উচ্চ মাধ্যমিক

অর্থনৈতিক ভূগোল

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য)

[পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ প্রবর্তিত সিলেবাস্ অনুসারে লিখিত]

অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, এম্. কম্.; সি. এ. আই. আই. বি.

অধ্যক্ষ, বারাসত সান্ধ্য কলেজ ; সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ; আধুনিক ভূগোল, সম্পদ-সমীক্ষা, হিসাবশাস্ত্র, আয়কর আইন, বাণিজ্যিক ও শিল্প-আইন, উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় সংগঠন, উচ্চ মাধ্যমিক হিসাবশাস্ত্র, Higher Secondary Accountancy, Higher Secondary Economic Geography, Practical Auditing, Secretarial Practice & Office Procedure, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

ও

জগদীশচন্দ্র বসু, বি.এ. (অনার্স) ; বি. টি.

ভূগোল শাস্ত্রের শিক্ষক, নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ (উচ্চ মাধ্যমিক), কোন্নগর ; ভূগোল শাস্ত্রের প্রাক্তন শিক্ষক, মথুরানাথ-জগদীশ বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা ; আধুনিক ভূগোল (ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণীর পাঠ্য), আধুনিক মৌখিক সংকলন, আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
এস্. ভট্টাচার্য,
পি-৪৬, আচার্য সত্যেন বসু সরণী
কলিকাতা-৭০০০৫৪

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—জুলাই, ১৯৭৮
তৃতীয় সংস্করণ—এপ্রিল, ১৯৭৯
চতুর্থ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০
পঞ্চম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৮০
ষষ্ঠ সংস্করণ—আগস্ট, ১৯৮১
সপ্তম সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৮১
অষ্টম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
নবম সংস্করণ—জুন, ১৯৮৩
দশম সংস্করণ—জুলাই, ১৯৮৪
একাদশ সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৮৪
দ্বাদশ সংস্করণ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)—সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

চিত্রশিল্পী : অধ্যাপক মনুজ গুহ
পোঃ নবগ্রাম, জেলা হুগলী

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য
পূর্বাশা প্রিন্টার্স
পি-৪৬, নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০৫৪

দ্বাদশ সংস্করণের ভূমিকা

অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের সহযোগিতায় পুস্তকখানির একাদশ সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ পাইলাম। আমরা এই সুযোগে ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত সংস্কার সাধন করিয়াছি :

Specimen Questions এবং ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে এই সংস্করণটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে।

মানচিত্রাদির সংস্কার সাধন করা হইয়াছে ও কয়েকটি নূতন মানচিত্র ও রেখাচিত্র সংযোজিত হইয়াছে।

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনীতে **W. B. Council of Higher Secondary Education** কর্তৃক প্রকাশিত **Specimen Questions** এবং ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন এবং উহাদের উত্তর-সংকেত দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিটি অনুশীলনীতেই **Essay-Type Questions**-এর সঙ্গে বহুসংখ্যক **Short Answer-Type Questions** এবং **Objective Questions** সংযোজিত হইয়াছে।

U. N. O Monthly Bulletin of Statistics, F. A. O. Monthly Bulletin, I. C. A. C. Monthly Bulletin, India—1984 ইত্যাদিতে প্রাপ্ত বিশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-পরিসংখ্যান পরিবর্তন করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৮৩-৮৪ সালের উৎপাদন-পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে।

ত্রিপুরার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ভূগোল নামক একটি অধ্যায় সংযুক্ত হইয়াছে।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভূগোলের সিলেবাস্ যথেষ্ট বিস্তৃত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে দুই বৎসরে সিলেবাস্ শেষ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য আমরা পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা সুনির্দিষ্টভাবে সিলেবাসের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছি; অযথা সিলেবাস্-বহির্ভূত বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করি নাই। পাঠ্য বিষয়ের আলোচনাও বাহুল্য-বর্জিত ও সাবলীল করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংস্করণটি পূর্বাপেক্ষা আরও সুচারুরূপে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইবে।

আশা করি, পুস্তকখানি পূর্বের মতোই অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হইবে।

বিনীত

সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য
জগদীশচন্দ্র বসু

কলিকাতা
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION

ECONOMIC GEOGRAPHY

SYLLABUS

Full Marks—200

PAPER I (Marks—100)

1. (a) **Economic Geography**: meaning and scope—methods study—relation with other branches of Geography—imp tance of study—dynamic nature.

   (b) **Man and his environment**: Principal factors of envir ment—(i) Physical: geographical location, topography, inl waterbodies, coastline, climate, soil, animals, vegeta minerals etc.

   (ii) Non-physical: population, political and social nisation, Adaptation of man to his environment, effect environment on the economic life of man.

   (c) **Climatic regions of the world**: Polar, Temperate (and Warm), Tropical and Equatorial; their influence vegetation, animal life, distribution of population, trans economic development etc.

   (d) **Meaning and nature of resources**: Resources-cre factors—functional theory of resources—concept of co vation of resources.

   (e) **Dual role of man**: Man-land ratio and population d sities—causes of uneven distribution of population—wo distribution of population—concept of optimum populat —world population trend.

2. Principal resources of the world and their utilisation:

   (a) **Fishing and world fisheries**: Economic significance of sea—important commercial fisheries of the world—mo methods of sea-fishing—fish trade—fish conservation.

(b) **Forest and forest resources:** Utility of forests—classification of forests—distribution of forest areas of the world and their exploitation—timber trade—forest conservation.

(c) **Soils:** Features—classification—soil problems—soil conservation.

(d) **Minerals and power resources:** Features of mining—mining and agriculture compared—classification.

Principal minerals and their uses: (i) Metals: Iron, copper, lead, tin, zinc, aluminium. manganese.

(ii) Non-metals: Salt, mica, building materials.

(iii) Fuel minerals: Coal, petroleum, water-power. Principal producers, consumers and traders.

3. **Principal resources of the world and their utilisation:**

(a) **Farming and farm resources:** Influence of climate on agriculture—types of farming—principal agricultural products: (i) Food crops: Rice, wheat, tea, coffee, sugar-cane, sugar-beet. (ii) Commercial crops: Cotton, jute, hemp, silk, rubber, oil-seeds—Their uses, principal growing areas, important markets.

(b) **Pastoral Farming:** Livestock—importance—principal products and their uses—production of raw wool, hides and skins and dairy article.

(c) **Transport, trade routes and trade centres:**
Importance of transport—different modes of modern transport: roads, inland waterways, railways, shipping and airways.

Trade routes: Land .routes (road and rail), .water routes (ocean, canal and river), and air routes. Examples of important routes—a descriptive study.

The Suez canal and the Panama canal.

Trade centres:

Ports and harbours—their functions, relation with the hinterland, required conditions for development. Some important ports of international standing.

(d) Manufacturing Industries:

(i) Essential factors for development—location of industries—industrial regions of the world—important industries: Iron and steel, Textiles (cotton, wool, silk, artificial silk, jute), paper and chemicals. Chief world centres.

(ii) **Trade**: Trade as an index of economic development—bases of international trade—major commercial regions of the world. (See Note below)

Note: The following portions of the syllabus will be treated as alternatives to each other, that is, if questions are set from topics of one area of study, alternative questions will be set from topics of the other area of study—

Portion of syllabus stated in sub-section 3 (c)—"Transport, trade routes and trade centres" in item 3 of the printed syllabus under the heading "Principal resources of the world and their utilisation."

Or,

Portion of syllabus as printed under headline "Manufacturing industries"—all topics.

ECONOMIC GEOGRAPHY OF INDIA

PAPER II (Marks—100)

A detailed study of the economic geography of India under the following heads:—

(a) Environmental features.

(b) Agriculture and agricultural products—pastoral resources—fishing—mining and important mineral resources—water-power—multipurpose river valley projects—forests and forest resources.

(c) Transport, trade routes, ports and trade centres.

(d) Manufacturing industries: Iron and steel, textiles (cotton, wool, jute), paper, chemicals, sugar, engineering.

(e) Foreign trade.

(f) Distribution of population.

(g) Economic geography of West Bengal: Principal agricultural and mineral resources—large scale industries and industrial regions, Tea industry—importance of Calcutta port.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

[প্রথম পত্র]

* 'পরিবহণ-ব্যবস্থা', 'বাণিজ্যপথ' ও 'বাণিজ্যকেন্দ্র' অথবা 'শ্রমশিল্প' ও 'বাণিজ্য' পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

[দ্বিতীয় পত্র]

ভারত

উচ্চ মাধ্যমিক

অর্থনৈতিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়

(Meaning & Scope of Economic Geography)

সংজ্ঞা (Meaning)—পূর্বে ভূগোল বলিতে সাধারণতঃ দেশের নাম, উহার রাজধানী, শহর প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনাই বুঝাইত। বর্তমানে এই শাস্ত্রের পরিধি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এখন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ভূগোল-শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মানুষকে কেন্দ্র করিয়া ভূগোলশাস্ত্র লিখিত হইয়াছে ; কারণ, মানুষের উন্নতিই সকলের কাম্য। প্রাকৃতিক অবস্থা ও সম্পদকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায় তাহাই ভূগোলবিদ্‌গণের প্রধান বিবেচ্য।

অন্যান্য শাস্ত্রের মতো ভূগোলশাস্ত্রকেও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, রাজনৈতিক বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাজনৈতিক ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রাকৃতিক ভূগোল, উদ্ভিদ সম্পকীয় বিষয় আলোচনার জন্য উদ্ভিদ সম্পকীয় ভূগোল প্রভৃতি এবং মানুষের অর্থনৈতিক পরিবেশ বুঝিবার জন্য অর্থনৈতিক ভূগোলের (Economic Geography) জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মানুষের জীবনধারণের জন্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, শিল্পের প্রসার ঘটে, মালপত্র চলাচল হয় ও জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। মানুষের এই সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর কতটা নির্ভরশীল, তাহাই **অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়।**

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—**প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশ**। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে প্রকৃতি-সৃষ্ট পরিবেশকে বুঝায় ; যেমন—জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, পাহাড়-পর্বত, খনিজ সম্পদ, সৈকতরেখা, নদ-নদী ইত্যাদি। অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে মনুষ্য-সৃষ্ট পরিবেশকে বুঝায় ; যেমন—জাতি, ধর্ম, সরকার ইত্যাদি। যে দেশে এই সকল পরিবেশ মানুষের যত অনুকূলে থাকিবে সেই দেশ তত সমৃদ্ধিশালী হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকায় উহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভগ্ন সৈকতরেখার জন্য ব্রিটেনে বন্দর-নির্মাণ সহজসাধ্য হইয়াছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে এই দেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সরকারের কর্মকুশলতার জন্য চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ায় দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আফ্রিকা মহাদেশের অভগ্ন সৈকতরেখা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা উহার অন্তর্গত দেশগুলির উন্নতি না হওয়ার প্রধান কারণ। এইভাবে বিভিন্ন পরিবেশ মানুষের উন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যদিকে এই সকল পরিবেশের উপরও মানুষের প্রভাব বিদ্যমান। আধুনিক-বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে প্রাকৃতিক অসুবিধা দূর করিয়া বিভিন্ন

পরিবেশকে নিজের অনুকূলে আনিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিয়া ভারতের অন্তর্গত রাজস্থানের মরুভূমির এক অংশকে কৃষিযোগ্য জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। দামোদর নদের উপর বাঁধ দিয়া উহার জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ ও জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এইভাবে মানুষ ক্রমশঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে; মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত এই সকল প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বা প্রভাব বুঝাইয়া দেওয়া অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের প্রধান কাজ। সুতরাং **যে শাস্ত্র প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography)** বলে।

বিখ্যাত ভূগোলবিদ্ ম্যাকফারলেন (J. Mcfarlane) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিশেষ করিয়া ভূপৃষ্ঠের গঠন, জলবায়ু, অবস্থান ইত্যাদি মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তত্ত্ব বিচারকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলা হয়।

আলোচ্য বিষয় (Scope)—হান্টিংটনের (Ellsworth Huntington) মতে মানুষের জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—যেমন, দ্রব্যসামগ্রী, প্রাকৃতিক সম্পদ, কার্যাবলী, রীতিনীতি, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা—তাহাই অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

ভূগোলের অপরূপ আখ্যান মানুষ ও প্রকৃতিদত্ত সম্পদ লইয়াই রচিত। সেই আখ্যানের মধ্যমণি বা অবিসংবাদী নায়ক মানুষ। ভূগোল তাই কঠিন বাস্তব। পৃথিবীর জল, স্থল, পাহাড়-পর্বত, মৃত্তিকা, অরণ্য ও জলবায়ু দেশ-দেশান্তরে মানুষের এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের ভাগ্য এবং কার্যক্রম কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, বা উহাদের উন্নতি বা অবনতিতে কি ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে, ইহাই ভূগোল-শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়।*

মানুষ ও প্রকৃতির নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্কের ফলে মানুষ কোথাও প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগাইয়া, কোথাও প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করিয়া কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজ সভ্যতাকে যুগযুগান্ত ধরিয়া নূতনতর উন্নতির পথে চালিত করিতেছে। তাহার ফলে ভূগোলের আলোচনাক্ষেত্রও পুরাতন সীমারেখা অতিক্রম করিয়া নূতন দিগন্তপ্রসারী হইতেছে। অধ্যাপক জিমারম্যান্ বলেন, সম্পদ ব্যবহারের অর্থ মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভাব মিটানো।† নোবেল লরিয়েট বলিয়াছেন যে, মানুষ শুধু বাঁচিবার জন্য আসে নাই—সে আসিয়াছে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে। এই প্রভাব তাহার চেতনাজাত। মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও উদ্ভাবনী শক্তি মানুষকে নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি ও সেই সকল অভাব পূরণের উভয় ক্ষমতাই দিয়া থাকে। নদীর জল সেইজন্যই আজ শুধু মাত্র পানীয়ের অভাব পূরণ করে না, ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালে, জলসেচের বন্দোবস্ত করে, মৎস্য-চাষের সুযোগ করিয়া দেয় ও পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বাণিজ্যিক কাঁচামালের বন্টন (Distribution), বাণিজ্য ও শিল্পবিশেষের কেন্দ্রীভূত হইবার কারণাবলী (Localisation factors),

* "The central theme of geography is the explanation of the part played by the land, the waters and the air in causing the plants, animals and people of one region to differ from those of other regions."—*Huntington.*

† E. W. Zimmermann.

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (Transport and Communications), মানবপ্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতায় সম্পদের গতিপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক সূত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। দ্রব্য, পণ্য, সম্পদ, কার্য, সংস্থা, রীতিনীতি, বিভিন্ন কার্য পরিচালনার ক্ষমতা অর্থাৎ মানুষের বাঁচিবার প্রয়োজনে যাহা দরকার সব কিছুই অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।*

সেইজন্য কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য—এই তিনটিকে লইয়াই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান ক্ষেত্র রচিত। অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রাকৃতিক এবং মানবিক সম্পদের বিনিময় অর্থনৈতিক নীতির উপর নির্ভর করিয়া রচনা করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান নায়ক মানুষ। গৌণ ভূমিকা প্রাকৃতিক পরিবেশের। মানুষ চিরকাল সূতিকাগারের নবজাতকের ন্যায় বাঁচিতে চাহে না। তাহার যৌবনদীপ্ত বিদ্রোহী ও কৌতূহলী মন নব নব চেতনার আলোকে প্রকৃতিকে কাজে লাগাইতে চাহে। প্রকৃতি নানা বাধা সৃষ্টি করে ; মানুষ সে বাধা অতিক্রম করে। প্রাকৃতিক সম্পদের সে নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করে ও উহা মোক্ষণের নব নব পদ্ধতি সৃষ্টি করে। তাই যুগে যুগে অর্থনৈতিক ভূগোলের আখ্যানবস্তুর পরিবর্তন ঘটে, নব নব পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়। মাত্র ৬৫ বৎসর পূর্বে তুষারাচ্ছন্ন সাইবেরিয়া সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিত। আজ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় মানুষের উদগ্র কর্ম-প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে সাইবেরিয়ার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেইজন্য সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচুর কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদ বর্তমানে সাইবেরিয়া হইতে উৎপাদিত হয়।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সম্যক্ ব্যবহারকে কার্যকরী বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া কিভাবে মানুষের জীবনের গতি-প্রকৃতির উন্নতিসাধন করা যায়, মানবসমাজ সেই জ্ঞান অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র হইতে লাভ করে। বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের (জলজ, বনজ, খনিজ, কৃষিজাত) অস্তিত্ব, কোন্ দেশের জলবায়ু মানুষের জীবনযাত্রার অনুকূল বা প্রতিকূল, বিভিন্ন দেশের অবস্থান ও আচার-ব্যবহার জানিয়া সেখানে কি ধরনের বাণিজ্য-সম্ভাবনা আছে, কোন্ দেশের শিল্প কোন্ স্তরে অবস্থিত, পরিবহণ কি ধরনের এবং কোন্ দেশের ভবিষ্যৎ কিরূপ সব কিছুই **অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।**

অনুশীলন প্রণালী (Methods of Study)—অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র মানব সম্পর্কিত ভূগোল ; সুতরাং এই শাস্ত্র অনুশীলন করিতে হইলে মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই অনুশীলন করিতে হইবে। কোনো মানুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করার অর্থ সেই মানুষের পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া।

পরিবেশ শব্দটির সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে হইলে বলা যায়—**মানুষের চারিপাশে যাহা কিছু বিদ্যমান এবং যাহার মধ্যে তাহার জীবনধারাটি গড়িয়া উঠে, তাহাকে পরিবেশ বলে।** পরিবেশ নানা প্রকারের হইতে পারে ; যেমন—প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি।

মানুষের চতুষ্পার্শ্বে প্রকৃতি-রাজ্যে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহাই **প্রাকৃতিক পরিবেশ**। জলবায়ু, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বৃষ্টিপাত

* "Economic Geography deals with the distribution of all sorts of materials, resources, activities, institutions, customs, capacities and types of ability that play a part in the work of getting a living."—*Huntington.*

ও তাপমাত্রা, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি লইয়া প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। এইগুলি সবই প্রকৃতির দান। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি পরিবেশ মানুষের সৃষ্ট। এইগুলিকে একত্রে সাংস্কৃতিক পরিবেশ (অপ্রাকৃতিক পরিবেশ) বলা হয়। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহার জীবনের মূল ধারাটি গঠন করে। মানব-জীবন প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়, সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারাও তেমনি প্রভাবিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব অনেক বেশী—এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মনে করা যাক, কোনো স্থান সমতলভূমির উপর অবস্থিত : সেখানকার মাটি উর্বর এবং সেখানে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। এইরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করিয়া সেখানকার মানুষ কৃষিকার্য করিয়াই জীবন ধারণ করিবে। কিন্তু অনুরূপ একই প্রকারের প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি ভারতে এবং সোভিয়েত রাশিয়াতে বিদ্যমান থাকে, তবুও ভারতের কৃষিপদ্ধতির সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার কৃষিপদ্ধতির পার্থক্য থাকার দরুন উভয় দেশের কৃষিজাত উৎপাদনের তারতম্য দেখা যাইবে। ইহার কারণ, দুই দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্য।

সেইজন্যই অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তেমনি সেখানকার সাংস্কৃতিক পরিবেশেরও বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কিভাবে কোনো স্থানের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এবং সেখানকার পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রয়োজন অনুসারে বদলাইয়া ফেলে। যেমন, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে পৃথক হওয়ার ফলেই সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে স্বাধীনতার পরবর্তী সাংস্কৃতিক পরিবেশ ক্রমশঃ বদলাইয়া যাইতেছে বলিয়াই তো নিত্য নূতন সেচ-প্রকল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, গুরুশিল্প ইত্যাদি সৃষ্টি হইতেছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিতেছে।

প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত ও সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়া মানবজাতির উন্নতির অনুশীলনই অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল লক্ষ্য।

উল্লিখিত লক্ষ্য লইয়া অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচিত হয় বলিয়াই এই শাস্ত্র অনুশীলনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গী মানবকল্যাণ অভিমুখী হইয়া পড়ে। তাই তাহারা যেমন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে, তেমনি চিন্তা করে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের কথা। অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের যথাযথ অনুশীলন করিতে পারিলে দেশের মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হইবে।

ভূগোলশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের সম্পর্ক (Relation with other branches of Geography)—ভূগোলশাস্ত্রের পরিধি বিশাল। এইজন্য এই শাস্ত্রকে সঠিক অধ্যয়নের জন্য ইহাকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয় ; যথা—(১) প্রাকৃতিক ভূগোল (Physical Geography), (২) উদ্ভিদ সম্পর্কীয় ভূগোল (Phyto Geography), (৩) প্রাণীসম্পর্কীয় ভূগোল (Zoo

Geography), (৪) মানবিক ভূগোল (Anthro Geography or Human Geography)। তাহাছাড়া অনেক ভূগোলবিদ্ আরও বিভাগের পক্ষপাতী—যথা, গাণিতিক ভূগোল (Mathematical Geography), অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography) এবং রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography)। ভূগোলশাস্ত্রের এতগুলি বিভাগ মানবিক প্রয়োজনেই করিতে হইয়াছে।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি বা অবনতি এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের সহিত মানুষের সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ও উহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য **প্রাকৃতিক ভূগোল** অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। আবহবিদ্যায় (Climatology) জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই শাস্ত্র প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত। ভূ-প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য ভূ-তত্ত্ব (Geology) অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এই শাস্ত্রও প্রাকৃতিক ভূগোলের অঙ্গীভূত। প্রাকৃতিক সম্পদকে কিভাবে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা যায়, অর্থনৈতিক ভূগোলে সেই সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে। উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা করে **উদ্ভিদ সম্পর্কীয় ভূগোল**। কিন্তু উদ্ভিদকে কিভাবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কাজে লাগানো যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনা করে অর্থনৈতিক ভূগোল। প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা করে **প্রাণিসম্পর্কীয় ভূগোল**। কিন্তু বিভিন্ন প্রাণীকে কিভাবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কাজে লাগানো যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনা করে **অর্থনৈতিক ভূগোল**। মানুষের বসতি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে **মানবিক ভূগোল**, কিন্তু মানুষের সংস্কৃতি কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োজিত করিয়াছে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করে অর্থনৈতিক ভূগোল।

এইভাবে দেখা যায় যে, ভূগোল শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান।

অর্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা (Importance of the Study of Economic Geography)—বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এই উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। ভারতে কিভাবে নদীর উপর বাঁধ দিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে এবং কিভাবে এই বিদ্যুৎ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হইতেছে, সেই সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশের বিভিন্ন সম্পদকে কাজে লাগাইতে হইবে। কোন্ দেশে কৃষিজাত সম্পদ অধিকমাত্রায় পাওয়া যায়, কোন্ দেশ খনিজ সম্পদের অধিকারী এবং কোন্ দেশে শিল্পের উন্নতির অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান তাহা সম্যক্ অবগত না হইলে দেশের উন্নতিসাধন করা সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়ন করিলে সকল দেশের বিভিন্ন সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যের অবস্থা, পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের সুবন্দোবস্ত, যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেও অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। দেশ শাসন করিবার জন্য রাজস্ব আদায় করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সূত্রে রাষ্ট্রে অর্থাগমের পরিমাণ এবং আমদানি-রপ্তানির অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক্

জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে রাজস্ব আদায় করা বা বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে জানিতে হইলেও অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। দেশের পশুসম্পদ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেও অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠ করা প্রয়োজন। এইভাবে দেখা যাইবে যে, **দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য এবং রাজ্যশাসনের জন্য অর্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।**

অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র (Dynamic nature of Economic Geography)—মানুষের জীবন সর্বদাই গতিশীল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের জীবনধারণ প্রণালীর সঙ্গে বর্তমান স্পুটনিক যুগের মানুষের জীবনধারণ প্রণালীর তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, মানুষের জীবন সর্বদাই গতিশীল। অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র এই গতিশীল মানবজীবন লইয়া আলোচনা করে; সুতরাং এই শাস্ত্রও একটি গতিশীল বিজ্ঞান।

আদিম যুগে মানুষ পশু-শিকার, মৎস্য-শিকার ও বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সেই যুগে মানুষ ছিল যাযাবর। বন্য ফলের উৎপাদন-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া ও অনুকরণ করিয়া মানুষ ক্রমশঃ কৃষিকার্যের উদ্ভাবন করিল। তাহার ফলে মানুষের জীবনধারণ প্রণালীতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইল। যাযাবর চরিত্র পরিবর্তিত হইল—কৃষিকার্যের জন্য মানুষ এক জায়গায় বসবাস করিতে শিখিল। প্রথমে মানুষ প্রধানতঃ নিজের পেশীশক্তির উপর নির্ভরশীল থাকিলেও ক্রমশঃ বিভিন্ন পশুকে বশে আনিয়া পশু-শক্তিকে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করিতে শিখিল। প্রাথমিক অবস্থায় প্রধানতঃ নিজের জন্য বিভিন্ন সম্পদ উৎপাদন করিলেও ক্রমশঃ মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় প্রথার প্রচলন হইল। এই যুগে অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় কৃষিকার্য, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, পশু-পালন প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে **বাষ্পশক্তি (Steam power)** আবিষ্কারের ফলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃহদাকার যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে যে **শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution)** শুরু হয়, তাহার ফলে মানুষের পেশী-শক্তি ও পশু-শক্তির সহিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উদ্ভূত জড়শক্তি যুক্ত হইল। কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি হইতে জড়শক্তি উৎপন্ন হয়। এই সকল শক্তিসম্পদ মানুষের বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত হইল। কৃষিকার্য, পরিবহণ-ব্যবস্থা, শ্রমশিল্প ও অন্যান্য কার্যে এই সকল জড়শক্তি নিয়োজিত হওয়ায় সম্পদসৃষ্টির কাজে প্রচুর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে মানুষের জীবনধারণের মান ও প্রণালী উন্নততর হইল। ইহা ছাড়া জড়শক্তির সাহায্যে শুধু যে শ্রমশিল্পের ও কৃষিকার্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল তাহাই নহে, আধুনিক রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, বিমানপোত ও অন্যান্য পরিবহণ-ব্যবস্থার ফলে পৃথিবীর সকল স্থান মানুষের নিকটতর হইল; অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিল। এই যুগে অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষিকার্য, শ্রমশিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থায় জড়শক্তির ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি।

বর্তমান যুগে আণবিক শক্তির আবিষ্কার এবং শিল্পে ও পরিবহণে উহার ব্যবহার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত পরিবর্তন ঘটাইতেছে। অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র উহার আলোচনাও করিয়া থাকে।

যুগে যুগে মানুষের জীবনধারণ প্রণালীতে এইভাবে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময়ে একরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। কোনো কোনো দেশ শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে; কিন্তু কোনো কোনো দেশ এখনও আদিম যুগে বা আধা-উন্নত যুগে পড়িয়া রহিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ব্রিটেন, জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন দেশের উন্নতিতে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্য। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান। যথা, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ ও কৃষিজাত সম্পদ। আবার কোনো কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রীনল্যান্ড, নেপাল, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কোনো কোনো দেশে সাংস্কৃতিক পরিবেশের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। আবার কোনো কোনো দেশে সাংস্কৃতিক পরিবেশের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ স্থানীয় মানুষের উন্নতিতে ব্যবহার করা যায় না। পূর্বে জায়েরের বিশাল খনিজ সম্পদ ঐ দেশের উন্নতিতে নিয়োজিত না হইয়া বেলজিয়ামে চলিয়া যাইত; কারণ, স্থানীয় মানুষ পরাধীনতার ফলে শিক্ষায়, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে অনুন্নত ছিল। অবশ্য সকল দেশই আবার সকল সময় একইভাবে উন্নতিলাভ করে না। চীনদেশে বিপ্লবের পূর্বের অবস্থা ও বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ এই দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নতি ও স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মদক্ষতা।

বর্তমান যুগে সকল দেশেই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিয়া সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হইতেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবও কিছুটা পূরণ করা হইতেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার স্টেপ্‌স্ তৃণভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরীকরণ এইজাতীয় প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ। বর্তমান যুগে মানুষের এই সকল কার্যাবলী অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত।

এইভাবে দেখা যায় যে, মানুষের গতিশীল জীবনধারণ-প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ও পরিবর্তিত হইতেছে। তাই এই শাস্ত্রের গতিশীল চরিত্রের জন্য ইহাকে একটি **গতিশীল বিজ্ঞান (Dynamic Science)** বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Define "Economic Geography" and explain its scope and importance. **[Specimen Question of H. S. Council, 1980 & '81]**

(অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা লিখ এবং উহার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বুঝাইয়া লিখ।)

উঃ 'অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়' (১ পৃঃ—৪ পৃঃ) এবং 'অর্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা' (৫ পৃঃ—৬ পৃঃ) লিখ।

2. Discuss the meaning and scope of economic geography and indicate its relation with other branches of geography.

[W. B. H. S. Examination, 1978]

(অর্থনৈতিক ভূগোলের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর। ভূগোলের অন্যান্য শাখার সহিত উহার সম্পর্ক নির্দেশ কর।)

উঃ 'আলোচ্য বিষয়' (২ পৃঃ—৩ পৃঃ) এবং 'ভূগোলশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের সম্পর্ক' (৪ পৃঃ—৫ পৃঃ) লিখ।

3. Explain the relation of Economic Geography with other branches of geography.

(অর্থনৈতিক ভূগোলের সহিত ভূগোলশাস্ত্রের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।)

উঃ 'ভূগোলশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের সম্পর্ক' (৪ পৃঃ—৫ পৃঃ) লিখ।

4. Explain in what respects economic geography may be considered as a dynamic science. Illustrate with suitable examples.

[W. B. H. S. Examination, 1979]

(অর্থনৈতিক ভূগোলকে একটি গতিশীল বিজ্ঞান বলা যায় কেন তাহা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।)

উঃ 'অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র' (৬ পৃঃ—৭ পৃঃ) লিখ।

5. Why is economic geography called a dynamic science? Discuss with examples. [W. B. H. S. Examination, 1981]

(অর্থনৈতিক ভূগোলকে একটি গতিশীল বিজ্ঞান বলা হয় কেন? উদাহরণসহ আলোচনা কর।)

উঃ 'অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র' (৬ পৃঃ—৭ পৃঃ) লিখ।

B. Short Answer/Problem-Type Questions

1. Write short notes on : (a) Phyto geography, (b) Climatology.

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : (ক) উদ্ভিদ সম্পর্কীয় ভূগোল ; (খ) আবহবিদ্যা।]

উঃ ৫ পৃঃ হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Write correct answers from the following sentences :

(a) Economic Geography is a Dynamic/Static Science.

(b) Economic Geography is closely related to Anthro Geography/Physics.

(c) The main topic of Economic Geography is to ascertain how much the man's economic activities is dependent on his luck/environment.

[নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখ :

(ক) অর্থনৈতিক ভূগোল একটি গতিশীল/স্থিতিশীল বিজ্ঞান।

(খ) অর্থনৈতিক ভূগোল মানবিক ভূগোল/পদার্থবিদ্যার সহিত নিকট সম্পর্কযুক্ত।

(গ) মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম তাহার ভাগ্যের উপর/পরিবেশের উপর কতটা নির্ভরশীল তাহা নির্ণয় করাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ ও তাহার পরিবেশ

(Man and his Environment)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, মানুষের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাবই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পরিবেশ বলিতে সাধারণতঃ মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে (Surroundings of Man) বুঝানো হয়। অর্থাৎ মানুষের চারিদিকে যে অবস্থাগুলি বিদ্যমান তাহাই মানুষের পরিবেশ। মানুষের অবস্থার উপর পরিবেশ কতটা প্রভাব বিস্তার করে তাহাই এই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদান (Principal Factors of Environment) —মানুষের পরিবেশকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment) ও (২) অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ (Non-Physical Environment)।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

(Physical Factors of Environment)

মানুষ নিজের শক্তিতে পরিবেশের যে উপাদানগুলিকে সৃষ্টি করিতে পারে না উহাদের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। এই উপাদানগুলি প্রকৃতিপ্রদত্ত বলিয়াই ইহাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশসমূহ প্রকৃতির সৃষ্টি। ইহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়: যথা—(১) ভৌগোলিক অবস্থান, (২) ভূ-প্রকৃতি, (৩) অভ্যন্তরীণ জলাশয়, (৪) সৈকতরেখা, (৫) জলবায়ু, (৬) মৃত্তিকা, (৭) জীবজন্তু, (৮) স্বাভাবিক উদ্ভিদ, (৯) খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।

ভৌগোলিক অবস্থান (Geographycal Location)

কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। যে কোনো দেশের অবস্থানের উপর ঐ দেশের জলবায়ু নির্ভরশীল ; যেমন, নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে কোনো দেশের অবস্থান হইলে সেখানে নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কৃষিকার্য জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল ; কারণ, উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত কৃষির উন্নতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ধান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যমান থাকায় এই রাজ্য ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সুতরাং জলবায়ুর উপর মানুষের উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। জলবায়ুর তারতম্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোক সমানভাবে উন্নত হয় না। ভৌগোলিক অবস্থান মানুষের বসতিস্থাপনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অত্যধিক গরম ও সারা বৎসর ধরিয়া অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া মনুষ্যবাসের প্রায় অযোগ্য। মেরু অঞ্চলগুলি বরফাচ্ছন্ন বলিয়া মানুষ সহজে সেখানে যাইতে পারে না ও বসবাস করিতে পারে না। ভৌগোলিক অবস্থানকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(i) সমুদ্র হইতে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে :

(ক) **মহাদেশীয় অবস্থান**—মহাদেশের অভ্যন্তরস্থ দেশগুলি এই প্রকার অবস্থানের অন্তর্গত ; যেমন, বলিভিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, আফগানিস্তান, নেপাল ইত্যাদি। এই দেশগুলি স্বভাবতঃই সমুদ্রতীর হইতে দূরে অবস্থিত এবং সেইজন্য বন্দর না থাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্য তেমন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। এই সকল দেশের স্বাভাবিক সীমারেখা না থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। জার্মানী এই যুদ্ধে তাহার পার্শ্ববর্তী মহাদেশীয় অবস্থানভুক্ত দেশগুলিকে আক্রমণ করিয়া সহজেই ঐ সকল দেশকে তাহার অধিকারে আনিয়াছিল।
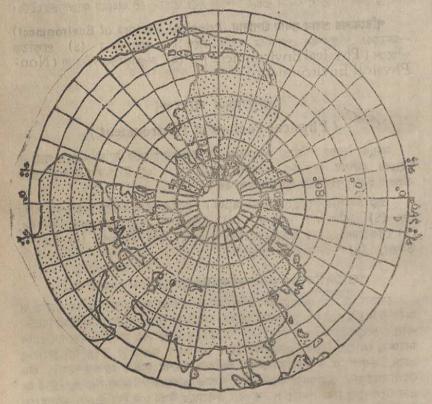
অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর গোলার্ধের অবস্থান

(খ) **সমুদ্র-প্রান্তীয় অবস্থান**—সমুদ্র-প্রান্তীয় অবস্থানভুক্ত দেশগুলির কোনো কোনো অংশ সমুদ্র-প্রান্তে অবস্থিত থাকে ; যেমন, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যাদি। এই সকল দেশের পক্ষে বন্দর গড়িয়া তোলা সহজসাধ্য বলিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা সম্ভব।

(গ) **দ্বৈপ অবস্থান**—দ্বৈপ অবস্থানভুক্ত দেশগুলির চারিদিকে সমুদ্র থাকায় বন্দর-নির্মাণের পক্ষে এই সব দেশ খুবই উপযুক্ত। সেইজন্য এই দেশগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুব উন্নতিলাভ করিয়াছে। যথা—ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ইত্যাদি। এই সকল দেশ সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়া এখানকার অধিবাসীরা নৌ-বিদ্যায় ও মৎস্য-ব্যবসায়ে পারদর্শী।

(ঘ) **উপদ্বীপীয় অবস্থান**—উপদ্বীপীয় অবস্থানভুক্ত দেশগুলির তিনদিকে জল ও একদিকে স্থল থাকায় বন্দর নির্মাণে ও বাণিজ্যে এই দেশগুলির উন্নতিলাভ সহজসাধ্য হইয়াছে; যেমন—ভারত, ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি।

ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দেশের **রাজনৈতিক নিরাপত্তা** নির্ভর করে। কারণ দ্বৈপ অবস্থানভুক্ত দেশগুলির প্রাকৃতিক সীমারেখা থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহজসাধ্য নহে। কোনো কোনো দেশে পাহাড় পর্বত বা নদীর দ্বারা প্রাকৃতিক সীমারেখার সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, তিনদিকের সমুদ্র ও উত্তরের হিমালয় পর্বত ভারতের স্বাভাবিক সীমারেখা। সেইজন্যই কবি বলিয়াছেন:

"আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী।"

কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান **পৃথিবীর মধ্যস্থলে** হইলে, উহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এখান হইতে পৃথিবীর কোনো দেশেরই দূরত্ব খুব বেশী নহে। সুতরাং এই দেশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা সুবিধাজনক। এই দেশ বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। জাপান ও ভারতের অবস্থানও পৃথিবীর মধ্যস্থলে। ইহা বাণিজ্যের পক্ষে খুবই সহায়ক। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভৌগোলিক অবস্থান দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

(ii) **অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে:**

ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো স্থানের অবস্থিতি অক্ষরেখা (Lines of Latitude) ও দ্রাঘিমারেখা (Lines of Longitude) দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়। জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রভৃতির সহিত অক্ষাংশের নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। বিষুবরেখা (নিরক্ষরেখা) হইতে যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায় তাপমাত্রা ততই কমিতে থাকে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা কম। অক্ষাংশ অনুসারে পৃথিবীর দেশগুলিকে অবস্থানগতভাবে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) উষ্ণমণ্ডলীয় অবস্থান, (খ) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় অবস্থান ও (গ) হিমমণ্ডলীয় অবস্থান।

উল্লিখিত বিভিন্ন তাপমণ্ডলে অবস্থানকারী দেশসমূহে জলবায়ুর প্রভেদ ঘটায় মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, উষ্ণমণ্ডলে অত্যধিক উত্তাপের জন্য মানুষ বেশী পরিশ্রম করিতে পারে না, সেইজন্য উৎপাদন কম হয়। উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত যে সকল স্থানের উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই সকল স্থানে কৃষিকার্য উন্নতিলাভ করিয়াছে। হিমমণ্ডলে উত্তাপের অভাবে উৎপাদন অত্যন্ত কম হয়; প্রায় সারা বৎসর বরফাবৃত থাকায় কৃষিকার্য মোটেই প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। লোকসংখ্যাও অতি বিরল। এই দুই মণ্ডলের মধ্যবর্তী নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা অসহ্য নহে, আবার শীতের তাপমাত্রাও মানুষের সহ্য-সীমার মধ্যে থাকে। এই মণ্ডলের দেশসমূহ অনুকূল জলবায়ুর জন্য কৃষিকার্য ও শ্রমশিল্পে সর্বাপেক্ষা উন্নত।

সেইজন্য কোনো দেশের অক্ষাংশ জানিতে পারিলেই ঐ দেশটি কোন্ তাপমণ্ডলে অবস্থিত তাহা জানা যায় এবং তাপমণ্ডল জানিতে পারিলেই উহার উৎপাদন-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রগতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সুতরাং অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২। ভু-প্রকৃতি (Topography)

ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানের উচ্চতা সমান নহে। কোনো স্থান পর্বতের ন্যায় উচ্চ আবার কোনো স্থান প্রায় সমুদ্র সমতলের ন্যায় নিম্ন। কোনো স্থান সমভূমি, কোনো স্থান মালভূমি ও কোনো কোনো স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নিম্নে অবস্থিত। ভূমি-রূপের এই প্রকার বিভিন্নতার ফলে কোনো দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়, কোনো দেশ অনুন্নত থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি অনুসারে ভূ-প্রকৃতিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) পার্বত্যভূমি, (খ) মালভূমি ও (গ) সমভূমি।

(ক) **পার্বত্যভূমি**—পর্বতসংকুল স্থানে অর্থনৈতিক বিকাশের নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা যায়। যেমন, বর্তমান যুগে যানবাহন-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে কোনো দেশের উন্নতি সম্ভব নহে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের জমি অসমতল হওয়ায় এখানে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ কষ্টসাধ্য। এই অঞ্চলের নদীগুলি খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে। **পরিবহণ-ব্যবস্থার** উন্নতি না হইলে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয় না। এইজন্য পার্বত্য অঞ্চলগুলি এখনও অনুন্নত। জমি উঁচু-নীচু হওয়ায় ও বিক্ষিপ্ত থাকায় এখানে কৃষিকার্যে আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা সম্ভব নহে। এই জন্য এখানে কৃষির উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। চাহিদা, যানবাহন ও সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব, বিরল লোকবসতি ও বাজারের দূরত্বের জন্য এখানে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করে না। এই সকল কারণে স্থানীয় লোকেরা **অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ** হয়। এই জন্যই ভারতের হিমালয় অঞ্চলের উন্নতি তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

ইহা সত্ত্বেও পার্বত্য অঞ্চল হইতে দেশের বহু **উপকার** সাধিত হয়। প্রধানতঃ, পর্বতের অনুকূল অবস্থানহেতু দেশে **বৃষ্টিপাত** হয়। কারণ, ইহা আর্দ্র বায়ুকে বাধা দিয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। হিমালয় পর্বতমালা ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সহায়ক। দ্বিতীয়তঃ, পর্বত হইতে বিভিন্ন **নদ-নদীর** উৎপত্তি হয়। নদী দেশের সমৃদ্ধিসাধনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের হিমালয় পর্বত হইতে উপনদী সহ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদ-নদীগুলির উৎপত্তি না হইলে হয়ত ভারতের অধিকাংশ স্থানই মরুপ্রায় হইয়া যাইত। তৃতীয়তঃ, পার্বত্য অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ **বনভূমি** বিদ্যমান। বনজ সম্পদ হইতে **কাষ্ঠ,** জ্বালানি ও শিল্পের বিবিধ কাঁচামাল পাওয়া যায়। ভারতের হিমালয় অঞ্চল হইতে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তীর্ণ **পশুচারণভূমি** বিদ্যমান। এখানে পশুপালন দ্বারা বহু লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। পঞ্চমতঃ, পার্বত্য অঞ্চল হইতে যখন নদীগুলি সমভূমিতে আসিয়া পড়ে তখন উহার স্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এই জলবিদ্যুৎ বিভিন্ন শিল্পে ও মানুষের বাসস্থানে ব্যবহার করা হয়। ভারতের দামোদর, মহানদী, শতদ্রু প্রভৃতি নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইয়াছে ও হইতেছে। ষষ্ঠতঃ, পার্বত্য অঞ্চল গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে বলিয়া বহু লোক এই সময় এখানে আসিয়া বাস করে। পৃথিবীর বিখ্যাত **স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি**

পৃথিবী
ভূ-প্রকৃতি
পর্বত
পাহাড়
মালভূমি
সমভূমি
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
দক্ষিণ মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
সুমেরুবৃত্ত
কর্কটক্রান্তি
নিরক্ষরেখা
মকরক্রান্তি

এই অঞ্চলে অবস্থিত। ভারতের সিমলা, শিলং, দার্জিলিং, নৈনিতাল প্রভৃতি স্থানে বহু লোক গ্রীষ্মকালে অস্থায়িভাবে বাস করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর পার্বত্যভূমিও বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

(খ) **মালভূমি**—সমুদ্রসমতল হইতে মালভূমি ৩৫০ মিটার হইতে প্রায় ১,০০০ মিটার উচ্চ হইয়া থাকে। কোনো কোনো মালভূমির উচ্চতা ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী হয়। যেমন, তিব্বত মালভূমির উচ্চতা গড়ে ৪,০০০ মিটার।

মালভূমির পৃষ্ঠ প্রায় সমতল বা তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে। মালভূমি সাধারণতঃ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমতলভূমিতে মিশিয়া যায়; কিন্তু কোনো কোনো মালভূমির ঢাল বেশ কম হয়, মনে হয় যেন খাড়াভাবে উহা নীচে নামিয়া গিয়াছে; কোনো কোনো মালভূমি পর্বতবেষ্টিত হইয়া থাকে।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরাও বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে না। এখানে প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকিলেও যানবাহনের অসুবিধা থাকায় শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। এই সকল অঞ্চলে মৃত্তিকা সাধারণতঃ সমভূমির মৃত্তিকা অপেক্ষা কম উর্বর হইয়া থাকে; সেইজন্য কৃষিকার্য অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। তৃণাচ্ছাদিত মালভূমিতে অধিবাসীরা পশুপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। মালভূমির উচ্চতা উষ্ণমণ্ডলের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে; উষ্ণমণ্ডলে মালভূমি অঞ্চলের উষ্ণতা কম হয়। ফলে জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন ও স্বাস্থ্যকর হয়। বর্তমান যুগে মালভূমি অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে মালভূমির প্রভাব সমভূমি অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু পার্বত্যভূমি অপেক্ষা অধিক।

(গ) **সমভূমি**—নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই সমভূমি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। নদী-বাহিত পলিমাটির আধিক্য থাকায় সমভূমির মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্বর হয়। সেইজন্য ইহা কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। সমতলভূমির জমি উঁচু-নীচু নহে বলিয়া ইহা যানবাহন চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত। এখানকার নদীগুলি খরস্রোতা নহে বলিয়া নৌ-চলাচলের পক্ষে উপযোগী। ইহা শিল্প প্রসারের সহায়ক। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ বড় শহর ও বন্দর সমতল অঞ্চলে অবস্থিত। কাঁচামাল ও শ্রমিকের অভাব না থাকায় এবং যানবাহনের সুবিধা থাকায় এই অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটিয়া থাকে। এই সকল কারণে সমভূমিতে ঘন লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর শতকরা ৯০ জন লোক এই অঞ্চলে বাস করে। কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের সুবন্দোবস্ত থাকায় সমভূমির অধিবাসীরা জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে। এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন সহজসাধ্য। খাওয়া-পরার অভাব থাকে না বলিয়া কিছু কিছু লোক শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য সাংস্কৃতিক উন্নতিতে ইহারা অগ্রগামী। সুতরাং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সমভূমির প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক।

৩। অভ্যন্তরীণ জলাশয় (Inland waterbodies)

অভ্যন্তরীণ জলাশয় বলিতে নদ-নদী, হ্রদ, খাল-বিল, পুষ্করিণী, জলাধার প্রভৃতি বুঝায়। এই জলাশয়গুলি মানব-জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলির মধ্যে নদ-নদীর প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অধিক।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নদীমাতৃক দেশগুলিতে

প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়াছে। নীলনদের উপত্যকায় মিশর, টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিশ নদীর উপত্যকায় ব্যাবিলন, সিন্ধু-গাঙেগয় উপত্যকায় ভারতবর্ষ এবং হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় চীন প্রাচীন সভ্যতার বাহক। বর্তমান যুগেও নিম্নলিখিত বহু উপায়ে নদী দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে :

(ক) **পানীয় জল** সরবরাহ করা নদীর একটি প্রধান কাজ। হুগলী নদীর জল পরিশোধন করিয়া কলিকাতা শহরের অধিবাসীদের জলের ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) নদীর জল কৃষিকার্যে **জলসেচের** জন্য ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের জন্য নদীর উপর বাঁধ দিয়া জলাধারে জল সঞ্চিত করিয়া সেখান হইতে খাল কাটিয়া সেই জল কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর বাঁধ দিয়া বিস্তৃত এলাকায় জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয়।

(গ) নদী দেশের স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের প্রণালীরূপে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা শহরের যাবতীয় আবর্জনা হুগলী নদীতে আনিয়া ফেলা হয়। ভাগীরথী নদীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও দক্ষিণাংশের বর্ষাকালীন উদ্বৃত্ত জলের অধিকাংশ বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। নদী পয়ঃপ্রণালীরূপেও ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) সুলভে পণ্য-পরিবহণের কাজে নদী খুবই উপযোগী। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদী ভারতের পণ্য-পরিবহণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। আসামের চা ও বাংলাদেশের পাট অধিকাংশই নদীপথে কলিকাতায় আনীত হয়। অবশ্য নাব্য হইতে হইলে নদীকে বরফমুক্ত হইতে হইবে ; খরস্রোতা ও জলপ্রপাতযুক্ত নদী এবং গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক নদী পরিবহণের অযোগ্য। এই জন্য দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি সাধারণতঃ পরিবহণের অনুপযুক্ত।

(ঙ) নদী-বাহিত **পলিমাটি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে উর্বর** করে। এই কারণে ভারতের ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদীর উপত্যকা, মিশরের নীলনদের উপত্যকা এবং চীনের ইয়াংসি-কিয়াং নদীর উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষিকার্যের পক্ষে খুবই উপযোগী।

(চ) নদী যেখানে পাহাড়-পর্বত হইতে সমতলভূমিতে প্রবেশ করে সেই স্থানে বাঁধের সাহায্যে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করিয়া সুলভে **জলবিদ্যুৎ** উৎপন্ন করা

হয় এবং **জলসেচের** বন্দোবস্ত করা হয়। এই বিদ্যুৎ দেশের শিল্পোন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করে। ভারতের দামোদর, শতদ্রু, মহানদী প্রভৃতি নদ-নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে এবং জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নীলনদের উপর আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ করিয়া কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। নীলনদ হইতে মিশরের সর্বতোমুখী উপকার সাধিত হইয়াছে। এইজন্য মিশরকে **'নীলনদের দান'** (**Gift of the Nile**) বলা হয়। এই সকল কারণে নদীর উপকূলবর্তী স্থানে ঘন **লোকবসতি** বিদ্যমান।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন উপায়ে নদী একদিকে যেমন দেশের বহুমুখী উন্নতিসাধন করে, অপরদিকে বন্যা দ্বারা প্রভূত ক্ষতিসাধনও করিয়া থাকে। ১৯৭৮ সালের অভূতপূর্ব বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও চীনের হোয়াং হো নদীর বন্যায় প্রায়ই বহু সম্পত্তি ও জীবন নষ্ট হইত। এইজন্য এই নদীকে 'চীনের দুঃখ' বলিয়া অভিহিত করা হইত। বিপ্লবের পর চীন সরকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই নদীর বন্যা রোধ করিয়া ইহাকে জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছে।

অনুরূপভাবে হ্রদ, খাল, বিল প্রভৃতিও মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। হ্রদের গুরুত্ব নদী অপেক্ষা অনেক কম; তথাপি বায়ুর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে ও বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে, খনিজ দ্রব্যের উৎসরূপে, জলসেচ ও জলনিকাশের উপায়রূপে, মৎস্য ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের ও লবণের উৎসরূপে হ্রদের গুরুত্ব যথেষ্ট। হ্রদ ও খালের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়া থাকে। সুয়েজ খাল ও পানামা খালের গুরুত্ব সর্বজনবিদিত।

৪। সৈকতরেখা (Coast Line)

সৈকতরেখার প্রকৃতির উপর দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি নির্ভর করে। সৈকতরেখা ভগ্ন হইলে বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা সহজসাধ্য হয়। অবশ্য এইজন্য সমুদ্রের গভীরতাও প্রয়োজন। সমুদ্রের ভয়াবহ ঢেউ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় দরকার। ব্রিটেন, নরওয়ে ও নেদারল্যান্ডস্-এর অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে উহাদের ভগ্ন সৈকতরেখা। আফ্রিকার সৈকতরেখা অভগ্ন হওয়ায় সেখানে ভাল পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে ঐ মহাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথ ব্যাহত হইয়াছে। ভারতের সৈকতরেখা সাধারণতঃ অভগ্ন। সেইজন্য পশ্চিম উপকূলের সৈকতরেখায় বোম্বাই ছাড়া অন্য কোনো বড় বন্দর নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। পূর্ব উপকূলের সৈকতরেখাও অভগ্ন বলিয়া মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম্ ছাড়া অন্য কোথাও ভালো বন্দর নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই।

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সৈকতরেখা ভগ্ন হইলেও তাহা বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণের পক্ষে উপযোগী নাও হইতে পারে। অনেক স্থানে ভগ্ন সৈকতরেখা থাকা সত্ত্বেও বন্দর নির্মাণ সম্ভব হয় না। বন্দর নির্মাণের জন্য সৈকতরেখার ভগ্নস্থানের সমুদ্রে গভীরতা প্রয়োজন : নতুবা সেখানে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। তরঙ্গোৎক্ষেপ হইতে জাহাজের সুরক্ষণের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন; নতুবা জাহাজ আসিয়া নির্বিঘ্নে নোঙ্গর করিয়া মাল উঠা-নামা করাইতে পারে না।

ইহা ছাড়া বন্দর নির্মাণ করিতে হইলে বন্দরের সহিত যানবাহনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তর ভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। কারণ, পণ্যের আমদানি-রপ্তানির

পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বন্দরের মারফত যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা যায়, সেইজন্য দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

৩। জলবায়ু (Climate)*

কোনো দেশের তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সমষ্টিগত অবস্থার দীর্ঘ দিনের (প্রায় ৩৫ বৎসরের) গড় ফলকে ঐ দেশের জলবায়ু বলা হয়। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে দেশের জলবায়ু যতটা প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রীও এই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষভাবে জলবায়ু মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর নিম্নলিখিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে :

(ক) কৃষিকার্য প্রধানতঃ জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। যেখানে বৃষ্টিপাত কৃষিকার্যের উপযোগী সেখানে ফসল ভাল হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম, সেখানে কৃষিকার্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগে বৃষ্টিপাতের অভাবে জলসেচ-ব্যবস্থা দ্বারা কৃষিকার্য করা হইলেও ইহা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। তাপমাত্রার উপরও কৃষিকার্য নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। খাদ্য মানুষের সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। মানুষ কি প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করিবে তাহা জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। কারণ, পরিপাক-শক্তি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের জলবায়ু ধান উৎপাদনের উপযোগী এবং ভাত পরিপাকের সহায়ক বলিয়া ভাত বাঙালীর প্রধান খাদ্য।

স্বাভাবিক উদ্ভিদের উৎপাদন বহুলাংশে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। জলবায়ুর তারতম্যের দরুন বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অক্ষাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাপমাত্রা হ্রাস পাইতে থাকে, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি তাপমাত্রা কমিতে থাকে। এইজন্য অক্ষাংশ ও উচ্চতার পার্থক্যের জন্য জলবায়ুর পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। জলবায়ুর পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতের তারতম্য ঘটায় স্বাভাবিক উদ্ভিদেরও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিদ জন্মে অর্থাৎ পৃথক পৃথক বনভূমি ও তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। যেমন, শীতপ্রধান দেশে তুষারপাতের জন্য সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এই গাছগুলি সোজা ও ত্রিভুজাকার বলিয়া ইহাতে বরফ লাগিয়া থাকিতে পারে না। পশুপালনে স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রয়োজন। কারণ, পশুর প্রধান খাদ্য উদ্ভিদ ; সুতরাং উদ্ভিদ ও পশুপালন উভয়ই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলে, দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস অঞ্চলে ও অস্ট্রেলিয়ায় জলবায়ুর প্রভাবে বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ায় পশুপালন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে ;

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থল মৎস্য-চারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেইজন্য পৃথিবীর বিখ্যাত মৎস্যক্ষেত্রগুলি নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।

(খ) বাসোপযোগী স্থান মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। বাসস্থান ও বাসগৃহ বহুলাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। জলবায়ুর প্রভাবে কোনো স্থান বরফাচ্ছন্ন, কোনো স্থান অত্যন্ত উষ্ণ, কোনো স্থান নাতিশীতোষ্ণ এবং কোনো স্থান শীতপ্রধান হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বরফাচ্ছন্ন স্থান মনুষ্যাবাসের অনুপযুক্ত। শীতপ্রধান

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ঘন লোকবসতি দেখা যায় এবং অত্যধিক গ্রীষ্মপ্রধান স্থান অত্যধিক গরম বলিয়া উহা জনবিরল হইয়া থাকে।
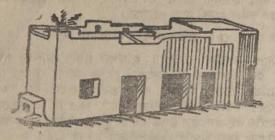
কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলের সমতল ছাদের গৃহ

অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলের ঢালু ছাদের গৃহ
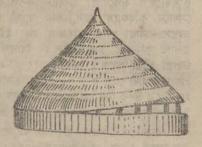
উষ্ণ মরু অঞ্চলের অত্যধিক ঢালু ছাদের গৃহ

মানুষের গৃহ নির্মাণ-পদ্ধতিও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। অধিক বৃষ্টিপাত-যুক্ত অঞ্চলের গৃহের ছাদও ঢালু হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে কম বৃষ্টিপাত হয় সেখানকার গৃহের ছাদ সমতল। যাহাতে বরফ জমিয়া থাকিতে না পারে সেইজন্য শীতপ্রধান দেশের ঘরের ছাদ ঢালু করা হয়। অত্যধিক গরম বাতাসের হলকা হইতে আত্মরক্ষার জন্য মরু অঞ্চলের গৃহের ছাদ অত্যন্ত ঢালু হয়।

শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলের চিমনি বসান ঢালু চালের গৃহ
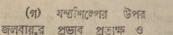
(গ) যন্ত্রশিল্পের উপর জলবায়ুর প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যমান। কোনো শিল্প গঠনের পক্ষে প্রধানতঃ চারিটি উপাদান প্রয়োজন—কাঁচামাল, শ্রমনৈপুণ্য, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও চাহিদা। এই উপাদানগুলি জলবায়ুর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। যেমন,

(i) **কাঁচামাল**—অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামালই কৃষিজাত দ্রব্য। ভারতের পাট-শিল্পের উন্নতি কাঁচা পাটের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। এখানে অধিক তুলা উৎপন্ন হওয়ায় এবং আর্দ্র জলবায়ুতে সূক্ষ্ম সূতা কাটা সম্ভব হওয়ায় বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই পাট ও তুলার উৎপাদন স্থানীয় জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই স্থানগুলির আর্দ্র জলবায়ু ও তুলার প্রাচুর্য। শুষ্ক আবহাওয়ার উপর ময়দা-শিল্পের প্রসার নির্ভর করে। কারণ, আর্দ্র আবহাওয়ায় ময়দা পচিয়া যায়। এমন কি চলচ্চিত্র শিল্পও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কারণ, সূর্যকিরণোজ্জ্বল আবহাওয়া চিত্র-গ্রহণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(ii) **শ্রমনৈপুণ্য**—শ্রমিকের নিপুণতা ও কর্মক্ষমতার উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে শ্রমিকগণের পক্ষে অধিক সময় দক্ষতার সহিত কাজ করা কঠিন। কারণ, কিছুক্ষণ কাজ করিবার পরেই শ্রমিকেরা গরমে ঘামিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে শীতপ্রধান দেশের শ্রমিকেরা অধিকক্ষণ নিপুণতার সহিত কাজ করিতে পারে। ব্রিটেন, জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের শ্রমিকগণের কর্মনৈপুণ্য ও শ্রমশক্তি অধিক ; সেইজন্য ঐ সকল দেশে শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

(iii) **পরিবহণ-ব্যবস্থা**—উত্তাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের উপর পরিবহণ-ব্যবস্থা নির্ভর করে। কারণ, তাপমাত্রা কম হইলে বরফ জমিয়া নদ-নদী ও রাস্তাঘাট যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয় ; অত্যধিক ঘূর্ণিবায়ুর ফলে বিমান চলাচল ব্যাহত হয়। প্লাবন ও অতিবৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট ও রেলপথ ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি অনেকাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল ; শিল্পের পক্ষে পরিবহণ-ব্যবস্থা অপরিহার্য। কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রে আনিতে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে চালান দিতে উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। অতএব শিল্পের প্রসার প্রত্যক্ষভাবে পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর ও পরোক্ষভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভর করে।

(iv) **চাহিদা**—জলবায়ুর উপর শিল্পদ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে ; শীতপ্রধান দেশে পশমী দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। কারণ, শীত নিবারণের জন্য গরম কাপড় প্রয়োজন। সোভিয়েত রাশিয়া বা ব্রিটেনের মত শীতপ্রধান দেশের পশমী দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য সেখানে পশম শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাসজাত দ্রব্যের চাহিদা বেশী। কারণ, গরমের জন্য মানুষ এখানে পাতলা ও ঢিলা জামা-কাপড় ব্যবহার করে। এইজন্য ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে ও উন্নতিলাভ করিয়াছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পের আয়তন জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। যেমন, যে সকল দেশে শীতকালে অত্যধিক তুষারপাত হয়, সেই সকল দেশের মানুষ ঐ সময়ে ঘরের বাহিরে যাইতে না পারায় কুটিরশিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। সুইজারল্যান্ডে বা কাশ্মীরে কুটিরশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে ঐ দেশের শীতকালীন তুষারপাত।

৬। মৃত্তিকা (Soil)

কৃষিকার্যের উন্নতি প্রধানতঃ মৃত্তিকার উর্বরতাশক্তির উপর নির্ভর করে। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের কৃষির উন্নতির মূলে রহিয়াছে উহাদের মৃত্তিকার উর্বরতা। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে

বিশেষ উপযোগী। এইজন্য বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্র-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মৃত্তিকা হইতে মানুষ টালি ও ইট প্রস্তুত করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করে।

মৃত্তিকার সহিত **মানব-সভ্যতার বিকাশ** অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, প্রাচীনকালে সভ্য মানুষ যেখানে কৃষির উপযোগী উর্বর জমি পাইয়াছে, প্রধানতঃ সেখানেই বসতি স্থাপন করিয়াছে। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া প্রাচীন যুগে এখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। আবার, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পলিমাটি পাট-উৎপাদনের উপযুক্ত। সেইজন্য কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

৭। জীবজন্তু (Animals)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিভিন্ন প্রাণীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহপালিত প্রাণী (যথা, গরু, মহিষ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি) হইতে মানুষ দুগ্ধ, মাংস, পশম, চর্বি, হাড়, শিং প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করে। এই সকল দ্রব্য **মানুষের খাদ্য ও পানীয়** হিসাবে বা বিভিন্ন **শিল্পে** ব্যবহৃত হয়।

খাদ্য হিসাবে প্রাণিজ দ্রব্যের কোনো পরিপূরক নাই। গরুর দুধের মত দ্বিতীয় কোনো সুষম খাদ্য নাই। ছাগ, মেষ, মুরগী প্রভৃতির মাংসের কোনো বিকল্প নাই।

প্রাচীন যুগ হইতেই প্রাণী পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষ, বল্গাহরিণ ও কুকুর এখনও পরিবহণ কার্যে মানুষকে সহায়তা করিয়া চলিয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও বহু উন্নতিশীল এবং অনুন্নত দেশে এখনও বিভিন্ন কুটিরশিল্পে পশুই শক্তির প্রধান উৎসরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতে তৈলের ঘানি ও ইক্ষু পেষণযন্ত্র এখনও গবাদি পশুর শক্তির সাহায্যে চালিত হয়। ইহা ছাড়া কৃষিকার্যে এখনও গরু অথবা মহিষের সাহায্যে লাঙ্গল চালানো হয়। কূপ হইতে জল তোলার মত পরিশ্রমসাধ্য কার্য এখনও নানা স্থানে গরু-মহিষের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

৮। স্বাভাবিক উদ্ভিদ (Vegetation)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর উদ্ভিদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ইহা জলবায়ুর প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে, বায়ু হইতে দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করিয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করে, মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করে এবং প্রবল ঝঞ্ঝাদমনে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া বন হইতে নির্মাণকার্যের উপযোগী মূল্যবান কাষ্ঠ, জ্বালানি কাষ্ঠ, নরম কাষ্ঠ, ফলমূল, ভেষজ শিল্পের উপাদান, চিকল, মধু, মোম, লাক্ষা প্রভৃতি বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। আসাম ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কাঠ ভারতের মূল্যবান সম্পদ এবং ইহা দ্বারা ভারতের বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

উদ্ভিদের উপর **পশুপালন** নির্ভরশীল। যেখানে স্বাভাবিক উদ্ভিদ (তৃণ) বিদ্যমান সেখানেই পশুপালন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে ; পশু হইতে মাংস, চামড়া, ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতি পাওয়া যায়। পশুপালন অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

৯। খনিজ সম্পদ (Minerals)

মানব সভ্যতার উন্নতির মূলে রহিয়াছে খনিজ সম্পদ। শিল্পের উন্নতির পক্ষে ইহা অপরিহার্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া ও ব্রিটেনের শিল্প-সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে এই সকল দেশের প্রচুর খনিজ সম্পদ। খনিজ সম্পদের সন্ধান পাইলে মানুষ যে কোনো স্থানে ছুটিয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শ্বেতকায় মানুষের সমাগম হইয়াছিল। আটাকামা মরুভূমিতে খনিজের সন্ধান পাওয়ায় মানুষ এই মরুভূমিতে বাস করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। খনিজ সম্পদ থাকিবার ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও অনেক শিল্পে কাঁচা-মালের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। কয়লা ও খনিজ তৈল শিল্পে ও যানবাহন চালনায় প্রধান শক্তি-সম্পদরূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান যুগে ইস্পাত শিল্পই মূল শিল্প। এই শিল্প গড়িতে হইলে লোহ ও কয়লা প্রয়োজন। সেইজন্য যেখানে এই সকল খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, সেখানেই শিল্পের দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

ভারতের বর্তমান শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে পূর্ব ভারতের (বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি) মূল্যবান খনিজ সম্পদ। এই অঞ্চলে লোহ, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া যায় বলিয়া ভারতের অধিকাংশ শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। জামসেদপুর, দুর্গাপুর, রাউরকেলা প্রভৃতি স্থানের শিল্প-সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে স্থানীয় কয়লা ও লৌহের সরবরাহ।

মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে অপর্যাপ্ত খনিজ তৈলসম্পদ থাকিবার ফলে ঐ সকল দেশ আজ প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী।

অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ

(Non-Physical Factors of Environment)

পরিবেশের যে উপাদানগুলি মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে, কিন্তু যাহাদের প্রভাব মানুষের উপর গুরুত্বপূর্ণ তাহাদিগকে **অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ** বলা হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতির সৃষ্টি ; কিন্তু অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ অধিকাংশই মনুষ্যসৃষ্ট। অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে (ক) **লোকবসতি** এবং (খ) **রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনকে** বুঝায়।

পৃথিবীর সকল স্থানের অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ এক নহে। কোনো কোনো দেশের লোকবসতি ঘন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন অত্যন্ত উন্নত—আবার কোথাও উহা অনুন্নত। কোনো অঞ্চলে মানুষ এখনও অশিক্ষিত, বর্বর এবং পশু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে ; আবার কোনো কোনো দেশে মানুষ শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত। জায়েরের অধিবাসীদের সর্দারদের সাংস্কৃতিক মানের সঙ্গে স্পুটনিক আবিষ্কারক সোভিয়েত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সাংস্কৃতিক মানের কোনো তুলনা হয় না। অনেক ভূগোলবিদ্ মনে করেন যে, বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের সামাজিক পরিবেশ থাকিবার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অ-প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(ক) লোকবসতি (Population)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে জনসংখ্যার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। জনবহুল দেশ মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য সচেষ্ট হয় এবং দেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। যে সকল দেশের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম, সেখানে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া এবং শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম থাকিলে উন্নতি ব্যাহত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল থাকা সত্ত্বেও লোকাভাবে অস্ট্রেলিয়া আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি'র (White Australia Policy) ফলে এখানকার লোকবসতি বৃদ্ধি পাইতেছে না ; অন্যদিকে ভারত, চীন ও জাপান তাহাদের জনসম্পদকে কাজে লাগাইয়া দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেছে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে লোকসংখ্যার অভাবে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় না। সোভিয়েত রাশিয়ার আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম ; কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অল্প লোকের সাহায্যে চাষ-আবাদ করা সম্ভব হইয়াছে। তবুও সোভিয়েত রাশিয়া জনসংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

(খ) রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন
(Political and Social Organisation)

পৃথিবীর সকল দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন একই রকম নহে। কোনো কোনো দেশের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ অত্যন্ত সুসংহত ও শক্তিশালী, আবার কোনো কোনো দেশের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ অত্যন্ত দুর্বল ও অসংহত। ইহার ফলে দেশের উন্নতির তারতম্য ঘটে।

দেশের সামাজিক সংগঠনসমূহ ও সামাজিক রীতিনীতি দেশের উন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, ধর্মের অনুশাসনের জন্য হিন্দুরা গোমাংসের ব্যবসায় করিতে পারে না, আবার মুসলমানেরা শূকরের মাংস লইয়া বাণিজ্য করে না।

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে আলোচনা করা যায় ঃ

(১) **সরকারের কর্মকুশলতা**—প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশের সরকার প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার সুবন্দোবস্ত না করে, ততক্ষণ সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া কঠিন। সরকারের কর্মকুশলতা ও সদিচ্ছার উপর বর্তমান যুগে দেশের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ জারের রাজত্বকালে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে ; কিন্তু জারের সময় সরকারের অকর্মণ্যতায় সেই দেশে কোনো উন্নতি হয় নাই। বিপ্লবের পর নূতন সরকার সমাজতান্ত্রিক পন্থায় সেই দেশের দ্রুত উন্নতিসাধন করিয়াছে। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। ইহা ছাড়া পরাধীন দেশ কখনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হয় না। কারণ, সেখানকার দখলকারী সাম্রাজ্যবাদী সরকার নিজ দেশের উন্নতিসাধনের জন্যই সর্বদা সচেষ্ট থাকে। যখন ভারত পরাধীন ছিল, সেই সময় ব্রিটিশ সরকার সর্বদাই

ভারতের সম্পদ শোষণ করিয়া ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োজিত করিত। ইহার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় নাই। স্বাধীনতার পর স্বাধীন সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত দেশের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। এইভাবে দেখা যায়, সরকারের কর্মকুশলতা ও সদিচ্ছা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(২) জাতি—বিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতার যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও এখনও বহুস্থানে জাতি ও ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর মানুষকে সাধারণতঃ তিনটি জাতিতে বিভক্ত করা হয়—শ্বেতকায়, পীতকায় ও কৃষ্ণকায় জাতি। শ্বেতকায় জাতি বলিতে শ্বেতবর্ণের মানুষ ও আর্যগণকে বুঝায়; যথা, ইউরোপীয়, ভারতীয় ও উত্তর আমেরিকার অধিবাসিগণ। পীতকায় জাতি বলিতে প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় জাতিকে বুঝায়। ইহাদের গায়ের রং হরিদ্রাভ এবং নাক চাপা, চোখ ছোট ও বাঁকা এবং চেহারা খর্বাকার। চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, লাওস, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণকায় জাতি বলিতে সাধারণতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের কৃষ্ণকায় অধিবাসিগণকে বুঝায়। ইহাদের গায়ের রং অত্যন্ত কালো এবং দেহের গঠন খুবই দৃঢ়। আফ্রিকার নিগ্রোজাতীয় লোকেরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

অনেক ভূগোলবিদ্ মনে করেন যে, শ্বেতকায় লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী; এইজন্য তাহারা শিল্পে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত। বর্তমান পৃথিবীতে এইজন্যই তাহারা প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। পীতকায় লোকেরাও কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। ইহার ফলে এই জাতির লোকেরাও কৃষিকার্য, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতেছে। এই সকল ভূগোলবিদের মতে কৃষ্ণকায় লোকেরা শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিলেও বুদ্ধিমত্তায় ততটা উন্নত নহে; ইহার জন্য কৃষ্ণকায়গণ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই।

বর্তমান সভ্যজগতে অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব অনেকেই স্বীকার করেন না। নৃতত্ত্বশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এই মতবাদকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারেন নাই। মানুষ কে কোন্ বংশে বা কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিবে তাহা আকস্মিক ঘটনামাত্র; কাহারও ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর উহা নির্ভর করে না। কোনো লোক আফ্রিকায় কোনো নিগ্রোর বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই নির্বোধ বা মূর্খ হইবে এই কথা কোনো সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনই স্বীকার করিবেন না। অনুন্নত কৃষ্ণকায় জাতিসমূহের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ উহাদের বর্ণ বা জাতি নহে; ইহার মূল কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ কর্তৃক ইহাদের সম্পদ শোষণ। ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ ছিল ব্রিটিশের শোষণ। অন্য যুক্তি বর্তমানে অচল। জায়েরের অনুন্নতির প্রধান কারণ বেলজিয়ানগণ কর্তৃক ঐ দেশের খনিজ সম্পদের শোষণ। বেলজিয়ামের লোক জায়েরের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ খুঁজিতে যাইয়া সেখানকার অধিবাসিদের কৃষ্ণকায়ত্বের দোহাই দিলে বর্তমানে কেহই তাহা বিশ্বাস করিবে না।

(৩) ধর্ম—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও অর্থনৈতিক জীবনে ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীতে প্রধানতঃ চারিটি ধর্ম বিদ্যমান—হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম। হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ গরুকে ভক্তি করে বলিয়া গো-মাংসের ব্যবসায়ে তাহারা যোগদান করে নাই। ভারত গবাদি পশুপালনে পৃথিবীতে

প্রথম স্থান অধিকার করিলেও গো-মাংসের রপ্তানি বাণিজ্যে এই দেশ অংশগ্রহণ করে না। হিন্দুধর্মে বর্ণবৈষম্য প্রথার কুসংস্কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। ইসলাম ধর্মে সুদগ্রহণ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া মুসলমান অধ্যুষিত দেশসমূহে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ও মদ্যশিল্প তেমন প্রসার লাভ করে নাই। বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ অহিংস বলিয়া এই ধর্মে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্মপ্রধান দেশে মাংসের ব্যবসায় উন্নতিলাভ না করাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্মে সামাজিক অনুশাসন কম থাকায় এই ধর্মাবলম্বিগণ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্তমান যুগে ধর্মের অনুশাসন ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে এবং ধর্মের প্রতিপত্তিও কমিয়া আসিতেছে। বর্তমান শতাব্দীতে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর বহু লোক ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না এবং ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলে না। চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অধিবাসিগণ অধুনা মাংস-ভক্ষণে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। কাবুলিওয়ালারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হইয়াও সুদের ব্যবসায়ে সিদ্ধহস্ত। বহু হিন্দু কুক্কুটমাংসে পরম তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান যুগে ধর্মের অনুশাসন অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। যাহারা ভারত ও চীনের অনুন্নতির জন্য ধর্মের অনুশাসনকে দায়ী করিয়াছিল, তাহারা বর্তমানে চীন ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে তাকাইয়া দেখিলে তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিবে। ভারত ও চীনের অর্থনৈতিক অবনতির মূলে ছিল রাজনৈতিক পরাধীনতা—ধর্ম নহে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশে দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে।

(৪) **বৈজ্ঞানিক উন্নতি**—মানুষের উন্নতিতে বিজ্ঞানের অবদান অত্যন্ত বেশী। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই আজ মানুষ প্রকৃতিকে বহুলাংশে বশে আনিয়া প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিতেছে। মানুষের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিকে এককথায় সাংস্কৃতিক সম্পদ বলা হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিয়া, সারের বন্দোবস্ত করিয়া, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া, শিল্পে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও ব্যবহার করিয়া মানুষ তাহার অর্থনৈতিক মান বহুলাংশে উন্নত করিয়াছে। মানুষের বহু দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করিয়া বিজ্ঞান মানুষকে দীর্ঘজীবী ও কর্মকুশল করিয়া তুলিয়াছে।

• পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন
(Adaptation of Man to his Environment)

যুগে যুগে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে অথবা প্রকৃতিকে নিজের সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা পরিবর্তিত করিয়া নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়াছে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশেই সম্ভব হইয়াছে মানুষের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিসম্ভূত নানাবিধ আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলেই প্রতিকূল পরিবেশকে মানুষের অনুকূলে আনা সম্ভব হইয়াছে; একদিকে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এইভাবে প্রকৃতিকে বশে আনিবার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে—কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে; অন্যদিকে প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূলে আনিবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের সংস্কৃতি।

প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশে আনিতে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সংস্কৃতি

গড়িয়া উঠিতে থাকে ; অত্যধিক শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ বুদ্ধিবলে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিল ; কঠিন প্রস্তরকে ভাঙ্গিবার জন্য মানুষের চেষ্টা ও বুদ্ধির ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল কুঠার। ইহাই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাংস্কৃতিক পরিবেশের সামঞ্জস্য বিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি হইয়াছে। এই যুগে আর মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য বিধান করিতে হয় না। বর্তমানের জটিল অবস্থার যুগে এই সামঞ্জস্য বিধানও প্রত্যক্ষ না হইয়া পরোক্ষভাবে হইয়া থাকে। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইতেছে। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টাই অপ্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান আছে। পূর্বে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার জন্য সাধারণ ইস্পাত দ্রব্য ব্যবহৃত হইত। ক্রমশঃ অত্যধিক ধারালো অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় সৃষ্টি হইল টাংস্টেন-ইস্পাত ও কোবাল্ট-ইস্পাত। এই সকল আবিষ্কার মানুষের প্রয়োজনকে খাপ খাওয়াইবার জন্য পরোক্ষ সামঞ্জস্য বিধান ছাড়া আর কিছু নহে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য মানুষেরই পরোক্ষ প্রচেষ্টার ফল। আদিম যুগে মানুষ বন্য পশুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের এই দলবদ্ধতা প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়ানোর প্রত্যক্ষ ফল। সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হইল বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান : সর্বশেষে সৃষ্টি হইল রাষ্ট্র ও সরকার। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে 'গণতন্ত্র' (Democracy) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতির পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান ; আদিম কালের দলবদ্ধ মানুষের সংগঠন হইতে বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক সমাজ-গঠনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই এই পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধানের চরিত্রটি উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তৎকালীন পরিবেশের আলোচনা করিলেও এই পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যাইবে, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়াই পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন সম্ভব হইতেছে।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব

(Effects of Environment on Economic Life of Man)

অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের প্রধান কাজ প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দেওয়া। কিভাবে প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে, কিভাবে মানুষ তাহার অ-প্রাকৃতিক পরিবেশের সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়াছে, এই সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না থাকিলে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা করা কঠিন।

বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কখনই অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে পৃথক করিয়া চিন্তা করা যায় না। এই দুইটি পরিবেশ মানুষের প্রয়োজনে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যেমন, মৃত্তিকার উর্বরতা সম্পূর্ণতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ, কিন্তু উর্বর মৃত্তিকার কার্যকারিতা নির্ভর করে মানুষের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির উপর। কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিয়া, সারের বন্দোবস্ত করিয়া, উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদার সৃষ্টি করিয়া মানুষ কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের আর একটি উদাহরণ—বনভূমি। কিন্তু মানুষের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির কাষ্ঠের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হওয়ায় বনভূমির চেহারা পাল্টাইয়া গিয়াছে। কোনো কোনো অঞ্চলে বনভূমি কাটিয়া নিঃশেষ করা হইয়াছে; আবার কোথাও বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষ প্রচেষ্টা চালাইতেছে। এইভাবে দেখা যায়, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ উভয়েই একসঙ্গে কাজ করে এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের যোগাযোগের ফলেই দেশের উন্নতি হয় একথা ঠিক, কিন্তু আরও কোনো কোনো উপাদানও সম্পদকে কার্যকরী করে। মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা এইরূপ একটি উপাদান। ভারতে প্রচুর কৃষিজমি থাকা সত্ত্বেও এই দেশ বহুদিন পর্যন্ত খাদ্যে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। কারণ, এই দেশের চাষে মানুষের প্রচেষ্টা ততটা কার্যকরী ছিল না। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার কৃষিজমি ঐ দেশের মানুষের প্রচেষ্টায় প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, ঐ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা। কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া, জমিতে সার দিয়া, উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিয়া ও পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া ঐ দেশ কৃষিকার্যে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে, যাহা ভারতের পক্ষে এতদিনে কিছুটা সম্ভব হইয়াছে।

দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এই চাহিদা মিটাইবার জন্য মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাও বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইভাবে দেশের সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্বাধীনতার পরে ভারতে জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নীত হওয়ায় খনিজ তৈলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈলের অনুসন্ধান শুরু হয় এবং তৈলের উৎস আবিষ্কৃত হয়। সম্পদ আহরণের এই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার পিছনে রহিয়াছে জীবনযাত্রার উন্নত মান ও চাহিদা।

এইভাবে দেখা যাইবে যে, মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার তাগিদে মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা অধিক পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইতেছে এবং এই প্রচেষ্টাকে সাংস্কৃতিক সম্পদ সাহায্য করিতেছে।

নিম্নে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল:

মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর পরিবেশের প্রভাব অসামান্য। আদিম মানব ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক পরিবেশের অধীন। আধুনিক সভ্য মানুষ সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অনেকটা অতিক্রম করিয়াছে। বন কাটিয়া মানুষ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে, মরুভূমিতে

জলসেচ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, অনুর্বর মাটিকে সার প্রয়োগ ও জলসেচ দ্বারা শস্যোৎপাদনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে, শস্যকেও মৃত্তিকার উপযোগী করিতেছে। ভূগর্ভের খনিজ দ্রব্যসমূহ উত্তোলন করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমিতে আধুনিক বড় বড় শিল্প-কারখানা গড়িয়া তুলিতেছে, কৃষিজাত দ্রব্যকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া কৃষি অঞ্চলের মধ্যে বড় বড় শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তুলিতেছে। এইভাবে মানুষের পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারা যেমন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, তেমনি পরিবেশের প্রভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সর্বদা পরিবর্তন ঘটিতেছে।

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ বন্য প্রাণী শিকার, মৎস্য শিকার, কাষ্ঠ সংগ্রহ, পশুপালন, কৃষিকার্য, খনিজদ্রব্য উত্তোলন, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী প্রধানতঃ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তুষারাবৃত মেরু অঞ্চলের অধিবাসীরা সমুদ্র হইতে সীল, সিন্ধুঘোটক ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী এবং স্থলভাগ হইতে কোনো কোনো প্রাণী শিকার করিয়া জীবিকা অর্জন করে। কারণ অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য মেরু অঞ্চলে কৃষিকার্য অসম্ভব।

সোভিয়েত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, আলাস্কা, কানাডার প্রেইরি অঞ্চলের উত্তরাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ কাষ্ঠ আহরণ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান বরফে ঢাকা থাকায় এই অঞ্চলে কাষ্ঠ ও কাগজ শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।

নরওয়ে ও কানাডার পূর্বাঞ্চলের জলবায়ু কৃষিকার্যের অনুকূল নহে ; অধিবাসীরা মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কারণ, দুইটি দেশেরই উপকূলবর্তী সমুদ্রে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ পশুপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এই সকল তৃণভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই কৃষিকার্য করা সম্ভবপর নহে।

ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী উপত্যকা, চীনের ইয়াংসি-কিয়াং ও সি-কিয়াং নদীর অববাহিকা, মিশরের নীল নদের উপত্যকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর উপত্যকা প্রভৃতি নদী-উপত্যকার সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। এই সমভূমি অঞ্চলের উর্বর পলি মৃত্তিকা, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও জলসেচের সুবিধা কৃষিকার্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। আবার এই সকল সমভূমির প্রচুর লোকবসতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা, কৃষিজাত কাঁচামাল ও অন্যান্য সুবিধা এই সকল অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইতেও সাহায্য করিতেছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, যন্ত্রশক্তি, প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, বনজ, খনিজ ও কৃষিজাত সম্পদের প্রাচুর্য পৃথিবীর যে সকল দেশে যতটা অনুকূল সেই সকল দেশ যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ততটা উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে অর্থাৎ উন্নত প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশের সমন্বয় যে দেশে যতটা ঘটিয়াছে, সেই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা তত উন্নত হইয়াছে এবং যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ততটাই উন্নতি ঘটিয়াছে। যেমন, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশ যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভৌগোলিক অবস্থান (মহাদেশীয় মালভূমি সমুদ্রপ্রান্তীয়, ও সমভূমি) দ্বৈপ, উপদ্বীপীয়) | ভূ-প্রকৃতি (পর্বত, | অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ | সৈকত রেখা | জলবায়ু | মৃত্তিকা | জীবজন্তু | স্বাভাবিক উদ্ভিদ | খনিজ সম্পদ

অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ

লোকবসতি | রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন

জাতি | ধর্ম | সরকারের কর্মকুশলতা | বৈজ্ঞানিক উন্নতি

প্রশ্নাবলী
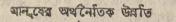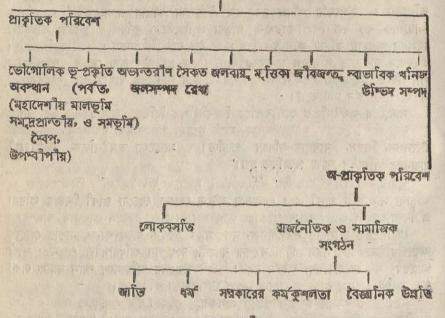
A. Essay-Type Questions

1. What are the different factors of natural environment? Critically examine the role of environment on the economic activities of man. [H. S. Examination, 1978]

[কি কি উপাদানের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশ রচিত হয়? মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব পর্যালোচনা কর।]

উঃ 'প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদান' (৯ পৃঃ—২১পৃঃ) ও 'মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব' (২৫ পৃঃ—২৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

2. What do you understand by natural environment? Discuss how natural environment influences the economic activities of people of a region. Give examples. [H. S. Examination, 1980]

[প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে কি বোঝ? কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিরূপে প্রভাবিত করে তাহা আলোচনা কর। উদাহরণ দাও।]

উঃ 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৯ পৃঃ) এবং 'মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব' (২৫ পৃঃ—২৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. What are different components of non-physical environment? Discuss with illustration how man adapts to his environment. [H. S. Examination, 1979]

[অ-প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান কি? পরিবেশের সহিত মানুষ নিজেকে কি প্রকারে খাপ খাওয়াইয়া লয় উপযুক্ত উদাহরণ সহ আলোচনা কর।]

উঃ 'অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ' (২১ পৃঃ—২৪ পৃঃ) এবং 'পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন' (২৪ পৃঃ—২৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. **What are the different elements of physical environment?** Critically examine the role of rivers or the topography on the activities of man. **[Specimen Question, 1980 & '81]**

[প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কি কি? মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর নদ-নদী বা ভূ-প্রকৃতির প্রভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা কর।]

উঃ 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৯ পৃঃ) হইতে উহার বিভিন্ন উপাদানের নাম, 'অভ্যন্তরীণ জলাশয়' হইতে 'নদ-নদী' (১৪ পৃঃ—১৬ পৃঃ) এবং 'ভূ-প্রকৃতি' (১২ পৃঃ—১৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. The mode of life in any region is not an accident but is the result of the environment. Discuss. **[Specimen Question, 1978]**

['যে কোনো অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী অকারণ ও আকস্মিক নহে, বরং পরিবেশের প্রভাবের ফল।'—আলোচনা কর।]

উঃ 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৯ পৃঃ—২১ পৃঃ) ও 'মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব' (২৫ পৃঃ—২৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Describe with suitable examples the effects of environment on the economic life of man.

[B. S. E. Higher Secondary, 1960. '61, '70

[মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব উপযুক্ত উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।]

উঃ 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৯ পৃঃ—২১ পৃঃ), 'অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ' (২১ পৃঃ—২৪ পৃঃ) এবং 'মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব' (২৫ পৃঃ—২৭ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

7. Explain how physical environment influences the economic activities of man. **[B. S. E. Higher Secondary, 1963 & '65**

[মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাহা বুঝাইয়া লিখ।]

উঃ 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৯ পৃঃ—২১ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

8. 'Man is a product of Environment'—Explain this statement with reference of Physical and Non-physical Environments.

['মানুষ পরিবেশের সৃষ্টি।"—প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া এই বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর।]

উঃ 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৯ পৃঃ—২১ পৃঃ) এবং 'অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ' (২১ পৃঃ—২৪ পৃঃ) হইতে সংক্ষেপে লিখ।

9. Discuss the influence of (a) rivers, (b) plains and (c) coastline on the economic development of countries. Give examples in support of your answer. **[B. U. Univ. Ent. 1962]**

[দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর নদী, সমভূমি ও সৈকতরেখার প্রভাব বর্ণনা কর। তোমার বক্তব্যের সমর্থনে উপযুক্ত উদাহরণ দাও।]

উঃ 'অভ্যন্তরীণ জলাশয়' (১৪ পৃঃ—১৬ পৃঃ) 'সমভূমি' (১৪ পৃঃ) ও 'সৈকতরেখা' (১৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10. Examine the influence of the following on the economic life of a region : (a) Topography, (b) Climate, (c) Location, size, form and coast line, (d) Soils and minerals and (e) Inland waterbodies.

[Specimen Question, 1979

[একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রভাব পরীক্ষা কর : (ক) ভূ-প্রকৃতি, (খ) জলবায়ু, (গ) অবস্থান, আয়তন, গঠন ও সৈকতরেখা, (ঘ) মৃত্তিকা ও খনিজ সম্পদ এবং (ঙ) অভ্যন্তরীণ জলাশয়।]

উঃ 'ভূ-প্রকৃতি' (১২ পৃঃ—১৪ পৃঃ), 'জলবায়ু' (১৭ পৃঃ—১৯ পৃঃ), 'ভৌগোলিক অবস্থান' (৯ পৃঃ—১২ পৃঃ), 'সৈকতরেখা' (১৬ পৃঃ), 'মৃত্তিকা' (১৯ পৃঃ—২০ পৃঃ), 'খনিজ সম্পদ' (২১ পৃঃ) ও 'অভ্যন্তরীণ জলাশয়' (১৪ পৃঃ —১৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

11. (a) What are the principal factors of geographical environment? (b) Discuss the role of physical factors on the economic activities of man.

[H. S. Examination, 1982

[(ক) ভৌগোলিক পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদান কি কি ? (খ) মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

উঃ 'মানুষ ও তাহার পরিবেশ' (৯ পৃঃ), 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৯ পৃঃ—২৯ পৃঃ) এবং 'মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব' (২৫ পৃঃ—২৭ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

12. Discuss how the physical environment influences economic activities in a region of (a) mountains and (b) coastal plains. Give examples from Indian Union, as far as possible.

[C. U. Pre-Univ. 1962]

[পার্বত্য অঞ্চল ও উপকূলসংলগ্ন সমভূমির অর্থনৈতিক কার্যকলাপে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর। যতদূর সম্ভব ভারত হইতে উদাহরণ দাও]

উঃ 'ভূ-প্রকৃতি' (১২ পৃঃ—১৪ পৃঃ), 'সৈকতরেখা' (১৬ পৃঃ) হইতে সংক্ষেপে লিখ।

13. Describe with suitable examples from India, the influence of climate on man's economic life.

[B. U. Univ. Ent. 1961;
B. S. E. Higher Secondary, 1962, '64, '69]

[ভারত হইতে উদাহরণ দিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।]

উঃ 'জলবায়ু' (১৭ পৃঃ—১৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

14. Define climate. Describe the influence of climate on man's economic activities.

[Specimen Question, 1980, '81 & H. S. Examination, 1985]

[জলবায়ুর সংজ্ঞা লিখ। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর।

উঃ 'জলবায়ু' (১৭ পৃঃ—১৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

15. Describe the adaptation of man to his environment.

[পরিবেশের সহিত মানুষের খাপ খাওয়ানো বর্ণনা কর।]

উঃ 'পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন' (২৪ পৃঃ—২৫ পৃঃ) লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on: (a) Insular location; (b) Plateau; (c) Soil, (d) White Australia Policy.

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ (ক) উপদ্বীপীয় অবস্থান; (খ) মালভূমি; (গ) মৃত্তিকা; (ঘ) শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি।]

উঃ 'উপদ্বীপীয় অবস্থান' (১১ পৃঃ), 'মালভূমি' (১৪ পৃঃ), 'মৃত্তিকা' (১৯ পৃঃ—২০ পৃঃ) এবং 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি' (২২ পৃঃ) লিখ।

C. Objective Questions

1. Write correct answers from the following statements:

(a) Human habitation is dependent on location/size of the country. (b) Mountains are responsible for causing rainfall/production of fuel. (c) The water of Hooghly river is supplied to the people of Calcutta/Bombay/Madras. (d) The main factor of Economic Geography is man/environment. (e) Whatever exists around man and within which his mode of living is framed is called culture/environment. (f) The natural environment of a region depends on the soil/climate/population/natural resources and culture of the inhabitants of a region. (g) After reviewing the history of human civilization it is found that ancient civilization developed in the river valleys/mountainous countries.

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখঃ

(ক) মনুষ্য-বসতি দেশের অবস্থান/আয়তনের উপর নির্ভর করে।

(খ) পর্বত বৃষ্টিপাত সৃষ্টির জন্য/জ্বালানি উৎপাদনের জন্য দায়ী।

(গ) হুগলী নদীর জল কলিকাতা/বোম্বাই/মাদ্রাজের অধিবাসীদের সরবরাহ করা হয়।

(ঘ) অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান নায়ক মানুষ/পরিবেশ।

(ঙ) মানুষের চারিপাশে যাহা কিছু বিদ্যমান এবং যাহার মধ্যে তাহার জীবনধারাটি গড়িয়া উঠে, তাহাকে সংস্কৃতি/পরিবেশ বলে।

(চ) কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা/জলবায়ু/জনসংখ্যা/প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও অধিবাসীদের সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে।

(ছ) মানব-সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নদীমাতৃক দেশগুলিতে/পর্বতসঙ্কুল দেশগুলিতে প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়াছিল।]

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর জলবায়ু-অঞ্চল

(Climatic Regions of the World)

জলবায়ু (Climate)—কোনো অঞ্চলের দৈনিক বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহের চাপ ও গতি, সূর্যালোকের পরিমাণ, বায়ুর উষ্ণতা প্রভৃতির সামগ্রিক অবস্থাকে ঐ অঞ্চলের কোনো নির্দিষ্ট দিনের আবহাওয়া (Weather) বলে। এই আবহাওয়ার দীর্ঘকালের (প্রায় ৩০-৩৫ বৎসরের) গড় ফলকে ঐ অঞ্চলের জলবায়ু (Climate) বলা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু বিদ্যমান। কোনো দেশের অবস্থান, উচ্চতা, সমুদ্রস্রোত, বায়ুপ্রবাহের গতি, ভূ-প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, ভূমিভাগের ঢাল, অরণ্যের অবস্থান প্রভৃতির উপর ঐ দেশের জলবায়ু নির্ভরশীল। হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে ও ভারত মহাসাগরের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উষ্ণমণ্ডলের নিকটবর্তী বলিয়া এখানে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে হিমমণ্ডলের নিকটবর্তী বলিয়া উত্তর ইউরোপের দেশসমূহে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয় এবং বহুস্থান শীতকালে বরফাচ্ছন্ন থাকে। এইভাবে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

কৃষিকার্য, উদ্ভিদ, পশুচারণ, মৎস্যচাষ, লোকবসতি, যানবাহন, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইহা খুব স্বাভাবিক যে, জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর এক এক স্থানে এক এক প্রকার অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী স্থানে অত্যধিক গরম ও বৃষ্টিপাতের দরুন মূল্যবান রবার গাছ জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এই রবারের জন্য এই অঞ্চলের দেশসমূহের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য ইউরোপের দেশসমূহের মানুষ অধিকতর কর্মক্ষম হয় এবং সেইজন্য শিল্প ও বাণিজ্যে ইহারা উন্নতিলাভ করিয়াছে। অনুকূল বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার জন্য ভারতে কৃষিকার্যের উন্নতি সম্ভব। সেইজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে ঐ সকল স্থানের জলবায়ুর তারতম্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন।

কোপেনের তাপবলয়—পৃথিবীর আকার প্রায় কমলালেবুর মত। পৃথিবীর মেরুরেখা আবার ৬৬½° কোণে হেলিয়া থাকে। সুতরাং সূর্য পৃথিবীর সকল স্থানে সমানভাবে কিরণ দিতে পারে না। কোনো স্থানে লম্বভাবে কিরণ দেয়, কোনো স্থানে তির্যকভাবে কিরণ দেয়। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী স্থানে লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় এখানে তাপের পরিমাণ অত্যধিক। কিন্তু সুমেরুবৃত্তের উত্তরে বা কুমেরুবৃত্তের দক্ষিণে তির্যকভাবে কিরণ দিবার ফলে এখানকার তাপমাত্রা অত্যন্ত কম। সেইজন্য এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান সারা বৎসর বরফাচ্ছন্ন থাকে।

বিখ্যাত জার্মান ভূগোলবিদ্ কোপেন (Wilhelm Koppen) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে পৃথিবীকে বিভিন্ন তাপমণ্ডলে বিভক্ত
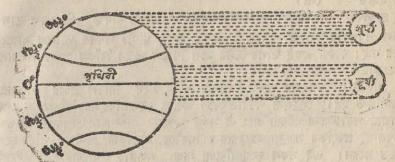
পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যের লম্বভাবে ও তির্যকভাবে কিরণ দান

করিয়াছেন। তাঁহার এই বিভাগকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীকে সাধারণতঃ ৪টি তাপ-মণ্ডলে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ

(ক) হিমমণ্ডল—সুমেরুবৃত্তের (৬৬½° উঃ) উত্তর ভাগের ও কুমেরুবৃত্তের (৬৬½° দঃ) দক্ষিণ ভাগের অঞ্চলসমূহ ইহার অন্তর্গত। এখানকার তাপমাত্রা সর্বদাই ১০° সেঃ অপেক্ষা কম থাকে।

(খ) শীতল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল—৪৫° উঃ হইতে ৬৬½° উঃ এবং ৪৫° দঃ হইতে ৬৬½° দঃ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী স্থানসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার তাপমাত্রা ১০° সেঃ হইতে ২০° সেঃ হইয়া থাকে।
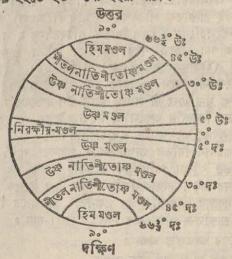
(গ) উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল—৩০° উঃ হইতে ৪৫° উঃ এবং ৩০° দঃ হইতে ৪৫° দঃ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহ ইহার অন্তর্গত। এখানকার তাপমাত্রা সাধারণতঃ ২০° সেঃ-এর উর্ধ্বে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো সময় ১০° সেঃ পর্যন্ত নামিয়া আসে।

(ঘ) **নিরক্ষীয় ও উষ্ণমণ্ডল**—নিরক্ষরেখা (০°) হইতে ৩০° উঃ ও ৩০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার তাপমাত্রা প্রায় ২০° সেঃ হইতে ২৭° সেঃ।

প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল (Natural Regions)—কোপেন বর্ণিত এই সকল তাপ-মণ্ডল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর প্রকৃত ছবিটি কখনও তুলিয়া ধরিতে পারে নাই। কারণ, একই তাপমণ্ডলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা দেখা যায়।

প্রতিটি তাপমণ্ডলের পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য পরবর্তিকালে অন্যান্য ভূগোলবিদ্‌গণ বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু পর্যালোচনা করিয়া এবং ঐ সকল অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, উদ্ভিদ, জীবজন্তু প্রভৃতির সাদৃশ্য অনুসারে পৃথিবীকে কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন। এই সকল ভূগোলবিদের মধ্যে অধ্যাপক হারবার্টসনের (Prof. A. J. Herbertson) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখা দরকার। যদিও কয়েকটি স্থানকে একটি পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ইহার অর্থ এই নয় যে, এই সকল স্থানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। প্রকৃত কথা এই যে, একই পরিমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের প্রভেদ অপেক্ষা সাদৃশ্য অনেক বেশী। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল বিভাগের সঙ্গে রাজনৈতিক সীমারেখার কোনো সম্পর্ক নাই। বহুদূরবর্তী বিভিন্ন দেশ বা ইহার অংশ একই প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। যেমন—ভারত, উত্তর অস্ট্রেলিয়া ও মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন স্থান পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত হইলেও ইহারা একই প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে (মৌসুমী অঞ্চল) অবস্থিত। অনেক সময় একটি পরিমণ্ডলের কোনো অংশ বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে অন্য একটি পরি-মণ্ডলের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সন্ধিক্ষেত্রের (Transitional Zone) সৃষ্টি হয়। একই পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো স্থানে ভূ-প্রকৃতি, অবস্থান ইত্যাদির পার্থক্যহেতু জল-বায়ুর তারতম্য দেখা যায় এবং ঐ সকল স্থানে উপ-মণ্ডলের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পর্বতের উপর অবস্থান-হেতু এখানকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবাপন্ন।

অধ্যাপক হারবার্টসন বিভিন্ন তাপমণ্ডলকে প্রধানতঃ পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য—এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীকে কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন। হারবার্টসনের এই বিভাগকে ভিত্তি করিয়া এবং ইহাকে সামান্য পরিবর্তিত করিয়া আধুনিক কালের ভূগোলবিদ্‌গণ প্রধানতঃ জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে পৃথিবীকে ১৩টি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন। যথা :

ক। **হিমমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল :**

(১) তুন্দ্রা অঞ্চল বা শীতল মেরু অঞ্চল

খ। **শীতল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ :**

(১) পশ্চিমপ্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল (বা ব্রিটিশ আদর্শের পরিমণ্ডল)

(২) পূর্বপ্রান্তীয় হিমশীতোষ্ণ অঞ্চল (বা লরেন্সীয় আদর্শের পরিমণ্ডল)

(৩) মধ্যভাগের নিম্নভূমি অঞ্চল (বা সাইবেরিয়া আদর্শের পরিমণ্ডল)

(৪) মধ্যভাগের উচ্চভূমি অঞ্চল (বা আলটাই আদর্শের পরিমণ্ডল)

গ। উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অঞ্চলসমূহ :

(১) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল
(২) পূর্বপ্রান্তীয় চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল
(৩) মধ্যভাগের তৃণভূমি (স্টেপ) অঞ্চল (বা তুরান আদর্শের পরিমণ্ডল)
(৪) মধ্যভাগের মরুভূমি অঞ্চল (বা ইরান আদর্শের পরিমণ্ডল)

ঘ। নিরক্ষীয় ও উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলসমূহ :

(১) নিরক্ষীয় অঞ্চল (বা আমাজনীয় আদর্শের পরিমণ্ডল)
(২) মৌসুমী অঞ্চল (বা ভারতীয় আদর্শের পরিমণ্ডল)
(৩) উষ্ণ মেরুদেশীয় অঞ্চল (বা সাহারা আদর্শের পরিমণ্ডল)
(৪) উষ্ণ তৃণভূমি সাভানা অঞ্চল (বা সুদান আদর্শের পরিমণ্ডল)

[ক] হিমমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল

১। তুন্দ্রা অঞ্চল

(শীতল মেরু অঞ্চল)

(The Tundras or Polar Region)

অবস্থান—সুমেরুবৃত্ত (৬৬½° উঃ) হইতে উত্তর মেরুবিন্দু পর্যন্ত (৯০° উঃ) এবং কুমেরুবৃত্ত (৬৬½° দঃ) হইতে দক্ষিণ মেরুবিন্দু (৯০° দঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর গোলার্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তরাংশ, গ্রীনল্যান্ড, কানাডা ও আলাস্কার উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ গোলার্ধের আন্টার্কটিকা ইহার অন্তর্গত।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু, দক্ষিণ-পূর্বের ও দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলবর্তী অংশ বাদে গ্রীনল্যান্ডের বাকী সমস্ত অংশ (উচ্চভূমি) ও আন্টার্কটিকা মহাদেশের অধিকাংশ চিরতুষারাবৃত ও গভীর বরফের স্তূপে মূল ভূভাগ চাপা পড়িয়া আছে। এই চিরতুষারাবৃত ভূমিতে কোনো প্রাণী বাস করিতে পারে না বা কোনো উদ্ভিদ জন্মায় না।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

জলবায়ু—বরফাচ্ছন্ন দেশ বলিয়া এখানে সর্বদাই শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। গ্রীষ্মকালে উত্তাপ প্রায় ১০° সেঃ উঠে এবং আট/নয় মাস স্থায়ী শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়। এই অঞ্চলে ২৫ সেঃ মিঃ-এর বেশী বৃষ্টিপাত ও শীতকালে তুষারপাতই এখানকার বিশেষত্ব।
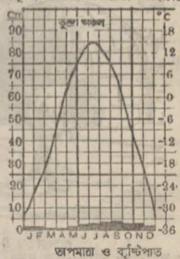
উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চল শীতকালে বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া ঐ সময় কোনো প্রকার তৃণ বা গাছ জন্মায় না। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গেলে এখানে

এক প্রকার শৈবাল বা গুল্ম জন্মে। এখানকার সমুদ্রে সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি এবং স্থলভাগে বল্গাহরিণ, ক্যারিবু, বৃষ, শ্বেতভল্লুক, সেবল্, কুকুর, শ্বেত খেঁকশিয়াল প্রভৃতি লোমশ জীবজন্তু পাওয়া যায়।

লোকবসতি—অত্যধিক শীতের প্রকোপে মানুষের পক্ষে এখানে বাস করা প্রায় অসম্ভব। দক্ষিণ গোলার্ধের এই অঞ্চলে কোনো লোকবসতি নাই। উত্তর গোলার্ধে ইউরোপের উত্তরাংশে এবং উত্তর কানাডায় অল্পসংখ্যক লোক বাস করে। গ্রীনল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের 'এস্কিমো' বলা হয়। ল্যাপল্যাণ্ডে 'ল্যাপ' নামে এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় 'সাময়েদ' ও 'ইয়াকুত' নামে ইহারা পরিচিত।

পরিবহণ ব্যবস্থা—তুন্দ্রা অঞ্চল শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত বলিয়া এখানে পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত। তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীরা বরফের উপর দিয়া চাকাবিহীন শ্লেজ গাড়িতে যাতায়াত করে। শ্লেজগাড়ি বল্গাহরিণে টানে। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গেলে সীলমাছের চামড়ার তৈয়ারি 'কায়াক' নামক একপ্রকার ছোট নৌকায় চড়িয়া এখানকার অধিবাসীরা সমুদ্রে শিকার করে। সোভিয়েত রাশিয়া ও উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রাভূমি হইতে বল্গাহরিণের মাংস আনিবার জন্য বর্তমানে পরিবহণের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার যে সকল নদী উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে সেই সকল নদী পরিবহণের কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে কয়েকটি বন্দরেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ইনেসি নদীর তীরে ইগার্কা এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। সোভিয়েত রাশিয়ায় বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে এই সকল অঞ্চলকে সভ্যতার আলোকে আনা সম্ভব হইতেছে। উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রা অঞ্চলে জলপথে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। উত্তর আমেরিকার আলাস্কা সড়কপথ তুন্দ্রা অঞ্চলকে মহাদেশের অবশিষ্ট অংশের সহিত যুক্ত করিয়াছে।

এস্কিমোদের 'ঈগলু' নামক বরফের ঘর

অর্থনৈতিক উন্নতি—শ্লেজ নামক একপ্রকার চাকাহীন গাড়িতে বল্গাহরিণ জুড়িয়া তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীরা বরফের উপর দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। শৈবাল

বল্গাহরিণের প্রধান খাদ্য। যেখানেই শৈবাল থাকে, সেখানেই ইহারা ছুটিয়া যায়। সেইজন্য ইহারা যাযাবর। ইহারা বল্গাহরিণের মাংস ও দুধ খায়, শিং ও হাড় দিয়া অস্ত্র এবং চামড়া দিয়া বস্ত্র ও তাঁবু প্রস্তুত করে। অনেকে সমুদ্রতীরে বাস করে এবং সামুদ্রিক মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। এস্কিমোরা শীতকালে 'ঈগলু' নামক একপ্রকার বরফের ঘরে বাস করে। গ্রীষ্মকালে ইহারা চামড়ার তৈয়ারি তাঁবুতে বাস করে ; এই তাঁবুকে ইহারা 'টিউপিস্' বলে।

সোভিয়েত সরকারের অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। নলযোগে গরম জল প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়া লোকের বসবাসের অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার এই অঞ্চলে আণবিক শক্তি-চালিত জাহাজ যাতায়াত করিতেছে এবং বিমান চলাচলের বন্দোবস্ত হইতেছে। কানাডার অন্তর্ভুক্ত তুন্দ্রা অঞ্চলে খনিজ সম্পদ আহরণের কাজ চলিতেছে।

[খ] শীতল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ

১। পশ্চিম প্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল

[ব্রিটিশ আদর্শের পরিমণ্ডল]
(The Cool Temperate Oceanic Climate)

অবস্থান—মহাদেশসমূহের পশ্চিমপ্রান্তে ৪৫° হইতে ৬০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিম নরওয়ে ও সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস্, বেলজিয়াম, উত্তর ফ্রান্স, উত্তর স্পেন, দক্ষিণ-পশ্চিম কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ চিলি, টাসমানিয়া ও নিউ জিল্যান্ড এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে প্রায় সারা বৎসর কমবেশী বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে ; কিন্তু শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী। এখানে সাধারণতঃ ৫০

পশ্চিম-প্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল

সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উচ্চ পর্বতের পশ্চিম ঢালে ও সমুদ্রোপকূলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশী। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১৮° সেঃ। উপকূল অঞ্চলে উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে শীতকালীন উত্তাপ ৫°

সেঃ-এর নীচে নামে না। সেইজন্য এখানকার শীতের প্রকোপ কিছুটা কম। এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায় এবং ওক্, এল্‌ম্, বীচ, বার্চ, মেপল প্রভৃতি বৃক্ষ এখানে জন্মিয়া থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের মধ্যে নরওয়ে ও সুইডেন বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত এই জলবায়ু অঞ্চল সরলবর্গীয় বনভূমিতে সমৃদ্ধ।

সাধারণতঃ গৃহপালিত জীবজন্তুই এখানে বেশী দেখা যায়। তন্মধ্যে গরু, মেষ ও অশ্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোকবসতি—শিল্পে ও বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত বলিয়া এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ইউরোপের দেশগুলিতে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। কিন্তু অন্যান্য মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত এইজাতীয় জলবায়ু অঞ্চলে লোকবসতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

পরিবহণ ব্যবস্থা—এখানকার অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি হওয়ায় রেলপথ ও রাস্তাঘাটের উন্নতি হইয়াছে। নদীবহুল দেশে (জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি) জলপথের সুবন্দোবস্ত আছে। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখানে পরিবহণ-ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বড় বড় শহর হইতে বিমান চলাচল করে।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অম্লধর্মী পডসলজাতীয় বলিয়া কৃত্রিম সার ও জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। অরণ্য পরিষ্কার করিয়া বহু জায়গা কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কৃষিজমির আধিক্য না থাকায় এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় অতি-উৎপাদন কৃষি ব্যবস্থা (Intensive farming) প্রচলিত হইয়াছে। গম, যব, রাই, বীট, আলু প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত সম্পদ।

তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন করা হইয়া থাকে এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম ও মাংসের ব্যবসায়ে এই সকল স্থান উন্নতিলাভ করিয়াছে। সন্নিহিত স্থানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। ব্রিটেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ মৎস্য শিকারের জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। কয়লা ও লৌহ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এইজন্য বৃহদাকার শ্রমশিল্পে এই সকল দেশ বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। মৃদু জলবায়ুর জন্য এখানকার শ্রমিকগণ অত্যন্ত কর্মঠ। শ্রমিকের নিপুণতা, যান-বাহনের সুবিধা, কয়লা ও কাঁচামাল সরবরাহে সুবন্দোবস্ত এবং পরাধীন ও অনুন্নত দেশসমূহ (ভূতপূর্ব উপনিবেশ) হইতে আনীত সম্পদের জন্য এই সকল দেশ শিল্প বা বাণিজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নত। এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে নিউ জিল্যান্ড, টাসমানিয়া ও দক্ষিণ চিলি অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। কারণ, নিউ জিল্যান্ড ও টাসমানিয়া কৃষিপ্রধান দেশ এবং দক্ষিণ চিলি শিল্পে অনুন্নত।

২। পূর্বপ্রান্তীয় হিমশীতোষ্ণ অঞ্চল

[লরেন্সীয় আদর্শের পরিমণ্ডল]

(The Cool Temperate East Coast Type)

অবস্থান—মহাদেশসমূহের পূর্বভাগে ৪৫° হইতে ৬৬½° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। কানাডার পূর্বাঞ্চল সেন্ট লরেন্স নদীর

অববাহিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে, নিউ ফাউণ্ডল্যান্ড, আমুর নদীর উপত্যকা, কোরিয়া, জাপানের উত্তরাংশ ও দক্ষিণ-পূর্ব আর্জেন্টিনা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—শীতল বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। শীতকালীন উত্তাপ প্রায় ১২° সেঃ। শীতকালে সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে উত্তাপ কিছুটা হ্রাস পায়। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ১৮° সেঃ। এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। সারা বৎসরই প্রায় বৃষ্টিপাত হয়।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলের অধিকতর তাপযুক্ত অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি এবং অপেক্ষাকৃত কম তাপযুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়; এই অঞ্চলের কাষ্ঠশিল্প জগদ্বিখ্যাত।

বনভূমিতে সেবল্, আরমাইন, শ্বেত শৃগাল, শ্বেত ভল্লুক প্রভৃতি লোমশ প্রাণিসমূহ বাস করে। ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী এখানে প্রতিপালিত হয়।
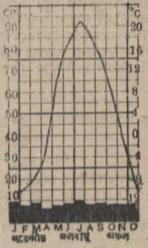
লোকবসতি—জাপান, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে শিল্পোন্নতির ফলে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে লোকবসতি অত্যন্ত কম।

পরিবহণ ব্যবস্থা—বিস্তীর্ণ বনভূমি থাকায় সর্বত্র যানবাহনের সুবন্দোবস্ত নাই। জাপান, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে পরিবহণ-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত।

অর্থনৈতিক উন্নতি—অনুর্বর পডসল্ জাতীয় মৃত্তিকা থাকায় বৃষ্টিবহুল স্থানেও কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কোনো কোনো অঞ্চলে কৃত্রিম সারের সাহায্যে গম, যব, রাই, সয়াবীন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা, বিরল লোকবসতি ও যানবাহনের অসুবিধা থাকায় আমুর উপত্যকায় শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুতের সাহায্যে কাষ্ঠশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। জাপান, নিউ ফাউন্ডল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার নিউ ফাউন্ডল্যান্ড এলাকায় অপর্যাপ্ত মৎস্য পাওয়া যায়। জাপান মৎস্য-শিল্পে পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

৩। মধ্যভাগের নিম্নভূমি (সরলবর্গীয় বনভূমি) অঞ্চল
[সাইবেরীয় আদর্শের পরিমণ্ডল]
(Interior Lowlands or Siberian Type)

অবস্থান—উত্তর গোলার্ধের ৪৫° হইতে ৬৬½° অক্ষাংশ পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চল উত্তর গোলার্ধের সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চল নামে পরিচিত। মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের যে সকল অংশ মেরু বৃত্তের নিকটবর্তী সেগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত রাশিয়ার সাইবেরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পোল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এবং আলাস্কা ও কানাডার প্রেইরী অঞ্চলের উত্তরাংশ ইহার অন্তর্গত। ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া এই অঞ্চলটি গঠিত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বিদ্যমান। শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী এবং গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব অত্যন্ত কম। বার্ষিক গড় উত্তাপ প্রায় ৫° সেঃ। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার তারতম্য অত্যন্ত বেশী। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ সেঃ মিঃ। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষা তুষারপাত অধিক হয়।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির জন্য বিখ্যাত। এইজন্য এই অঞ্চলকে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি (**Evergreen Coniferous forest**) বা 'তৈগা' অঞ্চল বলা হয়। বনভূমির ঘনত্ব এই অঞ্চলের দক্ষিণ সীমান্তে সর্বাপেক্ষা অধিক। যতই উত্তরে যাওয়া যায় গাছের আকৃতি ততই ছোট হয় ও ঘনত্ব ততই কমিতে থাকে। এই সকল নরম কাঠ কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কানাডা, ফিনল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশ এইজন্য কাগজ শিল্প ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

অত্যধিক শীতের জন্য শুধু লোমশ প্রাণী এখানে বাস করিতে পারে। সেবল, মার্টেল, আরমিন, শ্বেত খেঁকশিয়াল প্রভৃতি জীবজন্তু এখানে দেখা যায়। এই সকল পশুর লোম অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ।

লোকবসতি—অধিকাংশ স্থান বরফাবৃত বলিয়া এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশের লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। কারণ, এই অংশে শীতের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম এবং সেইজন্য শিল্প ও বাণিজ্যের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এই অঞ্চলে অধিকাংশ স্থান বরফাবৃত থাকায় কৃষিকার্য করা কষ্টকর। নিম্নাংশের কোনো কোনো স্থানে রাই, বীট, ওল, আলু প্রভৃতি শস্য জন্মে। গ্রামশিল্পের মধ্যে কাষ্ঠ-শিল্প ও কাগজ-শিল্পই প্রধান। নরম কাঠের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় এই সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। পশুপালন এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা।

৪। মধ্যভাগের উচ্চভূমি অঞ্চল

[আলটাই আদর্শের পরিমণ্ডল]

(Interior Highlands or Altai Type)

অবস্থান—আলটাই পর্বতমালার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ, **উত্তর আমেরিকার** পশ্চিমাংশের পর্বতশ্রেণীর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ (কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাংশ) ইহার অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা ও অবস্থান অনুসারে জলবায়ুর তারতম্য ঘটে।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এখানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই বনভূমি হইতে ডগলাস, লার্চ, স্প্রুস, ফার প্রভৃতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। উত্তর আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ পূর্বে শিকার করিয়া ও বনজ সম্পদ আহরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।

অর্থনৈতিক উন্নতি—বর্তমানে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষিকার্য, পশুপালন ও কাষ্ঠশিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। আলটাই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ মনুষ্য-বসতির উপযুক্ত নহে বলিয়া এখানকার অধিবাসিগণ এখনও বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই ; পশুশিকার ও খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া ইহাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। কোনো কোনো স্থানে জলসেচের মাধ্যমে কিছু কিছু কৃষিকার্য হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকিলেও প্রতিকূল অবস্থার জন্য উহার উত্তোলন সন্তোষজনক নহে।

উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ

১। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল

(The Mediterranean Region)

অবস্থান—এই অঞ্চলের দেশসমূহ সাধারণতঃ মহাদেশসমূহের পশ্চিম-প্রান্তে ৩০° হইতে ৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহ (দক্ষিণ ফ্রান্স, ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, দক্ষিণ স্পেন, পর্তুগাল, তুরস্ক, আলজেরিয়া ও টিউনিসিয়া), ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্য চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলের জলবায়ুর কিছুটা বিশেষত্ব আছে। এখানে ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুবলয়গুলি যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে সরিয়া যায়। শীতকালে এই অঞ্চল পশ্চিমা বায়ুবলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া পশ্চিমের সমুদ্র হইতে জলকণাযুক্ত বাতাস আসিয়া এখানে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চল আয়ন বায়ুবলয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানে উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়। সেই সময় এখানে সামুদ্রিক বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া
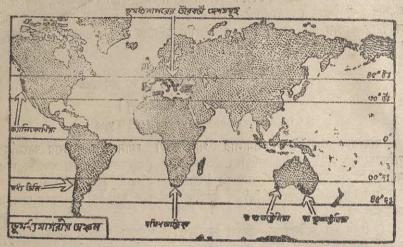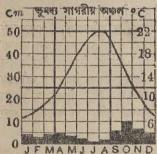
গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না। এখানকার গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রায় ২১° সেঃ হইতে ২৭° সেঃ এবং শীতকালীন তাপমাত্রা প্রায় ৫° সেঃ হইতে ১০° সেঃ। এইজন্য এখানে শীতের প্রকোপ কম। সারা বৎসর, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় দিনগুলি সর্বদাই সূর্যকিরণোজ্জ্বল থাকে।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে ওক্ ও চিরহরিৎ বৃক্ষাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছোট ছোট বৃক্ষ ও লতাপাতার গাছ এখানে অধিক জন্মিয়া থাকে। কমলালেবু, আপেল ও আঙ্গুর গাছ এই অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। অস্ট্রেলিয়ার 'জারা' ও 'কারি' গাছ, পর্তুগালের 'কর্ক' গাছ ও অন্যান্য স্থানের বাদাম ও সুপারি গাছ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বনজ সম্পদ।

তৃণভূমির অভাবে গরু-মহিষের সংখ্যা অল্প, কিন্তু অনুকূল আবহাওয়ায় অশ্ব, মেষ, শূকর, উষ্ট্র, ছাগল প্রভৃতি জীবজন্তু প্রতিপালিত হয়।

লোকবসতি—প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশলাভ ঘটিয়াছিল। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সময় হইতেই এখানে ঘন লোকবসতি বিদ্যমান ছিল। উৎকৃষ্ট জলবায়ু ও মূল্যবান ফল-মূলের গাছ থাকায় এবং যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হওয়ায় বর্তমান যুগেও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ঘন লোকবসতি বিদ্যমান। সুন্দর আবহাওয়া ও এই অঞ্চলে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট মদ্যের আকর্ষণে বহুলোক এখানে শীতকালে বেড়াইতে আসে এবং অনেকে শেষ

জীবন এখানে অতিবাহিত করে। সহজলভ্য ফল ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ থাকায় মানুষকে এখানে জীবিকার জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না ; সেইজন্য এখানকার অধিবাসীরা অনেকটা আরামপ্রিয়।

পরিবহণ ব্যবস্থা—ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করায় এবং সমভূমির আধিক্য হেতু এই অঞ্চলে রেলপথ ও রাস্তাঘাটের উন্নতি হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অংশে উষ্ট্র ও গর্দভ ভারবাহী পশু হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অর্থনৈতিক উন্নতি—অর্থনৈতিক বিচারে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে একটি উন্নত অঞ্চল বলা যায়। এখানে **কৃষিকার্য** অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। **গম**, যব, ভুট্টা, তুঁত প্রভৃতি শস্য এবং **আঙুর**, **কমলালেবু**, জলপাই, পেয়ারা, কুল, **বাদাম**, **আপেল**, **পীচ** প্রভৃতি নানাবিধ ফল এখানে প্রচুর জন্মে। অলিভ (জলপাই) এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট ফল। ইহা অন্য কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় না। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ফল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানকার আঙুর হইতে উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয় এবং উহা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। তৃণভূমির অভাবে এখানে পশু-পালন-শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। খনিজ সম্পদের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার খনিজ তৈল ও স্বর্ণ, ইটালির মর্মর ও গন্ধক, চিলির নাইট্রেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে কয়লার অভাব থাকায় বৃহদাকার শ্রমশিল্প তেমন বিকাশলাভ করে নাই। বর্তমানে জলবিদ্যুতের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি হইতেছে। তুঁত গাছ থাকার জন্য এখানে রেশম শিল্পও শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। সূর্যকিরণোজ্জ্বল আবহাওয়ার জন্য এই অঞ্চল চলচ্চিত্র শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত হলিউড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র শিল্পকেন্দ্র। ইহাছাড়া সাবান, তৈল প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের শিল্পও এই অঞ্চলে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

২। পূর্ব প্রান্তীয় চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল

(Eastern Marginal Region or China Type)

অবস্থান—উপক্রান্তীয় মণ্ডলে ২০° হইতে ৪০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার
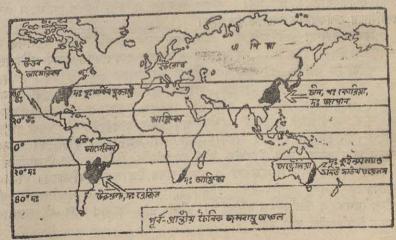
মধ্যে এবং মহাদেশসমূহের পূর্বপ্রান্তে এই অঞ্চলের স্থানসমূহ অবস্থিত। এশিয়ার

উত্তর ও মধ্য চীন, পশ্চিম কোরিয়া ও দক্ষিণ জাপান, উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ ব্রাজিল ও উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বপ্রান্ত, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলসের পূর্বপ্রান্ত এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
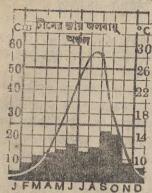
তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

জলবায়ু—এই অঞ্চলে বৎসরের প্রায় সকল সময় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এখানকার বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ১৫০ সেঃ মিঃ। মাঝে মাঝে প্রবল ঝড়ের ফলে এই অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাপান, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের 'টাইফুন', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের 'নর্দারন', দক্ষিণ ব্রাজিলের পূর্ব-প্রান্তের 'প্যাম্পেরা' ও 'জোন্ডা', অস্ট্রেলিয়ার 'সাদার্লি বাস্টার' ও 'ব্রিকফিল্ডার্স' প্রভৃতি ঝড়-বৃষ্টি এই সকল দেশের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা প্রায় ২৫° সেঃ এবং শীতকালীন উত্তাপ প্রায় ১০° সেঃ। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর মধ্যে কিছুটা তারতম্য দেখা যায়।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলের পার্বত্য অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষ এবং সমতলভূমিতে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য পরিলক্ষিত হয়। ওক্, পাইন, চেস্টনাট, বাঁচ প্রভৃতি বৃক্ষের মূল্যবান কাষ্ঠসম্পদ এখানে পাওয়া যায়। ফার্ন, কর্পূর ও বাঁশ প্রভৃতি বনজ সম্পদও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

এখানে তৃণভোজী জন্তুর সংখ্যা কম। কিন্তু গবাদি গৃহপালিত পশু এখানে প্রতিপালিত হয়।

লোকবসতি—চীনদেশ প্রাচীন সভ্যতার বিকাশলাভ হওয়ায় এখানে ঘন লোকবসতি বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। দক্ষিণ গোলার্ধে ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় লোকবসতি অপেক্ষাকৃত কম।

পরিবহণ-ব্যবস্থা—এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান সমভূমি বলিয়া রেলপথ ও রাস্তাঘাটের উন্নতি হইয়াছে। নদীবহুল দেশ হওয়ায় জলপথেরও উন্নতি ঘটিয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ও পেডলফার জাতীয় বলিয়া কৃত্রিম সারের সাহায্যে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। ধান, ভুট্টা, তুলা, চা, ইক্ষু, তুঁত, লেবু, তামাক ও কফি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত সম্পদ। দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় কৃষিকার্য অপেক্ষা পশুপালন অপেক্ষাকৃত লাভজনক বলিয়া দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম ও মাংসের ব্যবসায়ে অস্ট্রেলিয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, তাম্র, টাংস্টেন, টিন, অ্যান্টিমনি, লৌহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রমশিল্পে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। চীন ও জাপানের রেশমশিল্প জগদ্বিখ্যাত। ইহাছাড়া ইস্পাত, চিনি ও বস্ত্রশিল্পেও এই অঞ্চলের দেশসমূহ উন্নতিলাভ করিয়াছে। চীনের দ্রুত উন্নতির ফলে এই অঞ্চলকে বর্তমানে উন্নতিশীল বলা যায়।

৩। মধ্যভাগের তৃণভূমি (স্টেপ) অঞ্চল
[তুরান আদর্শের পরিমণ্ডল]
(The Interior Grassland or Turan Type)

অবস্থান—সাধারণতঃ মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে এই অঞ্চলের স্থানসমূহ অবস্থিত। সোভিয়েত রাশিয়ার তুরান (বা তুর্কিস্তান), ট্রান্স-কাস্পিয়ান ও কাস্পিয়ান অঞ্চল, রোমানিয়া, হাঙ্গেরী, মাঞ্চুরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-মধ্যাঞ্চল, কানাডার দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চল, উত্তর আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমি অঞ্চল এবং অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং উপত্যকা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে চরম জলবায়ু বিদ্যমান। বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম; ৩৫ সেঃ মিঃ-এর বেশী নহে। গ্রীষ্মকালেই এই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রায় ২৭° সেঃ; কিন্তু শীতকালীন উত্তাপ হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে।
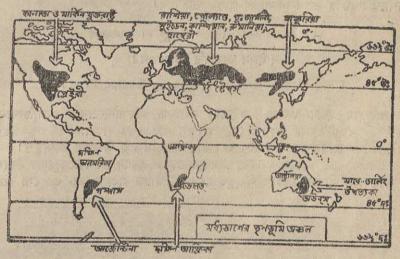
উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—বৃষ্টিবহুল স্থানে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। বৃষ্টিহীন অঞ্চলে গুল্ম ইত্যাদি দেখা যায়। এখানকার তৃণভূমি বসন্তকালে সবুজ রঙে নূতন রূপ ধারণ করে, গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে, আবার শীতকালে তুষারাবৃত হইয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই তৃণভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় 'স্টেপস্' (Steppes) নামে, উত্তর আমেরিকায় 'প্রেইরি' (Praires) নামে, দক্ষিণ আমেরিকায় 'পম্পাস' (Pampas) নামে, দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ভেলড্' (Veldt) নামে এবং অস্ট্রেলিয়ায় 'ডাউনস্' (Downs) নামে পরিচিত।

এই তৃণভূমিতে বিভিন্ন পশু বাস করে। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় ঘোড়া, গাধা, উট ও হরিণ, প্রেইরি অঞ্চলে গরু ও ঘোড়া, অস্ট্রেলিয়ায় মেষ, গরু ও ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি জীবজন্তু দেখা যায়।

লোকবসতি—অধিকাংশ স্থান তৃণভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় লোকবসতি ঘন

নহে। পূর্ব ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন।

পরিবহণ-ব্যবস্থা—বিস্তীর্ণ তৃণভূমি থাকায় রেলপথ বা রাস্তাঘাটের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। অনেক স্থানে উষ্ট্র ও অশ্ব পরিবহণের প্রধান অবলম্বন।

অর্থনৈতিক উন্নতি—তৃণভূমিতে পশুপালন শিল্প ভালভাবে গড়িয়া উঠে বলিয়া এখানকার অধিকাংশ লোক পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম ও মাংসের ব্যবসায়ে এই সকল স্থান উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখানকার মৃত্তিকা পিঙ্গলবর্ণের পেডোক্যাল বর্গীয়। সার ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো কোনো স্থানে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। গম, ভুট্টা, যব, তুলা প্রভৃতি এই অঞ্চলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত সম্পদ। পশুপালন শিল্প ছাড়া অন্যান্য শ্রমশিল্প এই অঞ্চলে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত স্টেপস্ অঞ্চল খনিজ সম্পদ উত্তোলনে ও যন্ত্রশিল্পে খুবই উন্নত। এই অঞ্চলের ইউক্রেনে সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় প্রধান শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে।

৪। মধ্যভাগের মরুভূমি অঞ্চল

[ইরান আদর্শের পরিমণ্ডল]

(The Interior Desert Climate or Iranian Type)

অবস্থান—ইরান, এশিয়া মাইনরের মধ্যভাগ, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, তিব্বত, পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, উত্তর মেক্সিকো, আর্জেন্টিনার দক্ষিণাংশ ও গোবি মরুভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রখর উত্তাপ ও শীতকালে শীতের প্রকোপ অনুভূত হয়। বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম, ৩৫ সেঃ মিঃ-

এর বেশী নহে। অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত অঞ্চলে তৃণভূমি এবং কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে মরুভূমি বিদ্যমান।
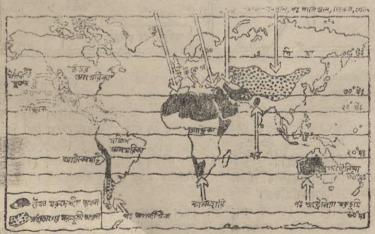
উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এই মরু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেও

শীতকালে বরফ জমে বলিয়া গাছপালা ও শস্যাদি বিশেষ জন্মে না। এখানকার যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত হয় সেই সকল স্থানে তৃণভূমি বিদ্যমান। এই অঞ্চলে তৃণভূমিতে ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, উট প্রভৃতি প্রতিপালিত হয়।

লোকবসতি—উষ্ণ মরু অঞ্চলের ন্যায় এই মরু অঞ্চলেও লোকবসতি বিরল। অধিবাসীরা প্রধানতঃ পশুপালক এবং অনেকেই এখনও যাযাবর জীবন যাপন করে। সেচ ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা—বন্ধুর ভূপ্রকৃতির জন্য রাস্তাঘাট তেমন প্রসারলাভ করে নাই; উষ্ণ মরুভূমির মত উটই এখানকার পরিবহণের প্রধান অবলম্বন।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এই অঞ্চলে কৃষিকার্য করা প্রায় অসম্ভব। যে সকল স্থানে নদী বা মরূদ্যান আছে, সেই সকল স্থানে কিছু কিছু কৃষিকার্য হইয়া থাকে ; জোয়ার, বাজরা, গম, তুলা, তামাক, ইক্ষু, খেজুর ইত্যাদি এই সকল স্থানের প্রধান ফসল। তৃণভূমি অঞ্চলে গরু, মেষ, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকিলেও শ্রমিক ও মূলধনের অভাবে এখনও সকল স্থানে ইহা উত্তোলন করা সম্ভব হয় নাই। উন্নতিশীল অঞ্চলে ছোটো খাটো শিল্প দেখা যায়। এখানকার দেশসমূহ সাধারণতঃ অনুন্নত।

নিরক্ষীয় ও উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ

১। নিরক্ষীয় অঞ্চল

[আমাজনীয় আদর্শের পরিমণ্ডল]

(The Equatorial Region)

অবস্থান—নিরক্ষরেখার ৫° হইতে ১০° উত্তর ও ৫° হইতে ১০° দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকা ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার উপকূল সন্নিহিত অঞ্চল, আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকা (জায়েরে প্রজাতন্ত্র) ও গিনি উপকূল, এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

জলবায়ু—নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল বলিয়া স্বভাবতঃই এখানকার তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী—প্রায় ২৭° সেঃ। এইজন্য এখানে বৃষ্টিপাত অত্যধিক—গড়ে প্রায় ২০০ সেঃ মিঃ। সূর্য নিরক্ষরেখার উপর প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়; ফলে এখানকার বায়ু উত্তপ্ত হইয়া স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে উপরে উঠিয়া যায় ও নিকটবর্তী সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পসমেত বায়ুরাশি এই অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এখানে প্রায় প্রতিদিনই ঝড়সহ পরিচলন বৃষ্টি হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময় এখানে বৃষ্টিপাত ঘটে। একই প্রকার আবহাওয়া এখানে সারাবৎসর বিদ্যমান থাকে।
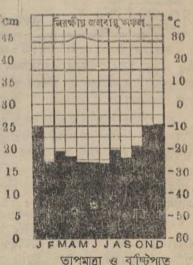
উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—এই অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য মৃত্তিকা সর্বদা আর্দ্র থাকে। সেইজন্য এখানে স্বাভাবিক উদ্ভিদ সহজেই জন্মিয়া থাকে। চিরহরিৎ বৃক্ষের ঘন বনভূমি এখানে পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত 'আফ্রিকার জঙ্গল' এই অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বনভূমি এত ঘন যে, ইহার সকল জায়গায় সূর্যকিরণ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। এই সকল স্থানকে সেইজন্য 'গোধূলি অঞ্চল' **(Regions of Twilight)** বলা হয়। এই সকল বনভূমির অভ্যন্তরে আলোকের অভাবে কোনো ছোট লতাপাতা বা ছোট গাছপালা জন্মিতে পারে না। লতাপাতা বা বৃক্ষাদি আলো পাইবার জন্য দীর্ঘ হইয়া থাকে। আমাজন নদীর অববাহিকায় যে বনভূমি বিদ্যমান উহার নাম 'সেল্‌ভা' **(Selva)**। নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর কাঠ পাওয়া গেলেও পরিবহণ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাবে এখানকার কাষ্ঠশিল্প উন্নতিলাভ করে নাই।
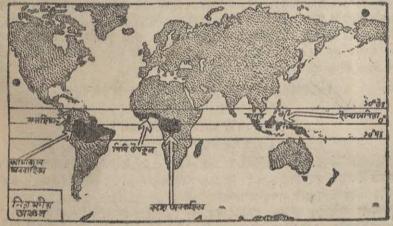
বনভূমির অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া অধিকাংশ জীবজন্তুকে বৃক্ষশাখায় বাস করিতে হয়। সেইজন্য এখানে বানর, শিম্পাঞ্জী, সাপ, পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু বাস করে। কোনো কোনো অঞ্চলে হাতী, বাঘ, শূকর, পুমা ও জাগুয়ার প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়।

লোকবসতি—অত্যধিক গরম অনুভূত হওয়ায় এবং বৃষ্টিপাত ও বনভূমির আধিক্য থাকায় এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত কম। জায়েরের আয়তন ভারতের তিন-চতুর্থাংশ হইলেও ইহার লোকসংখ্যা ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় [illegible] ভাগ মাত্র এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক খর্ব ও কৃষ্ণকায়। কোনো কোনো স্থান জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় মানুষ বৃক্ষশাখায় ঘর বাঁধিয়া বাস করে। ইন্দোনেশিয়ায় কৃষির উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি অপেক্ষাকৃত বেশী।

পরিবহণ-ব্যবস্থা—অত্যধিক গরম, গভীর ও দুর্গম বনভূমি এবং অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য এই অঞ্চলের পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হয় নাই। কোনো কোনো স্থানে রেলপথ স্থাপিত হইলেও ইহা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। কঙ্গো ও আমাজন নদী নাব্য হওয়ায় জলপথের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে এখানে কাষ্ঠ-শিল্প ও অন্যান্য শ্রম-শিল্পের উন্নতি হয় নাই।

অর্থনৈতিক উন্নতি—আফ্রিকার দেশসমূহ, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া বহুদিন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের অধীন থাকায় এবং ব্রাজিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকায়, এই অঞ্চলের দেশসমূহের কোনো অর্থনৈতিক উন্নতি এতদিন পরিলক্ষিত হয় নাই। দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ এই সকল বৈদেশিকগণ তাহাদের নিজ দেশে লইয়া যাইত। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধন কিছুটা শিথিল হওয়ায় এই অঞ্চলের দেশসমূহের ক্রমশঃ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু গভীর বনভূমি থাকায়, মৃত্তিকা অনুর্বর হওয়ায় এবং অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ধান, ইক্ষু, কোকো, কফি ও রবার, জায়েরের রবার ও কোকো, ব্রাজিলের রবার, কফি, কোকো, ধান ও ইক্ষু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদও বিদ্যমান। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার টিন; জায়েরের তাম্র ও হীরক; ঘানার ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের বনভূমি হইতে কোনো কোনো স্থানে কাষ্ঠ, লাক্ষা, চিকল (চিউইংগাম) প্রভৃতি পাওয়া যায়। পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাব, বিরল লোকবসতি এবং কয়লা ও কাঁচামালের অভাবে এখানে শ্রমশিল্প এখনও গড়িয়া উঠে নাই। কঙ্গো ও আমাজন নদীর জল হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও পরাধীনতার ফলে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে জায়েরে শীঘ্রই উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ, এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং মূল্যবান খনিজ সম্পদও এখানে বিদ্যমান। স্বাধীনতা পাওয়ার পর ইন্দোনেশিয়া শিল্প ও বাণিজ্যে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। রবার, কফি, কোকো, তাম্র প্রভৃতি সামগ্রীর জন্য সমগ্র পৃথিবী নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল।

২। মৌসুমী অঞ্চল
(ভারতীয় আদর্শের পরিমণ্ডল)
(The Monsoon Region)

'মৌসিম' নামক একটি আরবী শব্দ হইতে 'মৌসুমী' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'মৌসিম' শব্দের অর্থ ঋতু; ঋতু অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তিত হয় বলিয়া এই অঞ্চলের নাম মৌসুমী অঞ্চল। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল বলিয়া অনেক ভূগোলবিদ্ এই অঞ্চলকে গ্রীষ্মপ্রধান মৌসুমী অঞ্চল (Tropical Monsoon Region) বলেন।

অবস্থান—এই অঞ্চলের স্থানসমূহ বিভিন্ন মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ চীন, মাদাগাস্কার দ্বীপ, ব্রাজিলের পূর্বাংশ, ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী স্থানসমূহ (ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার তীরভাগ), অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। সাধারণতঃ ৫° হইতে ২৫° উত্তর ও ৫° হইতে ২৫° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে এই সকল স্থান অবস্থিত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে সারা বৎসর প্রচুর উত্তাপ পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ৩০° সেঃ এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১৫° সেঃ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত

অত্যন্ত কম। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। আবার কোনো কোনো স্থানে ৫০ সেঃ মিঃ-এরও কম বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে

এই অঞ্চলে সূর্য প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয় বলিয়া উত্তাপ বাড়িয়া যায় এবং বায়ুরাশি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রসারিত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। সেইজন্য এই অঞ্চলে বায়ুর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই বায়ুশূন্যতা পূরণ করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের জলভাগ হইতে উচ্চচাপযুক্ত বায়ুরাশি জলকণা বহন করিয়া এই অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় এবং কোনো উচ্চ পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইলে এই বায়ুরাশি হইতে জলকণা ঝরিয়া পড়িয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বৃষ্টির নাম মৌসুমী বৃষ্টি। কোনো কোনো অঞ্চলে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শীতকালে অল্প বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের উপর এখানকার কৃষিকার্য নির্ভরশীল বলিয়া কৃষকগণ সর্বদাই বৃষ্টির ভরসায় বসিয়া থাকে। সেইজন্য এখানকার মানুষ সাধারণতঃ ভগবান-বিশ্বাসী ও অদৃষ্টবাদী; তাহাদের ধারণা বৃষ্টিপাত ভগবানের কৃপায় হইয়া থাকে। এমন কি বৃষ্টির কামনায় বহুস্থানে দেব-দেবীর পূজা করা হয়।
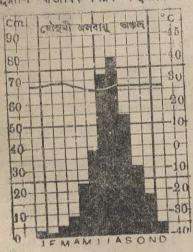
তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যান্ডের সেগুন কাঠ, ভারতের চন্দন ও শাল কাঠ এবং লাক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান বনজ সম্পদ।

বিস্তীর্ণ তৃণভূমির অভাবে এখানে পশুচারণ-শিল্প প্রসারলাভ করে নাই। গভীর অরণ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, চিতাবাঘ, হাতী, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি দেখা যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, গাধা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লোকবসতি—এই অঞ্চলের মৃত্তিকা এবং জলবায়ু কৃষিকার্যের উপযোগী বলিয়া খাদ্যশস্য প্রচুর জন্মে। সেইজন্য লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই অঞ্চলে বাস করে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা—এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি বলিয়া রেলপথ ও রাস্তাঘাটের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। ভারত, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ চীন নদীবহুল দেশ বলিয়া এই সকল দেশে জলপথের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে সাময়িকভাবে যানবাহন চলাচলের অসুবিধা দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এই অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ বহুদিন যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অধীনে ছিল বলিয়া এই সকল দেশের বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। বিগত ৩০/৩৫ বৎসরে অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করায় ঐসকল দেশে বর্তমানে কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বৃষ্টিপাতের অভাব না থাকায় এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখানকার মৃত্তিকা রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের ; অধিকাংশ স্থানেই মৃত্তিকা উর্বর ও কৃষিকার্যের উপযোগী। ধান, পাট, চা, ইক্ষু, তুলা, কফি, জোয়ার, বাজরা, তামাক, রবার, তৈলবীজ প্রভৃতি এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্য এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান উৎপাদক অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ বিদ্যমান থাকিলেও পরাধীনতার জন্য এত দিন উহা উত্তোলনের সুবন্দোবস্ত হয় নাই। স্বাধীনতা পাইবার পর খনিজ সম্পদের উত্তোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রমশিল্পেও এই অঞ্চল বর্তমানে উন্নতিলাভ করিতেছে। পূর্বে এই সকল দেশ কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করিত এবং পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করিত। বর্তমানে বহুবিধ ভোগ্যদ্রব্য এখানে উৎপন্ন হইতেছে। কাঁচামাল, কয়লা এবং সুলভ শ্রমিকের অভাব না থাকায় এখানে শ্রমশিল্প আরও উন্নতিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। তবে অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া এবং কৃষি-পদ্ধতির সম্যক্ উন্নতি না হওয়ায় অধিকাংশ লোক অত্যন্ত গরীব।

মৌসুমী অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তুলনামূলক পার্থক্য

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল	মৌসুমী অঞ্চল
১। মহাদেশসমূহের পশ্চিমপ্রান্তে এই অঞ্চল অবস্থিত।	১। মহাদেশসমূহের পূর্বপ্রান্তে এই অঞ্চল অবস্থিত।
২। ৩০° হইতে ৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে ইহা অবস্থিত। ইহা উপক্রান্তীয় মণ্ডলের অন্তর্গত।	২। ৫° হইতে ২৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে ইহা অবস্থিত। ইহা উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল	মৌসুমী অঞ্চল
৩। এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ হইয়া থাকে।	৩। এখানে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালীন বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম। এখানে বৎসরে ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়।
৪। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রায় ২৭° সেঃ এবং শীতকালীন উত্তাপ প্রায় ১০° সেঃ।	৪। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রায় ৩০° সেঃ এবং শীতকালীন উত্তাপ প্রায় ১৫° সেঃ।
৫। এখানকার উদ্ভিদের মধ্যে ছোট ছোট গাছপালা ও গুল্মই প্রধান। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়। আঙ্গুর ও নানাবিধ ফলের জন্য এই অঞ্চল বিখ্যাত।	৫। এখানে বৃষ্টিবহুল স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (শাল, মেহগনি, সেগুন ইত্যাদি) দেখা যায়। বৃষ্টিহীন অঞ্চলে মরুপ্রায় অবস্থা বিদ্যমান।
৬। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, তুঁত ও ভুট্টা প্রধান।	৬। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, চা, কফি, তুলা, গম, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
৭। খনিজ সম্পদের মধ্যে খনিজ তৈল, স্বর্ণ, গন্ধক, নাইট্রেট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জলবিদ্যুতের উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল।	৭। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনেও ক্রমশঃ উন্নতি ঘটিতেছে।
৮। কয়লার অভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। মদ্য ও রেশম শিল্প এখানকার উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্প।	৮। কয়লার প্রাচুর্যের জন্য বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতি হইতেছে।

৩। উষ্ণ মরুদেশীয় অঞ্চল

(সাহারা আদর্শের পরিমণ্ডল)

(The Hot Desert Region)

অবস্থান—২০° হইতে ৩০° উত্তর ও ২০° হইতে ৩০° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি মরুভূমি, এশিয়ার আরব মরুভূমি ও ভারতবর্ষের থর মরুভূমি, উত্তর আমেরিকার কলোরাডো ও মেক্সিকোর মরুভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। সাধারণতঃ এই সকল মরুভূমি মহাদেশসমূহের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। (৪৬ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

জলবায়ু—এখানকার তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায়

৩২° সেঃ এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১৬° সেঃ। সর্বোচ্চ উষ্ণতা ৫৩° সেঃ পর্যন্ত উঠে। রাত্রিতে ঠান্ডা পড়ে। বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫ সেঃ মিঃ-এর কম। অনেক স্থানে এক টানা চার-পাঁচ বৎসর বৃষ্টিপাত হয় না।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—মরুভূমি অঞ্চলে উষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান থাকায় শুষ্ক তৃণ ও কাঁটাগাছের ঝোপ জন্মে। এখানকার গাছপালাসমূহ দীর্ঘ মূল দ্বারা মাটির রস গ্রহণ করে। ইহাদের পত্র তৈলাক্ত হয়।

উষ্ট্র এই অঞ্চলের প্রধান জন্তু। অশ্ব, ছাগ, মেষ প্রভৃতি জীবজন্তুও এখানে প্রতিপালিত হয়।

লোকবসতি—অত্যধিক গরমের জন্য এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির অভাবে এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। এখানে জীবিকা উপার্জনের বন্দোবস্ত করা কষ্টকর। মরু অঞ্চলে সাধারণতঃ যাযাবর জাতীয় লোক বাস করে।
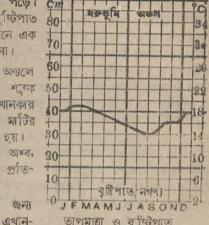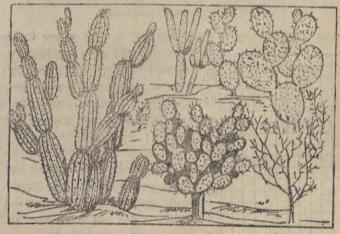
মরু অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার কাঁটাগাছ

পরিবহণ ব্যবস্থা—মরুভূমি অঞ্চলে স্বভাবতঃই রেলপথ বা রাস্তাঘাটের সুবন্দোবস্ত করা কষ্টকর। উষ্ট্রই এখানকার যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। মিশর প্রভৃতি দেশে নদীর তীরে রেলপথ ও রাস্তাঘাটের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নতি—ক্ষারধর্মী পেডোক্যাল শ্রেণীর মৃত্তিকা থাকায় এবং বৃষ্টিপাতের অভাবে এই অঞ্চলে কৃষির উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু মরূদ্যান অঞ্চলে এবং নদীমাতৃক মিশর প্রভৃতি দেশে কৃষির উন্নতি কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল স্থানে খেজুর, তুলা, ধান, ইক্ষু, তামাক, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি জন্মে। মরূদ্যানের

খেজুর ও মিশরের তুলা জগদ্বিখ্যাত। মরূদ্যানের অধিবাসিগণ পশুপালনও করিয়া থাকে। মরুভূমি অঞ্চলের কোনো কোনো স্থান খনিজ সম্পদের জন্য বিখ্যাত। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির তাম্র ও নাইট্রেট এবং পেরুর খনিজ তৈল, দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লির হীরক ও তাম্র, সাহারার লবণ, আরব দেশসমূহের খনিজ তৈল, উত্তর আমেরিকার কলোরাডো অঞ্চলের স্বর্ণ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ। এই সকল খনিজ সম্পদের লোভে মানুষ মরুভূমিতে যাইতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এই সকল খনি দখল করিয়া আছে। ইহারা এই অঞ্চল হইতে খনিজ সম্পদ আহরণ করিয়া নিজ নিজ দেশে লইয়া যায়। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই সকল খনিজ সম্পদ বিশেষ সাহায্য করে নাই। পরিবহণ-ব্যবস্থা, শ্রমিক ও কাঁচামালের অভাবে এই অঞ্চলে শ্রমশিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। এই সকল কারণে স্থানীয় অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। মরুভূমি অঞ্চল সভ্যতা বিকাশের পরিপন্থী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই অঞ্চলের অন্তর্গত নীলনদের তীরে মিশরে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশলাভ ঘটিয়াছিল।

৪। উষ্ণ তৃণভূমি (সাভানা) অঞ্চল

[সুদান আদর্শের পরিমণ্ডল]

(The Tropical Grassland)
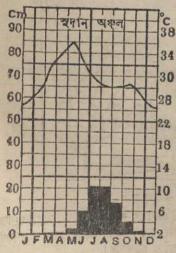
অবস্থান—নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তরে এবং মরু অঞ্চলের দক্ষিণে উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজন উপত্যকার উত্তরাংশ (ভেনেজুয়েলা) ও দক্ষিণাংশ (দক্ষিণ ব্রাজিল), উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার সুদান, জিম্বাবোয়ে ও অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

জলবায়ু—নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী বলিয়া এখানকার গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অত্যন্ত বেশী—গড়ে প্রায় ২৭° সেঃ হইতে ৩২° সেঃ পর্যন্ত। শীতকালীন উত্তাপ গড়ে ২১° সেঃ হইতে ২৬° সেঃ পর্যন্ত অনুভূত হয়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী স্থানে প্রায় ১২৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু মরু অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে ৪০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত দেখা যায়। এই প্রকার জলবায়ু আফ্রিকার সুদানে স্পষ্টরূপে দেখা যায় বলিয়া উহাকে সুদানী জলবায়ু বলা হয়।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—সময়োপযোগী বৃষ্টিপাতের জন্য এই অঞ্চলে দীর্ঘাকার তৃণ জন্মে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মিটার পর্যন্ত হয়। এই তৃণভূমিকে সাভানা বলে।

এই তৃণভূমি জিম্বাবোয়েতে 'পার্কল্যান্ড', ভেনেজুয়েলায় 'ল্যানোস' এবং ব্রাজিলে 'ক্যাম্পোস' নামে পরিচিত। অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। মরু অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে ঝোপ ও ঘাস জন্মে। এখানকার বাবলা গাছ হইতে প্রচুর গঁদ প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

তৃণভূমি অঞ্চলে জিরাফ, হরিণ, অশ্ব, ক্যাঙ্গারু, জেব্রা প্রভৃতি তৃণভোজী জীব-

ক্যাঙ্গারু
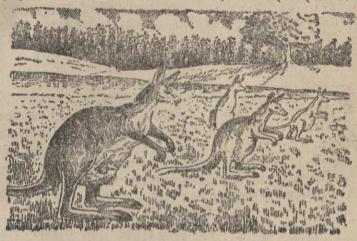
জন্তু দেখা যায়। ইহাদের মাংস খাইয়া জীবনধারণকারী সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও এখানে বাস করে। ক্যাঙ্গারু এই অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব।

লোকবসতি—এই অঞ্চলের লোকবসতি কম। অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে এখনও যাযাবর জীবন যাপন করে। অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা পশুপালন ; অনেকে পশুশিকার করিয়া জীবিকা অর্জন করে। আফ্রিকার সুদান অঞ্চলে পশু শিকারের সুযোগ অধিক বলিয়া উহাকে "শিকারীদের স্বর্গ" (Paradise for hunters) বলা হয়। পূর্ব আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে মাসাই জাতির বাস। তাহারা পশুপালক। উত্তাপের জন্য তাহারা অল্প পরিমাণ পোশাক ব্যবহার করে। মাসাইগণ ডালপালার কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপ দিয়া নির্মিত ঘরে বাস করে। তাহারা অনেকটা যাযাবরদের মত জীবন যাপন করে। কেনিয়ার উত্তরাংশের সাভানা অঞ্চলে কিকুয়ু-নামক নিগ্রো জাতির বাস। তাহারা পশুপালন করে এবং কলা, জোয়ার প্রভৃতির চাষ করে। কিকুয়ুরা অধিকাংশ স্থায়িভাবে একস্থানে বাস করে। পশ্চিম আফ্রিকার সাভানায় হোসাস নামে নিগ্রোজাতি স্থায়িভাবে গ্রামে ও শহরে বসবাস করে। তাহাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। বর্তমানে চাষের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা গবাদি পশু পালন করিতেছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা—এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও অনুন্নত রহিয়াছে। সড়কপথেই যাতায়াত চলে। রেলপথের এখনও প্রসার ঘটে নাই।

অর্থনৈতিক উন্নতি—এখানকার দেশসমূহ এখনও অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র থাকায় কৃষিকার্যের অসুবিধা হয়। কোনো কোনো স্থানে তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, তামাক, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন করা হয়। তৃণভূমি অঞ্চলে যাযাবর শ্রেণীর লোক বাস করে। ইহারা পশুশিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। স্থানীয় অধিবাসিগণ পশুপালন করিয়া থাকে। সুদান অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, কিন্তু অন্যত্র শ্রমিক-সমস্যা, যানবাহনের অসুবিধা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Name the different climatic regions of the world. Describe the role of climate of any region on the activities of the people. [H. S. Examination, 1979]

[পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের নাম উল্লেখ কর। ইহাদের যে কোনো একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।]

উঃ। 'প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল' (৩৪-৩৫ পৃঃ) ও 'মৌসুমী অঞ্চল' (৪৯-৫১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

2. What is a *natural region*? Name the natural regions of the world as classified by Herbertson and state briefly the agricultural activities of at least two of these regions. [C. U. Inter. 1960]

[প্রাকৃতিক অঞ্চল কাহাকে বলে ? হারবার্টসনের বিভাগ অনুসারে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের নাম লিখ এবং ইহার অন্ততঃ দুইটি অঞ্চলের কৃষিকার্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

উঃ। 'প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল' (৩৪-৩৫ পৃঃ), 'অর্থনৈতিক উন্নতি' (৪৩ পৃঃ) ও 'অর্থনৈতিক উন্নতি' (৫১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. (a) Describe the characteristic features of Warm Temperate Climate. (b) Name the countries where such type of climate occurs. (c) Mention briefly the economic activities of man in such climatic regions. [H. S. Examination, 1982]

[(ক) উষ্ণ-নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (খ) যে সকল দেশে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায়, তাহাদের নাম উল্লেখ কর। (গ) এইরূপ জলবায়ু অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]

উঃ। 'উষ্ণ-নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অঞ্চলসমূহ' (৪১-৪৭ পৃঃ) হইতে 'জলবায়ু,' 'অবস্থান' ও 'অর্থনৈতিক উন্নতি' অবলম্বনে উত্তর লিখ।

4. Name three important countries located in the equatorial climate. What are the characteristic features of this type of climate ? Describe the role of this climate on the economic activities of the people. [H. S. Examination, 1978]

[নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত প্রধান তিনটি দেশের নাম উল্লেখ কর। এই প্রকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি? এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর এই জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।]

উঃ। 'নিরক্ষীয় অঞ্চল' (৪৭-৪৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. Describe the characteristic features of equatorial type of **climate. In which parts of the world this type of climate is found ?** **Mention** the principal economic activities of the people in this climatic region. **[H. S. Examination, 1981]**

[নিরক্ষীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দাও। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে এইরূপ জলবায়ু দেখা যায়? এই জলবায়ু অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ উল্লেখ কর।]

উঃ। "নিরক্ষীয় অঞ্চল" (৪৭-৪৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Describe the following natural regions indicating the value **of economic development of each of these regions : (a) Equatorial** region ; (b) Monsoon region ; (c) Mediterranean region ; (d) St. Laurance region. **[Specimen Question, 1979]**

[নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির নির্দেশ প্রদান পূর্বক ঐগুলি বর্ণনা কর: **(ক) নিরক্ষীয় অঞ্চল ; (খ) মৌসুমী অঞ্চল** ; (গ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ; (ঘ) সেন্ট লরেন্স অঞ্চল।]

উঃ। 'নিরক্ষীয় অঞ্চল' (৪৭-৪৯ পৃঃ), 'মৌসুমী অঞ্চল' (৪৯-৫১ পৃঃ), 'ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল' (৪১-৪৩ পৃঃ) ও 'সেন্ট লরেন্স অঞ্চল' (৩৮-৪০ পৃঃ) লিখ।

7. Describe the characteristics of either the Monsoon or the Mediterranean type of climate. Name the areas where such type **of climate prevails. Account for the natural vegetation and principal agricultural products of the areas having this parti**cular type of climate. **[Specimen Question, 1980]**

[মৌসুমী অথবা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের বিশেষত্ব বর্ণনা কর। এই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলির নাম কর। এই বিশেষ জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ ও কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের বিবরণ দাও।]

উঃ। 'মৌসুমী অঞ্চল' (৪৯-৫১ পৃঃ), 'ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল' (৪১-৪৩ পৃঃ) হইতে 'অবস্থান,' 'জলবায়ু', 'উদ্ভিদ' ও 'অর্থনৈতিক উন্নতি' লিখ।

8. Give a **comparison** between Monsoonal region and Mediterranean region. **[Tripura H. S. Examination, 1981]**

[মৌসুমী অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পার্থক্য দেখাও।]

উঃ। 'মৌসুমী অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তুলনামূলক পার্থক্য' (৫১-৫২ পৃঃ) লিখ।

9. Compare and contrast the Monsoon and Mediterranean **lands in respect of their general climatic conditions, natural** vegetations and economic developments. **[B. U. Univ. Ent. 1962]**

[মৌসুমী অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্থানসমূহের জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও অর্থনৈতিক উন্নতির তুলনা করিয়া পার্থক্য দেখাও।]

উঃ। 'মৌসুমী অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তুলনামূলক পার্থক্য' (৫১-৫২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10. Give a description of the characteristic of the Tropical Monsoon climate. What are the chief agricultural products of the tropical monsoon lands? [B. S. E. Higher Secondary, 1964]

[ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও। ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যাদি কি কি?]

উঃ। 'জলবায়ু' (৪৯-৫০ পৃঃ) ও 'অর্থনৈতিক উন্নতি' (৫১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. Classify and account for the chief areas of natural grasslands of the world. Describe the nature of economic development of these regions. [Specimen Question, 1978]

[পৃথিবীর স্বাভাবিক তৃণভূমিগুলিকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া উহাদের বিবরণ দাও। এই অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির বিবরণ দাও।]

উঃ। 'মধ্যভাগের তৃণভূমি অঞ্চল' (৪৫-৪৬ পৃঃ) ও 'উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল' (৫৪-৫৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on: (a) Eskimos, (b) Pompas, (c) Veldt, (d) Regions of twilight, (e) Campos.

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ (ক) এস্কিমো, (খ) পম্পাস, (গ) ভেল্ড, (ঘ) গোধূলী অঞ্চল, (ঙ) ক্যাম্পোস।]

উঃ। (ক) 'এস্কিমো' (৩৬-৩৭ পৃঃ), (খ) 'পম্পাস' (৪৫ পৃঃ), (গ) 'ভেল্ড' (৪৫ পৃঃ), (ঘ) 'উদ্ভিদ ও জীবজন্তু' (৪৮ পৃঃ), (ঙ) 'ক্যাম্পোস' ৫৫ পৃঃ) হইতে লিখ।

2. Explain why: (a) In the Mediterranean region most of the rains fall in winter months. (b) Human life in the equatorial region has not made much progress in economic sphere. (c) In Polar region people are nomads. (d) River Valleys of Monsoon region are the most densely populated areas of the world.

[B. S. E. Higher Secondary, 1960]

[কারণ নির্ণয় করঃ (ক) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অধিকাংশ বৃষ্টিপাত শীতকালে হইয়া থাকে। (খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। (গ) মেরু অঞ্চলের মানুষ যাযাবর। (ঘ) মৌসুমী অঞ্চলের নদী উপত্যকাসমূহ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনবসতি অঞ্চল।]

উঃ। (ক) 'জলবায়ু' (৪১-৪২ পৃঃ), (খ) 'অর্থনৈতিক উন্নতি' (৪৯ পৃঃ), (গ) 'লোকবসতি' ও 'অর্থনৈতিক উন্নতি' (৩৬-৩৭ পৃঃ), (ঘ) 'লোকবসতি' ও 'অর্থনৈতিক উন্নতি' (৫১ পৃঃ) ও 'নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল' (৭৭-৭৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Explain the following statements :

(a) Judged from the economic point of view, the Mediterranean Region can be said to be an advanced one.

(b) Rainfall occurs during the major part of the year in the Equatorial Region.

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি ব্যাখ্যা কর : (ক) অর্থনৈতিক বিচারে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে একটি উন্নত অঞ্চল বলা যায়। (খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৎসরের অধিকাংশ সময় বৃষ্টিপাত ঘটে।]

উঃ। (ক) 'অর্থনৈতিক উন্নতি' (৪৩ পৃঃ) এবং (খ) 'জলবায়ু' (৪৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

C. Objective Questions

1. Write correct answers for the following statements :

(a) Alaska is located in Equatorial/Monsoon/Polar region.

[H. S. Examination, 1982]

(b) Equatorial/Tropical Monsoon/Mediterranean climatic regions have only winter rains.

[H. S. Examination, 1982]

(c) Agriculture is the main occupation of the people of Cool Temperate/Monsoon region.

[H. S. Examination, 1982]

(d) The density of population of Temperate/Polar region is high.

(e) Soft-wood forests are usually found in the Equatorial/ Tropical Monsoon/Temperate regions.

[H. S. Examination, 1982]

(f) The polar climate is characterised by cold humid/too cold/long severe winter and cool summer.

[H. S. Examination, 1982]

(g) The Selva is a grassland area in India/tropical forest in Brazil/desert region of central Asia/forest area of Congo.

[H. S. Examination, 1979]

(h) Pasture lands are common in regions of temperate/ equatorial climate.

[H. S. Examination, 1982]

(i) Agriculture is the main occupation of the people of Cool Temperate/Tropical Monsoon region.

[নিম্নলিখিত বিবৃতিসমূহ হইতে সঠিক উত্তর লিখ :

(ক) আলাস্কা নিরক্ষীয়/মৌসুমী/তুন্দ্রা অঞ্চলে অবস্থিত।

(খ) নিরক্ষীয়/ক্রান্তীয় মৌসুমী/ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কেবলমাত্র শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়।

(গ) শীতল নাতিশীতোষ্ণ/মৌসুমী অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃষিকার্য প্রধান উপজীবিকা।

(ঘ) নাতিশীতোষ্ণ/তুন্দ্রা অঞ্চলের লোকবসতি ঘনত্ব বেশী।

(ঙ) সাধারণতঃ নিরক্ষীয়/ক্রান্তীয় মৌসুমী/নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে নরম কাঠের বনভূমি দেখা যায়।

(চ) শীতল/আর্দ্র/অতিশীতল/দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড শীত এবং শীতল গ্রীষ্মকাল মেরুদেশীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য।

(ছ) ভারতের এক তৃণভূমির/ব্রাজিলের নিরক্ষীয় বনভূমির/মধ্য এশিয়ার মরুভূমির/কঙ্গোর বনভূমির নাম সেলভা।

(জ) নাতিশীতোষ্ণ/নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে পশুচারণ ক্ষেত্র দেখা যায়।

(ঝ) শীতল নাতিশীতোষ্ণ/ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি।]

2. Put tick (√) mark against correct sentences and cross (x) mark against incorrect ones:

(i) Snow covered places are unfit for animal living and plant growth. (ii) Humid summer is the climatic feature of polar region. (iii) In the Mediterranean region it rains during winter. (iv) Judged from the economic point of view the Mediterranean region cannot be said to be an advanced one. (v) Tropical regions are densely populated. (vi) In Equatorial region rainfall is heavy—on an average about 200 cm. (vii) The monsoon winds bring in heavy rainfall during winter. (viii) Rainfall being sufficient, agriculture in Monsoon region is well developed. (ix) Due to hot weather in desert regions dry grass and bushes of thorny plants grow up. (x) Most of the people of Tropical grassland regions lead nomadic life even today

[শুদ্ধ বাক্যের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও এবং ভুল বাক্যের পাশে ক্রশ (x) চিহ্ন দাওঃ (i) চিরতুষারাবৃত ভূমিতে কোনো প্রাণী বাস করিতে পারে না বা কোনো উদ্ভিদ জন্মে না। (ii) আর্দ্র গ্রীষ্মকাল মেরুদেশীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। (iii) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। (iv) অর্থনৈতিক বিচারে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে একটি উন্নত অঞ্চল বলা যায় না। (v) ক্রান্তীয় অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব অধিক। (vi) নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যধিক—গড়ে প্রায় ২০০ সে. মি.। (vii) মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সাধারণতঃ শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। (viii) বৃষ্টিপাতের অভাব না থাকায় মৌসুমী অঞ্চলে কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। (ix) মরুভূমি অঞ্চলে উষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান থাকায় শুষ্ক তৃণ ও কাঁটাগাছের ঝোপ জন্মে। (x) উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে এখনও যাযাবর জীবন যাপন করে।]

চতুর্থ অধ্যায়

সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(Meaning and Nature of Resources)

সম্পদ (Resource) মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অবলম্বন। সম্পদহীন দেশের পক্ষে উন্নতিলাভ করা যেমন কঠিন আবার সম্পদশালী দেশের পক্ষে উন্নতিলাভ করা তেমনি সহজ। সম্পদশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্পদহীন নেপালের অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনা হইতেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্নভাবে আলোচনা করিয়াছেন। **প্রত্যেকে তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে বিচার** করিয়াছেন। পূর্বে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্থূল এবং তাহারা শুধুমাত্র প্রকৃতিদত্ত সামগ্রী ভিন্ন আর কোনো কিছুকেই সম্পদের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিত না। তাহাছাড়া সম্পদের কার্যকারিতা ও সম্পদের সংরক্ষণ সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

সম্পদের সংজ্ঞা
(Resources Defined)

বর্তমানে সম্পদ বলিতে কোনো জিনিস বা বস্তুকে বুঝায় না। কোনো জিনিস বা বস্তু যে কার্য (function) করিতে পারে তাহাই সম্পদ এবং এই কার্যের লক্ষ্য হইল মানুষের অভাব মোচন করা। সুতরাং সম্পদ নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উপায় মাত্র। এই লক্ষ্য হইল মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক চাহিদা মিটানো। কোনো জিনিসকে সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে হইলে প্রথমতঃ উহার উপযোগিতা (utility) থাকা চাই এবং দ্বিতীয়তঃ উহাকে মানুষের অভাব মোচনের কার্য করিতে হইবে।* গুজরাটের কাম্বে আঙ্কলেশ্বর ও কালোলের মাটির নীচে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তৈল সঞ্চিত ছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভারতের মানুষ ঐ তৈলের সন্ধান পায় নাই এবং উহা আমাদের কোনো কাজে লাগে নাই। ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের প্রচেষ্টায় এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় অল্পদিন পূর্বে ঐ সকল স্থানে তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই তৈল উত্তোলিত হইয়া নানা কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে ; অর্থাৎ ঐ তৈল সম্পদে পরিণত হইয়াছে। মোট কথা, কোনো জিনিসের কার্যকারিতাই উহাকে সম্পদে পরিণত করে। তৈল সম্পদ নহে, তৈলের কার্যকারিতাই সম্পদ।

* The word 'resource' does not refer to a thing or substance but to a function which a thing or a substance may perform or to an operation in which it may take part, mainly, the function or operation of attaining a given end such as satisfying a want. —*E. W. Zimmermann.*

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Resources)

পার্থিব সম্পদগুলিকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) জৈব সম্পদ ও (২) অ-জৈব সম্পদ।

(১) জৈব সম্পদ (Organic Resources)—বিভিন্ন জীবজন্তু ও প্রাণী এবং প্রাকৃতিক উদ্ভিদ দ্বারা জৈব সম্পদ তৈয়ারি হয়। মানুষ, পশুপক্ষী, বনভূমির কাঠ, বন্যপ্রাণী, পশুচারণ-ক্ষেত্র, মৎস্যক্ষেত্র প্রভৃতি জৈব সম্পদ।

(২) অ-জৈব সম্পদ (Inorganic Resources)—যে সকল সম্পদ পৃথিবীর উপাদানরূপে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে—যেগুলি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করে, তাহাদিগকে অ-জৈব সম্পদ বলে। খনিজ দ্রব্য, গৃহ-নির্মাণের প্রস্তরখণ্ড, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উপাদান-সমূহ, জল প্রভৃতি অ-জৈব সম্পদ।

যে সকল জৈব ও অ-জৈব সম্পদ ব্যবহারের ফলে ফুরাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, উহাদিগকে **প্রবহমান বা অবাধ বা অফুরন্ত সম্পদ (Flow or Inexhaustible Resources)** বলে। যেমন, বাতাস, সূর্যকিরণ, বালুমাটি প্রভৃতি। যে সকল সম্পদ ব্যবহারে কমিয়া গেলেও ব্যবহারশেষে পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া পূরণ হইয়া যায় উহা-দিগকে **পুনর্ভব সম্পদ (Renewable Resources)** বলে। যেমন, বনভূমির কাঠ, কূপের জল, পশুচারণ ক্ষেত্রের ঘাস ইত্যাদি। যে সম্পদ ব্যবহারের মধ্য দিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, উহাদিগকে **সঞ্চিত বা গচ্ছিত বা অ-পুনর্ভব সম্পদ (Fund or Non-Renewable Resources)** বলে। যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য।

অধিকারভেদের তারতম্য অনুসারে সম্পদকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) ব্যক্তিগত সম্পদ (Individual or Personal Resources)—যে পার্থিব সম্পদ কোনো একজন ব্যক্তির নিজস্ব, উহাকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। যেমন, জমি, বাড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি, চরিত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

(২) জাতীয় সম্পদ (National Resources)—কোনো দেশের প্রতিটি নাগরিকের সম্পত্তির সমষ্টি লইয়া জাতীয় সম্পদ গঠিত হয়। উহার সঙ্গে দেশের বনজ, খনিজ ও কৃষিজাত সম্পদ, জলবায়ু, মৃত্তিকা, কলকারখানা, রেলপথ, পরিকল্পনা, সরকার প্রভৃতিকে সমষ্টিগতভাবে জাতীয় সম্পদ বলা হয়।

(৩) পার্থিব সম্পদ (World Resources)—পৃথিবীর সকল দেশের সম্পদের সমষ্টিকে পার্থিব সম্পদ বলে।

ক্রমবর্ধমান সম্পদ চেতনা
(Growing Resource consciousness)

বর্তমান যুগে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ক্রমশঃই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। সম্পদের সংজ্ঞার পরিধি অনেক বিস্তৃত হইয়াছে। বর্তমান যুগের মানুষ সম্পদ সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়াছে। কারণ, সম্পদ মানুষের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ। কি যুদ্ধের সময়ে, কি শান্তির সময়ে, মানুষের ভাগ্য

বহুলাংশে সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সম্পদ সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ নূতন না হইলেও সমসাময়িককালে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে আমরা সম্পদ-চেতনার নূতন ধারা লক্ষ্য করি। এই নূতন সম্পদ-চেতনার (New Resource consciousness) ধারা বুঝিতে হইলে গত দুইশত বৎসরে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার যে বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অনুধাবন করিতে হইবে।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ (অন্ততঃ অধিকাংশ) দাস, ভূমিদাস (Serf) বা অধীনস্থ প্রজা হিসাবে নানরূপ বাধা-নিষেধের কঠিন শৃঙ্খলের মধ্যে বাস করিয়াছে।

তারপর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশ-সমূহে এক পরিবর্তনের জোয়ার আসে। পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিবাসিগণ নূতন নূতন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করে। শক্তিচালিত বৃহদাকার কলকারখানার দ্রুত প্রসার ঘটিতে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের নূতন ও অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহার হইতে থাকে। ব্যক্তির ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতে থাকে; বিবর্তন (evolution) ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া এতদিনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক নিগড় হইতে এই মুক্তি অবাধ বাণিজ্যাধিকার ও স্বাধীন শিল্পোদ্যোগের (Free Enterprise system) মধ্যে প্রকাশ পায়। ইহার ফলে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতে, বিশেষ করিয়া ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহে মানুষের কর্মশক্তির ব্যাপক ও বিপুল স্ফূর্তি ঘটে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও তাহার ফলে জীবনযাত্রার মানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। আবার শিল্পোদ্যোগ-ব্যবস্থায় এই সাফল্যের ফলে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক ও সরকারী বাধানিষেধের অপসারণের ফলেই সম্ভব হইয়াছে ; ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বাণিজ্য ও মুনাফা অর্জনের অবাধ অধিকার থাকিলেই সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হইবে অর্থাৎ অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়াই ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়া থাকে।

এই মতাদর্শ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চল-সমূহের অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) সর্বপ্রথম অবাধ বাণিজ্য নীতির এই মতাদর্শ খণ্ডন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থ অনুসরণ করিলেই সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না ; জনস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সচেতন সরকারী নীতির (Public Policy) প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। পিগু ও আরও অনেকে মার্শালের এই মত সমর্থন করেন। পরবর্তিকালে কিন্স্ এই মত আরও জোরের সহিত প্রচার করেন।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থের সহিত সরকারের যে সকল বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে, দেশের সম্পদ—বিশেষ করিয়া মৃত্তিকা, জল, অরণ্য, শক্তিসম্পদ, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি মৌলিক সম্পদের সংরক্ষণ তাহাদের অন্যতম। ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। তাহার দৃষ্টি বর্তমান অথবা নিকট ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একশত বা দুইশত বৎসর পরে দেশের কয়লা ফুরাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং

থাকিলে এখন হইতে কয়লাসম্পদ সংরক্ষণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; ইহা লইয়া কোনো কয়লাখনির মালিক বা কয়লা-ব্যবসায়ী মাথা ঘামাইবে না। যে কোনো প্রকারে বর্তমানে লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করাই তাহার লক্ষ্য। এইজন্য দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকারী হস্তক্ষেপ আবশ্যক হইয়া পড়ে। জনগণের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নতির গতি অব্যাহত রাখার জন্য সরকার কয়লা, মৃত্তিকা প্রভৃতি সম্পদ সংরক্ষণের জন্য অগ্রসর হন।

সম্পদ-সৃষ্টির উপাদানসমূহ
(Resource creating Factors)

সম্পদ ব্যক্তিগত বা সামাজিক মঙ্গলসাধনের উপায়মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিলে প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতিকে সম্পদের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকটিই একক বা যৌথভাবে ব্যক্তিগত বা সামাজিক মঙ্গলসাধনের উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়। নিম্নে সম্পদের এই তিনটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হইল:

(১) প্রকৃতি—প্রকৃতি সম্পদের বিপুল ভান্ডার এবং সম্পদ-সৃষ্টির বিশিষ্ট উপাদান। অধ্যাপক জিমারম্যান বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিদত্ত যে সকল সামগ্রী হইতে মানুষ নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া প্রাণী-অস্তিত্ব মাত্র রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, উহাদিগকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। এই সংজ্ঞা অনুসারে সূর্যকিরণ, বায়ু, জল, বনের ফলমূল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ। কারণ, এইগুলি মানুষ অনায়াসেই প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়া থাকে। মানুষ ছাড়া পশুপক্ষীও এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু এই জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে সম্পদ সৃজনে প্রকৃতির যে দান তাহা প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে বহুগুণ অধিক। কারণ, অধিকাংশ প্রাকৃতিক উপাদান বা সামগ্রী নিরপেক্ষ উপাদান (Neutral Stuff) রূপে প্রকৃতিতে অবস্থান করে ; প্রকৃতিতে অবস্থিত এই সকল নিরপেক্ষ উপাদান যখন মানুষ তাহার প্রচেষ্টায়, উদ্ভাবনী ক্ষমতায় ও কারিগরি দক্ষতায় স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারে তখনই ঐগুলি সম্পদে পরিণত হয়। সম্পদ হিসাবে প্রকৃতির এই যে কার্যকারিতা তাহা প্রকৃতপক্ষে মানুষের অভাব, কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভরশীল। কয়লা প্রাকৃতিক পদার্থ ; কিন্তু খনি হইতে এই কয়লা উত্তোলন করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না জ্বালানো হয়, ততক্ষণ উহা সম্পদ রূপে গণ্য হয় না। সুতরাং মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়া কয়লাকে সম্পদে পরিণত করা যায় না। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রকৃতিই সম্পদ সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ। মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করিয়াই মানুষ সম্পদের সৃষ্টি করে

(২) মানুষ—মানুষ নিজেই সম্পদ—সম্পদের স্রষ্টা ও ভোগকর্তা। মানুষ সম্পদ-সৃষ্টির অন্যতম উপাদান। শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টার সাহায্যে মানুষ নিরন্তর সম্পদ সৃষ্টি করিতেছে। মানুষ সংস্কৃতির স্রষ্টা। সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাহায্যে মানুষ তাহার প্রচেষ্টাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে ; আবার এই সংস্কৃতির সাহায্যেই মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক প্রতিরোধ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে। স্বীয় সংস্কৃতির সাহায্যে মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রকৃতির নিরপেক্ষ উপাদান-গুলিকে নিরন্তর সম্পদে পরিণত করিয়া চলিয়াছে। **সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষই** হইল সর্বাপেক্ষা গতিশীল উপাদান।

(৩) সংস্কৃতি—সংস্কৃতি ভিন্ন মানুষের কাজ করিবার এবং উৎপাদন করিবার ক্ষমতা খুবই সীমিত। ব্যক্তিগত ও সামাজিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির সাহায্য, নির্দেশ ও সম্মতি লইয়া মানুষ যে সকল উপায় ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহার সমষ্টিকেই সংস্কৃতি বলে। মানুষের সংস্কৃতির উপাদান বস্তু-সাপেক্ষ (Tangible) অথবা বস্তুনিরপেক্ষ (Intangible) উভয়ই হইতে পারে। কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, পরিবহণ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বস্তুসাপেক্ষ উপাদান এবং জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অভিজ্ঞতা, সভ্য আচরণ, সুশৃংখল সমাজ-জীবন, ন্যায় বিচার, আদিম পশুপ্রবৃত্তির দমন, সংঘর্ষের পরিবর্তে সহযোগিতা প্রভৃতি বস্তুনিরপেক্ষ উপাদান লইয়া মানুষের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃতির এই সকল বিভিন্ন উপাদান কখনও বা সম্পদ হিসাবে আবার কখনও বা সম্পদ সৃষ্টির উপাদান হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সম্পদ সৃষ্টির গতিপ্রকৃতি মানুষের সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। মানুষের সংস্কৃতি সর্বদাই তাহার কল্যাণসাধনে নিয়োজিত হয়। **তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংস্কৃতি প্রকৃতির ক্ষেত্র ব্যতীত সম্পদ উৎপাদনে** কখনোই ব্যবহৃত হইতে পারে না।

সুতরাং প্রকৃতি, মানুষ ও তাহার সংস্কৃতি—এই তিনটির মিলিত প্রচেষ্টায়ই সম্পদ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, কৃষিজাত সম্পদ উৎপাদনে **জমি, জমির মৃত্তিকা, জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান (প্রকৃতি), কৃষিকার্যে নিযুক্ত কৃষক ও ক্ষেতমজুর মানবিক উপাদান** (মানুষ) এবং কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক দ্রব্য, বীজ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উপাদান (সংস্কৃতি)। **এই তিনটির মিলিত প্রচেষ্টায়ই কৃষিজাত সম্পদ সৃষ্টি হইয়া থাকে।** একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে।

ব্রাজিলের মিনাস্ গেরাইস্ (Minas Geraes) অঞ্চলে লৌহ আকরিকের যে বিশাল ভাণ্ডার রহিয়াছে তাহা বহুদিন হইতেই মানুষের জানা ছিল। মধ্যে মধ্যে উহা ব্যবহারের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত উহা খনি হইতে তোলা হয় নাই। মাত্র কয়েক বৎসর হইল এই লৌহ ভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করিয়া একটি আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠায় ঐ লৌহ ভাণ্ডার সম্পদে পরিণত হইয়াছে। ব্রাজিলের লৌহ আকরিকের মত প্রাকৃতিক সামগ্রীর সম্পদে রূপান্তর নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভর করিয়াছে:

(১) মূলধন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটি আধুনিক ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য ঋণ, কারিগর ও যন্ত্রপাতি ব্রাজিলে সরবরাহ করা হয়।

(২) জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা—স্থানীয় অঞ্চল মনুষ্যবাসের উপযোগী করিবার জন্য জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৩) যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন—ভিক্টোরিয়া বন্দর পর্যন্ত রেলপথের সংস্কার ও যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হয়।

(৪) শ্রমিক—শ্রমিকের সামর্থ্য ও কাজ করিবার ইচ্ছা বাড়াইবার জন্য শ্রমিক-আইন, মজুরিনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি—ইস্পাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানো হয়।

(৬) **বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি**—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ব্রাজিলের লৌহ আকরিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

(৭) **সরকারী নীতি**—ব্রাজিল সরকার দেশে ইস্পাতশিল্পের উন্নতিতে আগ্রহী ছিলেন এবং এই শিল্পকে সাহায্য (subsidy) দিয়াছিলেন।

(৮) **আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা (technology)**—কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফলেই লৌহ আকরিক উত্তোলন, ধাতব লৌহ নিষ্কাশন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, কোনো সম্পদ **প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি** এই তিনটি উপাদানের যৌথ ক্রিয়াকলাপের ফলেই উৎপন্ন হয়। এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষ মৌলিক উপাদান। প্রাকৃতিক বস্তু না থাকিলে সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব নহে, আবার মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়া প্রাকৃতিক বস্তু সম্পদে পরিণত হইতে পারে না। মানুষ ও প্রাকৃতিক বস্তু থাকিলেই প্রাকৃতিক বস্তু সম্পদে রূপান্তরিত হয় না—উহার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, কারিগরি বিদ্যা, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, সাংগঠনিক দক্ষতা, সরকারী নীতি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সম্পদ। সুতরাং প্রকৃতি, মানুষ ও তাহার সংস্কৃতি—এই তিনটির মিলিত প্রচেষ্টায়ই সম্পদ সৃষ্টি হয়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের গতিশীল ঘাত-প্রতিঘাতের (Dynamic Interaction) মধ্য দিয়াই কোনো সামগ্রী সম্পদে পরিণত হয়।

সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব

(Functional or Operational theory of Resources)

পূর্বে বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সম্পদ সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণাও মানুষ পোষণ করিত। সম্পদ বলিতে মানুষ বুঝিত কোনো স্থূল পদার্থকে, যথা, কয়লা, লৌহ আকরিক, খনিজ তৈল প্রভৃতি। কিন্তু সম্পদ বলিতে কি ইহাই বুঝা উচিত? যে পদার্থ মানুষের কোনো প্রয়োজনে লাগে না, মানুষের ক্ষুধা, আকাঙ্ক্ষা ও অভাব মিটাইতে পারে না, যে পদার্থ মানুষের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নহে, তাহাকে আমরা কখনই সম্পদ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না।

বর্তমান যুগে সম্পদ বলিতে বুঝি সম্পদের কার্যকারিতা। অর্থাৎ কোনো পদার্থ যখনই মানুষের কাজে লাগে, তখনই উহা সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। কয়লা পদার্থ হইলেও যতক্ষণ উহা মানুষের কোনো কাজে না আসিবে, ততক্ষণ উহা সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে না। সুতরাং কয়লা সম্পদ নহে, উহার **কার্যকারিতাই** সম্পদ। পদার্থের যে কার্যকারিতা মানুষের কোনো অভাবমোচনে নিয়োজিত করা যায়, উহাকেই সম্পদ বলা হয়।

সম্পদের এই **কার্যকারিতা** যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে। গতিশীল জগতে এই কার্যকারিতাও গতিশীল। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পদার্থকে বেশী করিয়া নিজের প্রয়োজনে লাগাইতে শিখিয়াছে। পূর্বে মানুষ খনিজ

তৈল হইতে পেট্রোল প্রস্তুত করিতে পারিত না ; তখন খনিজ তৈল সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত না। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে খনিজ তৈল হইতে শুধু পেট্রোল প্রস্তুত হয় না, বহুবিধ উপজাত দ্রব্যও প্রস্তুত হয়।

মানবসভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হইবার পর দীর্ঘদিন মানুষের সহিত অন্যান্য পশুর আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য ছিল না। এই স্তরের মানুষকে আমরা পশুমানব (man on animal level) আখ্যা দিতে পারি। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ পশুর স্তর অতিক্রম করে। পরবর্তী এই স্তরের মানুষকে আমরা সভ্যমানুষ (man on supra-animal or human level) বলিব। সম্পদ সম্বন্ধে **স্পষ্ট ধারণা** করিতে হইলে সভ্য মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক বুঝিতে হইবে।

পশু মানুষ তাহার পাশবিক অভাব (creature-wants) মিটাইবার জন্য স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে (Natural capacities) প্রকৃতি হইতে জীবনধারণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিত। সেইসংগে সে প্রকৃতির অন্তর্গত ক্ষতিকর অবস্থা ও শক্তিসমূহের (যথা, ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, মহামারী, বন্যপশুর আক্রমণ ইত্যাদির) সম্মুখীন হইত। প্রকৃতির যে সকল উপাদানে পশু-মানব তাহার পাশবিক চাহিদা মিটাইত, তাহাদিগকে **প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources)** এবং প্রকৃতির যে সকল উপাদান তাহার ক্ষতি অথবা বাধা সৃষ্টি করিত, তাহাদিগকে **প্রাকৃতিক বাধা (Natural resistances)** বলা হয়। অভাবপূরণ শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে না; প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক বাধা এই দুই-এর উপর কতটা অভাব পূরণ করা যাইবে তাহার পরিমাণ নির্ভর করে। পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থ, শক্তি ইত্যাদি পশু-মানুষের কোনো উপকারে আসে না, আবার অপকারও করে না। অর্থাৎ ঐগুলি তাহার নিকট **নিরপেক্ষ সামগ্রী (Neutral Stuff)**।

অন্যান্য পশুর ন্যায় পশু-মানুষও জীবজগতের নিয়মের অধীন ছিল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেকে **নিষ্ক্রিয়ভাবে খাপ খাওয়াইয়া (Passive adaptation)** লইত। অন্যান্য পশুর ন্যায় পশু-মানুষের কলাকৌশলও ছিল গণ-কলাকৌশল (Genus technique); অর্থাৎ সমগ্র পশু-মানবসমাজ অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে একই কলাকৌশল অবলম্বন করিত এবং এই কলাকৌশল তাহার দৈহিক গঠন ও জীবনধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই কলাকৌশলের পরিবর্তন করা কোনো পশু-মানুষের একক সাধ্যের অতীত ছিল। পরিবেশের চাপে ধীরে ধীরে ইহার পরিবর্তন হইত। এইরূপে নিজস্ব ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় এবং কোনোরূপ সংস্কৃতির সহায়তা না পাওয়ায় প্রকৃতির দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে পশু-মানুষ এই পৃথিবীতে কোনোক্রমে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল।

অতঃপর প্রায় অর্ধলক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষ ক্রমে ক্রমে পরিবেশের সহিত নিজের ইচ্ছানুযায়ী খাপ খাওয়াইবার (Active Adaptation) ক্ষমতা অর্জন করিয়া জীব-জগতে স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী হইল। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবার সংগে সংগে তাহার সামনের পা দুইটি দেহের ভার বহনের

কাজ হইতে মুক্ত হইয়া অন্য জিনিস ধরিবার এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিল। হাত, মস্তিষ্ক, অতুলনীয় প্রকাশক্ষমতা সম্পন্ন বাক্‌যন্ত্র ও দৈহিক শক্তির সাহায্যে মানুষের সংস্কৃতি সৃষ্টির অভিযান আরম্ভ হইল। মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ক্রমেই অধিকতর সম্পদ ছিনাইয়া লইতে লাগিল। এখন সে প্রকৃতিকে অনুকরণ করিয়া নূতন সম্পদ সৃষ্টি করিতেছে (যথা, কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম রবার ইত্যাদি) এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতিসাধন করিতেছে (যথা, কয়লা ধৌত করিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লাকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লায় পরিণত করা ইত্যাদি)।

মানুষ তাহার অতুলনীয় প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে ; ভাষা দ্বারা সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও জটিল উচ্চস্তরের ভাবধারা পর্যন্ত বিনিময়ে সক্ষম। ক্রমশঃ ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া হইয়াছে, ছাপাখানার আবিষ্কার হইয়াছে। এইভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান স্থায়িভাবে সংরক্ষণের, এক যুগ হইতে অন্য যুগে এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া কলাকৌশলের উন্নতি হইতেছে এবং হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া-ওঠা সংস্কৃতি প্রকৃতির রূপ পাল্টাইয়া দিতেছে। মানুষের কলাকৌশল এখন আর নিছক অপরিবর্তনীয় গণ-কলাকৌশল নহে। সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত-প্রচেষ্টায় মানুষ নিত্য নূতন কলাকৌশল উদ্ভাবন করিতেছে। নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন কলাকৌশলসমূহ দ্রুত বাতিল হইয়া যাইতেছে। এই সকল নূতন কলাকৌশলের সাহায্যে সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

মানুষের চাহিদার উপর সম্পদের কার্যকারিতা নির্ভরশীল। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থের রূপ পরিবর্তন করিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। মোটরগাড়ির টায়ার নির্মাণের জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ভাল্‌কানিজেশন। ইহার ফলে রবারের কার্যকারিতা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সম্পদ-সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা

(Concept of Conservation of Resources)

সম্পদ ও ইহার ব্যবহার লইয়া পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে সম্পদ-সংরক্ষণের সমস্যা লইয়াও আলোচনা করিতে হইবে। কারণ, সংরক্ষণ বলিতে সম্পদের উপযুক্ত হারে উৎপাদন ও ব্যবহার বুঝায়। সংরক্ষণ সমস্যার মধ্য দিয়া ব্যক্তি-স্বার্থের সহিত সমষ্টি-স্বার্থের সংঘাত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

সংরক্ষণের অর্থ স্থান ও কাল অনুযায়ী পরিবর্তনশীলতা। এইজন্য ইহার কোনো একটি চরম সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সংরক্ষণের দুই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। সংরক্ষণ বলিতে কম উৎপাদন বা কম ব্যবহার বুঝায়। আবার সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় অপচয় নিবারণ। প্রথম অর্থে সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় ব্যবহারে সংযম অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের ত্যাগস্বীকার। সংরক্ষণের দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী অপচয়-নিবারণের অর্থ হইল উৎপাদনে দক্ষতা-বৃদ্ধি। দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন খরচ কম হইবে, খরচ কম হইলে স্বভাবতঃই বাজারদরও কম হইবে ; ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

সম্পদের উৎপাদনবৃদ্ধি নিশ্চয়ই সম্পদ-সংরক্ষণ নয়। সংরক্ষণের আরও বহু সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু সেইগুলি মোটেই স্পষ্ট নয়।

অনেকে সংরক্ষণ বলিতে মিতব্যয়িতা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু সংরক্ষণ ও মিতব্যয়িতা শব্দ দুইটি সমার্থক নহে। সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় কম করিয়া ব্যবহার যাহার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে অপেক্ষাকৃত বেশী সম্পদ মজুত থাকিবে। কিন্তু মিতব্যয়িতা বলিতে যে স্বভাবতঃই কম করিয়া ব্যবহার বুঝাইবে তাহা নহে। মিতব্যয়িতা বলিতে বুঝায় যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া যথাসম্ভব অধিক ফললাভ। অনেক সময় মিতব্যয়িতার ফলে সংরক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু তাহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিবার কোনো কারণ নাই যে, সংরক্ষণ ও মিতব্যয়িতা একই অর্থ প্রকাশ করে। যেখানে অপচয় নিবারণ অর্থাৎ মিতব্যয়িতার ফলে উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায়, সেখানে মিতব্যয়িতা সংরক্ষণের সূচনা করে না।

সংরক্ষণ বলিতে কেবলমাত্র সম্পদের উৎপাদন হ্রাস করা বুঝায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোনো কোনো সময় মিতব্যয়িতার ফলে সংরক্ষণ হইতে পারে। এই মিতব্যয়িতা বা অপচয় নিবারণ উৎপাদনে হইতে পারে, আবার ব্যবহার বা ভোগেও হইতে পারে। ব্যবহারে মিতব্যয়িতা বলিতে কেবল কম ব্যবহার বুঝায় না, বিচার-বিবেচনার সহিত ব্যবহার বুঝায়। কিন্তু বিচার-বিবেচনার সহিত সম্পদ ভোগ করিতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রতি নজর রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, কোনো বিশেষ সম্পদ প্রধানতঃ যে সকল কাজের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী শুধুমাত্র সেই সকল কাজে উহা ব্যবহার করিতে হইবে। খনিজ তৈল উত্তাপ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু উত্তাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার না করিয়া মোটরগাড়ি, বিমানপোত প্রভৃতি চালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত সম্পদের স্থলে যথাসম্ভব প্রবহমান সম্পদ ব্যবহার করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কয়লা ও খনিজ তৈলের স্থলে যথাসম্ভব জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে হইবে।

সম্পদ সংরক্ষণ করিতে হইলে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ লইয়া বিবেচনা করিলে চলিবে না, শ্রম, মূলধন এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, একটি বিশেষ অনুপাতে শ্রম, মূলধন ও জমির (অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের) সমন্বয়ের ফলেই উৎপাদন সংঘটিত হয় এবং এই অনুপাতের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। সুতরাং সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের ফলে যদি প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান হ্রাস পায়, তাহা হইলে শ্রম এবং মূলধনের চাহিদা এবং ব্যবহার সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সংরক্ষণের সমস্যা বিবেচনা করিবার সময় উৎপাদনের সকল উপাদান একসঙ্গে লইয়া বিবেচনা করিতে হয়।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, সকল প্রকার সম্পদ-সংরক্ষণে একই নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বন করিলে চলিবে না। সম্পদের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণের নিয়ম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। কারিগরি বিদ্যার দ্রুত উন্নতির ফলে নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইতেছে, সম্পদের নূতন ব্যবহারের প্রচলন হইতেছে এবং নূতন উৎস হইতে প্রচলিত সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা হইতেছে ; ফলে বিভিন্ন সম্পদের গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতেছে। সাধারণ মাটি হইতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন

যদি সহজসাধ্য হয় তাহা হইলে অ্যালুমিনিয়াম সংরক্ষণকে আর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হইবে? আণবিক শক্তি উৎপাদন সহজসাধ্য ও সুলভ হইলে কয়লা ও খনিজ তৈলের গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটিবে। এই সকল পরিবর্তনের জন্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে কোনো বাধানিষেধ বা নিয়ম প্রণয়ন করা কঠিন।

ব্যবহারের ফলে সম্পদের পরিমাণ, বিশেষ করিয়া সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ কমিয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সম্পদের ব্যবহারোপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়া অথবা পরিবর্ত সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়া উহা আবার কিয়ৎপরিমাণ পূরণ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা সম্পদ হিসাবে গণ্য করিলে আমরা উপরিউক্ত ঘটনা এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারি যে, ক্রমেই সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক সম্পদ বস্তুগত সম্পদের স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে যেটুকু সম্পদ বাঁচে তাহা বর্ধিত জনসংখ্যার ব্যবহারের ফলে খরচ হইয়া যায়। এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক উন্নতির দ্বারা সম্পদ-সংরক্ষণের কোনো সাহায্য হয় না। যদি সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহা হইলেই সম্পদ-সংরক্ষণ সম্ভব হয়।

পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক বিনাশ ঘটে যুদ্ধের ফলে। বিশেষ করিয়া আধুনিক সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ অপরিমেয় সম্পদ ধ্বংসের প্রধান কারণ। সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণের সমস্ত রকমের ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হইল পৃথিবীতে চিরকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধের ব্যবস্থা করা এবং শান্তি চিরস্থায়ী করা।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. What is the meaning and nature of "Resources"?

[সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি কি?]

উঃ। 'সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি' (৬১ পৃঃ) লিখ।

2. What are the factors for creation of resources? Give your answer with an example.

[সম্পদ-সৃষ্টির উপাদানসমূহ কি কি? একটি উদাহরণের সাহায্যে উত্তর দাও।]

উঃ। 'সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ' (৬৪-৬৬ পৃঃ) লিখ।

3. Analyse the concept of functional theory of resources with examples. [H. S. Examination, 1984]

[যথাযথ উদাহরণ সহ সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।]

উঃ। 'সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব' (৬৬-৬৮ পৃঃ) লিখ।

4. Define and classify resources.

[Tripura H. S. Examination, 1981]

Explain the functional theory of resources.

[Specimen Question, 1978]

[সম্পদের সংজ্ঞা নির্ণয় কর ও উহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর। সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।]

উঃ। 'সম্পদের সংজ্ঞা' (৬১ পৃঃ), 'সম্পদের শ্রেণীবিভাগ' (৬২ পৃঃ) ও 'সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব' (৬৬-৬৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. Define and classify resources. Analyse the functional theory of resources and indicate the modern trend in resource development. **[Specimen Question, 1980]**

[সম্পদের সংজ্ঞা লিখ ও উহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর। সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর এবং সম্পদ বিকাশের আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

উঃ। 'সম্পদের সংজ্ঞা' (৬১ পৃঃ), 'সম্পদের শ্রেণীবিভাগ' (৬২ পৃঃ), 'সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব' (৬৬-৬৮ পৃঃ) এবং 'ক্রমবর্ধমান সম্পদ-চেতনা' (৬২-৬৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. What are the resource-creating factors? Explain the concept of conservation of resources. **[Specimen Question, 1980]**

[সম্পদ-সৃষ্টির উপাদানসমূহ কি কি ? সম্পদ-সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা ব্যাখ্যা কর।]

উঃ। 'সম্পদ-সৃষ্টির উপাদানসমূহ' (৬৪-৬৬ পৃঃ) এবং 'সম্পদ-সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা' (৬৮-৭০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. What is meant by 'resource'? Is there any need for its conservation in the economic development of any country? Illustrate your answer with suitable examples. **[H. S. Examination, 1978]**

[সম্পদ বলিতে কি বুঝায় ? কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সম্পদ-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? উপযুক্ত উদাহরণ সহ আলোচনা কর।]

উঃ। 'সম্পদের সংজ্ঞা' (৬১ পৃঃ) এবং 'সম্পদ-সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা' (৬৮-৭০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

8. Define 'resource'. What are the causes for the growing emphasis on the development of resources? What do you understand by the term conservation of resources? **[H. S. Examination, 1985]**

(সম্পদের সংজ্ঞা দাও। সম্পদের উৎকর্ষ সাধনের উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বদানের কারণ কি ? সম্পদের সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝ ?)

উঃ 'সম্পদের সংজ্ঞা' (৬১ পঃ), 'সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব' (৬৬—৬৮ পঃ) এবং 'সম্পদ-সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা' (৬৮—৭০ পঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. "The fundamental issue of conservation is the proper rate of exploitation and utilization of resources." (Zimmermann)—Discuss. **[C. U. B. Com. 1965]**

["সম্পদের সংগ্রহ ও ব্যবহারের সঠিক হারই সংরক্ষণের প্রধান আলোচ্য বিষয়। (জিমারম্যান)—আলোচনা কর]

উঃ। 'সম্পদ-সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা' (৬৮-৭০ পঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. What are the resource creating factors? [Specimen Question, 1980 & 1981]

['সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ' কি কি ?]

উঃ। 'সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ' (৬৪-৬৬ পৃঃ) হইতে শুধুমাত্র উপাদান-সমূহের নাম লিখ।

2. Do you consider the iron-ore deposit of Minas Geraes as resource? Give reasons for your answer.

[তুমি কি মনে কর মিনাস্ গেরায়েসের সঞ্চিত লৌহ আকরিক সম্পদ ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।]

উঃ। 'সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ' (৬৪-৬৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

3. Write short notes on : (a) Organic Resources, (w) Inorganic Resources, (c) Functional Theory of resources.

[H. S. Examination, 1981]

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ (ক) জৈব সম্পদ, (খ) অজৈব সম্পদ, (গ) সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব।]

উঃ। 'সম্পদের শ্রেণীবিভাগ' (৬২ পৃঃ) হইতে (ক) ও (খ)-এর উত্তর এবং (গ)-এর উত্তরের জন্য 'সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব' (৬৬-৬৮ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

C. Objective Questions

1. Write correct answers from the following statements :

(i) Oil is not resource, but its functions/supply is resource.

(ii) Resources not exhausted by their use/supply are called Flow Resources.

(iii) Hydro-electricity is a fund resource/flow resource.

[H. S. Examination, 1980]

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখঃ

(*i*) তৈল সম্পদ নহে, কিন্তু ইহার কার্যকারিতা/সরবরাহই সম্পদ। (*ii*) যে সম্পদ ব্যবহারের/সরবরাহের ফলে ফুরাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, উহাদিগকে প্রবহমান সম্পদ বলে। (*iii*) জলবিদ্যুৎ শক্তি একটি সঞ্চিত সম্পদ/প্রবহমান সম্পদ।]

2. Fill up the gaps with the appropriate words from the brackets :

(*i*) — refers to the resources which are there as element of the earth in the form of solid, liquid and gas and which are used by man directly or indirectly. (Animate resource/Inanimate resource) (*ii*) The resources which can be recouped after a reduction by consumption are called —. (flow or inexhaustible resources/fund resources) (*iii*) The worst destruction of resources in the world occurs as a result of — (war/earthquake).

[বন্ধনীর মধ্য হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছিয়া লইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ (*i*) যে সকল সম্পদ পৃথিবীর উপাদানরূপে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে এবং যেগুলি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করে তাহাদিগকে — বলে। (জৈব সম্পদ/অজৈব সম্পদ) (*ii*) যে সকল সম্পদ ব্যবহারে কমিয়া গেলেও ব্যবহারের শেষে পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া পূরণ হইয়া যায় তাহাদিগকে — বলে। (অবাধ বা অফুরন্ত সম্পদ/পুনর্ভব সম্পদ) (*iii*) পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক বিনাশ ঘটে — ফলে। (যুদ্ধের/ভূমিকম্পের)]

পঞ্চম অধ্যায়

মনুষ্য সম্পদ

(Human Resources)

মানুষের দ্বৈত ভূমিকা

(Dual Role of Man)

প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া নিজের চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য ঐগুলি ব্যবহার করে। শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই তাহা মানুষের ব্যবহার্য হয় না। ইহার সহিত মানুষের বুদ্ধি ও শ্রম যোগ করিলে তবেই ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। বুদ্ধিবলে মানুষ নূতন নূতন আবিষ্কারের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে নূতন নূতন কার্যে নিয়োজিত করিয়াছে ও করিতেছে। জমি প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু জমিতে বীজ বপন না করিলে ধান ও গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে না। আবার খনিজ সম্পদের আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে। নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা কয়লা শুধু শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে না, নানাবিধ উপজাত দ্রব্যাদি (আলকাতরা, পিচ, গ্যাস, অ্যামোনিয়া, স্যাকারিন প্রভৃতি) কয়লা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ও শ্রমের যোগাযোগ হইলেই ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। এইভাবে দেখা যায় যে, মানুষ নিজেই সম্পদ-উৎপাদনের একটি প্রধান অঙ্গ। অন্যদিকে উৎপাদিত সম্পদ মানুষই ভোগ করে। প্রকৃতির দান কৃষি-জমি হইতে মানুষ খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিয়া নিজেই তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং মানুষ একদিকে সম্পদ উৎপাদনের অঙ্গ, অন্যদিকে সম্পদের ভোগকর্তা। সম্পদ উৎপাদনে ও ব্যবহারে মানুষ এইভাবে দ্বৈত ভূমিকা (Dual Role) অবলম্বন করে।

ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে নিজের বুদ্ধিবলে ও কর্মপ্রচেষ্টায় নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত করিয়া বা আবিষ্কার করিয়া মানুষ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। সৃষ্টির আনন্দ ব্যবহারের আনন্দের চেয়ে কম নহে। নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে মানুষের শ্রমের লাঘব হওয়ায় অবসর বিনোদনের জন্য মানুষ ক্রমশঃই বেশী সময় পাইতে থাকে। অবসর সময়ে মানুষ চিত্তবিনোদন করিয়া, কলাচর্চা করিয়া ও শিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

মানুষ ও জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব

(Man-Land Ratio and Population Densities)

সম্পদ উৎপাদনে জমির দান অসামান্য। জমির সাহায্যে মানুষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে ও ভূগর্ভ হইতে খনিজ সম্পদ আহরণ করে। জমি হইতে এই সকল সম্পদ উৎপন্ন হয় বলিয়া জমির মোট পরিমাণ বেশী হইলেই সকল সময় বেশী সম্পদ উৎপন্ন হইবে না ; কারণ, সকল জমি মানুষের প্রয়োজনে আসে না। কানাডার তুন্দ্রা অঞ্চল, মিশরের মরু অঞ্চল সম্পদ উৎপাদনে মানুষকে সাহায্য করে না। অন্য-দিকে মানুষের কর্মক্ষমতা থাকিলেই সম্পদ উৎপন্ন হইবে না : প্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে

বিভিন্ন ভাবে ইহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। মানুষের কর্মদক্ষতা এবং জমির উৎপাদিকাশক্তির অনুপাতের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। জমির পরিমাণ লোকসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত হইলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হইবে ; অন্যদিকে লোকসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ বেশী হইলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য হইবে।

এখানে জমি বলিতে সমগ্র ভূমিভাগকেই বুঝাইবে না, শুধু কার্যকরী জমিকে বুঝাইবে। যে জমি হইতে মানুষ সম্পদ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাকেই কার্যকরী জমি বলা হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ উর্বর জমি থাকার জন্য ঐ দেশে ২২ই কোটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অন্যদিকে ব্রাজিলের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমান হইলেও, জমি অনুর্বর বলিয়া এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য এই দেশের মাত্র ১২ কোটি লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় নাই।

লোকবসতি-ঘনত্বের (Population Density) সংগে মানুষ ও জমির অনুপাতকে (Man-land ratio) কখনই একভাবে দেখা উচিত নহে। লোকবসতি-ঘনত্ব বলিতে আমরা বুঝি মোট জমি ও লোকসংখ্যার অনুপাত ; কিন্তু মানুষ ও জমির অনুপাত বলিতে আমরা বুঝি লোকসংখ্যার সংগে 'কার্যকরী জমি'-র অনুপাত। এক্ষেত্রে **কার্যকরী জমির সঙ্গে দেশের সমগ্র প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকেও অন্তর্ভুক্ত** করিতে হইবে। সাধারণতঃ যে জমিকে সম্পদ-উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় বা যে জমি মানুষের ব্যবহারে প্রয়োজন হয়, তাহাই কার্যকরী জমি। যেমন, মিশরের লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২৬ জন। কিন্তু এই দেশের মোট আয়তন হইতে বসতিহীন মরু অঞ্চল বাদ দিলে কার্যকরী জমির (নীলনদের উপত্যকা) পরিমাণ দাঁড়াইবে মাত্র ৩৪,৮৯৫ বর্গ-কিলোমিটার। এই কার্যকরী জমির সঙ্গে সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার অনুপাত প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৭৫০ জন। এক্ষেত্রে মিশরের প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতির ঘনত্ব ২৬ জন এবং মানুষ ও কার্যকরী জমির অনুপাত ৭৫০ জন। সুতরাং কোনো দেশের শুধু আয়তন ও লোকসংখ্যার বিচার করিয়াই সেই দেশকে অত্যধিক ঘনবসতিযুক্ত বা বিরলবসতিযুক্ত অঞ্চল বলা যায় না। কোনো দেশের মানুষ ও জমির অনুপাত বুঝিতে হইলে দেশের কার্যকরী জমি, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনক্ষম মানুষের সংখ্যার বিচার করিতে হইবে। অনেকে চীনদেশকে একটি অত্যধিক ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু চীনের জমির উর্বরতা ও কার্যকারিতা এবং চীনাদের অধ্যবসায় ও কর্মক্ষমতা বিচার করিলে দেখা যায়, আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে চীন মোটেই অত্যধিক বসতিযুক্ত দেশ নহে ; কার্যকরী জমির তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা অধিক নহে।

জমির কার্যকারিতা গতিশীল মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। সভ্যতার বিকাশের প্রথমার্ধে মানুষ জমি হইতে শুধু কৃষিজাত সম্পদ উৎপন্ন করিত এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিত। সেই সময়ে জমির কার্যকারিতা বলিতে শুধু জমি হইতে উৎপন্ন কৃষিজাত ও বনজ দ্রব্যকেই বুঝাইত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সংগে মানুষ জমির অভ্যন্তরস্থ খনিজ সম্পদ আহরণ করিতে শিখিল। বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য মানুষের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে শুরু করিল। এই সময় ভূমি

বলিতে ত্রিমাত্রিক ভূমি বুঝাইত। খনিজ দ্রব্য বিনিময় করিয়া মানুষ অন্য দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিত শুরু করিল। এইভাবে জমির কার্যকারিতারও পরিধি বিস্তৃত হইল। ব্রিটেন স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্যের সাহায্যে যত লোকের ভরণ-পোষণ করিতে পারে, খনিজ সম্পদ বিনিময় করিয়া ইহার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী লোকের সমৃদ্ধি লাভ করাইতে পারে। ইহাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের নিজেদের জমির উপরই শুধু স্থানীয় লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করিত না ; ইহাদের দখলীকৃত উপনিবেশসমূহের জমির কার্যকারিতাও এই সকল দেশের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিল। ব্রিটেনের ক্ষুদ্র ভূ-ভাগের উপর কিভাবে ৫½ কোটি লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইলে ব্রিটেনের সকল উপনিবেশের জমির কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। পূর্বে ভারতের জমিতে উৎপাদিত পাট, তুলা প্রভৃতি ব্রিটেনের শিল্পে নিয়োজিত হইত। ভারতের জমির অভ্যন্তরস্থ লৌহ আকরিক ব্রিটেনের ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইত। এখনও জিম্বাবোয়ের তাম্র ব্রিটেনের শিল্প-সমৃদ্ধির জন্যই ব্যবহৃত হয়। এইভাবে দেখা যায়, বর্তমান যুগে লোকসংখ্যা ও জমির অনুপাত (Man-land ratio) বুঝিতে হইলে স্থানীয় জমি হইতে প্রাপ্ত কৃষিজাত, বনজ ও খনিজ সম্পদের পরিমাণ, উপনিবেশের বা রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত অঞ্চলের জমির কার্যকারিতা প্রভৃতির সঙ্গে স্থানীয় লোকসংখ্যার অনুপাত বুঝিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জমির কার্যকারিতা বুঝিতে হইলে স্থানীয় জমির উৎপাদিকা-শক্তির সহিত এই দেশের রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত ফরমোসা, ফিলিপাইনস, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের জমির কার্যকারিতাও কিয়দংশে যোগ করিতে হইবে। কারণ, এই সকল দেশের কৃষিজাত, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত হয়। সুতরাং মানুষ-জমির অনুপাত বুঝিতে হইলে, একদিকে কার্যকরী ত্রিমাত্রিক জমি এবং প্রভাবাধীন দেশ ও উপনিবেশের জমি এবং অন্যদিকে মানুষের সংখ্যা, সংস্কৃতি ও কর্মক্ষমতার অনুপাত বুঝিতে হইবে।

লোকবসতির ঘনত্ব (Density of Population)	মানুষ-জমির অনুপাত (Man-Land Ratio)
লোকসংখ্যা : মোট জমির আয়তন	কার্যকরী জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রভাবাধীন দেশ ও উপ-নিবেশের সম্পদ : মানুষের সংখ্যা ও কর্মক্ষমতা

লোকবসতি-বণ্টনের তারতম্যের কারণ
(Causes of Uneven Distribution of Population)

প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি-বণ্টনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

(ক) **প্রাকৃতিক পরিবেশ**—প্রাকৃতিক পরিবেশ লোকবসতি-ঘনত্বের উপর প্রভাব

বিস্তার করে। জলবায়ুর উপর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর কৃষিকার্য, মানুষের কর্মক্ষমতা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রভৃতি নির্ভর করে। কৃষিকার্য হইতে মানুষের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান হইয়া থাকে। সুতরাং যে অঞ্চলে কৃষিকার্য উন্নতিলাভ করে সেখানে লোকবসতি বেশী হয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহাতে শিল্পের উন্নতি হয় ও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। ভূ-প্রকৃতি সমতল হইলে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় এবং লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসার সমতলভূমিতেই সম্ভব। পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিকূল ভূ-প্রকৃতির জন্য ও কৃষিজমির অভাবে লোকবসতি-ঘনত্ব বেশী হইতে পারে না। মৃত্তিকা উর্বর হইলে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় ও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে খনিজ সম্পদ। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। খনিজ সম্পদের লোভে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলেও মানুষ ছুটিয়া গিয়াছে ও বসতি বিস্তার করিয়াছে।

(খ) **অর্থনৈতিক পরিবেশ**—কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে সেই দেশে লোকবসতি ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির উপর। কৃষিকার্যের উপর বসতি-ঘনত্বের নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। দেশের কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষমতা, মানুষের কর্মক্ষমতা ও বাজারের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতার উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে বসতি-ঘনত্বের কারণ শুধু স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ নহে, প্রভাবাধীন দেশ ও উপনিবেশসমূহের অনুকূল পরিবেশও এই সকল দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের পাট, তুলা ও লৌহের সাহায্যে ব্রিটেনের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। জায়েরের খনিজ সম্পদের সাহায্যে বেলজিয়ামের শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। বাণিজ্যের উন্নতি হইলেও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। ব্রিটেন পূর্বে সমগ্র জগতের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিত বলিয়া ক্ষুদ্র আয়তনেও ঐ দেশে বহুলোক বাস করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিদেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে কোনো কোনো দেশের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ব্যাঙ্কিং, জাহাজ, বীমা প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা বিদেশ হইতে অর্থ আমদানি করা সম্ভব। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত করিতে পারিলে লোকবসতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; ব্রিটেন ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

(গ) **সামাজিক পরিবেশ**—সমাজের বিভিন্ন সংস্কারের জন্য লোকসংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে পুত্র দ্বারা পিতামাতার পরলোকের কার্যাদি করিবার সংস্কার প্রচলিত থাকায় চীন ও ভারতীয়গণের পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা গভীর। রাজনৈতিক কারণেও জন্মহার বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হিটলার সৈন্যের প্রয়োজনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জার্মানীর সকল পিতামাতাকে অধিক হারে সন্তান উৎপাদনের আদেশ দিয়াছিলেন। মানুষের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ফলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়. শিক্ষার উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ নূতন নূতন জিনিস উৎপাদন করে। ফলে অধিকতর সম্পদের সৃষ্টি হয় এবং লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, শিল্পবিপ্লবের পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। বিভিন্ন দেশের সরকারের কর্মকুশলতা লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

কোনো কোনো দেশের সরকার সম্পদের অভাবে পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকরী করে ; ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশ পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নহে। তাহারা শিল্পজাত দ্রব্য ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে, লোকসংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য নহে। এই সকল দেশে স্বভাবতঃই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সরকারের কর্মকুশলতায় শিল্পজাত দ্রব্যের ও খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিলে মৃত্যুর হার কমিয়া যায়, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। চীনদেশের বিপ্লবের সাফল্যের সময় (১৯৪৯ সাল) লোকসংখ্যা ছিল ৪৬ কোটি। ১৯৭৯ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৯৭ কোটিতে। ৩০ বৎসরে এই দেশে প্রায় ৫১ কোটি লোক বাড়িয়াছে।* কারণ, এই দেশ খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়ায় এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর লোকবসতি বণ্টন
(World Distribution of Population)

প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বসতি-ঘনত্বে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া গতিশীল পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এক স্থান হইতে মানুষ অন্যস্থানে যাতায়াত করিতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন স্থানের বসতি-ঘনত্ব পরিবর্তিত হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি-ঘনত্বের উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীকে নিম্নলিখিত চারিটি বসতি-ঘনত্ব অঞ্চলে (Density Zones) বিভক্ত করা যায়ঃ

(ক) **নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল**—দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ (চীন, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি), পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ (ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস্, সুইজারল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালি, স্পেনের কিয়দংশ প্রভৃতি), সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ এবং মিশরের নীলনদের উপত্যকা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। **এই অঞ্চল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল ; পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ এই অঞ্চলে বাস করে।** প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে এখানকার লোকসংখ্যা ৫০ জনের বেশী।

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল দেশে বিশেষতঃ চীন ও ভারতে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছিল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দেও এই অঞ্চলে ৩৩ কোটি লোক বাস করিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার লোকবসতি প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। যে সকল স্থানে কৃষিকার্য অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেই সকল স্থানেই বসতি-ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি এবং চীনের ইয়াং-সি কিয়াং ও সি-কিয়াং নদীর উপত্যকায় কৃষি অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী লোক বাস করে। এখানকার কোনো কোনো অঞ্চলে জল-সেচের সাহায্যে কৃষিকার্য হইয়া থাকে ; ইহার ফলে লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে

* *China—A General Survey.* Page 15. বর্তমানে চীনের লোকসংখ্যা ১০০ কোটি।

৪০০ জন পর্যন্ত হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও উর্বর মৃত্তিকা থাকায় ও কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে লোকবসতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

চীনের গড় লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ৬০ জন, কিন্তু ইহার নদী উপত্যকার কৃষি-অঞ্চলের লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১,২০০ জন। জাপানের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, ভগ্ন তটরেখা ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি এই দেশের নিবিড় লোকবসতির প্রধান কারণ।

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ কৃষিকার্যে মোটামুটি উন্নতিলাভ করিলেও এই সকল দেশের সম্পদ-সৃষ্টির উৎস শিল্প। স্থানাভাবে এই সকল দেশ শ্রমশিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইয়াছে। স্থানীয় খনিজ সম্পদ ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা এবং অতি উৎপাদনক্ষম কৃষি-ব্যবস্থার মাধ্যমে কম জমিতে অধিক শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যেও এই সকল দেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার উন্নতি, প্রভাবাধীন দেশ ও উপনিবেশসমূহ হইতে আনীত প্রচুর সম্পদ, এখানকার মানুষের কর্মদক্ষতা এই অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ফলে লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে ব্রিটেনে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১২৪ জন, বেলজিয়ামে ২৮০ জন, জার্মানীতে ১৭০ জন, নেদারল্যান্ডসে ২৫৫ জন এবং ইটালিতে ১৪৪ জন লোক বাস করে।

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল হইতে ঘনবসতি অঞ্চলটি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে ঘন লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার পূর্বাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল অবস্থিত এবং পশ্চিমাংশে বিস্তীর্ণ কৃষিবলয়সমূহ অবস্থিত। শিল্পাঞ্চলে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ২৩০ জন এবং কৃষি-অঞ্চলে প্রায় ১০০ জন লোক বাস করে। উৎকৃষ্ট নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকা, পরিমিত বৃষ্টিপাত, অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ, উৎকৃষ্ট বন্দর এই দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিয়াছে। উন্নত ধরনের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি, স্থায়ী সরকার, অন্য দেশের উপর রাজনৈতিক প্রভাবও এই অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধিতে ও লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিশরের নীলনদের উপত্যকায় কৃষিকার্য উন্নতি-লাভ করায় এই অঞ্চলে ঘন লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর বড় বড় শহরেও ঘন লোকবসতি বিদ্যমান।

(খ) **নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল**—ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, পশ্চিম এশিয়ার মালভূমি (তুরস্ক, ইরান, ইরাক) আফ্রিকার উপকূল (ঘানা, নাইজেরিয়া, গিনি), দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আলজেরিয়া ও মরক্কো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, মধ্য আমেরিকা, ইউরোপীয় রাশিয়ার মধ্যাংশ ও পূর্বাংশে নাতি-নিবিড় লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডের অল্পাংশও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২১ হইতে ৫০ জন লোক বাস করে। এই অঞ্চলের দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে,

এখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে ইহারা মোটামুটি স্বাবলম্বী। কোনো কোনো দেশ উদ্‌বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানিও করিয়া থাকে। কোনো কোনো স্থানে খনিজ সম্পদ বিদ্যমান ; ইউরোপের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোনো কোনো অংশে শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

(গ) **বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল**—উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরী,' দক্ষিণ আমেরিকার 'পম্পাস্', সোভিয়েত রাশিয়ার 'স্টেপস্', অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউনস্' এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 'ভেল্ড' তৃণভূমি ও আফ্রিকার 'সাভানা' অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী তৃণভূমিতে পশুচারণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কোনো কোনো অঞ্চলে তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্যও হইয়া থাকে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে অল্প লোক অধিকসংখ্যক পশুপালন করিতে পারে। সেইজন্য এখানে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে মাত্র ১ হইতে ২০ জন লোক বাস করে।

(ঘ) **প্রায় জনহীন অঞ্চল**—এই অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানসমূহে লোকবসতি প্রায় নাই বলিলেই চলে। যে সকল স্থানে কিছু কিছু লোক আছে সেখানেও প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতি ১ জনেরও কম। শীতল মেরু অঞ্চল, বিভিন্ন মরুভূমি ও পার্বত্য ভূমি এবং নিরক্ষীয় বনভূমি, ইন্দোনেশিয়ার কালিমান্তান (বোর্নিও) ও নিউগিনি দ্বীপ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইউরোপের তুন্দ্রা অঞ্চলেও কদাচিৎ কোনো লোক দেখা যায়। অত্যধিক শীতের প্রকোপে তুন্দ্রা অঞ্চলে কোনো গাছপালা জন্মে না এবং বল্গাহরিণ ও মৎস্য ভিন্ন খাদ্যের অন্য কোনো বন্দোবস্ত নাই। মরু অঞ্চলের মধ্যে আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা, এশিয়ার আরব, তুর্কিস্তান ও গোবি মরুভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মরুভূমিতে জলের অভাব, চরম জলবায়ু এবং ধূসর বালুকাময় বা বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য মানুষের পক্ষে বসবাস করা কঠিন। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অত্যধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়। এখানকার জমি স্যাঁৎসেঁতে হওয়ায় জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। কঙ্গো-উপত্যকায় সামান্য লোকবসতি থাকিলেও আমাজন উপত্যকায় লোকবসতি প্রায় নাই বলিলেই চলে। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং নানাপ্রকার বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপের উপদ্রবের জন্য ইন্দোনেশিয়ার নিউগিনি ও কালিমান্তান দ্বীপে লোকবসতি অত্যন্ত কম। বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্যের অসুবিধা হয় বলিয়া এবং পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাব থাকায় বসতি স্থাপন করা কঠিন ; এইজন্য ভারতের হিমালয় পর্বত, চীনের তিব্বত, উত্তর আমেরিকার রকি পর্বত, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত আয়তনের তুলনায় প্রায় জনমানবশূন্য।

আদর্শ লোকবসতি সম্পর্কে ধারণা
(Concept of Optimum Population)

কোনো দেশের লোকসংখ্যা যদি সেই দেশের 'কার্যকরী জমির' অনুপাতে গড়িয়া উঠে তাহাকেই আদর্শ লোকবসতি (Optimum Population) বলা যায়। কার্যকরী জমি সম্বন্ধে ৭৩-৭৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। যতক্ষণ কোনো দেশের উৎপন্ন সম্পদের দ্বারা দেশের মানুষের ভোগসুখের বন্দোবস্ত করা যায়, ততক্ষণ সেই দেশে আদর্শ লোকবসতি বিদ্যমান থাকিবে ; কিন্তু যদি কোনো দেশে সম্পদ

সৃষ্টির পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে কম হয়, তাহা হইলে সেই দেশের বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী বলিতে হইবে। আবার যদি সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা কম থাকে এবং শ্রমিকের অভাবে সম্পদ-সৃষ্টির ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে সেই দেশের বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত কম বলিতে হইবে। অনেক লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন চীনে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু বিপ্লবের পর সম্পদের উৎপাদন ঐ দেশে এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সেখানকার মানুষ স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে সুখে বাস করিতেছে। সেইদিক হইতে বিচার করিলে চীনে অত্যধিক লোকবসতি আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

সম্পদের উৎপাদন নির্ভর করে প্রধানতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মানুষের কর্মক্ষমতার উপর। এই তিনটি পরিবেশের পারস্পরিক মিলন সম্ভব হইলে সম্পদসৃষ্টি সার্থক হইয়া থাকে। সকল দেশে ইহার অনুপাত সমান নহে। কোথাও প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের অনুন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশজনিত কর্মক্ষমতার অভাবে উহাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব হয় নাই। কোথাও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে মানুষ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সম্পদ উৎপাদনের এই ত্রয়ী পরিবেশের কার্যকারিতার সঙ্গে লোকবসতির সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। এই ত্রয়ী পরিবেশের সঙ্গে লোকবসতির অনুপাত ঠিক না থাকিলেই বসতি-ঘনত্বের আধিক্য বা অল্পতা হেতু বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা লোকবসতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পবিপ্লবের পর হইতেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও শক্তিসম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। ইহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের অর্থনীতি উপনিবেশের অর্থনীতির সহিত যুক্ত হইয়াছে ; উপনিবেশ হইতে শোষিত সম্পদ এই সকল দেশের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি দেশ বিদেশে পুঁজি নিয়োগ করিয়া প্রভূত সুদ ও লাভ বিদেশ হইতে অর্জন করিয়া থাকে। ইহাও দেশের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় মানুষ সর্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া বসবাস করে। সুতরাং বর্তমান যুগে কোনো দেশের বসতি-ঘনত্ব অধিক বা অল্প ইহা নির্ধারণ করিতে হইলে স্থানীয় শক্তি-সম্পদ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বিদেশ হইতে আনীত সম্পদ, পুঁজি হইতে আহৃত লাভ এবং বসবাসের স্থান পরিবর্তন প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করিতে হইবে।

গতিশীল পৃথিবীতে লোকসংখ্যাও সর্বদাই কমবেশী হওয়া স্বাভাবিক। আজ যে সকল দেশে আদর্শ লোকবসতি বিদ্যমান, জন্ম-মৃত্যুর হার এবং সম্পদের উৎপাদন কমবেশী হওয়ায় কিছুদিন পরে সেই সকল দেশে বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী বা কম হইতে পারে। লোকবসতির গতি কখন কোন দিকে মোড় ফিরিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না।

পৃথিবীর লোকবসতির গতি-প্রকৃতি

(World Population Trend)

পৃথিবীর লোকবসতির ঘনত্ব ও লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে লোকসংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জন্ম ও মৃত্যুর হার

এবং সম্পদের উৎপাদন-সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে পৃথিবীর লোকবসতি সম্বন্ধে নানাবিধ সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার মোটামুটি বেশী হইয়াছে। ১৬৫০ সালে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা ছিল ৫৪.৫ কোটি। ১৯৮০ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৪২.৭ কোটি।

পৃথিবীর লোকসংখ্যার গতি-প্রকৃতি (কোটি)

মহাদেশ	১৬৫০	১৭৫০	১ ০০	১৯০০	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০
উত্তর আমেরিকা	০.১	০.১	০.৬	৮.১	২১.৫০	২৪	২৮	৩৭.৫
দক্ষিণ আমেরিকা	১.২	১.১	১.৯	৬.৩	১১	১৪	২২	২৪.০
ইউরোপ	১০	১৪	১৯	৪০	৫৫	৬০	৬৫	৬৮.৪
এশিয়া	৩৩	৪৮	৬০	৯৪	১৭২	১৭৩.৭০	২১০	২৬৩.৫
আফ্রিকা	১০	৯.৫	৯	১২	২০	২৪	২৯	৪৭.০
ওশিয়ানিয়া	০.২	০.২	০.২	০.৬	১.২৬	১.৫৮	১.৯৪	২.৩
পৃথিবী	৫৪.৫	৭২.৯	৯০.৭	১৬১	২৪০.৭৬	২৯৭.২৮	৩৭৫.৯৪	৪৪২.৭

শিল্পবিপ্লবের পূর্বে কৃষিকার্য ও পশুপালনের উপর মানুষ অধিকতর নির্ভরশীল ছিল। সেই সময় জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হার ছিল অত্যন্ত বেশী ; জন্মের হার ছিল হাজারে ৪০ জন এবং মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ৩৫ জন। জন্ম ও মৃত্যুর হারে বিশেষ পার্থক্য না থাকায়, লোকসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইত না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি না হওয়ায় এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষার ভালো ব্যবস্থা না থাকায় মৃত্যুর হার ছিল বেশী। অধিকাংশ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই অথবা কর্মক্ষম হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইহার ফলে শিশুকে লালন-পালনের জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইত তাহা সমাজের কল্যাণে লাগিত না ; কারণ শিশু বড় হইয়া সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারিত না। সেই সময়ে জীবনধারণের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়াই মানুষের আয়ু অল্প হইত। ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল।

শিল্পবিপ্লবের পর লোকসংখ্যাতত্ত্বের ধরন পাল্টাইয়া যায়। এই সময় মানুষ 'উদ্ভিজ্জ সভ্যতা' (Vegetable civilization) হইতে 'যান্ত্রিক সভ্যতা'য় পদার্পণ করে। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প পরিশ্রমে মানুষ দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে শিখে। ইহার ফলে মানুষের আয়ু ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিভিন্ন ঔষধপত্রের আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া যায়। অন্যদিকে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার আওতায় আসিয়া জন্মের হারও কমিতে থাকে। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পরিবার পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতে শিখে। মৃত্যুর হার কমিয়া যাওয়ায় শিশুদের লালন-পালন করিবার জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, শিশু বড় হইয়া তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। ইহার ফলে উৎপাদনক্ষম শ্রমিকের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। যে সকল দেশ তাহাদের শ্রম-

শক্তিকে শুধু কৃষিকার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখে, তাহাদের উন্নতি হওয়া কষ্টসাধ্য। কিন্তু যে সকল দেশ শ্রমশক্তির কিয়দংশকে কৃষিকার্য হইতে সরাইয়া খনিজ সম্পদ-আহরণে ও শিল্পে নিয়োজিত করিতে পারে, সেই সকল দেশের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজতান্ত্রিক শাসনে কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্র হইতে বহু শ্রমিককে সরাইয়া খনিতে ও শিল্পে নিযুক্ত করা হইয়াছে ; ফলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তিকালে যে পরিমাণ লোক ভারতে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন ও খনিজ সম্পদ আহরণের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জন করিত, বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে শিল্পে উন্নতি ঘটায় তদপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক লোক এইগুলির উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জন করে। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করা হইলে মানুষ সমস্ত উৎপাদনকার্য বজায় রাখিয়াও অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর সময় পায় ; ইহাতে মানুষের সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া যায়, সৎ ও বলিষ্ঠ সরকার-গঠন সম্ভবপর হয়।

শিল্পবিপ্লবের পর হইতে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ফলে ক্রমশঃ জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ের হার কমিয়া যাইতেছে ; কিন্তু যে হারে জন্মের হার কমিয়াছে ইহার তুলনায় মৃত্যুর হার কমিয়াছে অনেক বেশী। ইহার ফলে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই আধুনিক লোকসংখ্যা-তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীতে বর্তমানে যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে অনেকেই আতঙ্কিত হইতেছেন। বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গড় হার '৯% হইলেও বিভিন্ন মহাদেশে ইহার হার বিভিন্ন রকমের ; উত্তর আমেরিকায় বৃদ্ধির হার শতকরা ১'৯, ইউরোপে ১১ মধ্য আমেরিকায় ২৭, ওশিয়ানিয়ায় ২১, আফ্রিকায় ৮ এবং এশিয়ায় '৬ জন। কোনো কোনো লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ২০০০ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হইবে ৪৯৪ কোটি। অবশ্য এই হিসাবের সঙ্গে সকল লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ একমত নহেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বদাই কমবেশী হওয়া স্বাভাবিক। মানুষের প্রজনন ক্ষমতার হার, সম্পদ উৎপাদনের গতি, যুদ্ধ, মহামারী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতির উপর ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সংখ্যা নির্ভর করে।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Explain the dual role of man in resource creation and its consumption.

[সম্পদ উৎপাদনে ও উহার ব্যবহারে মানুষের দ্বৈত ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।]

উঃ—'মানুষের দ্বৈত ভূমিকা' (৭৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

2. Explain with examples the dual role of man as creator and user of resources. **[H. S. Examination, 1980]**

[সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহারকারী হিসাবে মানুষের দ্বৈত ভূমিকা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।]

উঃ—'মানুষের দ্বৈত ভূমিকা' (৭০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Account for the uneven distribution of population in the world. Identify the regions of densely populated areas of Eastern Hemisphere. [H. S. Examination, 1980]

[পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অসম লোকবসতি-বণ্টনের কারণ দর্শাও। পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চলগুলির উল্লেখ কর।]

উঃ—'লোকবসতি বণ্টনের তারতম্যের কারণ' (৭৫-৭৭ পৃঃ) ও 'নিবিড় বসতি অঞ্চল' (৭৭-৭৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Describe the geographical causes responsible for the uneven distribution of population in different parts of the world.

[H. S. Examination, 1984]

[পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসম জনবসতি বিন্যাসের ভৌগোলিক কারণ বর্ণনা কর।]

উঃ—'লোকবসতি বণ্টনের তারতম্যের কারণ' হইতে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৭৫-৭৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. "Nearly two-thirds of the human population are concentrated in about one-tenth of the land surface."—Describe and account for this peculiar distribution.

["পৃথিবীর লোকবসতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর মোট জমির এক-দশমাংশ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে।"—এই রকম অদ্ভুত ধরনের লোকবসতি বণ্টনের কারণ দর্শাইয়া উক্ত বণ্টন বর্ণনা কর।]

উঃ—'নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল' (৭৭-৭৯ পৃঃ) এবং 'লোকবসতি-বণ্টনের তারতম্যের কারণ' (৭৫-৭৭ পৃঃ) লিখ।

6. Describe briefly the world population trend.

[পৃথিবীর লোকবসতির গতি-প্রকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

উঃ—'পৃথিবীর লোকবসতির গতি-প্রকৃতি' (৮১-৮৩ পৃঃ) লিখ।

7. Explain fully the concept of *man-land ratio* and indicate how far population optima can be explained in terms of ideal man-land ratio. [C. U. B. Com. 1967 & B. U. B. Com. 1963 & 65]

['মানুষ-জমি অনুপাতের তত্ত্ব' বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর এবং আদর্শ লোকবসতি কিভাবে মানুষ-জমির অনুপাত অনুসারে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা নির্দেশ কর।]

উঃ—'মানুষ-জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব' (৭৩-৭৫ পৃঃ) এবং 'আদর্শ লোকবসতি সম্পর্কে ধারণা' (৮০-৮১ পৃঃ) লিখ।

8. What do you mean by man-land ratio? How does the concept compare with population density?

[Specimen Question, 1981]

[মানুষ-জমির অনুপাত বলিতে কি বুঝ? লোকবসতি-ঘনত্বের সহিত এই তত্ত্বের তুলনা কর।]

উঃ—'মানুষ-জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব' (৭৩-৭৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখিতে হইবে।

9. What do you understand by man-land ratio ? How does it differ from population density ?

[Specimen Question, 1980]

[মানুষ-জমির অনুপাত বলিতে কি বুঝ? লোকবসতি-ঘনত্বের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় ?]

উঃ—'মানুষ-জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব' (৭৩-৭৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10. Is there any difference between 'main-land ratio' and 'population density'? Describe the modern trends of population distribution in the world.

[H. S. Examination, 1985]

['মানুষ-জমির অনুপাত' ও 'লোকবসতি-ঘনত্বের' মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? পৃথিবীতে লোকবসতি-বণ্টনের আধুনিক গতি-প্রকৃতি বর্ণনা কর।]

উঃ—'মানুষ-জমির অনুপাত ও লোকবসতি-ঘনত্ব' (৭৩-৭৫ পৃঃ) এবং 'পৃথিবীর লোকবসতির গতি-প্রকৃতি' (৮১-৮৩ পৃঃ) লিখ।

11. What do you understand by main-land ratio? Explain with the help of examples.

Discuss the causes of high density of population in densely populated regions of the world. **[Tripura H. S. Examination, 1979]**

[মানুষ-জমির অনুপাত বলিতে কি বুঝ দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা কর। পৃথিবীর ঘনবসতি অঞ্চলে নিবিড় জনবসতির কারণগুলি আলোচনা কর।]

উঃ—'মানুষ-জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব' (৭৩-৭৫ পৃঃ) ও 'নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল' (৭৭-৭৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

12. Define optimum population. Discuss the factors which determine this with specific example.

[B. U. B. Com, 1975 & Specimen Question, 1981]

[আদর্শ লোকবসতির সংজ্ঞা লিখ। যে সকল উপাদান ইহা নির্ধারণ করে, তাহা উদাহরণসহ আলোচনা কর।]

উঃ—'আদর্শ লোকবসতি সম্পর্কে ধারণা' (৮০-৯৯ পৃঃ) এবং 'লোকবসতি বণ্টনের তারতম্যের কারণ (৭৫-৭৭ পৃঃ) লিখ।

13. Describe the causes of uneven distribution of population in different parts of the world. **[Specimen Question, 1980]**

[পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে লোকবসতি বণ্টনের তারতম্যের কারণসমূহ বর্ণনা কর।]

উঃ—'লোকবসতি বণ্টনের তারতম্যের কারণ' (৭৫-৭৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

14. (a) Identify the geographical causes for the uneven distribution of population in the world. (b) Mention the present pattern of the world population trend.

[(ক) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসম জনবসতি বিন্যাসের ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর। (খ) সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের জনসংখ্যার সাধারণ ঝোঁক সম্বন্ধে উল্লেখ কর।]

উঃ—'লোকবসতি-বণ্টনের তারতম্যের কারণ' (৭৫-৭৭ পৃঃ) এবং 'পৃথিবীর লোকবসতির গতি-প্রকৃতি' (৮১-৮৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

15. Describe the nature of population distribution in the world. **[Specimen Question, 1978]**

[পৃথিবীর লোকবসতি বণ্টনের প্রকৃতি বর্ণনা কর।]

উঃ—'পৃথিবীর লোকবসতি-বণ্টন' (৭৭-৮০) অবলম্বনে উত্তরটি লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Discuss briefly the following : (a) World population trend, (b) Dual role of man.

[নিম্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর : (ক) পৃথিবীর লোকবসতির গতি-প্রকৃতি, (খ) মানুষের দ্বৈত ভূমিকা।]

উঃ—(ক) 'পৃথিবীর লোকবসতির গতি-প্রকৃতি' (৮১-৮২ পৃঃ) এবং (খ) 'মানুষের দ্বৈত ভূমিকা' (৭৩ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

2. Write short notes on the following : optimum population and population density. **[H. S. Examination, 1984]**

[নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর টীকা লিখ : আদর্শ জনবসতি ও বসতি-ঘনত্ব।]

উঃ—'আদর্শ লোকবসতি সম্পর্কে ধারণা' (৮০-৮১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

C. Objective Questions

1. Write correct answers from the following statements :

(i) Population density is usually high in mountain/plateau/coastal plain.

[H. S. Examination, 1982]

(ii) Population density is least in the Gangetic Valley/Sahara desert. **[H. S. Examination, 1980]**

(iii) Man plays dual role in production/distribution and consumption of resources.

(iv) Man-land ratio must not be confused with density of population/civilization.

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখ : (i) জনবসতির ঘনত্ব সাধারণতঃ পার্বত্য/মালভূমি/সমুদ্র উপকূলের সমভূমিতে অধিক হইয়া থাকে।

(ii) জনবসতি ঘনত্ব গাঙ্গেয় উপত্যকায়/সাহারা মরুভূমিতে সর্বাপেক্ষা কম।

(iii) সম্পদ সৃষ্টিতে/বণ্টন ও ব্যবহারে মানুষ দ্বৈত ভূমিকা পালন করে।

(iv) মানুষ ও জমির অনুপাতকে লোকবসতি ঘনত্বের/সভ্যতার সঙ্গে গুলাইয়া ফেলা উচিত নয়।]

2. Fill up the gaps with the appropriate words selected from the brackets :

(i) The chief characteristic of south-east Asian countries is that the people here depend mainly upon—. (agriculture/industry) (ii) In the Nile valley of Egypt development of — has brought about large concentration of people in that area. (industry/agriculture) (iii) Due to — pattern of economy there has been an outstanding agricultural and industrial development in East Germany, Czechoslovakia and south-western region of European Russia and this has caused a — density of population in these regions. (socialistic/capitalistic ; low/high.)

[বন্ধনীর মধ্য হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছিয়া লইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর : (i) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার লোকবসতি প্রধানতঃ — উপর নির্ভরশীল। (কৃষিকার্যের/শিল্পের) (ii) মিশরের নীলনদের উপত্যকায় — উন্নতিলাভ করায় এই অঞ্চলে ঘন লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। (শিল্প/কৃষিকার্য) (iii) — ব্যবস্থার ফলে পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় লোকবসতির ঘনত্ব — পাইয়াছে। (সমাজতান্ত্রিক/ধনতান্ত্রিক ; হ্রাস/বৃদ্ধি)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৎস্য-আহরণ ও পৃথিবীর মৎস্য-চাষ
(Fishing and World Fisheries)

সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য
(Economic Significance of Sea)

মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ প্রভৃতি অগাধ জলরাশি শতকরা ৭০ ভাগের বেশী ধরাপৃষ্ঠ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া সাগর-মহাসাগরের অভ্যন্তর দেশ-দেশান্তরে নানা রূপকথার খোরাক যোগাইয়াছে, দেশ-দেশান্তরে মানুষের নানা কথাকাহিনীতে স্বপ্ন ও রহস্যের জাল বুনিয়াছে। পুরাণে কথিত আছে, সমুদ্র-মন্থনকালে একই সাথে অমৃত ও হলাহল এবং মহালক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন।

সাগর-মহাসাগর নানাবিধ শক্তি ও সম্পদের **অফুরন্ত ভাণ্ডার**। সমুদ্রে চন্দ্রাকর্ষণে ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে যে **জোয়ার-ভাঁটা** হয়, সারা দুনিয়ার মানুষের করায়ত্ত সমস্ত যন্ত্রশক্তিকে একত্রীভূত করিলেও উহা সেই জোয়ার-ভাঁটার দুর্জয় শক্তির কাছে হীন বলিয়া মনে হইবে।

যুগ যুগ ধরিয়া সমুদ্র হইতে **লবণ** উৎপাদন করা হইতেছে। লবণ আজ মানুষের খাদ্যের একটি অপরিহার্য অংশ। সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক চেতনার ফলে মানুষ সাধারণ লবণ হইতে ক্ষার ও ক্লোরিন উদ্ধার করিয়া নানা কার্যে ব্যবহার করিতেছে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে নানা গাছপালা হইতে **আইওডিন ও ব্রোমাইড** উৎপন্ন করা হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৩ সালে ব্রোমিনের কারখানা চালু করে। **ম্যাগনেশিয়াম** ও **পটাশও** সমুদ্রজাত।

গবেষণার শেষ নাই। **সমুদ্রজল** লবণহীন করিয়া পানীয় জল হিসাবে বহু দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। নানা **খনিজ সম্পদ** ছাড়াও মুক্তা, প্রবাল, স্পঞ্জ, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি সমুদ্র হইতে সংগ্রহ করা হয়। পূর্বে তিমি মাছ ধরিয়া তাহার তৈল দিয়া মোমবাতি তৈয়ারি করা হইত। আজকাল **সাবান** ও রং প্রস্তুতকার্যেও তিমির তৈল ব্যবহৃত হয়।

সমুদ্রের দিক হইতে দিগন্তে বিচিত্র **মৎস্যের সম্ভার** বিদ্যমান। কতকগুলি মৎস্য মনুষ্য-খাদ্যের উপযুক্ত। মৎস্য মানুষের অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করে। প্রাচীনকাল হইতেই দুঃসাহসিক মানুষ এই মৎস্য আহরণের জন্য ছোট ছোট নৌকা লইয়া সমুদ্রের ভয়াল ঢেউয়ের সহিত লড়াই করিয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আজ বিরাট বিরাট ট্রলার ও যন্ত্রচালিত জাল দিয়া মাছ ধরা হইয়া থাকে। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা কম। মৎস্য শুধু মানুষের উদরপূর্তির বস্তু না থাকিয়া বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং মৎস্য হইতে নানা উপজাত শিল্পদ্রব্য আজ মানুষের নিত্য প্রয়োজন মিটাইতেছে। সিল মাছের রোমাবৃত চামড়া, নানাপ্রকার মৎস্যের **লিভার-জাত তৈল**, মৎস্যজাত **সার, ক্যালসিয়াম** ও **চুন বিভিন্ন শিল্পে** ব্যবহৃত হইয়া আজ বিভিন্ন দেশে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইতেছে।

মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষ তাৎপর্য অবহেলা করিবার উপায় নাই। মহাসমুদ্রের বুকে বাষ্পীভবনের ফলে বাতাস আর্দ্র থাকে। সেই **আর্দ্রতা** উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বাষ্পীভবনে ও ঘনীভবনে **বৃষ্টিপাত সম্ভব** হয়। মরাগাঙে ঢল নামে। কৃষিক্ষেত্রে এই ঢল আনে পলি—সম্ভব করে জলসেচ। সমুদ্রের তটে তটে যে **ঢেউয়ের পর ঢেউ** আলোড়িত হয়, সেই শক্তিও মানুষ একদিন আণবিক শক্তির মত নিজ কাজে লাগাইবে—বর্তমানে ইহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে।

সমুদ্রের কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষ দুঃসাহসী হয়। দিকে দিকে তাহারাই মরণজয়ী অভিযানে ঝাঁপাইয়া পড়ে, নূতন উপনিবেশ সৃষ্টি করে, দেশে-দেশান্তরে পণ্যের বিনিময় সম্ভব করে। দুনিয়ার বণিক সভ্যতার তাহারাই গোড়াপত্তন করে। প্রাচীন মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে সমুদ্রকূলের মানুষেরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। তাহারাই পথপ্রদর্শক (pioneers)।

পরিবহণক্ষেত্রে আকাশপথ, রেলপথ ও রাজপথের তুলনায় সমুদ্রপথের খরচ অনেক কম। সময় বেশী লাগিলেও অনেক বেশী পণ্য অতি কম খরচে লেনদেনের সুবিধার জন্য এখনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রধানতঃ সমুদ্রপথেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

মৎস্য-চাষ
(Fisheries)

আদিম যুগ হইতেই মৎস্যের সহিত মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বিভিন্ন ধর্মে মৎস্য শান্তি ও নিরাপদ সমুদ্রযাত্রার প্রতীক। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে মানুষের ভাগ্যচক্রের মীন রাশিতে যে মানুষ জন্মে সে ধনের অধিকারী হইয়া থাকে। হিন্দু ধর্মে বিবাহ ইত্যাদি শুভকর্মে মৎস্য মঙ্গলচিহ্ন হিসাবে গণ্য হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য-চাষ ও মৎস্য-আহরণ বলিতে সামুদ্রিক মৎস্য-চাষ ও মৎস্য-আহরণই বুঝায়। নদী, হ্রদ ও খাল হইতে যাহা আহরিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। মৎস্যবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে প্রায় ১,৮০০ ধরনের মৎস্য আছে। ইহার মধ্যে ১৮/১৯ জাতির মৎস্য আমাদের পরিচিত। অধিকাংশ মৎস্য এখনও আমাদের কাছে অপরিচিত। সকল মৎস্যই খাদ্য নহে। বিষাক্ত মৎস্যের সংখ্যাও কম নহে। কোনো কোনো সামুদ্রিক মৎস্য নিজ দেহ হইতে আলো বিকিরণ করে। কোনো কোনো মৎস্যের দেহে বিদ্যুৎ-প্রবাহ (Electric Eel) থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই দুঃসাহসিক মানুষ বর্শা দিয়া সমুদ্র হইতে মৎস্য শিকার করিত। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে নূতন নূতন পদ্ধতি এবং যন্ত্রের সাহায্যে বর্তমানে মৎস্য-আহরণ চলিতেছে।

বিভিন্ন ধরনের মৎস্য-চাষ (Types of Fisheries)—মানুষের চাহিদা অনুযায়ী মৎস্য-চাষকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা চলে। যথা—
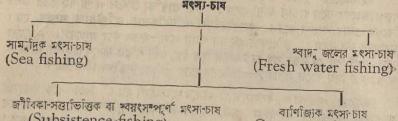
দেশের অভ্যন্তরীণ নদ-নদী, নালা, খাল-বিল প্রভৃতি হইতে যে মৎস্য-আহরণ করা হয় উহাকে **স্বাদুজলের মৎস্য-চাষ (Fresh water fishing)** বলা হয়। উপকূলবর্তী সমুদ্র বা গভীর সমুদ্রে যে মৎস্য আহরণ করা হয় উহাকে **সামুদ্রিক মৎস্য-চাষ (Sea fishing)** বলা হয়। সাধারণতঃ স্বাদুজলের মৎস্য কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ও রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত হয়।

অনুন্নত দেশে স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য স্বাদুজলের মৎস্য-চাষ অবধারিত ছিল। বিশেষ করিয়া ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে মৎস্য সহজে পচিয়া যায় বলিয়া মৎস্য আহরণপূর্বক স্থানীয় বাজারে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া থাকে। উপকূল অঞ্চলের এই সকল দেশে যে সামুদ্রিক মৎস্য ধরা হইত তাহাও স্থানীয় চাহিদা মিটাইত। বাণিজ্য-ভিত্তিক মৎস্য-চাষ এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় অজ্ঞাত ছিল। এই সকল অঞ্চলে মৎস্য-চাষ ছিল **জীবিকাসত্তাভিত্তিক** বা **স্বয়ংসম্পূর্ণ (Subsistence-fishing)**।

দূরবর্তী স্থানের চাহিদা মিটাইবার জন্য অনেক দেশে আধুনিক পন্থায় মৎস্য-চাষের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই সকল মৎস্য দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এইজাতীয় মৎস্য-চাষকে **বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষ (Commercial fishing)** বলা হয়।

বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ
(Factors for development of Commercial fishing grounds)

প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক প্রচেষ্টার বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয়ের ফলে বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষের উদ্ভব হইয়াছে। বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) প্রাকৃতিক কারণসমূহ এবং (খ) অর্থ-নৈতিক কারণসমূহ।

(ক) **প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Physical Factors)**—প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) **অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া (Shallow Seas and Bank)**—উত্তর আমেরিকা, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, চীন, জাপান ও সোভিয়েত রাশিয়ার সমুদ্র উপকূলে বিস্তীর্ণ মহীসোপান রহিয়াছে। এই সকল মহীসোপানের সমস্ত অংশে মৎস্য শিকার না হইলেও বিশেষ করিয়া অগভীর সমুদ্রের খাড়ি ও মগ্ন চড়া অঞ্চলে মৎস্যচাষ বর্তমানে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। মগ্ন চড়াগুলির নরম ঢালু উপরিভাগ মৎস্য ধরিবার

পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাদের অনেকগুলি তীরভূমির নিকটেই অবস্থিত। উত্তর সাগরের ডগার্স ব্যাঙ্ক, নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে গ্রান্ড ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্নিহিত জর্জেস ব্যাঙ্ক মৎস্য-চাষের জন্য বিখ্যাত। মগ্ন চড়াগুলির উপর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন তাপমাত্রা ও রাসায়নিক গুণবিশিষ্ট জলের স্রোত আসিয়া মিলিত হইতেছে। উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে শীতল লাব্রাডর স্রোত উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইতেছে। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত আটলান্টিক স্রোতের সহিত মিশিয়া উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের উপকূল ধরিয়া উত্তর নরওয়ে পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। আবার ইহার তলদেশ দিয়া উত্তর হইতে শীতল আর্কটিক স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। অনুরূপভাবে এশিয়ার পূর্ব উপকূলে শীতল কামচাট্কা স্রোতের সহিত উষ্ণ জাপান স্রোতের মিলন ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া, এই সকল অঞ্চলের সমুদ্রে অসংখ্য নদী প্রচুর পরিমাণ জলরাশি আনিয়া ঢালিতেছে ; এই জলে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকায় ইহা মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(২) **সৈকতরেখা (Coastline)**—মৎস্য শিল্পে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির ভগ্ন সৈকতরেখা এই শিল্পের উন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিবার পক্ষে ভগ্ন সৈকতরেখা অত্যন্ত অনুকূল। ধৃত মৎস্য দেশ-বিদেশে পাঠাইবার জন্য, ঝড়-তুফানের সময় মৎস্য শিকারে নিযুক্ত নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে মৎস্য-শিল্পের পক্ষে বন্দর ও পোতাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। কোনো কোনো মৎস্য নদীর মুখে ও অগভীর সমুদ্র-খাড়িতে ডিম পাড়ে। ফলে ভগ্ন সমুদ্রতীরে এই সকল মৎস্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

(৩) **প্ল্যাঙ্কটন (Plankton)**—মৎস্যের প্রধান খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন। প্ল্যাঙ্কটন সমুদ্রজলে ভাসমান একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী। উদ্ভিদজাতীয় প্ল্যাঙ্কটনের জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য সূর্যকিরণ প্রয়োজন। ২০০ মিটার গভীর জল পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে। এইজন্য এইরূপ গভীরতার মধ্যে অধিক মৎস্য পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলের নিকটেই সাধারণতঃ প্ল্যাঙ্কটনের বংশ বৃদ্ধির হার অধিক। কারণ, এখানে নদীগুলি প্ল্যাঙ্কটন বৃদ্ধির সহায়ক বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বহন করিয়া আনে। তাহা ছাড়া এই সকল অঞ্চলে বিপরীতমুখী জলস্রোতের মিলনের ফলে প্রতিনিয়ত জল ওঠানামা করে বলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ জলের উপরের স্তরে পাওয়া যায়। ইহার জন্য উষ্ণ ও শীতল স্রোতের সঙ্গমস্থলে, বিশেষ করিয়া মগ্ন চড়াগুলির উপর প্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্য দেখা যায় ; ফলে মৎস্যও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(৪) **নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু (Temperate Climate)**—নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের সমুদ্রে উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের তুলনায় খাদ্যোপযোগী মৎস্য অনেক বেশী পাওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের মৎস্য সুস্বাদু। শীতল জলবায়ুতে ধৃত মৎস্য অধিকক্ষণ টাট্কা থাকে। শীতকালে এই সকল অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বরফ পাওয়া যায় বলিয়া মৎস্য-সংরক্ষণের খরচও কম। নাতিশীতোষ্ণ জল-বায়ু প্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই জলবায়ুতে মৎস্য সাধারণতঃ বিষাক্ত হয় না। শীতল জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার ধীবরগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও

কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষসমূহ ধীবরগণের মৎস্য ধরিবার নৌকা, ট্রলার ও জাহাজ নির্মাণে সাহায্য করে।

(৫) **ভূপ্রকৃতি (Character of the land)**—বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির সন্নিহিত দেশসমূহের ভূ-প্রকৃতি কৃষিকার্য ও পশুপালনের উপযোগী নহে। ফলে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণের একাংশ খাদ্য ও জীবিকার জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভর করিয়াছে।

প্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্য, উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন, প্রচুর সূর্যকিরণ, জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Low specific gravity) ও সমুদ্রতলদেশের অনুকূল গঠনের ফলে উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের মৎস্য আসে ও ডিম পাড়ে।

(খ) **অর্থনৈতিক কারণসমূহ (Economic Factors)**—মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক উন্নতি পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির মৎস্যশিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। কোটি কোটি টাকা মূলধন লইয়া গঠিত বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই সকল অঞ্চলে মৎস্যশিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান মৎস্য শিকারের জন্য শুধু যন্ত্রচালিত জাহাজই নহে, বিমানপোত, ইলেকট্রনিক যন্ত্র, রেডিও, হিমায়নযন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া থাকে। গ্রীম্‌স্‌বি, হাল, লন্ডন, ইয়ারমাউথ, এবারডিন, সেন্ট জন্‌স, হ্যালিফ্যাক্স, বোস্টন, নিউ বেডফোর্ড, ভ্যাংকুভার, লস্‌ এঞ্জেলস্‌, সান ডিয়েগো, মন্‌টিরে, বার্গেন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বন্দর মৎস্যশিল্পের বৃহৎ সুসংগঠিত কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল বন্দর হইতে অভ্যন্তরভাগের বাজারগুলিতে দ্রুত মৎস্য প্রেরণের জন্য রেলপথে চমৎকার পরিবহণ ব্যবস্থা রহিয়াছে। ধৃত মৎস্য মজুত রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা-সমন্বিত বিরাট বিরাট গুদামঘর নির্মিত হইয়াছে। মাছের কাঁটা, হাড় ও অন্যান্য অংশ হইতে কৃষি সার তৈয়ারির এবং মৎস্যের তৈল বাহির করিয়া সেই তৈল হইতে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির অনেক স্থানেই লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। ইহার ফলে মৎস্যের চাহিদা অত্যন্ত বেশী।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহ
(Important Commercial Fisheries of the World)

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মৎস্য-শিকার করা হইলেও বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষ নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ঃ

(ক) প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল, (খ) উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক উপকূল, (গ) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক উপকূল, (ঘ) প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূল।

(ক) **প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল**—দক্ষিণ চীন হইতে সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তর কামচাট্‌কা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে প্রচুর পরিমাণে হেরিং, ট্রাউট, স্যামন, কড ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। পূর্ব

সাইবেরিয়ার সমুদ্র উপকূল ও নদীসমূহে প্রচুর স্যামন মৎস্য পাওয়া যায়। জাপানের চতুর্দিকের সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়। এই দেশে মাংস-প্রদায়ী পশু নাই বলিলেই চলে; ফলে জাপানের অধিবাসিগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মৎস্য শিকার ও আহার করিয়া থাকে। জাপানের সমুদ্রে পিলকার্ড, ম্যাকারেল, হেরিং, কড, পোলক, বোনিটো, টুনা, কাটল ফিস, চিংড়ি, ঝিনুক, কাঁকড়া, হাঙ্গর, এমনকি অক্টোপাস পর্যন্ত ধরা হয়। অখাদ্য মৎস্য নষ্ট না করিয়া সার প্রভৃতি তৈয়ারির কাজে ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ চীন সাগর হইতে পীত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়।

(খ) **উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক উপকূল**—স্পেনের উত্তর উপকূল হইতে শুরু করিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তরে অবস্থিত **শ্বেত সাগর (White Sea)** পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। প্রতি বৎসর গড়ে ৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য এখানে ধরা হয়। ধৃত মৎস্যের মধ্যে কড, হেরিং, হ্যাড্ডক ও ম্যাকারেল প্রধান। উত্তর সাগরে সর্বাধিক পরিমাণ মৎস্য শিকার করা হয়। এই সাগরে অসংখ্য অগভীর চড়া (ডগার্স ব্যাঙ্ক

পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রসমূহ

প্রভৃতি) রহিয়াছে এবং চতুর্দিকে ঘন লোকবসতিপূর্ণ ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস্, ডেনমার্ক, জার্মানী, নরওয়ে ও সুইডেন অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে নরওয়ে ও আইসল্যান্ডের অর্থনীতি মৎস্য-শিকার ও মৎস্য-ব্যবসায়ের উপর সর্বাপেক্ষা বেশী নির্ভরশীল। প্রায় ১,১৫,০০০ নরওয়েবাসী মৎস্য-শিকারে নিযুক্ত আছে। মাথাপিছু মৎস্য-শিকারে আইসল্যান্ড শ্রেষ্ঠ—বাৎসরিক প্রায় ৩,২০০ কিলোগ্রাম। এই দেশের রপ্তানির শতকরা ৫ ভাগ মৎস্যজাত দ্রব্য।

(গ) **উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক উপকূল**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের হ্যাটেরাস অন্তরীপ (Cape Hatteras) হইতে আরম্ভ করিয়া লাব্রাডারের

উত্তর উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের সমুদ্রেও মৎস্য আহরণের উপযোগী অসংখ্য অগভীর চড়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলবর্তী গ্রান্ড ব্যাংক সর্ববৃহৎ। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সহিত শীতল লাব্রাডার স্রোতের মিলন হওয়ায় এখানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের ধৃত মৎস্যের মধ্যে হ্যাড্ডক, রোড ফিশ, ফাউন্ডার, কড, হোয়াইটিং, হেরিং, হ্যালিবাট, পোলক এবং হেক প্রধান; চিংড়ি প্রভৃতি মৎস্যও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঝিনুক, স্যাড ও ক্ল্যাম ধরা হইয়া থাকে।

(ঘ) **প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূল**—উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের উত্তরাংশ হইতে শুরু করিয়া বেরিং সাগর পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানে স্যামন, হ্যালিবাট, সার্ডিন, পিলকার্ড, টুনা, হেরিং, সেল, কড্ প্রভৃতি মাছ ধরা হয়। পৃথিবীর অর্ধেক হ্যালিবাট এই অঞ্চলের সমুদ্রে ধরা হয়। হ্যালিবাট তৈল এখানকার গুরুত্বপূর্ণ উপজাত দ্রব্য। এখানে ঝিনুক শিল্পও উন্নতিলাভ করিয়াছে; বেরিং সাগরে অবস্থিত প্রিবিলফ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর বৃহত্তম ফার-সিল (Fur-Seal) শিকারের ক্ষেত্র।

এই চারিটি উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্র ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকায় চিলির দক্ষিণাংশের সমুদ্র উপকূল, দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডের মৎস্য-শিকার ক্ষেত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর প্রধান চারিটি মৎস্যক্ষেত্রে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক মৎস্য-শিকারে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও বহু লোক মৎস্য-শিকারের আনুষঙ্গিক শিল্পে নিযুক্ত আছে।

সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারের আধুনিক পদ্ধতিসমূহ
(Modern Methods of Sea-fishing)

কাষ্ঠ ও লৌহনির্মিত নানা আকৃতি ও গঠনের ডিঙ্গা, নৌকা ও জাহাজে করিয়া সমুদ্রে মৎস্য শিকার করা হয়। এই সকল জলযান দাঁড়, পাল, কয়লা বা তৈলের সাহায্যে চালানো হয়। শিল্পোন্নত দেশসমূহে কোটি কোটি টাকা মূলধন লইয়া গঠিত বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমুদ্রে মৎস্য শিকারে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান মৎস্য-শিকারের জন্য শক্তি-চালিত বৃহদাকৃতি জাহাজ, বিমানপোত, ইলেকট্রনিক যন্ত্র, রেডিও, হিমায়ন যন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া থাকে। মৎস্য শিকারের পদ্ধতি নানারকম। ইহাদের মধ্যে তিনটি প্রধান: (১) **ড্রিফট নেট (Drift Net)** পদ্ধতিতে নৌকা বা ট্রলারের সামনে জলের মধ্যে পর্দার মত জাল ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। জলের উপরের স্তরে ভ্রমণকারী মৎস্য এই জালে ধরা পড়ে। হেরিং বা ম্যাকারেল মৎস্যের মতো যে সকল মৎস্য ঝাঁক বাঁধিয়া (Shoal fish) বেড়ায় প্রধানতঃ সেইগুলি ধরিবার জন্যই এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। (২) **ট্রল নেট (Trawl Net)** বা টানা জাল পদ্ধতি সমুদ্রের তলদেশে বিচরণকারী মৎস্য ধরিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। বড় থলিয়ার মতো জাল বিশেষ উপায়ে মুখ খোলা রাখিয়া সমুদ্রের তলদেশের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। স্বভাবতঃই অগভীর সমুদ্র ভিন্ন অন্যত্র এই পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নহে এবং জলের নীচে অদৃশ্য পাহাড় বা ভাঙ্গা জাহাজ থাকিলে এই পদ্ধতিতে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। (৩) **লং লাইন (Long line)** পদ্ধতিতে একটি লম্বা মোটা তার বা দড়ি হইতে অনেকগুলি বঁড়শি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল বঁড়শিতে আধার (মাছের

খাদ্য) গাঁথা থাকে। নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের সমুদ্রোপকূলে এই পদ্ধতিতে কড্ মাছ ধরা হয়।

মৎস্যের উৎপাদন—পৃথিবীতে মৎস্যের উৎপাদন প্রায় ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ মেঃ টন। উহার অধিকাংশই সামুদ্রিক মৎস্য। সেইজন্য সমুদ্রোপকূলের দেশসমূহ সাধারণতঃ মৎস্য-শিকারে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর মৎস্য উত্তোলন (১৯৮৪)

লক্ষ মেট্রিক টন

জাপান	১০৬	কোরিয়া	৩২
সোভিয়েত রাশিয়া	১০১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩০
চীন	৬৯	ভারত	২৪
পেরু	৪৩	ডেনমার্ক	১৯
নরওয়ে	৩৪	ব্রিটেন	১০

মৎস্যের বাণিজ্য (Fish Trade)—পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস্য উৎপাদক অঞ্চলের অধিকাংশ মৎস্য স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয় হয়। অবশ্য কিছু কিছু মৎস্য নিকটবর্তী দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। উৎপাদনের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ অত্যন্ত কম। ব্রিটেন, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান রপ্তানিকারক এবং স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারক দেশ।

মৎস্য সংরক্ষণ
(Fish Conservation)

বনজ সম্পদের ন্যায় মৎস্যসম্পদও ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ খরচ হয় সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে উহার পূরণ হইতে থাকে। কিন্তু এযাবৎ মৎস্য সংগ্রহের তুলনায় স্বাভাবিকভাবে নূতন মৎস্যের উৎপাদন (জন্ম) কম হারে হইয়াছে। এই কারণে ধীবরগণকে মৎস্য সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান সংগ্রহের পরিমাণ বজায় রাখিবার জন্যও অপেক্ষাকৃত অধিক ও সূক্ষ্ম সাজ-সরঞ্জাম লইয়া দ্রুতগামী জাহাজে করিয়া তীরভূমি হইতে আরও দূরে গভীরতর সমুদ্রে যাইতে হইতেছে। অবশ্য উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও আর্জেন্টিনার উপকূলের মৎস্যক্ষেত্রগুলি অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া এই সকল অঞ্চলের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার

এখনও বহু অব্যবহৃত মৎস্যক্ষেত্র রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলি লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এবং অত্যধিক শীতের জন্য বৎসরের অধিকাংশ সময় ব্যবহারের উপযোগী না থাকায় এই সকল ক্ষেত্রে মৎস্য-শিকারের খরচ অনেক বেশী পড়ে। সেইজন্য সম্প্রতি মৎস্যসম্পদ **সংরক্ষণের** প্রতি মানুষের দৃষ্টি কিছুটা আকৃষ্ট হইয়াছে।

নরওয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ব্রিটেন, কানাডা ও সোভিয়েত রাশিয়ার বহু বৈজ্ঞানিক **মৎস্যসম্পদের গবেষণায়** নিযুক্ত রহিয়াছেন। ভারতেও মৎস্য গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

কোথাও কোথাও **মাছের ডিম হইতে কৃত্রিম উপায়ে পোনা** জন্মাইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন জলাশয়ে ও সমুদ্র উপকূলে উহা ছাড়িয়া দিয়া মৎস্য চাষ করা হইতেছে।

ঝিনুক ও অন্যান্য **খোলসবিশিষ্ট মৎস্যের চাষ** (Shell fish) কোনো কোনো দেশে নিয়মিতভাবে করা হইতেছে।

কিন্তু মৎস্যশিল্পের গুরুত্ব বজায় রাখিবার ও উহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের মৎস্যের প্রকৃতি ও জীবনযাপন প্রণালী পর্যবেক্ষণ, মৎস্যের ডিম ছাড়িবার ঋতুতে আইন করিয়া মৎস্য শিকার নিষিদ্ধকরণ, চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মৎস্য শিকার এবং মিহি জালের পরিবর্তে মোটা জালের প্রবর্তন** ইত্যাদি ব্যবস্থা আশু গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সুখের বিষয়, এইভাবে কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে হ্যালিবাট মাছ সংরক্ষণের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক কমিশন ইহার উদাহরণ। ১৯৩৬, ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালের উত্তর সাগর কনভেনশনে (North Sea Convention) ইউরোপের দেশগুলি জালের বুনানি এবং ছোট মাছ না ধরা সম্বন্ধে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাসমুদ্রের বিজ্ঞান গবেষণার সুফল একমাত্র মৎস্য-শিকারের ক্ষেত্রে এত বিপুল হইতে পারে যে, বর্তমানের তুলনায় পৃথিবীর মৎস্য-শিকার পাঁচগুণ বৃদ্ধিলাভ করিলেও এই সঞ্চয় কখনও ফুরাইয়া যাইবে না। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, মৎস্যের বিচরণ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভের দ্বারা এবং মৎস্যের বংশ বিস্তারের পক্ষে অনুকূল নূতন নূতন অঞ্চলে মৎস্যের উৎপাদনের দ্বারা এবং আরও কিছু কিছু উপায়ে আমরা পূর্বোক্ত সুফল লাভ করিতে পারি।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Analyse the economic significance of the sea. Discuss with suitable examples the geographical factors which have helped in the development of marine fishing grounds.

[H. S. Examination, 1985]

[সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। কি কি ভৌগোলিক কারণে সামুদ্রিক মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলি বিকাশলাভ করে—যথাযথ উদাহরণসহ আলোচনা কর।]

উঃ। 'সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য' (৮৮-৮৯ পৃঃ), 'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' (৯০-৯২ পৃঃ) ও 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯২-৯৪ পৃঃ) লিখ।

2. Give an account of the important fisheries of the world and analyse the factors of their commercial development.

[C. U. B. Com. 1968 & Specimen Question, 1981]

[পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্রসমূহের বিবরণ দাও এবং উহাদের বাণিজ্যিক উন্নতির কারণ বিশ্লেষণ কর ।]

উঃ । 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯২-৯৪ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' (৯০-৯২ পৃঃ) লিখ ।

3. Locate the principal fishing grounds of the world and describe the geographical factors which have favoured their development. **[H. S. Examination, 1978]**

[পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের সমৃদ্ধির যথাযথ ভৌগোলিক কারণ উল্লেখ কর ।]

উঃ । 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯২-৯৪ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' (৯০-৯২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

4. Locate the major fishing grounds of the world and give their characteristics. **[C. U. B. Com. 1964. 1967]**

[পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্রসমূহের অবস্থান নির্দেশ কর এবং উহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ ।]

উঃ । 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯২-৯৪ পৃঃ) লিখ ।

5. Describe the important commercial fishing grounds of the world. **[Specimen Question, 1978]**

[পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রগুলির বিবরণ দাও ।]

উঃ । 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯২-৯৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

6. Indicate the location of the principal commercial fishing grounds of the world. Analyse the reasons of their location in the Temperate zone. **[H. S. Examination, 1981]**

[পৃথিবীর বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রগুলির অবস্থান নির্দেশ কর । নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে উহাদের অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর ।]

উঃ । 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯২-৯৪ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' হইতে 'নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু' (৯১-৯২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

7. What are the steps to be taken for conservation of fish resources?

[মৎস্য-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কি কি পন্থা গ্রহণ করা উচিত ?]

উঃ । 'মৎস্য সংরক্ষণ' (৯৫-৯৬ পৃঃ) লিখ ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on : (a) Subsistence fishing, (b) Plankton, (c) Trawl Net Method.

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : (ক) জীবিকাসত্তাভিত্তিক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ মৎস্য চাষ, (খ) প্ল্যাঙ্কটন, (গ) টানাজাল পদ্ধতি ।]

উঃ (ক) 'জীবিকাসত্তাভিত্তিক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ মৎস্যচাষ' (৯০ পৃঃ), (খ) 'প্ল্যাঙ্কটন' (৯১ পৃঃ) এবং (গ) 'ট্রল নেট বা টানা জাল পদ্ধতি' (৯৪-৯৫ পৃঃ) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Construct correct answers from the following statements :

(i) Inland fishing thrives near sea coasts/river valleys.

(ii) The Grand Bank is a fishing port/industrial centre/fishing ground. [H. S. Examination, 1979]

(iii) The Dogger's Bank is located in the Atlantic Ocean/ Mediterranean Sea/Indian Ocean. [H. S. Examination, 1982]

(iv) Important fisheries of the world are concentrated in deep oceans/shallow continental shelves/river valleys.

[H. S. Examination, 1984]

(v) The planktons are favourite food of man/fish/wild animals.

[H. S. Examination, 1985]

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে শুদ্ধ উত্তর গঠন কর :

(ক) অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষ সমুদ্র-উপকূলে/নদী-উপত্যকায় গড়িয়া উঠে।

(খ) গ্রান্ড ব্যাঙ্ক একটি মৎস্য-বন্দর/শিল্পকেন্দ্র/মৎস্যক্ষেত্র।

(গ) ডগার্স ব্যাঙ্ক আটলান্টিক মহাসাগরে/ভূমধ্যসাগরে/ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।

(ঘ) পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যক্ষেত্রগুলি গভীর/অগভীর মহীসোপান/নদী উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(ঙ) প্ল্যাঙ্কটন মানুষের/মৎস্যকুলের/বন্যপ্রাণীর প্রিয় খাদ্য।]

2. Delete the incorrect word/part of the sentence from the following sentences and frame the correct sentences : (i) In the field of transportation air-route/sea-route is the cheapest means of transportation. (ii) Fishing carried on the inland water-bodies such as rivers, canals etc. is called Fresh-water fishing/Salt-water fishing/Sea-fishing. (iii) Inland fishing grounds are located in sea coast/river valley.

[নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে অশুদ্ধ শব্দ/বাক্যাংশ বর্জন করিয়া সঠিক বাক্য রচনা কর : (i) পরিবহণ ক্ষেত্রে বিমানপথের/সমুদ্রপথের খরচ সর্বাপেক্ষা কম। (ii) দেশের অভ্যন্তরীণ নদ-নদী, খালবিল প্রভৃতি হইতে যে মৎস্য আহরণ করা হয় উহাকে স্বাদুজলের মৎস্যচাষ/নোনাজলের মৎস্যচাষ/সামুদ্রিক মৎস্যচাষ বলে। (iii) অন্তর্দেশীয় মৎস্যক্ষেত্রগুলি সমুদ্রের উপকূলে/নদী উপত্যকায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে।]

সপ্তম অধ্যায়

বনভূমি ও বনজ সম্পদ

(Forest and Forest Resources)

যে সকল স্থানে বৃক্ষের সমারোহ দেখা যায় সাধারণতঃ তাহাকেই অরণ্য বা বনভূমি বলে। বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, সূর্যালোক এবং উত্তাপের তারতম্যের উপর বনভূমির ধরন ও প্রকৃতি নির্ভর করে।

এককালে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের শতকরা ৪০ ভাগ বনভূমিতে আচ্ছাদিত ছিল অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি বর্গ-কিলোমিটারে ছিল বনভূমির সবুজ সমারোহ। কিন্তু মানুষ বৈষয়িক লাভের উদগ্র লালসায় বহু বনভূমি ধ্বংস করিয়াছে এবং যাহা আছে তাহার মধ্যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার বনভূমি ব্যবহারে লাগাইতেছে। বনভূমির এই ধ্বংস সাধনের ফলে কোথাও জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন হইয়াছে, শ্যামল বনভূমি মরুভূমিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, কোথাও স্রোতস্বতী নদী মজিয়া গিয়াছে অথবা অন্য খাতে বহিতেছে।

বনভূমির উপকারিতা

(Utility of Forests)

প্রত্যক্ষ উপকারিতা (Direct Advantages)—বনভূমির প্রধান সম্পদ কাষ্ঠ। বনভূমি হইতে বিভিন্ন প্রকার কাঠ সংগ্রহ করা হয়। এই সকল কাঠের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে **কাষ্ঠশিল্প (Lumbering Industry)** গড়িয়া উঠিয়াছে। কোনো কোনো কাঠ আসবাবপত্র, রেলগাড়ি, জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, বাক্স ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে এবং গৃহনির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো কাঠ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কাগজশিল্পের জন্য কাষ্ঠমণ্ড ও রেয়ন শিল্পের জন্য কাঠের আঁশ প্রয়োজন হয়। নিকৃষ্টজাতীয় কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বনভূমিতে সাধারণতঃ দুইপ্রকার কাঠ দেখা যায়। নরম কাঠ ও শক্ত কাঠ। পাইন, ফার, হেমলক, বার্চ, স্প্রুস্ ইত্যাদি গাছের কাঠ নরম এবং ওক্, বীচ, শাল, সেগুন, চেস্টনাট, এল্‌ম প্রভৃতি গাছের কাঠ শক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নরম কাঠ কাগজশিল্পে এবং শক্ত কাঠ গৃহনির্মাণ ও আসবাব তৈয়ারির কার্যে ব্যবহৃত হয়। বনভূমি হইতে বিভিন্ন প্রকার উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। বনের ফল আহরণ ও পশু শিকার করিয়া বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে। জীবজন্তুর মাংস ও চামড়া, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, তার্পিন তৈল, রেশমের গুটী, কুইনাইন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান দ্রব্য বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনে লাগে। অনেক বনভূমিতে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি থাকায় সেখানে পশুপালন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

পরোক্ষ উপকারিতা (Indirect Advantages)—বনভূমির বৃক্ষাদির শিকড়ের

বন্ধনে মাটি আবদ্ধ থাকে ; এইজন্য বৃষ্টিপাত বা অন্যান্য কারণে মাটির উপরের অংশ ধুইয়া যাইতে পারে না। এইভাবে **বনভূমি ভূমিক্ষয়** রোধ করে।

বনভূমির বৃক্ষাদিতে প্রতিহত হইয়া প্রচন্ড ঝড়ের গতিবেগ মন্দীভূত হয়। ইহাতে মানুষের ঘরবাড়ি ও কৃষিসম্পদ ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পায়। গাছের শিকড়ে বৃষ্টির জল প্রতিহত হওয়ায় সহসা নদীতে জলবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহাতে বন্যার গতিবেগ মন্দীভূত হয়। বনভূমি কৃষি-জমির উর্বরতা রক্ষা করে। বৃষ্টির জল ভূমির উপরিভাগের সার মাটি ধুইয়া বনভূমির বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। কারণ, এই মাটি ধুইয়া বৃক্ষের তলায় শিকড়ে আটকাইয়া যায়। ইহা ছাড়া গাছের পাতা ভূমির উপর পচিয়া থাকে। ইহাতে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। দেশের জলবায়ুর উপর বনভূমির প্রভাব বিদ্যমান। বায়ু যখন জলীয় বাষ্প লইয়া বনভূমির উপর দিয়া যায়, তখন উচ্চ বৃক্ষাদির দ্বারা প্রতিহত হয় এবং তজ্জন্য কখনও কখনও বৃষ্টিপাত হয়। বনভূমি-অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ায় জলবায়ু আর্দ্র হয় এবং মাটি জলসিক্ত থাকে। বৃক্ষাদির বাষ্পীকরণের ফলে তাপমাত্রা সর্বদাই মাঝামাঝি থাকে, কোনো কোনো অঞ্চলে বনভূমির নিকটবর্তী স্থানসমূহ স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে ; ভারতের নৈনিতাল এইরূপ একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বনভূমির কাঠ ও উপজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বহু লোকের **জীবিকা** নির্বাহ হয়। সরকারী বনভূমি হইতে **সরকারের আয় বৃদ্ধি** পায়।

বনভূমির এই সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারিতার জন্য বিভিন্ন দেশে বৃক্ষাদি রোপণ করিবার (Afforestation) ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃক্ষাদি কর্তনও (Deforestation) সুপরিকল্পিত পন্থায় হইয়া থাকে। ভারতে প্রতি বৎসর একবার **বন মহোৎসব** পালন করিয়া প্রচুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়। অবশ্য এই উৎসবে যে সকল বৃক্ষ রোপণ করা হয়, তাহার অধিকাংশই বাঁচে না। ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি অনেক কম। সুতরাং যাহাতে কম খরচে বেশী বৃক্ষ রোপণ করা যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বনভূমি সম্প্রসারণের ভৌগোলিক উপাদানসমূহ
(Geographical Factors Influencing the Growth of Forest)

বনভূমির বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ নিম্নলিখিত ভৌগোলিক উপাদানসমূহের উপর নির্ভরশীল ঃ

(ক) **উত্তাপ**—উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কমপক্ষে মাসিক ৬° সেন্টিগ্রেড গড় উত্তাপ প্রয়োজন। মাসিক গড় উত্তাপ ৬° সেন্টিগ্রেড অপেক্ষা হ্রাস পাইলে উদ্ভিদ বাঁচে না। আবার অত্যধিক উত্তাপও উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং ইহাতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সীমিত হইয়া পড়ে। তাপমাত্রা অধিক হইলে জলের বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে কম হইলে জলীয় বাষ্প সোজাসুজি তুষারে পরিণত হয়। উভয় প্রক্রিয়াই উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক।

(খ) **বৃষ্টিপাত**—বৃষ্টিপাত উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধিকে গভীরভাবেপ্রভাবিত করে। বিভিন্ন পরিমাণ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মে। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে কাঁটা গাছের ঝোপ এবং অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জলাভূমির গভীর অরণ্য দেখা যায়।

(গ) **মৃত্তিকা**—ম্যাগনেশিয়াম, নাইট্রোজেন, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ প্রভৃতি মৃত্তিকার রাসায়নিক উপাদানের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন মৃত্তিকায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে। মাটির উর্বরতা অপেক্ষা উহার আর্দ্রতার উপর বনভূমির সম্প্রসারণ অধিকতর নির্ভরশীল। বনভূমির সম্প্রসারণের জন্য মৃত্তিকায় প্রেইরী অঞ্চলের তৃণভূমি বা ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর আর্দ্রতা প্রয়োজন। উদ্ভিদ বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। যদি উদ্ভিদের ঝরা পাতা অন্যত্র সরিয়া না যায় এবং বনভূমিতেই পচিতে পারে তবে চুন, ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পচাপাতা হইতেই মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া নিয়মিত চলিতে থাকে। ইহার ফলে মৃত্তিকায় সারের অভাব হয় না। মৃত্তিকার গঠন, সচ্ছিদ্রতা, ছিদ্রের মধ্য দিয়া উদ্ভিদের মূল প্রবেশের ক্ষমতা, মূলসমূহকে আটকাইয়া ধরার ক্ষমতা ইত্যাদির তারতম্যের উপর বিভিন্ন প্রকারের মাটিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে।

(ঘ) **উচ্চতা**—উচ্চতার তারতম্যের উপর তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। যত উচ্চে উঠা যায় উত্তাপ তত কমিতে থাকে। সুতরাং উচ্চতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের জাতিরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

(ঙ) **বায়ুপ্রবাহের বেগ**—যে স্থানের উপর দিয়া প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেখানে উদ্ভিদের সংখ্যা বিরল হইয়া থাকে। বাতাস বেগে প্রবাহিত হইলে উদ্ভিদের বাষ্পনির্গমনের পরিমাণ বেশী হয়। ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাহাছাড়া টর্নেডো, টাইফুন, ঘূর্ণবাত ইত্যাদি বহুসংখ্যক বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ও উপড়াইয়া ফেলিয়া বনভূমির সম্প্রসারণে ব্যাঘাত ঘটায়। আবার সমুদ্রবায়ু কয়েক শ্রেণীর বৃক্ষের জন্ম ও বিকাশের অনুকূল।

(চ) **ভূমির ঢাল**—পর্বতের অনুবাত ঢালে যে প্রকারের উদ্ভিদ জন্মে উহার প্রতিবাত ঢালে অন্য প্রকারের উদ্ভিদ জন্মে। কম জলধারণের ক্ষমতা সম্পন্ন জমিতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে উহারা ঢালু বা অল্প ঢালু জমিতে জন্মিতে পারে।

(ছ) **সূর্যকিরণ**—সালোকসংশ্লেষ কার্যে অর্থাৎ উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য, যে ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয় ইহা উদ্ভিদ সূর্যকিরণ হইতে লাভ করে। সেইজন্য সূর্যকিরণ উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির সহায়ক।

বনভূমির শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Forests)

উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যালোক, মৃত্তিকার প্রকারভেদ ও ভূমির উচ্চতার তারতম্যে বিভিন্ন প্রকার বনভূমি দেখা যায়। এই সকল বনভূমিতে বিভিন্ন আকারের গাছপালা জন্মায়। কোনো কোনো বনভূমিতে সরলবর্গীয় বৃক্ষ থাকায় সূর্যালোক প্রবেশের কোনো অসুবিধা হয় না। এই সকল বনভূমি হইতে গাছ কাটিয়া আনা সহজসাধ্য। কোনো কোনো বনভূমির গাছ আবার অত্যন্ত সরু; কোথাও বা গাছগুলি মোটা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার বনভূমিকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

বনভূমি	বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ	জলবায়ু অঞ্চল	উৎপন্ন বৃক্ষ
১। সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি (Coniferous Forests)	৩০-৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ১০° সেঃ উত্তাপ	হিমশীতোষ্ণ অঞ্চল	পাইন, ফার, বার্চ, ডিল, হেমলক, স্প্রুস ইত্যাদি
২। চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি (Evergreen Forests)	২০০-২৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং ৩৮° সেঃ উত্তাপ	ক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় অঞ্চল	মেহগনি, আবলুস, রবার, তাল ইত্যাদি
৩। পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি (Deciduous Forests)	১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি-পাত এবং ২৭°-৩২° সেঃ উত্তাপ	মৌসুমী ও উষ্ণশীতোষ্ণ অঞ্চল	শাল, সেগুন, চন্দন, গোলাপ-গন্ধ ইত্যাদি
৪। নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি (Temperate mixed Forests)	৫০ সেঃ মিঃ-এর অধিক বৃষ্টিপাত ও ১৬° সেঃ উত্তাপ	নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল	ওক, ম্যাপল, এলম, বার্চ, ওয়ালনাট ইত্যাদি
৫। ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি (Mediterranean Forests)	৫০-৯০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ও ২০°-২৫° সেঃ উত্তাপ	ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল	অলিভ, মার্টেল, কর্ক ইত্যাদি

পৃথিবীর বনভূমির বণ্টন
(Distribution of Forest areas of the World)

(ক) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি (Coniferous Forests)

এই প্রকার বনভূমি প্রধানতঃ পৃথিবীর স্হলভাগের উত্তর অংশে বিদ্যমান। সাধারণতঃ ৪৫° হইতে ৬৫° উত্তর অক্ষাংশে এই বনভূমি দেখা যায়। এই সকল স্থান শীতপ্রধান এবং এখানে প্রচুর তুষারপাত হইয়া থাকে। গাছে যাহাতে তুষার জমিয়া থাকিতে না পারে সেই জন্য গাছের মাথাগুলি অত্যন্ত সরু হইয়া যায় এবং মন্দিরের মতো দেখায়। পাতাগুলিও খুব সরু হয় এবং গাছগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। শীতকালে এখানে চাষ-আবাদ করা সম্ভব নহে। চাষীরা এই সময় কাঠ ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য বনভূমি হইতে সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

উপজাত দ্রব্য—এই বনভূমি হইতে সংগৃহীত ওকগাছের কর্ক, পাইনগাছের পীচ, আলকাতরা ও তার্পিন তৈল প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়। পর্তুগাল, স্পেন, আলজেরিয়া ও মরক্কোতে এই সকল উপজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering Industry)—পৃথিবীতে মোট কাঠের বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে পাওয়া যায়। এই বনভূমির

পাইন, ফার, স্প্রুস, বার্চ প্রভৃতি গাছ হইতে নরম কাঠ পাওয়া যায়। এই সকল কাঠ জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, রেলগাড়ি, আসবাবপত্র, কাষ্ঠমণ্ড ও দিয়াশলাই প্রস্তুত করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

শীতপ্রধান দেশে এই সকল গাছ জন্মে। এই দেশগুলি অনেক সময় বরফাবৃত থাকে। সেইজন্য গাছগুলিকে কাটিয়া বরফের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া সহজসাধ্য। এই কাঠ নরম বলিয়া জলে ভাসে; সেইজন্য পরিবহণ খরচ অত্যন্ত কম। শীতকালে যখন নদীগুলি বরফে আবৃত থাকে তখন কাঠের গুঁড়িগুলিকে যন্ত্র দ্বারা (donkey engine) টানিয়া বরফ-জমা নদীতে আনিয়া ফেলা হয়। বসন্তকালে বরফ গলিয়া গেলে ঐ কাঠের গুঁড়িগুলিকে নদীপথে অল্প খরচে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়।

সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন

এই বনভূমিতে একই স্থানে একই প্রকার গাছ দেখা যায়। সুতরাং প্রয়োজনীয় গাছ খুঁজিয়া বাহির করিতে অসুবিধা হয় না। এই বনভূমি অত্যন্ত ঘন না হওয়ায় এখানে গাছ কাটিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য নহে। নাতিশীতোষ্ণ দেশে এই বনভূমি বিদ্যমান। এই দেশগুলি সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় এখানে কাঠের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। সুলভ জলবিদ্যুৎ এবং শিল্পের প্রসারের পক্ষে অন্যান্য সুবিধা থাকায় এখানে নরম কাঠের সাহায্যে কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত করিয়া কাগজ ও **কৃত্রিম রেশম শিল্পের উন্নতিসাধন** করা হইয়া থাকে। শীতকালে এই অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রগুলি বরফাবৃত থাকায় কৃষকেরা গ্রীষ্মকালে চাষ-আবাদ করে এবং শীতকালে গাছ কাটিয়া আনে। সেইজন্য এখানে শ্রমিকের অভাব নাই। এই সকল কারণে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চলে কাষ্ঠ-শিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে।
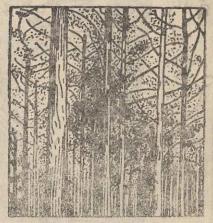
অবস্থান—পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই এই প্রকার বনভূমি বেশী দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন দেশের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি-অঞ্চলের কাষ্ঠ-শিল্প ও বনজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইলঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া এখানে কাষ্ঠের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, রকি পর্বতে ও নিউ ইংল্যান্ডে প্রচুর সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায়। এইজন্য কাষ্ঠমণ্ড-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **প্রথম স্থান** অধিকার করিয়াছে।

সোভিয়েত রাশিয়া—পৃথিবীর মোট বনভূমির এক-তৃতীয়াংশ সোভিয়েত রাশিয়ায় অবস্থিত। এই দেশের বনাঞ্চল ইউরোপের পূর্বাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া এশিয়ার

গ্রীনিচ পশ্চিম
পূর্ব
0°
উত্তর মহাসাগর
উত্তর বৃত্ত
আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
কর্কট ক্রান্তি রেখা
নিরক্ষ রেখা
ভারতমহাসাগর
মকর ক্রান্তি রেখা
পৃথিবীর বনভূমি বণ্টন
সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি
ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি
নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি
পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি
চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি
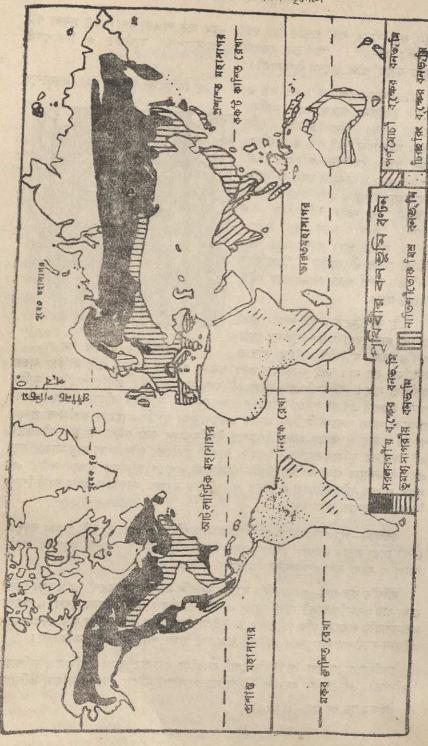
পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দেশের উত্তরাংশের বনভূমির কাঠ হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কাগজ ও কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি তৈয়ারি করা হয়। এখানকার তাইগা সরল-বর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির আয়তন প্রায় ৫২ কোটি হেক্টর ; ইহা সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের কোনো কোনো স্থান এখনও দুর্গম। সেইজন্য কাষ্ঠ সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

কানাডা—কুইবেক ও অন্টারিও অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি বিদ্যমান। এই বনভূমির কাঠ হইতে এখানে কাগজ-শিল্পের জন্য কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয়। কাগজ উৎপাদনে কানাডার স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়, কিন্তু নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন ও রপ্তানিতে কানাডার স্থান প্রথম।

ইউরোপের ফিনল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালিতে সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায়। এই সকল বৃক্ষের কাঠ দিয়া কাগজ, পেন্সিল, ঘড়ির ফ্রেম, কৃত্রিম রেশম ও দিয়াশলাই প্রস্তুত করা হয় এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই সকল দেশের মধ্যে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন কাঠ ও কাগজ রপ্তানির জন্য বিখ্যাত।

এশিয়ায় জাপানের উত্তরাংশে, মাঞ্চুরিয়ায় ও উত্তর চীনে, ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে ও হিমালয় পর্বতের পাদদেশে এইপ্রকার বনভূমি দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলের দক্ষিণাংশে, আর্জেন্টিনা ও চিলির দক্ষিণে আন্ডিজ পর্বতে এই বনভূমি বিদ্যমান। নিউ জিল্যান্ডের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এই প্রকার বনভূমিতে কাউরি পাইন গাছ জন্মে।

সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাষ্ঠ-রপ্তানিতে কানাডা, সুইডেন, ব্রাজিল, সোভিয়েত রাশিয়া ও ফিনল্যান্ড বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস্ প্রভৃতি দেশ এই সকল কাঠের প্রধান আমদানিকারক।

(খ) চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি
(Evergreen Forests)

যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যধিক, সেখানে এই প্রকার বনভূমি দেখা যায়। উষ্ণ-মণ্ডলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এখানে চিরহরিৎ বৃক্ষের আধিক্য দেখা যায়। জলের অভাব না থাকায় এই সকল গাছের পাতা ঝরে না এবং গাছ সর্বদা সবুজ পাতায় আবৃত থাকে। এইজন্য ইহাকে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি বা নিরক্ষীয় বনভূমি বলা হয়। আমাজনীয় জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত ব্রাজিল, ইকুয়েডর, মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, মধ্য আমেরিকার পানামা ও নিকারাগুয়া, এশিয়া মহাদেশের মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ও পূর্ব হিমা-লয়ের তরাই অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়।

উপজাত দ্রব্য—জাপোট গাছের রস হইতে প্রস্তুত চিক্‌ল অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। ইহা চিউইং গাম প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। মেক্সিকো হইতে ব্রাজিল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমিতে ইহা পাওয়া যায়। পশ্চিম আফ্রিকার বনভূমিতে পামনাট পাওয়া যায়। ইহা হইতে পাম তৈল প্রস্তুত হয়। ভারত ও পাকিস্তানের বনভূমি হইতে লাক্ষা ও মোম সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা রপ্তানি করিয়া ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ব্রাজিলের ব্রাজিলনাট খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনভূমি হইতে রবার সংগ্রহ করা হয়। রবার একপ্রকার

গাছের আঠা হইতে প্রস্তুত হয়। এই গাছ নিরক্ষীয় অঞ্চলেই দেখা যায়। এই বনভূমিতে কলা, আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি গাছ জন্মে। এই সকল গাছের ফল সুমিষ্ট। এই সকল ফল সংগ্রহ করিয়া বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering Industry)—চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমিতে অসংখ্য মূল্যবান বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বনভূমির মেহগনি, আবলুস, সেগুন, পাম প্রভৃতি গাছ হইতে শক্ত কাঠ সংগ্রহ করা হয়। ব্রহ্মদেশীয় সেগুন কাঠ প্রধানতঃ আসবাবপত্র ও জাহাজ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

এই সকল মূল্যবান বৃক্ষ থাকা সত্ত্বেও এখানে কাষ্ঠশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলি সমৃদ্ধিশালী না হওয়ায় এখানে কাঠের চাহিদা অত্যন্ত কম। এই বনভূমি অত্যন্ত ঘন বলিয়া এবং বৃক্ষাদি অসংখ্য লতা-পাতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া থাকায় বৃক্ষাদি কাটিয়া বাহিরে লইয়া আসা কষ্টসাধ্য। কোনো কোনো স্থানে হাতীর সাহায্যে কাঠ টানিয়া বাহিরে আনা হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মতো এই সকল স্থান বরফাবৃত না থাকায় অল্প ব্যয়ে কাঠ পাঠানো সম্ভব নহে। যানবাহনের উন্নতি না হওয়ায় বনভূমি হইতে কাঠ চালান দেওয়া কষ্টসাধ্য। কাঠগুলি ভারি বলিয়া জলে ভাসাইয়া পাঠানো সম্ভব নহে। এই অঞ্চলে বৃক্ষাদি এত ঘন হয় যে, সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য এই সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর এবং মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। ফলে এখানে কাঠ কাটিবার জন্য শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সকল কারণে এখানে বনজ সম্পদ সংগ্রহে অসুবিধা হয় এবং অনেক মূল্যবান কাঠ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

অবস্থান—উষ্ণমণ্ডলের অত্যধিক উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এইজন্য উষ্ণমণ্ডলেই এই বৃক্ষ বেশী দেখা যায়। মৌসুমী অঞ্চলেও কিছু কিছু চিরহরিৎ বৃক্ষ দেখা যায়। ব্রাজিলের আমাজন-উপত্যকা, আফ্রিকার কঙ্গো-উপত্যকা, মালয়েশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যাপক স্থান জুড়িয়া এই বনভূমি বিদ্যমান। এই অঞ্চলের রবারগাছ অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। উষ্ণমণ্ডলের এই সকল দেশ পৃথিবীর সর্বত্রই রবার সরবরাহ করিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের আবলুস ও সেগুন কাঠ উল্লেখযোগ্য মূল্যবান সম্পদ। স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া উৎপাদনকারী দেশগুলি কাঠের অল্প অংশই বিদেশে রপ্তানি করিতে পারে।

(গ) পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি
(Deciduous Forests)

উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এই বনভূমি দেখা যায়। যে সময় বৃষ্টিপাত কম হয় সেই সময় গাছগুলি জলের খরচ বাঁচাইবার জন্য পত্র ত্যাগ করে। এইজন্য এই সকল গাছকে পর্ণমোচী অর্থাৎ পতনশীল পত্রযুক্ত গাছ বলা হয়। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় এখানকার সমভূমিতে অবস্থিত বনভূমির কিয়দংশ কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। সেইজন্য পর্বতগাত্রেই এই জাতীয় বনভূমি বেশী পরিলক্ষিত হয়।

পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমিকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) মৌসুমী অঞ্চলের বনভূমি ও (২) গ্রীষ্মপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনভূমি।

(১) **মৌসুমী অঞ্চলের বনভূমি**—সারা বৎসর উচ্চ তাপমাত্রা ও গ্রীষ্মকালীন পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। শীতকালে বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না। এই অঞ্চলে উত্তাপ ও গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। মৌসুমী অঞ্চলে শীতকাল প্রায় বৃষ্টিশূন্য থাকে বলিয়া সেই সময় বেশ কিছুদিন গাছ মাটি হইতে প্রয়োজনীয় রস পায় না; সেইজন্য শীতকালে যাহাতে পাতার মধ্য দিয়া প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় গাছ হইতে রস বাহির হইয়া
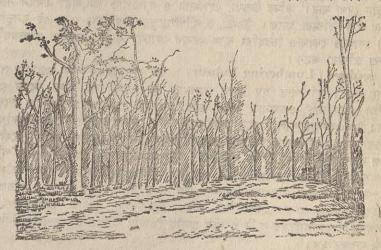
মধ্য প্রদেশের সেগুন (পর্ণমোচী) বন

যাইতে না পারে সেইজন্য শরৎকালের শেষ দিক হইতে শীতের প্রথম দিক পর্যন্ত অনেক গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। তাই এই অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি সৃষ্টি হয়। কিন্তু মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অন্তর্ভুক্ত যে সকল এলাকায় ১০০—২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টিপাত চারি-পাঁচ মাস ধরিয়া হইয়া থাকে, সেই সকল এলাকায় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। সেই জন্যই মৌসুমী অঞ্চলের অরণ্যকে **মিশ্র বনভূমি** বলে।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering Industry)—এই বনভূমির উষ্ণ অঞ্চলে শাল, সেগুন, লোহাকাঠ, খদির, শিশু, গর্জন, চাপলাস, বট, তাল, জারুল, হলদু প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। গৃহ, আসবাবপত্র, জাহাজ, মোটরগাড়ি ও রেলগাড়ি-নির্মাণে এই সকল কাঠ ব্যবহৃত হয়। এই বনভূমির **কাঠ শক্ত (Hard Wood)** ও স্থূলকায়। এই জন্য কাগজ শিল্পে এই কাঠ ব্যবহৃত হয় না। এই বনাঞ্চলের কোনো কোনো অংশ হইতে কাঠ কাটিয়া আনা খুব কষ্টসাধ্য। যানবাহনের সুবন্দোবস্ত না থাকায় বহু কাঠ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই কারণে এই বনভূমি অঞ্চলে কাষ্ঠ-শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। এখানকার বনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত জন্মে।

উপজাত দ্রব্য—মোম, মধু, লাক্ষা প্রভৃতি বনজ সম্পদ এখানকার বন হইতে

আহরণ করা হয়। রবার, কর্পূর, মসলা, সিঙ্কোনা, হরীতকী, পামনাট প্রভৃতিও এই অঞ্চলের বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

অবস্থান—ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো অংশ, ব্রাজিলের দক্ষিণ অংশ, সুদানের দক্ষিণ অংশ, উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উপকূল (কুইন্সল্যান্ড) প্রভৃতি অঞ্চলে মৌসুমী অরণ্য বিদ্যমান।

(২) **গ্রীষ্মপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনভূমি**—এই অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। ভূমির উচ্চতা, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত অনুযায়ী এখানে নানা-প্রকার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য এই বনভূমির মধ্যে কোথাও কোথাও চিরহরিৎ বৃক্ষ আবার কোনো কোনো এলাকায় সরলবর্গীয় বৃক্ষও জন্মিয়া থাকে।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering Industry)—এই অঞ্চলের যে সকল এলাকায় সারা বৎসর ব্যাপী বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু তাপমাত্রা কম থাকে সেই সকল স্থানে ওক, ম্যাপল, এলম, বার্চ, ওয়ালনাট, জারা, কারি, আখরোট, চেস্টনাট প্রভৃতি গাছ জন্মে। ইহার উষ্ণ এলাকায় শাল, সেগুন, লোহাকাঠ, চন্দন, গোলাপগন্ধ প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে অনুকূল জলবায়ুর জন্য ঘন লোকবসতি বিদ্যমান; যোগা-যোগ ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। ফলে এখানে কাষ্ঠশিল্পের উন্নতি পরি-লক্ষিত হয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের পর্বতগাত্র হইতে কাঠ কাটিয়া আনা কষ্টসাধ্য ও পার্বত্য এলাকায় যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি না ঘটায় অরণ্য সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। আসবাবপত্র, জাহাজ, মোটরগাড়ি ও রেলগাড়ি, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে এই অঞ্চলের বিভিন্ন কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

উপজাত দ্রব্য—গ্রীষ্মকালে গাছ মাটি হইতে অতি অল্প পরিমাণ রস সংগ্রহ করে বলিয়া এই সকল গাছের বাকল খুব শুষ্ক হয়। এই বাকল হইতে কর্ক প্রস্তুত হয়। এখানে বাদাম, আখরোট ও খুবানি প্রভৃতি ফল বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়।

অবস্থান—চীন, জাপান ও মেক্সিকোর পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপ, কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম অংশ, দক্ষিণ চিলি, দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে এই অরণ্য অবস্থিত।

(ঘ) নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি

উপরে বর্ণিত তিন প্রকার বনভূমি ছাড়াও পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে বিভিন্ন রকমের মিশ্র বনভূমি দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্ণমোচী বৃক্ষের সহিত সরলবর্গীয় বৃক্ষের আবার কোথাও কোথাও চিরহরিৎ বৃক্ষের সহাবস্থান দৃষ্ট হয়। (১০৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে (ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহ ও অন্যান্য দেশের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে) বিশেষ ধরনের বৃহৎ পত্র বিশিষ্ট চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য শুষ্ক ও উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এবং আর্দ্র ও শীতল শীতকাল। এই জলবায়ুর সহিত খাপ খাওয়াইবার উপযুক্ত

বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের গাছগুলির আছে। এখানকার গাছগুলির ছাল পুরু ও পাতার উপরে মোমের আবরণ থাকে। ইহাতে শুষ্ক ও উষ্ণ গ্রীষ্মকালে গাছগুলি হইতে জল বাষ্প হইয়া নষ্ট হয় না। ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমির বৃক্ষের ছাল হইতে ছিপি তৈয়ারি হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর বনভূমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টর)

মহাদেশ	সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি	নাতিশীতোষ্ণ, শক্তকাঠের বনভূমি	ক্রান্তীয় শক্তকাঠের বনভূমি
এশিয়া	৩,৫৫৬	২,২৮৮	২,৪৫০
আফ্রিকা	২৮	৬৮	৩,০৯২
ইউরোপ	২,৩১৬	৭৮০	০
অস্ট্রেলিয়া	৬০	৬০	১,০১২
উঃ আমেরিকা	৪,১৮৪	১,১৬০	৪০২
দঃ আমেরিকা	৪৩৬	৪৬০	৭,৪৭৬
	১০,৫৮০ (৩৫%)	৪,৮১৬ (১৬%)	১৪,৫৫২ (৪৯%)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাষ্ঠ উৎপাদন

(কোটি কিউবিক মিটার)

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
সোভিয়েত রাশিয়া	৩৮·৪	সুইডেন	৫·৮
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৩·৬	ফিনল্যান্ড	৪·৭
কানাডা	১৪·৪	ফ্রান্স	৪·৪
		জাপান	৪·২

কাষ্ঠের ব্যবসায়
(Timber trade)

নরম কাষ্ঠ (পাইন, ফার, স্প্রুস, বার্চ প্রভৃতি) হইতে কাগজ প্রস্তুত হয় বলিয়া সারা পৃথিবীতে এই কাষ্ঠের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। সরলবর্গীয় বৃক্ষ হইতে এই নরম কাষ্ঠ পাওয়া যায়। এইজন্য সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চলের দেশগুলি (যথা, কানাডা, সুইডেন, ব্রাজিল, সোভিয়েত রাশিয়া ও ফিনল্যান্ড) নরম কাষ্ঠের রপ্তানিতে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। অন্যান্য উন্নত ও উন্নতিশীল দেশে এই নরম কাঠের চাহিদা অত্যন্ত বেশী ; এইজন্য এই সকল দেশ এই কাষ্ঠ আমদানি করে। আমদানিকারকদের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ভারত প্রভৃতি দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি হইতে শাল, জারুল, হলদু, ওক, বীচ, আখরোট, এলম, চেস্টনাট প্রভৃতি শক্ত কাঠ উৎপন্ন হয়। ওজনে ভারী বলিয়া এই সকল কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানি করা ব্যয়সাধ্য ; তাই অধিকাংশ কাষ্ঠ স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি হইতে মেহগনি, আবলুস, সেগুন, পাম প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদেশীয় সেগুন কাষ্ঠ আসবাবপত্র ও জাহাজ নির্মাণে ব্যবহৃত হয় এবং এই কাষ্ঠ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। অবশ্য স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া এইজাতীয় কাষ্ঠের খুব অল্প অংশই বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

বনজ সম্পদ সংরক্ষণ
(Conservation of Forest Resources)

যথেচ্ছভাবে বনভূমি হইতে গাছ কাটিবার ফলে মানুষের প্রচুর ক্ষতি হয়। ইহাই ভারতের অধিকাংশ প্লাবন হওয়ার ও ধস নামার অন্যতম কারণ। বনভূমির অভাবে বৃষ্টিপাত কম হয়। বৃষ্টিপাত কমিলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। উপরন্তু নদীর দুইকূল ভাঙে, জমির উর্বরতা নষ্ট হয় ; পতিত জমির পরিমাণ বাড়ে।

বিভিন্ন দেশে সেইজন্য বনজ সম্পদ সংরক্ষণের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। মানুষের লোভ সীমাহীন। সীমাহীন লোভেই ধ্বংস আসে। উত্তরবঙ্গে বনহীন তিস্তা নদীর দুই তীর এইভাবে সর্বনাশা বন্যায় হাহাকার তুলিয়াছিল। এই কারণেই অতীতে কোশী, দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদী প্রতি বৎসর মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস করিত।

ভারতে ১৯৫২ সালে লোকসভার জাতীয় বন-নীতির উপর সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব লওয়া হয়। সেই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল অন্ততঃ সারা ভারতে শতকরা ৩৩·৩ ভাগ জমি বনভূমি হিসাবে সংরক্ষিত করা। ১৯৫০ সালে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড স্থাপিত হয় এবং মৃত্তিকা-সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা সেই সকল সমাজদ্রোহীদের লইয়া যাহারা অর্থের লোভে গোপনে পশু শিকার করে এবং সাময়িক মুনাফার লোভে যথেচ্ছভাবে বৃক্ষ ছেদন করে। কাষ্ঠ-ব্যবসায় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ করা না হইলে এইভাবেই প্রতি বৎসর জাতীয় সম্পত্তির অপচয় ঘটিবে। এই ধরনের অপরাধ দেশদ্রোহিতা এবং ইহার জন্য উপযুক্ত শাস্তির প্রয়োজন। কানাডা ও সোভিয়েত রাশিয়া বনভূমি সংরক্ষণে আদর্শস্থানীয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণে আদর্শ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। বিভিন্ন দেশে বনভূমি সংরক্ষণার্থে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে ঃ

(১) **দাবানল নিরোধ ব্যবস্থা**—হিমোষ্ণ অঞ্চলে বিশেষতঃ কানাডা এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণ হেতু দাবানল সৃষ্টি হয়। যথাযথ নিরোধ ব্যবস্থা না থাকিলে অগ্নিতে বনজ সম্পদ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। কানাডার বনসমূহে দাবানল নিবারণের জন্য কিছু দূর দূর ব্যবধানে প্রহরাকেন্দ্র আছে। প্রতি কেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি, খবরাখবর দিবার আধুনিক ব্যবস্থা প্রভৃতি রহিয়াছে।

(২) **পতিত জমি বনভূমিতে রূপান্তর**—অনেকক্ষেত্রে যে জমি চাষের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া যায় তাহা বনভূমিতে রূপান্তরিত করা লাভজনক। বৃক্ষ রোপণে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জমির ভূমিক্ষয় নিবারিত হয় এবং প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি রোপণের ফলে বাণিজ্যে আয় বৃদ্ধি পায়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় এইভাবে বহু জমি বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

(৩) **ছোট বা অপরিণত বৃক্ষাদি ছেদন সরকারী আইন দ্বারা নিষিদ্ধকরণ**—অপরিণত বৃক্ষাদি কর্তনের ফলে বনভূমি নিঃশেষ হইয়া যায়। শিল্পোন্নত দেশে ইহা আইন বিরোধী কার্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

(৪) **চারাগাছ-সম্বলিত বনাঞ্চলে পশুচারণ নিষিদ্ধকরণ**—ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় আইন দ্বারা চারাগাছ-সম্বলিত বনাঞ্চলে পশুচারণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। পশুচারণ অবারিত চলিতে থাকিলে বনভূমি সৃষ্টি সম্ভব নহে।

(৫) **বনাঞ্চলে যথাযথ যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থা** থাকা উচিত এবং বনরক্ষার কার্যে **প্রহরী** রাখা দরকার। ভারতে বে-আইনী কাঠ-কাটা ও **পশু শিকার-লোভী** (Poachers) মানুষদের দুষ্কার্যে বনভূমির সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। উন্নত দেশ-গুলিতে এই ধরনের অপরাধীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা আছে।

(৬) **বন্য জীবজন্তু সংরক্ষণের প্রয়োজন**—কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পার্কগুলিতে অরণ্য ও পশু সংরক্ষণ করা হয়। ভারতেও কাজিরাঙ্গা, হাজারিবাগ, গির প্রভৃতি অঞ্চলে সংরক্ষিত বনভূমি রহিয়াছে ; কিন্তু এই সকল বনভূমিতে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৭) **বনভূমি এবং কাষ্ঠ ব্যবসায়** জাতীয়করণ করা প্রয়োজন এবং **পশুবিক্রয়** সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা প্রয়োজন।

(৮) প্রয়োজনীয় **বৃক্ষাদি আরও অধিক সংখ্যায় রোপণ** করা প্রয়োজন।

এই সকল পন্থা গ্রহণ করিতে পারিলে পৃথিবীর বনজ সম্পদ সংরক্ষণ করা **সম্ভব**।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Discuss the direct and indirect utilities of forest resources.

[বনজ সম্পদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহার আলোচনা কর।]

উঃ। 'বনভূমির উপকারিতা' (৯৯-১০০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

2. (a) Mention the geographical factors favourable for the growth of forests. (b) Classify forests of the world. (c) Describe the various economic uses of forests. **[H. S. Examination, 1982]**

[(ক) বনভূমি সম্প্রসারণের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ উল্লেখ কর। (খ) পৃথিবীর বনাঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ কর। (গ) বনভূমির বহুবিধ অর্থনৈতিক ব্যবহার আলোচনা কর।]

উঃ। 'বনভূমি সম্প্রসারণের ভৌগোলিক উপাদানসমূহ' (১০০-১০১ পৃঃ), 'পৃথিবীর বনভূমির বণ্টন' (১০২-১০৯ পৃঃ) ও 'বনভূমির উপকারিতা' (৯৯-১০০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Classify forests on the basis of climate and give their world distribution. Narrate the commercial uses of the products of the temperate forests.

[C. U. B. Com. 1956 ; B. U. B. Com. 1967 & 1971]

[জলবায়ুর ভিত্তিতে পৃথিবীর বনভূমি অঞ্চলসমূহের শ্রেণীবিভাগ কর। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনজ দ্রব্যাদির বাণিজ্যিক ব্যবহার বর্ণনা কর।]

উঃ। 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ' (১০১-১০২ পৃঃ) এবং 'কাষ্ঠশিল্প' (১০২-১০৩ পৃঃ) ও (১০৮-১০৯ পৃঃ) এবং 'উপজাত দ্রব্য' (১০২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Classify the forests of the world. Mention the principal uses of the forest-wealth and indicate the nature for its conservation.

[H. S. Examination, 1984]

[পৃথিবীর বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর। বনসম্পদের প্রধান প্রধান ব্যবহার উল্লেখ করিয়া উহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ কর।]

উঃ। 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ' (১০১-১০২ পৃঃ), 'পৃথিবীর বনভূমির বণ্টন' (১০২-১০৯ পৃঃ) ও 'কাষ্ঠের ব্যবহার' (১০৯-১১০ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

5. Classify the forest types of the world on the basis of climate. What are the problems of conservation of these resources?

[H. S. Examination, 1980]

[জলবায়ুর ভিত্তিতে পৃথিবীর বনভূমি অঞ্চলসমূহের শ্রেণীবিভাগ কর। এই সম্পদ সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় সমস্যাবলী কি কি?]

উঃ। 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ' (১০১-১০২ পৃঃ) ও 'বনজ সম্পদ সংরক্ষণ' (১১০-১১১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Indicate the geographical location of the coniferous forest-belts of the world and describe the commercial uses of the products of these forests.

[C. U. B. Com. 1969, 1972; B. U. B. Com. 1962 & Specimen Question, 1980]

[পৃথিবীর সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর এবং এই সকল বনভূমির বনজ সম্পদের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যবহার বর্ণনা কর।]

উঃ। 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' (১০২-১০৫ পৃঃ) লিখ।

7. Describe the lumbering activities in the coniferous forest-belts of Urasia and North America. [C. U. B. Com. 1970]

[ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির কাষ্ঠশিল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী বর্ণনা কর।]

উঃ। 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' (১০২-১০৫ পৃঃ) হইতে লিখ।

8. Account for the geographical distribution of Coniferous Forest of the world. What are the various uses of this forest?

[H. S. Examination, 1978]

[পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সরলবর্গীয় বনভূমির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণ নির্দেশ কর। এই বনসম্পদ কিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে?]

উঃ। 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' (১০২-১০৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. Name the important forest types of the world. Give the geographical distribution of *any one* of the forest types. What are the uses of forest products?

[C. U. B. Com. 1974; B. U. B. Com. 1973]

[পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধরনের বনভূমির নাম লিখ। ইহাদের যে কোনো একটি ধরনের ভৌগোলিক বণ্টন নির্দেশ কর। বনভূমি হইতে উদ্ভূত বস্তুগুলির ব্যবহার কি কি?]

উঃ। 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ' (১০১-১০২ পৃঃ), 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' হইতে 'অবস্থান' (১০৩-১০৫ পৃঃ) ও 'উপজাত দ্রব্য' ও 'কাষ্ঠশিল্প' (১০২-১০৩ পৃঃ) লিখ।

10. Explain fully the concept of *Conservation of resources* and indicate briefly the need for the conservation of forest resources and their utilization in some countries of the world.

[C. U. B. Com. 1962 & 1972]

[সম্পদ সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ কর এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং কয়েকটি দেশে বনজ সম্পদের ব্যবহার নির্দেশ কর।]

উঃ। চতুর্থ অধ্যায় হইতে 'সম্পদ-সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা' (৬৮-৭০ পৃঃ) ও এই অধ্যায়ের 'বনজ সম্পদ সংরক্ষণ' (১১০-১১১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on :

(a) Coniferous forest and its utility;

[H. S. Examination, 1979]

(b) Deciduous forest and its utility.

(c) Conservation of forest resources.

[H. S. Examination, 1985]

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ

(ক) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি ও ইহার ব্যবহার ; (খ) পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি ও ইহার ব্যবহার ; (গ) বনসম্পদ সংরক্ষণ।]

উঃ। 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' (১০২-১০৫ পৃঃ), 'পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি' (১০৬-১০৮ পৃঃ) এবং 'বনজ সম্পদ সংরক্ষণ' (১১০-১১১ পৃঃ) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Give correct answers from the following statements :

(i) Resin is extracted from grapes/pine trees/oil palms.

[H. S. Examination, 1978]

(ii) Lumbering industry depends on hard wood/soft wood/bamboo/grass for success. [H. S. Examination, 1979]

(iii) Brazil/Canada/Ghana is noted for its soft-wood forests.

[H. S. Examination, 1980]

(iv) Equational forest of South America/Grasslands of Central Asia/Desert of Africa are called stepps. [H. S. Examination, 1981]

উঃ। 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ' (১০১-১০২ পৃঃ) এবং 'কাষ্ঠশিল্প' (১০২-১০৩ পৃঃ) ও (১০৮-১০৯ পৃঃ) এবং 'উপজাত দ্রব্য' (১০২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Classify the forests of the world. Mention the principal uses of the forest-wealth and indicate the nature for its conservation.

[H. S. Examination, 1984]

[পৃথিবীর বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর। বনসম্পদের প্রধান প্রধান ব্যবহার উল্লেখ করিয়া উহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ কর।]

উঃ। 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ' (১০১-১০২ পৃঃ), 'পৃথিবীর বনভূমির বণ্টন' (১০২-১০৯ পৃঃ) ও 'কাষ্ঠের ব্যবহার' (১০৯-১১০ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

5. Classify the forest types of the world on the basis of climate. What are the problems of conservation of these resources?

[H. S. Examination, 1980]

[জলবায়ুর ভিত্তিতে পৃথিবীর বনভূমি অঞ্চলসমূহের শ্রেণীবিভাগ কর। এই সম্পদ সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় সমস্যাবলী কি কি?]

উঃ। 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ' (১০১-১০২ পৃঃ) ও 'বনজ সম্পদ সংরক্ষণ' (১১০-১১১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Indicate the geographical location of the coniferous forest-belts of the world and describe the commercial uses of the products of these forests.

[C. U. B. Com. 1969, 1972; B. U. B. Com. 1962 & Specimen Question, 1980]

[পৃথিবীর সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর এবং এই সকল বনভূমির বনজ সম্পদের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যবহার বর্ণনা কর।]

উঃ। 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' (১০২-১০৫ পৃঃ) লিখ।

7. Describe the lumbering activities in the coniferous forest-belts of Urasia and North America. [C. U. B. Com. 1970]

[ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির কাষ্ঠশিল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী বর্ণনা কর।]

উঃ। 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' (১০২-১০৫ পৃঃ) হইতে লিখ।

8. Account for the geographical distribution of Coniferous Forest of the world. What are the various uses of this forest?

[H. S. Examination, 1978]

[পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সরলবর্গীয় বনভূমির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণ নির্দেশ কর। এই বনসম্পদ কিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে?]

উঃ। 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' (১০২-১০৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. Name the important forest types of the world. Give the geographical distribution of *any one* of the forest types. What are the uses of forest products?

[C. U. B. Com. 1974; B. U. B. Com. 1973]

[পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধরনের বনভূমির নাম লিখ। ইহাদের যে কোনো একটি ধরনের ভৌগোলিক বণ্টন নির্দেশ কর। বনভূমি হইতে উদ্ভূত বস্তুগুলির ব্যবহার কি কি?]

উঃ। 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ' (১০১-১০২ পৃঃ), 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' হইতে 'অবস্থান' (১০৩-১০৫ পৃঃ) ও 'উপজাত দ্রব্য' ও 'কাষ্ঠশিল্প' (১০২-১০৩ পৃঃ) লিখ।

10. Explain fully the concept of *Conservation of resources* and indicate briefly the need for the conservation of forest resources and their utilization in some countries of the world.

[C. U. B. Com. 1962 & 1972]

[সম্পদ সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ কর এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং কয়েকটি দেশে বনজ সম্পদের ব্যবহার নির্দেশ কর।]

উঃ। চতুর্থ অধ্যায় হইতে 'সম্পদ-সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ধারণা' (৬৮-৭০ পৃঃ) ও এই অধ্যায়ের 'বনজ সম্পদ সংরক্ষণ' (১১০-১১১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on :

(a) Coniferous forest and its utility ;

[H. S. Examination, 1979]

(b) Deciduous forest and its utility.

(c) Conservation of forest resources.

[H. S. Examination, 1985]

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ

(ক) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি ও ইহার ব্যবহার ; (খ) পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি ও ইহার ব্যবহার ; (গ) বনসম্পদ সংরক্ষণ।]

উঃ। 'সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি' (১০২-১০৫ পৃঃ), 'পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি' (১০৬-১০৮ পৃঃ) এবং 'বনজ সম্পদ সংরক্ষণ' (১১০-১১১ পৃঃ) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Give correct answers from the following statements :

(i) Resin is extracted from grapes/pine trees/oil palms.

[H. S. Examination, 1978]

(ii) Lumbering industry depends on hard wood/soft wood/bamboo/grass for success. **[H. S. Examination, 1979]**

(iii) Brazil/Canada/Ghana is noted for its soft-wood forests.

[H. S. Examination, 1980]

(iv) Equational forest of South America/Grasslands of Central Asia/Desert of Africa are called stepps. **[H. S. Examination, 1981]**

(v) Siberia is very rich in hardwood/bamboo/pine forests.
(vi) Taiga is famous for coniferous/evergreen/deciduous forest.

[H. S. Examination, 1984]

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর দাওঃ

(ক) গ্রাক্ষাফল/পাইন গাছ/তৈল-পাম গাছ হইতে রঞ্জন প্রস্তুত করা হয়।

(খ) শক্ত কাঠ/নরম কাঠ/বাঁশ/ঘাস-এর যোগানের উপর কাষ্ঠ-চেরাই শিল্প নির্ভরশীল।

(গ) ব্রাজিল/কানাডা/ঘানা নরম কাষ্ঠের অরণ্যের জন্য বিখ্যাত।

(ঘ) দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় বনভূমি/মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি/আফ্রিকার মরুভূমিকে স্তেপস্ বলা হয়।

(ঙ) ভারীকাঠ/বাঁশ/পাইন গাছে সাইবেরিয়া খুব সমৃদ্ধ।

(চ) সরলবর্গীয়/চিরহরিৎ/পর্ণমোচী বনভূমির জন্য তাইগা অঞ্চল খ্যাতিলাভ করিয়াছে।]

2. Insert tick marks (✓) against correct and cross marks (×) against incorrect sentences :

(i) Of the total land on the earth 40% is covered with forests. (ii) Inferior kind of woods is used as fuel. (iii) Forests lands do not influence the climate of a country. (iv) Dyeing is manufactured from the Pine trees. (v) Coniferous forest grows generally between latitudes 45°S and 65°S. (vi) Evergreen forests are seen in the torried zone which is drenched by heavy rain. (vii) Cork is made of barks from the trees of Mediterranean forests.

[শুদ্ধ বাক্যের পাশে ✓ (টিক) চিহ্ন ও ভুল বাক্যের পাশে × (ক্রশ) চিহ্ন দাওঃ (i) পৃথিবীর মোট স্থলভাগের শতকরা ৪০ ভাগ বনভূমিতে আচ্ছাদিত। (ii) নিকৃষ্ট জাতীয় কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (iii) দেশের জলবায়ুর উপর বনভূমির কোনো প্রভাব নাই। (iv) পাইন বৃক্ষ হইতে রঞ্জন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। (v) সাধারণতঃ ৪৫° হইতে ৬৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে সরলবর্গীয় বনভূমি দেখা যায়। (vi) অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া উষ্ণমণ্ডলে চিরহরিৎ বনভূমির আধিক্য দেখা যায়। (vii) ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমির বৃক্ষের ছাল হইতে ছিপি তৈয়ারি হয়।]

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্তিকা
(Soil)

মৃত্তিকার প্রকৃতি
(Features of Soil)

ভূত্বকের বহিরাবরণের উপরিভাগের সূক্ষ্ম পদার্থের শিথিল কোমল স্তরকে মৃত্তিকা বলে। মৃত্তিকা নিম্নস্থ কঠিন শিলার আবরণ মাত্র। পর্বতগাত্রের নগ্ন বহির্ভাগ ছাড়া স্থলভাগের অধিকাংশ স্থান মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। কঠিন শিলা হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়।

মৃত্তিকার উৎপত্তি

মৃত্তিকার উৎপত্তি (Formation of Soil)—সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটি কারণে ভূপৃষ্ঠের কঠিন শিলা হইতে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়ঃ

(ক) নৈসর্গিক প্রভাব, (খ) রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাব, (গ) জৈবিক প্রভাব।

(ক) **নৈসর্গিক প্রভাব**—উত্তাপের তারতম্য, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদ-নদী, সমুদ্রস্রোত, হিমবাহ প্রভৃতির ক্রিয়ায় শিলা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়। মৃত্তিকার উৎপত্তির মূলে জলবায়ুর প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। উত্তাপের পার্থক্য, বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ, শিলার সহিত শিলার ঘর্ষণ প্রভৃতির ফলে কঠিন শিলাস্তর চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হইয়া মৃত্তিকা গঠন করে। এই গঠন প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা যান্ত্রিক আবহবিকার (Mechanical Weathering) বলে।

(খ) **রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাব**—বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ও ভূপৃষ্ঠের ধাতব লবণ ইত্যাদির মধ্য দিয়া বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইলে তাহা মৃদু অ্যাসিডে পরিণত হয়। ইহার রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে কঠিন শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হইয়া মৃত্তিকা গঠন করে। এই গঠন প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা **রাসায়নিক আবহবিকার** (Chemical Weathering) বলে। মৃত্তিকা গঠনে রাসায়নিক আবহবিকারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) **জৈবিক প্রভাব**—জীবজন্তু ও উদ্ভিদের ক্রিয়াকলাপের উপরও মৃত্তিকার উৎপত্তি নির্ভর করে। কেঁচো, উই প্রভৃতি প্রাণী ভূত্বক হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তিতে সাহায্য করে। বড় বড় গাছের শিকড় অনেক সময় শিলাকে ফাটাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ করে এবং উহাকে ক্রমশঃ মৃত্তিকাতে রূপান্তরিত হইতে সাহায্য করে। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর গলিত দেহের উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে উহা মৃদু জৈবিক অ্যাসিডে

পরিণত হয় এবং শিলার সহিত এই অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কঠিন শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকা গঠন করে। এই গঠন প্রক্রিয়াকে জৈবিক প্রক্রিয়া বলে।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ—পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে, যে জাতীয় শিলা হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি, মৃত্তিকার গুণ সম্পূর্ণরূপে উহার উপর নির্ভর করে। সেই সময় মৃত্তিকাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতঃ

(ক) অবশিষ্ট মৃত্তিকা (Residual Soil),

(খ) অপসৃত মৃত্তিকা (Transported Soil)।

(ক) **অবশিষ্ট মৃত্তিকা**—কোনো স্থানের কঠিন শিলার স্তর চূর্ণবিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানেই নিম্নস্থ শিলার উপর যে মৃত্তিকার আবরণ সৃষ্টি করে উহাকে অবশিষ্ট মৃত্তিকা বলে। যে মূল শিলা-স্তর হইতে অবশিষ্ট মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, তাহার পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্তিকা-কে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ যেমন, বেলেপাথর হইতে উৎপন্ন বেলেমাটি, চুনাপাথর হইতে উৎপন্ন চুনামাটি (খড়ি মাটি), গ্রানাইট পাথর হইতে উৎপন্ন লালমাটি ও ব্যাসল্ট পাথর হইতে উৎপন্ন কালোমাটি। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অন্তর্গত কৃষ্ণমৃত্তিকা অবশিষ্ট মৃত্তিকার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

(খ) **অপসৃত মৃত্তিকা**—বৃষ্টির জল, বায়ু, নদ-নদী, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা শিলাকণা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অপসারিত হইয়া সঞ্চিত হয়; এইজাতীয় সঞ্চিত মৃত্তিকাকে অপসৃত মৃত্তিকা বলে। এই মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রকারের শিলার উপাদান দিয়া গঠিত হয় বলিয়া অপসৃত মৃত্তিকার উর্বরতা অধিক হইয়া থাকে। যে প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা এই জাতীয় মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, উহার নামানুসারে ইহাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ যেমন, হিমবাহ মৃত্তিকা, পলি মৃত্তিকা, হ্রদ মৃত্তিকা, বায়ব মৃত্তিকা (লোয়েস) ইত্যাদি। উত্তর ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পলি মৃত্তিকা অপসৃত মৃত্তিকার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সোভিয়েত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক ডকুশেভ প্রমাণ করেন যে, মৃত্তিকা গঠনে মূল শিলাখণ্ড ছাড়াও জলবায়ু ও উদ্ভিদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মূল শিলা-স্তর যাহাই হউক না কেন, একই প্রকারের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও উদ্ভিদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রায় একই রকমের মৃত্তিকা গঠন করিয়া থাকে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ মৃত্তিকা গঠনের মূলে জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, মূল শিলাখণ্ড ও সময়ের প্রভাব সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন।

মৃত্তিকার উপাদান—মৃত্তিকা কেবলমাত্র শিলাচূর্ণ নহে; খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, বায়ু, জল, অম্ল প্রভৃতি মৃত্তিকার উপাদান। এই সকল উপাদানের তারতম্যের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতার পার্থক্য দেখা যায়।

সিলিকা, সিলিকেট, বিভিন্ন লৌহ অক্সাইড, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম,

ম্যাগনেসিয়াম, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য মৃত্তিকায় মিশ্রিত থাকে। এই সকল খনিজ গাছের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

গাছপালা, লতাপাতা, শেওলা, বিভিন্ন প্রাণীর মৃতদেহ প্রভৃতি পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়; ইহাকে **হিউমাস্‌** বলে। হিউমাসে ফসফরাস্‌, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি থাকে; এইগুলি মাটির সহিত মিশিয়া মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। আবার জৈব পদার্থ উদ্ভিদের খাদ্যকে জলে দ্রবীভূত হইতে সাহায্য করায় উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে অতি সহজেই উহার খাদ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

মৃত্তিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বায়ু থাকে। বায়ু জৈব পদার্থের কিছু অংশকে নাইট্রোজেনে পরিণত করিয়া গাছের খাদ্যে রূপান্তরিত করে। ইহা ছাড়া মাটির মধ্যে বসবাসকারী কীট ও জীবাণুকে অক্সিজেন যোগান দিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করে।

মাটির জৈব পদার্থের মধ্য দিয়া যাইবার সময় জল মৃদু জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন করে ও মাটির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যকে দ্রবীভূত করে। উদ্ভিদ খনিজ পদার্থের দ্রবণ শিকড়ের মাধ্যমে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

মৃত্তিকায় অধিক অম্লতা বা অধিক ক্ষারকীয়তা ভাল নহে; তবে মৃত্তিকায় অল্প পরিমাণ অম্ল থাকা প্রয়োজন।

মৃত্তিকায় জলবায়ুর প্রভাব—মৃত্তিকার উৎপত্তির মূলে অনেক কারণ বিদ্যমান থাকিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মৃত্তিকার উপর জলবায়ুর প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী। জলবায়ুর পার্থক্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মাটি দেখা যায়।

মেরু অঞ্চলে অত্যধিক শীতের জন্য বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফ জমিয়া থাকে। ফলে মাটির গঠনকার্য ব্যাহত হয়। ইহাছাড়া এতদঞ্চলে অত্যধিক শৈত্যের জন্য গাছপালা কম জন্মায়। মৃত্তিকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত জলে অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপ ও বৃষ্টিপাত উভয়ের পরিমাণ বেশী থাকে। উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের মৃত্তিকা শীতল অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষা অতিদ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রাচীন অনুর্বর মৃত্তিকায় পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, মেরু অঞ্চল হইতে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে যতই যাওয়া যায়, জলবায়ুর তারতম্যের ফলে মৃত্তিকা ততই প্রবীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। মেরু অঞ্চলের মাটি সর্বাপেক্ষা নবীন হওয়ায়, সেখানে শিলাখণ্ড সম্পূর্ণরূপে মৃত্তিকায় পরিণত হইতে পারে না এবং মাটিতে জৈব পদার্থের অভাব থাকে। সেইজন্য মেরু অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর নহে। আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের মৃত্তিকা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এবং ধৌতি প্রক্রিয়া অধিক হওয়ায় সেখানকার মাটির উর্বরতাশক্তি কমিয়া যায়। কেবল মধ্য অক্ষাংশে অবস্থিত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত পরিমিত রকমের এবং পর্ণমোচী বৃক্ষ বা তৃণভূমি বিদ্যমান, সেখানেই পৃথিবীর উর্বরতম অঞ্চলসমূহ অবস্থিত। সুতরাং দেখা যায় যে, মৃত্তিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম।

মৃত্তিকার প্রভাব—কৃষিকার্যের উন্নতি প্রধানতঃ মৃত্তিকার উর্বরতাশক্তির উপর নির্ভর করে। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের কৃষির উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের মৃত্তিকার উর্বরতা। মৃত্তিকার জন্য অনেকক্ষেত্রে শিল্পের উন্নতিও লক্ষ্য করা যায়। বোম্বাই রাজ্যের শোলাপুর অঞ্চলের কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা- চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এইজন্য বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

মৃত্তিকার সহিত মানব সভ্যতার বিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, প্রাচীনকালের সভ্য মানুষ যেখানে কৃষির উপযোগী উর্বর জমি পাইয়াছে, সেখানেই প্রধানতঃ বসতি স্থাপন করিয়াছে। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া প্রাচীন যুগে এখানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল।

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Soil)

প্রাকৃতিক প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকা দেখা যায়। মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন কাজ। সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পদ্ধতি এখনও পৃথিবীর সকল দেশে গৃহীত হয় নাই। এখনও মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করার বিভিন্ন রীতি বিদ্যমান। মৃত্তিকাকে প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) আঞ্চলিক মৃত্তিকা (Zonal Soil), (২) অন্তঃ-আঞ্চলিক মৃত্তিকা (Intra-Zonal Soil) ও (৩) অনাঞ্চলিক মৃত্তিকা (Azonal Soil)।

(১) আঞ্চলিক মৃত্তিকা—বিশেষ ধরনের জলবায়ু ও উদ্ভিদ অঞ্চলে যে মৃত্তিকা গড়িয়া উঠে উহাকে আঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। এই মৃত্তিকা অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানীয় শিলার উপর গড়িয়া উঠে। এইরূপ মৃত্তিকাগুলি এক একটি অক্ষাংশ বরাবর অঞ্চল বা বলয় ব্যাপিয়া গড়িয়া উঠে। পীত, লোহিত, প্রেইরি, চেরনোজেম প্রভৃতি এই জাতীয় মৃত্তিকা।

(২) অন্তঃ-আঞ্চলিক মৃত্তিকা—আঞ্চলিক মৃত্তিকার মধ্যেই আরও একপ্রকার মৃত্তিকা গঠিত হইতে দেখা যায়। জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই যে মৃত্তিকা স্থানীয় শিলার উপর স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠে, উহাকে অন্তঃ-আঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। এই মৃত্তিকা গঠনে মূল শিলাখণ্ড জলাভূমি বা লবণের প্রভাব বেশী। মেডো বা গ্লেই জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবে, **সোলোন্চাক** ও **সোলোনেট্জ** শুষ্ক অঞ্চলে জলের অভাবে, **রেন্‌জিনা** চুনাপাথর অঞ্চলে জলের অভাবে গড়িয়া উঠা মৃত্তিকা। এইগুলি অন্তঃ-আঞ্চলিক মৃত্তিকার উদাহরণ।

(৩) অনাঞ্চলিক মৃত্তিকা—এই প্রকারের মৃত্তিকা বৃষ্টিপাত, নদ-নদী, হিমবাহ প্রভৃতি জলপ্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে বাহিত হইয়া ক্রমশঃ জমা হইতে থাকে ; এইজাতীয় মৃত্তিকাকে অনাঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। **পলিমাটি** ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মৃত্তিকাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রং, দানার প্রকৃতি ও রাসায়নিক গঠন অনুসারে মৃত্তিকাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(ক) **রং অনুসারে বিভক্তীকরণঃ** পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রং-এর মৃত্তিকা লক্ষ্য করা যায়।

আগ্নেয়গিরির লাভা হইতে কৃষ্ণবর্ণের একপ্রকার মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। ইহার নাম কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black soil)। তুলা চাষের পক্ষে এই মৃত্তিকা অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া অনেকে ইহাকে কৃষ্ণ তুলা-মৃত্তিকা (Black Cotton Soil) বলিয়া থাকে।

প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চলে ঘাস পচিয়া শিকড় প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া যে কাদামাটির সৃষ্টি হয় উহাকে **প্রেইরি মৃত্তিকা (Prairie soil)** বলে। এই মৃত্তিকার স্তর গভীর ও রং কালো। প্রেইরি মৃত্তিকায় হিউমাস্ বেশী থাকে বলিয়া ইহা খুব উর্বর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের আর্দ্র অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। গম, বীট প্রভৃতি ইহাতে ভাল জন্মে।

প্রেইরি অঞ্চলের প্রান্তে যেখানে জলবায়ু আরও শুষ্ক ও তৃণভূমির ঘাসগুলি উচ্চতায় কম, সেখানে এক বিশিষ্ট রকমের মৃত্তিকা গঠিত হয়। বৃষ্টির স্বল্পতা হেতু ধৌতি প্রক্রিয়া খুব কম হয় ও এই মৃত্তিকার নিম্নস্তরে চুনজাতীয় পদার্থ সঞ্চিত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে এই রকম মৃত্তিকা দেখা যায়। গাছপালার পচানি ও লাভা-মিশ্রিত মৃত্তিকার রং কালো হয়। এই প্রকার মৃত্তিকার নাম **চারনোজেম (Chernozem)**। ইহা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া ইহাকে 'মাটির রাজা' বলা হয়। এই মৃত্তিকায় গম, তুলা প্রভৃতির চাষ ভালো হয়।

যেখানে মাটিতে লৌহের অংশ বেশী থাকে সেখানে মাটির রং লাল হয়। এই জাতীয় মাটির নাম **লোহিত মৃত্তিকা**। সার ব্যবহার করিয়া এই মাটি চাষ করা যায়। লোহিত মৃত্তিকা অপেক্ষা ধৌতি প্রক্রিয়া অধিক হইলে এবং মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম বেশী থাকিলে মাটির রং ইটের মত দেখিতে হয় বলিয়া এই জাতীয় মাটিকে **ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা** বলা হয়। এই ধরনের মৃত্তিকা অনুর্বর ও চাষের অনুপযোগী। ক্রান্তীয় অঞ্চলে দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা, ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে লোহিত ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দেখা যায়।

পর্ণমোচী অরণ্যের যে সকল অঞ্চলে বৃহৎ পত্রযুক্ত শক্ত কাঠ জন্মে সেখানে এক বিশেষ ধরনের মৃত্তিকার উদ্ভব হয়। ইহার রং ধূসর বাদামী। এই মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ আছে ; ইহা অরণ্য অঞ্চলের মৃত্তিকাগুলির মধ্যে বেশী উর্বর। এই জাতীয় মৃত্তিকাকে **ধূসর বাদামী মৃত্তিকা (Brown soil)** বলে। ইহা কোথাও আর্দ্র, কোথাও শুষ্ক। জলসেচের সাহায্যে এই মৃত্তিকায় চাষ হইয়া থাকে। এই জাতীয় মৃত্তিকা উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং উত্তর চীনে দেখা যায়।

পাতা পচিয়া মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, উহাকে **পডসল (Podzol)** মৃত্তিকা বলে। এই মৃত্তিকা ধূসর ছাই রং-এর হইয়া থাকে। ইহাতে অম্লের পরিমাণ বেশী থাকে। কয়েকটি কঠিন শস্য ছাড়া ইহা কৃষিকার্যের অনুপযোগী। কিন্তু উন্নত সার ও বীজ ব্যবহার করিয়া সোভিয়েত রাশিয়ায় এই মৃত্তিকায় চাষ হইয়া থাকে। সোভিয়েত রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় এবং কানাডার উত্তরাংশে পডসল মৃত্তিকা দেখা যায়।

পীত-লাল মৃত্তিকায় ধান, ইক্ষু, পাট ও চা উৎপন্ন হয়।

(খ) **দানার প্রকৃতি অনুসারে বিভক্তীকরণ:** পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের দানাযুক্ত মৃত্তিকা লক্ষ্য করা যায়। পাথর ক্ষয় পাইবার ফলে পাথরের দানা বা বালি যখন বড় থাকে, তখন উহাকে **বেলেমাটি (Sandy soil)** বলে। এই ধরনের মাটির জলধারণের ক্ষমতা অত্যন্ত কম বলিয়া ইহা অতিশয় অনুর্বর। দীর্ঘ মূল-বিশিষ্ট গাছ বা কাঁটাগাছ ছাড়া অন্য কিছু এই মাটিতে উৎপন্ন হয় না। আলু

শালগম, মূলা, গাজর, বীট প্রভৃতি এই মাটিতে ভাল জন্মে। পাথর, নুড়ি ও বালির সংযোগে সৃষ্টি হয় **পাথুরে মাটি (Gravelly soil)**। ভুট্টা, মূলা ও আলুর চাষের জন্য এই জাতীয় মৃত্তিকা ব্যবহৃত হয়। সূক্ষ্মতম দানার সাহায্যে সৃষ্টি হয় **এ'টেল মাটি (Clayey soil)** ; সহজে এই মৃত্তিকার মধ্য দিয়া জল চুয়াইতে পারে না। জল জমিয়া থাকায় ইহা ধান ও পাট চাষের পক্ষে উপযোগী। এ'টেল মাটি অপেক্ষা মোটা দানাযুক্ত মৃত্তিকার নাম **পলিমাটি (Alluvial soil)**। নদীবাহিত হইয়া পলিমাটি নদীর দুই তীরে সঞ্চিত হয়। বিভিন্ন জৈব সার ও খনিজ লবণে পূর্ণ থাকায় এই ধরনের মৃত্তিকায় ধান, পাট, তামাক প্রভৃতি ভাল জন্মে। উপরে বর্ণিত পলিমাটি বা এ'টেল মাটি এবং বেলেমাটির সংমিশ্রণে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, তাহার নাম **দো-আঁশ মাটি (Loamy soil)**। ইহার জলধারণের ক্ষমতা বিদ্যমান ; এই জল চুয়াইয়া নীচে যাইবার ফলে গভীর স্তর পর্যন্ত মাটি সরস থাকে। ফলে কৃষিকার্যের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ধান, গম, যব, ইক্ষু প্রভৃতি এই মৃত্তিকায় ভাল জন্মে।

(গ) **রাসায়নিক গঠন অনুসারে বিভক্তীকরণঃ** রাসায়নিক গঠন অনুসারে মৃত্তিকাকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত্তিকার দ্রাব্য খনিজ লবণ বৃষ্টির জলের সহিত মিশিয়া মৃত্তিকার তলদেশে সঞ্চিত হয় এবং তলদেশে অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহঘটিত লবণের সহিত মিশিয়া **পেডলফার (Pedalfer)** মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। **পীত মৃত্তিকা, লোহিত মৃত্তিকা, ধূসর বাদামী অরণ্য মৃত্তিকা, প্রেইরি মৃত্তিকা, পড্‌সল মৃত্তিকা** ও তুন্দ্রা মৃত্তিকা পেডলফার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

চুনঘটিত লবণযুক্ত মৃত্তিকাকে **পেডোক্যাল (Pedocal)** মৃত্তিকা বলা হয়। জলসেচের সাহায্যে এই মৃত্তিকায় চাষের বন্দোবস্ত করা হয়। চারনোজেম, **শুষ্ক মেরু** মৃত্তিকা, **খয়েরী স্টেপ মৃত্তিকা** পেডোক্যাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিকার্যের অনুপযোগী বিভিন্ন মৃত্তিকা দেখা গেলেও বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রায় সকল শ্রেণীর মৃত্তিকায় চাষের বন্দোবস্ত হইতেছে।

পৃথিবীর মৃত্তিকার বণ্টন
(Distribution of Soil of the World)

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম মৃত্তিকা দেখা যায়। নিম্নে পৃথিবীতে মৃত্তিকার বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা হইলঃ

(১) **চারনোজেম্ মৃত্তিকা**—প্রেইরি অঞ্চলের প্রান্তে যেখানে জলবায়ু অধিকতর শুষ্ক ও তৃণভূমির তৃণসমূহের উচ্চতা কম, সেখানে চারনোজেম মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকা পেডোক্যাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাতে ক্ষার জাতীয় পদার্থের পরিমাণ খুব কম থাকে। ইহাতে যথেষ্ট জৈব পদার্থ (হিউমাস্) থাকায় ইহার রং কালো। এই মৃত্তিকা খুব উর্বর। জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়। গম ও তুলা-চাষে এই মৃত্তিকা আদর্শ স্থানীয়। **সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ** ভারত ও **মধ্যচীনের** উত্তরাংশে চারনোজেম্ মৃত্তিকা দেখা যায়।

(২) **মরু অঞ্চলের মৃত্তিকা বা সিরোজেম (Serozem)**—শুষ্কতার জন্য এই মৃত্তিকায় ক্ষার ও লবণের পরিমাণ বেশী থাকে ; জৈব পদার্থ থাকে না বলিলেই চলে। সেইজন্য এইজাতীয় মৃত্তিকায় কৃষিকার্যের অসুবিধা দেখা দেয়। তবে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিকার্য করা যায়। **আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি মরুভূমিতে, এশিয়ার আরব, থর** (রাজস্থান ও পাকিস্তানে বিস্তৃত) ও মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার **পশ্চিমাংশের মরুভূমিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশের** মরু অঞ্চলে, **দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমিতে** এবং পৃথিবীর অন্যান্য শুষ্ক মরুভূমিতে সিরোজেম মৃত্তিকা দেখা যায়।

(৩) **খয়েরী স্টেপ মৃত্তিকা**—প্রায় শুষ্ক তৃণভূমি অঞ্চলে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। স্টেপ অঞ্চলে তৃণভূমি ঘন হয় না এবং তৃণের উচ্চতাও খুব কম। সেইজন্য চারনোজেম্ মৃত্তিকার মত ইহার রং কালো না হইয়া খয়েরী হয়। চারনোজেম মৃত্তিকা অপেক্ষা ইহার উর্বরতা কিছু কম হইয়া থাকে। জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে কৃষিকার্য করা যায়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মরু-অঞ্চলের প্রান্তে এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকা, **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্য এশিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া,** ভারত, পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা ও **অস্ট্রেলিয়ায়** এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

(৪) **পড্‌সল মৃত্তিকা**—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিতে এই মৃত্তিকা গড়িয়া উঠে। এই মৃত্তিকা ধূসর ছাই রং-এর হইয়া থাকে। ইহাতে অম্লের পরিমাণ বেশী থাকে। এই মৃত্তিকার স্তর খুব পুরু হয় না। এই মৃত্তিকা কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নহে। এই জাতীয় মৃত্তিকার নীচে শক্ত আবরণ থাকায় বহুস্থানে জলনিকাশের সমস্যা দেখা যায় এবং জলাভূমির সৃষ্টি হইয়া থাকে। **সোভিয়েত রাশিয়া ও কানাডার উত্তরাংশে** বিস্তৃত অঞ্চলে পড্‌সল মৃত্তিকা দেখা যায়। প্রকৃত-পক্ষে ইহা তাইগা বনভূমির মৃত্তিকা।

(৫) **ধূসর বাদামী রং-এর অরণ্য মৃত্তিকা**—শক্তকাঠের গাছ আছে এমন পর্ণমোচী অরণ্যে এই ধরনের মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহাতে জৈবপদার্থের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে এবং অরণ্য মৃত্তিকার মধ্যে ইহা বেশী উর্বর। উচ্চ অক্ষাংশের দিকে এই মৃত্তিকায় পডসল মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো কোনো অংশে** এই জাতীয় মৃত্তিকার আধিক্য দেখা যায়।

(৬) **লোহিত ও পীত মৃত্তিকা**—ভূপৃষ্ঠে লোহিত ও পীত মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা বেশী অঞ্চলে বিস্তৃত। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে যেখানে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশী, সেইখানেই লোহিত ও পীত মৃত্তিকা উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। জলের সঙ্গে মিশিয়া বিভিন্ন প্রকারের দ্রবণীয় লবণ ও খনিজ পদার্থ মাটির গভীর স্তরে চলিয়া যায়। এইজাতীয় মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণও কম থাকে। এই কারণে সাধারণভাবে এই জাতীয় মৃত্তিকা উর্বর নহে। তবে লাভা ও চুনাপাথর অঞ্চলে এই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলা-বলয়, দক্ষিণ চীনের কৃষি অঞ্চল প্রভৃতি এলাকায় এই জাতীয় মৃত্তিকায় যথেষ্ট কৃষিকার্য হয়।

(৭) **ল্যাটেরাইট ও ল্যাটেরাইট জাতীয় মৃত্তিকা**—যেখানে মাটিতে লৌহের অংশ বেশী থাকে সেখানে মাটির রং লাল হয়। এই জাতীয় মাটির নাম **লোহিত মৃত্তিকা**। সার ব্যবহার করিয়া এই মাটি চাষ করা যায়। লোহিত মৃত্তিকা অপেক্ষা ধৌতি প্রক্রিয়া অধিক হইলে এবং মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম বেশী থাকিলে মাটির রং ইটের মত দেখিতে হয় বলিয়া এই জাতীয় মাটিকে **ল্যাটেরাইট** মৃত্তিকা (গ্রীক ভাষায় later শব্দের অর্থ ইট) বলা হয়। এই ধরনের মৃত্তিকা অনুর্বর ও চাষের অনুপযোগী। ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত **দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা, ভারতের দাক্ষিণাত্যের** মালভূমি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ল্যাটেরাইট ও লোহিত দো-আঁশ মৃত্তিকা দেখা যায়।

(৮) **প্রেইরি মৃত্তিকা**—প্রেইরি তৃণভূমিতে যেখানে আর্দ্রতার পরিমাণ স্টেপ তৃণভূমির তুলনায় বেশী, সেখানে এই ধরনের মৃত্তিকা দেখা যায়। প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চলের ঘাস পচিয়া মাটিতে মিশিয়া এই জাতীয় মৃত্তিকা গড়িয়া উঠে। এই মৃত্তিকার স্তর গভীর ও রং কালো। ইহাতে জৈব পদার্থ বেশী পরিমাণে থাকে। এই মৃত্তিকা খুব উর্বর। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, আর্জেন্টিনার আর্দ্র প্রেইরি অঞ্চলে** এই মাটি দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার কৃষি বলয়গুলি এই মৃত্তিকা অঞ্চলে অবস্থিত।

মৃত্তিকার সমস্যা
(Soil Problems)

মৃত্তিকা মানুষের অন্যতম মৌলিক সম্পদ (Basal asset)। কৃষিকার্য, পশুপালন, বনজ সম্পদ প্রভৃতি মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকাকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন,

ভূমিক্ষয়—মানুষের অদূরদর্শিতার ফলে ও অবহেলার দরুন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভয়াবহ ভূমিক্ষয়ের (Soil erosion) সৃষ্টি হইতেছে। বৃষ্টিপাত, জলের ঢেউ, প্রবল বাতাস, বন্যা, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য, বনজ সম্পদের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি কারণে ভূমির উপরিভাগের উর্বর অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় : ইহাকেই ভূমিক্ষয় বলা হয়। ভূমিক্ষয় হইলে জমি কৃষিকার্যে বা বনজ সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগে না। ভূমিক্ষয়ই মৃত্তিকার প্রধান সমস্যা। এই ভূমিক্ষয় রোধ করিতে না পারিলে দেশের কৃষিকার্য ও বনজ সম্পদের উন্নতিসাধন অসম্ভব।

উর্বরতা হ্রাস—মৃত্তিকার উপরের স্তরে চাষ করিয়া কৃষিকার্য করা হয়। এই স্তরের জৈবিক উপাদান (হিউমাস), খনিজ উপাদান, জৈব অ্যাসিড প্রভৃতি উদ্ভিদের খাদ্য। চাষ পদ্ধতির ত্রুটির ফলে মৃত্তিকায় এই সকল উপাদান হ্রাস পাইলে কৃষিকার্যে অসুবিধা দেখা দেয় : অর্থাৎ শস্যের উৎপাদন কমিয়া যায়। বনভূমি ও তৃণভূমির ধ্বংসসাধন, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর পরিবর্তন এবং নদ-নদীর মজিয়া যাওয়া ও গতি পরিবর্তনের ফলে মৃত্তিকায় কৃষিকার্যের উপযোগী জল সরবরাহ কমিয়া গেলে মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তিও কমিয়া যায়।

লবণতা, ক্ষারকীয়তা ও অম্লতা—বৃষ্টিপাতহীন বা কম বৃষ্টিপাতযুক্ত বা শুষ্ক অঞ্চলে মৃত্তিকার উপরের স্তরে লবণ ও ক্ষারের পরিমাণ বেশী থাকে। বিভিন্ন

লবণ ও ক্ষারের মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট ও বিভিন্ন দ্রবণীয় বোরেট বিশেষভাবে ক্ষতিকারক। সোডিয়াম লবণ থাকার ফলে উদ্ভিদ উহার খাদ্যের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান (ফস্ফেট, লৌহ ইত্যাদি) গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া লবণ বেশী মাত্রায় থাকিলে মৃত্তিকার জলধারণের ক্ষমতা কমিয়া যায়।

অন্যদিকে যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী, সেই সকল অঞ্চলে অতি-অম্ল মৃত্তিকা দেখা যায়। অতি-অম্ল মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে অসুবিধা হয়। এইজন্য এই জাতীয় মৃত্তিকায় কৃষিকার্য করা কঠিন হইয়া পড়ে।

অন্যান্য বিবিধ সমস্যা—বর্তমানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিকার্যের উপযোগী মৃত্তিকা এবং বনভূমি ও তৃণভূমির অন্তর্ভুক্ত মৃত্তিকা বসবাস করার জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে **রাজপথ, রেলপথ, কল-কারখানা, শহর, বন্দর** প্রভৃতির বৃদ্ধি ঘটিতেছে। ইহাতে যেমন একদিকে মৃত্তিকার একটা বিরাট অংশ কৃষিকার্যের আওতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, তেমনি জলনিকাশের অসুবিধা বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস করিতেছে।

উল্লিখিত সমস্যাসমূহ সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে পারিলে মৃত্তিকার স্থায়িত্ব ও উর্বরতাশক্তি বজায় থাকিবে। । কিন্তু শুধু মৃত্তিকার স্থায়িত্ব ও উর্বরতাশক্তি বজায় রাখিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করার কথাও চিন্তা করিতে হইবে। নতুবা বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাহিদার উপযোগী শস্যাদি উৎপাদন করা যাইবে না।

ইহার জন্য বনভূমি ও তৃণভূমির সংরক্ষণ, নদ-নদীর প্রবাহ সঠিক পথে চালিত রাখা, জলনিকাশের ও বন্যারোধের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা, মরুভূমির প্রসার বন্ধের জন্য নূতন বনভূমি সৃষ্টি করা এবং পরিকল্পিতভাবে নূতন রেলপথ, রাজপথ, শহর-বন্দর প্রভৃতি নির্মাণ করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য করা প্রয়োজন।

মৃত্তিকা-সংরক্ষণ
(Soil Conservation)

ভূমিক্ষয়ের দরুন দেশের কৃষিকার্য ও বনজ সম্পদের উন্নতি বিশেষরূপে ব্যাহত হয়। বন্যা, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য, অরণ্য সম্পদের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি কারণে ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে। ইদানীং অবশ্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ (Soil Conservation) সম্বন্ধে মানুষ কিছুটা সচেতন হইতেছে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিতে সরকারী প্রচেষ্টায় মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। মৃত্তিকা সংরক্ষণের সমস্যা দুই প্রকার। প্রথমতঃ, জলের সহিত মিশিয়া কিংবা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া মাটি যাহাতে স্থানচ্যুত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মাটির উর্বরতাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভূমিক্ষয়ের কারণ সর্বত্র একরূপ নহে এবং ভূমির উর্বরতাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ

করিলে চলিবে না। অবস্থা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ভূমিক্ষয় বহুলাংশে রোধ করা যায়ঃ

(১) কৃষিভূমির চতুর্দিকে **তৃণভূমি রচনা** করিতে হইবে।

(২) কৃষি-জমির চতুর্দিকে, পাহাড়-পর্বতের ঢালে, নদীর উৎপত্তিস্থল ও ঊর্ধ্বগতিতে, প্রবল বায়ুপ্রবাহের গতিপথে এবং সমুদ্রের তীরে অরণ্যবলয় রচনা করিতে হইবে।

(৩) মরুভূমির প্রসার রোধ করিবার জন্য উহার চতুর্দিকে অরণ্য সৃষ্টি করিতে হইবে।

(৪) যে হারে বৃক্ষ ছেদন করা হইবে অন্ততঃ সেই হারে নূতন বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে, যাহাতে মোট বনভূমির পরিমাণ হ্রাস না পায়। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বায়ুপ্রবাহের ও জলপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিক্ষয় নিবারণ করিবার পক্ষে অরণ্য সৃষ্টি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

(৫) অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ রোধ করিতে হইবে। পশুচারণের জন্য তৃণভূমি ও বনভূমি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

(৬) **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমিকর্ষণ** করিতে হইবে। পাহাড়-পর্বতের ঢালে ধাপ কাটিয়া, জমির পাড় উঁচু করিয়া বাঁধিয়া চাষ (terrace cultivation) করিতে হইবে।

(৭) কৃষিকার্যে **শস্যাবর্তন পদ্ধতি** অবলম্বন করিতে হইবে।

(৮) যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেখানে সেইভাবে জমিতে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সার প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৯) ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা-সংরক্ষণ সম্পর্কে উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ভূমিক্ষয়ের সাংঘাতিক পরিণতি সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণকে এই সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. What is called 'Soil'? In how many classes soil can be divided according to formation? Name the classification and analyse their characteristics.

['মৃত্তিকা' কাহাকে বলে? উদ্ভব অনুসারে মৃত্তিকাকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়? বিভাগগুলির নাম লিখ এবং উহাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।]

উঃ। 'মৃত্তিকা' (১১৫ পৃঃ), 'মৃত্তিকার উৎপত্তি' (১১৫-১১৬ পৃঃ) ও 'মৃত্তিকার প্রকারভেদ' (১১৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

2. Classify soils of the world and indicate the nature of their utilisation. **[Specimen Question, 1978]**

[পৃথিবীর মৃত্তিকাসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর এবং উহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

উঃ। 'মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ' (১১৮-১২০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Give the geographical distribution of the major soil types of the world and indentify their characteristic features.

[H. S. Examination, 1979]

[পৃথিবীতে প্রধান প্রধান মৃত্তিকা-গোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা কর ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।]

উঃ। 'পৃথিবীর মৃত্তিকার বণ্টন' (১২০-১২২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. (a) Classify soils. (b) Suggest measures to control the problems of soil erosion. [H. S. Examination, 1982]

[(ক) মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর। (খ) ভূমিক্ষয় নিবারণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, আলোচনা কর।]

উঃ। 'মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ' (১১৮-১২০ পৃঃ) ও 'মৃত্তিকা-সংরক্ষণ' (১২৩-১২৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. Define 'Soil.' Explain with illustrations how soil has been formed.

[মৃত্তিকার সংজ্ঞা লিখ। কিভাবে মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।]

উঃ। 'মৃত্তিকা' (১১৫ পৃঃ) ও 'মৃত্তিকার উৎপত্তি' (১১৫-১১৬ পৃঃ) লিখ।

6. Write an essay on soils and their utilisation.

[C. U. B. Com. 1967]

[মৃত্তিকা ও উহার ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।]

উঃ। 'মৃত্তিকা' (১১৫-১২৪ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

7. Name four important soils of the world and broadly indicate their characteristics and uses. Briefly discuss the principle and methods of soil conservation. [B. U. B. Com. 1969]

[পৃথিবীর চারিটি গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তিকার নাম লিখ এবং বিস্তারিতভাবে তাহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। মৃত্তিকা সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

উঃ। 'পৃথিবীর মৃত্তিকার বণ্টন' (১২০-১২২ পৃঃ) ও 'মৃত্তিকা-সংরক্ষণ' (১২৩-১২৪ পৃঃ) লিখ।

8. Mention the chief causes of soil erosion and methods of soil conservation. [Tripura H. S. Examination, 1981]

[ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণগুলি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ কর।]

উঃ। 'মৃত্তিকার সমস্যা' হইতে 'ভূমিক্ষয়' (১২২ পৃঃ) ও 'মৃত্তিকা সংরক্ষণ' (১২৩-১২৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. What are the causes of soil erosion? Discuss the various measures that are adopted for the conservation of soil.

[H. S. Examination, 1985]

(ভূমিক্ষয়ের কারণ কি? ভূমিসংরক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়, তাহা আলোচনা কর)

উঃ। 'মৃত্তিকার সমস্যা' হইতে 'ভূমিক্ষয়' (১২২ পৃঃ) ও 'মৃত্তিকার সংরক্ষণ' (১২৩-১২৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Briefly discuss the following : (a) The Natural influence in formation of soil, (b) Texture of soil, (c) Chernozem, (d) Laterite soil.

[নিম্নলিখিতগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর ঃ

(ক) মৃত্তিকার উৎপত্তিতে নৈসর্গিক প্রভাব, (খ) মৃত্তিকার উপাদান, (গ) চারনোজেম, (ঘ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা।]

উঃ। 'নৈসর্গিক প্রভাব' (১১৫ পৃঃ), 'মৃত্তিকার উপাদান' (১১৬-১১৭ পৃঃ), 'চারনোজেম' (১২০ পৃঃ) এবং 'ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা' (১২২ পৃঃ) লিখ।

2. Write short notes on :

Soil erosion and conservation. **[H. S. Examination, 1978]**

(সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা-সংরক্ষণ।)

উঃ। 'মৃত্তিকার সমস্যা' হইতে 'ভূমিক্ষয়' (১২২ পৃঃ) এবং 'মৃত্তিকা-সংরক্ষণ' (১২৩-১২৪ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

C. Objective Questions

1. Construct correct answers from the following statements :

(a) Red soils are common in tropical/high latitude countries.

(b) Tea prefers ferrous red soil/saline soil for its growth.

[H. S. Examination, 1978]

(c) The black soils in India are suitable for the cultivation of paddy/jute/cotton.

(d) Laterite soil is suitable for the cultivation of paddy/coffee/jute. **[H. S. Examination, 1980]**

(e) Podsol soil is usually found in humid sub-arctic/humid tropical/dry tropical regions. **[H. S. Examination, 1981]**

(f) Black soil is ideal for the cultivation of rice/sugarcane/cotton.

[H. S. Examination, 1985]

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে সঠিক উত্তর গঠন কর ঃ

(ক) ক্রান্তীয়/উচ্চ অক্ষাংশের অন্তর্ভুক্ত দেশে লোহিত মৃত্তিকা দেখা যায়।

(খ) চা-উৎপাদনের পক্ষে লৌহযুক্ত রক্তাভ মৃত্তিকা/লবণাক্ত মৃত্তিকা অনুকূল।

(গ) ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা ধান/পাট/কার্পাস চাষের উপযোগী।

(ঘ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ধান/কফি/পাট চাষের উপযুক্ত।

(ঙ) পডসল মৃত্তিকা সাধারণতঃ আর্দ্র অব-সুমেরীয়/আদ্র/ ক্রান্তীয়/শুষ্ক ক্রান্তীয় অঞ্চলে দেখা যায়।

(চ) কৃষ্ণমৃত্তিকা ধান/ইক্ষু/তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।]

2. Fill up the gaps :

(i) It is only in the — zones situated in the midway latitudes that the rainfall is moderate and — forests or grasslands can be found and the most fertile regions of the world are located. (ii) — is a very excellent example of Azonal soil. (iii) Vegetations, that is, trees and plants, creepers, leaves and foliages, mosses, carcasses of various animals get decomposed and at last mix up with soil ; that is called —. These things mix up with soil and increase its —. (iv) The layer of Prairie soil is deep and its colour is —. Such soil is very fertile as it contains — very much. (v) Soil is — in places where it contains high percentage of iron and it is called — soil. (vi) — is the principal problem of soil.

[শূন্যস্থান পূর্ণ কর: (i) কেবল মধ্য অক্ষাংশে অবস্থিত — অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত পরিমিত রকমের এবং — বৃক্ষ বা তৃণভূমি বিদ্যমান, সেখানেই পৃথিবীর উর্বরতম অঞ্চলসমূহ অবস্থিত। (ii)—অনাঞ্চলিক মাটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (iii) গাছপালা, লতাপাতা, শেওলা, বিভিন্ন প্রাণীর মৃতদেহ প্রভৃতি পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায় ; ইহাকে — বলে। ইহা মাটির সহিত মিশিয়া মাটির — বৃদ্ধি করে। (iv) প্রেইরি মৃত্তিকার স্তর গভীর ও রং — । এই মৃত্তিকায় — বেশী থাকে বলিয়া ইহা খুব উর্বর। (v) যেখানে মাটিতে লোহের অংশ বেশী থাকে সেখানে মাটির রং — হয় ; এই জাতীয় মাটির নাম — মৃত্তিকা। (vi) — মৃত্তিকার প্রধান সমস্যা।]

নবম অধ্যায়

খনিজ সম্পদ ও শক্তিসম্পদ

(Mineral Resources and Power Resources)

প্রাচীন যুগ হইতেই খনিজ পদার্থের ব্যবহার দেখা যায়। প্রস্তরযুগের পরেই মানুষ তাম্র ব্যবহার করিতে শিখে ; সেইজন্য এই যুগের নাম তাম্রযুগ। তাম্রযুগের পরে আসে ব্রোঞ্জযুগ। তাম্রের সহিত টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ তৈয়ারি করিতে হয়। ব্রোঞ্জের সাহায্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করা হইত। ইহার পর আসে লৌহযুগ। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহা একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। ক্রমশঃ মানুষ আরও খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে কয়লা মানুষের সভ্যতায় বিপ্লব ঘটায়। কয়লা হইতে মানুষ শুধু বাষ্পশক্তি সৃষ্টি করে নাই, ইহার সাহায্যে লৌহপিন্ড ও ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া কয়লা হইতে পিচ, ন্যাপথলিন, স্যাকারিন ইত্যাদি নানাবিধ উপজাত-দ্রব্যও উৎপাদিত হইতে থাকে। খনিজ তৈল আবিষ্কারের সংগে সংগে বহুস্থানে নূতন ভাবে সভ্যতা গড়িয়া উঠে। মধ্য এশিয়ার কুওয়াইত, ইরান, ইরাক প্রভৃতি স্থানে তৈলখনি আবিষ্কারের সঙ্গে সংগে ব্রিটিশ, ডাচ্, ফরাসী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেখানে উপস্থিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ লইয়া ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহারা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদের অধিকারী হয়। তৈলসম্পদ আহরণের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি লাভও সম্ভবপর হয়।

বর্তমান যুগে মানুষের উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ। পৃথিবীর যে সকল দেশ আজ সমৃদ্ধিশালী উহাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সকল দেশের উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের খনিজ সম্পদ। সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ব্রিটেন, চীন প্রভৃতি দেশে অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। এই সম্পদকে কাজে লাগাইয়া এই দেশগুলি তাহাদের আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও খনিজ পদার্থ মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, জাহাজ, মোটরগাড়ি, রেলপথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে খনিজ পদার্থ প্রয়োজন। সভ্যতার মান উঁচু রাখিতে হইলে এই সকল সামগ্রী বর্তমান যুগে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে খনিজ সম্পদ রহিয়াছে তাহা সীমিত ; একদিন ফুরাইয়া যাইবে। সুতরাং একদিকে যেমন খনিজ সম্পদের নিত্য নূতন ব্যবহারের প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিকগণ ক্লান্তিহীন, অন্যদিকে খনিজ সম্পদের বিকল্প ব্যবস্থা লইয়া গবেষণাতেও তাঁহারা শ্রান্তিহীন।

পেশীশক্তির যুগ উত্তরণে ও যন্ত্রশক্তির ব্যবহার চালু করার ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং ব্যবহারের ব্যাপক অবদান রহিয়াছে। শক্তি-সম্পদ হিসাবে কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি যেমন শিল্পায়নে এবং শিল্পের একদেশীভবনে সহায়তা করিয়াছে,

লৌহ আকরিক, ম্যাংগানিজ, তাম্র, সীসা, অভ্র ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ তেমনি কল-কারখানা, রেল-লাইন, রেল-ইঞ্জিন, জাহাজ, মোটরগাড়ি, বিমান, সেতু প্রভৃতি নির্মাণে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। লৌহ আকরিক এবং কয়লাখনির পারস্পরিক নৈকট্যে গড়িয়া উঠিয়াছে পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পাঞ্চলগুলি। স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা খনিজ সম্পদ-ভিত্তিক এবং বিশেষ করিয়া লৌহ ও কয়লার উপরই সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

খনিজ উন্নয়ন আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও কারিগরি জ্ঞানের উন্নতির উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলেই বিভিন্ন দেশের খনিজ সম্পদের উত্তোলন ত্বরান্বিত হইয়াছে। ফলে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিচারে উন্নতিশীল দেশগুলিই খনিজ সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডস্ খনিজ সম্পদের ব্যবহার এবং উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে মোট খনিজ সম্পদের ৩৪% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে, ২৯% ব্রিটেন ও উহার উপনিবেশগুলিতে এবং ২০% সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধিকারে ছিল। প্রবল প্রতাপশালী জার্মানী তখন মাত্র ৭% খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণাধিকারী ছিল। বর্তমানে অধিকাংশই সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করতলগত। বিরাট আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির খনিজ উত্তোলনের স্বর্গরাজ্য। এশিয়াও তাই। শ্বেতজাতির কায়েমী স্বার্থ জিম্বাবোয়ের বিরাট খনিজ সম্পদ হাতছাড়া করিতে চাহে নাই ; তাই মুষ্টিমেয় শ্বেতকায় গোষ্ঠী কৃষ্ণকায় মানবগোষ্ঠীর সকল দাবি নস্যাৎ করিয়া ও আন্তর্জাতিক পরিষদের সকল নির্দেশ অবহেলা করিয়া শ্বেতকায়ের সরকার স্থাপিত করিয়া সমগ্র খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন করিতেছিল। জিম্বাবোয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু খনিজ সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন এখনও চলিতেছে। ইন্দোনেশিয়ায় খনিজ সম্পদের লোভে গণতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদ হয়, সুকর্ণো গৃহবন্দী হন, লক্ষ লক্ষ গণতান্ত্রিক মানুষ হত্যার শিকার হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় গোষ্ঠীর সরকার শতবর্ষ ধরিয়া কৃষ্ণকায় মানবসমাজের বুকের রক্তে রঞ্জিত সোনা, হীরা ও লোহা আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করিয়া মুনাফার পাহাড় গড়িতেছে।

যুগের পালে পরিবর্তনের হাওয়া লাগিয়াছে। মানুষ দিকে দিকে জাগিতেছে। বৈজ্ঞানিক চেতনার অগ্রগতি, সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষে সমস্ত মানুষই আজ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হইতেছে। আণবিক শক্তি ব্যবহারের ফলে সংগঠন এবং কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিতেছে। এমন দিন সমাগত, যেদিন সাম্যবাদভিত্তিক আন্তর্জাতিক শক্তিসম্পদ ও খনিজসম্পদের বণ্টনের ফলে দেশ-দেশান্তরে নূতন জীবন শুরু হইবে। অভাবহীন শোষণহীন এক নূতন প্রভাতে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের মানুষ আমেরিকার মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের আনন্দে শোষণহীন সমাজের অভিষেক ত্বরান্বিত করিবে।

খনিজ সম্পদ উত্তোলনের বৈশিষ্ট্য
(Features of Mining)

কোনো দেশই খনিজ সম্পদে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী নহে। সেইজন্য অধিকাংশ দেশ অন্য দেশের উপর খনিজ পদার্থের জন্য কমবেশী নির্ভরশীল। খনিজ সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ইহার আয়তন বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। অবশ্য খনিতে সঞ্চিত (Reserves) খনিজ পদার্থের উত্তোলনের পরিমাণ নির্ভর করে মানুষের কর্মকুশলতা ও খনন-পদ্ধতির উপর। বর্তমানে সমৃদ্ধিশালী উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে খনিজ পদার্থের উত্তোলনের মাত্রা অত্যন্ত বেশী। মনে হয়, শীঘ্রই তাহাদের খনিজ সম্পদ নিঃশেষিত হইয়া যাইবে এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে পূর্ব-দেশীয় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে।

খনিজ সম্পদ আহরণে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ; পরাধীন দেশগুলি হইতে দ্রুত খনিজ দ্রব্য আহরণ করিয়া বৈদেশিক দখলকারীরা এই সম্পদ তাহাদের দেশে লইয়া যায় এবং ইহা দ্বারা নিজেদের শিল্পের উন্নতিসাধন করে। এইজন্য পরাধীন দেশসমূহ খনিজ সম্পদের অধিকারী হইয়াও স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে পারে না।

খনিজ সম্পদের উৎপাদন ইহার চাহিদার উপর নির্ভরশীল। শিল্পের উন্নতি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির উপর খনিজ সম্পদের চাহিদা নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য খনিজ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। খনি-অঞ্চলের সহিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষতঃ শিল্পাঞ্চলের যানবাহন-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে খনিজ সম্পদ উত্তোলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও কৃষিকার্যের তুলনা
(Mining and Agriculture Compared)

প্রাকৃতিক সম্পদ (মৃত্তিকা) হইতে মানুষ নিজ বুদ্ধিবলে কৃষিকার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ (খনিজ দ্রব্য) মাটির নীচে বা উপরে অবস্থান করে ; মানুষ উহা উত্তোলন করিয়া বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করে। খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও কৃষিকার্যের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য বিদ্যমান :

(১) খনিজ সম্পদ সরাসরি প্রকৃতির দান। উহা মাটির নীচে বা উপরে অবস্থান করে। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য সরাসরি প্রকৃতির দান নহে ; উহা মানুষকে প্রকৃতির সহায়তায় মাটির উপর উৎপাদন করিতে হয়।

(২) খনিজ সম্পদ প্রধানতঃ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য প্রধানতঃ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; অবশ্য কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্য (তুলা, পাট প্রভৃতি) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

(৩) সঞ্চিত (Reserves) খনিজ সম্পদ পরিমাণে সীমাবদ্ধ। ইহার মোট

পরিমাণ কখনই বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ নহে, কৃষিকার্যে সঞ্চিত সম্পদের প্রশ্ন ওঠে না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৪) খনিজ সম্পদের উত্তোলন চাহিদার উপর নির্ভরশীল। যে পরিমাণ খনিজ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ খনিজ দ্রব্য খনি হইতে উত্তোলিত হয়। কিন্তু মানুষ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সর্বদাই বাড়াইবার চেষ্টা করে।

(৫) খনি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য সর্বদাই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু এখনও অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশে প্রাচীন পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকে কৃষিকার্য হইয়া থাকে।

(৬) খনিজ সম্পদ উত্তোলনে যত লোক নিযুক্ত আছে, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী লোক কৃষিকার্যে লিপ্ত আছে।

(৭) খনিজ সম্পদ উত্তোলন বিশেষ বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত ; অন্যদিকে কৃষিকার্য কোনো দেশের বিরাট অঞ্চল (প্রায় সর্বত্র) জুড়িয়া বিস্তৃত।

খনিজ সম্পদ উত্তোলনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ না করিলে বহু খনিজ দ্রব্য খনিতেই থাকিয়া যায়। আধুনিক যন্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিলে খনি হইতে অধিক দ্রব্য উত্তোলন করা যায়।

খনি অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব থাকিলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। খনির অভ্যন্তরে বহু কাজ হাতে করিতে হয় বলিয়া খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন।

খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Minerals)

শিলার গঠনের উপর ভিত্তি করিয়া খনিজ পদার্থের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু কোনো কোনো খনিজ দ্রব্য প্রাণী বা উদ্ভিদ হইতে উদ্ভূত হয়। যেমন, গাছপালা বহুদিন মাটির নীচে থাকিলে কয়লায় পরিণত হয় এবং প্রাণীর হাড় ভূগর্ভে থাকিলে খড়িজাতীয় খনিজে পরিণত হয়। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভূগর্ভে বিভিন্নপ্রকার খনিজ বিদ্যমান। ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। এইগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) ধাতব খনিজ, (খ) অধাতব খনিজ ও (গ) জ্বালানি খনিজ। যে সকল খনিজদ্রব্য খনি হইতে উত্তোলন করিয়াই সরাসরি ব্যবহার করা যায় না, কোনো যান্ত্রিক বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে এইগুলিকে ব্যবহারের উপযোগী করিতে হয়, সেই সকল খনিজ দ্রব্যকে ধাতব খনিজ বলে। অন্যদিকে খনি হইতে উত্তোলন করিয়াই যে সকল খনিজ দ্রব্য ব্যবহার করা যায়, উহাদিগকে অধাতব খনিজ বলে। জ্বালানি খনিজও অধাতব খনিজের অন্তর্গত। এই তিন প্রকার খনিজ দ্রব্যকে আবার বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

খনিজ সম্পদ (Minerals)
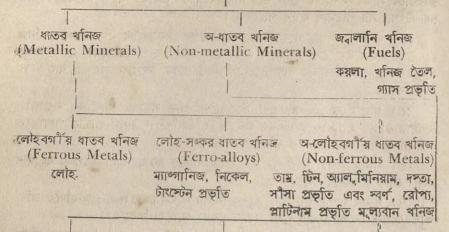
(ক) ধাতব খনিজ
(Metallic Minerals)

ধাতব খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লৌহ আর্করিক, তাম্র, সীসা, রাং, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাংগানিজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লৌহ আর্করিক
(Iron-ore)

ব্যবহার (Uses)—বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার প্রধানতম ধারক ও বাহক লৌহ আর্করিক। লৌহ আর্করিক হইতে লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত হয়। ধনতান্ত্রিক শিল্পনীতি প্রধানতঃ স্থানগত বিশেষীকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিনিময়ভিত্তিক। ইহা আবার পরিবহণ এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সমগ্র পৃথিবীতে কোটি কোটি মেট্রিক টন লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার করিয়া নির্মিত হাজার হাজার সেতু, হাজার হাজার কিলোমিটার রেল-লাইন, লক্ষ লক্ষ মালগাড়ি, রেল ইঞ্জিন, জাহাজ, মোটরগাড়ি, বিমানপোত, মোটর ট্রাক, বাস, টেলিগ্রাফের থাম, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন ও বন্দর দেশ দেশান্তরে যোগাযোগ এবং পরিবহণ-সম্পর্ক রক্ষা করিতেছে।

তাহাছাড়া লৌহ আর্করিকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইস্পাত এবং সহযোগী শিল্প যে কোনো দেশের শিল্পোন্নতির ভিত্তিপ্রস্তর। আধুনিক সভ্যতা গ্রামমুখী নহে, নগরকেন্দ্রিক ; অসংখ্য বাসগৃহ ও কারখানা আজকাল ইস্পাত কাঠামোর উপর

রি-ইনফোরস্‌ড্‌ কংক্রীটের সাহায্যে তৈয়ারি হয়। কি শান্তিতে, কি যুদ্ধে ইস্পাত আজ মানুষের হাতে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন কাল হইতেই লৌহ নির্মিত লাঙলের ফলা মানুষ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। আজ ইস্পাতের সাহায্যে জমি চাষ করার জন্য ট্রাক্টর (Tractor), বীজ বপনের জন্য রিপার (Reaper), ফসল কাটার জন্য হারভেস্টার (Harvester) এবং ঝাড়াই-এর জন্য নানা ইস্পাতের যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে।

টিনের কৌটায় সংরক্ষিত খাদ্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইবার ফলে রাং-এর প্রলেপ দেওয়া লৌহপাতনির্মিত কৌটায় সংরক্ষিত খাদ্য, ফল প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিনিময় ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া লৌহ বিশেষ ধরনের কঠিনতম ইস্পাতে পরিণত হইতেছে। অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে, শল্যচিকিৎসাক্ষেত্রে এবং নানা গবেষণাক্ষেত্রে নিত্য ইস্পাতের প্রয়োজন, শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, খনন-যন্ত্র, হিমায়ন যন্ত্র—প্রায় সর্বত্রই লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার অপরিহার্য। লৌহ ও ইস্পাতের প্রধান গুণ স্থিতিস্থাপকতা, কাঠিন্য, উত্তাপে নমনীয়তা এবং অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রণের সুবিধা। অন্য ধাতুর তুলনায় ইহার উৎপাদন-খরচ বেশী নহে।

লৌহ আকরিকের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Iron-ore)—উন্নত ধরনের আকরিক অর্থাৎ যে আকরিকে লৌহের পরিমাণ অধিক থাকে, সে আকরিক হইতে ইস্পাত উৎপাদনে খরচ কম এবং ইস্পাতও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয়; সুতরাং উত্তোলন লাভজনক কিনা তাহা বিচার করা যায় আকরিকের রাসায়নিক গঠন এবং খাঁটি লোহার অংশ কতখানি রহিয়াছে তাহা যাচাই করিয়া। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কল্যাণে অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প লৌহ সম্বলিত আকরিক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অন্যদিকে সাম্যবাদী অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিকৃষ্ট আকরিকও ইস্পাত শিল্পে যথাযথ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ লৌহ আকরিককে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(১) **হেমাটাইট (Haematite Fe_3O_3)** আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ ৯০%। ইহার রং লাল এবং ধূসর হয়। ইহা হইতে ধাতব লৌহ নিষ্কাশন অপেক্ষাকৃত সহজ।

(২) **ম্যাগনেটাইট (Magnetite Fe_3O_4)** আকরিকের রং কালো, লৌহ শতকরা ৭২·৪ ভাগ। অনেক ক্ষেত্রে চুম্বকশক্তি নষ্ট করিয়া পরে ইহা ব্যবহার করা হয়।

(৩) **লিমোনাইট (Limonite, $2Fe_2O_3 3H_2O$)** আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৫৯·৮%; রং হলুদ।

(৪) **সিডেরাইট (Siderite, $FeCo_3$)** আকরিকের রং ধূসর। ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৪৮ ভাগ।

(৫) **বগ আয়রন (Bog Iron)** আকরিক সাধারণতঃ হ্রদের তলদেশে সঞ্চিত থাকে। ইহার অপর নাম টাইটানিয়াম। কানাডায় হ্রদের জল সরাইয়া টাইটানিয়াম সংগ্রহ করিয়া ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহার করা হইতেছে।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ—(Principal producing countries)—লৌহ আকরিক কয়লার ন্যায় সমগ্র বিশ্বে ছড়ানো নাই। কতকগুলি দেশে হেমাটাইট ও

ম্যাগ্‌নেটাইট জাতীয় লৌহ আকরিক রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব কম। যেমন, সুইডেন, স্পেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও ফ্রান্স। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীর লৌহ আকরিকের সঞ্চয় রহিয়াছে। কয়েকটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে উন্নত শ্রেণীর লৌহ আকরিক নাই বলিলেই চলে, উপরন্তু সাধারণ লৌহ আকরিকের সঞ্চয়ও কম। এই সকল ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর আকরিক আমদানির উপর তাহাদের ইস্পাত এবং সহযোগী শিল্প নির্ভরশীল।

পৃথিবীর মোট লৌহ আকরিক উৎপাদন—১৯৮৪

(কোটি মেঃ টন)

সোভিয়েত রাশিয়া	২৪·৫২	কানাডা	৩·২৯
অস্ট্রেলিয়া	৮·০৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	২·৪৬
ব্রাজিল	৬·২৭	লাইবেরিয়া	১·৮২
চীন	৫·৭৯	ফ্রান্স	১·৬০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩·৮৬	সুইডেন	১·৩২
ভারত	৩·৮০	ভেনেজুয়েলা	·৯৩

(Source : U. N. O. Monthly Bulletin, March 1985)

সোভিয়েত রাশিয়া (U.S.S.R.)—লৌহ আকরিক উত্তোলনে এই দেশ পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। অথচ বিপ্লবের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়াকে আমদানীকৃত লৌহ আকরিকের উপর নির্ভর করিতে হইত এবং তাহা যোগান দিত জার্মানী, ফ্রান্স, সুইডেন, স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদেশে সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণ মোটেই কম নহে। হেমাটাইট ও ম্যাগ্‌নেটাইট আকরিকের পরিমাণ যেমন যথেষ্ট, তেমনি লিমোনাইট আকরিকের সঞ্চয়ও প্রচুর।

এই দেশের নিম্নোক্ত অঞ্চলে লৌহ খনি রহিয়াছে : (১) ইউক্রেন—ক্রিভয় রগ (উচ্চশ্রেণীর আকরিক) ও কার্চ্‌ উপদ্বীপে (ক্রিমিয়া—নিকৃষ্ট আকরিক) স্থানীয় লৌহ আকরিক এবং ডোনেৎস অঞ্চলের কয়লার উপর নির্ভর করিয়া স্টালিনো হইতে ভোরোশিলভগ্রাড্‌ পর্যন্ত বৃহদাকার ইস্পাত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **ইউরাল ও কুজনেৎস্ক অঞ্চল**—এই অঞ্চলটি সাম্যবাদী অর্থনীতির নূতন পথের দিশারী ; ইউরালের লৌহ কুজনেৎস্কের কয়লা খনি হইতে ১,৯০০ কিলোমিটার দূরে থাকা সত্ত্বেও পরিবহণের অপূর্ব দোলকনীতি (Pendulum Principle) কার্যকরী করিয়া উভয় ক্ষেত্রে ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কয়লা লইয়া যে মালগাড়ি ইউরালে আসে, লৌহ আকরিক লইয়া সেই গাড়ি ইউরাল হইতে কুজনেৎস্কে অহরহঃ ফিরিয়া যাইতেছে। ধনতান্ত্রিক মুনাফাভিত্তিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইহা সত্যই কল্পনাতীত। ইউরালের ম্যাগনেট পর্বতে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিক সঞ্চিত আছে। এখানকার ম্যাগ্‌নিটোগরস্ক তাই সোভিয়েত রাশিয়ার

দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র। ইহা ছাড়া মস্কো ও টুলা অঞ্চল, ভলগা অঞ্চল, বৈকাল হ্রদ অঞ্চল, আমুর ও ইনিসী অববাহিকায় লৌহ আকরিকের যথেষ্ট সঞ্চয় রহিয়াছে। কোলা উপদ্বীপের লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

পৃথিবীর লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী দেশসমূহ ●
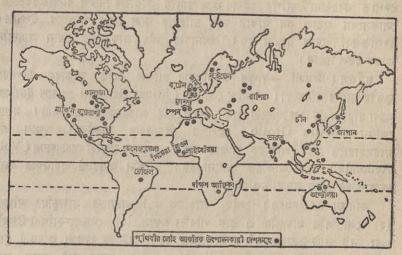
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—হ্রদ অঞ্চলে সুপিরিয়র হ্রদের দক্ষিণ ও পশ্চিমে তিনটি করিয়া ছয়টি পর্বতমালায় উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিক সঞ্চিত আছে। মেসাবি, মারকোয়েট, মেনোমিনি, গোজেবিক, কুইনা ও ভার্মিলিয়ন বিখ্যাত লৌহ আকরিক কেন্দ্র। আলাবামা রাজ্যে বার্মিংহাম ও রেড মাউন্টেনে উৎকৃষ্ট হেমাটাইট আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে। রকি পর্বতে সিডেরাইট জাতীয় লৌহ আকরিক রহিয়াছে। পূর্বে পিট্সবার্গের নিকট লৌহ আকরিক উত্তোলিত হইত। অনেক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে লৌহ আকরিক আমদানি করিতে হয়। লৌহ আকরিক এবং কয়লার পারস্পরিক নৈকট্য এবং উন্নত পরিবহণের ব্যবস্থা থাকায় পিট্সবার্গ এখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইস্পাত শিল্পাঞ্চল—যাহার ফলে তাহার চারিদিকে বাফেলো, ক্লীভল্যান্ড, ডেট্রয়েট, টলেডো, স্পারোস পয়েন্ট (Sparrows Point), হ্যান্টিংডন, গ্যারী, চিকাগো, ডুলুথ ও বার্মিংহাম প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পনগরীর সৃষ্টি হইয়াছে। হ্রদ অঞ্চলের আকরিক উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো খনি গভীর হইবার ফলে উত্তোলন খরচ বেশী পড়ে। রেড মাউন্টেনের সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশী। আলাবামার শতকরা ৮৫ ভাগ আকরিক এখানে উত্তোলিত হয়। তবে ধাতব লৌহের পরিমাণ বেশী নহে। বার্মিংহামের আকরিক লিমোনাইট জাতীয়। এইজন্য ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনে উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক আমদানির প্রয়োজন হয়। এই দেশ লৌহ আকরিক উৎপাদনে **পঞ্চম স্থান** অধিকার করে।

অস্ট্রেলিয়া—এই দেশ লৌহ আকরিক উৎপাদনে পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থানের** অধিকারী। এখানকার আয়রন-নব (Iron-Knob) দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার একটি

উল্লেখযোগ্য লৌহ আকরিক ক্ষেত্র। আয়রন মোনার্ক (Iron Monarch) নিউ সাউথ ওয়েলস্-এ অবস্থিত আর একটি বিখ্যাত লৌহখনি অঞ্চল। পূর্বে প্রায় সমগ্র আকরিক রপ্তানি হইত। পোর্ট পেরী, কেম্বা, হোক্‌লা ও নিউ ক্যাস্‌লে ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবার ফলে স্থানীয় আকরিক শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় স্বল্প চাহিদার ফলে লৌহ আকরিক, ইস্পাত ও ইস্পাত-দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার লৌহ আকরিকের প্রধান আমদানি-কারক হইল ব্রিটেন।

ব্রাজিল (Brazil)—দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল লৌহ আকরিক উৎপাদনে **তৃতীয় স্থানের** অধিকারী। মিনাস্ গেরায়েস (Minas Geraes) প্রদেশে ইটাবিরা, বলো হরিজোনটি এবং আউরো প্রেটো অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ম্যাটো গ্রোসো (Matto Grosso) প্রদেশের কোরাম্বার নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং মারাহোয়াতে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ব্রাজিলে ভোল্টা রেডোন্ডায় (Volta Redonda) লৌহ আকরিক গলানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানকার লৌহ আকরিকের প্রধান আমদানিকারক।

কানাডা (Canada)—লৌহ আকরিক (১) লাব্রাডর মালভূমির দক্ষিণে, (২) লোরেন্সীয় মালভূমি ও রকি পার্বত্য অঞ্চলে, (৩) নোভাস্কোশিয়া উপদ্বীপ এবং নিউ ফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপে উত্তোলিত হয়। কুইবেক অঞ্চলে কয়েকটি হ্রদের তলদেশে লৌহচূর্ণ (Titanium dioxide) সঞ্চিত থাকায় সেই সকল হ্রদের সম্পূর্ণ জল নিষ্কাশিত করিয়া এই লৌহচূর্ণ তুলিয়া ইস্পাত তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানকার অধিকাংশ আকরিক বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রধান ক্রেতা হইল ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লৌহ আকরিক উৎপাদনে এই দেশ বর্তমানে **সপ্তম স্থান** অধিকার করে।

ফ্রান্স (France)—লৌহ আকরিক উত্তোলনে ফ্রান্স বর্তমানে পৃথিবীতে দশম স্থান অধিকার করে। নিম্নলিখিত অঞ্চলে উচ্চস্তরের হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট আকরিক রহিয়াছে : (১) প্যারি পর্যঙ্কের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে, (২) লোরেন ও (৩) বার্গান্ডি অঞ্চলে। তাহা ছাড়া পিরেনিজ পর্বতেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ আকরিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, আকরিকের সহিত চুন ও ফসফরাস মিশ্রিত থাকায়—একদিকে চুনাপাথরের পরিমাণ কম লাগিবার ফলে উৎপাদন খরচ কম হয় এবং অন্যদিকে ফসফরাসের জন্য আমদানীকৃত উৎকৃষ্ট আকরিক মিশাইয়া ইস্পাত প্রস্তুত করিতে হয়। কয়লা এবং লৌহ আকরিকের অবস্থান শিল্পগতভাবে আদর্শ স্থানীয় না হওয়ায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ফ্রান্স বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। লৌহ আকরিকের কিয়দংশ ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানি করা হয় এবং সামান্য স্থানীয় আকরিক এবং আমদানীকৃত লৌহ ব্যবহৃত হয় সেন্ট্ এ'তেনি, ডিজন ও আর্টয় অঞ্চলের ইস্পাত কারখানায়। বিশেষ ধরনের ইস্পাত এবং সূক্ষ্ম ও ভারী যন্ত্রপাতি রপ্তানিতে ফ্রান্স আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

চীন (China)—লৌহ আকরিক উত্তোলনে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী

মহাচীনে (People's Republic of China) শানসি, হোপাই এবং শানটুং অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিকের সঞ্চয় রহিয়াছে। মাঞ্চুরিয়াতেও লৌহ আকরিকের যথেষ্ট সঞ্চয় আছে। শানসির লৌহ আকরিক ভান্ডারের পরিমাণ ৩০ কোটি মেঃ টনের উপর। চীনের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ২,০০০ কোটি মেঃ টন।

এই দেশের উহান (Wuhan)-এর নিকটে তায়ে (Tayeh) অঞ্চলে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে। চীনদেশে ১৯৭৭ সালে ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন লৌহ আকরিক উত্তোলিত হইয়াছিল। সর্ববৃহৎ ইস্পাতকেন্দ্র আনশান্ শিল্পনগরে মাঞ্চুরিয়ার মুকদেনের খনি হইতে লৌহ আকরিক আসে। এখানকার ইস্পাত শিল্পকারখানাগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ লক্ষ মেঃ টন। উহান ও পাওটাও (Paotow) কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেঃ টন। চীন ইস্পাত শিল্পে শত শত স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন ব্লাস্ট ফারনেস স্থাপন করিয়া বেকার সমস্যা এবং অন্যান্য শিল্পগত সমস্যা দূর করিবার চেষ্টায় আছে। ইহার ফলে চীনের শিল্পায়ন অনেক দেরীতে আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের তুলনায় তাহার বাৎসরিক ইস্পাত উৎপাদন বেশী। ১৯৭১ সালে ভারত যেখানে মাত্র ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত উৎপাদন করিয়াছিল, চীনের ঐ বৎসরের উৎপাদন হইয়াছিল ১৮৪ লক্ষ মেট্রিক টনের উপর।

ভারত (India)—স্বাধীনোত্তর যুগেই লৌহ আকরিক উত্তোলনে ভারতের প্রকৃত অগ্রগতি দেখা যায়। রাজ্যগুলির মধ্যে ওড়িশা (৩৬%), বিহার (২৬%), মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশ প্রচুর লৌহ আকরিক উত্তোলন করে। মধ্য প্রদেশের খনিজ লৌহ (ডাল্লি ও রাজহারা) অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। প্রচুর লৌহ আকরিক বিদেশে রপ্তানি হয়। জাপান সর্বাপেক্ষা বেশী (৫৮%) ভারতীয় লৌহ আকরিক আমদানি করে। লৌহ আকরিক উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

সুইডেন (Sweden)—সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ আকরিকের মালিক সুইডেন। এখানকার অধিকাংশ লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট শ্রেণীর। মেরুবলয়ের উত্তর কিরুনা ও গালিভার-মামবারজেট (Kiruna & Gallivare-Malmberget) অঞ্চলে সুইডেনের সর্ববৃহৎ লৌহ আকরিকক্ষেত্র রহিয়াছে। আকরিক নরওয়ের বন্দর নারভিক এবং সুইডিশ বন্দর লুলিয়া মারফত রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণ সুইডেনে বার্গসল্যাগেন (Bergslaga) অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। গ্রাঞ্জেসবার্গ ও স্ট্রাসা (Grangesberg & Strassa) লৌহ খনির জন্য বিখ্যাত। ওক্সেলেসান্ড (Oxelesund) বন্দর মারফত এই অঞ্চলের আকরিক রপ্তানি হয়। দক্ষিণে আরও লৌহখনি আছে কিন্তু ফস্‌ফরাস মিশ্রিত থাকায় উহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর আকরিক। খনিগুলি গভীর নহে; এইজন্য উত্তোলন খরচ কম। ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দেশের লৌহ আকরিকের প্রধান আমদানিকারক।

ভেনেজুয়েলা (Venezuella)—লৌহ আকরিক উৎপাদনে এই দেশ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বলিভার রাজ্যে অরিনোকো স্টীল কোং এবং মার্কিন স্টীল করপোরেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি লৌহ আকরিক উত্তোলন কার্যে নিযুক্ত

আছে। সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ ১৫২ কোটি মেট্রিক টন। এখানে পূর্বে ইস্পাতশিল্প ছিল না। ১৯৬১ সালে সরকারী প্রচেষ্টায় পিয়র্টো অরডাজ্ (Puerto Ordaz) অঞ্চলে একটি ৬ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ব্রিটেন (U. K.)—ব্রিটেনে লৌহ আকরিকের সঞ্চয় নিঃশেষের পথে; কিন্তু এই দেশের বিরাট ইস্পাতশিল্প আমদানীকৃত উৎকৃষ্ট আকরিকের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে। ক্লিভল্যান্ড ও মিডল্যান্ড অঞ্চলে লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। আমদানীকৃত খনিজ লৌহের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ২ কোটি মেঃ টন। আমদানী-ভিত্তিক বলিয়া সমুদ্রের উপকূলের নিকট ইস্পাত কারখানাগুলির সন্নিবেশ হইয়াছে। এখানকার আকরিক গন্ধক ও ফস্‌ফরাস মিশ্রিত। উহা আমদানীকৃত লৌহ আকরিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইস্পাত তৈয়ারি হয়।

পশ্চিম জার্মানী (Federal Republic of Germany)—খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য এবং সঞ্চয় দেখা যায় উত্তর রাইন ওয়েস্টফালিয়া অঞ্চলে। খনিজ লৌহ আকরিকের জন্য হার্জ, থুরিনজার, সাল্‌জ্‌নিটার, সিজারল্যান্ড, ভোগল্‌স্‌বার্গ এবং পীন অঞ্চল বিখ্যাত। বিভিন্ন ধরনের ইস্পাত তৈয়ারিতে এখনও জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী খুব কম। রূঢ়, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্ক্‌ফার্ট, ড্রেসডেন, লিপজীগ, ম্যাগ্‌ডিবার্গ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইস্পাত-প্রস্তুত অঞ্চল।

স্পেন (Spain)—এব্রো (Ebro) অববাহিকায় নদীর উৎসের নিকটে বিলবাও (Bilbao) নামক অঞ্চলে লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। সান্‌টানডার (Santander) অঞ্চলও আকরিকের জন্য বিখ্যাত। আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ ৫০%-৬০%। আকরিকে ফসফরাস, গন্ধক প্রভৃতি না থাকায় বিদেশে এই দেশের আকরিক আদৃত হয়। মধ্যযুগে তলোয়ার ও কৃপাণ নির্মাণে এখানকার আকরিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। টোলেডো তলোয়ার (Toledo Blade) এখনও ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন। ইস্পাত শিল্পের অভাবের ফলে অধিকাংশ আকরিক বিদেশে রপ্তানি হয়। খনিগুলি ব্রিটেন, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত; দেশের সরকার জনকল্যাণকামী নহে। সেইজন্য খনিজ সম্পদ এবং শিল্প অবহেলিত ও অনুন্নত।

ইউরোপের লুক্সেমবার্গ, চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, গ্রীস ও নরওয়ে লৌহ আকরিক উত্তোলন করিয়া থাকে।

জাপান (Japan)—হক্কাইডো দ্বীপের মুরোরান অঞ্চলে লৌহ আকরিক রহিয়াছে। হনসু দ্বীপে সেনিন (Senin) অঞ্চলেও লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। অধিকাংশ লৌহ আকরিক ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি করিতে হয়। জাপান ইস্পাত শিল্পে দ্বিতীয় এবং জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনসে (মিনডানাও) লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়।

উত্তর আফ্রিকায় **মরক্কো,** টিউনিশিয়া ও **আলজিরিয়াতে** পর্যাপ্ত পরিমাণে লৌহ আকরিক রহিয়াছে। এখানকার অধিকাংশ খনি ফরাসী স্বার্থে পরিচালিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই সকল দেশে সুলভ কৃষ্ণকায় মজুর খাটানো হয়; ফলে উৎপাদন খরচ কম হয়।

পশ্চিম আফ্রিকার **লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওন** অঞ্চলে লৌহ আকরিক উত্তোলিত

হয়। খনির মালিকানা শ্বেতাঙ্গদের অধিকৃত। লৌহ আকরিক উৎপাদনে দক্ষিণ আফ্রিকার পরই লাইবেরিয়ার স্থান। এখানকার নিম্বা পর্বতমালা ও বোমি পাহাড় হইতে উন্নতমানের লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার **চিলির** উত্তরভাগে লা সেরেনার (Les Serena) নিকটে তিনটি উৎকৃষ্টশ্রেণীর লৌহ আকরিক ভাণ্ডার রহিয়াছে। উত্তোলিত লৌহ আকরিক ভালডিভিয়া ও হুয়াচিপাটো শহরে চালান হয়। ভালডিভিয়া হইতে লৌহ আকরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কারখানায় প্রেরিত হয়। হুয়াচিপাটোয় সরকারী প্রচেষ্টায় একটি আধুনিক ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবার ফলে ঐ কারখানায় স্থানীয় লৌহ আকরিক ব্যবহৃত হইতেছে।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)—সাধারণতঃ শিল্পোন্নত দেশগুলি লৌহ আকরিকের প্রধান আমদানিকারক; যাহাদের স্থানীয় চাহিদা কম অথবা শিল্পায়নে পশ্চাৎপদ, তাহারাই প্রধান রপ্তানিকারক। যেমন, ভারত তাহার উৎকৃষ্ট আকরিক জাপানকে রপ্তানি করে। ইহা জাতীয় ক্ষতি। ইস্পাত কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে স্থানীয় উৎকৃষ্ট আকরিকের সাহায্যে অল্প খরচে ইস্পাত উৎপাদন করিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে তাহা বিক্রয় করিলে ভারতের পক্ষে অনেক লাভজনক হইবে। লৌহ আকরিকের প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশ হইল ব্রিটেন, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হইল অনুন্নত বা উন্নতিশীল অন্যান্য লৌহ আকরিক উৎপাদক দেশসমূহ।

তাম্র (Copper)

প্রাচীনকাল হইতেই মানবসমাজে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। পূর্বে কোনো কোনো জায়গায় বিশুদ্ধ তাম্র পাওয়া যাইত। হাজার হাজার বৎসর পূর্বের প্রাচীন ভারতীয়, মিশরীয় ও চৈনিক সভ্যতার নানা চিহ্ন প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তাম্রলিপি ও অনুশাসন, তাম্রের তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রস্তরযুগের পরেই প্রাচীন মানবসমাজ তাম্রযুগে নূতন অগ্রগতির ইতিহাস রচনা করিয়াছিল।

ব্যবহার (Uses)—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিল্পক্ষেত্রে তাম্র একাধিপত্য করিয়াছে। আজ ইহার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী আসরে নামা সত্ত্বেও এখনও লৌহের পরেই তাম্রের স্থান। বৈদ্যুতিক তার, যন্ত্রপাতি ও ব্যাটারী প্রস্তুতকার্যে তাম্র অধিক ব্যবহৃত হয়। জড়বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বহুল প্রচলিত। তাম্র বিদ্যুৎপরিবাহী হওয়ায় বৈদ্যুতীকরণ এবং বিদ্যুৎ সরঞ্জামশিল্পে ইহা অপরিহার্য। তামার পাত দিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে নানা সামগ্রী তৈয়ারি হয়। ইহা ঘাতসহ এবং নমনীয় হওয়ায় নানারূপে ইহাকে ব্যবহার করা যায়। তাম্রনির্মিত তৈজসপত্র হিন্দুদের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়।

তাম্রের সহিত অন্যান্য ধাতু মিশাইয়া নানা রকম সঙ্কর ধাতু উৎপাদন করা হয়। যেমনঃ

যেমনঃ	তাম্র + টীন বা রাং	= ব্রোঞ্জ (Bronze)
	তাম্র + দস্তা	= পিতল
	তাম্র + নিকেল	= মনেল মেটাল

তাম্র + টিন + অ্যান্টিমনি = ব্যাবিট মেটাল
তাম্র + অ্যালুমিনিয়াম = ডুরালুমিন
তাম্র + স্বর্ণ = গিনি সোনা

আকরিক তাম্র হইতে শোধনপূর্বক ধাতব তাম্র নিষ্কাশিত করার খরচ অনেক বেশী। ইলেকট্রোলাইসিস্ পদ্ধতিতে তাম্র শোধন করা হয়। তাম্রশোধন শিল্পে ব্যাপকভাবে জলবিদ্যুতের ব্যবহার হয়; তাহাতে শোধন-ব্যয় অনেক কম হয়। বর্তমানে আণবিক শক্তিজাত বিদ্যুতে কানাডায় তাম্রশোধন কার্য চালু হইয়াছে। তাম্র আকরিকে বিশুদ্ধ তাম্রের পরিমাণ ·৫% হইতে ১·৫%।

পৃথিবীর খনিজ তাম্র উৎপাদন—১৯৮৪
(লক্ষ মেঃ টন)

(১)	চিলি	১২·০০	(৬)	ফিলিপাইন্স	৪·২৬
(২)	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০·৪৬	(৭)	পোল্যান্ড	৩·৬৭
(৩)	জাম্বিয়া	৬·৯৩	(৮)	পেরু	৩·৩৬
(৪)	কানাডা	৬·১৫	(৯)	অস্ট্রেলিয়া	২·৩৪
(৫)	জায়েরে	৫·০৩	(১০)	দঃ আফ্রিকা	২·০৮

Source: U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics. March, 1985.

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (**Principal Producing Countries**)—**চিলি** খনিজ তাম্র উৎপাদনে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। চুকি কামাটা, পেট্রেরিলোস এবং সান্টিয়াগোর দক্ষিণ-পূর্বে ব্রাডেন ডা সেওয়েল প্রধান খনি অঞ্চল। সমুদ্রতীরবর্তী হওয়ায় এই দেশ হইতে বিদেশে তাম্র রপ্তানির সুবিধা হইয়াছে। শিল্পায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বর্তমান সরকার কয়েকটি তাম্রশোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিলির তাম্রের প্রধান আমদানিকারক। খনিগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ লগ্নি রহিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খনিজ তাম্র উৎপাদনে এবং শোধনে পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। এই দেশের উৎপাদনের ১০% আসে আরিজোনা, উটা, নেভাডা, নিউ মেক্সিকো ও মনটানা রাজ্য হইতে। একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চলে এই ধাতু উত্তোলিত হইলেও ইহার শিল্প-অঞ্চল পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ। উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা থাকায় স্থানগত অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। দেশের সম্পদ লইয়া এই দেশের শিল্পপতিরা সন্তুষ্ট নহেন। বিদেশে বহু তাম্রখনিতে ইহাদের মূলধন খাটিতেছে এবং ঐ সকল তাম্রখনিতে মালিকানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রহিয়াছে। অন্যতম বৃহৎ উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল দেশ হইতে প্রচুর তাম্রপিণ্ড স্থানীয় প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা হয়।

আফ্রিকা মহাদেশের **জাম্বিয়া** রাজ্যে এতকাল শ্বেতকায়দের স্বার্থে প্রচুর তাম্র উত্তোলিত হইয়া আসিতেছিল। নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই দেশ অবাধ লুণ্ঠনের বিরোধী। বর্তমানে এই দেশ খনিজ তাম্র উৎপাদনে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে।

অধিকাংশ আকরিক বিদেশে রপ্তানি হয়। জাম্বিয়া সরকার ব্যাপক জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে স্থানীয় আকরিক তাম্র শোধনাগারে শোধিত হইয়া নূতন শিল্পায়নের সহায়ক হইবে। আফ্রিকার তাম্র আকরিক শ্রেষ্ঠ, কেননা, ধাতব তাম্রের অংশ ইহাতে বেশী। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের কায়েমীস্বার্থ সেইজন্যই এই মহাদেশে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে। জাম্বিয়া সহ সমগ্র আফ্রিকার বিরাট খনিজ সম্পদের পরিচালনা ও কর্তৃত্ব কৃষ্ণকায় জাতির স্বার্থে জাতীয় সরকারগুলি কর্তৃক গ্রহণ না করা পর্যন্ত আফ্রিকার জাতীয় শিল্পের উন্নতি সম্ভব হইবে না।

জায়েরের ও জিম্বাবোয়ের স্থানীয় কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের বেলায় একই ধরনের বঞ্চনার ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়। জায়েরের কাটাঙ্গায় এবং জিম্বাবোয়েতে প্রচুর তাম্র আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে। জায়েরের খনিগুলি এখনও শ্বেতকায় কবলিত *"Societe Generale Congolaise Minerals"* কোম্পানীর হাতে। পূর্বে কুখ্যাত বেলজিয়াম কোম্পানী *'Union Minere du Hant Ketanga'*-র হাতে ছিল। বিখ্যাত তাম্রখনিগুলি হইতেছে কাটাঙ্গার কিপুসী (Kipushi), মুসোনাই (Musonoie) ও রুয়ে (Ruwe)। জায়েরের মোট রপ্তানির ৫০% তাম্র (২,৭৮,০০০ মেঃ টন)।

জিম্বাবোয়ের মাটির মানুষদের (Sons of the soil) বঞ্চিত করিয়া অ্যাংলো-আমেরিকান কায়েমীস্বার্থের প্রহরায় এক বে-আইনী শ্বেত সরকার এখানে রাজত্ব করিতেছিল। এখন এই দেশ স্বাধীন হইয়াছে। বিরাট খনিজ সম্পদ যদি এই দেশে কালো মানুষদের স্বার্থে সত্য সত্যই কোনোদিন ব্যবহৃত হইবার সুযোগ ঘটে, তাহা হইলে জিম্বাবোয়ের কৃষ্ণকায় মানুষদের আর্থিক দুর্গতি বহুলাংশে দূর হইবে। এই দেশের রোয়ান এ্যান্টিলোপ (Roan Antelope) ও এনকানা (Nkana) অঞ্চলে তাম্র উত্তোলিত হয়। ইহা ছাড়া **দক্ষিণ আফ্রিকায়** তাম্র পাওয়া যায়।

কানাডায় জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন অলৌহবর্গীয় ধাতুর উৎপাদনে কানাডা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। স্যাডবেরী, স্কীনা, টেলক্রীক ও ভ্যাঙ্কুভারে অধিকাংশ তাম্র উৎপন্ন হয়। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় তাম্র শিল্পজাত নানা দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, ব্রিটেন ও চীন কানাডার তাম্রের প্রধান আমদানিকারক। তাম্র উৎপাদনে কানাডা চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে ব্রোকেন হিল, কুইন্সল্যান্ডে (কার্পেন্টারিয়া) এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় তাম্রখনি রহিয়াছে ; এখানে তাম্র শোধনাগার আছে এবং এই তাম্র বিভিন্ন ধাতুশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

মেক্সিকোর এলোনোরা (Eilonora)-র উলরিক (Ulrick) অঞ্চলে তাম্র উত্তোলিত হয়। **ভেনেজুয়েলার** ব্রাদেন (Braden) এবং **বলিভিয়ার** পোটোসি (Potosi) ও আরোয়ায় (Aroa) তাম্র পাওয়া যায়।

অনুন্নত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যথারীতি শোধনাগার এবং শিল্পায়ন শুরু না হইলে খনিজ রপ্তানিভিত্তিক অর্থনীতি হইতে মুক্তি নাই। **পেরুর** অধিকাংশ তাম্রখনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত। সেরো ডি প্যাস্কো (Cerro de

Pasco) এবং কাজামার্কায় (Kazamarca) খনিগুলি অবস্থিত। এদেশের অধিকাংশ আকরিক এবং পিণ্ড বিদেশে রপ্তানি হয়।

ইউরোপে পোল্যান্ড তাম্র উত্তোলনে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ইহা ছাড়া স্পেন (রিওটিন্‌টো), পর্তুগাল (সিয়ারা নেভাডা) ও সোভিয়েত রাশিয়ায় (ককেশাস, ইউরাল এবং মধ্য এশিয়া) তাম্র উত্তোলিত হইয়া থাকে।

এশিয়ায় ফিলিপাইনস্‌ তাম্র উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া জাপানে (হনসু, সিকোকু ও কিউসু দ্বীপে) এবং ভারতের মোশাবনি ও ধোবানিতে (বিহার), ক্ষেত্রীতে (রাজস্থান) এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে তাম্র পাওয়া যায়। চীনে (সানটুং, জেচুয়ান এবং ইউনান) তাম্র উত্তোলিত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই বিদেশ হইতে তাম্র আমদানির উপর নির্ভরশীল।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধাতব তাম্রের প্রধান রপ্তানিকারক। খনিজ তাম্র রপ্তানিতে চিলি, কানাডা, জিম্বাবোয়ে ও জায়েরে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রিটেন, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালি, ভারত ও জাপান খনিজ তাম্র ও ধাতব তাম্রের প্রধান আমদানিকারক। • • •

সীসা (Lead)

ব্যবহার (Uses)—অন্যান্য খনিজ ধাতুর তুলনায় খনিজ সীসায় ধাতব সীসার অংশ অনেক বেশী থাকে। খনিজ সীসার মধ্যে (১) গ্যালেনা (Galena), (২) এ্যাঙ্গিসাইট (Angicite), (৩) এরুসাইট (Aerucite) উল্লেখযোগ্য। গ্যালেনায় ধাতব সীসার অনুপাত প্রায় ৮৬%। গ্যালেনা হইতেই অধিকাংশ সীসা পাওয়া যায়। খনিজ সীসাকে খনির মধ্যে একক অবস্থায় পাওয়া যায় না। দস্তা ও রৌপ্যের সহিত যৌগিক মিশ্র অবস্থায় পাওয়া যায়।

সীসা অল্প উত্তাপে গলিয়া যায় এবং অ্যাসিডে নষ্ট হয় না বলিয়া বিভিন্ন শিল্পে ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ব্যবহার বহুবিধ। গ্যাসের ও জলের নল, বৈদ্যুতিক তারের আচ্ছাদন, মুদ্রণের হরফ, টাইপরাইটিং যন্ত্র, রং, কাঁচ, গোলা-গুলি, কীটনাশক ঔষধ, মোটর ও বিমানপোত নির্মাণ, রাং ঝালাই ও মৃৎশিল্পের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির কার্যে সীসা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries)—উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় অধিকাংশ খনিজ সীসা পাওয়া যায়।

পৃথিবীর খনিজ সীসা উৎপাদন—১৯৮৪

(১) অস্ট্রেলিয়া	৪ লক্ষ ৫৮ হাঃ মেঃ টন		(৬) মরক্কো	১ লক্ষ ০১ হাঃ মেঃ টন
(২) মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৪ „ ৪৮ „ „ „		(৭) স্পেন	৭২ „ „ „
(৩) কানাডা	২ „ ৫২ „ „ „		(৮) থাইল্যান্ড	৫০ „ „ „
(৪) মেক্সিকো	১ „ ৬৭ „ „ „		(৯) জাপান	৫৭ „ „ „
(৫) যুগোশ্লাভিয়া	১ „ ১৫ „ „ „		(১০) পোলান্ড	৪৫ „ „ „
			(১১) ভারত	২৫ „ „ „

Source: U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March 1985

পৃথিবীর খনিজ সম্পদ
M ম্যাঙ্গানিজ
তাম্র
সীসা
দস্তা
T টিন
সীসা ও তাম্র
সীসা ও দস্তা
সুমেরু মহাসাগর
সুমেরুবৃত্ত
0°
কর্কটক্রান্তি-রেখা
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
নিরক্ষরেখা
ভারত মহাসাগর
মকরক্রান্তি-রেখা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রধান খনিজ ও ধাতব সীসা উৎপাদনকারী দেশ ছিল; বর্তমানে এই দেশ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করে। মিসৌরীতে অধিকাংশ সীসা উত্তোলিত হয়। তাহা ছাড়া ওক্‌লাহোমা, ইডাহো, কলোরাডো, মন্টানা, আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো ও নেভাডায় সীসা উৎপন্ন হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশী হওয়ার দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সীসা আমদানি করিতে বাধ্য হয়। **অস্ট্রেলিয়ার** নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌ ও কুইন্সল্যান্ডে সীসা উৎপন্ন হয়। খনিজ সীসা উৎপাদনে এই দেশ বর্তমানে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। **কানাডায়** ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রধান উৎপাদক অঞ্চল (৯৫%)। ধাতব সীসা উৎপাদনে এই দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও খনিজ সীসা উৎপাদনে এই দেশ **তৃতীয়** স্থান অধিকার করে। এখানকার সালিভান খনি বিখ্যাত। **মেক্সিকোর** চিহুয়াহুয়া (Cnihuahua), জাকাটিকাস (Zacatecus) এবং সান লুই পোটোসিতে (San Louis Potosi) খনিজ সীসা উত্তোলিত হয়। **পেরুতে** (দক্ষিণ আমেরিকা) সেরো ডি প্যাস্কো (Cerro de Pasco), **আর্জেন্টিনায়** অ্যাহুইলারে (Awheeler) এবং **বলিভিয়ার** সীসা আকরিক উত্তোলিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলি শিল্পোন্নত দেশগুলিকে খনিজ সীসা রপ্তানি করিয়া থাকে।

ইউরোপে পশ্চিম জার্মানী (সাইলেশিয়া), যুগোশ্লাভিয়া (ট্রেপকা ও স্টানট্রাস, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স (পিরেনীজ ও আল্পস), স্পেন (লেনারেস কারলিন, সিয়েরা মোরেনা), ব্রিটেন (ডার্বিশায়ার ও ডারহাম) এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় (কাজাকস্তান) খনিজ সীসা উত্তোলিত হয়। এশিয়ার মাঞ্চুরিয়া, চীন ও ব্রহ্মদেশে (সান রাজ্য) খনিজ সীসা পাওয়া যায়। আফ্রিকার মরক্কো সীসা উৎপাদনের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, স্পেন, পেরু, বলিভিয়া প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি, জাপান, ভারত ও পাকিস্তান প্রধান আমদানিকারক।

রাং (Tin)

রাং বর্তমান জগতে শিল্পায়নের প্রয়োজনে একটি উল্লেখযোগ্য ধাতু। ক্যাসিটেরাইট আকরিক হইতে টিন বা রাং নিষ্কাশিত হয়। অনেকক্ষেত্রে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ হিসাবে বা সালফাইড হিসাবে খনিজ রাং উত্তোলিত হয়।

ব্যবহার (Uses)—ইস্পাত পাতের উপর টিনের প্রলেপ বা কলাই দিয়া টিনের পাত (Corrugated Iron Sheet) প্রস্তুত হয়। ইহাতে মরিচা ধরে না। ঘরবাড়ি ও গুদামঘর-নির্মাণে ইহা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। পাতলা টিনের পাত দিয়া কৌটা তৈয়ারি হয়। সারা পৃথিবীব্যাপী খাদ্য সংরক্ষণে এই কৌটা বা টিনের বড় পাত্র ব্যবহৃত হয়। কেরোসিন, ঘি, মাখন, তৈল, দুগ্ধ এবং অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের জন্য এই ধাতুনির্মিত পাত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। ফিল্ম, শৌখিন দ্রব্য, সিগারেট, কফি ইত্যাদির প্যাকেট করিবার জন্যও টিনের কৌটা বা পাতের প্রয়োজন। তামা ও এ্যান্টিমনির সহিত টিন পৃথকভাবে মিশাইয়া সংকর ধাতু (alloy) প্রস্তুত হয়। সীসার পাতলা পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ দিয়া সিগারেট ও চকোলেট মুড়িবার রুপালী কাগজ তৈয়ারি হয়।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (**Principal Producing Countries**)—এশিয়ার কয়েকটি দেশে পৃথিবীর বেশীর ভাগ রাং উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর রাং বা টিন উৎপাদন—১৯৮৪

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
মালয়েশিয়া	৪১ হাজার ৩৬ শত মেঃ টন	ব্রাজিল	৮ হাজার ৩ শত মেঃ টন
বলিভিয়া	২৬ ,, ৭ ,, ,, ,,	ব্রিটেন	৪ ,, ২ ,, ,, ,,
ইন্দোনেশিয়া	২৬ ,, ৫ ,, ,, ,,	দঃ আফ্রিকা	৩ ,, ০ ,, ,, ,,
থাইল্যান্ড	২৬ ,, ২ ,, ,, ,,	জায়েরে	২ ,, ২ ,, - ,,
অস্ট্রেলিয়া	১০ ,, ২ ,, ,, ,,	নাইজেরিয়া	১ ,, ৭ ,, ,, ,,

Source : U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1985

মালয়েশিয়া শতকরা ৪০ ভাগ রাং উৎপাদন করিয়া **শ্রেষ্ঠ স্থান** অধিকার করে। খনিগুলির মালিকানা অধিকাংশ ব্রিটিশ ব্যবসায়িগণের হাতে। মালয়েশিয়ার গোপেন, কিমটো ও জেহোস্পাত নামক খনি অঞ্চলে এবং পেরাক, সেলাঙ্গর ও নেগ্রি সেম্বিলান অঞ্চলে রাং উত্তোলিত হয়। বলিভিয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে খনিজ রাং উত্তোলিত হয়। এই দেশের অধিকাংশ খনিজ রাং বিদেশে রপ্তানি হয়। **ইন্দোনেশিয়ায়** বাঁকা বিলিটন ও সিঙ্গকেপ দ্বীপে খনিজ রাং উত্তোলিত হয়। কয়েক বৎসর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের ফলে ইন্দোনেশিয়াব্যাপী রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোষিত সরকারের অভ্যুত্থানের সুযোগে অধিকাংশ খনিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নি এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **থাইল্যান্ড, নাইজেরিয়া, জায়েরে ও দক্ষিণ আফ্রিকায়** খনিজ রাং উত্তোলিত হয়। অধিকাংশই বিদেশী মালিকানার শৃঙ্খলে বাঁধা। অধুনা **অস্ট্রেলিয়া** রাং উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। **চীনও** রাং উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দেশের প্রধান উৎপাদক অঞ্চল হইল ইউনান্ ও কোয়াংসি। **ব্রিটেনের** ডেভন ও কর্নওয়ালের প্রাচীন রাং-এর খনিগুলি এখনও চালু আছে। ব্রহ্মদেশ (ট্যাভয় ও মৌচি), পশ্চিম জার্মানী ও পর্তুগালে খনিজ রাং পাওয়া যায়।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (**Consumers and Traders**)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাং আমদানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি, ভারত ও পাকিস্তান প্রধান আমদানিকারক। অন্যদিকে মালয়েশিয়া, বলিভিয়া, ব্রহ্মদেশ, জায়েরে, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড রাং রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

দস্তা (Zinc)

ব্যবহার (Uses)—নানা ধরনের অলৌহবর্গীয় বা লৌহেতর ধাতুর মধ্যে দস্তার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ইহা নমনীয় এবং ঘাতসহ। লৌহের উপর মরিচা নিবারক দস্তার প্রলেপ (Galvanizing) লাগানো হয়। বিদ্যুৎশিল্পের এবং ব্যাটারী তৈয়ারিতে দস্তা ব্যবহৃত হয়।

রং, মুদ্রণের ব্লক, পিতল, কাঁসা, নকল সোনা, জার্মান সিলভার, ড্রাই ইলেকট্রিক ব্যাটারী, ঔষধ ও রবারের টায়ার তৈয়ারিতে দস্তা ব্যবহৃত হয়। দস্তার আকরিক

সাধারণতঃ খনিতে এককভাবে অবস্থান করে না। রূপা, সীসা, তাম্র, এমন কি নিকেলের সহিতও মিশ্রিতভাবে আকরিক দস্তা পাওয়া যায়।

আকরিক দস্তাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) জিংক-স্পার (Zinc spur), (২) জিংক ব্লেন্ড (Zinc Blende), (৩) জিংকাইট (Zincite), (৪) উইলেমাইট (Wil mite), (৫) হেমিমরফাইট (Hem morphite) ও (৬) স্ফ্যালেরাইট (Sphalerite । ইহার মধ্যে স্ফ্যালেরাইট হইতেই অধিকাংশ দস্তা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ উপরিউক্ত বিভিন্ন আকরিকে ধাতব দস্তার পরিমাণ ২% হইতে ১২%।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries)—উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে অধিকাংশ (৭৬%) খনিজ দস্তার সঞ্চয় দেখা যায়।

পৃথিবীর খনিজ দস্তা উৎপাদন—১৯৮৩

কানাডা	১০ লক্ষ	৭০ হাজার	মেঃ	টন	আয়ারল্যান্ড	১ লক্ষ	৩৫	হাজার	মেঃ	টন
অস্ট্রেলিয়া	৬ ,,	৭৮ ,,	,,	,,	পঃ জার্মানী	১ ,,	০৬	,,	,,	,,
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২ ,,	৭৪ ,,	,,	,,	যুগোশ্লাভিয়া		৮৮	,,	,,	,,
মেক্সিকো	২ ,,	৫৭ ,,	,,	,,	জায়েরে		৮২	,,	,,	,,
জাপান	২ ,,	৫৬ ,,	,,	,,	উঃ কোরিয়া		৫৮	,,	,,	,,
স্পেন	১ ,,	৬২ ,,	,,	,,	ফিনল্যান্ড		৫৮	,,	,,	,,

Source : U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1985

ধাতব দস্তা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও খনিজ দস্তা উৎপাদনে **কানাডা** পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কুইবেক, অন্টারিও, ম্যানিটোবা ও ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় খনিজ দস্তা কোথাও সীসা, কোথাও রূপার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

খনিজ দস্তা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান **অস্ট্রেলিয়ার**। নিউ সাউথ ওয়েলস্ (ব্রোকেন হিল) এবং টাসমানিয়া দ্বীপে (রীড রোজবেরীতে) দস্তা উত্তোলিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বপ্রধান ধাতব দস্তা উৎপাদক এবং তৃতীয় খনিজ দস্তা উৎপাদক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দস্তার খনিগুলি কানসাস, ওকলাহোমা, মিসৌরি, উত্তর-পূর্ব পেনসিলভ্যানিয়া, নিউ জার্সি, উটা, ইডাহো ও কলোরাডো রাজ্যে অবস্থিত। ধাতব দস্তা রপ্তানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান স্থান অধিকার করে।

খনিজ দস্তা উৎপাদনে **মেক্সিকো** চতুর্থ স্থান এবং জাপান পঞ্চম স্থানের অধিকারী।

তাহা ছাড়া ইউরোপে পোলান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইটালি, সোভিয়েত রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, হাঙ্গেরী, স্পেন ও ব্রিটেন, এশিয়ায় চীন, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া ও ভারত, আফ্রিকায় জিম্বাবোয়ে, মরক্কো, আলজিরিয়া, জায়েরে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানায় খনিজ দস্তা পাওয়া যায়।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)— দস্তার প্রধান রপ্তানিকারক হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, ব্রহ্মদেশ এবং আফ্রিকার দেশগুলি এবং আমদানিকারক হইল ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)

তাম্রের ন্যায় অ্যালুমিনিয়ামের ঐতিহাসিক মর্যাদা নাই। কারণ, মাত্র ১৮২৫ সালে বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন শুরু হইয়াছিল। বক্সাইট হইতে ক্রায়োলাইটের সাহায্যে প্রধানতঃ ধাতব অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। ধাতব অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন কার্যে জলবিদ্যুৎশক্তি অপরিহার্য ; কয়লা পোড়াইয়া খরচ পোষায় না। সুতরাং যে সকল দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নত ও ব্যাপক, তাহাদের বক্সাইট আকরিক না থাকিলেও তাহারা আমদানীকৃত আকরিকের সাহায্যে বিরাট অ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে ; আবার যে দেশে আকরিক এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন উভয়ই রহিয়াছে, অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে তাহারা উন্নত ; কিন্তু যে দেশে শুধু আকরিক আছে, অথচ জলবিদ্যুৎ নাই, তাহাদের পক্ষে এই আকরিক রপ্তানি করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

ব্যবহার (Uses)—অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত হালকা অথচ কঠিন পদার্থ। অনেক ক্ষেত্রে ইস্পাতের বিকল্প হিসাবে ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী। অ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যে গৃহস্থালির তৈজসপত্র, যানবাহনের কাঠামো (বিমান, ট্রাক, মোটরগাড়ি, জাহাজ, রেলের কামরা, মোটর বোট ইত্যাদি) গুদামঘর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক তার এবং রং প্রস্তুত হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়াম রং অবিকৃত থাকে। কি ঘরে, কি বাহিরে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। সম্ভবতঃ সেইজন্যই অনেকে এই যুগকে 'অ্যালুমিনিয়াম যুগ' বলিয়া থাকেন। ইহার যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব রহিয়াছে।

অন্যান্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত সংকর অ্যালুমিনিয়ামেরও চাহিদা বাড়িয়াছে। অ্যালুমিনিয়াম সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। নমনীয় হওয়ায় যে কোনো রূপে ইহার ব্যবহার সম্ভব। কানাডা এবং অন্যান্য শীতপ্রধান অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়ামের ঘর-বাড়ি, সেতু, লাইটপোস্ট ও বৈদ্যুতিক তারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কানাডা তাহার খনিজ লৌহ ও ইস্পাতের অভাব অ্যালুমিনিয়াম দিয়া পূরণ করিতেছে।

আকরিক অ্যালুমিনিয়াম বা বক্সাইট—পূর্বেই বলা হইয়াছে বক্সাইট হইতে প্রধানতঃ ধাতব অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। বক্সাইটের অন্যান্য ব্যবহারও আছে। রাসায়নিক শিল্পেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ৪০% অ্যালুমিনা থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন সম্পূর্ণভাবে সুলভ জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল।

বক্সাইট উৎপাদক দেশ এবং অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে বিশেষ বৈষম্য দেখা যায়। অধিকাংশ বক্সাইট উৎপাদক দেশ পশ্চাৎপদ। কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক দেশগুলি উন্নত। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশের বিরাট অ্যালুমিনিয়াম শিল্প আমদানীকৃত বক্সাইটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

বক্সাইট উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, জামাইকা, গিনি, সুরিনাম, গায়ানা, হাঙ্গেরী, ব্রাজিল, ফ্রান্স এবং যুগোশ্লাভিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতে বিহার অঞ্চলে (লোহারডাগা) প্রচুর বক্সাইট উৎপাদিত হয়। প্রধান উৎপাদক দেশগুলি নিজ নিজ দেশে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অনুকূল

অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার না থাকায় সবটাই বিদেশে রপ্তানি করিতে বাধ্য হয়।

পৃথিবীর মোট বক্সাইট উৎপাদন—১৯৮৪

অস্ট্রেলিয়া	২ কোটি ২৯ লক্ষ মেঃ টন	হাঙ্গেরী	২৯ লক্ষ মেঃ টন
গিনি	১ ,, ১৮ ,, ,, ,,	গ্রীস	২৪ ,, ,, ,,
জ্যামাইকা	৮৩ ,, ,, ,,	ভারত	১৯ ,, ,, ,,
ব্রাজিল	৪২ ,, ,, ,,	গায়ানা	১৮ ,, ,, ,,
যুগোশ্লাভিয়া	৩৫ ,, ,, ,,	ফ্রান্স	১৮ ,, ,, ,,
সুরিনাম	৩৩ ,, ,, ,,		

Source : U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1985

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। নিম্নে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন পরিসংখ্যান দেওয়া হইল ঃ

পৃথিবীর অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন—১৯৮৪

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৫০ লক্ষ ৪১ হাঃ মেঃ টন	ব্রিটেন	৩ লক্ষ ৮০ হাঃ মেঃ টন
পঃ জার্মানী	১১ ,, ৬৬ ,, ,, ,,	স্পেন	৩ ,, ৬৬ ,, ,, ,,
জাপান	১০ ,, ৯৬ ,, ,, ,,	ভেনেজুয়েলা	৩ ,, ৩৬ ,, ,, ,,
কানাডা	১০ ,, ৭৫ ,, ,, ,,	নেদারল্যান্ডস	২ ,, ৯৪ ,, ,, ,,
নরওয়ে	৭ ,, ২০ ,, ,, ,,	যুগোশ্লাভিয়া	২ ,, ৮৩ ,, ,, ,,
ফ্রান্স	৫ ,, ২৩ ,, ,, ,,	ইটালি	২ ,, ৭৪ ,, ,, ,,
অস্ট্রেলিয়া	৪ ,, ৪ ,, ,, ,,	নিউজিল্যান্ড	২ ,, ১৭ ,, ,, ,,
		ভারত	২ ,, ৪ ,, ,, ,,

Source : U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1985.

প্রধান অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries) —শিল্পোন্নত অর্থশালী এবং প্রবল প্রতাপশালী দেশগুলি অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের মাধ্যমে ধনমোক্ষণের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। মাত্র ৪% বক্সাইট উৎপাদন করিয়াও **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে **প্রথম স্থান** অধিকার করিয়াছে। কারণ, অনেক অনুন্নত দেশের খনি তাহার মালিকানায় রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, অরিগ্যান, টেকসাস, লুইসিয়ানা, আরাকানসাস, টেনেসি ও আলাবামায় সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

সুলভ জলবিদ্যুতের সহায়তায় আমদানীকৃত বক্সাইটের সাহায্যে **জাপান** এই শিল্পে পৃথিবীতে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করিয়াছে।

কানাডার বক্সাইটের সংস্থান নাই বলিলেও চলে; তবু এই দেশ পৃথিবীর **চতুর্থ** বৃহত্তম অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক হিসাবে পরিচিত। কানাডার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাপক এবং উন্নত। সেখানে সেওয়েন (কুইবেক), সেন্ট লরেন্স, সি ওয়ের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। **পশ্চিম জার্মানী** অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করিয়াছে। নরওয়ে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন ও নেদারল্যান্ডস এই শিল্পে

প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। ফ্রান্স আল্পস্ ও পীরেনিজের জলপ্রপাতগুলি হইতে উৎপন্ন সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে পশ্চিম ইউরোপে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতও অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে অগ্রগামী। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইস্পাতের বিকল্প ধাতু হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয় বলিয়া শিল্পোন্নত এবং উন্নতিশীল দেশসমূহ এই শিল্প স্থাপনে এবং ইহার প্রসার-কল্পে যত্নবান হইয়াছে। **সোভিয়েত রাশিয়ার** স্থানীয় আকরিক ভিত্তিক অ্যালু-মিনিয়াম শিল্প ইউরাল, লেনিনগ্রাড, জাপোরোজিই (নীপার), কান্ডালাক্সা (শ্বেতসাগর তীরে) এবং জেরেভানে (আর্মেনিয়া) গড়িয়া উঠিয়াছে।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)—জ্যামেইকা, সুরিনাম, গায়না ও ফ্রান্স বক্সাইটের প্রধান রপ্তানিকারক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, কানাডা, নরওয়ে, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারক দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানিকারক এবং শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি প্রধান আমদানিকারক।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)

ব্যবহার (Uses)—ধাতব ম্যাঙ্গানিজ সাধারণ ইস্পাত ও উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত প্রস্তুতকার্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা ইস্পাতের সহিত মিশ্রিত করিলে ইস্পাতকে আরও কঠিন এবং মরিচা প্রতিরোধক করিয়া তোলে।

পৃথিবীতে খনি হইতে উত্তোলিত মোট ম্যাঙ্গানিজের শতকরা ৯০/৯২ ভাগ ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্টাংশ রাসায়নিক, এনামেল, বৈদ্যুতিক ও কাঁচশিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন—১৯৮৪

সোভিয়েত রাশিয়া	৩০ লক্ষ মেঃ টন	গ্যাবন	১১ লক্ষ মেঃ টন
দক্ষিণ আফ্রিকা	২৪ „ „ „	ব্রাজিল	৯ „ „ „
ভারত*	১৩ „ „ „	অস্ট্রেলিয়া	৮ „ „ „

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries)—**সোভিয়েত রাশিয়া** পৃথিবীর মোট ম্যাঙ্গানিজের ৩০% উত্তোলন করিয়া পৃথিবীতে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। জর্জিয়ার চিয়াতুরা (Chiatura) অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ আকরক্ষেত্র ২৬০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এবং দক্ষিণ ইউক্রেনের নিকোপোল (Nikopol) অঞ্চলে ১২০ বর্গ-কিলোমিটার ব্যাপী প্রসারিত। তাহা ছাড়া কুইবিশেভ, বাশকিরিয়া, কাজাকস্তান ও সাইবেরিয়ার মুজুল নদীর উপত্যকায় ম্যাঙ্গানিজ রহিয়াছে।

ভারত ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। ওড়িশা (গাংপুর, সুন্দরগড়, বোনাই, কেওনঝার), মধ্য প্রদেশ (বালাঘাট, চিন্দওয়ারা, ঝাবুয়া, জব্বলপুর), মহারাষ্ট্র (ভাণ্ডারা, পাঁচমহল ইত্যাদি), অন্ধ্র প্রদেশ (শ্রীকাকুলম,

*India—1983.

বিশাখাপতনম্) ও কর্ণাটকে (সিমোগা, চিত্রদুর্গা ইত্যাদি) এবং বিহারে (সিংভূম প্রভৃতি) প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানিতে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান ক্রেতা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কিম্বার্লি (কেপ কলোনী) অঞ্চলে অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। **ব্রাজিলে** সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ ১ কোটি মেট্রিক টনের উপর। আউরো পেট্রো (মিনাস গেরায়েস) এবং ম্যাটো গ্রাসো অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান ক্রেতা। গ্যাবন, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জায়েরে, ঘানা (Ghana) ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)—ম্যাঙ্গানিজের প্রধান আমদানিকারক দেশ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এবং অন্যান্য উন্নত ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশসমূহ। রপ্তানি বাণিজ্যে ভারত, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, মরক্কো, মিশর প্রভৃতি দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(খ) অ-ধাতব খনিজ
(Non-Metallic Minerals)

অ-ধাতব খনিজদ্রব্যের মধ্যে লবণ, অভ্র এবং গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

লবণ (Salt)

লবণ দুই প্রকারের দেখা যায় ; সাধারণ লবণ (Common Salt) ও যৌগিক লবণ (Complex Salt)। সোডিয়াম ক্লোরাইড বা Simple Salt অল্প মাত্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়।

লবণ আহরণের সাধারণতঃ দুইটি উৎস—(১) সমুদ্র ও লবণ হ্রদ এবং (২) ভূগর্ভ ও পর্বতগাত্র। আমাদের দেশে পর্বতগাত্র হইতে যে লবণ আহরিত হয়, হিন্দু আচারবিধি অনুযায়ী উহাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয়। উহা সৈন্ধব লবণ (Rock Salt) নামে পরিচিত। তবে বাণিজ্যে অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেনদেনে সর্বাধিক পরিমাণে যে লবণ ব্যবহৃত হয় তাহা আসে খনি হইতে। সমুদ্রজাত লবণও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার (Uses)—রূপকথায় আছে কোনো এক রাজকন্যা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল যে, আমি আপনাকে লবণের মত ভালবাসি। তাহার ফলে প্রথমতঃ তাহার নির্বাসন দণ্ড হইলেও রাজা নিজ ভুল বুঝিয়া তাহাকে পরে রাজত্ব দান করেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে লবণের অবশ্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা রহিয়াছে। লবণহীন খাদ্য খাওয়ার কথা চিন্তা করা যায় না।

শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লবণ রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তিমূলক খনিজ (Basic mineral)। এখানে ৬৫% লবণ সাধারণতঃ শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কস্টিক সোডা, সোডিয়াম কার্বনেট, ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডা অ্যাশ প্রস্তুতকার্যে লবণ অপরিহার্য কাঁচামাল। উপরিউক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি আবার কাগজ, কৃত্রিম রেশম, সাবান, ঔষধ, কৃত্রিম রবার, পেট্রোলিয়াম ও সেলুলোজ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পশুর খাদ্যেও লবণ ব্যবহৃত হয়।

মৎস্য, মাখন, পনীর, মাংস ও চামড়া পচন হইতে সংরক্ষণার্থে লবণ প্রয়োজন হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে লবণ দিয়া বরফকে গলিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করা হয়। বিভিন্ন কুটীরশিল্পে, মালাই ও দুগ্ধ জমাইবার জন্য লবণ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শহরে পানীয় জল পরিশোধন কার্যে লবণ (ক্লোরিন) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নাগরিক স্বাস্থ্য লবণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পরিশেষে বলা যায়, দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে লবণের ভূমিকা ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries)—সাধারণতঃ সমুদ্র, মহাসমুদ্র ও লবণ হ্রদ হইতে বাষ্পীয়করণ মারফত লবণ আহরণ করা হয়। ইহা স্ফটিক লবণ। কোনো কোনো পর্বতে শিলাস্তরে লবণ রহিয়াছে ; যেমন, পাকিস্তানের সল্ট রেঞ্জ। পৃথিবীর মোট লবণ আহরণের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ইহার শতকরা ৪০ ভাগ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ভারত ইত্যাদি দেশগুলি লবণ উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লবণ উত্তোলক দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট লবণ নিম্নোক্ত রাজ্যগুলি হইতে আসে ঃ মিচিগান (২৬%), নিউ ইয়র্ক (১৭%), ওহিও (১৬%), লুইসিয়ানা (১৪%), টেকসাস (১২%), ক্যালিফোর্নিয়া (৬%) এবং কানসাস (৫%)। গড় বাৎসরিক উৎপাদন ২ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে খনিজ লবণ ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মেঃ টন, সৈন্ধব লবণ (Rock salt) ৫৬ লক্ষ মেঃ টন এবং লবণাক্ত জলজাত লবণ (Brine salt) ৩৬ লক্ষ মেঃ টন। ভারতে ৬০% লবণ সমুদ্রজল বাষ্পীয়করণ মারফত আহরিত হয়। প্রধান উৎপাদক রাজ্যসমূহের মধ্যে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশ, রাজস্থান এবং গুজরাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম বাংলায় মেদিনীপুরে ও ওড়িশার উপকূলে লবণ আহরিত হয়। ভারতের মোট উৎপাদন ৩৫ লক্ষ মেঃ টন। সৈন্ধব লবণের উৎপাদন মাত্র ৪ হাজার মেঃ টন।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)—অধিকাংশ উৎপাদনকারী দেশ স্থানীয় প্রয়োজনে ইহা ব্যয় করে। সামান্য অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়।

অভ্র (Mica)

অধাতব এবং অলৌহবর্গীয় ধাতুসমূহের মধ্যে অভ্র বর্তমান যুগে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অভ্র নানা ধরনের ও নানা রংয়ের হয়। শ্বেত বা ঈষৎ নীল স্বচ্ছ অভ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয়। ইহাকে রুবি অভ্র বা মাসকোভাইট (Muscovite) বলে। রঙীন ঈষৎ সবুজ অস্বচ্ছ অভ্রকে বাইওটাইট (Biotite) বলে। সান্ডউইচে পাঁউরুটির টুকরা যেভাবে সাজানো থাকে, অভ্রের পাত সেইভাবে খনির মধ্যে সাজানো

থাকে। ঐরূপ অবস্থায় উহাকে বুক অব মাইকা (Book of Mica) বলে। প্রতিটি পাত ধারালো ছুরি দিয়া পৃথক করার জন্য সুদক্ষ নারী শ্রমিক নিয়োজিত হয়।

ব্যবহার (Uses)—অভ্রের সর্বাধিক গুণ এই যে, ইহা তাপ, বিদ্যুৎ এবং আণবিক শক্তি বিকিরণে অপরিবাহী এবং প্রতিরোধক। সেইজন্যই আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অভ্র নিত্যসঙ্গী। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে, পদার্থবিদ্যায় এবং আণবিক শক্তি উৎপাদনার্থে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তাহাতে, মোটরগাড়িতে ও বিমানপোতে অভ্রের ব্যাপক ব্যবহার হয়। শব্দতরঙ্গ মারফত শ্রবণশক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী করার ক্ষমতা অভ্রের আছে। তাই গ্রামোফোন, রেডিও, টেলিভিশনে ইহার ব্যাপক ব্যবহার হয়। প্রতিমার সাজের অলঙ্কারে, প্রচণ্ড তাপযুক্ত চুল্লীর জানালা নির্মাণে এবং তাপরক্ষক প্রলেপ ও রং প্রস্তুত কার্যে অভ্র ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে অভ্রের গুঁড়া আমদানি করিয়া সামিকা নামক কৃত্রিম অভ্রখণ্ড প্রস্তুত করে এবং অভ্রের গুঁড়া বৈদ্যুতিক তারে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করে।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries)—অভ্র উৎপাদনে ভারতের একচেটিয়া (monopoly) প্রতিপত্তি রহিয়াছে। পৃথিবীর মোট রপ্তানির ৭৫% ভারতে উৎপন্ন হয়। ভারতের বিহার অঞ্চলে (ঝাঁঝা হইতে হাজারিবাগ) ৮০% উৎকৃষ্ট মাস্‌কোভাইট অভ্র পাওয়া যায়। বর্তমানে উহার উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। অন্ধ্র প্রদেশে বায়োটাইট শ্রেণীর অভ্র রহিয়াছে। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, রাজস্থান ও কেরালায় অভ্রখনি রহিয়াছে। ব্রাজিল ও মালাগাসি অভ্র উৎপাদনে পৃথিবীতে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। কানাডায় অল্প পরিমাণে অভ্র উত্তোলিত হয়।

পৃথিবীর অভ্র উৎপাদন

ভারত	১২,৭০০ মেঃ টন*	মালাগাসি	৯১০ মেঃ টন
ব্রাজিল	১,১০০ মেঃ টন	কানাডা	৭০৫ মেঃ টন

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)—ভারত তাহার মোট উৎপাদনের ৭৫% রপ্তানি করে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার সকল শিল্পোন্নত দেশই ভারতের অভ্রের আমদানিকারক।

গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি (Building Materials)

গৃহনির্মাণে নানাবিধ দ্রব্য প্রয়োজন। তন্মধ্যে বেলেপাথর, চুনাপাথর, মার্বেল পাথর ও সিমেন্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও এবং পেনসিলভ্যানিয়া অঞ্চলে অধিকাংশ বেলেপাথর পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশেও অল্পবিস্তর বেলেপাথর পাওয়া যায়। **চুনাপাথর** সকল দেশে পাওয়া গেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ইহার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। এই দেশের ইন্ডিয়ানা রাজ্যে অধিকাংশ চুনাপাথর পাওয়া যায়। **পৃথিবীর** ভঙ্গিল পর্বতসমূহে, বিশেষতঃ সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান ও ভারতে অধিক

*India—1984

পরিমাণে চুনাপাথর পাওয়া যায়। ইটালি, ভারত, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনে **মার্বেলপাথর** পাওয়া যায়। ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও ব্রিটেনে স্লেট পাওয়া যায়। **সিমেন্ট** প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ জিপসাম প্রয়োজন। সিমেন্ট-উৎপাদনে জাপান, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া ও ফ্রান্সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম, জাপান দ্বিতীয় ও মাঃ যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় স্থান অধিকার করে। গৃহাদি নির্মাণে যে **টালি** ও ইট প্রয়োজন হয়, তাহা মাটি হইতে প্রস্তুত হয়; সুতরাং ইহা সকল দেশেই পাওয়া যায়।

গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত অধিকাংশ দ্রব্যাদি উৎপাদক দেশেই ব্যবহৃত হয়। এইজন্য এই সকল দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ অধিক নহে।

(গ) জ্বালানি খনিজ
(Fuel Minerals)

বর্তমানে **শক্তির** উৎস হইতেছে প্রধানতঃ তিনটি: (১) **কয়লা**, (২) **খনিজ তৈল** ও (৩) **জলবিদ্যুৎ**। মানবসভ্যতার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রথমে কয়লা, পরে খনিজ তৈল এবং তারপর জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং আণবিক শক্তির ব্যবহারও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক এবং শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস অনুশীলন করিলে সাধারণতঃ এই সিদ্ধান্তেই পেঁছাইতে হয় যে, শক্তিসম্পদের অস্তিত্ব এবং ব্যবহারের উপর অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। ব্রিটেনের কয়লাসম্পদের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি সূচিত হইয়াছিল। উপনিবেশসমূহের খনিজ তৈল এবং অন্যান্য সম্পদের উপর আধিপত্যের ফলেই এককালে ব্রিটেন প্রধানতম অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

বিভিন্ন শক্তিসম্পদের তুলনা (Comparison of Different Sources of Power—কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুতের পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:

কয়লা	খনিজ তৈল	জলবিদ্যুৎ
(১) সভ্যতার অগ্রগতির প্রথম পর্যায়ে মানুষ একমাত্র কয়লাকে শিল্পের শক্তিসম্পদ হিসাবে **ব্যবহার** করিতে শুরু করে।	(১) বিংশ শতাব্দীতে খনিজ তৈল ও গ্যাস **ব্যবহারের** ঝোঁক শিল্পোন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়।	(১) বিংশ শতাব্দীতে যে সকল দেশে কয়লা ও অন্যান্য শক্তিসম্পদের অভাব, সেখানে জলবিদ্যুতের **ব্যবহার** শুরু হয়।
(২) শক্তিসম্পদ হিসাবে ইহার **ব্যবহার** সর্বাধিক—শতকরা ৬০ ভাগ।	(২) শক্তিসম্পদ হিসাবে ইহার **ব্যবহার** কয়লা অপেক্ষা কম—শতকরা ৩০ ভাগ।	(২) শক্তিসম্পদ হিসাবে ইহার ব্যবহার সবচেয়ে কম—মাত্র শতকরা ১০ ভাগ।
(৩) কয়লার **মূল্য** খনিজ তৈল অপেক্ষা কম।	(৩) কয়লা অপেক্ষা ইহার **মূল্য** বেশী।	(৩) ইহার **উৎপাদন** ব্যয় সবচেয়ে কম বলিয়া **মূল্যও**

কয়লা	খনিজ তৈল	জলবিদ্যুৎ
	এইজন্য ব্যবহারের ব্যাপকতা কম।	কম। এইজন্য ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে।
(৪) শক্তিসম্পদ হিসাবে কয়লা ব্যবহারের ফলে কয়লাখনি অঞ্চলেই **শিল্প-কল-কারখানা** কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কেননা কয়লা কাঁচামালের নিকট বহন করা অপেক্ষা কয়লাখনি অঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বহন করা সহজসাধ্য। আসল কথা হইল, কয়লা ঘনলোক-বসতিপূর্ণ শিল্প-শহরগুলির জন্মদাতা।	(৪) বিংশ শতাব্দীতে কেন্দ্রীভূত শিল্পসমন্বয়ের নানা সমস্যা হইতে বাঁচিবার জন্য মানুষ বিকেন্দ্রীকরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। খনিজ তৈল ও গ্যাস ব্যবহারে **বিকেন্দ্রীকরণ** সম্ভব হইয়াছে। তরল খনিজ তৈল এবং গ্যাস খনি অঞ্চল হইতে বহু দূরে পাইপ যোগে সহজে এবং অল্প খরচে বহন করা সম্ভব। এইজন্য সাধারণতঃ তৈল ও গ্যাসের খনি-অঞ্চল শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয় না।	(৪) বিংশ শতাব্দীতে **বিকেন্দ্রীকরণের** নবতম মাধ্যম হইল জলবিদ্যুৎ-শক্তি। তার যোগে বহু দূরে (৪৮০ কিঃ মিঃ) এই শক্তি সরবরাহ করা যায়। ফলে স্বাস্থ্যকর ধূম-ধূলাবিহীন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তোলা সম্ভব হইতেছে। বাঁধ নির্মাণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদক ডায়নামো স্থাপন এবং সরবরাহের তারের ব্যবস্থার প্রাথমিক খরচ বেশী হয়, কিন্তু উৎপাদন চালু হইলে পরে খরচ খুব কম পড়ে।
(৫) ইহা ভারী বলিয়া ইহার **পরিবহণ-ব্যয়** বেশী।	(৫) ইহা বেশী ভারী নহে বলিয়া ইহার **পরিবহণ ব্যয়** অপেক্ষাকৃত কম।	(৫) ইহার **পরিবহণ ব্যয়** সবচেয়ে কম। যদিও প্রাথমিক মূলধনী ব্যয় বেশী।
(৬) ইহার **তাপ উৎপাদনের** ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম।	(৬) কয়লা অপেক্ষা ইহার **তাপ উৎপাদনের** ক্ষমতা বেশী।	(৬) ইহার **তাপ উৎপাদনের** ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী।
(৭) ইহা **সঞ্চিত সম্পদ**। শতাধিক বৎসর ব্যবহারের শেষে বহু দেশে ইহার সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়া যাইবে।	(৭) ইহা **সঞ্চিত সম্পদ**। ব্যবহার করিতে করিতে ইহা একদিন ফুরাইয়া যাইবে।	(৭) ইহা **প্রবহমান সম্পদ**। জলস্রোত এই পৃথিবীতে যতদিন থাকিবে ততদিন বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে।
(৮) কয়লাখনি খনন কার্যে এবং উত্তোলন ব্যবস্থায় খরচ কম হইলেও এই খরচ পৌনঃপুনিক। পৌনঃপুনিকতার জন্য খরচ গড়ে খুব কম হয় না।	(৮) খনি হইতে তৈল বা গ্যাস উত্তোলন এবং শোধনকার্য প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ হইলেও পাইপ-যোগে সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হইলে তখন আর খরচ বেশী লাগে না।	(৮) জলবিদ্যুৎ সরবরাহ খরচ খুব কম; অবশ্য যদি ৪৮০ কিঃ মিঃ ব্যাসের মধ্যে যথাযথ চাহিদা থাকে।

কয়লা	খনিজ তৈল	জলবিদ্যুৎ
(৯) কয়লা খনিতে সহজে আগুন লাগে না। তবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা যদি ভূগর্ভে না থাকে তাহা হইলে অনেক খনিতে কয়লার গ্যাসের প্রভাবে আগুন ধরে বা ধস নামিয়া শ্রমিকদের জীবনান্ত হয়।	(৯) খনি অঞ্চলকে সব সময়ে আগুনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা থাকে। সমস্ত অঞ্চলটি ঘেরা থাকে এবং আগুন ধরিতে পারে এমন কোনো মাধ্যমের ব্যবহার (সিগারেট ইত্যাদি) খনি অঞ্চলে নিষিদ্ধ।	(৯) আগুন লাগিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই।
(১০) ইহা দ্বারা ধোঁয়া ও ময়লার সৃষ্টি হয়।	(১০) ইহা দ্বারা কয়লা অপেক্ষা কম ধোঁয়া ও ময়লার সৃষ্টি হয়।	(১০) ইহা দ্বারা কোনো ধোঁয়া ও ময়লার সৃষ্টি হয় না।
(১১) কয়লা ব্যবহারের জন্য উচ্চ **জীবনযাত্রার** মানসম্পন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন হয় না।	(১১) জনবহুল উচ্চ **জীবনযাত্রায়** অভ্যস্ত অঞ্চলে খনিজ তৈল ও গ্যাসের চাহিদা অনুকূলে থাকে।	(১১) জনবহুল উচ্চ **জীবনযাত্রার** মানসম্পন্ন অঞ্চলে জলবিদ্যুতের চাহিদা সকল সময়ে অনুকূলে থাকে।
(১২) কয়লা হইতে নানা উপজাত দ্রব্য তৈয়ারি করা হয়; যেমন, কয়লাজাত গ্যাস, অ্যামোনিয়া, আলকাতরা, পিচ, ন্যাপথালিন, ক্রিয়োসোট, গন্ধদ্রব্য, রং, কলপ, বিস্ফোরক, স্যাকারিন, কোক ও প্লাস্টিক।	(১২) খনিজ তৈল হইতে নানা উপজাত দ্রব্য তৈয়ারি করা হয়। তৈল শোধনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা পাই কেরোসিন, ডিজেল তৈল, ভারী এভিয়েশন তৈল, কিটোন, এসিটোন, লুব্রিকেটিং অয়েল, সলভেন্ট অয়েল, গ্রীজ, হাল্কা তৈল ও গ্যাসোলিন।	(১২) কোনো উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় না। তবে অলৌহবর্গীয় ধাতু শোধনকার্যে জলবিদ্যুৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাম্র, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর শোধনকার্যে সুলভ জলবিদ্যুৎ মূল শক্তি।
(১৩) কয়লার মোট উৎপাদনের ৪০% রেল-ইঞ্জিন ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়। রেলগাড়ি ও জলযানে নিত্য প্রচুর কয়লা ব্যবহার করা হয়। ইস্পাত শিল্প এখনও কয়লা শক্তির উপরই	(১৩) খনিজ তৈলের ইন্ধনশক্তি উচ্চ। এক একক পরিমাণ খনিজ তৈলে যে পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায় অন্য কোনো সমপরিমাণ ইন্ধন হইতে ততটা তাপ পাওয়া যায় না। বিমান, মোটরগাড়ি	(১৩) ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনুকূল থাকিলে সম্ভাব্য জলবিদ্যুতের অনেকখানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। অনেক সময় অন্য ইন্ধন শক্তির সরবরাহ অধিক এবং

কয়লা	খনিজ তৈল	জলবিদ্যুৎ
অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল; কয়লাজাত তাপ-বিদ্যুৎ বিভিন্ন দেশে এখনও প্রচুর ব্যবহৃত হয়।	ও ট্রাক পরিবহণ এখনও সম্পূর্ণ খনিজ তৈলের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক ও কামান পেট্রোল দ্বারা চালিত হয়। এইজন্য খনিজ তৈলের ব্যবহার প্রচুর।	সুলভ হইলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তরায় হয়। নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডে খনিজ শক্তি-সম্পদের অভাব থাকায় সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ও ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। দঃ আমেরিকা ও আফ্রিকার সম্ভাব্য শক্তি প্রচুর, কিন্তু উৎপাদন হয় সামান্য।
(১৪) কয়লা লইয়া আন্তর্জাতিক কলহ বা যুদ্ধ কখনও ঘটে নাই।	(১৪) খনিজ তৈল লইয়া নানা আন্তর্জাতিক কলহ এবং যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য।	(১৪) জলবিদ্যুতের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক কলহ হয় নাই।

কয়লা (Coal)

কোটি কোটি বৎসর পূর্বে ভূকম্পন বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অরণ্যরাশি ভূগর্ভে ঢাকা পড়িয়া চাপে এবং তাপে বিবর্তনের ফলে কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগে এইভাবে ভূগর্ভে ঢাকা-পড়া অরণ্যসমূহ কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

কয়লার শ্রেণীবিভাগ—ভূগর্ভস্থ নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার কয়লার সৃষ্টি হয়। কয়লার গুণাগুণ ও ব্যবহার অনুসারে ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, অ্যানথ্রাসাইট (Anthracite), বিটুমিনাস (Bituminous), ও লিগনাইট (Lignite)।

অ্যানথ্রাসাইট সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কয়লা। ইহাতে জলীয় পদার্থ কম থাকে বলিয়া এই কয়লা হইতে বেশী ধোঁয়া বাহির হয় না। ইহা জ্বালাইতে কিছু অসুবিধা হয় বলিয়া এইজাতীয় কয়লা সাধারণতঃ বড় চুল্লীতে ব্যবহৃত হয়। একবার জ্বলিলে ইহা হইতে প্রচণ্ড তাপ নির্গত হয়। পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ মাত্র এই শ্রেণীর কয়লা।

বিটুমিনাস কয়লায় জলীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়া ইহা হইতে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হয়। এই কয়লা জ্বালাইতে বিশেষ অসুবিধা হয়। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৮০ ভাগ এই শ্রেণীর। এই কয়লা পোড়াইয়া কোক-কয়লা (Coke) প্রস্তুত হয়। শক্ত কোক-কয়লা (Hard Coke) ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থঘরের রন্ধনকার্যে নরম কোক-কয়লা (Soft Coke) ব্যবহৃত হয়।

লিগনাইট কয়লায় জলীয় পদার্থ ও অন্যান্য গ্যাস অত্যন্ত বেশী মাত্রায় থাকে বলিয়া ইহার তাপ-উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। সেইজন্য ইহা নিকৃষ্টতম কয়লা। এই কয়লার রং বাদামী বলিয়া ইহা **বাদামী কয়লা** (Brown Coal) নামে পরিচিত। পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ এই শ্রেণীর কয়লা। বর্তমানে জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই কয়লা হইতে **কৃত্রিম পেট্রোল** (Synthetic Liquid Fuel) প্রস্তুত করা হইতেছে। গ্যাস-উৎপাদন, গৃহে উত্তাপ সৃষ্টি এবং ইট পোড়াইবার জন্য এই কয়লা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

এই তিন প্রকার কয়লা ছাড়া **পিট** (Peat) নামক একপ্রকার নিকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি কয়লাহীন দেশে ইহা রন্ধনশালায় ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার (Uses)—কয়লা প্রধানতঃ জ্বালানি হিসাবে শিল্পে ও গৃহকার্যে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিটুমিনাস্ জাতীয় কয়লাকে কোক-চুল্লীতে (Coke Oven) রাখিয়া কোক প্রস্তুত করিবার সময় গ্যাস, আলকাতরা, পিচ, স্যাকারিন, অ্যামোনিয়াক্যাল লিকর, ন্যাপথ্যালিন, ক্রিয়োজোট, গন্ধক প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। কয়লার গ্যাস শহর আলোকিত করে। ইহা জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। **আলকাতরা** গৃহনির্মাণে এবং পিচ রাস্তানির্মাণে প্রয়োজন হয়। **স্যাকারিন** অত্যন্ত মিষ্ট এবং ইহা চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। **অ্যামোনিয়া-ক্যাল** লিকর হইতে শত শত রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয়। **ন্যাপথালিন** কীট-নিবারণে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়োজোট ঔষধ প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। কয়লা হইতে রং ও বিস্ফোরক সামগ্রীও পাওয়া যায়। কয়লা হইতে এই সকল উপজাত দ্রব্য বাহির না করিয়া রেলগাড়ি, জাহাজ ইত্যাদিতে সোজাসুজি এই কয়লা ব্যবহার করিলে এই সকল উপজাত দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। ইহা জাতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries)—পৃথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৭,৩৯,৭৫৫ কোটি মেট্রিক টন। ইহা দ্বারা আরও প্রায় ২,০০০ বৎসর কয়লার কাজ চলিবে। কিন্তু ভালো কয়লার পরিমাণ খুব বেশী নহে। সুতরাং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার উত্তোলনে সংযম রক্ষা না করিলে সরবরাহ শীঘ্রই কমিয়া যাইবে।

পৃথিবীর কয়লা উৎপাদন—১৯৮৪

দেশ	কোটি	লক্ষ	একক	দেশ	কোটি	লক্ষ	একক
সোঃ রাশিয়া	৭১ কোটি	৭০ লক্ষ	মেঃ টন	দঃ আফ্রিকা	১২ কোটি	৭৩ লক্ষ	মেঃ টন
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৬৮ ,,	৩৭ ,,	,, ,,	ব্রিটেন	১১ ,,	৯২ ,	,, ,,
চীন	৬৭ ,,	৫৩ ,,	,, ,,	অস্ট্রেলিয়া	৯ ,,	৬৮ ,,	,, ,,
পোল্যান্ড	১৯ ,,	৩০ ,,	,, ,,	পঃ জার্মানী	৮ ,,	৪৯ ,,	,, ,,
ভারত	১৩ ,,	৬২ ,,	,, ,,	চেকোশ্লোভাকিয়া	২ ,,	৬৯ ,,	,, ,,

Source: U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1985

সোভিয়েত রাশিয়া—কয়লা উত্তোলনে সোভিয়েত রাশিয়া (U.S.S R) বর্তমানে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। এখানে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৯৯,৮০০ কোটি মেঃ টন; কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে এখানে সামান্য পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইত।

বর্তমানে ইহার উৎপাদন প্রায় দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ার কয়লা উৎপাদন বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ; ইহার মধ্যে লিগনাইট কয়লার পরিমাণ মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। এখানকার ডোনেৎস্ক্ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী (৪০%) কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লা দক্ষিণ সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কুজনেৎস্ক্ অঞ্চলে এই দেশের বৃহত্তম কয়লাখনি অবস্থিত। এখানে সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা বিদ্যমান; কিন্তু শিল্পাঞ্চল দূরে থাকায় কিছুদিন পূর্বেও এখানে বেশী কয়লা উত্তোলিত হইত না। অন্যান্য কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে ইনেসি উপত্যকা, কারাগান্ডা, মস্কো, ইউরাল্স্, ট্রান্স-ককেশাস ব্লাডিভস্টক, ইর্কুটস্ক এবং পেচোরা, লীনা ও আমুর নদীর উপত্যকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৬ কোটি মেঃ টন লিগনাইট উৎপন্ন হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দেশের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৩,৮৩,৮৬৬ কোটি মেট্রিক টন বর্তমানে কয়লা উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S A.) পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ কয়লা এখানে উত্তোলিত হয়। দেশের নিম্নলিখিত তিনটি অঞ্চলে প্রধানতঃ কয়লা পাওয়া যায়ঃ

অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার পশ্চিমাংশ—উত্তরে পেনসিলভেনিয়া হইতে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত সকল রাজ্যে প্রচুর অ্যানথ্রাসাইট ও উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস্
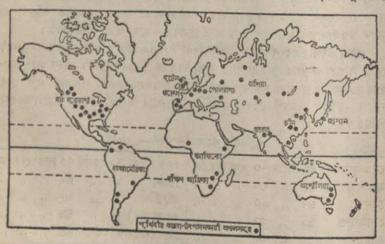
কয়লা পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট সরবরাহের শতকরা ৭০ ভাগ কয়লা এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। **মধ্যভাগের সমতলভূমিতে** কেন্টাকি, ইলিনয়, ইন্ডিয়ানা, কানসাস্, মিসৌরী, নেব্রাস্কা, আইওয়া, ডাকোটা প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর কয়লা উত্তোলিত হয়। **রকি পর্বতমালার** উত্তরে কানাডা সীমান্ত হইতে দক্ষিণে মেক্সিকো সীমান্ত পর্যন্ত

কয়লাখনি বিস্তৃত। এই অঞ্চলে কলোরাডো রাজ্যে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে বেশী লোক না থাকায় এখানকার খনিসমূহ হইতে খুব বেশী কয়লা তোলা যায় না। ইহা ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকুলে অবস্থিত রাজ্যসমূহে, আলাস্কায় ও উপসাগরীয় উপকুল অঞ্চলেও কয়লাখনি আছে। শেষোক্ত অঞ্চলে লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৪ সালে ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ মেঃ টন লিগনাইট উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন—পৃথিবীর কয়লা উৎপাদনে চীন (China) বর্তমানে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে। চীনে সঞ্চিত কয়লার সম্ভাব্য পরিমাণ ৯৯,৫৫৯ কোটি মেট্রিক টন। চীনের অধিকাংশ কয়লা উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস্ শ্রেণীর। বিপ্লবের পূর্বে এই দেশে বৎসরে মাত্র ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা উত্তোলন করা হইত। কিন্তু বর্তমান চীন সরকার উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া বৎসরে প্রায় ৬৭'৫ কোটি মেঃ টন কয়লা উত্তোলন করে। উত্তর-পূর্ব চীনের শান্সি, শেন্সি ও হ্যাঙাউ অঞ্চলেই অধিকাংশ (৮৯%) কয়লা পাওয়া যায়।

পোল্যান্ড—উত্তর সাইলেশিয়া অঞ্চলেই এই দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা পাওয়া যায়। এক সময়ে এই অঞ্চল জার্মানীর করতলগত ছিল। কয়লা উৎপাদনে বর্তমানে এই দেশ **চতুর্থ স্থান** অধিকার করে।

ব্রিটেন—কয়লা উৎপাদনে ব্রিটেন (United Kingdom) বর্তমানে **সপ্তম স্থান** অধিকার করে। চীন ও পোল্যান্ডের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় ব্রিটেনের স্থান নীচে নামিয়া গিয়াছে। কয়লা ও লৌহখনি কাছাকাছি থাকায় এবং খনিসমূহ সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে কয়লা-উত্তোলন সহজসাধ্য হইয়াছে। এখানে ১৯৪৭ সালে কয়লাশিল্প জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের পর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্রিটেনের কয়লা-উত্তোলন পদ্ধতির অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখানে প্রধানতঃ তিনটি কয়লাখনি অঞ্চল আছে। **পেনাইন পর্বত অঞ্চল**—এই পর্বতের পূর্বদিকে নর্দাম্বারল্যান্ড, ডারহাম, ইয়র্কশায়ার, ডার্বিশায়ার এবং নটিংহামশায়ার খনি অঞ্চল এবং পশ্চিমদিকে ল্যাঙ্কাশায়ার ও স্টাফোর্ডশায়ার খনি অঞ্চলে ব্রিটেনের মোট উৎপাদনের শতকরা ৫৭ ভাগ কয়লা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের বস্ত্র ও পশম শিল্প এবং ইস্পাত ও জাহাজ-নির্মাণশিল্প স্থানীয় কয়লার উপর নির্ভরশীল। **স্কটল্যান্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল**—আয়ারশায়ার, ফাইফশায়ার ও লানার্কশায়ার এখানকার প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল। এখানকার ইস্পাত ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প এই অঞ্চলের কয়লার সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। **ওয়েল্স্ অঞ্চল**—উত্তর ও দক্ষিণ ওয়েল্স্ অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এখানকার কয়লা অধিকাংশ জাহাজে সরবরাহ করা হয় এবং রপ্তানি করা হয়।

ভারত—বর্তমানে কয়লা উৎপাদনে ভারত **পঞ্চম স্থান** লাভ করিয়াছে। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'ভারত' অংশে 'খনিজ সম্পদ' দ্রষ্টব্য)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—কয়লা উৎপাদনে দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্রগতি লক্ষ্য করিবার মত। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের নাটাল, ট্রান্সভাল ও অন্তরীপ প্রদেশে কয়লা পাওয়া যায়। এই দেশ বর্তমানে কয়লা উৎপাদনে **ষষ্ঠ স্থান** অধিকার করিয়াছে।

পশ্চিম জার্মানী—পশ্চিম জার্মানীর রুঢ়, সার ও অ্যালস্যাসি অঞ্চল এবং পূর্ব জার্মানীর স্যাক্সনী অঞ্চলে প্রচুর কয়লা উত্তোলিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর কয়লা উত্তোলনে বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু এখনও কয়লা উৎপাদনে পশ্চিম জার্মানী পৃথিবীতে **নবম স্থান** অধিকার করে।

অস্ট্রেলিয়া—এই মহাদেশের কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলসে যথেষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। কয়লা উৎপাদনে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার স্থান **অষ্টম**।

জাপান—কিউসিউ ও হোক্কাইডো দ্বীপে অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। এখানকার কয়লা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর। অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় এখানকার উৎপাদন খুবই কম। জাপানে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৭৯৭ কোটি মেঃ টন।

ফ্রান্স—চাহিদার তুলনায় ফ্রান্সের কয়লা উৎপাদন অনেক কম। এখানকার কয়লা-খনিসমূহ বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে। উত্তর ফ্রান্সের ডোভার প্রণালী হইতে জার্মানীর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত খনিসমূহে সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা পাওয়া যায়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অঞ্চলে, **বেলজিয়ামের** সেম্বার মিউজ অঞ্চলে এবং **কানাডার** নোভাস্কোসিয়া ও রকি পর্বতমালায় প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)—বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন কয়লার অধিকাংশই দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যয় হয়। যাহারা অধিকমাত্রায় কয়লা উৎপাদন করে, তাহারা কিছু পরিমাণ কয়লা রপ্তানি করিতে পারে। ব্রিটেন কয়লার রপ্তানি বাণিজ্যে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, দঃ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়াও কয়লা রপ্তানি করিয়া থাকে। ফ্রান্স, ইটালি, সুইডেন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কানাডা ও জাপান কয়লার প্রধান **আমদানিকারক** দেশ।

খনিজ তৈল (Petroleum)

ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের মধ্যে খনিজ তৈল সঞ্চিত থাকে। ইহা এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর (Forra-meniferra) নির্যাস বলিয়া অনেকে মনে করেন। শিলার ভিতরে এই প্রাণীর দেহ পচিয়া তৈল বাহির হয়। শিলামধ্যস্থ জলের সহিত এই তৈল মিশিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। ভঙ্গিল শিলাস্তরের উপরের ভাঁজে আসিয়া এই তৈল সঞ্চিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে এই তৈলের সন্ধান পান এবং পরে নল বসাইয়া তৈল উত্তোলন করা হয়। শিলাস্তর হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া এই তৈলকে শিলা তৈলও (Rock Oil বা Mineral Oil) বলা হয়।

ব্যবহার Uses—খনি হইতে এই তৈল অপরিস্রুত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে তরল পাঁকের মত। ইহার রং কালো অথবা পিঙ্গলবর্ণের হইয়া থাকে। এই তৈল শোধন করিয়া বিভিন্ন প্রকার জিনিস পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে **গ্যাসোলিন** বা **পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস, ন্যাপথা, এ্যাসফাল্ট** বা **পিচ, প্যারাফিন** বা **মোম** প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পেট্রোল বর্তমান যুগে একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহা সহজদাহ্য এবং কয়লা অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন। মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমানপোত ও

বিভিন্ন শিল্পে ইহা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রন্ধনকার্যে ও বিভিন্ন শিল্পে গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এই গ্যাস হইতে কৃষ্ণ অঙ্গার (Carbon Black) বাহির করিয়া রং, কালি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কেরোসিন প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলে গৃহ আলোকিত করিতে এবং যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করিতে ব্যবহৃত হয়। রাস্তা প্রস্তুত করিতে পিচ প্রয়োজন। এইভাবে খনিজ তৈল হইতে উদ্ভূত বিবিধ সামগ্রী মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

খনিজ তৈল প্রধানতঃ শক্তিসম্পদ ও পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও খনিজ তৈলের নানাবিধ **উপজাত দ্রব্য** বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খনিজ তৈল পরিশোধনের সময় যে গ্যাস বাহির হয়, তাহা হইতে প্রস্তুত নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম সার, প্লাস্টিক, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রভৃতির প্রস্তুত-কার্যে ব্যবহৃত হয়। প্রসাধন দ্রব্য, রং, বার্নিশ, কীটনাশক ঔষধপত্র, কালি, ফিল্ম, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন কার্যেও খনিজ তৈলের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

খনিজ তৈলের ব্যবহার প্রণালী হইতে দেখা যায় যে, ইহা মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। সেইজন্য মানুষ তৈলের সন্ধান পাইলেই সেখানে ছুটিয়া যায়।
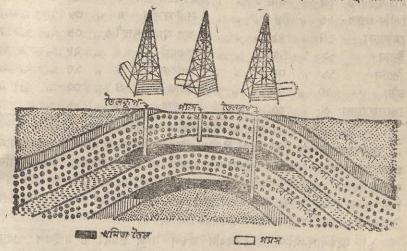
ভূগর্ভে খনিজ তৈল ও গ্যাসের অবস্থিতি ও উহাদের উত্তোলন

মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনির উপর ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সুবিদিত। মধ্য-প্রাচ্যের তৈলখনিসমূহের সহিত এখানকার অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্পর্ক বিদ্যমান। ইরানের স্বার্থে ইহার তৈল শিল্পকে জাতীয়করণ করিবার জন্য সেখানকার তদানীন্তন মোসাদেক সরকারের পতন ঘটিয়াছিল। ব্রিটেনে কোনো তৈলখনি না থাকিলেও তাহারা পৃথিবীর তৈলের আন্তর্জাতিক বাজার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries)—পৃথিবীর সঞ্চিত খনিজ তৈলের পরিমাণ প্রায় ৮,৬০০ কোটি ব্যারেল। (সাধারণতঃ ১

ব্যারেল = ⅐ মেট্রিক টন)। ইহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় শতকরা ৪ ভাগ এবং মধ্যপ্রাচ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ তৈল সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। বিভিন্ন দেশে সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ এইরূপ ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২,৯০০ কোটি ব্যারেল, কুওয়েটে ২,১০৯ কোটি ব্যারেল, সৌদি আরবে ১,০০০ কোটি ব্যারেল, ইরানে ৯৫০ কোটি ব্যারেল, ভেনেজুয়েলায় ৯০০ কোটি ব্যারেল, ইরাকে ৭০০ কোটি ব্যারেল এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫৫০ কোটি ব্যারেল।

তৈল উৎপাদক অঞ্চলগুলিকে চারিটি বৃহৎ বলয়ে ভাগ করা যায়—(১) উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা (৯০% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে), (২) সোভিয়েত রাশিয়া, রোমানিয়া, ফ্রান্স, (৩) মধ্যপ্রাচ্য (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ অধিকারে), (৪) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য—ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ফরমোসা, সাখালিন দ্বীপ, জাপান ও সোভিয়েত রাশিয়ার ব্লাডিভস্টক অঞ্চল। ব্রহ্মদেশের ও ভারতের পুরাতন তৈলখনি এখনও ব্রিটেনের করতলগত।

পৃথিবীর মোট খনিজ তৈল উৎপাদন—১৯৮৪

সোঃ রাশিয়া	৬১ কোটি	৮০ লক্ষ	মেঃ টন			কানাডা	৬ কোটি	৬৪ লক্ষ	মেঃ টন			
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৪২ "	৬০ "	" "			ইন্দোনেশিয়া	৬ ,,	৫৯ ,,	,, ,,			
সৌদি আরব	২৫ "	০৮ "	" "			নাইজেরিয়া	৬ ,,	৩৮ ,,	,, ,,			
মেক্সিকো	১৪ "	২৯ "	" "			আঃ আমীরশাহী	৫ ,,	৩৬ ,,	,, ,,			
ইরান	১২ "	৪৫ "	" "			কুওয়েট	৫ ,,	২৮ ,,	,, ,,			
ব্রিটেন	১১ "	০৮ "	" "			লিবিয়া	৪ ,,	৯৩ ,,	,, ,,			
চীন	১০ "	৫০ "	" "			ইরাক	৪ ,,	৩০ ,,	,, ,,			
ভেনেজুয়েলা	৯ "	৩৫ "	" "			কাতার	২ "	১৬ ,,	,, ,,			

Source : U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1985.

সোভিয়েত রাশিয়া (U. S. S. R.)—এই দেশ বর্তমানে খনিজ তৈল উৎপাদনে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই দেশকে তৈল আমদানি করিতে হইত। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলেই বর্তমান অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। বিপ্লবের পূর্বে এই দেশের তৈলখনিগুলি বিদেশী শক্তির অধীনে ছিল। এই দেশের উল্লেখযোগ্য তৈলখনিগুলি নিম্নলিখিত অঞ্চলে অবস্থিত ঃ

(১) **ককেশাস-কাস্পিয়ান তৈলখনি অঞ্চল**—বাকু, গ্রজনী ও মাইকপ প্রধান তৈলকেন্দ্র। কৃষ্ণসাগরতীরস্থ বাটুম এবং কাস্পিয়ান সাগরতীরস্থ বাকু বন্দরে বৃহত্তম তৈল-শোধনাগার রহিয়াছে। উভয় বন্দর তৈলের নল দ্বারা এবং **রেলপথ** দ্বারা যুক্ত। সোভিয়েত রাশিয়ার মোট উত্তোলনের ৫০% এই অঞ্চল সরবরাহ করে। (২) **ভল্গা-ইউরাল তৈলখনি অঞ্চল**—এই তৈলখনি উখ্টা হইতে স্টারলিটামাক্ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরালস অঞ্চলের "উফা" তৈলক্ষেত্র এত বেশী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, ইহাকে 'দ্বিতীয় বাকু' বলা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার মোট উৎপাদনের ৪৪% এই অঞ্চল সরবরাহ করে। (৩) মধ্য এশিয়া অঞ্চলে কাজাক, তুর্কমেন কিরঘিজ ও বুখারায় তৈলক্ষেত্র রহিয়াছে। এখানকার উৎপাদন বেশী নহে। এই দেশের উৎপাদনের মোট ৫% এই অঞ্চল সরবরাহ

করে। (৪) **সদূর প্রাচ্য অঞ্চল**—সাখালিন, কামচাটকা ও আমুর উপত্যকায় তৈলক্ষেত্র রহিয়াছে। এখানকার উৎপাদন এ দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র ১%।

পৃথিবীর খনিজ তৈল-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ ●
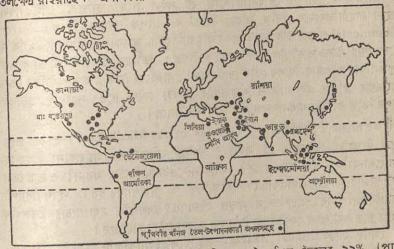
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)—পৃথিবীর মোট সঞ্চিত তৈলের **২২%** (প্রায় **২,৯০০** কোটি ব্যারেল) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূগর্ভে রহিয়াছে। তৈল উৎপাদনে পূর্বে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও বর্তমানে এই দেশ **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। এই দেশের বহু অঞ্চলে তৈলখনি আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) **আপালাচিয়ান পর্বত অঞ্চল**—নিউ ইয়র্ক হইতে দক্ষিণে টেনেসী পর্যন্ত তৈলক্ষেত্র প্রসারিত। এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯৫% তৈল এই অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হইত। (২) **ইলিনয়-ওহিও-লিমা-ইন্ডিয়ানা অঞ্চল**—এই অঞ্চলে প্রচুর তৈল খনি রহিয়াছে। লিমা বিখ্যাত তৈলকেন্দ্র। এখানে বিরাট তৈল শোধনাগার রহিয়াছে; পাইপ লাইন দ্বারা ইহার সহিত বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের যোগসাধন করা হইয়াছে। কানাডার চাহিদা মিটাইবার জন্য এই তৈল কানাডায় এবং অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়। (৩) **টেক্সাস্-কানসাস্-ওকলাহামা-লুইসিয়ানা-আরকানসাস অঞ্চল** বা **মধ্য মহাদেশীয় অঞ্চল**—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তৈলখনি এই অঞ্চলে অবস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উত্তোলনের ৫০% এই অঞ্চল সরবরাহ করে। পূর্বে টেক্সাসে কমপক্ষে **২৫,০০০** তৈলকূপ রহিয়াছে এবং কয়েকটি আধুনিক বৃহৎ শোধনাগার রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্যালটেক্স, স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকাম প্রভৃতি সংস্থা এখানে তৈল উত্তোলন, পরিশোধন এবং সরবরাহের কার্যে লিপ্ত আছে। (৪) **উপসাগর অঞ্চল**—টেক্সাস ও লুইসিয়ানার তৈলক্ষেত্র উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রসারিত রহিয়াছে। নিউ অরলিয়ন্স ও গ্যালভেস্টনে তৈল শোধনাগার রহিয়াছে। এখান হইতে তৈল রপ্তানি হয়। (৫) **রকি পর্বত ও ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চল**—রকি পর্বতের পাদদেশে প্রচুর তৈল সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমিত হইলেও পুরামাত্রায় উত্তোলনকার্য এখনও বাকী। ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলস্ হইতে সান জোয়াকিন উপত্যকা পর্যন্ত তৈলক্ষেত্রগুলি

বিস্তৃত। যে মার্কিন নৌবহর এশিয়া মহাদেশের প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত মহাসাগরে টহল দিতেছে তাহার প্রধান তৈলরসদ ক্যালিফোর্নিয়া সরবরাহ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শোধনাগারগুলি যে সকল রাজ্যে স্থাপিত, সেই সকল রাজ্যে পেট্রোলিয়ামকে ভিত্তি করিয়া বিরাট ও ব্যাপক রসায়ন শিল্প (Petro-Chemicals) গড়িয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, অধিকাংশ শোধনাগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। তবে বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম উপকূলেও শোধনাগার স্থাপনের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। বাজারের নৈকট্য, অপরিশোধিত তৈল আনিবার সুবিধা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে দ্রুত সরবরাহ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া শোধনাগারগুলির বিন্যাস হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনিসমূহ (Oilfields of the Middle East) হইতে প্রচুর তৈল উত্তোলিত হইলেও এই সকল তৈলখনির অধিকাংশের মালিকানা রহিয়াছে অ্যাংলো-মার্কিন গোষ্ঠীর হাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফরাসী ও ডাচ তৈল কোম্পানীর অধীনে এখানকার তৈল উত্তোলিত ও পরিশোধিত হয়। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হইয়া এই দেশগুলি মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি হইতে দ্রুত সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল উত্তোলন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

সৌদি আরব (Saudi Arabia)— এই দেশের হাসা প্রদেশে তৈলখনি রহিয়াছে। তৈল উৎপাদনে এই দেশ ১৯৭৮ সালে **তৃতীয়** স্থানের অধিকারী হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ৬০ বৎসরের লীজে এই দেশের তৈলখনি তত্ত্বাবধান করে। দাহরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। অধিকাংশ তৈল বাহরীন দ্বীপে বৃহৎ শোধনাগারে শোধিত হয় এবং বিশালকায় তৈলবাহী জাহাজ মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়।

ইরাক (Iraq)—ইরাকের কারকুক, খানাকিন ও মোসাল অঞ্চলে অধিকাংশ তৈলখনি রহিয়াছে। কারকুক পৃথিবী-বিখ্যাত তৈলখনি অঞ্চল। ইহার আয়তন ১১২ বর্গ কিলোমিটার। পাইপ লাইন কারকুক হইতে হাডিথা (ইউফ্রেটিস নদীর উপর) এবং সিরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিপলি ও হাইফা বন্দরে গিয়াছে। তৈলখনিগুলি ব্রিটিশ পরিচালনায় ও মালিকানায় গঠিত 'ইরাক অয়েল কোম্পানী' তত্ত্বাবধান করে। ১৯৭২ সালের জুন মাসে এই কোম্পানীটি ইরাক সরকার জাতীয়করণ করিয়াছেন।

ইরান (Iran)—এই দেশের সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ ৯৫০ কোটি ব্যারেল এবং মসজিদই সুলেমান, আঘাজারি, লালি, গার্চসরন, নাফত-সামিদ ও হাল্‌তকেল এই দেশের উল্লেখযোগ্য খনি অঞ্চল। তৈল উৎপাদনে এই দেশ **পঞ্চম স্থান** অধিকার করে। এই দেশের আবাদানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তৈল শোধনাগার অবস্থিত ও এইটি পৃথিবীর তৈল রপ্তানির বৃহত্তম বন্দর। খনিগুলির সহিত পাইপ লাইন দ্বারা আবাদান যুক্ত। ১৯৫১ সালে ডঃ মোসাদেকের আমলে তৈল উত্তোলন শিল্পের জাতীয়করণ হইলেও পরবর্তিকালে পুনরায় ব্রিটিশ স্বার্থ পুরামাত্রায় রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৯ সালে পুনরায় তৈল শিল্পের জাতীয়করণ হইয়াছে।

কুওয়েট (Kuwait) ও **লিবিয়ার (Libya)** তৈলক্ষেত্রগুলি অ্যাংলো-মার্কিন তৈল কোম্পানীর মালিকানায় পরিচালিত হয়। খনিগুলি খুব গভীর নহে। উত্তোলন

খরচ কম। **কাতার (Qutar)** ও **বাহ্‌রীন-এ (Bahrain)** অ্যাংলো-মার্কিন তৈল কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে প্রচুর তৈল উত্তোলিত হয়। ইহা ছাড়া মিশর ও আলজেরিয়ায় তৈল পাওয়া যায়। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (মিশর) রাস ঘারিব ও অন্যান্য অঞ্চলেও তৈল পাওয়া যায়।

ভেনেজুয়েলা (Venezuela) এই দেশ এককালে খনিজ তৈল উত্তোলনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিল; বর্তমানে ইহা **অষ্টম স্থান** অধিকার করে। মারাকাইবো পর্যঙ্ক ও অরিনকো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে তৈলখনিগুলি বিদ্যমান। এই সকল তৈলক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ এবং মালিকানা রহিয়াছে। তৈলবাহী জাহাজে করিয়া অপরিশোধিত তৈল আরুবা ও কারাকাও বন্দরে আনা হয়; সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে স্থাপিত তৈল শোধনাগার রহিয়াছে।

কানাডার (Canada) আলবার্টা প্রদেশের এডমন্টনের নিকট শাসকাচুয়ানে ও টার্নার উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়।

মেক্সিকোর (Mexico) উপসাগর অঞ্চলেই তৈলক্ষেত্রগুলি রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানায় এইগুলি পরিচালিত হয়। ট্যাম্পিকো হইতে তৈলবাহী জাহাজে এখানকার তৈল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত তৈল শোধনাগারে লইয়া যাওয়া হয়। এই দেশ তৈল উৎপাদনে **চতুর্থ স্থান** লাভ করিয়াছে।

রোমানিয়ার (Romania) কার্পেথিয়ান পর্বতের পূর্বে দানিয়ুব নদীর মধ্য অববাহিকায় তৈলক্ষেত্র বিরাজমান। ডাম্‌বোরিজা উপত্যকা, পারহোভা, বুজান্ ও বাকাউ-এ তৈলক্ষেত্র রহিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক বিন্যাসের ফলে উৎপাদন ও শোধন ব্যবস্থা উন্নত হইয়াছে। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ও কারিগরির সাহায্যে নূতন নূতন তৈলখনি আবিষ্কৃত হইতেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asia)—এখানকার তৈলখনিগুলির অধিকাংশই ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভারত, চীন ও জাপানে অবস্থিত। **ইন্দোনেশিয়ায়** সুমাত্রা দ্বীপে রনতান্, লিরিক, দিজাম্বি ও তালন্দ অঞ্চলে তৈল উত্তোলিত হয়। শোধনাগারগুলি রহিয়াছে পলেমবাঙ্গ ও পাংকালন ব্রান্ডানে। জাভার সুরাবায়া, বোর্নিও দ্বীপের সংসং ও তারাকান, সারাওয়াকের সোরিয়ার এবং বোয়েলী দ্বীপে তৈল উত্তোলিত ও পরিশোধিত হয়। **জাপানের হন্‌সু** দ্বীপে আকিটা, নীগাটা ও নীতসপু নামক স্থানে তৈলখনি রহিয়াছে। হোকাইডো দ্বীপে মাসুহারো, মুরোরান ও গারুগোয়াতে তৈল পাওয়া যায়। শোধনাগার রহিয়াছে নীগাটা, মুরোরান, টুরুমি, ফুনাকানা ও কাজিয়াজাকি অঞ্চলে। জাপানের চাহিদা অনেক বেশী। সেইজন্য বিদেশ হইতে বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর তৈল এখানে আমদানি করা হয়।

ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর উপত্যকায় প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। **পাকিস্তানের** পাঞ্জাবে ও বেলুচিস্তানে, **ভারতের** ডিগবয় অঞ্চলে, গুজরাটে ও বোম্বাই বন্দরের নিকটে সমুদ্রের তলায় এবং **চীনের** কানসু, লায়োনিং, জেচুয়ান, সিংকিয়াং ও শেন্‌সি প্রদেশে তৈল পাওয়া যায়। এই দেশ বর্তমানে তৈল উৎপাদনে **সপ্তম স্থান** অধিকার করে।

ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ী (Consumers and Traders)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর তৈল উৎপন্ন হইলেও মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে প্রচুর অপরিস্রুত খনিজ তৈল আমদানি করা হয়। এই সকল তৈল পরিস্রুত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা অনেক বেশী। সেইজন্য মোট উৎপাদনের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব কম তৈল রপ্তানি করে।

ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, সোভিয়েত রাশিয়া, রোমানিয়া, কলম্বিয়া, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, বাহ্রিন প্রভৃতি দেশ প্রচুর তৈল রপ্তানি করিয়া থাকে। ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, নেদারল্যান্ডস্, ভারত প্রভৃতি দেশ প্রধান **আমদানিকারক**।

জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity)

বিদ্যুৎশক্তি (Electric Power)—প্রধানতঃ কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানি খনিজ ও জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। সম্প্রতি কোনো কোনো দেশে আণবিক ও ভূতাপ শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হইতেছে। বিদ্যুৎশক্তি প্রধানতঃ দুই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়ঃ কয়লা, খনিজতৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানি জ্বালাইয়া তাপ সৃষ্টি করা হয়; এই তাপ বাষ্প সৃষ্টি করে এবং এই বাষ্পের চাপে টারবাইন ঘুরাইয়া যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় উহাকে **তাপবিদ্যুৎ** (Thermal Electricity) বলে।

বাষ্পীভবনের ফলে বাষ্পীভূত জলকণা মেঘ সৃষ্টি করে; উহা হইতে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির জল নদ-নদী সৃষ্টি করিয়া অবশেষে সমুদ্রে মিশিয়া যায়। এই বারি-চক্র সূর্যতাপের কল্যাণে চিরকাল সক্রিয় রহিয়াছে। জলের চাপ আছে। স্রোতের জলে চক্র রাখিলে তাহা চাপশক্তির ধাক্কায় ঘুরিতে থাকিবে। ডায়নামোযুক্ত টারবাইন জলস্রোত দ্বারা চালাইয়া বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয়। ইহাকে জলবিদ্যুৎ বলে। এই শক্তির ক্ষয় নাই। ইহা প্রবহমান সম্পদ (Flow Resource)। জলস্রোত যতদিন থাকিবে, তাহার চাপকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ততদিন ব্যবহার করা যাইবে। নিম্নে জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ব্যবহার (Uses)—জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পবিন্যাসের ক্ষেত্রে ছোটখাটো বিপ্লব সম্ভব করিয়াছে। বিকেন্দ্রীভবন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার শিল্পগত তাৎপর্য যথেষ্ট। জলবিদ্যুৎ চালিত আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রীজ, বস্ত্র পরিষ্কারক ও ইস্ত্রি, টেপরেকর্ডিং ও মাইক্রোফোন, ব্রডকাস্টিং প্রভৃতি নানা নূতন সামগ্রী ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনের ধারাকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে।

জলবিদ্যুৎ প্রবহমান সম্পদ। উহার সরবরাহ কখনই কমিবে না। জলবিদ্যুতের আবর্তন ব্যয় (Recurring expenditure) খুবই কম। কারণ, এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোনো পৌনঃপুনিক কাঁচামালের প্রয়োজন হয় না, শুধু মূল্যহীন জলের প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে জলবিদ্যুৎ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যে সকল শিল্পে সুলভ শক্তির প্রয়োজন, সেখানেই জলবিদ্যুৎ শক্তি একান্ত প্রয়োজন।

অ্যালুমিনিয়াম, কাগজ, তাম্রশোধন, কাঁচ, রসায়ন, রাসায়নিক সার, মধ্যমাকৃতির

ইস্পাত শিল্প, কুটিরশিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প ও কাষ্ঠশিল্পে শক্তি হিসাবে জলবিদ্যুৎ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সকল শিল্পে সুলভ শক্তির প্রয়োজন। জলবিদ্যুতের দেশব্যাপী ব্যাপক সরবরাহের ফলে জনসংখ্যা ও বসতির পুনর্বিন্যাস করা যাইতে পারে, যাহার ফলে জনাকীর্ণ অঞ্চলের নাগরিক সমস্যা কমিবে এবং জনহীন অঞ্চলে নূতন বসতি স্থাপন সম্ভব হইবে। বেকার সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, গ্রামে গ্রামে যে সকল বেকার যুবক রহিয়াছে, বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পে তাহাদের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়। চাল-ছাঁটাই কল জলবিদ্যুতের সাহায্যে চলিতে পারে, বিভিন্ন রাজ্যের ঘরে ঘরে জলবিদ্যুতের সাহায্যে বহুকালের ঐতিহ্যপূর্ণ কুটিরশিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

জলবিদ্যুতের একটি সমস্যা এই যে, ইহার উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ অত্যন্ত বেশী; প্রচুর মূলধন ও কারিগরি সাহায্য ছাড়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা কঠিন। তাহা ছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল না হইলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব নহে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বহু উপকারও পাওয়া যায়। জলসেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ, মৎস্য চাষ, ভূমিক্ষয়-নিবারণ প্রভৃতিও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন কার্যক্রমের সঙ্গে হইয়া থাকে।

জলবিদ্যুৎ চিরস্থায়ী, কখনও উহার উৎপাদন বন্ধ হইবে না ; কারণ জল **প্রবহমান সম্পদ**।

জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ (Environment favourable for development of Hydro-Electricity)—জলস্রোতের বেগ হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজনঃ (ক) ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং (খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ।

(ক) **ভৌগোলিক পরিবেশঃ** জলবিদ্যুৎ প্রকৃতির দান। অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ থাকিলেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সহজ। নদীর উপর বিশালকায় বাঁধ দিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হয়; এজন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ও প্রচুর মূলধন। যে সকল দেশে ইহার অভাব আছে, সেখানে ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল থাকিলেও জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে না।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত ভৌগোলিক (প্রাকৃতিক) পরিবেশ প্রয়োজনঃ

(১) কি পরিমাণ জল কতটা বেগে প্রবাহিত হইতেছে তাহার উপরই কি পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে। জলের পরিমাণ আবার নির্ভর করে **বৃষ্টিপাত** বা **তুষারপাতের** পরিমাণের উপর।

(২) যে জমির উপর দিয়া জল প্রবাহিত হইতেছে তাহার ঢালের উপর জলের গতিবেগ নির্ভর করে। জমি যত বেশী ঢালু হইবে জলস্রোত তত বেগবান্ হইবে। নিয়মিত ভাবে সম-পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইলে সারা বৎসর জলের প্রবাহ সমান থাকা প্রয়োজন।

(৩) সাধারণতঃ দেখা যায়, যে নদী বরফ-গলা জলে পুষ্ট উহাতে সারা বৎসর জল থাকে। যেখানে নদী বৃষ্টির জলে পুষ্ট সেক্ষেত্রে **বৃষ্টিপাতের প্রকৃতির** উপর নদীতে নিয়মিত জলপ্রবাহ থাকিবে কিনা তাহা নির্ভর করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা

বৎসর প্রায় সমানভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই অঞ্চলের নদীগুলিতে সকল সময় প্রচুর জল পাওয়া যায় ; ফলে এই সকল নদী হইতে নিয়মিতভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাও অধিক ; কিন্তু ক্রান্তীয় মন্ডলে কিংবা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বৎসরের একটা বিশেষ ঋতুতে সীমাবদ্ধ বলিয়া এই সকল অঞ্চলের বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদীগুলিতে সারা বৎসর প্রয়োজনীয় জল থাকে না। ফলে এই সকল নদী হইতে সারা বৎসর সম-পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইলে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বর্ষার বাড়তি জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য উপযুক্ত জলাধার নির্মাণ করিতে হয়।

(৪) তাপমাত্রার উপরেও জলের প্রবাহ নির্ভর করে। অত্যধিক উষ্ণ অঞ্চলে **বাষ্পীভবনের** হার অধিক হওয়ার ফলে জলের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পায়। আবার অত্যধিক শীতল অঞ্চলে নদীগুলি বৎসরের অন্ততঃ কয়েকমাস জমিয়া বরফ হইয়া থাকে ; ফলে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(৫) **বনভূমি** নদীতে জলের সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বনভূমি বৃষ্টি-পাতের সহায়ক এবং জলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) **অর্থনৈতিক পরিবেশ ঃ** জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেবলমাত্র উল্লিখিত প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে না, ইহার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থাও অনুকূল থাকা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর কোনো অঞ্চলের সুপ্ত বা সম্ভাব্য জলবিদ্যুতের পরিমাণ (Potential hydel energy) নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্ভর করে নিম্নলিখিত **অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের (Economic factors)** উপর ঃ

(১) অন্য যে কোনো জিনিসের ন্যায় বিদ্যুৎ উৎপাদনও মূলতঃ তাহার চাহিদার উপর নির্ভরশীল। প্রধানতঃ **শিল্পে, যাতায়াত-ব্যবস্থায় ও গৃহস্থালির কার্যে** বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়। **জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর গৃহস্থালির** কার্যে বিদ্যুতের চাহিদা নির্ভর করে। জনসাধারণ দরিদ্র হইলে বিদ্যুতের কোনো চাহিদা থাকিবে না। জনসাধারণ সঙ্গতিসম্পন্ন হইলে আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, সিনেমা প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। শিল্প ও যাতায়াত-ব্যবস্থায় বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক। যে সকল দেশ শিল্পোন্নত, সেই সকল দেশে কল-কারখানা ও রেলগাড়ি চালাইবার জন্য অধিক বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিল্পোন্নতি না ঘটিলে বিদ্যুতের চাহিদা সামান্য হইবে। এই কারণে আফ্রিকার জায়েরেতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিলেও প্রকৃত উৎপাদন অতি সামান্য, মোট সুপ্ত শক্তির শতকরা মাত্র ০·২৭ ভাগ। অন্যদিকে ফ্রান্স, ইটালি, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডে সুপ্ত জলবিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ কম হইলেও এই সকল দেশে অভূতপূর্ব শিল্পোন্নতি ঘটায় শক্তির চাহিদা অধিক বলিয়া ইহারা যে শুধু সুপ্ত সম্ভাবনার সম্পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে তাহাই নহে, স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে।

(২) কয়লা ও খনিজ তৈল প্রভৃতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যোগান কম হইলে ও মূল্য বেশী হইলে জলবিদ্যুতের **চাহিদা** বৃদ্ধি পায়। সুইজারল্যান্ডে কয়লা ও খনিজ

তৈল পাওয়া যায় না বলিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।
(৩) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রভূত পরিমাণে স্থায়ী **মূলধন** ও (৪) উচ্চশ্রেণীর **কারিগরি জ্ঞানের** দরকার। যে সকল দেশে এইগুলি বর্তমান, সেই সকল দেশেই জলবিদ্যুৎ বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ (Principal Producing Countries)—জলবিদ্যুতের সম্ভাব্য পরিমাণ এবং ব্যবহৃত পরিমাণের চরম অসঙ্গতি অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ প্রায় ৬,৫০০ লক্ষ কিলোওয়াট, কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় মাত্র ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট—ব্যবহৃত শক্তি সেখানে উৎপাদনের উপযোগী শক্তির পরিমাণের ১০ শতাংশও নহে। সাধারণভাবেই অনুন্নত দেশে চাহিদা কম থাকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন লাভজনক নহে। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্ভাব্য ও ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির মানের নিয়ামক। উভয় পরিবেশের যথাযথ সমন্বয়ে উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হয়।

উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদক দেশ। এই দেশের জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে নায়গ্রা জলপ্রপাত, টেনেসী উপত্যকা এবং কলোরাডো উপত্যকা (হুভার বাঁধ) উল্লেখযোগ্য। নায়গ্রা জলপ্রপাত ও টেনেসী উপত্যকার বাঁধসমূহ হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি পূর্বাঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রে (৭৫ শতাংশ), যানবাহন চলাচলে, রাসায়নিক, অ্যালুমিনিয়াম, বনজ ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। কলোরাডো উপত্যকার বাঁধসমূহ হইতে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ রকি পর্বত অঞ্চলের শিল্পসমূহে শক্তি সরবরাহ করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে যে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত হয় উহার পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি মেঃ টন কয়লা দ্বারা উৎপাদিত শক্তির সমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চুক্তির ফলে নায়গ্রা জলপ্রপাত হইতে সৃষ্ট জলবিদ্যুৎ এবং সেন্টমরিস্ ও অটোয়া নদীর বাঁধ হইতে সৃষ্ট জলবিদ্যুৎ কানাডার কাগজশিল্প, তাম্র, নিকেল শোধন শিল্প, রেয়ন শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যাসবেস্টস্ শিল্পে এবং বিভিন্ন খনিতে ব্যবহৃত হইতেছে। মাথাপিছু জলবিদ্যুতের ব্যবহার সম্ভবতঃ কানাডায় সবচেয়ে বেশী।

সোভিয়েত রাশিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করে। এই দেশের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে নীপার নদীর উপর নীপ্রোগেস্ কেন্দ্র, লেনিনগ্রাডের নিকটে শীর ও ভলকভ নদীর বাঁধ, নিভা নদীর বাঁধ, আমুর নদীর উপর বাঁধ, ইউরাল এবং ককেশাস পর্বতাঞ্চলের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সুদূর প্রাচ্যে, মধ্য-সাইবেরিয়ায় এবং মধ্য-এশিয়ায় নূতন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বাঁধ নির্মিত হইয়াছে।

ইউরোপে **ইটালি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে** ও **সুইডেনে** প্রায় সামগ্রিকভাবেই শিল্পবিন্যাসের ও জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার প্রধান উৎস জলবিদ্যুৎ। ফ্রান্সের পিরেনীজ পর্বত অঞ্চলে এবং আল্পস্ পর্বত অঞ্চলের নদীসমূহ হইতে সৃষ্ট বিদ্যুৎ পো অববাহিকার শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ব্যবহার করা হয়। নরওয়ের শিল্প, কৃষি ও মৎস্যশিল্প সম্পূর্ণভাবে জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। সুইডেনে ট্রলহাট্টা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র সেই দেশের ব্যাপক বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিন্যাস ও ব্যবহারের সাক্ষ্য দেয়।

এশিয়া মহাদেশে **জাপান** কয়লায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। হনসু দ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ পার্বত্য ঢালে যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা জাপানের বৃহদায়তন ও কুটির শিল্পে ব্যবহৃত হয়। জাপান জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে **তৃতীয়** স্থান অধিকার করে।

চীনে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর। উত্তর চীন এবং ইয়ানান্ প্রদেশে ব্যাপক জলবিদ্যুতের ব্যবহারের কথা শোনা যায়। **ভারতের** বিভিন্ন অঞ্চলে নদীর উপর বাঁধ দিয়া প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে এবং ক্রমশঃ ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

জলবিদ্যুৎশক্তি একদেশ হইতে অন্যদেশে রপ্তানি করা সম্ভব নহে বলিয়া উৎপাদনকারী দেশসমূহ সমগ্র জলবিদ্যুৎ শক্তিই নিজেদের কাজে লাগায়।

তাপবিদ্যুৎ, আণবিক শক্তি ও **সৌরশক্তি** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়। শক্তির উৎস হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। (H. S. Council-এর Syllabus বহির্ভূত বলিয়া এখানে ঐগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল না।)

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Narrate the features of mineral resources and classify minerals.
[খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর এবং খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর।]
উঃ। 'খনিজ সম্পদ উত্তোলনের বৈশিষ্ট্য' (১৩০ পৃঃ) এবং 'খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ' (১৩১-১৩২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

2. Compare mining with agriculture.
[কৃষিকার্যের সহিত খনিজ সম্পদ উত্তোলনের তুলনা কর।]
উঃ। 'খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও কৃষিকার্যের তুলনা' (১৩০-১৩১ পৃঃ) লিখ।

3. Describe the various uses of iron ore. Give an account of the principal iron ore producing regions of Asia or North America.
[H. S. Examination, 1981]
[লৌহ আকরিকের নানাবিধ ব্যবহারের কথা উল্লেখ কর। এশিয়া অথবা উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও।]
উঃ। 'লৌহ আকরিক' (১৩২-১৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Point out the economic importance of iron ore. Name the major countries where it is mined. Mention the important iron ore exporting and importing countries of the world.
[H. S. Examination, 1983]
(লৌহ আকরিকের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণ উল্লেখ কর। যে সকল দেশে ইহা খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হয় তাহাদের নাম উল্লেখ কর। লৌহ আকরিক রপ্তানি ও আমদানিকারক প্রধান প্রধান দেশগুলির নাম কর।)
উঃ। 'লৌহ আকরিক' (১৩২-১৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. Name the different grades of iron-ore. Give the world production and distribution of iron-ore. **[Specimen Question, 1980]**

(বিভিন্ন প্রকার লৌহ আকরিকের নাম লিখ। লৌহ আকরিকের পৃথিবীব্যাপী উৎপাদন ও বণ্টন উল্লেখ কর।)

উঃ। 'লৌহ আকরিক' (১৩২-১৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Indicate the commercial and industrial uses and regional distribution of any one of the following : (i) Bauxite, (ii) Manganese, (iii) Copper, (iv) Nickel. **[Specimen Question, 1980]**

(বাণিজ্যে ও শিল্পে নিম্নলিখিত খনিজ দ্রব্যগুলির যে কোনো একটির ব্যবহার এবং উহার পৃথিবীব্যাপী বণ্টন নির্দেশ করঃ (i) বক্সাইট, (ii) ম্যাঙ্গানিজ, (iii) তাম্র, (iv) নিকেল।)

উঃ। 'বক্সাইট' (১৪৭-১৪৯ পৃঃ), 'ম্যাঙ্গানিজ' (১৪৯-১৫০ পৃঃ), 'তাম্র' (১৩৯-১৪২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ। (নিকেল সিলেবাস বহির্ভূত)।

7. How are copper and manganese used ? Name the countries of the world which are the main producers and consumers of any one of these metals. **[H. S. Examination, 1978]**

(তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজ কি কি ভাবে ব্যবহৃত হয়? পৃথিবীতে এই ধাতু দুইটির যে কোনো একটির উৎপাদক ও ব্যবহারকারী দেশসমূহের নাম কর।)

উঃ। 'তাম্র' ও 'ম্যাঙ্গানিজ' (১৩৯-১৪২ পৃঃ এবং ১৪৯-১৫০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

8. Name four metallic minerals of commercial use. Indicate the principal uses of copper. Describe the main copper producing areas of the world. **[H. S. Examination, 1980]**

(বাণিজ্যিক ব্যবহারে লাগে এইরূপ চারিটি ধাতব খনিজের নাম লিখ। তাম্রের মুখ্য ব্যবহারগুলি নির্দেশ কর। পৃথিবীর প্রধান তাম্র উৎপাদক অঞ্চলগুলির বর্ণনা দাও।)

উঃ। লৌহ আকরিক, তাম্র, বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানিজ—এই চারিটি ধাতব খনিজ বাণিজ্যিক ব্যবহারে লাগে। ইহার পর 'তাম্র' (১৩৯-১৪২ পৃঃ) অবলম্বনে বাকী অংশের উত্তর লিখ।

9. Classify coal and mention its various uses. Mention the geographical distribution of principal coalfields of Asia. **[H. S. Examination, 1979]**

(কয়লার শ্রেণীবিভাগ কর ও ইহার বিভিন্ন ব্যবহার উল্লেখ কর। এশিয়া মহাদেশের প্রধান প্রধান কয়লা উৎপাদক অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর।)

উঃ। 'কয়লা' (১৫৬-১৬০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10. What are the different varieties of coal ? Discuss the uses and by-products of coal. **[H. S. Examination, 1985]**

(কয়লা কত প্রকারের হয়? কয়লার ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যাদির বিষয় আলোচনা কর।)

উঃ। 'কয়লার শ্রেণীবিভাগ' (১৫৬-১৫৭ পৃঃ) ও 'ব্যবহার' (১৫৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. What are the various uses and by-products of coal? Give a full account of the world production and distribution of coal.

[B. U. B. Com. 1962 & 1968; C. U. B. Com. 1970]

(কয়লার বিভিন্ন ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যসমূহ কি কি? কয়লার পৃথিবীব্যাপী উৎপাদন ও বণ্টনের বিস্তারিত বিবরণ দাও।)

উঃ। কয়লার 'ব্যবহার' (১৫৭ পৃঃ) এবং 'প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ' (১৫৭-১৬০ পৃঃ) লিখ।

12. What are the industrial uses of mineral oil? Give an account of its world distribution.

[C. U. B. Com. 1962 & 1970 & Specimen Question, 1980]

(খনিজ তৈলের শিল্পগত ব্যবহার কি কি? পৃথিবীতে উহার বণ্টনের বর্ণনা দাও।)

উঃ। 'ব্যবহার' (১৬০-১৬১ পৃঃ) এবং 'প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ' (১৬১-১৬৫ পৃঃ) লিখ।

13. Name the principal petroleum producing countries of the world. What are its various uses? Discuss its role in influencing world affairs.

[H. S. Examination, 1984]

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান পেট্রোলিয়াম উৎপাদক দেশগুলির নাম কর। ইহার বিবিধ ব্যবহার কি কি? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা কর।)

উঃ। 'প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ' (১৬১-১৬৪ পৃঃ) এবং 'ব্যবহার' (১৬০-১৬১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

14. Mention the various uses and by-products of petroleum. Describe the principal petroleum producing areas of the world.

[H. S. Examination, 1980]

(খনিজ তৈলের বিভিন্ন ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যগুলির উল্লেখ কর। পৃথিবীর প্রধান খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চলগুলির বর্ণনা কর।)

উঃ। 'খনিজ তৈল' (১৬০-১৬৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

15. Describe the geographical conditions suitable for the generation of hydro-electric power. What are its advantages to thermal power?

[H. S. Examination, 1981]

(জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাগুলি আলোচনা কর। তাপবিদ্যুৎ শক্তির তুলনায় ইহার কি কি সুবিধা আছে?)

উঃ। 'জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ' (১৬৭-১৬৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

16. (a) Describe the favourable geographical factors for the development of water-power. (b) Name the countries noted for the generation of water-power.

[H. S. Examination, 1982]

(ক) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক কারণসমূহ নির্ণয় কর। (খ) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে উন্নত দেশগুলির নাম উল্লেখ কর।)

উঃ। 'জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ' (১৬৭-১৬৯ পৃঃ) এবং 'প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ' (১৬৯-১৭০ পৃঃ) লিখ।

17. Explain the conditions favouring the development of hydro-electric power. Examine the world distribution of water power resources. [Specimen Question, 1978]

(জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা কর। জলশক্তিসম্পদ পৃথিবীর কোন্ দেশে কি পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা আলোচনা কর।)

উঃ। 'জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ' (১৬৭-১৬৯ পৃঃ) ও 'প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ' (১৬৯-১৭০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

18. What are the different sources of power ? Describe the natural and economic factors for the development of hydro-electric power. In what respects is hydro-electricity superior to other sources of power ? [Specimen Question, 1980]

(শক্তির বিভিন্ন উৎস কি কি? জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের বর্ণনা কর। কোন্ কোন্ বিষয়ে জলবিদ্যুৎ অন্যান্য শক্তিসম্পদ হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়?)

উঃ। বর্তমানে শক্তির উৎস প্রধানতঃ (১) কয়লা, (২) খনিজ তৈল ও (৩) জলবিদ্যুৎ। বাকী অংশ 'জলবিদ্যুৎ' (১৬৬-১৭০ পৃঃ) এবং 'বিভিন্ন শক্তিসম্পদের তুলনা' (১৫৩-১৫৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

19. Compare and contrast Coal, Petroleum and Hydro-electricity as sources of industrial power.

[C. U. B. Com. 1964 & B. U. B. Com. 1964 & 1972]

(শ্রমশিল্পের শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুতের তুলনা কর।)

উঃ। 'বিভিন্ন শক্তিসম্পদের তুলনা' (১৫৩-১৫৬ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

20. (a) Mention the name of a country producing copper and the name of another producing tin. (b) Mention the non-physical factors that help generation of hydro-electricity. Also mention one hydel power centre of the U.S.A. and the U.S.S.R. (c) Discuss the production and distribution of coal mining in the U.S.A.

Or, Discuss the production and distribution of iron ore mining in the U.S.S.R. [Tripura H. S. Examination, 1979]

[(ক) তাম্র উৎপাদনকারী একটি দেশ ও টিন উৎপাদনকারী একটি দেশের নাম লিখ। (খ) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যকারী অভৌগোলিক কারণগুলি বর্ণনা কর ; যুক্তরাষ্ট্রের একটি ও সোভিয়েত রাশিয়ার একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম উল্লেখ কর। (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়লার অবস্থান ও উৎপাদন আলোচনা কর।

অথবা, সোভিয়েত রাশিয়ার লৌহখনির অবস্থান ও লৌহ আকরিকের উৎপাদন আলোচনা কর।]

উঃ। 'তাম্র' (১৩৯-১৪২ পৃঃ), 'টিন' (১৪৪-১৪৫ পৃঃ), 'জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ' (১৬৭-১৬৯ পৃঃ), 'প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ' (১৬৯-১৭০ পৃঃ), 'কয়লা' (১৫৬-১৬০ পৃঃ), 'লৌহ আকরিক' উৎপাদন (১৩২-১৩৯ পৃঃ) হইতে উত্তর লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on : (a) Metallic Minerals, (b) Non-Metallic Minerals, (c) By-products of coal, (d) Various uses of petroleum and its by-products. [**H. S. Examination, 1982**] (e) Principal ores of iron and uses of iron. [**H. S. Examination, 1978**] (f) Thermal and hydel power. [**H. S. Examination, 1979**] (g) Different uses of coal. [**H. S. Examination, 1981**] (h) Mineral fuels. [**H. S. Examination, 1983**] (i) Ferro-alloys. [**H. S. Examination, 1985**]

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ (ক) ধাতব খনিজ, (খ) অধাতব খনিজ, (গ) কয়লার উপজাত দ্রব্য, (ঘ) খনিজ তৈলের বিভিন্ন ব্যবহার ও ইহার উপজাত দ্রব্য, (ঙ) প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক ও লৌহের ব্যবহার, (চ) তাপ ও জলবিদ্যুৎ, (ছ) কয়লার বিভিন্ন ব্যবহার, (জ) জ্বালানি খনিজ, (ঝ) লৌহ-সংকর গোষ্ঠীর ধাতব খনিজ।]

উঃ। 'ধাতব খনিজ' (১৩২ পৃঃ), 'অধাতব খনিজ' (১৫০ পৃঃ), কয়লার 'ব্যবহার' (১৫৭ পৃঃ), খনিজ তৈলের 'ব্যবহার' (১৬০-১৬১ পৃঃ), 'লৌহ আকরিকের শ্রেণী-বিভাগ' (১৩৩ পৃঃ) ও 'ব্যবহার' (১৩২-১৩৩ পৃঃ), 'বিদ্যুৎ শক্তি' (১৬৬ পৃঃ), কয়লার 'ব্যবহার' (১৫৭ পৃঃ), 'জ্বালানি খনিজ' (১৩১-১৩৫ পৃঃ), 'লৌহ-সংকর গোষ্ঠীর ধাতব খনিজ' (১৩২ পৃঃ) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Frame correct answers with the help of the following :

(a) Manganese plays an important role in manufacturing Steel/Aluminium. (b) In mica production India/Pakistan/Iran occupies the leading position. (c) Donetz region/Great Barrier Reef/Tarim Valley is famous for the production of coal. (d) Saudi Arabia/Iran/the U. S. A./the U. S. S. R. occupies the first place in petroleum production. (e) India/Pakistan/Iran is famous for production of Mica [**H. S. Examination, 1978**]. (f) Aluminium is produced from Haematite/Bauxite/Laterite. (g) Natural Gas is recovered from Petroleum mines/Forests/Industrial centres. [**H. S. Examination, 1979**]. (h) Egypt/Italy/Saudi Arabia is famous for production of Petroleum. (i) Manganese is required for the production

of Aluminium/Steel [**H. S. Examination, 1980**]. (j) Anthracite/ Haematite/Bauxite is a kind of high grade iron-ore. (k) Australia/ Venezuela/Ghana is noted for production of petroleum [**H. S. Examination, 1981**]. (l) Orissa is noted for the production of mica/ iron ore/petroleum. (m) Bombay High produces forest products/ petroleum/manganese ore [**H. S. Examination, 1982**]. (n) Malaysia is noted for mining of copper/tin/mica. [**H. S. Examination, 1983**]. (o) Coal is mined at Raniganj/Jamshedpur/Darjeeling [**H. S. Examination, 1983**]. (p) Aluminium is obtained from haematite/galena/bauxite ore. (q) The countries in Middle East are noted for production of hydro-electric power/nickel/mineral oil. (r) Tar/diesel oil/alcohol is a by-product of coal. [**H. S. Examination, 1984**]. (s) Tar is a by-product of coal/groundnut oil/iron ore. (t) Atomic energy is generated from uranium/lignite/lead. [**H. S. Examination, 1985**].

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলির সহযোগে সঠিক উত্তর তৈয়ারি করঃ

(ক) ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। (খ) অভ্র উৎপাদনে ভারত/পাকিস্তান/ইরান দেশ বিখ্যাত। (গ) ডোনেৎস্ অঞ্চল/গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ/তারিম উপত্যকা কয়লা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। (ঘ) খনিজ তৈল উৎপাদনে সৌদি আরব/ইরান/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। (ঙ) অভ্র উৎপাদনে ভারত/পাকিস্তান/ইরান দেশ বিখ্যাত। (চ) হেমাটাইট/বক্সাইট/ল্যাটেরাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পিত হয়। (ছ) তৈলখনি/ বনভূমি/শিল্পাঞ্চল হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ করা হয়। (জ) মিশর/ইতালি/সৌদি আরব খনিজ তৈল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। (ঝ) অ্যালুমিনিয়াম/ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন হয়। (ঞ) অ্যানথ্রাসাইট/হেমাটাইট/বক্সাইট এক প্রকারের উচ্চ শ্রেণীর লৌহ আকরিক। (ট) খনিজ তৈল উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া/ভেনেজুলা/ ঘানা উল্লেখযোগ্য। (ঠ) অভ্র/আকরিক লৌহ/খনিজ তৈল উৎপাদনে ওড়িশা খ্যাতি-লাভ করিয়াছে। (ড) বম্বে হাই হইতে বনজ দ্রব্য/খনিজ তৈল/ম্যাঙ্গানিজ ধাতু উৎপন্ন হয়। (ঢ) তাম্র/টিন/অভ্র মালয়েশিয়ায় পাওয়া যায়। (ণ) রানীগঞ্জ/ জামসেদপুর/দার্জিলিং-এর খনি হইতে কয়লা তোলা হয়। (ত) হেমাটাইট/গ্যালেনা/ বক্সাইট আকর হইতে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। (থ) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি জলবিদ্যুৎ/নিকেল/খনিজ তৈল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। (দ) আলকাতরা/ডিজেল তৈল/সুরাসার কয়লার উপজাত দ্রব্য। (ধ) আলকাতরা হইল কয়লা/বাদাম তৈল/লৌহ আকরের উপজাত দ্রব্য। (ন) ইউরেনিয়াম/লিগনাইট/সীসা হইতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা হয়।

দশম অধ্যায়

কৃষিকার্য ও কৃষিসম্পদ

(Farming and Farm Resources)

কৃষিকার্য অবলম্বন করিয়াই মানব-সভ্যতা শুরু হয়। আদিম মানুষ যখন দেখিল যে মৃত্তিকাবক্ষে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তখন সে প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া নিজের প্রচেষ্টায় বৃক্ষ উৎপাদনের পন্হা গ্রহণ করে। মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিস খাদ্য। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের অভাবও মানুষ অনুভব করে। কি করিয়া প্রকৃতিকে কাজে লাগাইয়া এই অন্ন ও বস্ত্র উৎপাদন করা যায়, সেই প্রচেষ্টাই মানুষ বহুদিন ধরিয়া করিয়া আসিয়াছে এবং পরে একসময় এইগুলির উৎপাদনে সাফল্য লাভ করিয়াছে। কৃষিকার্যের মাধ্যমেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। কৃষিকার্যের মাধ্যমেই মানুষ আজ বিভিন্ন খাদ্যশস্য (গম, ধান প্রভৃতি) এবং বস্ত্রের **কাঁচামাল (তুলা)** উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কৃষিকার্যের সংজ্ঞা (Definition of Agriculture)—উদ্ভিদ ও প্রাণিজীবনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া মানুষ নিজে উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকে। কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে কোনো স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করা একান্ত প্রয়োজন। তারপর প্রকৃতিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ জমি হইতে নিজের প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে শুরু করে। প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়া মানুষ জমি হইতে কত বেশী দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে তাহার উপর কৃষিকার্যের সাফল্য নির্ভর করে।

বর্তমান যুগে কৃষিকার্যের পরিধি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে ; শুধু জমিতে চাষ করিয়া ফসল উৎপাদনকেই কৃষিকার্য বলা হয় না। উদ্ভিদ ও প্রাণিজীবনের স্বাভাবিক জন্ম, বৃদ্ধি, প্রসার প্রভৃতি যাবতীয় প্রক্রিয়াই কৃষিকার্যের অন্তর্গত বিষয়। সুতরাং বনভূমি সংরক্ষণ, মৎস্য চাষ, পশুপালন প্রভৃতিকে বর্তমানে কৃষিকার্যের আওতায় আনা হয়। পণ্ডিত জিমারম্যানকে অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপে কৃষিকার্যের সংজ্ঞা এইভাবেই দেওয়া যাইতে পারে—'**জমিতে স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া মানুষ যখন উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সুযোগ লইয়া নিজের চাহিদা মিটাইবার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজ দ্রব্য উৎপন্ন করে, তখন মানুষের ঐ প্রচেষ্টাকে কৃষিকার্য বলা হয়**'।*

যুগে যুগে মানুষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিয়াছে। ইহার মূলে আছে কৃষিকার্যে মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে লব্ধ জ্ঞানের

---

* 'Agriculture covers those productive efforts by which, man, settled on the land, seek to make use of and if possible, accelerate and improve upon the natural genetic or growth process of plant and animal life to the end that these processes will yield the vegetable and animal products needed or wanted by man'.
—*E.W.Zimmermann.*

প্রয়োগ। মানুষ নিজ বুদ্ধিবলে জড়শক্তিকে কৃষিকার্যে প্রয়োগ করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে, বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্যের উৎপাদনের উন্নতির গতিবেগ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বৃষ্টিপাতের অভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া, জমিতে সার দিয়া, সঙ্কর বীজ লাগাইয়া কৃষিকার্যে উন্নতিসাধন মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সাক্ষ্য বহন করে।

কৃষির উপাদান—পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কমবেশী কৃষিকার্যের ব্যবস্থা আছে। ভূ-পৃষ্ঠের সকল স্থানে কৃষির বিভিন্ন উপাদানের অভাবে কৃষিকার্য করা সম্ভব নহে; মাত্র ১/১০ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। এই চাষের জমির শতকরা ৭৫ ভাগ শুধু ১৫টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূ-পৃষ্ঠের মোট জমির পরিমাণ ১,৪৬০ কোটি হেক্টর। ইহার মধ্যে কৃষির উপযোগী জমির পরিমাণ খুবই কম। আশা করা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-জমির পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে। যেমন, ভারতের রাজস্থানের সুরতগড়ে মরুভূমি-প্রায় স্থানকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। বাহেরের (O. E. Baher) মতে পৃথিবীর মোট জমির শতকরা ৪২ ভাগ জমিকে কৃষির উপযোগী করা সম্ভব। ইহা সম্ভব হইলেই কৃষিজাত সম্পদের পরিমাণ প্রচুর বাড়িয়া যাইবে এবং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ আরও সুগম হইবে।

কয়েকটি উপাদানের উপর কৃষিকার্যের উন্নতি নির্ভর করে; যথা, (১) **বৃষ্টিপাত ও জলসেচ**, (২) **তাপমাত্রা**, (৩) **ভূ-প্রকৃতি**, (৪) **মৃত্তিকার উর্বরতা**, (৫) **কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও কর্মদক্ষতা।**

(১) **বৃষ্টিপাত ও জলসেচ**—বৃষ্টিপাতের উপর প্রধানতঃ কৃষির সাফল্য নির্ভর করে। মাটিতে জলাভাব হইলে কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না। আবার অতিবৃষ্টিও অনেক সময় কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর। নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলেই কৃষিকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। ধান ও পাট চাষের পক্ষে অত্যধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন; কিন্তু গম চাষের পক্ষে অধিক বৃষ্টিপাত অনুপযোগী। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কিছু কিছু আয়ত্তে আসিয়াছে। যেখানে বৃষ্টিপাত কম, সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদীর উপর বাঁধ দিয়া এবং খাল খনন করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কূপ ও পুষ্করিণীর সাহায্যেও জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত অপ্রচুর, সেখানে জলসেচের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। ভারতে জলসিঞ্চিত জমির পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ হেক্টর। ইহা মোট কৃষি জমির শতকরা ৩৩ ভাগ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জলসেচের উপর কৃষিকার্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

(২) **তাপমাত্রা**—গ্রীষ্মকাল কৃষির উপযোগী ঋতু। সুতরাং যে সকল স্থানে গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব কম, সেখানে কৃষিকার্য সফল হয় না। সেইজন্য মেরু অঞ্চল ও উত্তর ইউরোপে কৃষির অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। উত্তাপ চাষের পক্ষে অপরিহার্য। বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োজন। পাট চাষের জন্য ২৭° সেঃ-এর বেশী তাপমাত্রা প্রয়োজন, কিন্তু গমচাষের পক্ষে ১৩° সেঃ তাপমাত্রাই যথেষ্ট।

(৩) **ভূ-প্রকৃতি**—ভূমিভাগের উচ্চতা, পর্বতের অবস্থান, ভূমিভাগের ঢাল প্রভৃতি শস্যোৎপাদনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

(৪) **মৃত্তিকার উর্বরতা**—মৃত্তিকার উর্বরতা শস্যোৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে মৃত্তিকার উর্বরতাশক্তি কম, তাহাতে অনেক চেষ্টা করিয়াও ফসলের

ফলন বেশী বৃদ্ধি করা যায় না। উর্বর জমিতে অনায়াসেই ফসল উৎপন্ন হয়। বর্তমানে অনুর্বর জমিতেও সার দিয়া শস্য উৎপন্ন করা হয়; কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য।

মৃত্তিকার প্রকারভেদের উপর ইহার উর্বরতা নির্ভর করে। বর্ণ, আকার, গঠন, রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদির উপর ইহার উর্বরতা নির্ভরশীল। এই সকল অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা, **পোডোক্যাল (Pedocal)**, **পেডলফার (Pedalfar)** ও **প্রেইরী (Prairie)**। **পেডোক্যাল** মৃত্তিকা কৃষ্ণ, বাদামী ও রক্তাভ বর্ণের হয়। ইহা উর্বর ও চুন-প্রধান। জল পাইলে ইহাতে ভালো ফসল উৎপন্ন হয়। **পেডলফার** মৃত্তিকা ধূসর-বাদামী বর্ণের অথবা রক্ত ও পীত বর্ণের হইয়া থাকে। ইহা লৌহ-প্রধান এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। **প্রেইরী** মৃত্তিকায় চুন, লৌহ প্রভৃতি থাকায় ইহা উর্বর। অবস্থান ভেদে ইহার উর্বরতা বেশী বা কম হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন প্রকার ভূমির উর্বরতা বিভিন্ন প্রকারের। ভূমির উর্বরতাশক্তি কৃষির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমবঙ্গে মৃত্তিকা উর্বর হওয়ায় এখানে পাট ও ধান চাষের উন্নতি হইয়াছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যে কৃষ্ণ-মৃত্তিকা থাকায় তুলা চাষের উন্নতি হইয়াছে।

(৫) **কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও কর্মদক্ষতা**—কৃষির সাফল্য কৃষকের আর্থিক অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যদি কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণে কৃষক মনোযোগ দিয়া কাজ না করে, তাহা হইলে কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। কৃষকের হাতের লাঙলের উপর কৃষির উৎকর্ষ নির্ভর করে। অনেক দেশে কৃষক চাষের জমির মালিক নহে, জমির মালিক ফসলের মালিক হইয়া থাকে বলিয়া কৃষক মনোযোগ দিয়া চাষ করে না। সেইজন্য বর্তমানে অনেক দেশে চাষীকে জমি দেওয়ার কথা চিন্তা করা হইতেছে। ভারতে ইহাকে নীতি হিসাবে স্বীকার করা হইলেও এখনও সম্পূর্ণভাবে এই প্রথা কার্যকরী করা হয় নাই। ভাল বীজ ও সার সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা, কর্ষণের উপযোগী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার ক্ষমতা, কৃষকের কাজ করিবার ক্ষমতা ও বুদ্ধির উপর কৃষির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

কৃষিকার্যে জলবায়ুর প্রভাব (Influence of climate on agriculture)—পূর্বেই বলা হইয়াছে, কৃষিকার্যের উন্নতি প্রধানতঃ অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার উপর (বিশেষতঃ জলবায়ুর উপর) নির্ভর করে। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির কার্যাবলীতে মানুষের ভূমিকা মুখ্য ; কিন্তু কৃষি-কার্যে এখনও জলবায়ু (প্রকৃতি) মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে। কারণ, কৃষি-কার্য প্রধানতঃ জলবায়ুর খেয়ালের উপর নির্ভর করে। কিন্তু জলবায়ুর উপর মানুষের বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নাই। কোন্ বৎসর বর্ষা কখন শুরু হইবে এবং বেশী হইবে কি কম হইবে, শীত-গ্রীষ্ম বেশী হইবে কি কম হইবে, এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থার উপর মানুষের কোনো হাত নাই।

যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কৃষিকার্যের যত উপযোগী, সেখানে ফসল তত ভালো হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম, সেখানে কৃষিকার্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগে বৃষ্টিপাতের অভাবে জলসেচ ব্যবস্থা দ্বারা কৃষিকার্য করা হইলেও ইহা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। তাপমাত্রার উপর কৃষিকার্য নির্ভরশীল। খাদ্য মানুষের প্রধান নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। এই খাদ্য কি প্রকারের হইবে তাহা নির্ভর

করে জলবায়ুর প্রকৃতির উপর। কারণ, পরিপাকশক্তি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল এবং বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের জলবায়ু ধান-উৎপাদনের উপযোগী বলিয়া এবং জলবায়ু ভাত পরিপাকের সহায়ক বলিয়া ভাত বাঙালীর প্রধান খাদ্য। কিন্তু প্রকৃতির শাসন মানুষ কখনো নতমস্তকে মানিয়া লয় নাই। তাই মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক বৃষ্টিপাত হইলে নালা কাটিয়া বাড়তি জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারে, অথবা প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হইলে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে বা শুষ্ক কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে। **জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করিতে** না পারিলেও মানুষ এইভাবে জলবায়ুর প্রভাব কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিয়াছে।

বিভিন্ন ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা
(Types of Farming)

মেরু অঞ্চল ও সাহারা মরুভূমি বাদ দিলে অন্য সর্বত্রই কৃষিকার্য মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের অঙ্গ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্যের প্রকৃতি ও সংগঠনও বিভিন্ন রকমের। প্রাকৃতিক নির্ভরশীলতার দরুন কোথাও গম ও ভুট্টা, কোথাও ধান ও ইক্ষু, কোথাও বা তামাক ও তুলার চাষ হয়। কোথাও কৃষি জীবিকাসত্তাভিত্তিক (Subsistence), কোথাও স্বয়ংসম্পূর্ণ, কোথাও বা উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কৃষি অনুষ্ঠিত হয়। জমির সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভর করিয়া কোথাও ব্যাপক কৃষি, কোথাও বা প্রগাঢ় কৃষি প্রচলিত। কোথাও বা সরকারী মালিকানায়, কোথাও সমবায় প্রথায়, কোথাও বা বাণিজ্যিক ফার্ম পদ্ধতিতে, কোথাও বা ভাগ-চাষীদের দ্বারা চাষ হইয়া থাকে।
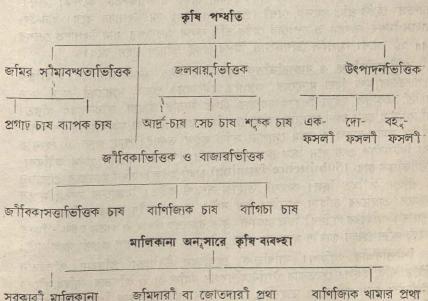
জমির সীমাবদ্ধতাভিত্তিক চাষ—এই প্রকার চাষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ যথা, প্রগাঢ় চাষ ও ব্যাপক চাষ।

(ক) প্রগাঢ় চাষ—দেশের জমির আয়তন এবং তাহার উপর লোকসংখ্যার নির্ভরতা অনুযায়ী চাষের ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। যেখানে লোকসংখ্যার চাপ অধিক, অথচ জমি সীমিত, সেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অল্প জমি হইতে বেশী ফসল উৎপাদন করার চেষ্টা করে। তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলি সমভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় ক্রমহ্রাসমান বিধি (Law of Diminishing Returns) কার্যকরী হয়।

জাপান, চীন, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস্, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশে যেখানে লোকসংখ্যার তুলনায় জমি কম, সেখানে প্রগাঢ় চাষ হয়। প্রগাঢ় চাষে জলসেচ ও জলনিকাশ, উন্নত বীজ ও সার এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে ফসলের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বেশী হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উন্নত ধরনের বীজ ও প্রয়োজনীয় সার, জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়া উন্নত দেশগুলির কৃষি-উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(খ) ব্যাপক চাষ—যেখানে লোকসংখ্যা কম অথচ জমি প্রচুর রহিয়াছে, সেখানে শ্রমিকের স্বল্পতার দরুন ব্যাপক চাষের ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়া ব্যাপক চাষের অনুগামী। বিশেষ করিয়া অস্ট্রেলিয়ায় কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, এমন কি বীজ, সার ও কীটনাশক দ্রব্য ছড়াইবার জন্য বিমান ব্যবহার করা হইয়া থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপক চাষ যে সকল দেশে চালু রহিয়াছে, তাহাদের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন প্রগাঢ় কৃষিপদ্ধতি অনুসরণকারী দেশের তুলনায় অনেক কম। যেমন, ভারত ও পাকিস্তান অপেক্ষা নেদারল্যান্ডস্ হেক্টর-প্রতি অনেক বেশী (প্রায় তিন গুণ) গম উৎপাদন করে। ধান-উৎপাদনে মিশর, জাপান ও স্পেনের হেক্টর-প্রতি ফলন অপরাপর ধান উৎপাদক দেশের প্রায় ১$\frac{1}{2}$ গুণ। কার্পাস উৎপাদনেও মিশর একই ভূমিকা গ্রহণ করে।

জীবিকাভিত্তিক ও বাজারভিত্তিক চাষ—বিবর্তনের ফলে নানাবিধ সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়া মানুষের অগ্রগতি হইতেছে। পূর্বে মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী একত্রিত হইয়া শিকার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিত। কৃষিকার্যের জ্ঞান যখন মানুষের আয়ত্তে আসিল তখন তাহারা ঘর বাঁধিতে শিখিল—আদিম সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম সোপান সৃষ্টি হইল তখনই। শুধু খাদ্য ও স্থানীয় দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনে ক্রমে ক্রমে কৃষিকার্যের রূপান্তর ঘটিল। প্রথম **জীবিকাসত্তাভিত্তিক চাষ (Subsistence farming)** চালু হইল। তখন মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা সীমিত ছিল। অল্পেই তাহারা সন্তুষ্ট হইত। বিজ্ঞানের নূতন নূতন উন্মেষে তাহাদের চাহিদা প্রসারিত হয় নাই। তখন গ্রামীণ সমাজও ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাহিরের পৃথিবী ছিল অজানা। কত রাজত্বের উত্থান ও পতন হইল ; কিন্তু তাহার ক্ষীণ প্রভাব গ্রামীণ সভ্যতার শান্ত জীবনকে কখনও চঞ্চল করিয়া তুলে নাই।

শিল্পবিপ্লব আসিল। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটিতে শুরু হইল। শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকগণ আফ্রিকা ও এশিয়ার আদিবাসীদের স্বাধীনতা হরণ করিল ও তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে নিজ নিজ শিল্পজগৎ কায়েম করিল। এইভাবে একদিকে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি, অন্যদিকে নূতন নূতন

জ্ঞানের উন্মেষে জীবিকাসত্তাভিত্তিক চাষ **বাণিজ্যিক** বা **বাজারভিত্তিক চাষে (Commercial farming)** রূপান্তরিত হইল। আজ শুধু খাদ্যের প্রয়োজন নহে, বাণিজ্যেরও প্রয়োজন। সকল শস্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপযুক্ত হইতে পারে না। গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনায় ধানের বা চাউলের বাণিজ্যের কোনো গুরুত্ব নাই। কেননা, তাহা উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি দেশগুলির মধ্যে বিনিময় হয়। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়ায় ধানের চাষ এখনও জীবিকাসত্তাভিত্তিক। উন্নত বাণিজ্যিক খামারব্যবস্থা এশিয়া ও আফ্রিকায় এখনও বিশেষভাবে প্রচলিত হয় নাই। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ধানের গুরুত্ব অনেক কম।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকগণ ব্যাপক ধনোপার্জনের উদ্দেশ্যে চা, রবার, কোকো, কফি ও তামাকের চারা নিজ নিজ উপনিবেশে রোপণ করিয়া বাগান বা **বাগিচা চাষ (Plantation farming)** শুরু করে। ইহাদের উদ্দেশ্য একচেটিয়া বাণিজ্য। এই সকল পানীয় ও উত্তেজক দ্রব্য আজ পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করিবার ফলে শ্বেত ঔপনিবেশিকদের প্রচুর মুনাফা হয়। বাগান ও বাগিচা চাষের বিশেষত্ব এই যে, শস্য বাজারে পাঠাইবার উপযোগী করিবার সামগ্রিক ব্যবস্থা বাগানের ভিতরেই হইয়া থাকে। বাহিরের লোকের অনুপ্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ।

জলবায়ুভিত্তিক চাষ—মৌসুমী বৃষ্টিপাত অঞ্চলে আর্দ্র চাষ চালু আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলস্থিত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক জায়গায় আর্দ্র চাষ প্রচলিত। ধান, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ এই ধরনের চাষের অধীন।

বৃষ্টিপাত যেখানে কম সেখানে জলসেচের উপর কৃষি নির্ভরশীল। এই চাষকে **সেচ চাষ** বলা হয়। মিশরের নীল নদের অববাহিকা, উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি উপত্যকা এবং মধ্য এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে এই ধরনের চাষ দেখা যায়। গম ও তুলা উৎপাদন এই চাষপদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। যেখানে বৃষ্টিপাত কম, সেখানে **শুষ্ক চাষ** প্রথা চালু আছে। এই প্রথায় মাটির নীচে বীজ বপন করা হয়। আবার বীজ-বপনের পর ভিজা মাটি দিয়া উহা ঢাকা হয়। রাই, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে চাষ হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কয়েকটি উন্নত দেশে **মিশ্র কৃষি-পদ্ধতি (Mixed Farming)** চালু রহিয়াছে। শস্য উৎপাদন ও পশুপালন একই সংগে হইয়া থাকে। কৃষিক্ষেত্র হইতে খড় ও অন্যান্য মনুষ্যখাদ্যের অনুপযোগী জিনিস পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; ভারতের দাক্ষিণাত্যে (কেরালা ও তামিলনাড়ু) ধান্য-ক্ষেত্রে মৎস্য চাষও হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানী, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডে মিশ্র কৃষিপদ্ধতিতে চাষ হয়। ভারতেও এই ধরনের চাষ প্রয়োজন।

উৎপাদনভিত্তিক চাষ—যে জমিতে বৎসরে নির্দিষ্ট একটিমাত্র ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাকে **একফসলী কৃষি-ব্যবস্থা (One-crop Farming)** বলে। জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য কারণে কোন কোন জমিতে এই কৃষি ব্যবস্থা লাভজনক। যুক্তরাষ্ট্রের তুলা, ব্রাজিলের কফি, ভারতের চা এবং কিউবার ইক্ষু-চাষ এই প্রকার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেশের কৃষক এইপ্রকার কৃষিকার্যে বিশেষজ্ঞ হয় ; কিন্তু একটি মাত্র ফসলের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই ফসলের স্বাভাবিক চাহিদা কমিয়া গেলে কৃষকের শস্য অবিক্রীত থাকে। ইহাতে কৃষকের আর্থিক দুর্গতির সীমা থাকে না।

যে ব্যবস্থায় জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল ফলে এবং দুই রকম ফসল উৎপন্ন হয় তাহাকে **দো-ফসলী কৃষি ব্যবস্থা** বলে। যেমন, ভারতের অনেক স্থানে জমিতে ধান প্রধান ফসল এবং বর্ষাকালে বৎসরে একবার উহা চাষ হয়। শীতকালে ঐ জমিতেই যে কোনো এক প্রকার রবিশস্যের চাষ হইয়া থাকে।

যে জমিতে বৎসরে বিভিন্ন ঋতুতে বহুবার ফসল ফলে, তাহাকে **বহুফসলী জমি** বলে। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে চাষপ্রথার উন্নতি ঘটিয়াছে ; উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে বৎসরে একই জমিতে একই ফসল একাধিকবার এবং অন্যান্য ফসলও এক বা একাধিকবার ফলান যাইতেছে। ইহাতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে একই জমিতে বৎসরে একাধিকবার ধান চাষ হইতেছে এবং ঐ জমিতেই কোনো এক প্রকার রবিশস্য ফলিতেছে।

কোনো কোনো দেশে একই জমিতে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপন্ন করা হয়। জাপানে একসঙ্গে একই জমিতে ২/৩ রকমের ফসল উৎপাদন কর হয়। চাষ-আবাদ করিয়া বাকী সময় পশুপালনের কাজে চাষীরা সময় কাটায়। ইহাতে চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের কোনো কোনো অংশেও একই জমিতে ২/৩ রকম ফসল উৎপন্ন হয়।

মালিকানা অনুসারে কৃষি-ব্যবস্থা—বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের মালিকানায় বিভিন্ন রকম চাষের ব্যবস্থা দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশে বা উন্নতিশীল দেশে সরকারী মালিকানায় বহু জমিতে চাষ হয়। উন্নতিশীল ধনতান্ত্রিক দেশে জমিদারী বা জোতদারী প্রথায় চাষ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশাল ধনতান্ত্রিক দেশে বাণিজ্যিক খামার প্রথায় চাষ হয়।

ফসলের শ্রেণীবিভাগ

কৃষিজাত সম্পদকে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) খাদ্যশস্য (Food crops) ও বাণিজ্যিক শস্য (Commercial crops)।
দুই প্রকার শস্যকে আবার নিম্নলিখিত উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ
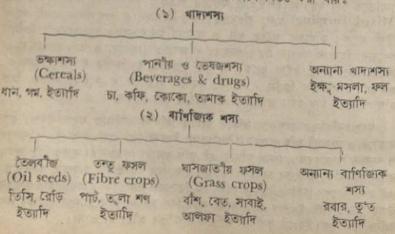
আলোচনার সুবিধার জন্য প্রধান এই দুই বিভাগকে ভিত্তি করিয়া নিম্নে উল্লেখযোগ্য শস্যগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল ঃ

খাদ্যশস্য (Food Crops)

ধান (Rice)

চীন, ভারত ও মিশরীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত ধান বা চাউলের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শোনা যায়, আর্যদের অনুপ্রবেশ করার পূর্বেও ভারতের আদিম অধিবাসীরা চাউলের ব্যবহার জানিত।

ধান মৌসুমী অঞ্চলের ফসল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় ইহা প্রধান খাদ্য হিসাবে প্রচলিত।

ধান শ্রেণীভেদে উচ্চভূমি এবং নিম্নভূমির ফসল। উচ্চভূমির ধান আর্দ্র এবং শীতল জলবায়ুতে হইয়া থাকে। (১) জাপোনিকা (Japonica) ধান উচ্চভূমিতে এবং (২) ইন্ডিকা (Indica) ধান নিম্নভূমিতে হইয়া থাকে।

ধানের ব্যবহার Uses of Rice—এশিয়াবাসীরা অধিকাংশ **জীবিকাসত্তাভিত্তিক (Subsistence Farming) চাষ** করে অর্থাৎ স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ধানের চাষ করা হয়। এইজন্য আন্তর্জাতিক বাজারে গমের ন্যায় ধানের বিশেষ গুরুত্ব নাই। ধান এশিয়াবাসীদের প্রধান খাদশস্য হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও ইহার দ্বারা শ্বেতসার ও মদও তৈয়ারি করা হয়। ধান হইতে খই, মুড়ি, চিড়া, চাউল প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। ধানের খড় হইতে ঘরের ছাউনি, দড়ি, গদি, টুপি ও চটি তৈয়ারি হয়। ধানের তুষ সিমেন্টের সহিত মিশ্রিত করিয়া শব্দ-নিরোধক দেওয়াল বা গৃহ তৈয়ারি হয়। তাহা ছাড়া কুড়া ও খড় উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। পূর্বে চাউলের লেনদেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের অনুপ্রবেশের ফলে চাউলের আন্তর্জাতিক বাজার প্রসারলাভ করিয়াছে।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—এখনও প্রকৃতির খেয়াল-খুশির উপর ধানের উৎপাদন নির্ভরশীল। ধানচাষের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ১৬° সেঃ হইতে ২৭° সেঃ **উত্তাপ** এবং ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ধানচাষের জন্য প্রয়োজন। সময়োপযোগী অধিকতর বৃষ্টিপাত হইলেও ক্ষতি হয় না। ফসল কাটার সময় শুষ্ক আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন; বৃষ্টি হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ধান রোপণের জন্য ও জমি তৈয়ারি করিবার জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, চারাগাছগুলি বীজতলা হইতে তুলিয়া লইয়া কৃষিক্ষেত্রে রোপণ, ফসল কাটা প্রভৃতি কার্যে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন।

নদী-উপত্যকায় **পলিমাটিতে** ধান ভাল জন্মে। জল ধরিয়া রাখিবার উপযুক্ত কাদামাটি ধানচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী-উপত্যকায় পলিময় অঞ্চলে ধানের চাষ হয়।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (Principal Growing areas)—এশিয়ার মৌসুমী জলবায়ুযুক্ত নদী-উপত্যকায় উপরিউক্ত চাষের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান থাকায় পৃথিবীর মোট ধান উৎপাদনের ৯০ শতংাশ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা উপত্যকা, চীনের ইয়াংসি কিয়াং ও সিকিয়াং উপত্যকা, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী উপত্যকা প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান-উৎপাদক অঞ্চল।

পৃথিবীর মোট ধান উৎপাদন—৪৬ কোটি ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন
(১৯৮৪)

চীন	১৭ কোটি	৮৩ লক্ষ মেঃ টন			ভিয়েতনাম	১ কোটি ৪৩ লক্ষ মেঃ টন			
ভারত	৯ „	২৫ „	„	„	ব্রাজিল	৯২	„	„	„
ইন্দোনেশিয়া	৩ „	৭০ „	„	„	ফিলিপাইনস্	৮৩	„	„	„
বাংলাদেশ	২ „	১০ „	„	„	দঃ কোরিয়া	৭৭	„	„	„
থাইল্যান্ড	১ „	৭২ „	„	„	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৬৪	„	„	„
জাপান	১ „	৪৮ „	„	„	উঃ কোরিয়া	৫৪	„	„	„
ব্রহ্মদেশ	১ „	৪৪ „	„	„	পাকিস্তান	৫২	„	„	„

(F. A. O. Monthly Bulletin, December, 1984 সংখ্যা হইতে গৃহীত)।

চীন (China)—ধান উৎপাদনে চীনের স্থান পৃথিবীতে **প্রথম**। ইয়াংসি কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকায় ইহার চাষ হইয়া থাকে। চীনের পার্বত্য অঞ্চলেও ধানের

পৃথিবীর ধান-উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

চাষ হয়। এই দেশে কমিউন প্রথায় চাষ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে হেক্টর-প্রতি ফলন ভারতের তুলনায় বেশী। ১০০ কোটি লোককে খাওয়াইবার পরেও উদ্‌বৃত্ত থাকায় এই দেশ চাউল রপ্তানি করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। দক্ষিণ চীনে ও মধ্য চীনে ইয়াংসি কিয়াং

নদীর উপত্যকায় অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়। সাংহাই, ক্যান্টন প্রভৃতি শহরে ধান সংগ্রহকেন্দ্র রহিয়াছে।

ভারত (India)—ধান উৎপাদনে ভারত **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। বর্তমানে উন্নত ধরনের তাইচুং, ইরি প্রভৃতি বীজ ব্যবহারে অনেকক্ষেত্রে ধানের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত চিরকালই ঘাটতি দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল। ১৯৭৭-৭৮ সালেও চাউল আমদানির জন্য ব্যয় করিয়াছিল ১ কোটি টাকা। বর্তমানে ভারত চাউল রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতে ৪ কোটি হেক্টর জমিতে ধান-চাষ হয়। এই দেশের আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, উত্তর প্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবরে ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। উত্তর প্রদেশে দেরাদুন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান উৎপন্ন হয়।

ইন্দোনেশিয়ার জাভা অঞ্চলে ও অন্যান্য দ্বীপে যথেষ্ট পরিমাণে ধান উৎপন্ন হইতেছে। অধুনা এই দেশ ধান-উৎপাদনে পৃথিবীতে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে।

বাংলাদেশ (Bangladesh) বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চাউল এবং এখানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। বরিশাল, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, পূর্ব দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা ধানচাষের প্রধান কেন্দ্র। ধান-উৎপাদনে বর্তমানে বাংলাদেশ পৃথিবীতে **চতুর্থ স্থান** অধিকার করে।

জাপান (Japan)—জাপানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হইলেও এখনও কোনো কোনো বৎসর কোরিয়া হইতে চাউল আমদানি করিতে হয়। দক্ষিণ জাপান ধানচাষের প্রধান কেন্দ্র। ধান উৎপাদনে এই দেশের **স্থান ষষ্ঠ**।

ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর উপত্যকায়, থাইল্যান্ডে, ব্রাজিলে, ভিয়েতনামে, কোরিয়ায়, ফিলিপাইনসে, **ইন্দোচীনের** মেকং ব-দ্বীপে, **ইটালির** পো নদীর উপত্যকায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি উপত্যকায় ও ক্যালিফোর্নিয়ায় ধানচাষ হইয়া থাকে।

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—প্রধান প্রধান উৎপাদক দেশগুলির জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় উহারা রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না।

চাউলের আমদানি-রপ্তানি—১৯৮৩

রপ্তানিকারক দেশ		আমদানিকারক দেশ	
থাইল্যান্ড	৩৫·৩৪ লক্ষ মেঃ টন	ইন্দোনেশিয়া	১১·৬৯ লক্ষ মেঃ টন
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২৩·৮৫ „ „ „	নাইজেরিয়া	৭·০০ „ „ „
পাকিস্তান	১২·৯৯ „ „ „	ইরান	৬·৭৫ „ „ „
চীন	১০·৮৭ „ „ „	ইরাক	৪·৪০ „ „ „
ব্রহ্মদেশ	৮·৪২ „ „ „	হংকং	৪·০২ „ „ „
ইটালি	৫·৪৭ „ „ „	সৌদি আরব	৪·০০ „ „ „
জাপান	৩·২৯ „ „ „	ব্রাজিল	৩·২২ „ „ „
ভারত	১·৬৫ „ „ „	দঃ কোরিয়া	২·০০ „ „ „
পৃথিবী	১১৯·০৪ „ „ „	পৃথিবী	১১৮·৩৫ „ „ „

(F. A. O. Monthly Bulletin, September, 1984 সংখ্যা হইতে গৃহীত।)

পৃথিবীর মোট চাউল উৎপাদনের শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ রপ্তানি বাণিজ্যে আসে। সেইজন্য ছোট ছোট উৎপাদনকারীকে রপ্তানির দায়িত্ব লইতে হয়। স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া ১৯৮৩ সালে থাইল্যান্ড চাউল রপ্তানিতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা না থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাউল রপ্তানিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই দেশ এই বৎসর চাউল রপ্তানিতে দ্বিতীয় এবং পাকিস্তান তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া চীন, ইটালি, ব্রহ্মদেশ, কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম ও মিশর প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। কারণ এই সকল দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে ধানের উৎপাদন বেশী। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে দঃ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, নাইজেরিয়া, ইরান সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, জাপান, মালয়েশিয়া ও হংকং উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের কোনো কোনো দেশ কিছু কিছু চাউল আমদানি করে। ১৯৮৩ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মোট ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার মেঃ টন চাউল রপ্তানি করে।

গম (Wheat)

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে গম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। বহু যুগ হইতেই মানুষ এই শস্যের ব্যবহার জানিত। প্রাচীন যুগেও গমের নানা ব্যবহারের যথাযথ প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পাইয়াছেন। ইউরোপেই প্রথম ইহার চাষের সংবাদ পাওয়া যায়। কলম্বাসের সময়ে উভয় আমেরিকাতে গমের চাষ অজানা ছিল। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রচেষ্টায় সেখানে গমের চাষ শুরু হয়। আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ এবং যান্ত্রিকীকরণের ফলে গম-চাষ বর্তমানে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত চাষের উজ্জ্বল উদাহরণ।

গমের ব্যবহার (Uses of Wheat)—গম পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। শীতপ্রধান দেশের মানুষ সাধারণতঃ গম খায়। গমে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট উভয়ই বিদ্যমান। মানুষ ইহাকে আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতে পরিবর্তিত করিয়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। রুটি, পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি গম হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া শ্বেতসার, গ্লুকোজ, মাড়, আঠা প্রভৃতি ইহা হইতে প্রস্তুত হয়। বোর্ড, মোড়কের কাগজ, শক্ত বা হাল্কা টুপি প্রস্তুত করিবার কাঁচামাল হিসাবেও গমের খোসা ব্যবহৃত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of Growth)—হিমোষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে শুষ্ক কৃষি-ভিত্তিক গমের চাষ হইয়া থাকে। গমের বিশেষত্ব এই যে, ইহা মৃত্তিকা অপেক্ষা জলবায়ুর উপর অধিক নির্ভরশীল। ভারী দো-আঁশ মাটি ও কাদামাটিতে গমের চাষ ভাল হয়। অনেক ক্ষেত্রে অরণ্য মৃত্তিকায় বা মরুভূমির প্রান্তদেশে জলসেচ অঞ্চলেও গমের চাষ হয়। ঢেউখেলানো ঢালু জমিও গমচাষের পক্ষে উপযোগী। ইহা শুধু জলনিকাশের জন্য উপযুক্ত নহে—ট্রাক্টর, হারভেস্টার (Reaper & Hervester & Sower Combined) প্রভৃতি চালনার পক্ষেও উপযুক্ত।

গমচাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র হইতেছে উত্তর গোলার্ধের ২০° হইতে ৬০° উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের ২০° হইতে ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের দেশগুলি। গম-উৎপাদনের জন্য ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং অন্ততঃ ১৪° সেঃ উত্তাপের প্রয়োজন। সোভিয়েত রাশিয়া ও কানাডায় বৈজ্ঞানিক উন্নতির কল্যাণে উপরিউক্ত উত্তাপ ও জলবায়ুর সীমা

শুধু অতিক্রম করা হয় নাই, চাষের সময়ও হ্রাস করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফসল হওয়া সত্ত্বেও কৃষিবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে জলবায়ুর প্রভাব অতিক্রমে কিছুটা সমর্থ হইয়াছে।

গমচাষের প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ শীতল ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং ফসল কাটিবার সময় উষ্ণ আবহাওয়া ও সূর্যালোক প্রয়োজন হয়। তুষারপাত গমচাষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। অবশ্য বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া বরফের মধ্যে অংকুরোদ্‌গম ক্ষমতাসম্পন্ন সংকর বীজ উদ্ভাবন করিয়া গমচাষের ক্ষেত্রে নূতন বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। অনেকক্ষেত্রে চাষের সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ২০০ দিনের পরিবর্তে সোভিয়েত রাশিয়া ও কানাডায় ১২০-১৫০ দিনে ফসল ফলানো সম্ভব হইয়াছে।

গাছ জন্মাইবার সময় অন্ততঃ তিন মাস জমিতে বরফ পড়া গমচাষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। গমচাষের জন্য অনুন্নত দেশে প্রচুর সুলভ শ্রমিক দরকার। কারণ, চাষের সকল কাজই এখানে হাতে করিতে হয়। কিন্তু উন্নত দেশে ট্রাক্টর ও ফসল কাটিবার যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা মানুষের শ্রম বহুলাংশে লাঘব করা হইয়াছে।

যে সকল দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করা হয় সেখানে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার বাড়িয়াছে। অনুন্নত দেশে এখনও পুরাতন প্রথায় চাষ আবাদ করায় হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার অনেক কম। নেদারল্যান্ডসে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার ১৫০ বুশেল, ডেনমার্কে ১৩৮ বুশেল, ব্রিটেনে ১০৪ বুশেল, ফ্রান্সে ৬৫ বুশেল, ইটালিতে ৬০ বুশেল এবং ভারতে মাত্র ৩৮ বুশেল (১ বুশেল প্রায় ২৭ কিলোগ্রামের সমান।)

সাধারণতঃ দুই প্রকার গমের চাষ হয়—**শীতকালীন গম (Winter wheat)** ও **বাসন্তিক গম (Spring wheat)**। কানাডা, সোভিয়েত রাশিয়া ইত্যাদি শীতপ্রধান দেশে শীতকালে তুষারপাত হওয়ায় এখানে বসন্তকালে মাত্র ৯০ দিনের মধ্যে Vernalisation নামক প্রথায় গমের চাষ হইয়া থাকে। এইজন্য এখানকার গমকে বাসন্তিক গম বলা হয়। উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতকাল গমচাষের উপযোগী। সেইজন্য ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে শীতকালে গমের চাষ হয়।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (Principal Growing areas)—উৎপাদনের অঞ্চলগুলি দুই প্রকার ; কয়েকটি দেশ শুধু স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য গমের চাষ করে। যেমন, ভারত, ব্রিটেন ইত্যাদি। অনেক দেশ প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানি করিবার জন্যই গমচাষ করে। যেমন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি।

পৃথিবীর মোট গম-উৎপাদন—৫১ কোটি ২৪ লক্ষ মেট্রিক টন

(১৯৮৪)

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
চীন	৮ কোটি ৬০ লক্ষ মেঃ টন	ফ্রান্স	৩ কোটি ২৫ লক্ষ মেঃ টন
সোঃ রাশিয়া	৭ ,, ৬০ ,, ,, ,,	কানাডা	২ ,, ১১ ,, ,, ,,
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৭ ,, ০০ ,, ,, ,,	অস্ট্রেলিয়া	১ ,, ৭৭ ,, ,, ,,
ভারত	৪ ,, ৫১ ,, ,, ,,	তুরস্ক	১ ,, ৭৩ ,, ,, ,,
		পাকিস্তান	১ ,, ০৯ ,, ,, ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, December, 1984 হইতে সংগৃহীত।)

চীন—গম উৎপাদনে চীন (China) **প্রথম স্থান** অধিকার করিয়াছে। চীনে বিপ্লবের পূর্বে গমের চাষ মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না ; বিপ্লবের মাত্র ১৪ বৎসরের মধ্যে ১৯৬২ সালে চীন **তৃতীয় স্থান**, ১৯৮৩ সালে **দ্বিতীয় স্থান** দখল করে এবং ১৯৮৪ সালে **প্রথম স্থান** দখল করিয়াছে। "কমিউন"-এর মারফত সমাজতান্ত্রিক পন্থায় এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। উত্তর চীনে হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় প্রচুর গমের চাষ হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় চীনের পক্ষে গম রপ্তানি করা সম্ভব নহে।

সোভিয়েত রাশিয়া—গম উৎপাদনে পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়ার (U.S S.R) **স্থান দ্বিতীয়**। বিপ্লবের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর মাত্র শতকরা ১০ ভাগ গম উৎপন্ন করিত ; কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৭ ভাগ উৎপন্ন করে। ইহার মূলে রহিয়াছে ঐ দেশের সরকারের ঐকান্তিকতা, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা। উত্তরাঞ্চলে বসন্তকালীন ও দক্ষিণাঞ্চলে শীতকালীন গম উৎপন্ন হয়। ডন উপত্যকা, ভল্গা অঞ্চল, ইউরাল অঞ্চল, কাজাকস্তান, মস্কো ও গোর্কী গমচাষের জন্য বিখ্যাত। অন্যান্য স্থানেও অল্প অল্প গমচাষ হয়। কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত খারসন ও ওডেসা বন্দর মারফত এই দেশের গম রপ্তানি হইয়া থাকে।
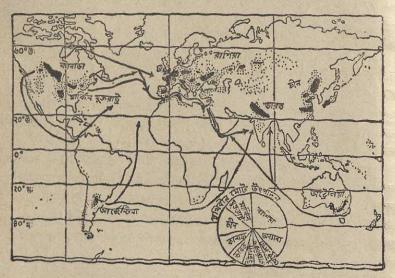
পৃথিবীর গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

সাইবেরিয়া অঞ্চলে গমচাষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—পৃথিবীতে গম-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A) **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে। কিছুকাল পূর্বেও ইহার স্থান ছিল প্রথম। কিন্তু বর্তমানে চীন সেই স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এই বৎসর দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়াছে সোভিয়েত রাশিয়া। মন্টানা, মিনেসোটা, উত্তর ডাকোটা, কানসাস্ নেব্রাস্কা, মিসৌরি

প্রভৃতি প্রদেশগুলি গমচাষের জন্য বিখ্যাত। মিনেসোটা ও উত্তর ডাকোটা অঞ্চলের লোহিত নদীর উপত্যকায় (Red River Valley) এত গম উৎপন্ন হয় যে, ইহাকে 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' (Bread Basket of the World) বলা হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অধিক হওয়ায় প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি হয়। নিউইয়র্ক বন্দর মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ গম রপ্তানি হইয়া থাকে।

ভারত—এই দেশের উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর গম উৎপন্ন হয় ; ১৯৬৯-৭০ সালে পাঞ্জাবে 'গম বিপ্লব' হওয়ার ফলেই ভারত বর্তমানে গম-উৎপাদনে পৃথিবীতে **চতুর্থ স্থান** অধিকার করিয়াছে।

ফ্রান্সে প্যারিস-উপত্যকায় ও **তুরস্কে** গমের চাষ হয়। ফ্রান্স গম উৎপাদনে **পঞ্চম স্থানের** অধিকারী।

কানাডা—গম উৎপাদনে কানাডা (Canada) বর্তমানে **ষষ্ঠ স্থান** অধিকার করিলেও গম-রপ্তানিতে এই দেশ দ্বিতীয় **স্থান** অধিকার করিয়াছে। ম্যানিটোবা, শাসকাচুয়ান ও আলবার্টা কানাডার শতকরা ৯২ ভাগ গম উৎপন্ন করে। গমের বিখ্যাত বাজার উইনিপেগ। এখান হইতে মন্ট্রিল, হ্যালিফাক্স, ভ্যাঙ্কুভার প্রভৃতি বন্দর মারফত গম রপ্তানি করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং নদীর উপত্যকায় গম জন্মে। এই দেশ গম উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

আর্জেন্টিনার পাম্পাস্ সমভূমি, **ইটালির** পো-উপত্যকা, **নিউ জিল্যান্ডের** ক্যান্টারবেরী সমভূমি, **পাকিস্তানের** সিন্ধুনদের উপত্যকা ইত্যাদি গমচাষের জন্য বিখ্যাত।

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—বর্তমানে গমের রপ্তানি বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **প্রথম স্থান** অধিকার করিয়াছে। গম-রপ্তানিতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে কানাডা ; ইহার মোট উৎপাদনের শতকরা ৫১ ভাগ রপ্তানি হয় এবং মাত্র ৪৯ ভাগ দেশে ব্যবহৃত হয় বা মজুত থাকে। এই দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। সেইজন্য গমের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক বেশী। ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশ প্রচুর **গম রপ্তানি** করিয়া থাকে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে জনসংখ্যা উৎপাদনের তুলনায় অত্যধিক। সেইজন্য ব্রিটেন, ইটালি, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচুর গম আমদানি হয়। এশিয়ার বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও জাপান গম আমদানি করিয়া থাকে।

পৃথিবীর মোট গম রপ্তানি—১০ কোটি ০৪ লক্ষ মেট্রিক টন

(১৯৮৩)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৩ কোটি ৮৪ লক্ষ মেঃ টন	আর্জেন্টিনা	১ কোটি ০১ লক্ষ মেঃ টন
কানাডা	২ ,, ১৮ ,, ,, ,,	অস্ট্রেলিয়া	৬৪ ,, ,, ,,
ফ্রান্স	১ ,, ৩৪ ,, ,, ,,	সোঃ রাশিয়া	১৮ ,, ,, ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, September, 1984 হইতে সংগৃহীত)

গম ও ধান-চাষের তুলনা

পৃথিবীতে যত প্রকারের খাদ্যশস্য মানুষ উৎপাদন ও ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি **ধান** ও **গম**। পৃথিবীতে ইহাদের উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় সমান হইলেও ইদানীং গমচাষের জমির পরিমাণ ও গমের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

গম ও ধানচাষের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্য যে জমিতে গম উৎপন্ন হয়, সেখানে ধান উৎপন্ন হয় না। উভয় শস্যই পরস্পরের সম্পূরক। এই দুইটি শস্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যথা ঃ

ধান ও গমের তুলনা

ধান	গম
১। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের **অশ্বেতকায়** অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।	১। শীতপ্রধান দেশের **শ্বেতকায়** অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।
২। চাষের প্রথমাবস্থায় **প্রচুর জল** প্রয়োজন। এইজন্য বর্ষাকালে ইহার চাষ হয়।	২। চাষের প্রথমাবস্থায় **অল্প জলের** প্রয়োজন হয়। এইজন্য শীতকালে ও বসন্তকালে ইহার চাষ হয়।
৩। ধানচাষের জন্য উর্বর **পলিমাটি** ও **কাদামাটি** প্রয়োজন।	৩। গমচাষের জন্য ভারী **দো-আঁশ** বা **হাল্কা কাদামাটি** প্রয়োজন।
৪। ধানচাষের জন্য প্রচুর **বৃষ্টিপাত** (১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ) প্রয়োজন।	৪। গমচাষের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প **বৃষ্টিপাত** (৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ) প্রয়োজন।
৫। ধানের জন্য **নীচু সমতলভূমি** প্রয়োজন, যাহাতে ধানগাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।	৫। গমের **জন্য** জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত ঢালু জমি প্রয়োজন।
৬। ধানের জন্য ২৫° সেঃ **উত্তাপ** হইলেও চলে।	৬। গমের জন্য ১৪° সেঃ **উত্তাপ** হইলেও চলে।
৭। ধানচাষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার **ফল** বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই, ফলে এই চাষে **যান্ত্রিকীকরণ** ব্যবস্থা চালু হয় নাই।	৭। গমচাষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার **ফল** বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ফলে এই চাষে **যান্ত্রিকীকরণ** হইয়াছে।
৮। ধানচাষে প্রচুর **শ্রমিক** প্রয়োজন।	৮। উন্নতিশীল দেশে যন্ত্রের সাহায্যে গম চাষ হওয়ায় কম **শ্রমিক** প্রয়োজন।
৯। ধান ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের **প্রধান খাদ্যশস্য**।	৯। গম নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের **প্রধান খাদ্যশস্য**।
১০। ধানের **হেক্টর-প্রতি** উৎপাদন বেশী।	১০। গমের **হেক্টর-প্রতি** উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম।

ধান	গম
১১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ধানের স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নে (২·৫%)।	১১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গমের স্থান উচ্চ (২০%)।
১২। ধান উৎপাদনে এশিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৯০%)।	১২। ইউরোপ ও আমেরিকা গম উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৬০%)।
১৩। এক কিলোগ্রাম চাউল হইতে ৩,৬২৮ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য।	১৩। এক কিলোগ্রাম গমের ময়দা হইতে ৩,৪৩৮ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। ইহা চাউলের তুলনায় কঠিনপাচ্য।
১৪। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প।	১৪। আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প।

পৃথিবীতে কয়েকটি দেশ আছে যেখানে ধান ও গম উভয়ই উৎপাদিত হয়; যথা—ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ইত্যাদি।

চা (Tea)

চা মৌসুমী অঞ্চলের উচ্চভূমির ফসল। বিজ্ঞানীরা চা-গাছের নামকরণ করিয়াছেন থিয়া সাইনেনসিস (Thea Sinensis)।

চীনদেশেই পানীয় এবং ঔষধ হিসাবে চায়ের ব্যবহার সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ যখন চীনদেশে যান, তখনই এই অত্যাশ্চর্য পানীয় সম্পর্কে তিনি অবহিত হন।

সাধারণতঃ দুই ধরনের চা-গাছ দেখা যায়—(১) চীনজাতীয় ও (২) আসাম-জাতীয়। চীনজাতীয় গাছের পাতা স্বাদ ও গন্ধের জন্য খ্যাত এবং আসামজাতীয় গাছের পাতা রংয়ের জন্য বিখ্যাত। দুই ধরনের চা-পাতার উন্নত সংমিশ্রণের উপরই ইহার আন্তর্জাতিক মূল্য নির্ধারিত হয়। চা-এর রং ও গুণাগুণ অনুসারে ইহাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। যথা, Black Tea, Green Tea, Leap Tea, Brick Tea, Dust Tea ইত্যাদি।

ব্যবহার (Uses)—চা বর্তমান জগতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক ব্যবহৃত পানীয়। অন্যান্য পানীয় অপেক্ষা ইহার দাম কম বলিয়া অধিকাংশ দেশের লোক এই পানীয় ব্যবহার করে। চা-এর বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় উহা সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া ক্যাফিন (Caffeine) নামক একপ্রকার ক্ষার পদার্থ চা হইতে প্রস্তুত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of Growth)—সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলের ঢালে চা গাছের চাষ হয়। কেননা চা-বাগানে জল জমিলে চা-গাছ নষ্ট

হইয়া যায়। জলনিকাশী পাহাড়ের ঢালে তাই চা-বাগান দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবে চা-গাছ ৫/৭ মিটার উঁচু হইতে পারে। কিন্তু সর্বদা ছাঁটিয়া তাহাকে ১ মিটারের মধ্যে রাখা হয়। এইভাবে ছাঁটিবার ফলে নূতন পাতা বাহির হয়; এবং এই নূতন পাতাই পানীয় চা-এর উপযোগী।

চা-চাষের জন্য ২৭° সেঃ উত্তাপ এবং ১৫০ সেঃ মিঃ হইতে ২৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এই পরিমাণ বৃষ্টিপাত মৌসুমী অঞ্চলে হয় বলিয়াই এই অঞ্চলে অধিকাংশ চা উৎপন্ন হয়। পাহাড়ী মাটিতে যৌগিক লৌহ মিশ্রিত মৃত্তিকায় চা-গাছ ভাল হয়। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে নূতন পত্র এবং অংকুরোদ্গম হয়।

চা-বাগানের ভিতরেই পণ্য বাজারজাত করিবার সকল ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে; অর্থাৎ চা-এর পাতা শুকানো ও সেঁকা, গুণাগুণ-ভিত্তিক পাতা বাছাই করা, বাক্সবন্দী করা ইত্যাদি সকল কাজই বাগানের ভিতরে হইয়া থাকে। নরম এবং ক্ষুদ্র অঙ্গুলি চা-এর পত্রচয়নে বিশেষ উপযোগী; এইজন্য চা-পাতা চয়নে অধিকাংশক্ষেত্রে নারী শ্রমিক ব্যবহার করা হয়। বর্ষার পর চয়ন-কার্য শুরু হয়। ভারতবর্ষে মাসে দুইবার করিয়া পাতা তোলা হয়। শ্রীলংকায় চা-পাতা তোলা হয় সপ্তাহে দুইবার।

চা-গাছ হইতে পাতা তুলিবার পর উহা ব্যবহারের উপযোগী করার প্রণালী জটিল। প্রথমে চা-পাতা আনিয়া বন্ধ ঘরে দুইদিন ফেলিয়া রাখা হয়। তাহার পর ঐ পাতা রাসায়নিক দ্রব্যে আর্দ্র করিয়া কয়েক ঘণ্টা গাঁজানো হয়। পরে উত্তপ্ত পাত্রে সেঁকা হয় এবং ঝলসানো পাতা পরে পাকানো হয়। তাহার পর টি টেস্টার (Tea taster) বিভিন্ন পাতার রস পরীক্ষা করিয়া গুণাগুণ বিচার করিলে তাহা বাছাই করা হয় এবং টিন বা বাক্সজাত করা হয়।

প্রক্রিয়ার তারতম্যের ফলে তিন ধরনের চা দেখা যায়। ঝলসানো বা সেঁকা চা কালো হয়। রৌদ্রতাপে শুষ্ক চা-এর রং সবুজ থাকে; সেইজন্য ইহাকে সবুজ চা বলে। আর সোভিয়েত রাশিয়ায় ও তিব্বতে গুঁড়া-চায়ের সহিত মসলা, ভাতের মণ্ড ও মাখন মিশ্রিত করিয়া চাপ দিয়া ইষ্টকের আকারে চা সংরক্ষণ করা হয়; তাহাকে ব্রিক টি বলে।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (Principal Growing areas)—একমাত্র এশিয়ার দেশগুলিতেই প্রধানতঃ চা উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর মোট চা-উৎপাদন—২২ লক্ষ ২৬ হাজার মেঃ টন

(১৯৮৪)

ভারত	৬ লক্ষ ৪৫ হাজার মেঃ টন	কেনিয়া	১ লক্ষ ১৫ হাজার মেঃ টন
চীন	৪ „ ৪৩ „ „ „	তুরস্ক	১ „ ১৫ „ „ „
শ্রীলংকা	২ „ ৩০ „ „ „	সোঃ রাশিয়া	১ „ ৮ „ „ „
ইন্দোনেশিয়া	১ „ ১৫ „ „ „	জাপান	১ „ ২ „ „ „

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত)

ভারত—চা-উৎপাদনে ভারতের স্থান **প্রথম**। ভারতে প্রায় সাত হাজার চায়ের বাগানে ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে চা-এর আবাদ আছে। ভারতের চা রপ্তানির পরিমাণ প্রায়

২ লক্ষ ৩ হাজার মেঃ টন। ভারতের মোট উৎপাদনের ৬০% উৎপন্ন করিয়া আসাম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। চা-বাগিচা শিল্পে এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বেতকায় মালিকগোষ্ঠী বর্তমান। দার্জিলিং-এর (পশ্চিমবঙ্গ) চা স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবী-বিখ্যাত। তাহা ছাড়া জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে চা-বাগান আছে। এখানে মালিকানা বাঙ্গালী ও রাজস্থানীদের হাতে। ত্রিপুরা, হিমাচল প্রদেশ (কাংড়া উপত্যকা), উত্তর প্রদেশ গাড়োয়াল) ও বিহার (রাঁচি) রাজ্যেও চা-বাগান আছে।

দাক্ষিণাত্যে ভারতের মোট চা-উৎপাদনের ১৮% উৎপন্ন হয়। **তামিলনাড়ুর** নীলগিরি, কার্ডামম ও আনামালাই পাহাড়ের ঢালে চা-বাগান রহিয়াছে। **কেরালায়** চা-বাগান বিদ্যমান। কলিকাতায় ও শিলিগুড়িতে চায়ের নীলামঘর রহিয়াছে। চা-এর

পৃথিবীর চা-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ
(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি-রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে।)

বাজার উন্নয়নের কাজে সরকারী সংস্থা 'টি বোর্ড' (Tea Board) ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাইতেছে। ভারতীয় চায়ের প্রধান আমদানিকারক ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস্ ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি।

চীন—দক্ষিণ চীনে চা-বাগানগুলি কেন্দ্রীভূত। সবুজ চা এখানকার বিশেষত্ব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও চীন অংশগ্রহণ করে। চা-উৎপাদনে চীন বর্তমানে **দ্বিতীয় স্থানের** অধিকারী।

শ্রীলংকা—সারা বৎসর বৃষ্টিপাতের সুযোগ পায় বলিয়াই শ্রীলঙ্কায় **সপ্তাহে** দুইবার করিয়া পাতা তোলা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এখানকার হেক্টর-প্রতি উৎপাদন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। চা-উৎপাদনে এই দেশ **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে।

জাপান—দক্ষিণ ও মধ্য জাপানে চা-এর আবাদ রহিয়াছে। জাপানে চা-পানের

পদ্ধতি উন্নত সংস্কৃতির পরিচায়ক। এখানে উন্নত পদ্ধতিতে চা-বাগানগুলি পরিচালিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ চা-বাগান জাভাতে কেন্দ্রীভূত। ভারতের মতোই এই দেশে পর্বতের ঢালে চা-বাগান গড়িয়া উঠিয়াছে। **সোভিয়েত রাশিয়া** চা-উৎপাদনে পৃথিবীতে **সপ্তম স্থান** অধিকার করে। ইহা ছাড়া তুরস্ক, বাংলাদেশ, কেনিয়া, নিয়াসাল্যান্ড, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে অল্প পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়।

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—রপ্তানি বাণিজ্যে ১৯৬৭ সাল হইতে কয়েক বৎসর শ্রীলংকা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারত চা-রপ্তানিতে পুনরায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; শ্রীলঙ্কার স্থান বর্তমানে দ্বিতীয়। তারপর কেনিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, মালাউই, বাংলাদেশ প্রভৃতির স্থান।

ব্রিটেনই সর্ববৃহৎ আমদানিকারক। মাথাপিছু চা-পানের খরচ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইংরেজদের চা-পান জাতীয় জীবনের অঙ্গ—মাথাপিছু ১০ পাউন্ড। অস্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গদের মাথাপিছু চা-এর ব্যবহার ইংরেজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছে (মাথাপিছু ৭ পাউন্ড)। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, পাকিস্তান, হাঙ্গেরী, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইরাক এবং মিশরও চা আমদানি করে।

চা-এর আমদানি-রপ্তানি (১৯৮৩)

(হাজার মেঃ টন)

রপ্তানিকারক দেশসমূহ		আমদানিকারক দেশসমূহ	
পৃথিবী	৯৩০	পৃথিবী	৯০৩
ভারত	২০৯	ব্রিটেন	১৮৪
শ্রীলংকা	১৮৮	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৭৭
কেনিয়া	১০১	সোভিয়েত রাশিয়া	৭৭
চীন	৯২	পাকিস্তান	৭৫
ইন্দোনেশিয়া	৬৯	মিশর	৪০
আর্জেন্টিনা	৪১	ইরাক	৩২
মালাউই	৩৭	পোল্যান্ড	২৬
বাংলাদেশ	৩২	নেদারল্যান্ডস্	২৩
ব্রিটেন	২৯	অস্ট্রেলিয়া	২২

(F. A. O. Monthly Bulletin, September, 1984 হইতে সংগৃহীত।)

কফি (Coffee)

ব্যবহার (Uses)—মানবসভ্যতার ইতিহাসে মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসাবে কফির প্রথম ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, আবিসিনিয়ার কাফা প্রদেশজাত বলিয়াই ইহা কফি নামে অভিহিত; আবার অনেকে বলেন, ইয়েমেনে কফি প্রথমে ভেষজ হিসাবে (Medicinal herb) এবং পরে খাদ্য এবং পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে ইউরোপে ইহা আদৃত হয়। পরবর্তিকালে দক্ষিণ আমেরিকায়

কফি গাছ রোপণ করা হয়। সেই সময় হইতেই দুই আমেরিকায় কফি ধীরে ধীরে চা-এর বাজার দখল করিতে থাকে।

কফি একজাতীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের ফল। এই ফল পাকিলে তাহা শুকাইয়া এবং ভাজিয়া চূর্ণ করা হয়। সেই চূর্ণীকৃত উপাদানই পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—কফি চাষের জন্য যৌগিক লোহ, পটাশ ও নাইট্রোজেন-মিশ্রিত উর্বর জলনিকাশী মৃত্তিকা প্রয়োজন। এই ধরনের মৃত্তিকা সাধারণতঃ লোহিত হয়। পর্বতগাত্রে ও ঢালু জমিতে কফির চাষ ভাল হয়।

চাষের প্রথমাবস্থায় সূর্যকিরণ হইতে চারাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য কফিক্ষেত্রে চারাগুলির পাশে কলাগাছ বা ভুট্টাগাছ লাগানো হয়। কফি-চাষের জন্য ১৫° সেঃ হইতে ৩০° সেঃ উত্তাপ ও ১৭৫ সেঃ মিঃ হইতে ২২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়।

প্রবল বায়ু কফি-গাছের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক; এইজন্য কফিক্ষেত্রে বায়ু প্রতিরোধকারী বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়।

গাছ লাগানোর পর অধিক বৃষ্টি হইলে শুঁটি ধরিতে বিলম্ব হয়। কফি-আবাদে প্রতিমাসে সময় উপযোগী বৃষ্টিপাত হইলে গাছ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

কফিগাছ সহজেই কীট দ্বারা নষ্ট হয়। নেমাটোড নামক কীট ইহার শত্রু। বর্তমানে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করিয়া গাছ রক্ষা করা হয়। কফি আবাদের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (Principal Growing areas)—অধিকাংশ কফি-ক্ষেত্র ২০° উঃ ও ২০° দঃ অক্ষরেখার মধ্যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবস্থিত।

পৃথিবীর মোট কফি-উৎপাদন—৫৩ লক্ষ ৯১ হাজার মেট্রিক টন

(১৯৮৪)

ব্রাজিল	১৫ ৪৫ লক্ষ মেঃ টন	এল্ সালভেডর	১'৫০ লক্ষ মেঃ টন
কলম্বিয়া	৭'৮০ ,, ,, ,,	ফিলিপাইনস্	১'৪৫ ,, ,, ,,
ইন্দোনেশিয়া	৩'০০ ,, ,, ,,	গুয়াতেমালা	১'৪০ ,, ,, ,,
মেক্সিকো	২'৫২ ,, ,, ,,	কোস্টারিকা	১ ২৪ ,, ,, ,,
ইথিওপিয়া	২'৪০ ,, ,, ,,	ভারত	১'০৩ ,, ,, ,,
উগান্ডা	২'০৪ ,, ,, ,,	আইভরি কোস্ট	'৮৫ ,, ,, ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত।)

ব্রাজিল (Brazil)—কফি-উৎপাদনে ব্রাজিল প্রথম স্থান অধিকার করে (২৯%)। এক সময়ে ইহা ব্রাজিলের একচেটিয়া ফসল ছিল। সাও পাওলো (Sao Paulo) প্রদেশেই অধিকাংশ কফির চাষ হয়। তাহা ছাড়া রায়ো-ডি-জেনিরো, এস্পিরিটো, পারানা ও মিনাস গেরায়েসে কফির বাগান আছে। একফসলী অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ব্রাজিলকে অনেক সময় কফি-বাজারের মন্দা হেতু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯৭৫ সালে প্রায় ৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে কফি

বাগান (Fazenda) প্রসারিত ছিল। এক একটি বাগানে কমপক্ষে ১ লক্ষ করিয়া কফিগাছ রহিয়াছে। ব্রাজিল সর্বপ্রধান রপ্তানিকারক দেশ। উহার রপ্তানিমূল্য প্রায় ৮০ কোটি ডলার।

নিম্নলিখিত কারণে ব্রাজিল কফি-উৎপাদন ও রপ্তানিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে ঃ

(১) ব্রাজিলে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে কফির একচেটিয়া উৎপাদন এবং ব্যবসায় সম্প্রসারণের কারণ হইল এই যে, ইউরোপ হইতে বহু লোক এখানে বসবাস করিতে আসার ফলে কফি-চাষের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

(২) পূর্ব ব্রাজিলের ঢালু জমিতে কফি-চাষে কৃষি-যন্ত্রাদির ব্যবহার ও রেলপথ-নির্মাণের ফলে এবং একদিকে চাহিদা ও অন্যদিকে বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করার ফলে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে। এই অঞ্চলের বিখ্যাত লালমাটি (Tarra Roxa) কফি-চাষের আদর্শ মৃত্তিকা।
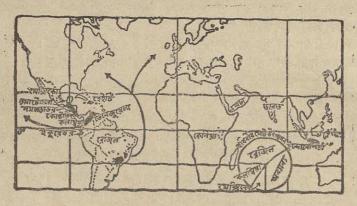
পৃথিবীর কফি-উৎপাদক অঞ্চলসমূহ
(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে।)

(৩) ব্রাজিলে কফি-চাষের সময় অক্টোবর হইতে এপ্রিল মাস। গাছ তখন বৃদ্ধি পায় ও ফল ধরে। প্রচুর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত এবং উত্তাপের ফলে (১৮° সেঃ হইতে ৩৬° সেঃ উত্তাপ এবং ১১২ সেঃ মিঃ হইতে ১৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত) গাছগুলি পূর্ণাঙ্গ হয়, ফলও পুষ্ট হয়। এইরূপ জলবায়ুতে কফি গাছে কীটের আক্রমণ কম হয়। অন্যান্য দেশের মত সকল সময় রৌদ্র ও ঝড় প্রতিরোধকারী দীর্ঘ পত্রবিশিষ্ট গাছ চারিপাশে রোপণের প্রয়োজন হয় না। এখানে রোবাস্টা জাতীয় কফির চাষ হয়। আবার শীতকালে বৃষ্টিপাত কম (৫ সেঃ মিঃ)। সূর্যের আলোকোজ্জ্বল আবহাওয়ায় কফির ফলগুলি সুষ্ঠুভাবে শুকাইয়া ভাজিবার কোনো অসুবিধা নাই। শীতল আবহাওয়ায় কঠোর পরিশ্রমে শ্রমিকদের কোনো অসুবিধা হয় না।

(৪) প্রতিটি কফি-বাগান রেলপথের সহিত যুক্ত। ক্ষেত হইতে কফি গুদামজাত হয় এবং পরে সান্টোস ও রায়ো-ডি-জেনিরো বন্দর মারফত রপ্তানি করা হয়।

(৫) সরকার কর্তৃক স্থাপিত কফি সংরক্ষণ কমিটি (Institute of Permanent Defence of Coffee) আন্তর্জাতিক চাহিদা বিচার করিয়া উৎপাদন ও রপ্তানি ঠিক করে ; ইহাতে আন্তর্জাতিক বাজারে কফির দর ঠিক থাকে।

কলম্বিয়া—কলম্বিয়া পৃথিবীর কফি-উৎপাদন ও রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ কফি এখানে উৎপন্ন হয়। আন্ডিজে করডিল্লেরা অঞ্চলে কফির চাষ হয়। এখানকার অধিকাংশ কফি রপ্তানি হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার **ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর**, মধ্য আমেরিকার **গুয়াতেমালা, এল্ সালভেডর, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো,** আফ্রিকার **আইভরি কোস্ট, অ্যাঙ্গোলা, উগান্ডা, ঘানা, নাইজেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও জায়েরে** এবং এশিয়ার **ভারত ও ইন্দোনেশিয়া** প্রধান কফি-উৎপাদক দেশ। ভারতে উৎপন্ন কফি স্বাদে এবং গন্ধে আন্তর্জাতিক বাজারে সুনাম অর্জন করিয়াছে।

সাধারণতঃ দুই ধরনের কফি দেখা যায়—কফি আরাবিকা (মোচা কফি) এবং কফি রোবাস্টা। আরাবিকা (ইয়েমেন-জাত) কফি সহজেই কীটে আক্রান্ত হয় বলিয়া কফি রোবাস্টার প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন দেশে স্থানীয় জলবায়ু-ভিত্তিক যে কফি উৎপন্ন হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে তাহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন, ফ্রেঞ্চ কফি, মোচা কফি, ব্রাজিলীয় বা রোবাস্টা কফি এবং জাভা কফি।

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—অধিকাংশ কফি-উৎপাদক দেশ অনুন্নত হওয়ায় স্থানীয় চাহিদা কম ; উৎপাদক দেশগুলির অধিকাংশ কফি বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এইজন্য কফির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ। মোচা কফি উচ্চস্তরের। রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও বর্তমানে কফি রপ্তানিতে ব্রাজিলের একচেটিয়া আধিপত্য নাই। আফ্রিকার দেশগুলি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর কফির বাজার দখল করিতেছে। বর্তমানে অ্যাঙ্গোলা, আইভরি কোস্ট, উগান্ডা, এল্ সালভেডর, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য রপ্তানিকারক।

আমদানিকারক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান প্রধান।

ইক্ষু (Sugar Cane)

পৃথিবীতে মোট চিনি উৎপাদনের ৬৮% ইক্ষু হইতে এবং ৩২% বীট হইতে উৎপাদিত হয়। ইক্ষুর আসল মাতৃভূমি ভারত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন সাকারাম্ অফিসিনারাম্ (Saccharum Officinarum)। ভারত হইতে অতীতে পর্যটকদের এবং পরে শ্বেত ঔপনিবেশিকদের কল্যাণে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, আফ্রিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার চাষ প্রচলিত হয়।

ব্যবহার (Uses)—ইক্ষু হইতে প্রধানতঃ চিনি ও গুড় প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া ইক্ষু হইতে রস বাহির করিয়া লইবার পর যে ছোবড়া থাকে, ইহা বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। উহা দ্বারা শব্দরোধক বোর্ড প্রস্তুত করা যায়। সিনেমাগৃহ নির্মাণে ইহা

শব্দরোধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। জ্বালানি হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতে জ্বালানি হিসাবে ইহা ব্যবহার না করিয়া কাগজ শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইলে কাগজ-শিল্পের কাঁচামাল সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত সুরাসার (Alcohol) অনেক শিল্পে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চিনির গাদ হইতে মোম প্রস্তুত করা যায়। ইক্ষু হইতে প্রস্তুত ঝোলা গুড় পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। উন্নত দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর উপজাত দ্রব্য উৎপাদনের ফলে চিনির উৎপাদন মূল্য কমিয়া যায়। বিউটিল, কৃত্রিম রবার, সার ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ইক্ষু হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—ইক্ষু ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এবং জলসেচিত অঞ্চলে ইহার চাষ দেখা যায়। চাষের জন্য ২৭° সেঃ উত্তাপ ও গ্রীষ্মকালে কমপক্ষে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বর্ষাকাল দীর্ঘদিন স্থায়ী (প্রায় ৭-৯ মাস) হওয়ায় ইক্ষুগাছগুলি যথাযথ বাড়িতে পারে। শীতকাল ইক্ষুর রসস্থ এবং পরিণত হইবার সময়। তখন শুষ্ক জলবায়ু প্রয়োজন। কুয়াশা বা তুহিন ইক্ষুচাষের পক্ষে ক্ষতিকর। ২৭° সেঃ-এর নীচে উত্তাপ নামিলে গাছের বৃদ্ধি হয় না এবং ২০° সেঃ-এর কম উত্তাপ হইলে নানাভাবে গাছের ক্ষতি হয়। সমুদ্র উপকূলে ইক্ষুর ফলন ভাল হয়। কেন না, নোনা বাতাস ও নোনা মাটি ইক্ষুর উৎপাদনে সাহায্য করে। বর্তমানে ভারতে ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইক্ষুচাষের জমিতে প্রচুর নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করিতে হয়। ইক্ষু চাষের জন্য চুন ও লবণ মিশ্রিত **দো-আঁশ মাটি** প্রয়োজন।

ইক্ষু-উৎপাদন অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর বেশী নির্ভরশীল। ইক্ষু পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরিবহণ-যোগে চিনির কলে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রে ইক্ষুক্ষেত্রের অভ্যন্তরে বা কাছেই চিনির কল থাকে। কেন না কলে লইয়া যাইতে বিলম্ব হইলে ইক্ষুর রস শুকাইয়া যায় ও চিনির পরিমাণ কমিয়া যায়। ইক্ষু-চাষের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ইক্ষুর উৎপাদনের এবং চিনি তৈয়ারির যাবতীয় কার্যে উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি উপত্যকায় ইক্ষু উৎপাদনে ব্যাপকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে।

ইক্ষু-চাষে এবং ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনে নানাবিধ সমস্যা দেখা যায়। ইক্ষু-চাষের ফলে ভূমির উর্বরতা দ্রুত নষ্ট হয়। সেইজন্য সারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। বহু দেশে দরিদ্র চাষী এই সার ক্রয় করিতে পারে না। ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় গুড়-উৎপাদন। ভারতে গুড় উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুরস ব্যবহৃত হওয়ায় চিনির উৎপাদন ব্যাহত হয়। গুড়ের মূল্য চিনির অনুপাতে বেশী হইলে চিনির উৎপাদন বহুলাংশে কমিয়া যায়। কৃষকগণের সঙ্গে অনেক সময় চিনির কলের মালিকদের ইক্ষুর মূল্য লইয়া বিরোধের ফলে বহু ইক্ষু চিনির কলে না আসিয়া গুড় প্রস্তুতের জন্য চলিয়া যায়।

প্রধান উৎপাদক অঞ্চল (Principal Growing areas)—ইক্ষু-চাষ পৃথিবীর ৩২° উঃ ও ৩২° দঃ অক্ষরেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

পৃথিবীর মোট ইক্ষু উৎপাদন—৯৩ কোটি ৩ লক্ষ মেঃ টন

(১৯৮৪)

ব্রাজিল	২৪ কোটি ৬৮ লক্ষ মেঃ টন	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২ কোটি ৫২ লক্ষ মেঃ টন
ভারত	১৭ ,, ৭০ ,, ,, ,,	থাইল্যান্ড	২ ,, ৪৯ ,, ,, ,,
কিউবা	৭ ,, ৫০ ,, ,, ,,	কলম্বিয়া	২ ,, ৪০ ,, ,, ,,
চীন	৩ ,, ৮৪ ,, ,, ,,	ইন্দোনেশিয়া	২ ,, ৩৭ ,, ,, ,,
মেক্সিকো	৩ ,, ৬৫ ,, ,, ,,	ফিলিপাইনস্	২ ,, ০১ ,, ,, ,,
পাকিস্তান	৩ ,, ২৩ ,, ,, ,,	দক্ষিণ আফ্রিকা	১ ,, ৯৫ ,, ,, ,,
অস্ট্রেলিয়া	২ ,, ৫৬ ,, ,, ,,	আর্জেন্টিনা	১ ,, ৫৫ ,, ,, ,,
		ডোমিনিকান রিঃ	১ ,, ০৫ ,, ,, ,,

(***F*. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985** হইতে সংগৃহীত।)

ব্রাজিল—দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ১৯৮২ সালে পৃথিবীতে ইক্ষু-উৎপাদনে **প্রথম স্থান** অধিকার করিয়াছে। এই দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এবং মধ্য-পূর্ব উপত্যকায় ইক্ষু-চাষ সীমাবদ্ধ। ইহা ছাড়া উত্তরে ভিক্টোরিয়া হইতে দক্ষিণে রায়ো ডি জেনিরো পর্যন্ত উপকূল অঞ্চলে অধুনা ইক্ষুর চাষ হইতেছে। ইক্ষু উৎপাদনে ব্রাজিলের অগ্রগতি লক্ষ্য করিবার মত।

ভারত (India)—১৯৮২ সালে ইক্ষু-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করিয়াছে। ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় অধিকাংশ ইক্ষুক্ষেত্র অবস্থিত। ভারতে প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইক্ষু চাষ করা হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম। ভূমি-ব্যবস্থার কুফল, সারের অভাব, অবৈজ্ঞানিক চাষ-ব্যবস্থা ইহার প্রধান কারণ।
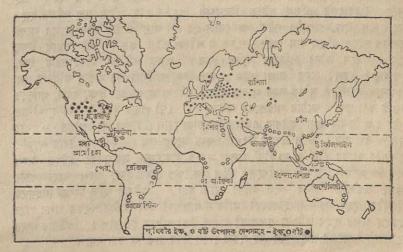
ব্যাপক মূলধন ব্যবহারের সুবিধা, শক্তিমান ব্যবসায়ীচক্র, উন্নত পরিবহণব্যবস্থা ও বাজারের সুব্যবস্থা থাকায় উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে ইক্ষু-চাষ ও চিনিকল কেন্দ্রীভূত

হইয়াছে। উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর, শাহ্‌জাহানপুর, ফৈজাবাদ, গোরক্ষপুর, আজমগড়, বালিয়া, জৌনপুর, বেনারস ও বুলান্দসহর এবং বিহারের চম্পারণ, সারণ, দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুরে অধিক পরিমাণে ইক্ষু চাষ হয়। ইহা ছাড়া পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও ওড়িশায় প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে অল্প বিস্তর ইক্ষু-চাষ হইয়া থাকে।

কিউবা (Cuba)—সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবা ইক্ষু-উৎপাদনে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে ; এই দেশের ইক্ষু-উৎপাদন ও চিনি তৈয়ারি বিজ্ঞানভিত্তিক। এই দেশের মোট জমির শতকরা ৪০ ভাগ ইক্ষু-চাষে ব্যবহৃত হয়।

ইক্ষু-চাষের উপযোগী সকল প্রকার সুবিধা বিদ্যমান থাকায় কিউবা অন্যতম প্রধান ইক্ষু-চিনি উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। পৃথিবীর মোট চিনি-উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ চিনি এই দেশে উৎপন্ন হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় কিউবা চিনি-রপ্তানিতে পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করিয়াছে।

নিম্নলিখিত কারণে কিউবা ইক্ষু-উৎপাদনে ও ইক্ষু-চিনি রপ্তানিতে উন্নতিলাভ করিয়াছে ঃ—(১) এই বৃহৎ দ্বীপটিতে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত অল্প ; ফলে অধিকাংশ জমি কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যায়। লোকসংখ্যা অল্প বলিয়া খাদ্যশস্যের প্রয়োজন কম। এই কারণে কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির প্রায় অর্ধেক ইক্ষু-উৎপাদনে ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছে। লোকসংখ্যা অল্প হওয়ায় উৎপাদিত চিনির খুব সামান্যই অভ্যন্তরীণ ব্যবহারে প্রয়োজন হয়। অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে। (২) এখানে অল্প ঢালু এবং সমতল ভূমিতে ইক্ষুর চাষ করা হয়। এই ভূমি উর্বর, জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত এবং চুনামাটি দ্বারা গঠিত ; ফলে ইক্ষুর ফলন এবং ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণ অধিক হয়। ভূমির গঠন সমতল অথবা অল্প ঢালু হওয়ায় কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি প্রয়োগ এবং রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণের পক্ষে সুবিধাজনক। (৩) এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ১৭০ সেঃ মিঃ। এই বৃষ্টির অধিকাংশই এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ গ্রীষ্মকালে পতিত হয়। ইহার ফলে ইক্ষুদণ্ডগুলি দীর্ঘ ও মোটা হয়। আর্দ্র ও উষ্ণ গ্রীষ্মকালের পরেই ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত শুষ্ক ও শীতল শীত ঋতু। এই সময়ে ইক্ষু পাকে এবং রসে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক শীতল আবহাওয়ায় ইক্ষু অপেক্ষাকৃত বেশী সময় তাজা থাকে ; ফলে ইক্ষু কাটিবার পর মাড়াই করিবার জন্য কারখানায় পাঠাইতে অধিক সময় পাওয়া যায়। শীতল আবহাওয়া ইক্ষু কাটা, গাড়িতে বোঝাই করা প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমের অনুকূল। (৪) প্রচুর তাপ, যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ও উর্বর মৃত্তিকার জন্য কিউবায় একবার ইক্ষুচারা রোপণ করিয়া ৪ হইতে ৮ বার ফসল পাওয়া যায় ; ফলে এখানে উৎপাদন-খরচ অনেক কম। (৫) কিউবার আকৃতি সমুদ্রতীর বরাবর দীর্ঘ ও সংকীর্ণ বলিয়া সমস্ত ইক্ষুক্ষেত্র সমুদ্রতীর হইতে অল্প কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ; ফলে ইক্ষুক্ষেত্র হইতে ইক্ষু অল্প খরচে বন্দর অঞ্চলে অবস্থিত চিনির কলে লইয়া আসা যায়। কিউবার অতি নিকটে রহিয়াছে পৃথিবীর বৃহৎ চিনি-ব্যবহারকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আটলান্টিকের অপর পারে রহিয়াছে অপর বৃহৎ চিনি-ব্যবহারকারী অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ। কিউবার বন্দর হইতে অতি সহজেই সমুদ্রপথে এই সকল দেশে চিনি রপ্তানি করা যায়।

ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে ইক্ষু চাষ হইয়া থাকে। এখানকার

হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অনেক বেশী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এই দেশেও চিনির স্বয়ংসম্পূর্ণতায় টান পড়িয়াছে।

হাওয়াই দ্বীপে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী হওয়া সত্ত্বেও চিনি শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। মোট উৎপাদিত চিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলে (চিনি উপকূল নামে খ্যাত) ইক্ষু-চাষ সীমাবদ্ধ। এখানকার আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত উৎপাদন-ব্যবস্থা ও শিল্পায়ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তান, পোর্টারিকো, জামাইকা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ফিলিপাইনস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইক্ষু উৎপাদন করিয়া থাকে।

বীট (Sugar Beet)

উত্তর গোলার্ধে হিমাঞ্চল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বীটের চাষ সীমাবদ্ধ। ইহার উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বীট চিনির উৎপাদন খরচ ইক্ষু-চিনি হইতে অনেক বেশী ; ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক স্বার্থ হইতে বঞ্চিত ইউরোপীয় দেশগুলি বীট-চাষের উপর মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি, ফ্রান্স, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী এবং পোল্যান্ড বীট-চাষে এবং বীট-চিনি উৎপাদনে অগ্রণী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাও বীট উৎপাদন করে। পৃথিবীর মোট বীটের শতকরা ৮৫ ভাগ ইউরোপে উৎপন্ন হয়।

ব্যবহার (Uses)—বীট হইতে প্রধানতঃ চিনি উৎপন্ন হয়। চিনি প্রস্তুতের পর যে মণ্ড পড়িয়া থাকে উহা পশুখাদ্য ও জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতাগুলিও পশুর খাদ্য।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of Growth)—ভাল জলনিকাশী উর্বর **দো-আঁশ মাটিতে** বীটের চাষ হয়। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ ২০° সেঃ হইতে ২৩° সেঃ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ **বৃষ্টিপাত** চাষের পক্ষে উপযোগী। শীতকালে ফসল তোলার সময় অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপ ও শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন।

বীট-চাষের জন্য সুনিপুণ শ্রমিক প্রয়োজন। কারণ, বীট-চাষ খুবই পরিশ্রমসাধ্য। বীট পাকিবার সময় জমি আলগা করিয়া না দিলে বীট পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। বীট তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া চিনির কলে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং উহার পাতা পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বীট কারখানায় আনিয়া কাটিয়া উহা হইতে রস বাহির করা হয়। ঐ রস হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের চিনি উৎপাদিত হয়।

প্রধান উৎপাদক অঞ্চল (Principal Growing Areas)—উত্তর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ ও হিমোষ্ণ অঞ্চলে বীট-চাষ সীমাবদ্ধ।

পৃথিবীর মোট বীট উৎপাদন—২৭ কোটি ৮৬ লক্ষ মেঃ টন

(১৯৮৪)

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
সোঃ রাশিয়া	৭ কোটি ৪০ লক্ষ মেঃ টন	পঃ জার্মানী	১ কোটি ৯৩ লক্ষ মেঃ টন
ফ্রান্স	২ ,, ৬৫ ,, ,, ,,	পোল্যান্ড	১ ,, ৫৬ ,, ,, ,,
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২ ,, ০১ ,, ,, ,,	ইটালি	০ ,, ৯৭ ,, ,, ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত।)

সোভিয়েত রাশিয়া—বীট উৎপাদনে এই দেশ **প্রথম স্থান** অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশের বেশী এই দেশে উৎপন্ন হয়। ইউক্রেন ও ককেশাস হইতে পশ্চিম সাইবেরিয়ার দক্ষিণ ও মধ্য রাশিয়া পর্যন্ত বীট ক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। (বীট উৎপাদনকারী দেশের মানচিত্রের জন্য ১৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ফ্রান্স ইউরোপের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বীট-উৎপাদনকারী দেশ। এই দেশ বর্তমানে বীট-উৎপাদনে পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থানের** অধিকারী। উত্তর ফ্রান্সে বীট-ক্ষেত্রগুলি অবস্থিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দেশ বর্তমানে বীট-উৎপাদনে পৃথিবীতে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে। জলসেচের সাহায্যে মিচিগান, কালিফোর্নিয়া, ওহিও এবং মনটানা হইতে কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বীট-চাষ হইয়া থাকে।

পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, পোল্যান্ড, রোমানিয়া ও হাঙ্গেরীতে বীটের চাষ হয় এবং উৎপাদিত চিনি স্থানীয় চাহিদা মিটায়। পূর্ব জার্মানীর উৎপাদনও যথেষ্ট। পলিময় সমভূমিতে ইহার চাষ হয়। কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া, সাসকাচুয়ান, কুইবেক ও হাডসন উপত্যকায় বীট-চাষ হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে বীট-চিনি খুব কম আসে। স্থানীয় প্রয়োজনে অধিকাংশ বীট-চিনি ব্যবহৃত হয়।

ইক্ষু ও বীটের তুলনা—পৃথিবীতে যে সকল অঞ্চলে ইক্ষু উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্থানে বীট উৎপন্ন হয় না। ইহার মূল কারণ, ইক্ষু চাষের জন্য যে প্রকার জলবায়ু প্রয়োজন হয়, বীট চাষের জন্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের জলবায়ু প্রয়োজন হয়। নিম্নে ইক্ষু ও বীট উৎপাদন-ব্যবস্থার তুলনা করা হইল ঃ

ইক্ষু	বীট
১। **উষ্ণমণ্ডলের** ফসল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহার চাষ হয়।	১। **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের** ফসল। শীতপ্রধান দেশেই ইহার চাষ হয়।
২। ১০০ হইতে ১৭৫ সেঃ মিঃ **বৃষ্টিপাতে** ভালো জন্মে ; অর্থাৎ বীটের তুলনায় অধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়।	২। ৫০ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি-পাতে ভালো জন্মে ; অর্থাৎ ইক্ষুর তুলনায় কম বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়।
৩। গ্রীষ্মকালীন **তাপমাত্রা** অন্ততঃপক্ষে ২৭° সেঃ হওয়া প্রয়োজন।	৩। গ্রীষ্মকালীন **তাপমাত্রা** ২০° সেঃ হইতে ২৩° সেঃ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৪। চুন ও লবণযুক্ত ভারী দো-আঁশ মাটি চাষের পক্ষে অনুকূল।	৪। চুনযুক্ত হালকা দো-আঁশ মাটি চাষের পক্ষে অনুকূল।
৫। ইক্ষু-চাষের জমি জল-নিকাশের উপযুক্ত হওয়া চাই।	৫। বীটের জমির জল উহার মূলে শোষিত হওয়া প্রয়োজন।
৬। সমুদ্রবায়ু ইহার ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।	৬। ইহার চাষের জন্য সমুদ্র-বায়ুর প্রয়োজন হয় না।
৭। ইহার উৎপাদনকাল ৯ মাস হইতে ১২ মাস এবং একই আবাদ হইতে কয়েকবার ফসল পাওয়া যায়।	৭। ইহার উৎপাদন-কাল ৬ মাস হইতে ৭ মাস এবং প্রতি বৎসর ইহার চাষ করা প্রয়োজন।

ইক্ষু	বীট
৮। ইহার চাষের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন।	৮। ইহার চাষের জন্য প্রচুর দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।
৯। ইহার চাষ অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্য-ভিত্তিক।	৯। ইহার চাষ প্রধানতঃ জীবিকা-সত্তা-ভিত্তিক; স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইতে ব্যবহৃত হয়।

চিনি (Sugar)

ইক্ষু ও বীট হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর মোট চিনির শতকরা ৬৮ ভাগ ইক্ষু হইতে এবং ৩২ ভাগ বীট হইতে প্রস্তুত হয়। বর্তমান যুগে চিনি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। মানুষের প্রধান খাদ্য না হইলেও চিনির ব্যবহার মানুষের দৈহিক তাপ-শক্তি উৎপাদনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া সুস্বাদু মিষ্টান্ন এবং চা, কোকো, কফি প্রস্তুত করিতে জনসাধারণ সর্বদাই চিনি ব্যবহার করে। চিনির মূল্য অধিক বলিয়া সাধারণতঃ গরীব দেশের লোকেরা ইহা অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক চিনির ব্যবহার প্রায় ৪৫ কিলোগ্রাম; কিন্তু ভারতে মাথাপিছু চিনির বাৎসরিক ব্যবহার মাত্র ৭ কিলোগ্রাম। দারিদ্র্যের জন্য এই দেশে চিনির চাহিদা সেরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ইহাতে চিনির উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে। ইক্ষু অথবা বীট দূরদেশে লইয়া চিনি প্রস্তুত করিতে যানবাহনের খরচ অত্যন্ত বেশী হয় বলিয়া শুধু ইক্ষু বা বীট উৎপাদনকারী দেশসমূহেই চিনি প্রস্তুত হয়।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (Principal Producing Regions)—সাধারণতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলে ইক্ষু এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বীট ভাল জন্মে (১৯৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। সেইজন্য গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলি ইক্ষু-চিনি উৎপাদনে এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলি বীট-চিনি উৎপাদনে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর মোট চিনি উৎপাদন—৯ কোটি ৪৮ লক্ষ মেঃ টন

(১৯৮৪)

বীট-চিনি		ইক্ষু-চিনি	
সোঃ রাশিয়া	৭৮ লক্ষ ০০ হাঃ মেঃ টন	ব্রাজিল	৯২ লক্ষ ০০ হাঃ মেঃ টন
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র*	৫১ ,, ০৫ ,, ,, ,,	কিউবা	৮১ ,, ৫০ ,, ,, ,,
ফ্রান্স	৪৩ ,, ৪০ ,, ,, ,,	ভারত	৬৪ ,, ২০ ,, ,, ,,
পঃ জার্মানী	৩০ ,, ৬০ ,, ,, ,,	চীন	৫৩ ,, ৭১ ,, ,, ,,
পোল্যান্ড	১৯ ,, ৫৬ ,, ,, ,,	অস্ট্রেলিয়া	৩৫ ,, ৫০ ,, ,, ,,
ইটালি	১৩ ,, ৭০ ,, ,, ,,	মেক্সিকো	৩২ ,, ৬০ ,, ,, ,,
ব্রিটেন	১৩ ,, ৬০ ,, ,, ,,	ফিলিপাইনস্	২৩ ,, ৮০ ,, ,, ,,
নেদারল্যান্ডস্	১০ ,, ০০ ,, ,, ,,	থাইল্যান্ড	২৩ ,, ০৫ ,, ,, ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত)

* ইক্ষু-চিনি সমেত।

সোভিয়েত রাশিয়া—বীট উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া **প্রথম স্থান** অধিকার করে। শিল্পায়নে দ্রুত উন্নতির ফলে বর্তমানে এই দেশ চিনি-শিল্পে পৃথিবীতে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে। কিয়েভ, নীপারপেট্রোভস্ক, কুরস্ক, ট্রান্স-ককেশীয় অঞ্চল, পশ্চিম সাইবেরিয়ার কুজনেৎস্ক এবং বৈকাল হ্রদের নিকট ইরকুটস্ক বীট-চিনি উৎপাদনে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

ব্রাজিল—ইক্ষু-চিনি উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** এবং চিনি-শিল্পেও **প্রথম স্থান** অধিকার করে। পূর্ব উপকূলের বাহিয়া, মিনাস্ গেরায়েস ও সাও পাওলো অঞ্চলেই অধিকাংশ ইক্ষু-চিনি উৎপন্ন হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় রপ্তানি বাণিজ্যে এই দেশ **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে।

কিউবা—ইক্ষু উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে এবং ইক্ষু-চিনি উৎপাদনেও কিউবা **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় রপ্তানি-বাণিজ্যে কিউবাই **প্রথম স্থান** অধিকার করে। স্থানীয় নিগ্রো শ্রমিক ও রাষ্ট্রের মূলধন এখানকার চিনি-শিল্পে নিয়োজিত আছে। মধ্য ও পূর্ব কিউবা অঞ্চলেই অধিকাংশ চিনি উৎপন্ন হয়। বিপ্লবের পরে এই দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধনমুক্ত হওয়ায় চিনি-শিল্পে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে।

ভারত—ইক্ষু-চিনি উৎপাদনে এবং চিনি-শিল্পে এই দেশ যথাক্রমে **তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানের** অধিকারী। এখানকার উত্তর প্রদেশে অধিকাংশ চিনির কল অবস্থিত। ইহা ছাড়া বিহার, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ু রাজ্য এই শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দেশে দুই প্রকার চিনিই উৎপন্ন হয়। পশ্চিম উপকূলের রাজ্যসমূহে অধিকাংশ বীট-চিনি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ফ্লোরিডা, লুইসিয়ানা, আলাবামা প্রভৃতি রাজ্যে অধিকাংশ ইক্ষু-চিনি পাওয়া যায়। অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও পোর্টোরিকো হইতে প্রচুর চিনি এদেশে আমদানি করা হয়।

জার্মানী—এই দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ম্যাগডেবার্গ বিখ্যাত চিনি শিল্পকেন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই দেশে সর্বাপেক্ষা বেশী বীট-চিনি পাওয়া যাইত। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া বীট-চিনি উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। পশ্চিম জার্মানী প্রায় ৩১ লক্ষ মেঃ টন এবং পূর্ব জার্মানী **প্রায় ১০ লক্ষ মেঃ টন** চিনি উৎপন্ন করে।

ইহা ছাড়া ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর বীট-চিনি উৎপন্ন হয়। চীন, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়ার জাভা, ফিলিপাইনস, মরিসাস্ ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, পোর্টোরিকো, বাংলাদেশ, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও পাকিস্তান প্রচুর ইক্ষু-চিনি উৎপন্ন করে।

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—ইক্ষু-চিনি **রপ্তানিকারকদের** মধ্যে কিউবা প্রথম, ব্রাজিল দ্বিতীয়, থাইল্যান্ড তৃতীয় এবং ফিলিপাইনস্ চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া, পোর্টোরিকো, ইন্দোনেশিয়া, হাওয়াই ও মরিসাস্ দ্বীপপুঞ্জ প্রচুর ইক্ষু-চিনি রপ্তানি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ ইক্ষু-চিনি **আমদানি** করে।

বীট-উৎপাদনকারী দেশগুলিতে চিনির অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে অধিকাংশ বীট-চিনি ব্যয় হয়। সুতরাং রপ্তানি-বাণিজ্যে বীট-চিনি বিশেষ অংশগ্রহণ করে না।

ইউরোপের ছোট ছোট দুই-তিনটি দেশ (চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরী) ভিন্ন অন্য কোনো দেশ বীট-চিনি রপ্তানি করে না। আমদানিকারকদের মধ্যে ব্রিটেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বীট হইতে চিনি উৎপাদনের খরচ বেশী হইলেও ইউরোপীয় দেশগুলি সরকারী সাহায্যে বীট উৎপন্ন করিয়া থাকে। কারণ, চিনির জন্য ইহারা ইক্ষু-উৎপাদনকারী দেশগুলির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা পছন্দ করে না।

বাণিজ্যিক শস্য (Commercial Crops)

তুলা (Cotton)

ব্যবহার (Uses)—বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারত, চীন ও মিশরে তুলার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপ এই সম্পর্কে তখন কিছুই জানিত না। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যন্ত্রের উদ্ভবের সাথে সাথে কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদন-ব্যবস্থা ইউরোপে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইল।

শ্বেত ঔপনিবেশিকদের কল্যাণে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তুল্যার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়। তুলাকে অনেকে সেইজন্য ঔপনিবেশিক ফসল হিসাবে অভিহিত করিয়া থাকে। তুলার বাণিজ্য-ইতিহাসের সঙ্গে অসংখ্য কৃষ্ণকায় মানুষের রক্ত ও অশ্রু মিশিয়া রহিয়াছে। কেননা তুলার বাগানে শ্রমিকের প্রয়োজনেই লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস আফ্রিকা হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে প্রেরিত হইয়াছিল।

সভ্য জগতের সকল মানুষেরই বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর মোট বস্ত্রের শতকরা ৭০ ভাগ তুলা হইতে প্রস্তুত হয়। কার্পাস (তুলা) গাছের গুটিফল হইতে তুলা পাওয়া যায়। বস্ত্রাদি ছাড়াও বালিশ, তোশক, গদি, ডাক্তারখানার ব্যান্ডেজ, প্যাড প্রভৃতি তুলা হইতে প্রস্তুত হয়। সুতা, দড়ি, শতরঞ্জি, ম্যান্টেল, কাগজ, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও তুলার প্রয়োজন হয়। তুলার বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। তুলার বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল থাকে, উহা পশুর খাদ্য ও জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তুলা হইতে সেলুলোজ (Cellulose) প্রস্তুত হয়।

তুলা সাধারণতঃ তিন প্রকার। যথা, ক্ষুদ্র-আঁশযুক্ত (Short Staple), মাঝারি আঁশযুক্ত (Medium Staple) এবং দীর্ঘ-আঁশযুক্ত (Long Staple) তুলা। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা ২·২ সেঃ মিঃ হইতেও ছোট হয়। ইহা দ্বারা খসখস ও মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারত ও চীনে এই তুলা উৎপন্ন হয়। মাঝারি আঁশযুক্ত তুলা ২·২ সেঃ মিঃ হইতে ২·৯ সেঃ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহাকে আমেরিকান আ্যপল্যান্ড তুলা বলা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ তুলা এই শ্রেণীভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও ব্রাজিলে এই তুলা উৎপন্ন হয়। ২·৯ সেঃ মিঃ হইতে দীর্ঘতর তুলার নাম দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা। ইহার অধিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরে উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর তুলার মধ্যে ৪·৫ সেঃ মিঃ হইতে ৬·৩ সেঃ মিঃ দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা সূক্ষ্ম পশমের মতো হয় এবং ইহাই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট তুলা। ইহাকে **সাগরদ্বীপীয়** (Sea Island) তুলা বলে।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of Growth)—চুন-মিশ্রিত উর্বর দো-আঁশ মাটি তুলা চাষের উপযোগী। কৃষ্ণ-মৃত্তিকা তুলা-চাষের পক্ষে খুব ভালো। এইজন্য ইহাকে 'কৃষ্ণ তুলা-মৃত্তিকা' (Black Cotton Soil) বলা হয়। তুলা-চাষের জমিতে জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

তুলাগাছের গুটিফল ফাটিবার পূর্বে ৬৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। কিন্তু গুটিফল ফাটিয়া তুলা বাহির হওয়ার পর বৃষ্টিপাত হইলে ইহা তুলা-চাষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সময় মতো জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২৪° সেঃ উত্তাপে তুলা গাছ ভালো জন্মে। কিন্তু তুলার ফল বাহির হইবার পর অত্যধিক গরম পড়িলে তুলা-ফল ঝরিয়া পড়ে। চাষের প্রাথমিক অবস্থায় আর্দ্র সমুদ্রবায়ু এবং পরে সূর্যকিরণ ও শুষ্ক আবহাওয়া বাঞ্ছনীয়। তুলা-চাষের সময় অন্ততঃ ২০০টি তুহিনমুক্ত দিবস প্রয়োজন।

তুলাগাছ হইতে গুটি তোলা এবং গুটি হইতে তুলা ছাড়াইবার জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন। **বল উইভিল** নামক একপ্রকার কীট তুলা-চাষের অন্তরায়। এইজন্য কীটনাশক ঔষধের ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (Principal Growing Areas)—পৃথিবীর তুলা-উৎপাদনকারী দেশসমূহ গ্রীষ্মমণ্ডলে ও উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত।

পৃথিবীর মোট তুলা উৎপাদন—১ কোটি ৭৩ লক্ষ মেঃ টন
(১৯৮৪)

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
চীন	৫৭·০০ লক্ষ মেঃ টন	পাকিস্তান	৮·৬০ লক্ষ মেঃ টন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৯·১৩ ,, ,, ,,	ব্রাজিল	৬·১৮ ,, ,, ,,
সোভিয়েত রাশিয়া	২৪·০০ ,, ,, ,,	তুরস্ক	৫·৮০ ,, ,, ,,
ভারত	১২·৫০ ,, ,, ,,	মিশর	৩·৯০ ,, ,, ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত)

চীন—চীন তুলা উৎপাদনে **প্রথম স্থানের** অধিকারী; এই দেশে ইয়াং-সির নিম্ন উপত্যকায়, হোয়াংহো অববাহিকায় এবং মধ্যাঞ্চলে তুলার চাষ হয়। মধ্যাঞ্চলের জলবায়ু মিসিসিপি উপত্যকার জলবায়ুর অনুরূপ। স্থানীয় তুলা মধ্যম এবং ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত হইলেও বহু জমিতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২০ ভাগেরও বেশী তুলা চীনে উৎপন্ন হয়। চীন সরকার ইচ্ছা করিলে তুলার চাষ বৃদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য চাষের জমি হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তুলার চাষ বাড়ানো হয় না।

সোভিয়েত রাশিয়া—তুলা উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়ার স্থান **তৃতীয়**। মধ্য এশিয়া (তুর্কিস্তান, আজারবাইজান, উজবেকিস্তানের জলসেচিত অঞ্চল), দক্ষিণ ইউক্রেন ও ক্রিমিয়াতে তুলার চাষ বিস্তৃত। সাগরদ্বীপীয় তুলার চাষ দক্ষিণাঞ্চলে প্রসারিত হইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—তুলা-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান **দ্বিতীয়**। এই দেশের অধিকাংশ তুলা ক্যারোলিনা, টেক্সাস, মিসিসিপি, আরকানসাস, আলাবামা, জর্জিয়া, টেনেসি, ওকালাহোমা, মিসৌরী এবং কেন্টুকির অংশবিশেষ উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে **মিসিসিপি উপত্যকা** পৃথিবীর সর্বপ্রধান তুলা-উৎপাদনকারী **অঞ্চল**। মিসিসিপি নদীর উপত্যকা বৎসরে অন্ততঃ ২০০ দিন তুষারমুক্ত থাকে। মিসিসিপি উপত্যকায় পলিপ্রধান দো-আঁশ মৃত্তিকা এবং সমতল ভূ-প্রকৃতি তুলা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অবশ্য এই অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে বন্যা হয়; কিন্তু বন্যার জলের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে যে পলি আসিয়া জমা হয়, তাহা বিনা ব্যয়ে জমির উর্বরতাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এখানে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অধিক (৫২৭ কিলোগ্রাম) এবং তুলার আঁশও হয় খুব দীর্ঘ।

ভারত—তুলা উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে **চতুর্থ** স্থান অধিকার করে। ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে তুলার চাষ হয়। ভারতে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন খুব কম—মাত্র ১২২ কিলোগ্রাম। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ **দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের** পরবর্তিকালে ভারতে ব্যাপকভাবে শুরু হয়। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মধ্য প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা চাষের প্রচেষ্টা চলিতেছে। মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণমৃত্তিকা এবং উপযুক্ত জলবায়ু থাকায় তুলার চাষ দ্রুত প্রসারলাভ করিয়াছে। গুজরাটেও একই কারণে তুলার চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্য প্রদেশেও প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার ফলে তুলার চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উন্নত দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ পাঞ্জাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের মধ্যে পাঞ্জাবে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং অন্ধ্র প্রদেশে নিয়মিত তুলার চাষ হইয়া থাকে। নাতিদীর্ঘ আঁশ ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার চাষ আমেদাবাদ, কাথিওয়ার, কচ্ছ, ধারওয়ার ও রায়চুড়ে হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের কোয়েম্বাটুর ও তিরুচিরাপল্লীতে আম্পান্ নামক নাতিদীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ হয়।

ব্রাজিল—এই দেশের সাও পাওলো অঞ্চলে বাহিয়ার উত্তরাংশে প্রচুর তুলার চাষ হয়। এই দেশের অধিকাংশ তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়।

পাকিস্তান—সিন্ধু উপত্যকায় এবং পাঞ্জাবে প্রায় ১৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের সাহায্যে তুলার চাষ হয়। মুলতান, মন্টগোমারী, লায়ালপুর, শাহ্‌পুর, ঝাং এবং শেখপুরা জেলাগুলিতে পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের ৯০% তুলা জন্মে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমেরিকার দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ শুরু হইয়াছে। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী। অধিকাংশ তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়। বর্তমানে ব্রিটেন ও জাপান পাকিস্তানী তুলার প্রধান আমদানিকারক।

মিশর—এই দেশের নীলনদের উপত্যকায় জলসেচিত অঞ্চলে তুলার চাষ হয়। এখানকার হেক্টর-প্রতি উৎপাদন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। মিশরে প্রায় ৬.৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে তুলার চাষ হইয়া থাকে। উৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে মিশরের স্থান অষ্টম হইলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলার উৎপাদনের জন্য এই দেশ বিখ্যাত।

তুলা-চাষের উপযোগী জলবায়ু এই দেশে পুরাপুরি বিদ্যমান। নীলনদের উপত্যকার পলিমাটি ও দো-আঁশ মাটি তুলা-চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। নীলনদ

হইতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত থাকার জন্যই এখানে তুলার চাষ সম্ভব হইয়াছে। নীলনদের বন্যায় জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়; স্থানীয় মেঘমুক্ত আকাশ, প্রচুর উত্তাপ ও শুষ্ক বায়ু তুলা-চাষের সহায়ক। এই সকল সুযোগ-সুবিধা থাকায় এই দেশের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সর্বাধিক।

মিশরের প্রধান ফসল তুলা। এই দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ৭৫ ভাগ তুলা। মিশর কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া এবং তুলাই এই দেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য বলিয়া তুলার উপর এই দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে আসোয়ানের নিকট বিশালকায় বাঁধ দিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া তুলার উৎপাদন দ্বিগুণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

অন্যান্য তুলা-উৎপাদক দেশের মধ্যে মেক্সিকো, কেনিয়া, উগান্ডা ও পেরু উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—তুলার বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি কখনও সম্পাদিত হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন ব্যবসায়ীরা নানা উপায়ে বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোট উৎপাদনের ২৫% রপ্তানি করে। এতদিন ধরিয়া আন্তর্জাতিক তুলার বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আধিপত্য ছিল তাহা মিশর, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, তানজানিয়া, সিরিয়া, পেরু, সুদান, মধ্য আমেরিকা, তুরস্ক, ইরান, উগান্ডা, পাকিস্তান ও ভারতের রপ্তানিকারক হিসাবে আবির্ভাবের ফলে মন্দীভূত এবং সীমিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এশিয়া ও আফ্রিকার হাতেই তুলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধিপত্য আসিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত বেশী। অনেক সময় উৎকৃষ্ট দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা তাহাকে আমদানিও করিতে হয়। আমদানিকারকদের মধ্যে জাপান, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পর্তুগাল, যুগোশ্লাভিয়া, ভারত, নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম উল্লেখযোগ্য। ভারত নিকৃষ্টশ্রেণীর তুলা রপ্তানি করিয়া উৎকৃষ্টশ্রেণীর তুলা আমদানি করে।

পাট (Jute)

ব্যবহার (Uses)—পাটগাছ প্রায় ১½ মিটার হইতে ৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাটগাছের ছাল হইতে যে আঁশ বাহির হয়, উহা পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া পাটের কলে চট, থলিয়া ও অন্যান্য বহু জিনিস প্রস্তুত হয়। চট ও থলিয়া প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ পাট ব্যবহৃত হয়। পাটের থলিয়া অপেক্ষা সুলভ প্যাক্ করিবার জিনিস পাওয়া কঠিন। এই জন্যই পাটের চাহিদা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিদ্যমান। বর্তমান যুগে পাটের বিভিন্ন প্রতিযোগী ও পরিবর্ত সামগ্রী আবিষ্কৃত হইলেও এখনও পর্যন্ত পাটের থলিয়া অপেক্ষা সস্তা জিনিস আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা ছাড়া পাট হইতে দড়ি, কাছি, ত্রিপল, কার্পেট, লাইনোলিয়াম প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। বর্তমানে কলিকাতায় পাটের সাহায্যে আরও বহু জিনিস তৈয়ারি করিবার জন্য নানা গবেষণা চলিতেছে; পাটের সাহায্যে কাগজ উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইলে ভারতে ও বাংলাদেশে কাগজ-শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of Growth)—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে পাটের চাষ সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলে শতকরা ৯৯ ভাগ পাট উৎপন্ন হয়। উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ু পাট-চাষের উপযোগী। ২৫° সেঃ উত্তাপ এবং ১৫০—২০০ সেন্টিমিটার **বৃষ্টিপাত** পাট-চাষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বায়ুতে প্রচুর আর্দ্রতাও থাকা দরকার। ভারত ও বাংলাদেশের নদী-অববাহিকায় ইহার চাষ ভাল হয়। নবীন পলিমাটি বা দো-আঁশ মাটি চাষের জন্য প্রয়োজন। পাট পচাইয়া আঁশ বাহির করিবার জন্য বিল, জলা ও খালের স্বচ্ছ স্থিরজল প্রয়োজন।

পাট-চাষের জন্য প্রচুর সুলভ অথচ অভিজ্ঞ শ্রমিক প্রয়োজন। চাষের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বীজবপন, নিড়ানো, পাট-কাটা, পাট-ভিজানো, আঁশ-ছাড়ানো প্রভৃতি কাজ হাতে করিতে হয় বলিয়া প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিহারে এবং বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকার ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষ চিরকালই পাট-চাষ ও পাটশিল্পে একাধিপত্য বিস্তার করিত।

প্রধান উৎপাদক অঞ্চল (Principal Growing Areas)—পাট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী এলাকার (গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের) একচেটিয়া ফসল। এই অঞ্চল হইতে পৃথিবীর যাবতীয় পাটের চাহিদা মিটানো হয়।

নিম্নে পরিবর্ত সামগ্রীসহ পাটের উৎপাদন দেখাইয়া যে তালিকা দেওয়া হইল উহা হইতে বিভিন্ন দেশের পাটের উৎপাদন সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও মোটামুটি ধারণা জন্মিবে।

পরিবর্ত সামগ্রীসহ পৃথিবীর মোট পাট উৎপাদন—৩৬ লক্ষ ৯৩ হাজার মেঃ টন*

(১৯৮৪)

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
ভারত	১৪ লক্ষ ০৪ হাজার মেঃ টন	ব্রাজিল	৭৩ হাজার মেঃ টন
চীন	১০ ,, ২০ ,, ,, ,,	সোভিয়েত রাশিয়া	৫৬ ,, ,, ,,
		ব্রহ্মদেশ	৫৫ ,, ,, ,,
বাংলাদেশ	৭ ,, ৩৩ ,, ,, ,,	নেপাল	৪১ ,, ,, ,,
থাইল্যান্ড	১ ,, ৯৯ ,, ,, ,,	ভিয়েতনাম	৩৯ ,, ,, ,,

(**F.A.O. Monthly Bulletin, January, 1985** হইতে সংগৃহীত।)

ভারত—ভারতের পূর্বাংশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও ওড়িশায় পাট-চাষের উপযোগী অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান। ফলে এই দেশে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। পরিবর্ত সামগ্রীসহ পাট-উৎপাদনে ভারতের স্থান **প্রথম** এবং ভারত পাট-উৎপাদনেও পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু ভারতের পাট-উৎপাদনের পরিমাণ বাংলাদেশের উৎপাদনের চেয়ে বেশী হইলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অধিকাংশ পাট বাংলাদেশেই উৎপন্ন হয়।

দেশ বিভাগের পূর্বে বেশীর ভাগ পাট এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট অধিকাংশই পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন হইত। কিন্তু পাটের কলগুলি সবই ছিল পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতায়

---

* মেস্তা ও অন্যান্য পরিবর্ত সামগ্রী সমেত।

নিকট ; স্টীমারে বা নৌকায় করিয়া সুলভে নদীপথে এই পাট পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতার মিলগুলিতে আসিত।

দেশ বিভক্ত হইবার ফলে ভারতের উৎপাদনের স্বল্পতা ও প্রাক্তন পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) কাঁচাপাটের বাজারের চাহিদার নিদারুণ অভাব বহুদিন ধরিয়া পাকিস্তান ও ভারতকে অর্থনৈতিক পীড়া দিয়াছে। ১৯৪৭ সালে ভারতে মাত্র ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট-চাষ হইত, আজ ভারতে মোট পাটের জমি ৯.৪২ লক্ষ হেক্টর। উৎপাদন যেখানে পূর্বে ছিল ১৭ লক্ষ গাঁট, আজ সেখানে হইয়াছে ৬৫ লক্ষ ১৫ হাজার গাঁট। কিন্তু কারখানাগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদা তাহাতেও না মিটায় ভারতে মেস্তার চাষ পত্তন করিতে হইয়াছে। বর্তমানে মেস্তার উৎপাদন প্রায় ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার গাঁট।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় পাটের চাষ হয়। আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া ও নওগাঁ জেলায়, বিহারের পূর্ণিয়া ও দ্বারভাঙ্গা জেলায় এবং ওড়িশার কটক জেলায় পাট-চাষ হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চলে ও পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। আসামে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সবচেয়ে বেশী।

বাংলাদেশ—দেশ বিভাগের পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়া সমগ্র পৃথিবীর পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত এবং একচেটিয়া ব্যবসায় করিত। এই ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণই ব্রিটিশ বণিকদের হাতে ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পৃথিবীতে বাংলাদেশ সর্বাপেক্ষা বেশী পাট উৎপন্ন করিত। কিন্তু ভারতের পাট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দেশ বর্তমানে পাট-উৎপাদনে পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** এবং পরিবর্ত সামগ্রীসহ পাট-উৎপাদনে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় পাটচাষের একদেশীভবনের কারণ : ভারত ও বাংলাদেশ সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ পাট উৎপাদন করিয়া থাকে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আবার পাট-চাষ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন-অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম পাট-চাষের জন্য বিখ্যাত। বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চলে পাট-চাষ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। প্রথমতঃ, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে পাট-চাষের প্রচলন আছে এবং এখানকার চাষীরা পাট-চাষে সুনিপুণ। দ্বিতীয়তঃ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা গঠিত এই নিম্ন সমভূমি অঞ্চল পাট-চাষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। পাটের চাষ করিলে জমির উর্বরতাশক্তি দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই অঞ্চলে প্রায় প্রতি বৎসর বন্যা হইবার ফলে জমিতে নূতন পলি পড়ে এবং এইভাবে জমির উর্বরতাশক্তি স্বাভাবিকভাবে পূরণ হয়। তৃতীয়তঃ, এই অঞ্চলে বৎসরে গড়ে ১৬০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টির অধিকাংশ মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, বর্ষার এই কয়েক মাসে গড় তাপমাত্রা ২৭° সেঃ-এর অধিক। এই প্রকার জলবায়ু পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময় এই অঞ্চলের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল বন্যার জলে ভরিয়া যায়। ইহাতে পাট পচাইবার ও ধুইবার খুব সুবিধা হয়। এই সকল

নদী-নালা ও খালের মাধ্যমে সুলভে পাট গ্রামাঞ্চল হইতে কারখানা ও বন্দর অঞ্চলে প্রেরণ করা যায়। পঞ্চমতঃ, পাট-চাষের জন্য জমি তৈয়ারি করা হইতে শুরু করিয়া জমি-নিড়ানো, পাটের চারাগুলি ফাঁক করিয়া দেওয়া, পাট-কাটা, আঁটি বাঁধিয়া জলে-ভিজানো, আঁশ-ছাড়ানো ও রৌদ্রে-শুকানো পর্যন্ত সমস্ত কাজ হাতে করিতে হয়। এই কারণে সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন খুব বেশী; এই অঞ্চলে প্রতি বর্গ-

পৃথিবীর পাট-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ
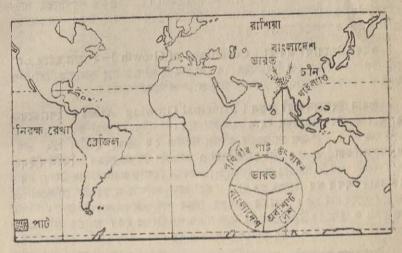
কিলোমিটারে গড়ে প্রায় ৫০০ জন লোক বাস করে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও নিম্ন; ফলে সুলভ শ্রমিকের অভাব নাই। সর্বশেষে, এই অঞ্চলে অর্থকরী ফসল হিসাবে কৃষকেরা পাট-উৎপাদন অধিক লাভজনক মনে করিয়া থাকে। কারণ, বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঐতিহ্য ও উৎপাদকগণের বহুদিনের অভ্যাসগত দক্ষতার জন্য ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি অন্যান্য অর্থকরী ফসলের তুলনায় পাট-উৎপাদনই অধিক লাভজনক।

চীন — পরিবর্ত সামগ্রীসহ পাট-উৎপাদনে চীন **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। তবে পাট-উৎপাদনে চীনের স্থান ভারত ও বাংলাদেশের পরে। বিপ্লবের পরে কৃষিক্ষেত্রে নানা ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্র ব্যবহার ও পাট ধুইবার যন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্তনের ফলে চীনের ইয়াংসি কিয়াং ও সি কিয়াং নদী উপত্যকায় ব্যাপক পাটের চাষ সম্ভব হইয়াছে।

থাইল্যাণ্ডে বর্তমানে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া ব্রাজিল, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, জায়েরে, মিশর, কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম ও সোভিয়েত রাশিয়ায় সামান্য পাটের চাষ হয়।

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—ভারত ও বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রধান রপ্তানিকারক। বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর মারফত এবং ভারত কলিকাতা বন্দর মারফত পাট রপ্তানি করে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা, জাপান ও ইটালি পাটের প্রধান আমদানিকারক।

শণ (Hemp)

ব্যবহার (**Uses**)—শণ-গাছ হইতে তন্তু ও বীজ পাওয়া যায়। ফল ধরিলে গাছ তুলিয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কিছুদিন পরে গাছকে শক্ত কাঠ দিয়া পিটাইয়া তন্তু বাহির করিতে হয়। এই তন্তু দ্বারা মোটা দড়ি, ত্রিপল, চট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহার তন্তু পাট অপেক্ষা মোটা। একপ্রকার শণ-গাছের পাতা হইতে গাঁজা ও অন্য এক-প্রকার শণ-গাছ হইতে ভাঙ্গ তৈয়ারি করা হয়। শণ-গাছের ডাঁটা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (**Conditions of Growth**)—২° সেঃ হইতে ১৩° সেঃ উত্তাপ এবং ৪৩ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং কাদাযুক্ত দো-আঁশ মাটি শণ চাষের উপযোগী। ইহার চাষে প্রচুর শ্রমিকের দরকার।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (**Principal Growing Areas**)—**সোভিয়েত রাশিয়া** শণ উৎপাদনে**প্রথম স্থান** অধিকার করে। পৃথিবীর মোট শণ উৎপাদন ৮ লক্ষ মেঃ টন। তন্মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া শতকরা ৫২ ভাগ, **ইটালি** ১২ ভাগ, **যুগোশ্লাভিয়া** ৮ ভাগ এবং **রোমানিয়া** ৫ ভাগ শণ উৎপন্ন করে। **ফিলিপাইনস** সর্বোৎকৃষ্ট শণ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানে বিখ্যাত ম্যানিলা শণ উৎপন্ন হয়। **কেনিয়ার শিশল শণ** অত্যন্ত শক্ত হয়। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ভারতে শণের চাষ হয়। **ভারত** অন্যতম প্রধান শণ উৎপাদনকারী দেশ। নিউ জিল্যান্ড ও ভারতের উত্তর প্রদেশে টেনাক্স নামক শণ উৎপন্ন হয়। ভারতে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে শণের চাষ হয়।

উল্লেখযোগ্য বাজার (**Important Markets**)—ইটালি ও ভারত প্রধান রপ্তানিকারক দেশ এবং ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স ও জাপান প্রধান আমদানি-কারক দেশ।

রেশম (Silk)

ব্যবহার (**Uses**)—রেশম প্রাণিজাত তন্তু। তুঁতগাছে পালিত গুটিপোকার দেহ নির্যাসজাত গুটি হইতে এই তন্তু পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে চীন, ভারত ও ইটালিতে যে রেশমবস্ত্র উৎপাদিত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পোশাক পরিচ্ছদের জন্য রেশমের ব্যবহার ছাড়াও বিদ্যুৎরোধক হিসাবে, অস্ত্রচিকিৎসার জন্য ও টাইপরাইটিং যন্ত্রের কার্বনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। প্যারাসুট, ফিতা প্রভৃতিও রেশম হইতে প্রস্তুত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (**Conditions of Growth**)—তুঁতগাছ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমধ্যসাগরীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মে। তুঁতগাছ ও গুটিপোকা পালনের জন্য ১৬° সেঃ উত্তাপ প্রয়োজন। গাছে গুটিপোকা নূতন পাতা খাইয়া নিজ দেহের নির্যাস হইতে গুটি প্রস্তুত করে। কয়েকদিন পরে এই গুটি অল্প গরম জলে ফেলিয়া পোকাটিকে মারিয়া পরে হস্ত দ্বারা বা যন্ত্র দ্বারা ঐ গুটি হইতে সূক্ষ্ম সুতা বাহির করিতে হয়। এইজন্য সুদক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (Principal Growing Areas)—উপরে বর্ণিত চাষের উপযোগী অবস্থা পৃথিবীর মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ বলিয়া শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইটালি, স্পেন, ইরান, গ্রীস, সিরিয়া ও তুরস্ক এবং এশিয়ার চীন, জাপান, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় রেশম উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর মোট রেশম উৎপাদন—৬৭,০০০ মেঃ টন (১৯৮৪)

চীন	৩৫ হাজার ০০ শত মেঃ টন		ভারত	৩ হাজার ০০ শত মেঃ টন	
জাপান	১৩ ,, ০০ ,, ,, ,,		উঃ কোরিয়া	২ ,, ০০ ,, ,, ,,	
সোঃ রাশিয়া	৪ ,, ০০ ,, ,, ,,		দঃ কোরিয়া	৩ ,, ০০ ,, ,, ,,	

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত।)

চীন-এর শানটুং ও ইয়াং-সি নদীর অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রেশমকীটের চাষ হয়। **চীন** রেশম উৎপাদনে পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। রেশম কারখানাগুলি হংকং, সাংহাই এবং ক্যান্টনে অবস্থিত।

জাপান রেশম উৎপাদনে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। নাগোয়া, বিওয়া হ্রদ অঞ্চল, সিওয়া নদীর মোহানা প্রভৃতি রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত। হনসুর উপকূলে সুভা হ্রদের চারিপাশে তুঁত গাছের চাষ হয়। পর্বতবেষ্টিত হওয়ায় ঝড়বৃষ্টিতে রেশমকীটের কোনো ক্ষতি হয় না। এই সকল অঞ্চলে কৃষক-পরিবারগুলি রেশমকীট পালন করে। রেশমকীট পালন হইতে শুরু করিয়া বস্ত্র রপ্তানি পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সরকার সাহায্য করিয়া থাকে। রেশমবয়ন শিল্পের কারখানাগুলি কানাজাওয়া, টগিচি, ইমানাচি ও কিয়োটো শহরে কেন্দ্রীভূত। রেশম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৩ হাজার মেঃ টন। জাপান হইতে উন্নত রেশমগুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। জাপান রেশম বস্ত্র ও গুটি রপ্তানিতে পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। জাপানের কুটিরশিল্প সাংগঠনিক ভিত্তিতে অত্যন্ত উন্নত।

সোভিয়েত রাশিয়া বর্তমানে রেশম উৎপাদনে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করিয়াছে। এই দেশে রেশমের চাষ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

ভারতে চারি ধরনের রেশম উৎপাদিত হয়ঃ

(১) তসর—পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বিহারের ছোটনাগপুর, ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশে তসর উৎপন্ন হয়।

(২) গরদ—কোয়েম্বাটুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ভাগলপুর, কাশ্মীর ও কর্ণাটকে গরদ উৎপন্ন হয়।

(৩) এণ্ডি—আসামে এণ্ডি উৎপন্ন হয়।

(৪) মুগা—আসাম, কাশ্মীর ও নীলগিরিতে মুগা উৎপন্ন হয়।

ভারতে কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা কর্তৃক রেশম উৎপাদিত হয়। ভারতে ১৯৮৪ সালে ৩ হাজার মেট্রিক টন রেশম উৎপন্ন হইয়াছে।

ইটালি (লাম্বার্ডি) ও ফ্রান্স (রোন্ উপত্যকা) পৃথিবীতে রেশম উৎপাদনের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ফ্রান্সে রোন্ নদীর তীরে রেশমকীটের চাষ ও রেশম

শিল্প বিস্তারলাভ করিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে গুটি হইতে সুতা বাহির করা হয়। স্পেনের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রেশমকীটের চাষ হয়। পৃথিবীর রেশমবাজারে ইটালি ও ফ্রান্স নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—মহার্ঘ ও অভিজাত বস্ত্র হিসাবে প্রতি দেশেই রুচিবান্ এবং বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কাছে রেশমের বিশেষ আকর্ষণ আছে। কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি না থাকিলেও চাহিদা ও বণ্টন অনুসারে রেশমের বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়।

রেশমবস্ত্র রপ্তানিতে জাপান, চীন, ইটালি, কোরিয়া এবং ভারত অগ্রণী। আমদানি ক্ষেত্রে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিই প্রধান।

রেশমকে অন্যান্য বয়ন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। কৃত্রিম রেশমের সহিত রেশমের প্রতিযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেশমশিল্প এখনও কুটির-শিল্পের সীমা অতিক্রম করিয়া বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই। জাপান ছাড়া আর কোনো দেশের কৃষি ও শিল্পপর্যায়ে রেশম-সংক্রান্ত গবেষণার তেমন মূল্য দেওয়া হয় না। বিকল্প ও কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহারও রেশমশিল্পের উন্নয়নে আর একটি বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

রবার (Rubber)

নিরক্ষীয় অঞ্চলের এক প্রকার বৃক্ষজাত রস (latex) হইতে রবার তৈয়ারি হয়। এই গাছটির নাম হেভিয়া ব্র্যাসিলিয়েনসিস্ (Hevea Brasiliensis)। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা বন্য হেভিয়ার জন্মস্থান। এই গাছের আঠা দিয়া দাগ মোছা (Rub) যায় বলিয়াই রবার (Rubber) নামটি প্রচলিত হইয়াছে। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত আমাজন অববাহিকা অঞ্চল এবং আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে পৃথিবীর মোট রবার-উৎপাদনের শতকরা ৯৯ ভাগ সরবরাহ হইত। ১৮৭৮ সালে উইক্হাম (Henry A. Wickham) নামক এক ইংরেজ ব্যবসায়ী ব্রাজিল হইতে রবার গাছের ৭০ হাজার বীজ চুরি করিয়া আনিয়া মালয়েশিয়ায় রোপণ করে। অবশ্য এই কার্যের পশ্চাতে ব্রিটিশ সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। আজ উইক্হাম নাই, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী স্বার্থ মালয়েশিয়ায় রবার বাগান সৃষ্টি করিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। সারা পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক রবার উৎপাদন ও রপ্তানিতে তাহাদের একচেটিয়া আধিপত্য এখনও ম্লান হয় নাই।

ব্যবহার (Uses)—বর্তমানে পথ-পরিবহণ (মোটরগাড়ী, বাস ইত্যাদি) এবং বিমান-পরিবহণ প্রাকৃতিক রবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মোটর-পরিবহণের অগ্রগতি রবারের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ার ফলে বিদ্যুৎ-শিল্পে রবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কি গবেষণাগারে, কি হাসপাতালে, কি খেলাধুলার আসরে, কি বর্ষাতি হিসাবে, রবার আজ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। যুদ্ধ এবং দেশরক্ষায় রবারের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শব্দ প্রতিরোধক এবং ঝাঁকুনি প্রতিরোধক হিসাবে সর্বত্র ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। তবে অধুনা বাজারে কৃত্রিম রবারের উৎপাদনের আধিক্যের ফলে প্রাকৃতিক রবারের একাধিপত্য কিছুটা ম্লান হইয়াছে।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of Growth)—রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের একচেটিয়া বাণিজ্যিক ফসল। পূর্বে মোট উৎপাদনের প্রায় ৯৯% বন্য রবার শ্বাপদসঙ্কুল আমাজনের ও মধ্য আফ্রিকার ঘন অরণ্য হইতে স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীদের সাহায্যে সংগ্রহ করা হইত। রবার সংগ্রহের সময় অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ক্রমে ক্রমে **বন্য রবার (Wild Rubber)** সংগ্রহ কমিয়া গিয়া **আবাদী রবারের (Plantation Rubber)** পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বর্তমানে বন্য রবার বিশেষ সংগৃহীত হয় না।

আবাদী রবার চাষের জন্য কমপক্ষে ২৭° সেঃ হইতে ৩০° সেঃ উত্তাপ এবং ২০০ সেঃ মিঃ বা ততোধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। প্রতিমাসেই বৃষ্টিপাত সম প্ররিমাণ হওয়া প্রয়োজন এবং তাপমাত্রাও খুব কম-বেশী না হইলেই সুবিধা। রবার চাষের জন্য জল-নিকাশী উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা দরকার। সাধারণতঃ জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত পাহাড়ের ঢালে রবার গাছের চাষ ভাল হয়।

রবারের আঠা সংগ্রহ করিবার জন্য এবং সংগ্রহের স্থানেই রবার শোধন করিবার জন্য সুলভ এবং সুদক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।

রবার গাছের পরিণত অবস্থা লাভ করিতে প্রায় ৭ বৎসর সময় লাগে। এই সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিতে হয় বলিয়া ব্যবসায়ীরা পূর্বে সহজে এই ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নি করিত না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবার উৎপাদনের উপযোগী আদর্শ অবস্থা থাকিবার ফলে মোট আবাদী রবারের ৯০% এই অঞ্চল হইতে আসে ; এখানে রবার-চাষের প্রাকৃতিক অবস্থা বিশেষ অনুকূল। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় পাহাড়ের ঢালে প্রচুর পরিমাণে ভারী দো-আঁশ মাটিযুক্ত জলনিকাশী জমি থাকায় ব্রিটিশ এবং ডাচ ব্যবসায়িগণ এখানে রবার বাগান স্থাপন করিতে কোনো অসুবিধা ভোগ করে নাই। এখানে সারা বৎসর একই ধরনের উত্তাপ থাকে এবং বৃষ্টিপাত প্রতি মাসে ১৩ সেঃ মিঃ হইতে ২০ সেঃ মিঃ-এর কম হয় না (বাৎসরিক মোট ১৭৫ সেঃ মিঃ—৩০০ সেঃ মিঃ)।

প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল (Principal Producing Areas)—আবাদী রবার এবং বন্য রবার উভয়ই নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল ; সেইজন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে রবার-চাষ সীমাবদ্ধ।

পৃথিবীর মোট প্রাকৃতিক রবার উৎপাদন—৪২ লক্ষ ৮৯ হাজার মেঃ টন
(১৯৮৪)

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
মালয়েশিয়া	১৬ লক্ষ ২৫ হাজার মেঃ টন	শ্রীলঙ্কা	১ লক্ষ ৪০ হাজার মেঃ টন
ইন্দোনেশিয়া	১১ ,, ০০ ,, ,, ,,	লাইবেরিয়া	৭৮ ,, ,, ,,
থাইল্যান্ড	৬ ,, ৫০ ,, ,, ,,	ফিলিপাইনস্	৭৩ ,, ,, ,,
ভারত	১ ,, ৮৫ ,, ,, ,,	নাইজেরিয়া	৫৫ ,, ,, ,,
চীন	১ ,, ৬৬ ,, ,, ,,	ভিয়েতনাম	৫০ ,, ,, ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত।)

মালয়েশিয়া—মালয়, উত্তর বোর্নিও ও সারাওয়াক লইয়া গঠিত এই নবীন রাষ্ট্র পৃথিবীতে রবার উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। আমাজন উপত্যকা হইতে

রবার গাছের বীজ আনিয়া এখানে রোপণ করা হইয়াছে। সুদক্ষ চীনা-শ্রমিক থাকায় রবার উৎপাদন এত সহজগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়া—এই দেশ রবার উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রাষ্ট্রপতি সুকর্নের আমলে রবার বাগানগুলি জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। বর্তমান সরকার পুরাতন মালিক ডাচ, ইংরেজ ও আমেরিকান ব্যবসায়িদের অধীনে রবার বাগানগুলি পুনরায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। রবার ইন্দোনেশিয়ার সর্বপ্রধান বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনকারী সম্পদ।

থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, চীন, ব্রুনেই, ফিলিপাইনস্, কাম্পুচিয়া এবং দক্ষিণ ভারতে রবারের চাষ হয়। আফ্রিকার নাইজেরিয়া, জায়েরে ও লাইবেরিয়ায় আবাদী রবারের চাষ হয়। আফ্রিকায় বস্তুতঃ বিদেশী মূলধন এবং আধিপত্যে বাগানগুলি পরিচালিত হয়। ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরেও রবার উৎপন্ন হয়।
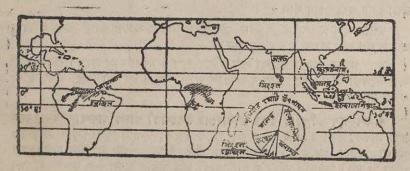
পৃথিবীর রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ। কালো দাগ দেওয়া স্থানগুলিতে আবাদী রবার এবং সরলরেখা চিহ্নিত স্থানগুলিতে বন্য-রবার উৎপন্ন হয়

উল্লেখযোগ্য বাজার (Important Markets)—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উৎপাদক দেশগুলি (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি) রবারের প্রধান রপ্তানিকারক। প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই মোট রপ্তানির শতকরা ৩০ ভাগ আমদানি করে।

তৈলবীজ (Oilseeds)

ব্যবহার (Uses)—তৈলবীজের চাষ সম্পূর্ণ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া সেই তৈলের অধিকাংশ শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তৈল আহারযোগ্য। অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য। পশুজাত চর্বি হইতে পূর্বে মানুষের তৈলের চাহিদা কিছুটা মিটিত। লোকসংখ্যার ঘনত্ব যেখানে বেশি, সেখানে পশু বা মৎস্যজাত চর্বি মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়তায় সভ্যতার অগ্রগতির পথে উদ্ভিদ্‌জাত তৈল অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে। উপরন্তু নানা গবেষণার ফলে তৈলের নানা উপজাত দ্রব্যের নানা বিচিত্র ব্যবহার প্রচলিত

হইয়াছে। নারিকেল, চীনাবাদাম, তিসি, রেড়ী, সরিষা, সয়াবীন, সানফ্লাওয়ার, তিল, কার্পাস ও অন্যান্য উদ্ভিদের ফল ও বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়।

তৈলবীজ হইতে প্রধানতঃ তৈল প্রস্তুত হইলেও কোনো কোনো তৈলবীজ অন্যান্য কার্যেও ব্যবহৃত হয়। সালাড, রং, প্রসাধন সামগ্রী, মোমবাতি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে তৈলবীজের প্রয়োজন হয়। তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায় উহা উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(১) **নারিকেল (Cocoanut)**—ক্রান্তীয় অঞ্চলের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জে ও সমুদ্রতটে নারিকেল গাছ জন্মে। আন্দামান-নিকোবর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস্, হাওয়াই, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মাদাগাস্কারে সমুদ্রতীরবর্তী অধিবাসীদের নারিকেল শুধু প্রধান খাদ্য নহে, জীবিকানির্বাহের মাধ্যম। নারিকেল চাষের জন্য ২৫° সেঃ উত্তাপ ও ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজন হয়। ইহা রোপণের প্রয়োজন হয় না, সমুদ্রজলে বীজ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রতটে অংকুরিত হয়। নারিকেলের শাঁস হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। ভারতে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার নানা জনপদে ইহা একটি মূল্যবান কুটিরশিল্প। অনেকক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পায়নও সম্ভব হইয়াছে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ফিলিপাইনস্, ইন্দোনেশিয়া, নিউ গিনি, ফিজি, সোলোমোন দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা এবং ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে নারিকেল তৈল হইতে সাবান, মার্গারিন ও উদ্ভিদজাত ঘৃত উৎপাদিত হয়, ছিবড়া দিয়া মাদুর ও দাড় তৈয়ারি হয়। ফিলিপাইনসের নারিকেল তৈল ও শাঁস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। কালিফোর্নিয়ায় (বার্কলী, লস্ এঞ্জেলস) নানা উপজাত দ্রব্য তৈয়ারির কারখানা আছে। ভারতে কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন প্রভৃতি শহরে নারিকেল তৈল ও তৈলজাত ঘি, সাবান প্রভৃতি তৈয়ারির কারখানা রহিয়াছে। ফিলিপাইনস্ নারিকেল শাঁস উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ (প্রায় ২১ লক্ষ মেট্রিক টন)।

ফিলিপাইনস্, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কা প্রধান রপ্তানিকারক। ভারত কিছু কিছু রপ্তানি শুরু করিয়াছে। জায়েরে, নাইজেরিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজও রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। আমদানিকারকদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলি প্রধান।

পামগাছের তৈল আফ্রিকার রাজ্যগুলিতে উৎপন্ন হয়। নাইজেরিয়া ও জায়েরে প্রধান উৎপাদক দেশ। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াও ইহা যথেষ্ট উৎপাদন করে। সম্পূর্ণ অংশই মার্গারিন (কৃত্রিম মাখন) শিল্পে ব্যবহৃত হয়। মালয়েশিয়া পামতৈল উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

(২) **বাদাম (Ground nut)**—উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, সুদান, ব্রাজিল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রধান। চীন আন্তর্জাতিক বাজারে সাধারণতঃ অংশগ্রহণ করে না। বাদাম উৎপাদনে ভারত প্রথম স্থানের অধিকারী। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ইহার চাষ সীমাবদ্ধ। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে ও পশ্চিম ভারতে বাদাম তৈল রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া ভেষজ ঘি উৎপাদনে ইহা প্রয়োজন। ভাজা চীনা বাদাম বিভিন্ন দেশে কিশোর-কিশোরীদের কাছে উপাদেয় খাদ্য।

নাইজেরিয়া, সেনেগাল, সুদান, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত চীনা-বাদামের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। উত্তর ইউরোপের দেশসমূহ (ব্রিটেন, পশ্চিম

জার্মানী, পর্তুগাল, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ইটালি) প্রধান আমদানিকারক। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী বাদাম আমদানি করিয়া তৈল নিষ্কাশন করে। তৈল রপ্তানিকারক হিসাবে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী বিখ্যাত।

(৩) **তিসি (Linseed)**—ইহা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। ইহার তৈল রং, বার্নিশ, লাইনোলিয়াম, ছাপাখানার কালি, কৃত্রিম চামড়া, সাবান, গ্লিসারিন এবং রবার ভালকানাইজিং-এর কাজে লাগে। **শণ (flax)** গাছে এই বীজ হয়। নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চলে ইহার উৎপাদন সীমাবদ্ধ। তিসি উৎপাদন আর্জেন্টিনা, সোভিয়েত রাশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সীমাবদ্ধ। ভারতে তিসির বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা হইতেছে এবং বিভিন্ন শিল্পে ইহার ব্যবহার হইতেছে। আর্জেন্টিনা তিসি উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে।

কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আর্জেন্টিনা প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। আমদানিকারক দেশগুলি অধিকাংশই ইউরোপে অবস্থিত। তিসির তৈল উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস্ ও ব্রিটেন প্রধান। ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস্ আমদানীকৃত তিসি হইতে তৈল নিষ্কাশন করে। ব্রিটেন তিসি হইতে নানা প্রকার রং উৎপাদনে এককালে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারী ছিল। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের আধিপত্য এখনও ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ম্লান হয় নাই।

(৪) **রেড়ি (Castor seed)**—কেশতৈল ও প্রদীপের তৈল ছাড়াও ঔষধ ও সাবান প্রস্তুত করিতে রেড়ির তৈল প্রয়োজন। পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবেও রেড়ি ব্যবহৃত হয়। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, থাইল্যান্ড, সুদান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান উৎপাদক দেশ। ভারত ও ব্রাজিল প্রধান রপ্তানিকারক। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পশ্চিম জার্মানী রেড়ি আমদানি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও স্বল্প পরিমাণে রেড়ি আমদানি করিতে হয়। রেড়ি উৎপাদনে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে (১৯৮২)।

(৫) **সয়াবীন (Soyabean)**—সয়াবীন হইতে যে তৈল নিষ্কাশিত হয় তাহা গ্লিসারিন, সাবান, রং, বার্নিশ, লাইনোলিয়াম, মুদ্রণ কালি ও মার্গারিন তৈয়ারির কাজে লাগে। যে সকল অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্থানে খাদ্য হিসাবেও সয়াবীন ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে অনেকক্ষেত্রে ইহা ছানার বিকল্প হিসাবে মিঠাই তৈয়ারির কাজে লাগে। উর্বর দো-আঁশ মাটিতে সয়াবীনের ফসল ভাল হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ব্রাজিলে ইহার ব্যাপক চাষ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উত্তরকালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ (মেদিনীপুর) ও অন্যান্য অঞ্চলে ইহার চাষ শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও চীন একযোগে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৯২% উৎপন্ন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সয়াবীন উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। চীন আন্তর্জাতিক বাজারে না আসার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল পৃথিবীর মোট রপ্তানির শতকরা ৯০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। ডেনমার্ক, ইটালি, স্পেন ও কানাডা অল্প পরিমাণে সয়াবীন রপ্তানি করে। জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস্ প্রধান আমদানিকারক। সয়াবীন হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া ব্রিটেন, জাপান ও পশ্চিম জার্মানীতে চালান দেওয়া হয়। বর্তমানে ভারত সয়াবীন-চাষ সম্প্রসারণ করিয়া তৈল রপ্তানির ব্যবস্থা শুরু করিয়াছে। কেননা তৈলবীজ উৎপাদনে ভারত শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, ভবিষ্যতে তাহার একচেটিয়া বাজার লাভের যথেষ্ট

সম্ভাবনা রহিয়াছে। তৈল নিষ্কাশনের পর যাহা থাকে তাহা হইতে নানা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

(৬) **কার্পাস বীজ (Cotton seed)**—কার্পাস গাছের বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া ইহা দ্বারা বনস্পতি ঘি প্রস্তুত করা হয়। ইহার খইল পশুর খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গ্রামোফোনের রেকর্ড, মোমবাতি, সাবান ও রং তৈয়ারি করিতে কার্পাস তৈল ব্যবহার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ব্রাজিল ও মিশর কার্পাস বীজ উৎপাদন করে। চীন কার্পাস বীজ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে এই তৈল প্রস্তুত হয়। জাপান, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী ইহার প্রধান আমদানিকারক দেশ।

(৭) **জলপাই (Olive)**—ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে জলপাই বৃক্ষ প্রচুর উৎপন্ন হয়। জলপাইয়ের তৈল ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা সাবান ও বয়নশিল্পে দরকার হয়। ইটালি, গ্রীস, স্পেন, তুরস্ক, পর্তুগাল, সিরিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মরক্কো ও টিউনিশিয়া প্রধান উৎপাদনকারক ও রপ্তানিকারক দেশ। ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, আঙ্গোলা ও ব্রাজিল প্রধান আমদানিকারক দেশ এবং স্পেন, তুরস্ক, টিউনিশিয়া, গ্রীস ও আর্জেন্টিনা রপ্তানিকারক দেশ।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Describe the influence of climate on agriculture.

[কৃষিকার্যে জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।]

উঃ 'কৃষিকার্যের উপর জলবায়ুর প্রভাব' (১৭৮—১৭৯ পৃঃ) লিখ।

2. (a) What are the different types of farming? Examine the conditions under which and the areas where they are practised and show the areas of their concentration.

[H. S. Examination, 1983 ; 1985]

(b) Write short notes on Intensive and Extensive farming.

[C. U. B. Com. 1961]

[(ক) বিভিন্ন ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা কি কি? কি পরিবেশে এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সকল কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা বিশ্লেষণ কর। (খ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: 'প্রগাঢ় চাষ' ও 'ব্যাপক চাষ'।]

উঃ (ক) 'বিভিন্ন ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা' (১৭৯—১৮২ পৃঃ) লিখ। (খ) 'প্রগাঢ় চাষ' ও 'ব্যাপক চাষ' (১৮০ পৃঃ) লিখ।

3. Describe the geographical conditions favourable for the growth of rice. Name the important rice producing countries of the world. **[H. S. Examination, 1983]**

[চাল উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা কর। বিশ্বের প্রধান প্রধান চাল উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর।]

উঃ 'ধান' (১৮৩—১৮৬ পৃঃ) লিখ।

4. Describe the geographical conditions favourable for the cultivation of paddy. What are its various uses? Mention the names of major rice-producing countries of the world.
[H. S. Examination, 1978 & 1985]

[ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। ধানের বহুবিধ ব্যবহার কি কি? পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর।]

উঃ 'ধান' (১৮৩—১৮৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. What are the uses of wheat? Under what geographical conditions and in what areas of the world is wheat cultivated? Briefly narrate the International Trade. [B. U. B. Com. 1967 & 1973]

[গমের ব্যবহার কি কি? কি রকম ভৌগোলিক অবস্থায় এবং পৃথিবীতে কোন্ কোন্ অঞ্চলে গম-চাষ হইয়া থাকে? আন্তর্জাতিক গম-বাণিজ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

উঃ 'গম' (১৮৬—১৮৯ পৃঃ) লিখ।

6. Why is there a geographical separation of the typical areas of wheat and rice production? Describe the contrasting nature of farming methods of these two crops. [C. U. B. Com. 1967]

[গম-চাষ ও ধান-চাষের অঞ্চলসমূহের ভৌগোলিক পার্থক্য কেন হয়? এই দুইটি শস্যের কৃষি-প্রণালীর বিপরীতধর্মী চরিত্র বর্ণনা কর।]

উঃ 'গম ও ধান চাষের তুলনা' (১৮৯—১৯১ পৃঃ) লিখ।

7. Describe the suitable geographical conditions for the production of tea. Indicate the principal regions of its production. Which are the tea-exporting countries?
[H. S. Examination, 1979 & 1982]

[চা-উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। ইহার প্রধান প্রধান উৎপাদক অঞ্চলের নাম কর। কোন্ কোন্ দেশ চা রপ্তানি করিয়া থাকে?]

উঃ 'চা' (১৯১—১৯৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

8. Describe the geographical conditions for the cultivation of tea. Name the principal producers of tea and give an idea about the International Trade in tea. What are the uses of tea?
[B. U. B. Com. 1961 ; C. U. B. Com. 1971 & 1974]

[চা-চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাসমূহ বর্ণনা কর। চা-এর প্রধান প্রধান উৎপাদকের নাম লিখ এবং চা-এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে একটি ধারণা দাও। চা-এর ব্যবহার কি কি?]

উঃ 'চা' (১৯১—১৯৪ পৃঃ) লিখ।

9. Give an account of world production and trade in coffee. Discuss the reasons for Brazilian monopoly in coffee trade. What are the uses of coffee?

[কফির আন্তর্জাতিক উৎপাদন ও বাণিজ্যের বিবরণ দাও। কফির বাণিজ্যে ব্রাজিলের একাধিপত্যের কারণ আলোচনা কর। কফির ব্যবহার কি কি ?]

উঃ 'কফি' (১৯৪—১৯৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

10. Describe the conditions of growth of sugar-cane and sugar-beet and indicate the principal regions of their production. Who are the important exporters of cane and beet sugar ?

[C. U. B. Com. 1952 & 1974]

[ইক্ষু ও বীট-চাষের উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর এবং উহাদের প্রধান প্রধান উৎপাদক অঞ্চলসমূহ নির্দেশ কর। ইক্ষু-চিনি ও বীট-চিনির গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি-কারক কে কে ?]

উঃ 'ইক্ষু' (১৯৭—২০১ পৃঃ) ও 'বীট' (২০১—২০৩ পৃঃ) এবং 'চিনি' (২০৩—২০৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. Give a description of the favourable conditions of sugar-cane production and also of the regions where sugar-cane is produced.

Or, What are the conditions favourable for production of coffee ? Discuss the production and world trade of coffee.

[Tripura H. S. Examination, 1979]

[ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ও উৎপাদক অঞ্চলের বিবরণ দাও।

অথবা, কফি উৎপাদনের জন্য কি কি পরিবেশ প্রয়োজন উল্লেখ কর। কফি উৎপাদনের ও বাণিজ্যের আলোচনা কর।]

উঃ 'ইক্ষু' (১৯৭—২০১ পৃঃ) ও 'কফি' (১৯৪—১৯৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

12. Describe the geographical conditions suitable for the cultivation of cotton. Name the major cotton producing regions of the world. **[H. S. Examination, 1981]**

[তুলা-চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তুলা-উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর।]

উঃ 'তুলা' (২০৫—২০৮ পৃঃ) লিখ।

13. Discuss the part played by cotton in the economic development of Egypt and discuss the factors leading to the production of this material. **[C. U. B. Com. 1965]**

[মিশরের অর্থনৈতিক উন্নতিতে তুলা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা আলোচনা কর এবং এই কাঁচামালটির উৎপাদনের উপযোগী কারণসমূহ আলোচনা কর।]

উঃ। 'মিশর' (২০৭—২০৮ পৃঃ) এবং 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২০৬ পৃঃ) লিখ।

14. Describe the geographical conditions and areas of production of the following crops : (a) Rice, (b) Tea, (c) Jute, (d) Sugar-cane. **[Specimen Questions, 1980 & 1981]**

[নিম্নলিখিত শস্যগুলি উৎপাদনের ভৌগোলিক কারণসমূহ ও উৎপাদন অঞ্চল বর্ণনা কর : (ক) ধান, (খ) চা, (গ) পাট, (ঘ) ইক্ষু।]

উঃ 'ধান' (১৮৩—১৮৬ পৃঃ), 'চা' (১৯১—১৯৪ পৃঃ), 'পাট' (২০৮—২১১ পৃঃ), 'ইক্ষু' (১৯৭—২০১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

15. Discuss the factors responsible for the concentration of Jute and Rubber cultivation in certain regions of the world. Indicate the nature of the world trade in these products. Where these two products are produced? [C. U. B. Com. 1966]

[পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে পাট ও রবারের চাষ সীমাবদ্ধ হইবার কারণসমূহ আলোচনা কর। এই শস্যগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নির্দেশ কর। কোথায় এই শস্য দুইটি উৎপন্ন হয় ?]

উঃ। 'পাট' (২০৮—২১১ পৃঃ) ও 'রবার' (২১৪—২১৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

16. Describe the geographical conditions necessary for the cultivation of rubber. Why is its cultivation concentrated in South-East Asia? [H. S. Examination, 1984]

[রবার চাষের অনুকূল ভৌগোলিক কারণগুলি বর্ণনা কর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবার চাষ কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ কি ?]

17. Describe the geographical conditions for the cultivation of rubber. Name the countries where it is grown in a commercial scale. [H. S. Examination, 1980]

উঃ। 'রবার' (২১৪—২১৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

18. (a) Mention the favourable conditions for cultivation of Rubber. (b) Mention the names of the sugar-cane producing countries. [Tripura H. S. Examination, 1981]

[(ক) রবার-চাষের অনুকূল অবস্থাগুলি উল্লেখ কর। (খ) ইক্ষু-উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর।]

উঃ। 'রবার' হইতে 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২১৫ পৃঃ) ও 'ইক্ষু' হইতে 'প্রধান উৎপাদক অঞ্চল' (১৯৮—২০১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

19. Explain the conditions of growth, areas of production and world distribution of Wheat, Cotton, Coffee, Rubber, Sugar-cane and Sugar-beet. [Specimen Question, 1981]

[গম, তুলা, কফি, রবার, ইক্ষু ও বীট উৎপাদনের উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রধান প্রধান উৎপাদক অঞ্চলের পৃথিবীব্যাপী বণ্টন বর্ণনা কর।]

উঃ। 'গম' (১৮৬—১৮৯ পৃঃ), 'তুলা' (২০৫—২০৮ পৃঃ), 'কফি' (১৯৪—১৯৭ পৃঃ), 'রবার' (২১৪—২১৬ পৃঃ), 'ইক্ষু' (১৯৭—২০১ পৃঃ) ও 'বীট' (২০১—২০২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

20. Discuss the factors responsible for the concentration of silk production in certain regions of the world. Explain why a few

countries predominate in their exports. What are the uses of silk? **[B. U. B. Com. 1964; C. U. B. Com. 1972]**

[পৃথিবীর কয়েকটি দেশে রেশম উৎপাদন সীমাবদ্ধ হইবার কারণসমূহ আলোচনা কর। অল্প কয়েকটি দেশ ইহাদের রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। রেশমের ব্যবহার কি কি?]

উঃ। 'রেশম' (২১২—২১৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

21. Name the principal varieties of oil-seeds. Describe the favourable geographical conditions for cultivation of any two of them. **[H. S. Examination, 1985]**

[প্রধান প্রধান তৈলবীজের নাম কর। ইহাদের যে কোনো দুইটির চাষের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা দাও।]

উঃ। 'তৈলবীজ' (২১৬—২১৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

22. What are the uses of hemp? Where is this produced and where exported?

[শণের ব্যবহার কি কি? কোথায় ইহা উৎপন্ন হয় এবং কোথায় রপ্তানি হয়?]

উঃ। 'শণ' (২১২ পৃঃ) লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on:

(a) Production and marketing of the principal cash crops of the tropical region. **[H. S. Examination, 1978]**

(b) Intensive and extensive farming. **[H. S. Examination, 1979]**

(c) Type of Farming. **[H. S. Examination, 1981 & 1984]**

(d) Farming Types. **[H. S. Examination, 1982]**

(e) Influence of climate on agriculture.

(f) Classification of crops.

(g) Uses of Sugar-cane.

[সংক্ষেপে টীকা লিখ:

(ক) ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন ও বাজার।

(খ) নিবিড় ও ব্যাপক কৃষি-ব্যবস্থা।

(গ) নানাবিধ কৃষি-পদ্ধতি।

(ঘ) কৃষিব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ।

(ঙ) কৃষিকার্যের উপর জলবায়ুর প্রভাব।

(চ) শস্যের শ্রেণীবিভাগ।

(ছ) ইক্ষুর ব্যবহার।]

উঃ। (ক) 'তুলা' (২০৫—২০৮ পৃঃ) ও 'পাট' (২০৮—২১১ পৃঃ) 'প্রধান

উৎপাদনকারী অঞ্চল' ও 'উল্লেখযোগ্য বাজার' লিখ। ইহা ছাড়া ক্রান্তীয় অঞ্চলে উৎপন্ন 'তৈলবীজগুলি' (২১৬—২১৯ পৃঃ) সম্বন্ধে লিখিতে হইবে।

(খ) 'প্রগাঢ় চাষ' (১৮০ পৃঃ) ও 'ব্যাপক চাষ' (১৮০ পৃঃ) লিখ।
(গ) 'বিভিন্ন ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা' (১৭৯—১৮২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।
(ঘ) 'বিভিন্ন ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা' (১৭৯—১৮২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।
(ঙ) 'কৃষিকার্যের উপর জলবায়ুর প্রভাব' (১৭৮—১৭৯ পৃঃ) হইতে লিখ।
(চ) 'ফসলের শ্রেণীবিভাগ' (১৮২ পৃঃ) হইতে লিখ।
(ছ) 'ইক্ষু' হইতে 'ব্যবহার' (১৯৭—১৯৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Construct correct answer from the following statements :

(i) Tea prefers ferrous red soil/saline soil for its growth.

(ii) Cuba/Japan exports sugar. [H. S. Examination, 1978]

(iii) Most of the farmlands of India are used in production of fibre crops/oil-seeds/cereals/sugar-cane and tobacco.

(iv) Tea plantation in South-East Asia is largely confined to the areas of alluvial soil/semi-arid region/high land/hill slopes.

(v) India is noted for mechanised farming/mixed farming/intensive subsistence farming/shifting cultivation.

[H. S. Examination, 1979]

(vi) Natural rubber is produced in South Africa/Malaysia/France.

(vii) Laterite soil is suitable for the cultivation of paddy/coffee/jute.

(viii) Dry farming method is generally used in areas of high rainfall/medium rainfall/low rainfall. [H. S. Examination, 1980]

(ix) Sugar-Beet is mainly grown in the tropical/sub-tropical/temperate regions. [H. S. Examination, 1981]

(x) Shifting cultivation is common in Mizoram/West Bengal/the U. S. A.

(xi) Brazil is noted for the production of tea/cotton/coffee.

[H. S. Examination, 1982]

(xii) Jute cultivation is concentrated at Nile delta/Ganga delta/Po valley.

(xiii) New alluvium/red soil/black soil is suitable for the cultivation of rice. [H. S. Examination, 1983]

(xiv) Jhum cultivation is practised in North-East highlands of India/Central plain of Canada/Plains of Europe.

(xv) Canada is an exporter of oilseeds/rice/wheat.

(xvi) Temperate/dry/hot-humid climate is favourable for tea plantation. [H. S. Examination, 1984]

(xvii) Siberia/New Zealand/South-East Asia has become famous in the production of plantation crops.

(xviii) Jute cultivation is concentrated in the deltas of the Krishna/Godavari/Ganga river. [H. S. Examination, 1985]

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর তৈয়ারি কর :

(i) চা উৎপাদনের পক্ষে লৌহযুক্ত রক্তাভ মৃত্তিকা/লবণাক্ত মৃত্তিকা অনুকূল।

(ii) কিউবা/জাপান চিনি রপ্তানি করে।

(iii) ভারতের অধিকাংশ কৃষিভূমিই তন্তুজ ফসল/তৈলবীজ/খাদ্যশস্য/ইক্ষু ও তামাক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(iv) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পলিমাটি/আধাশুষ্ক অঞ্চল/উচ্চভূমি/পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে চা-চাষ প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

(v) যন্ত্রচালিত কৃষি/মিশ্র কৃষি / নিবিড় জীবিকা-ভিত্তিক কৃষি / ভ্রাম্যমাণ বা অস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার জন্য ভারত বিখ্যাত।

(vi) দক্ষিণ আফ্রিকা/মালয়েশিয়া/ফ্রান্স প্রাকৃতিক রবার উৎপাদন করে।

(vii) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ধান/কফি/পাট চাষের জন্য বিখ্যাত।

(viii) শুষ্ক কৃষি-পদ্ধতি সাধারণতঃ উচ্চ বৃষ্টিপাত / মধ্যম বৃষ্টিপাত / স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

(ix) বীট প্রধানতঃ ক্রান্তীয়/উপক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

(x) মিজোরাম/পশ্চিমবঙ্গ/আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্থান পরিবর্তনশীল কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(xi) চা/কার্পাস/কফি উৎপাদনে ব্রাজিল বিখ্যাত।

(xii) নীলনদের ব-দ্বীপ/গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ/পো-নদীর উপত্যকা অঞ্চলে পাটচাষ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(xiii) নূতন পলিমাটি/লালমাটি/কৃষ্ণমাটি চাল চাষের উপযোগী।

(xiv) ভারতের উত্তর-পূর্বের উচ্চভূমি/কানাডার মধ্যাঞ্চলের সমভূমি/ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলে ঝুম চাষ করা হয়।

(xv) কানাডা তৈলবীজ/ধান/গম রপ্তানি করে।

(xvi) নাতিশীতোষ্ণ/শুষ্ক/উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু চা-চাষের অনুকূল।

(xvii) বাগিচা-ফসল উৎপাদনে সাইবেরিয়া/নিউ জীল্যান্ড/দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

(xviii) কৃষ্ণা/গোদাবরী/গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপে পাট-চাষ কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।]

2. Select the proper word or number from the bracket and fill the gap with it :

(a) In agriculture — has even today played the main role. (Topography/Climate/Soil) (b) — is prevalent in monsoonal rainfall regions. (Dry farming/wet plantation) (c) For the cultivation of rice — soil is favourable (Alluvial/Sandy/Laterite) (d) In the production of rice the place of — is first in the world (India/Bangladesh/China (e) — °C of heat is required for the production of

wheat. (14/27/32) (f) — occupies the first position in wheat production in the world. (India/U.S.S.R./Argentina) (g) —Soil is favourable for the growth of tea plants. (Loamy/Pedocal) (h) Strong — is harmful for the cultivation of coffee. (Wind/Rainfall) (i) Tea is a crop of high land in — region. (Mediterranean/Monsoonal/Equatorial) (j) A minimum rainfall of — cm in summer and a temperature of 27°C are essential for the cultivation of sugarcane. (50/200/400) (k) Beet is a — crop (Tropical/Temperate) (l) — is ideal for the cultivation of cotton. (Red-soil/Black-soil) (m) In cotton production — occupies the first place in the world. (U.S.A./China/U.S.S.R./Egypt) (n) Jute is the monopoly crop solely of the — of South-east Asia. (Monsoonal region/Equatorial region/Dry region) (o) — basin is famous for the cultivation of jute (Amazon/Normada/Brahmaputra) (p) Rubber is produced from the juice collected from a kind of tree found in — (Equatorial region/Monsoonal region/Polar region) (q) — occupies the first place in the production of Ground nut. (India/Pakistan/China) (r) — is a product of the Mediterranean climate. (Cocoanut/Olive)

[বন্ধনীর মধ্য হইতে উপযুক্ত শব্দ বা সংখ্যা বাছিয়া লইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর : (ক) কৃষিকার্যে এখনও — মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে। (ভূ-প্রকৃতি/জলবায়ু/মৃত্তিকা) (খ) মৌসুমী বৃষ্টিপাত অঞ্চলে — চালু আছে। (শুষ্ক-চাষ/আর্দ্র-চাষ) (গ) ধান-চাষের পক্ষে — মৃত্তিকা অনুকূল। (পলল/বালুকাময়/ল্যাটেরাইট) (ঘ) ধান উৎপাদনে — স্থান পৃথিবীতে প্রথম। (ভারতের/বাংলাদেশের/চীনের) (ঙ) গম উৎপাদনের জন্য — সেন্টিগ্রেড উত্তাপের প্রয়োজন। (১৪°/২৭°/৩২°) (চ) গম উৎপাদনে পৃথিবীতে — স্থান প্রথম। (ভারতের/রাশিয়ার/আর্জেন্টিনার) (ছ) চা উৎপাদনের পক্ষে — মৃত্তিকা অনুকূল। (লৌহ-মিশ্রিত রক্তাভ/লাভা-মিশ্রিত কৃষ্ণ) (জ) প্রবল – কফি গাছের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। (বায়ু/বৃষ্টিপাত) (ঝ) চা — অঞ্চলের উচ্চভূমির ফসল। (ভূমধ্যসাগরীয়/মৌসুমী/নিরক্ষীয়) (ঞ) ইক্ষু চাষের জন্য ২৭° সেঃ উত্তাপ ও গ্রীষ্মকালে কমপক্ষে — সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। (৫০/২০০/৪০০) (ট) বীট — মণ্ডলের ফসল। (উষ্ণ/নাতিশীতোষ্ণ) (ঠ) তুলা চাষের পক্ষে খুব ভাল। (লোহিত-মৃত্তিকা/কৃষ্ণ-মৃত্তিকা) (ড) তুলা উৎপাদনে — পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/চীন/রাশিয়া/মিশর) (ঢ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় — পাটের চাষ সীমাবদ্ধ। (মৌসুমী অঞ্চলে/নিরক্ষীয় অঞ্চলে/শুষ্ক অঞ্চলে) (ণ) — উপত্যকা পাট চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। (আমাজন/নর্মদা/ব্রহ্মপুত্র) (ত) — বৃক্ষজাত রস হইতে রবার তৈয়ারি হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের/মৌসুমী অঞ্চলের/মেরু অঞ্চলের) (থ) বাদাম উৎপাদনে — প্রথম স্থান অধিকার করে। (ভারত/পাকিস্তান/চীন) (দ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে — প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। (নারিকেল/জলপাই)।]

একাদশ অধ্যায়

পশুপালন
(The Pastoral Farming)

পশুর প্রয়োজনীয়তা (**Importance of Animals**)—প্রাচীনকালে মানুষ বন্যপশু শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত। পশুর মাংস খাইয়া এবং চর্ম পরিধান করিয়া তাহারা দিন কাটাইত। সেই যুগের মানুষ পশুকে বশ করিয়া গৃহপালিত পশু হিসাবে পালন করিত না ; কারণ, তাহারা কোনোখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিত না ; সর্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার আলোকে আসিয়া মানুষ পশুপক্ষীকে পোষ মানাইবার বৈপ্লবিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিল এবং পশুকে বিবিধ কার্যে নিয়োগ করিতে শিখিল। ইহার পর জীবজন্তু হইতে দুগ্ধ, মাংস, চর্ম, চর্বি, শিং, হাড়, পশম প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিল। এই সকল জিনিস মানুষের নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হইল। ক্রমশঃই গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মানুষ প্রথমে বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশু ও অশ্ব পালন করিতে শিখে। তখন হইতে গবাদি পশুচারণ করিয়া মানুষ দুগ্ধ ও মাংস পানীয় ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। পৌরাণিক যুগে শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও গো-পালনের বিচিত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মেষ, ছাগ প্রভৃতি পালন করিয়া উহাদের লোম হইতে পশম-শিল্প ও চর্ম হইতে চর্মশিল্প গড়িয়া তুলিল। চর্ম হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া জীবজন্তুর হাড়, শিং প্রভৃতি দ্রব্যও বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পশুর হাড় হইতে বোতাম, চিরুনি ও নানাবিধ কারুকার্যখচিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল। শীতপ্রধান দেশে পশমবস্ত্র অন্যতম প্রধান পরিধেয় বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন পশু হইতে সূক্ষ্ম কোমল লোম (**Fur**) পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে ইহার আদর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন যুগ হইতেই পশু পরিবহণের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এখনও ভারত ও ব্রহ্মদেশে হাতী ভার-বহনে নিযুক্ত হয়। অশ্বপৃষ্ঠে মালপত্র ও মানুষ বহন করা হয় ; মরুভূমিতে উষ্ট্রই পরিবহণের প্রধান অবলম্বন। কলিকাতার মতো আধুনিক শহরেও গরু এবং মহিষের গাড়িতে প্রচুর মালপত্র পরিবাহিত হয়। তুন্দ্রাভূমিতে বল্গা-হরিণ ও কুকুর পরিবহণের প্রধান অবলম্বন।

শ্রমশিল্পে শক্তির (**Power**) প্রয়োজন। বর্তমান যুগে কয়লা, খনিজ তৈল বা জলবিদ্যুৎ হইতেই অধিকাংশ শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে পশুশক্তির সাহায্যে অধিকাংশ কাজকর্ম করা হইত। এখনও বিভিন্ন কুটিরশিল্পে পশুশক্তি ব্যবহৃত হয়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে তৈলের ঘানিতে ও ইক্ষু পেষণযন্ত্রে এখনও গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। বহু দেশে এখনও কৃষিকার্যে গরু-মহিষাদির সাহায্যে লাঙ্গল চালানো হয়।

মানুষ শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনে পশুপালন আরম্ভ করিলেও ক্রমশঃ পশুজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌বৃত্ত পশুজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য গড়িয়া ওঠে।

পূর্বে মানুষের অবস্থা বিশেষ উন্নত না থাকায় পশুজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পর এবং উত্তর আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতি আরম্ভ হইবার পর পশুজাত দ্রব্যাদির চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ একদেশ হইতে অন্যদেশে পশুজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি হইতে শুরু করিল। আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে বৃহদাকার বাণিজ্যিক পশুচারণক্ষেত্র সৃষ্টি হইতে থাকে।

পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুচারণ-ক্ষেত্রসমূহ (Commercial Grazing Grounds of the World)—পশুপালনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন তৃণভূমি ; কারণ তৃণভূমিতে পশুর প্রধান খাদ্য তৃণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তৃণভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায় না। যে সকল স্থানে তৃণভূমি জন্মাইবার উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিদ্যমান, সেই সকল স্থানেই পশুপালন উন্নতিলাভ করে। পৃথিবীর দুইটি মণ্ডলে প্রধানতঃ বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায়ঃ (ক) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি এবং (খ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি। স্বভাবতঃই এই দুইটি মণ্ডলে পশুপালন-শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। যে সকল তৃণভূমিতে দীর্ঘ তৃণ জন্মে, সেখানে গবাদি পশু পালন করা হয়। কারণ গরু, মহিষ প্রভৃতি পশু ইহাদের বৃহদাকার মুখে দীর্ঘকায় তৃণ খাইতে পারে। যেখানে ক্ষুদ্রকায় তৃণ দেখা যায়, সেখানে ছাগ, মেষ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পশু পালিত হয়।

(ক) **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি (Temperate Grasslands)**—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে তৃণভূমি বিদ্যমান। এই তৃণভূমি জন্মিবার জন্য প্রায় ২০° সেঃ গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ এবং ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে দীর্ঘকায় তৃণ এবং কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্রকায় তৃণ জন্মে। এইজন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি বসন্ত-কালে নয়নতৃপ্তিকর সবুজ রং ধারণ করে, গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায় এবং শীতকালে তুষারাবৃত হইয়া শুভ্র বর্ণে শোভা পায়। বিভিন্ন দেশে এই তৃণভূমি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সোভিয়েত রাশিয়ায় 'স্টেপস্' (Steppes) নামে, উত্তর আমেরিকায় 'প্রেইরী' (Prairies) নামে, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাংশে 'পম্পাস্' (Pampas) নামে, দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ভেল্ড্' (Veldt) নামে এবং অস্ট্রেলিয়ায় 'ডাউন্স্' (Downs) নামে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন তৃণভূমি পরিচিত। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নিম্নলিখিত অঞ্চলের তৃণভূমিতে পশুপালন শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে ঃ

(১) উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থলে এবং মেক্সিকোর উত্তরাংশে অবস্থিত 'প্রেইরী' তৃণভূমিতে এই মহাদেশের অধিকাংশ পশু পালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টাবলয়ে প্রচুর ভুট্টা উৎপন্ন হওয়ায় ইহা পশুপালন শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বর্তমানে এই ভুট্টাবলয় উত্তর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পশুপালন-কেন্দ্র। প্রেইরী অঞ্চল ছাড়াও পশ্চিমাংশের ইন্টারমনটেন মালভূমিতে বহু সংখ্যক পশু পালিত হয়।

উত্তর আমেরিকার তৃণভূমির অধিকাংশ স্থানে গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। টেক্সাস্ অঞ্চলে অ্যাঙ্গোরা ছাগলও পালিত হয়। পশুখাদ্য হিসাবে এখানকার ভুট্টা

ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া এখানে প্রচুর খড় উৎপন্ন হয়। বিস্তীর্ণ প্রেইরী অঞ্চলের গবাদি পশু প্রধানতঃ মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। জলসেচযুক্ত অঞ্চলে অল্পপরিসর স্থানে অধিক তৃণ ও শস্যাদি জন্মে বলিয়া ইহা দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুপালনের বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে মেষ পালন করা হইয়া থাকে। পশ্চিমাংশের মেষ-পালনক্ষেত্র হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ পশম আসে। টেক্সাসের পশ্চিমাংশে ও মধ্যাংশে প্রচুর মেষ পালিত হয়। টেক্সাসে এই অঞ্চলের অধিকাংশ অ্যাঙ্গোরা ছাগল পাওয়া যায়: বর্তমানে উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গো-পালনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান, মেষ-পালনে চতুর্থ স্থান এবং শূকর পালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

(২) দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির-অন্তর্গত আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রাজিল বর্তমানে পশুপালনে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখানকার এই তৃণভূমির নাম 'পম্পাস'। এই তৃণভূমি উচ্চশ্রেণীর গবাদি পশুপালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমাংশে ৪৫ সেঃ মিঃ এবং পূর্বাংশে ১০০ সেঃ মিঃ। এই বৃষ্টিপাত তৃণ-উৎপাদনের উপযোগী। মৃদু জলবায়ুর দরুন প্রায় সারা বৎসর পশুপালন করা সম্ভব। শীতের সময় পশুর দেহে প্রচুর মাংসের সৃষ্টি হয় বলিয়া এখানে মাংসপ্রদায়ী পশুর সংখ্যা অনেক বেশী। গো-মাংস রপ্তানিতে এই অঞ্চলের আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে প্রথম স্থান (৪৪%) অধিকার করে। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় অধিকাংশ মাংস রপ্তানি হইয়া থাকে। গমের রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এখানকার লোক অনেক সময় তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া গম চাষ করে। এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মেরিণো মেষ পালিত হয়। এই জাতীয় মেষের গায়ে প্রচুর পশম পাওয়া যায়। মেষ-মাংস রপ্তানিতে আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান (২০%) অধিকার করে। উরুগুয়ের তিন-চতুর্থাংশ জমিতে গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। এই দেশের মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ পশুজাত দ্রব্য। এই দেশে জই পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্রাজিলের দক্ষিণাংশে এই দেশের অধিকাংশ পশু পালিত হয়।

(৩) **অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডের** বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পশুপালনের বিশেষ উপযোগী। আমদানিকারক দেশসমূহ বহু দূরে অবস্থিত হইলেও এই দুইটি দেশ পশুজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়ার মোট রপ্তানির শতকরা ৬৫ ভাগ এবং নিউ জিল্যান্ডের মোট রপ্তানির শতকরা ৮০ ভাগ পশুজাত দ্রব্য। অস্ট্রেলিয়ায় জনপ্রতি ১০টি এবং নিউ জিল্যান্ডে ২০টি মেষ আছে। অস্ট্রেলিয়া অপেক্ষা নিউ জিল্যান্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ পশুপালনের পক্ষে অধিক উপযোগী। অস্ট্রেলিয়ায় কোনো কোনো বৎসর বৃষ্টিপাতের অভাবে পশুপালনের অসুবিধা হয়; কিন্তু নিউ জিল্যান্ডে বৃষ্টিপাতের অভাব কখনই পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া পশুপালনের কোনো অসুবিধা হয় না। এই অঞ্চলের মেষপালন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মেষপালনে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পশম-রপ্তানিতে পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম স্থান এবং নিউ জিল্যান্ড দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

(৪) **দক্ষিণ আফ্রিকার** 'ভেলড' তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলে ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া

দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র উভয় প্রকার তৃণ জন্মে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ তৃণভূমির উচ্চতা ৯০০ মিটার হইতে ১,৮০০ মিটার। এই সকল মালভূমির উচ্চ অংশে শীতকালে বরফ পড়ে বলিয়া বৎসরের প্রায় একশত দিন পশুপালনে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এখানকার মেষপালন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ মেষ উচ্চশ্রেণীর মেরিণোজাতীয়। পশম উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই দেশের বৃষ্টি-বহুল স্থানে গবাদি পশু পালন করা হয়। কিন্তু এখানকার গোমাংস নিম্নশ্রেণীর। ইহা ছাড়া কোনো কোনো স্থানে ছাগল পালিত হয়।

(৫) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ডেনমার্ক, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস্ ও জার্মানী এবং পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত রাশিয়া, হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ডের তৃণভূমিতে প্রচুর গরু ও মেষ পালিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ দুগ্ধ সংক্রান্ত (**Dairy**) শিল্পে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। কারণ, এই সকল দেশে গবাদি পশুর সংখ্যাই বেশী, সোভিয়েত রাশিয়ার স্টেপ্‌স্ তৃণভূমি এবং ব্রিটেনের ইয়র্কশায়ার মেষপালনে খুবই উন্নতিলাভ করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া বর্তমানে মেষপালনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান এবং গবাদি পশু পালনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের অল্প বৃষ্টিপাত তৃণভূমি সৃষ্টির পক্ষে খুবই উপযোগী।

(খ) **ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি (Tropical Grasslands)**—ক্রান্তীয় মণ্ডলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল অপেক্ষা বেশী—৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১৬০ সেঃ মিঃ। ইহার ফলে অধিকাংশ স্থানে দীর্ঘকায় তৃণ পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় তৃণ গবাদি পশুপালনের উপযোগী বলিয়া মেষ অপেক্ষা গবাদি পশু ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইলেও অত্যধিক তাপমাত্রায় বৃষ্টিপাতের জল শুকাইয়া জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। অধিক তাপমাত্রা ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য এখানকার তৃণ পুষ্টিকর হয় না। ইহা ছাড়া নানাবিধ ক্রান্তীয় ব্যাধির জন্য এখানকার বহু পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাপ এবং বন্যপশুও এখানকার বহু পশুর মৃত্যুর কারণ। বর্তমানে এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য দেশে পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে পশুমৃত্যুর হার অনেক কমিয়াছে। তাপমাত্রা বেশী বলিয়া এখানকার মেষের পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। বর্তমানে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সঙ্গে গো-মাংসের রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রান্তীয় অঞ্চল প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। উপযুক্ত ও পুষ্টিকর পশুখাদ্য উৎপাদন, পরিবহণের সুব্যবস্থা, পশুরোগ নিবারণের ব্যবস্থা ও উচ্চশ্রেণীর পশু দ্বারা প্রজননের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে এই অঞ্চল পশুপালনে আরও উন্নতিলাভ করিবে। ক্রান্তীয় মণ্ডলের নিম্ন-লিখিত অঞ্চলে পশুপালন বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

(১) **আফ্রিকার সাভানা** অঞ্চলে পশুপালন উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই মহাদেশের এক-তৃতীয়াংশে সাভানা তৃণ জন্মে। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সেঃ মিঃ হইতে ১২৫ সেঃ মিঃ। নাইজেরিয়া, সুদান, উগান্ডা, কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে (রোডেসিয়া), ট্যাঙ্গানাইকা, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ সাভানা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকায় তৃণ থাকায় এবং তাপমাত্রা অধিক বলিয়া গরু এখানকার প্রধান গৃহপালিত পশু। সাভানা অঞ্চলে মাংস-প্রদায়ী গরুর সংখ্যাই বেশী। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ছাগল, শূকর ও মেষ পালিত হয়। জিরাফ ও জেব্রা এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য তৃণভোজী পশু।

(২) **দক্ষিণ আমেরিকার** ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে প্রধানতঃ গরু পালিত হয়। এখানকার সাভানা ঘাস গরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু ইউরোপীয়গণ আসিবার পূর্বে এই অঞ্চলে গরু পালিত হইত না। এই অঞ্চলে কয়েকটি বিখ্যাত পশুচারণ-ক্ষেত্র বিদ্যমান ; তন্মধ্যে কলম্বিয়া ও বলিভিয়ার 'সাভানা', ভেনেজুয়েলার 'লানোস্', ব্রাজিলের 'ক্যাম্পোস্', উত্তর আর্জেন্টিনা ও পশ্চিম প্যারাগুয়েের 'চাকো' তৃণভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার পশু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না এবং রপ্তানি বাণিজ্যে এই অঞ্চলের গোমাংস নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া পরিচিত। ক্রান্তীয় অঞ্চলভুক্ত পেরুর দক্ষিণাংশে সমুদ্রবায়ুর জন্য মৃদু জলবায়ু থাকায় আন্ডিজ পর্বতের পাদদেশে প্রচুর মেষ পালিত হয়।

(৩) **অস্ট্রেলিয়ার** উত্তরাংশে ও উত্তর-পশ্চিমাংশে ক্রান্তীয় জলবায়ুতে প্রচুর গবাদি পশু পালিত হয়। ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত রেখার পূর্বাংশে অধিকাংশ পশু পালিত হয়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পূর্বাংশে ক্রমশঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে যতই পূর্বদিকে যাওয়া যায়, ততই পশুপালনের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

(৪) **ভারতে** ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। গবাদি পশুর সংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। নদী-উপত্যকায় এখানকার অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। ভারতে হিন্দুগণ গোমাংস ভক্ষণ না করায় মাংসের ব্যবসায়ে এই দেশ বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ক্রান্তীয় ব্যাধি, পশুখাদ্যের অভাব, গো-প্রজননের সুবন্দোবস্তের অভাব ও ব্যবসায়-ভিত্তিক পশুপালন না হওয়ায় এই দেশে গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ধর্মের অনুশাসনের জন্য গোমাংস রপ্তানিতে উন্নতিলাভ না করিলেও চর্ম-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

পশু ও পশুজাত দ্রব্য
(Animal and Animal Products)
গবাদি পশু (Cattle)

প্রাচীনকাল হইতেই গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। গাভী, ষাঁড়, বলদ, বাছুর ইত্যাদি সকল প্রকার গরুকে একত্রে গবাদি পশু বলা হয়। আফ্রিকার দেশসমূহে গবাদি পশুর সাহায্যে বিনিময় প্রথা কার্যকরী করা হইত। চীন ও ভারতে প্রাচীন-কাল হইতে গরু ও মহিষ কৃষিকার্যে লাঙ্গল চালাইবার জন্য ও ভারবহনের জন্য নিযুক্ত হইত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ক্রমশঃ গবাদি পশুপালন উন্নতিলাভ করে। গবাদি পশু প্রধানতঃ তিনভাবে **ব্যবহার** করা হয়—ভারবহনে, ভূমিকর্ষণে এবং মাংস, চর্ম ও দুগ্ধ উৎপাদনে। গোময়ও মানুষের প্রয়োজনে লাগে ; উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। এইজন্য ভারতের হিন্দুগণ গরুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং গোমাংস ভক্ষণ করা পাপ বলিয়া মনে করে। ইহার ফলে ভারতে গোমাংসের ব্যবসায় উন্নতিলাভ করে নাই। গো-দুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন, পনির প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। অনুন্নত দেশে এখনও গরু ও মহিষের গাড়িতে মালপত্র পরিবাহিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়িতে মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। গবাদি পশুর চর্ম অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ ; ইহা প্রধানতঃ জুতা ও অন্যান্য চর্মদ্রব্য প্রস্তুতকার্যে ব্যবহৃত হয়। গরু ও মহিষের হাড় সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের শিং ও খুর দিয়া নানাবিধ কারুকার্যখচিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু প্রধানতঃ বিস্তীর্ণ দীর্ঘকায় তৃণযুক্ত অঞ্চলে পালিত হয়। ইহাদের জন্য খুব বেশী যত্ন লওয়ার প্রয়োজন হয় না ; বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে বা ভুট্টাক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলেই হয়। মাংসের প্রয়োজনের সময় ইহাদের তৃণভূমি হইতে বধ্যভূমিতে লইয়া আসা হয়। কিন্তু দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পালন করিতে হয়। অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিয়া দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। প্রতিদিন দুইবার দুগ্ধ দোহন করিতে হয়। দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুর পালন ক্ষেত্রের নিকটেই সাধারণতঃ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প উন্নতিলাভ করে।

গবাদি পশুপালন অঞ্চল (Cattle rearing areas)—গবাদি পশুপালনের জন্য বিস্তীর্ণ তৃণভূমি প্রয়োজন। দীর্ঘকায় তৃণ ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোনো কোনো অঞ্চলে ভুট্টা, যব, রাই, জই প্রভৃতি গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খড়, ভুসি, খইল প্রভৃতি ইহাদের আনুষঙ্গিক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলেই অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। অধিক তাপযুক্ত ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গবাদি পশুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী।

পৃথিবীর গরুর সংখ্যা (১৯৮৪)

মোট সংখ্যা—১২৬ কোটি ৪৪ লক্ষ

দেশ	সংখ্যা	দেশ	সংখ্যা
ভারত	১৮ কোটি ২২ লক্ষ	আর্জেন্টিনা	৫ কোটি ৩৫ লক্ষ
ব্রাজিল	১২ ,, ৯০ ,,	বাংলাদেশ	৩ ,, ৬৩ ,,
সোঃ রাশিয়া	১১ ,, ৯৬ ,,	ইথিওপিয়া	২ ,, ৬০ ,,
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	১১ ,, ৪০ ,,	কলম্বিয়া	২ ,, ৪০ ,,
চীন	৫ ,, ৮৬ ,,	অস্ট্রেলিয়া	২ ,, ১৮ ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে গৃহীত।)

ভারত—পৃথিবীতে গবাদি পশুপালনে **প্রথম স্থান** অধিকার করিলেও গো-মাংস উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে এই দেশ বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। হিন্দুরা গো-মাংস ভক্ষণ করা এবং গো-মাংসের ব্যবসায় করা ধর্মবিগর্হিত কাজ বলিয়া মনে করে। এইজন্য গো-মাংস রপ্তানিতে এই দেশ বিশেষ কোনো অংশ গ্রহণ করে না। বহু গরু ভূমিকর্ষণে ও ভারবহনে নিযুক্ত হয় বলিয়া এবং গাভী-প্রতি দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম বলিয়া উদ্বৃত্ত দুগ্ধ বেশী পরিমাণে না পাওয়ায় দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্প উন্নতিলাভ করে নাই। ভারতে গো-পালনের উপযুক্ত জলবায়ু থাকায় গবাদি পশুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। অধিকাংশ গবাদি পশু গৃহপালিত পশু হিসাবে পালিত হয় ; বৃহদাকার বাণিজ্যিক পশুচারণ ক্ষেত্রের সংখ্যা খুব কম। মধ্য প্রদেশ, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। অন্যান্য রাজ্যেও অল্পবিস্তর গবাদি পশু পাওয়া যায়।

সোভিয়েত রাশিয়া—বর্তমানে এই দেশ গো-পালনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। স্টেপস্ অঞ্চলে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ

কৃষিখামারেও পশুপালনের সুবন্দোবস্ত আছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত পশুপালন শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। ভুট্টা ও অন্যান্য পশুখাদ্য এই দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্তমানে মোট পশুখাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪৮ কোটি মেঃ টন। এখানকার গবাদি পশু বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিয়া গাভী-প্রতি বৎসরে ২,৭০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া যায়। মাংস ও চর্ম-উৎপাদন এবং দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পের উন্নতির জন্য এই দেশে গবাদি পশু পালিত হয়।

এশিয়ার চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল প্রভৃতি দেশে গরু পালিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—গবাদি পশুপালনে এই দেশ পৃথিবীতে **চতুর্থ স্থান** অধিকার করে। বিস্তীর্ণ প্রেইরী তৃণভূমি ও ভুট্টাক্ষেত প্রধানতঃ গো-পালনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্বাঞ্চলের ভুট্টাবলয়ে প্রধানতঃ দুগ্ধের জন্য এবং পশ্চিমাঞ্চলের তৃণভূমিতে প্রধানতঃ মাংসের জন্য গবাদি পশু পালিত হয়। স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া গো-মাংস রপ্তানি করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব নহে। চিকাগো, সেন্ট লুই, সেন্ট পল্স প্রভৃতি এই দেশের মাংস ও দুগ্ধ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র।

উত্তর আমেরিকার **কানাডার বিস্তীর্ণ প্রেইরী** তৃণভূমিতে গবাদি পশু পালিত হয়। এই দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পেও বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের **ব্রাজিল** গবাদি পশুপালনে পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। **আর্জেন্টিনা** ও উরুগুয়ের পম্পাস, উত্তর আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ের চাকো, ভেনেজুয়েলার লানোস, কলম্বিয়া ও বলিভিয়ার সাভানা তৃণভূমি গবাদি পশুপালনের জন্য বিখ্যাত। অধিকাংশ পশু মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়; স্থানীয় চাহিদা অনেক কম। সেইজন্য আর্জেন্টিনা গো-মাংস (Beef) রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।
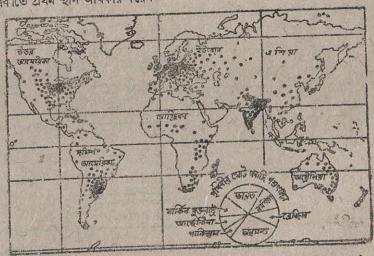
ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস্, ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ গো-পালনে উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিস্তৃত তৃণভূমি না থাকায় অল্প জায়গার মধ্যে এখানে পশুপালনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। সেইজন্য

এই সকল দেশে সাধারণতঃ দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। ডেনমার্ক দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। অন্যান্য দেশেও দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে মাংস-প্রদায়ী গবাদি পশুর সংখ্যা অল্প হইলেও ইহা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর বলিয়া পশু-প্রতি অধিক মাংস পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের সাভানা অঞ্চলে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই দেশের প্রায় অর্ধেক গবাদি পশু পাওয়া গেলেও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর গবাদি পশু পাওয়া যায়। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় গো-মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে এই দেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই দেশের তিন-চতুর্থাংশ গবাদি পশু মাংসের জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ দুগ্ধের জন্য পালিত হইয়া থাকে।

নিউ জিল্যান্ডের তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি পশু পালিত হয়। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু পালিত হয়। এই দেশে গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ২,০০০ কিলোগ্রাম।

মেষ (Sheep)

পশুপালন শিল্পে গবাদি পশুর পরই মেষের স্থান। প্রধানতঃ মাংস (mutton) ও পশমের (wool) জন্য মেষ পালিত হয়। কোনো কোনো স্থানে মেষ হইতে অল্প পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়। শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশমী বস্ত্র প্রয়োজন। সেইজন্য শীতপ্রধান দেশে অধিকাংশ পশম এবং পশমী বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা (Geographical Conditions for Sheep rearing)—মেষ প্রধানতঃ ক্ষুদ্রকায় তৃণ খাইয়া জীবন ধারণ করে। সেইজন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি মেষপালনের উপযোগী। কারণ, এখানকার অল্প বৃষ্টিপাতে ক্ষুদ্রকায় তৃণভূমি সৃষ্টি হয়। মোটামুটি ১০° সেঃ হইতে ১৫° সেঃ

উত্তাপ, ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ের উঁচু-নীচু জমি মেষপালনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। শীতল ও শুষ্ক স্থানে মেষের গায়ে পশমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অত্যধিক শীতল আবহাওয়া মেষের পশম নষ্ট করিয়া ফেলে। সেইজন্য উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধে পশম-প্রদায়ী মেষের সংখ্যা অনেক বেশী।

মেষপালন অঞ্চল (Sheep rearing areas)—ব্যবহার অনুসারে মেষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—মাংস-প্রদায়ী মেষ এবং পশম-প্রদায়ী মেষ।

পৃথিবীর মেষপালন (১৯৮৪)

মোট সংখ্যা—১১৩ কোটি ৮০ লক্ষ

সোঃ রাশিয়া	১৪ কোটি ৫৩ লক্ষ	ব্রিটেন	৩ কোটি ৪৫ লক্ষ
অস্ট্রেলিয়া	১৩ „ ৮৬ „	ইরান	৩ „ ৪০ „
চীন	৯ „ ৮৯ „	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩ „ ১৩ „
নিউ জিল্যান্ড	৬ „ ৯৭ „	আর্জেন্টিনা	৩ „ ০ „
তুরস্ক	৪ „ ৮৭ „	পাকিস্তান	২ „ ৪৩ „
ভারত	৪ „ ৯ „	ইথিওপিয়া	২ „ ৩৫ „

(F. A. O. Monthly Bulletin, January 1985 হইতে সংগৃহীত।)

মাংস-প্রদায়ী মেষপালনের জন্য তৃণবহুল বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রয়োজন। অধিক তৃণ ভক্ষণ করিলে মেদ বেশী হয় বলিয়া তৃণবহুল স্থানের মেষ হইতে অধিক পরিমাণে মাংস পাওয়া যায়। মেষ-মাংস উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়া, চীন, নিউ জিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ভারত, ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও প্রচুর মেষ-মাংস উৎপন্ন হয়।

মেষ-মাংস ও মেষশাবক (মাংসের জন্য) রপ্তানিতে নিউ জিল্যান্ড প্রথম (৫৩%), অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় (২৬%) এবং আর্জেন্টিনা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন প্রচুর পরিমাণে মেষ-মাংস উৎপন্ন করিলেও স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া ইহাদের পক্ষে রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নহে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে ব্রিটেন প্রথম স্থান (৯৫%) অধিকার করে।

ছাগল (Goat)

পৃথিবীর বহু দেশে ছাগল প্রতিপালিত হয়। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী। নিকৃষ্ট তৃণ খাইয়া ছাগল জীবন ধারণ করিতে পারে। যে সকল অঞ্চল গরু, মহিষ ও মেষ পালনের পক্ষে অনুপযুক্ত সেই সকল স্থানে ছাগল পালন করা যায়। মরুপ্রায় অঞ্চলের নিকৃষ্ট তৃণ খাইয়াও ইহারা বাঁচিয়া থাকে। তাই ইহাদিগকে দরিদ্র মানুষের বন্ধু বলা হয়। যাহাদের অন্য পশুপালন করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারাও ছাগল পালন করিতে পারে। ছাগল দুধ দেয়, ইহাদের মাংস খাইতে সুস্বাদু। বিশেষ করিয়া যাহারা গোমাংস খায় না, তাহারা ছাগলের মাংস খাইয়া থাকে। ইহাদের চামড়া নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ পাহাড়-পর্বতে প্রতিপালিত ছাগলের লোম উৎকৃষ্ট

পশমরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতের মধ্যে কাশ্মীরে প্রতিপালিত ছাগলের পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হয়।

ছাগল পালন অঞ্চল (**Goat-rearing areas**)—ছাগল প্রতিপালনে **ভারত** পৃথিবীতে **প্রথম স্থানের** অধিকারী। **চীন দ্বিতীয় স্থান** দখল করিয়াছে। ভারতের অন্তর্গত হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমিতে ও দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে সবচেয়ে বেশী ছাগল প্রতিপালিত হয়। **নাইজেরিয়া, তুরস্ক, ব্রাজিল, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ** প্রভৃতি ছাগল পালনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

পৃথিবীর ছাগলের সংখ্যা (১৯৮৪)

মোট সংখ্যা ৪৬ কোটি ৫ লক্ষ

ভারত	৮	কোটি	৮	লক্ষ		ইরান	১	কোটি	৩৬	লক্ষ
চীন	৬	,,	৮০	,,		সুদান	১	,,	৩০	,,
পাকিস্তান	২	,,	৮৭	,,		বাংলাদেশ	১	,,	২১	,,
নাইজেরিয়া	২	,,	৬০	,,		মেক্সিকো	১	,,	৪	,,
ইথিওপিয়া	১	,,	৭৩	,,		ব্রাজিল		,,	৮৫	,,
তুরস্ক	১	,,	৬৭	,,		ইন্দোনেশিয়া		,,	৭৯	,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত।)

শূকর (Pig)

মাংস ও চর্বির জন্য প্রধানতঃ শূকর পালন করা হয়। নিকৃষ্ট জিনিস ও আবর্জনা খাইয়া শূকর বাঁচিতে পারে বলিয়া এবং প্রায় সকল প্রকার জলবায়ুতে শূকর বাস করিতে পারায়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কমবেশী শূকর দেখা যায়। ভুট্টা খাইলে শূকরের চর্বি ও মাংস বৃদ্ধি পায় বলিয়া ভুট্টা অঞ্চলে শূকরপালন খুবই লাভজনক। শূকর একবারে অনেকগুলি বাচ্চা দেয় বলিয়া শূকর-মাংস উৎপাদনের খরচ অনেক কম।

শূকর-পালন অঞ্চল (**Pig rearing areas**)—পৃথিবীতে প্রায় ৭৮ কোটি শূকর পালিত হয়। **চীনদেশে** সর্বাপেক্ষা বেশী (প্রায় ৩১ কোটি) শূকর পাওয়া যায়। শূকরের মাংস চীনাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এই দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই কমবেশী শূকর পালিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া শূকর পালনে **দ্বিতীয় স্থান** (৭·৬৫ কোটি) অধিকার করে। ইউরোপীয় রাশিয়ায় প্রায় সর্বত্রই শূকর পালিত হয়। আলজেরিয়া হইতে পাকিস্তান পর্যন্ত মুসলমানপ্রধান দেশে শূকর পালিত হয় না। কারণ, ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমানগণের মনুষ্য পুরীষ খাদক শূকরের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** ভুট্টাবলয়ে প্রচুর শূকর (৫·৩২ কোটি) পাওয়া যায়। শূকর-পালনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে। শূকরের মাংস ও চর্বি টিনবন্দী করিয়া প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। আইওয়া ও মিসৌরী রাজ্য শূকর পালনের জন্য বিখ্যাত। চিকাগো শূকর-মাংস ও চর্বি রপ্তানির শ্রেষ্ঠ বন্দর। বর্তমানে জাহাজের হিমপ্রকোষ্ঠ বোঝাই করিয়া তাজা মাংস বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সহজ হইয়াছে। **পশ্চিম ইউরোপের** দেশসমূহের মধ্যে ফ্রান্স, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক,

নেদারল্যান্ডস্, পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানী, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ শূকর পালনে উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই সকল দেশের মাংস স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে ব্যয় হয়। **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রাজিলে অনেক শূকর পাওয়া যায়।

শূকরের মাংস (Pork, Bacon, Ham) ও চর্বি (Lard) **রপ্তানিতে** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। কানাডা, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস্ ও আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশও শূকরের মাংস রপ্তানি করে। **আমদানি-কারক** দেশসমূহের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশম (Wool)

মেষ হইতে প্রধানতঃ পশম উৎপন্ন হইলেও অন্যান্য জন্তুর লোম হইতেও পশম পাওয়া যায়। চীন দেশে ছাগল ও উটের লোম হইতে, সোভিয়েত রাশিয়ায়, তুর্কিস্তানে উটের লোম হইতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যাঙ্গোরা ছাগলের লোম হইতে, কাশ্মীর ও তিব্বতে ছাগলের লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভাইকুলা নামক এক প্রকার বন্যজন্তুর লোম হইতে সূক্ষ্ম পশম উৎপন্ন হয়। এই মহাদেশের আন্ডিজ পর্বতের পাদদেশে আলপাকা, ল্লামা প্রভৃতি জন্তুর লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়।

প্রধানতঃ মাংস (mutton) ও পশমের (wool) জন্য মেষ পালিত হয়। সেইজন্য মেষকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—মাংস-প্রদায়ী মেষ ও পশম-প্রদায়ী মেষ।

পশম-প্রদায়ী মেষ হইতে উৎপন্ন পশম **তিন প্রকার**। আফ্রিকায় উদ্ভূত 'মেরিনো' মেষের পশম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইজাতীয় মেষ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, নিউ জিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশেও পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মিশ্রজাতির মেষ হইতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত পশম পাওয়া যায়। নিউ জিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পেরু প্রভৃতি দেশে এইজাতীয় পশম পাওয়া যায়। এশিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় কর্কশ ও স্থূল পশমযুক্ত মেষ পালিত হয়। ইহাদের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

পশম-উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা (Factors Responsible for the Production of Wool)—পশম-প্রদায়ী মেষ প্রধানতঃ ক্ষুদ্রকায় তৃণ খাইয়া জীবন-ধারণ করে। সেইজন্য **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি** এইজাতীয় মেষপালনের উপযোগী ; কারণ, এখানকার অল্প বৃষ্টিপাতে ক্ষুদ্রকায় তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। মোটামুটি ১৩° সেঃ হইতে ২৫° সেঃ উত্তাপ, ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ **বৃষ্টিপাত** এবং **উঁচুনিচু জমি** মেষপালনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। শীতল ও শুষ্ক স্থানে মেষের গায়ে পশমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অত্যধিক শীতল আবহাওয়ায় মেষের পশম নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধে পশম-প্রদায়ী মেষের সংখ্যা অনেক বেশী। এই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে পৃথিবীর অধিকাংশ পশম-প্রদায়ী মেষ পাওয়া যায়।

পশম উৎপাদনকারী অঞ্চল (Wool producing areas)—দক্ষিণ গোলার্ধের জলবায়ু পশম-প্রদায়ী মেষপালনের বিশেষ উপযোগী। এখানে অত্যধিক শীতল জলবায়ু না থাকায় মেষের পশম নষ্ট হইতে পারে না।

পৃথিবীর পশম উৎপাদন (১৯৮৪)

মোট পশম উৎপাদন—২৯ লক্ষ ৫ হাজার মেঃ টন

অস্ট্রেলিয়া	৭ লক্ষ ২২ হাজার মেঃ টন	তুরস্ক	৬৪ হাজার মেঃ টন
সোঃ রাশিয়া	৪ ,, ৬০ ,, ,,	ব্রিটেন	৫৩ ,, ,,
নিউ জিল্যান্ড	৩ ,, ৬৩ ,, ,,	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৪৫ ,, ,,
চীন	২ ,, ৫ ,, ,,	ভারত	৩৮ ,, ,,
আর্জেন্টিনা	১ ,, ৫৫ ,, ,,	রোমানিয়া	৩৮ ,, ,,
দঃ আফ্রিকা	১ ,, ১৪ ,, ,,	বুলগেরিয়া	৩৭ ,, ,,

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত ।)

অস্ট্রেলিয়া মেষপালনে পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ মেষ পশমের জন্য প্রতিপালন করা হয় বলিয়া পশম উৎপাদনে ও রপ্তানিতে এই দেশ **শ্রেষ্ঠ স্থান** অধিকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে অধিকাংশ মেষ পালিত হয়। এখানকার অধিকাংশ পশম ব্রিটেনে প্রেরিত হয়।

সোভিয়েত রাশিয়া ক্রমশঃই মেষপালনে উন্নতিলাভ করিতেছে। বর্তমানে মেষপালনে এই দেশ পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। পূর্বে এই দেশে পশমের পরিমাণ অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই দেশ পশম উৎপাদনে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। এই দেশের পশম অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও অত্যধিক শীতের জন্য এখানে স্থানীয় পশমের প্রচুর চাহিদা বিদ্যমান। স্টেপস্ অঞ্চলে অধিকাংশ পশম প্রদায়ী মেষ পালিত হয়।

নিউ জিল্যান্ড পশম উৎপাদনে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে। এখানকার মৃদু জলবায়ু ও বিস্তীর্ণ তৃণভূমি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মেষপালনের সহায়ক। দক্ষিণাংশের পার্বত্য অঞ্চলে 'মেরিনো' মেষ, উত্তরাংশে 'রোমনে' মেষ এবং ক্যান্টারবেরীর সমভূমিতে মিশ্রজাতীয় মেষ পালিত হয়। পশমের রপ্তানি বাণিজ্যেও এই দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পম্পাস্ তৃণভূমিতে ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে প্রচুর পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। এখানকার পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হইলেও অধিকাংশ পশম ইউরোপের দেশসমূহে সহজেই রপ্তানি হইয়া থাকে। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** উত্তর-পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চলে অধিকাংশ পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। অত্যধিক শীতের জন্য এখানকার পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। বর্তমানে মিশ্র প্রজননের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় চাহিদা বেশী বলিয়া বিদেশ হইতে প্রচুর পশম আমদানি করা হয়। **দক্ষিণ আফ্রিকার** উচ্চ ভেল্ড তৃণভূমিতে ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। উচ্চশ্রেণীর ব্রিটিশ ও মেরিনো মেষ দ্বারা প্রজননের ফলে এখানকার পশম অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। এই দেশের অধিকাংশ পশম ব্রিটেনে প্রেরিত হয়। ভারত ও চীনের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া ইহা প্রধানতঃ কার্পেট প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত

হয়। ইহা ছাড়া চীন, ব্রিটেন, স্পেন, উরুগুয়ে, চিলি, পেরু, কানাডা প্রভৃতি দেশেও পশম উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য (Trade)—অধিকাংশ পশমবয়ন-শিল্প উত্তর গোলার্ধের শিল্পপ্রধান দেশসমূহে অবস্থিত। কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অধিকাংশ পশম উৎপন্ন হয় দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহে। দক্ষিণ গোলার্ধের পশম-উৎপাদনকারী দেশসমূহে লোকসংখ্যা কম এবং ইহারা এখনও পশম-বয়ন শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য পশমের মোট রপ্তানির শতকরা ৯৮ ভাগ দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহ হইতে আসে। আমদানিকারক দেশসমূহ সম্পূর্ণতঃ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত।

চর্ম (Hides & Skins)

দুগ্ধ, মাংস ও পশম যেমন মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, পশুচর্মও তেমনি মানুষের নানা কাজে দরকার হয়। পশুচর্মের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চর্মশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

চর্ম দুই প্রকার; গরু, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তুর চর্মকে **স্থূল চর্ম** (Hide) এবং ছাগল, মেষ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় জন্তুর চর্মকে **সূক্ষ্ম চর্ম** (**Skin**) বলে।

চর্ম মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগে। প্রধানতঃ জুতা, ব্যাগ, সুটকেশ, পোশাক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং যন্ত্রপাতিতে চর্ম ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চামড়া পাকা করিয়া পাকা চামড়া দ্বারা এই সকল জিনিস তৈয়ারি হয়। গরু ও মহিষের চর্মই পশুচর্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়িক চর্মের মধ্যে হাঙ্গর, খেঁকশিয়াল, বানর, সর্প প্রভৃতির চর্মও অন্তর্ভুক্ত।

ভারত, চীন, ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে ছাগ-চর্ম এবং অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, নিউ জিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে মেষ-চর্ম পাওয়া যায়।

ভারত গো-মাংস রপ্তানিতে অংশগ্রহণ না করিলেও মৃত গবাদি পশুর চর্ম রপ্তানিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এখানে দুগ্ধ-প্রদায়ী, মাংস-প্রদায়ী ও ভারবহনকারী সকলপ্রকার গবাদি পশু হইতেই চর্ম সংগ্রহ করা হয়। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমাণে চর্ম বিদেশে রপ্তানি করে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া চর্মের প্রধান আমদানিকারক দেশ।

দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প
(Dairy Industry)

গবাদি পশুর সংখ্যা বেশী থাকিলেই কোনো দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। কারণ, গাভী হইতে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ না পাওয়া গেলে এই শিল্পের উন্নতিসাধন সম্ভব নহে। গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পশু হইতে দুগ্ধ পাওয়া গেলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দুগ্ধ গরু ও মহিষ হইতে পাওয়া যায়। গরু ও

মহিষের মধ্যে গরু হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়। নিম্নে দুগ্ধ উৎপাদনকারী কয়েকটি দেশের গাভী-প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন দেখানো হইল :

দেশের নাম	গাভী-প্রতি দুগ্ধের বাৎসরিক উৎপাদন*
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫,৬৩৭ লিটার
যুক্তরাজ্য (ব্রিটেন)	৪,৯৯২ "
নিউ জিল্যান্ড	৩,২১৫ "
অস্ট্রেলিয়া	২,৯৭২ "
সোভিয়েত রাশিয়া	২,০৫২ "
ভারত	৫৩১ "

* ১৯৮২ সালের হিসাব অনুসারে।

দুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন ও পনির উৎপন্ন হয়।

দুগ্ধ-প্রদায়ী পশুপালনের জন্য এবং দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য নিম্নলিখিত **ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Geographical and Economical Conditions)** বিশেষ প্রয়োজন :

(১) গ্রীষ্মকালে পরিমিত বৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজন। মাঝারি বৃষ্টিপাতে দীর্ঘ পুষ্টিকর তৃণ জন্মায়। ইহা গো-মহিষাদির খাদ্যাভাব পূরণ করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া তৃণক্ষেত্র থাকিলে উহা গো-মহিষাদি পালনের প্রেরণা আনে। অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের জন্য দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

(২) মৃদু শীতকাল থাকিলে গবাদি পশু সারা বৎসর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে চরিয়া বেড়াইতে পারে।

(৩) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম হইলে গবাদি পশু হইতে দুগ্ধ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়।

(৪) তৃণভূমি ও অন্যান্য পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য আর্দ্র দো-আঁশ মৃত্তিকা প্রয়োজন।

(৫) দুগ্ধ দ্রুত পচিয়া যায় বলিয়া ইহা দ্রুত প্রেরণের জন্য পরিবহণের উন্নত ধরনের ব্যবস্থা থাকা দরকার ; দুগ্ধ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, হিমাগার প্রভৃতি এই শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করে।

(৬) বন্ধুর ভূ-প্রকৃতিতে কৃষিকার্য সম্ভব নয় বলিয়া অন্যান্য পরিবেশ অনুকূল থাকিলে এই শিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারে।

(৭) জনবহুল দেশে শ্রমিকের অভাব না থাকায় এবং চাহিদা বেশী বলিয়া এই শিল্প সহজে উন্নতিলাভ করে।

এই সকল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা স্বভাবতঃই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায় বলিয়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার যুগে শহরাঞ্চলে গবাদি পশুর দুগ্ধ ও মাখন সরাসরি পাওয়া

কষ্টকর। সেইজন্য বর্তমানে গুঁড়া দুগ্ধ, ঘনীভূত দুগ্ধ, ঘি, পনির প্রভৃতির উপর মানুষ অধিক নির্ভর করে। এই সকল দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন (১৯৮৪)
(লক্ষ মেঃ টন)

	দুগ্ধ	মাখন	পনির		দুগ্ধ	মাখন	পনির
সোঃ রাশিয়া	৯৭২	১৬·১০	১৬·৫৯	ভারত*	৩৪৭	৭·৩	—
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৬১৬	৫·০	২৪·২	পূর্ব-জার্মানী	৮৬	৩·০	২·৩
ফ্রান্স	৩৩০	৬·০	১২·৫	কানাডা	৮৩	১·২	২·৫
পশ্চিম জার্মানী	২৬০	৫·৭	৮·৮	জাপান	৭১	০·৮	০·৭
পোল্যান্ড	১৭৪	৩·২	৪·০	নিউ জিল্যান্ড	৭৫	৩·০	১·২
ব্রিটেন	১৬১	২·১	২·৪	আর্জেন্টিনা	৫৩	০·৩	২·১
ব্রাজিল	১০৫	০·৭	৩·৬	অস্ট্রেলিয়া	৬১	১·১	১·৬
নেদারল্যান্ডস্	১২৬	২·৪	৫·৩	ডেনমার্ক	৫২	১·০	৩·০
ইটালি	১০৭	·৮	৬·৬	চীন*	৩৭	·৫	১·২

(F. A. O. Monthly Bulletin, January, 1985 হইতে সংগৃহীত।)
* মহিষের দুগ্ধসমেত।

উৎপাদন অঞ্চল (Producing Areas)—প্রধানতঃ পৃথিবীর চারিটি অঞ্চলে এই শিল্প সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে : (ক) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ; (খ) সোভিয়েত রাশিয়া (গ) উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের স্থানসমূহ; এবং (ঘ) অস্ট্রেলিয়া-নিউ জিল্যান্ড অঞ্চল।

(ক) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের (North-West Europe) জার্মানী, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস্, ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স** প্রভৃতি দেশ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী। দুগ্ধ উৎপাদনে এই অঞ্চলের ফ্রান্স পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। মাখন উৎপাদনে ফ্রান্স পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান এবং পশ্চিম জার্মানী চতুর্থ স্থান অধিকার করে। পনির উৎপাদনে ফ্রান্স পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার এক একটি দেশ কোনো একটি দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ডেনমার্কের মাখন এবং নেদারল্যান্ডসের পনির জগদ্বিখ্যাত। এই দুইটি দেশের জনসংখ্যা কম বলিয়া রপ্তানি বাণিজ্যে ইহারা পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ডেনমার্কে প্রায় ৯,০০০ সমবায় প্রতিষ্ঠানের মারফত দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্প পরিচালিত হয়। দেশের মোট দুগ্ধের শতকরা ৮০ ভাগ মাখন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ডেনমার্কের মোট রপ্তানির তিন-চতুর্থাংশ দুগ্ধজাত দ্রব্য।

(খ) **সোভিয়েত রাশিয়ায় (U.S.S.R.)** সম্প্রতি দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে অত্যন্ত যত্নের সহিত গবাদি পশু পালিত হয়। দুগ্ধ-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম এবং মাখন উৎপাদনেও প্রথম স্থান

অধিকার করে। পনির উৎপাদনেও এই দেশ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে ও বর্তমানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

(গ) **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A.)** ভুট্টাবলয়ের পূর্বদিকে দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই দেশ পৃথিবীতে দুগ্ধ উৎপাদনে দ্বিতীয়, পনির উৎপাদনে প্রথম এবং মাখন-উৎপাদনে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। হ্রদ অঞ্চলের শহরগুলি দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের কেন্দ্রস্থল। **কানাডার** প্রেইরি অঞ্চলেও এই শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) **অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ড (Australia & New Zealand)** দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখানকার গাভী-প্রতি দুগ্ধ উৎপাদন অত্যন্ত বেশী। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় অধিকাংশ ঘনীভূত ও গুঁড়া দুগ্ধ, মাখন এবং পনির রপ্তানি হইয়া থাকে। সেইজন্য সমুদ্রপ্রান্তের বন্দরসমূহের নিকটেই অধিকাংশ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় সরকার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনে ও রপ্তানিতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

ইহা ছাড়া **চীন, ভারত, ইটালি, আর্জেন্টিনা** প্রভৃতি দেশও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. What are the importance of animals in our society ? What are important animal products and their uses ?

[আমাদের সমাজে পশুর প্রয়োজনীয়তা কি ? প্রধান প্রধান পশুজাত দ্রব্য কি কি এবং উহাদের ব্যবহার কি ?]

উঃ—'পশুর প্রয়োজনীয়তা' (২২৭—২২৮ পৃঃ) লিখ।

2. (a) Name the regions of the world where pastoral farming is the main occupation of the people. (b) Account for the practising pastoral farming in those regions in preference to growing crops. (c) What are the principal products of pastoral farming ?

[**H. S. Examination, 1982**]

[(ক) পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে পশুপালন শিল্প অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা সেই সকল অঞ্চলের নাম কর। (খ) কেন এই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্যের বদলে পশুপালন শিল্পকে কৃষিকার্যের উপরে স্থান দেওয়া হয়, তাহার কারণ বর্ণনা কর। (গ) পশুপালন শিল্পজাত প্রধান প্রধান দ্রব্যের নাম কর।]

উঃ—'পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুচারণ ক্ষেত্রসমূহ' (২২৮—২৩১ পৃঃ) ও 'পশু ও পশুজাত দ্রব্য' (২৩১—২৩৭ পৃঃ) অবলম্বনে উত্তর তৈয়ারি কর।

3 State the geographical conditions suitable for sheep-rearing and name the principal wool-producing countries of the world.

[**H. S. Examination, 1979**]

[মেষপালনের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর।]

উঃ—'মেষ' (২৩৪—২৩৫ পৃঃ) ও 'পশম' (২৩৭—২৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Describe the major commercial sheep-grazing areas of the world mentioning the reason for their development.

[H. S. Examination, 1978]

[উন্নতির কারণ উল্লেখপূর্বক পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক মেষ-চারণ ক্ষেত্র-গুলির বর্ণনা কর।]

উঃ—'মেষ' (২৩৪—২৩৫ পৃঃ) ও 'পশম' (২৩৭—২৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. Name a few species of wool-producing animals with suitable examples. Describe the physical and other conditions for successful production of commercial wool. Indicate the commercial wool producing areas of the world.

[B. U. B. Com. 1970 ; C. U. B. Com. 1972]

[উদাহরণসহ বিভিন্ন ধরনের পশম-প্রদায়ী জন্তুর নাম লিখ এবং বাণিজ্যিক পশম উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক ও অন্যান্য উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশম-উৎপাদনকারী অঞ্চলের নির্দেশ দাও।]

উঃ 'পশম' (২৩৭—২৩৯ পৃঃ) লিখ।

6. What are the geographical and economic conditions for the development of Dairy Industry ? What are the regions of the world where Dairy Farming is carried on in an extensive scale ? Mention briefly the world trade in dairy products.

[Specimen Question, 1981]

[দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পের উপযোগী ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ কি কি? পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দুগ্ধ-সংক্রান্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়? সংক্ষেপে দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উল্লেখ কর।]

উঃ—'দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প' (২৩৯—২৪২ পৃঃ) লিখ।

7. Discuss the geographical conditions for the development of dairy farming and mention the areas of their concentration.

[H. S. Examination, 1983]

[কি কি ভৌগোলিক পরিবেশে দুগ্ধজাত শিল্প উন্নতিলাভ করে, তাহা আলোচনা কর। যে সকল দেশ এই শিল্পে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহাদের নাম কর।]

উঃ—'দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প' (২৩৯—২৪২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

(B) Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on : (a) Merino sheep, (b) Goat rearing areas of the world, (c) Pig-rearing areas of the world.

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : (ক) মেরিনো মেষ, (খ) পৃথিবীর ছাগল পালন অঞ্চল, (গ) পৃথিবীর শূকর পালন অঞ্চল।]

উঃ - (ক) 'মেরিনো মেষ' (২৩৮ পৃঃ), (খ) 'ছাগল পালন অঞ্চল' (২৩৬ পৃঃ), (গ) 'শূকর পালন অঞ্চল' (২৩৬—২৩৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Fill up the blanks : (i) India occupies the—place in the world in tending cattle, but she could not progress much in the production and export of — and in — industry. (ii) Sheep are reared mainly for — and—. In excessive — and dry climate the — fleece of sheep do not grow well, but moderate climate is ideal. As a result, Southern Hemisphere has more — yielding wool than the —. (iii) In producing wool — holds the first place in the world. Most of the sheep are reared for—. Major portion of the wool produced here is exported to the —.

[শূন্য স্থান পূর্ণ কর : (i) ভারত পৃথিবীতে গবাদি পশু পালনে — স্থান অধিকার করিলেও — উৎপাদনে ও রপ্তানিতে এবং — শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। (ii) প্রধানতঃ — ও — জন্য মেষ পালিত হয়। শীতল ও শুষ্ক স্থানে মেষের গায়ে — পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অত্যধিক — আবহাওয়া মেষের পশম নষ্ট করিয়া ফেলে। সেইজন্য—অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধে — পশম-প্রদায়ী— সংখ্যা অনেক বেশী। (iii) — পশম উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ মেষ—জন্য প্রতিপালিত হয়। এখানকার অধিকাংশ পশম — রপ্তানি হয়।

2. Write correct answers from the following :

(a) The Australian live-stock industry is favoured by the nearness to large market/large grazing land/mild winter climate. **[H. S. Examination, 1979]**

(b) Sheep-rearing for commercial wool production is mostly concentrated in the Northern Hemisphere/Southern Hemisphere. **[H. S. Examination, 1980]**

(c) Buenos Aires exports raw cotton/jute/animal products. **[H. S. Examination, 1983]**

(d) Denmark / Korea / China is specially developed in dairy industry. **[H. S. Examination, 1985]**

[(ক) অস্ট্রেলিয়ায় পশুপালন শিল্প গড়িয়া উঠার প্রধান কারণ বৃহৎ বাজারের নিকট অবস্থান / বিশাল চারণভূমি / মৃদু শীতকালীন জলবায়ু।

(খ) বাণিজ্যিক পশম উৎপাদনের জন্য মেষচারণ প্রধানতঃ উত্তর গোলার্ধে / দক্ষিণ গোলার্ধে কেন্দ্রীভূত।

(গ) বুয়েনস আয়ার্স হইতে কাঁচা তুলা / পাট / পশুজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়।]

(ঘ) দুগ্ধজাত শিল্পে ডেনমার্ক / কোরিয়া / চীনদেশ বিশেষ উন্নত।

———

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিবহণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যকেন্দ্র

(Transportation System, Trade Routes & Trade Centres)

পরিবহণের ক্রমবিকাশ (Evolution of Transport)—আদিম যুগের মানুষ নিজে পশুপালন করিয়া ও কৃষিকার্য করিয়া জীবন ধারণ করিত। সেই যুগের মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি অনুসারে চলিত। সাধারণতঃ মানুষ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইত না এবং মালপত্র পরিবহণের কোনো প্রশ্ন সেই যুগে ছিল না। কারণ, জিনিসপত্র বিক্রয় হইত না এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মালপত্র প্রেরিত হইত না। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদির বিক্রয় আরম্ভ হইল এবং ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিল। এক স্থান হইতে মালপত্র নিকটবর্তী গ্রামে বা হাটে-বাজারে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই মালপত্র বহন করিত। পৃথিবীর বহু অনুন্নত দেশে এখনও মানুষের মাথায় মালপত্র প্রেরিত হয়। বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে উঁচু-নীচু জমিতে মানুষ ভিন্ন, অন্য কোনো পরিবহণের বন্দোবস্ত করা কঠিন। হিমালয় পর্বতের আরোহিগণকে সর্বদা 'শেরপা'দের সাহায্যে মালপত্র পরিবহণ করিতে হয়। ভারত ও অন্যান্য দেশে কুলির মাথায় করিয়া মালপত্র লইবার দৃশ্য সর্বদাই চোখে পড়ে। আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে এখনও মানুষ পরিবহণের প্রধান অঙ্গ।

মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পশুর সাহায্যে মালপত্র ও মানুষ পরিবাহিত হইবার বন্দোবস্ত হইল। পশুকে বশ করিয়া মানুষের ব্যবহারে নিযুক্ত করা হইল। অশ্ব, গো, মহিষ, গর্দভ, অশ্বেতর প্রভৃতি পশু পরিবহণের প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিণত হইল। পশুর সাহায্যে এখনও পৃথিবীর বহু স্থানে মালপত্র ও মানুষ পরিবাহিত হয়। ইউরোপের বহু স্থানে এখনও অশ্বপৃষ্ঠে মালপত্র বহন করা হয়। বরফাচ্ছন্ন দেশে বল্গা হরিণ ও কুকুরের সাহায্যে মালপত্র ও মানুষ পরিবাহিত হইয়া থাকে। বালুকাময় মরুভূমিতে উষ্ট্রই পরিবহণের একমাত্র অবলম্বন। ভারতেও বিভিন্ন স্থানে গরু, মহিষ, গর্দভ ও হাতীর সাহায্যে মালপত্র ও মানুষ পরিবাহিত হয়। গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়িতে চড়িয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে মানুষের গমনাগমনের দৃশ্য সর্বদাই চোখে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ পর্বত অঞ্চলে লামা ও ব্রহ্মদেশে হাতীর সাহায্যে এখনও প্রচুর পরিমাণে মালপত্র স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

শিল্পবিপ্লবের পর পরিবহণ ব্যবস্থায়ও এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। মানুষ জড়-শক্তিকে তাহার প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতে শিখিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার হওয়ায় বিভিন্ন যান্ত্রিক যান আবিষ্কৃত হইল ; ইহার মধ্যে মোটরগাড়ি, লরী, রেল-গাড়ি, ট্রামগাড়ি, জাহাজ, স্টীমার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জড়শক্তিকে ব্যবহার করিয়া মানুষ উন্নততর পরিবহণ-ব্যবস্থা আবিষ্কার করায় শুধু যে মানুষের ও পশুর শ্রমের লাঘব হইল তাহাই নহে, ইহার ফলে দ্রুতগামী পরিবহণ ব্যবস্থার সৃষ্টি হওয়ায়

মানুষ ও মালপত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সুলভে দ্রুত পরিবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে যেমন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নতিলাভ করিয়াছে তেমনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটরগাড়ির সাহায্যে মানুষ দ্রুত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে, ট্রামগাড়ির সাহায্যে মানুষ নিকটবর্তী স্থানে সহজে চলাফেরা করিতে পারে ও লরীর সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে দ্রুত মালপত্র প্রেরণ করা সম্ভব। রেলগাড়ির সাহায্যে মানুষ ও মালপত্র উভয়ই দ্রুত দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পরিবাহিত হইতে পারে। বর্তমানে রেলগাড়ি স্থলপথে শ্রেষ্ঠ পরিবাহক।

শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে জলপথে পালের সাহায্যে কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ চলাচল করিলেও ইহার সাহায্যে মালপত্র পরিবহণের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। ইহা ছাড়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে ইচ্ছামতো দ্রুত যাতায়াত করাও সম্ভব ছিল না। ইস্পাত ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর জলপথেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল। অভ্যন্তরীণ জলপথের জন্য স্টীমার এবং সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য আধুনিক ধরনের জাহাজ নির্মিত হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইল।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ-ব্যবস্থার আরও উন্নতি হইল। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যথাসম্ভব কম সময়ে সব কাজ করিতে চেষ্টা করিল। ইহার ফলে আবিষ্কৃত হইল **বিমানপোত**। ইহার সাহায্যে মানুষ অত্যন্ত দ্রুতবেগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে সক্ষম হইল। বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমানপথে পণ্যদ্রব্য পরিবহণের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বর্তমান যুগে বিমানপথ খুবই জনপ্রিয়।

এইভাবে দেখা যায়, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই গতিশীল জগতের পরিবহণ ব্যবস্থাও ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Transport System)—পূর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল সম্পদ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে না পাঠাইলে মানুষের চাহিদা মিটানো যায় না। আধুনিক যুগে মানুষের চাহিদার শেষ নাই। পৃথিবীর কোনো দেশই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সেইজন্য কমবেশী বহু জিনিস প্রায় সকল দেশকেই অন্য দেশ হইতে আমদানি করিয়া অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে হয়।

বর্তমান যুগে পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি নির্ভর করে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর। পাট ভারত ও বাংলাদেশের একচেটিয়া সম্পদ। সকল দেশকেই পাটের জন্য এই দুই দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা না থাকিলে ভারত ও বাংলাদেশ এই পাট অন্য দেশে রপ্তানি করিতে পারিত না। সুতরাং পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উন্নতিসাধন করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া, অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে হইলেও দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মালপত্র প্রেরণ করিতে হয়। এইজন্যও পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

দেশের অভ্যন্তরে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড় কলিকাতা ও দিল্লীর বাজারে বিক্রয় করিতে হইলে এবং উত্তর প্রদেশের চিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠাইতে হইলে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রে আনিতে, শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে পাঠাইতে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মস্থলে যাতায়াত করিতে যানবাহনের প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ সর্বদা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া থাকে। পৃথিবীর কোনো স্থানই এখন আর মানুষের কাছে দূর নহে। বিমানপথে এখন কলিকাতা হইতে লন্ডন বা মস্কো মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। পূর্বে একস্থানে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও অন্যস্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়া বহুলোক মারা যাইত। কিন্তু এখন পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাড়াতাড়ি খাদ্য প্রেরণ করিয়া দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মানুষকে রক্ষা করা যায়। দেশরক্ষার জন্য উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন; একস্থান হইতে অন্যস্থানে সৈন্য ও রসদ পাঠাইতে যানবাহনের প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান। কখনও মরুভূমিতে, কখনও গহন অরণ্যে, কখনও বা পাহাড়-পর্বতে বহু খনিজ ও বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করিতে হইলে সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। যানবাহন-ব্যবস্থার ফলে সুদূর অস্ট্রেলিয়া, আলাস্কা ও ট্রান্সভালের স্বর্ণ, কিম্বার্লির হীরক, জিম্বাবোয়ে ও চিলির তাম্র আহরণে কোনো অসুবিধা হইতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানুষের সকলপ্রকার অর্থনৈতিক উন্নতি পরিবহণ ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ (Different Modes of Modern Transport)— পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া নানাপ্রকার পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যমান; যথা—(ক) সড়কপথ, (খ) রেলপথ, (গ) অন্তর্দেশীয় জলপথ, (ঘ) জাহাজপথ ও (ঙ) বিমানপথ।

(ক) সড়কপথ (Roadways)

মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ-ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল রূপ ধারণ করিতেছে। আদিম যুগে মানুষ নিজেই মাল বহন করিত। ক্রমে পশু, মোটর-লরী, ট্রামগাড়ি প্রভৃতি পরিবহণ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইল। বর্তমানে স্থলপথে মালপত্র পরিবহণের জন্য বিভিন্ন পশু, মানুষ ও নানাবিধ যান্ত্রিক যান ব্যবহার করা হয়।

প্রাচীন যুগে মানুষ ও পশু দ্বারা যখন মালপত্র প্রেরণ করা হইত, তখন ভালো রাস্তাঘাটের বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু যান্ত্রিক যানসমূহ আবিষ্কৃত হইবার পর রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করিল। অবশ্য পূর্বেও কোনো কোনো রাজা-মহারাজা পথিকদের জন্য কিছু রাস্তা নির্মাণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভারতের গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এই জাতীয় রাস্তার একটি নিদর্শন।

পৃথিবীতে সাধারণতঃ তিন প্রকার রাস্তা দেখা যায় ঃ—প্রধান সড়কপথ, শাখাপথ ও গ্রাম্যপথ। দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার নাম প্রধান সড়কপথ। সড়কপথে প্রধানতঃ যান্ত্রিক যান যাতায়াত করে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে রাস্তা আসিয়া এই সকল সড়কপথের সহিত মিলিত হয়; এইগুলিকে **শাখাপথ** বা **পোষকপথ** (feeder road) বলে। গ্রামের ছোটোখাটো রাস্তার নাম **গ্রাম্যপথ** বা মেঠো পথ। শাখাপথ ও গ্রাম্যপথে গরু-মহিষাদির গাড়ি, গর্দভের গাড়ি প্রভৃতি যাতায়াত করে। বর্তমান যুগে মোটর-লরীর মারফত প্রেরিত মালপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সকল রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধিত হইতেছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ১½ কোটি কিলোমিটারের বেশী পাকা রাস্তা রহিয়াছে। সকল দেশেই মোটরগাড়ি চলিবার উপযুক্ত পাকা রাস্তা আছে। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** সর্বাপেক্ষা বেশী রাস্তা বিদ্যমান। পৃথিবীর মোট রাস্তার এক-তৃতীয়াংশ এই দেশে দেখা যায়। ইহার পরেই **ফ্রান্সের** স্থান। রাস্তার দৈর্ঘ্যে **ভারত** তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতের উল্লেখযোগ্য জাতীয় সড়কপথের মধ্যে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-মাদ্রাজ, মাদ্রাজ-বোম্বাই, বোম্বাই-দিল্লী, কলিকাতা-বোম্বাই ও মাদ্রাজ-দিল্লী জাতীয় সড়ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **সোভিয়েত রাশিয়ায়** রাস্তাঘাটের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে। মস্কো হইতে এই দেশের বিভিন্ন দিকে সুন্দর সুন্দর পাকা রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। **চীনদেশে** রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমানে এই দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৩১ হাজার কিলোমিটার পরিমিত পাকা রাস্তা আছে।

(পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সড়কপথ সম্পর্কে ২৫৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।)

(খ) রেলপথ (Railways)

বর্তমান যুগে স্থলপথে রেলপথই শ্রেষ্ঠ পরিবহণ পথ। সমৃদ্ধিশালী দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত থাকে। বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। স্থলপথে ভারী মাল পাঠাইতে হইলে রেলপথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়।

রেলপথ নির্মাণের উপযোগী পরিবেশ (Conditions for Development of Railways)—বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর রেল লাইন স্থাপন নির্ভর করে। পার্বত্য অঞ্চল অত্যন্ত উঁচু-নীচু বলিয়া এখানে রেল লাইন স্থাপন কষ্টসাধ্য; এইজন্য ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে এবং তিব্বতে প্রয়োজনীয় রেলপথের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমতলভূমিতে রেল-লাইন স্থাপন সহজসাধ্য বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ রেলপথ এই অঞ্চলে অবস্থিত। নদীবহুল দেশে রেললাইন স্থাপন করিতে হইলে বহু অর্থব্যয়ে সেতু তৈয়ারি করিতে হয়। এই জন্য নদীবহুল স্থানে রেলপথ অত্যন্ত কম। বাংলাদেশের নদীবহুল বরিশাল ও টাঙ্গাইল জেলার কোথাও কোনো রেলপথ নাই। রেলপথের প্রসারের উপর জলবায়ুর প্রভাবও বিদ্যমান; তুষারাবৃত বা মরু অঞ্চলে রেলপথ স্থাপন ও পরিচালন কষ্টসাধ্য; তুষারাবৃত অঞ্চলে বরফ জমিয়া অধিকাংশ রেলপথ অকেজো হইয়া থাকে। মরু-অঞ্চলে বালিয়াড়ি ও বালুঝড়ের জন্য রেলপথ নির্মাণ প্রায় অসম্ভব।

এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ছাড়াও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর রেলপথের প্রসার নির্ভরশীল। রেলপথ-নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এই ব্যয় বহন করিবার মতো ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের থাকা প্রয়োজন। রেলপথ স্থাপনের পর ইহার ব্যবস্থাপনার জন্য চলতি খরচ অত্যন্ত বেশী ; সেইজন্য আরোহী ও মালপত্র পরিবহণের অপর্যাপ্ত চাহিদা না থাকিলে ইহার খরচ পোষায় না। শিল্পসমৃদ্ধ ও লোকবসতিপূর্ণ দেশসমূহে পরিবহণের চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া এই সকল দেশে রেলপথের প্রসার সহজসাধ্য। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে রেলপথের উন্নতির ইহাই প্রধান কারণ। আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে লোকবসতি বিরল ; শিল্পে অনুন্নত হওয়ায় এই সকল মহাদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবহণের চাহিদা অত্যন্ত কম। এইজন্য এই সকল স্থানে রেলপথের বিশেষ প্রসার হয় নাই। অন্যদিকে শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে রেলপথের প্রসারের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য রেলপথের প্রসার না হইলে দেশের শিল্পের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

(পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথ সম্পর্কে ২৫৬-২৬২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

(গ) অন্তর্দেশীয় জলপথ (Inland Waterways)

জলপথের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। জলপথে দুই প্রকার পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যমান—অন্তর্দেশীয় (Inland) ও মহাসাগরীয় (Oceanic); **অন্তর্দেশীয় জলপথ** বলিতে সাধারণতঃ হ্রদ, খাল ও নদীকে বুঝায়। **মহাসাগরীয় জলপথ** বলিতে সাধারণতঃ সমুদ্র ও সমুদ্র-খালকে বুঝায়। (মহাসাগরীয় জলপথ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।) জলপথ নির্মাণের জন্য বিশেষ কোনো ব্যয় হয় না। সেইজন্য জলপথের পরিবহণ খরচ অত্যন্ত কম ; কিন্তু রেলগাড়ি অথবা মোটরগাড়ি অপেক্ষা জলযান অপেক্ষাকৃত ধীরগামী। সেইজন্য মালপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে পৌঁছাইতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। জলপথে নৌকা, স্টীমার ও জাহাজ প্রভৃতি পরিবহণের অংগ। সাধারণতঃ অন্তর্দেশীয় জলপথে নৌকা ও স্টীমার ব্যবহার করা হয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে জাহাজ ব্যবহৃত হয়।

নদীমাতৃক দেশসমূহে প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল। নদী অন্তর্দেশীয় জলপথের প্রধান অংগ ; ইহা ছাড়া খাল, হ্রদ, বিল প্রভৃতি মারফত বহু দেশে পণ্যদ্রব্য পরিবহণের ব্যবস্থা আছে। নদী, খাল, বিল প্রভৃতি নাব্য না হইলে ইহা পরিবহণের প্রয়োজনে আসে না।

নাব্য হইতে হইলে নদী, খাল, বিল প্রভৃতির নিম্নলিখিত গুণ থাকা প্রয়োজন : (১) নদ-নদী গভীর ও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। (২) নদীসমূহ বরফমুক্ত না হইলে সারা বৎসর পরিবহণের কার্য চালানো যায় না। সেইজন্য বরফমুক্ত নদী পরিবহণের পক্ষে উৎকৃষ্ট। (৩) অধিক খরস্রোতা হইলে নদীতে জলযান চালাইতে অসুবিধা হয়। সেইজন্য নদ-নদী খরস্রোতা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহার গতিপথে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইলে ইহা পরিবহণের অন্তরায় হয়। (৪) সারা বৎসর নদীতে যথেষ্ট জল থাকা প্রয়োজন ; (৫) নদ-নদীর উপকূলবর্তী স্থানসমূহ কৃষিজাত, খনিজ

শিল্পজাত সম্পদে পরিপূর্ণ হইলে জলপথের উন্নতি হইয়া থাকে ; কারণ, নদীপথে প্রেরণের জন্য এই সকল স্থানে যথেষ্ট বাণিজ্য-দ্রব্য পাওয়া যায়। এইজন্য জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ নদীপথের এতটা উন্নতি হইয়াছে।

(পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য অন্তর্দেশীয় জলপথসমূহ সম্পর্কে ২৬৮—২৭১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।)

(ঘ) জাহাজপথ (Ocean Routes)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য জাহাজপথ বা সমুদ্রপথ একান্ত প্রয়োজন। সমুদ্রপথ প্রস্তুত করিতে কোনো ব্যয় হয় না বলিয়া এই পথে পরিবহণ খরচ অত্যন্ত কম। পৃথিবীর সকল জাতি এই জলপথ ব্যবহার করিতে পারে ; এবং এই সকল জলপথে সাধারণতঃ কোনো শুল্ক প্রভৃতি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু সমুদ্রখালের মাধ্যমে যাইতে হইলে শুল্ক দিতে হয়।

জাহাজ (Shipping)—সমুদ্রপথে জাহাজে সুলভে পণ্যদ্রব্য-পরিবহণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রেলগাড়ি দ্রুতগামী হইলেও অনেক সময় ব্যবসায়িগণ সুলভে পরিবহণের জন্য জাহাজে করিয়া পণ্য আমদানি-রপ্তানি করে। সমুদ্রে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, তাহাদিগকে **তিন শ্রেণীতে** বিভক্ত করা যায়—লাইনার, ট্র্যাম্প ও সওদাগরী বা শিল্পজাত-দ্রব্যবাহী জাহাজ। **লাইনার (Liner)**—এই জাতীয় জাহাজ যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া থাকে। ইহারা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে ও ছাড়ে। ইহারা নির্দিষ্ট পথে চলে এবং দ্রুতগতিতে যাতায়াত করে। **ট্র্যাম্প (Tramp)**—ইহারা লাইনার অপেক্ষা ছোট এবং ইহাদের গতিবেগও অপেক্ষাকৃত কম। ইহাদের ছাড়িবার বা পৌঁছিবার কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। অল্প মূল্যের ভারী জিনিসপত্র প্রেরণের জনাই এই জাতীয় জাহাজ ব্যবহৃত হয়। খাদ্যশস্য, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি ট্র্যাম্পে পাঠানো হয়। **সওদাগরী জাহাজ (Merchant Vessel)**—সাধারণতঃ এই জাতীয় জাহাজ কোনো বিশিষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। শিল্পের মালিকগণ বা কোনো বড় সওদাগর এইগুলি নির্মাণ করান ; ইহার কোনোটি তৈলবাহী (Oil-tanker), কোনোটি ফলবাহী (Fruit-ship), কোনোটি কাষ্ঠবাহী (Timber-ship) ইত্যাদি।

লয়েডের হিসাব অনুসারে সমগ্র পৃথিবীর মোট জাহাজের মাল-বহনের ক্ষমতা ১০ কোটি ৫২ লক্ষ GRT*। ইহার মধ্যে তরল পদার্থবাহী জাহাজের (Tanker) মালবহনের পরিমাণ ৪২ লক্ষ ১০ হাজার GRT।

---

* জাহাজের পরিমাণ 'টনে' বুঝানো হয়। জাহাজের অভ্যন্তরস্থ সকল স্থান মাপিয়া যত ঘনফুট হইবে তাহাকে ১০০ দ্বারা ভাগ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহাই জাহাজের মোট টন বা Gross Tonnage বা GRT=Gross Registered Tonnage. GRT হইতে জাহাজের কর্মচারী প্রভৃতি থাকিবার স্থান, জল রাখিবার স্থান, ইঞ্জিনের ঘর প্রভৃতির ঘনফুট বাদ দিয়া অবশিষ্ট স্থানের ঘনফুটকে ১০০ দিয়া ভাগ করিয়া 'নীট টন' বাহির করিতে হয়। NRT=Net Registered Tonnage. এইভাবে সাধারণতঃ জাহাজের মালবহনের ক্ষমতা বাহির করা হয়। ৮,০০০ Gross Ton-এর জাহাজ-এর অর্থ এই যে, জাহাজটি মোটামুটি ৮,০০০ টন মাল বহন করিতে পারে।

জাহাজের সংখ্যা ও টনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, ব্রিটেন দ্বিতীয় ও নরওয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের জাহাজের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আশা করা যায়, ইহারা শীঘ্রই এই বিষয়ে উচ্চস্থান অধিকার করিবে। ইহা ছাড়া ইটালি, নেদারল্যান্ডস্, জার্মানী, চীন, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি দেশও অনেক জাহাজের মালিক।

জাহাজের অধিকারী না হইলে কোনো দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য এখনও বিদেশী (ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি) জাহাজের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই দেশের রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে। পর্যাপ্ত জাহাজের অধিকারী হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

(পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য জাহাজপথ বা বাণিজ্যপথ সম্পর্কে ২৬২—২৭০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।)

(ঙ) বিমানপথ (Airways)

বিমানপথে যাতায়াত বর্তমান জগতে খুবই জনপ্রিয়। এই যান্ত্রিক যুগে সকলেই যথাসম্ভব কম সময়ে সকল কার্য সমাধা করিতে চায়। সেইজন্য বিমানপোতের এত আদর। বিমানপোত অত্যন্ত দ্রুতগামী হইলেও ইহা ব্যয়সাধ্য এবং ভারী জিনিসপত্র পরিবহণের অনুপযুক্ত। সেইজন্য পণ্যদ্রব্য পরিবহণের চেয়ে ডাক ও যাত্রিবহনের জন্যই বিমানপোত বেশী ব্যবহৃত হয়। বিমানপথে যাতায়াতের ভাড়া না কমিলে জনসাধারণের পক্ষে এই পথে যাতায়াত করা সম্ভব হইবে না। যে সকল দেশের অধিবাসীদের আর্থিক সচ্ছলতা অধিক, সেই সকল দেশে বিমানপথের অধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সামরিক প্রয়োজনে বহু বিমানপোত ব্যবহৃত হয়। বর্তমান যুগে বিমানপথের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। অধিকাংশ দেশেই স্থানীয় সরকার বিমান-চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

(পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বিমানপথসমূহ সম্পর্কে ২৭১—২৭৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।)

বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of different types of Transport)—আধুনিক যান্ত্রিক যুগে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও জলপথে জাহাজ, স্থলপথে রেলগাড়ি ও মোটরগাড়ি এবং আকাশপথে বিমানপোত শ্রেষ্ঠ যান। বর্তমান যুগের মানুষ চায় কিভাবে সুলভে অথচ দ্রুতবেগে মালপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে লওয়া যায়, কিভাবে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। বর্তমান স্পুটনিকের যুগে পরিবহণ ব্যবস্থায় মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে স্থলপথে ইহার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ জলপথে, নৌকায় বা পাল চালিত জাহাজে মানুষ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। শিল্প-বিপ্লবের পর যান্ত্রিকযানের প্রবর্তন হওয়ায় পরিবহণ-ব্যবস্থায় এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রধানতঃ জাহাজ ব্যবহৃত হইলেও বিমানপথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমানপোতের সাহায্যে মালপত্র পরিবহণের পরিমাণও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও দ্রুত মালপত্র পরিবহণের জন্য ক্রমশঃই বিমানপোত ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাত্রী পরিবহণের ব্যাপারেও বিমানপোতের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বিমানপোতের দ্রুতবেগ। স্পুটনিক যুগের মানুষ একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে এক মাস বা দেড় মাস সময় দিতে চাহে না। তাহারা চায় যত বেশী দ্রুতবেগে মালপত্র বা মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবহণ করা যায়। এইজন্য আজ বিমানপোত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। অন্যদিকে খরচের প্রশ্নও আছে। বিমানপোত জনপ্রিয় এবং দ্রুতগামী হইলেও ইহা সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল পরিবহণ-ব্যবস্থা। জাহাজ বা রেলপথ অপেক্ষা বিমানপথে যাইতে অনেক বেশী খরচ লাগে। ইহার প্রধান কারণ বিমানপোতের শক্তিসম্পদের (খনিজ তৈল) খরচ ও মূল্য অধিক। পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ তৈল কয়েকটি মার্কিন, ব্রিটিশ, ডাচ ও ফরাসী একচেটিয়া কোম্পানীর করতলগত। ইহারা জোটবন্ধ হইয়া খনিজ তৈলের উচ্চমূল্য বজায় রাখে; কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া ও রোমানিয়ার তৈল পৃথিবীর বাজারে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করায় ইহাদের একচেটিয়া সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িতেছে। যদি খনিজ তৈলের মূল্য নামিয়া যায় এবং বিমানপোতের কারিগরি উন্নতি আরও সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে হয়তো এমন দিন আসিবে যখন বিমানপথে মালপত্র ও মানুষ পরিবহণ মোটেই ব্যয়সাধ্য থাকিবে না। বিমানপোত নির্মাণে মানুষ ক্রমশঃই অধিকতর ক্ষমতা অর্জন করিতেছে। বর্তমানে একখানা বিমানপোতে কয়েক শত মানুষ ও কয়েক শত মেঃ টন মালপত্র পরিবাহিত হইতে পারে। বিমানপোতের পরিবহণ ক্ষমতা যে আরও বৃদ্ধি পাইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? আশা করা যায় শীঘ্রই বিমানযাত্রা আরও সুলভ হইবে এবং ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থায় পরিণত হইবে।

পরিবহণ-ব্যবস্থায় খরচের প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রতিযোগিতার জগতে যে সুলভ পরিবহণ-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিতে পারিবে, তাহার পণ্যদ্রব্যের মূল্য সাধারণতঃ কম হইবে। **জলযান** (জাহাজ) ধীরগামী হইলেও সর্বাপেক্ষা সুলভ। এইজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ বাণিজ্য সামুদ্রিক জাহাজের মারফত সংঘটিত হয়। একখানা জাহাজে ৮ হাজার, ১০ হাজার, এমন কি ১৫ হাজার মেঃ টন পর্যন্ত মালপত্র প্রেরিত হইতে পারে। জলপথে রাস্তা-নির্মাণ বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বিশেষ হয় না। সুলভ কয়লা ও ডিজেল তৈলের সাহায্যে ইহা চালিত হয়। সুতরাং জলপথে সুলভে একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ মালপত্র পরিবাহিত হইতে পারে। কিন্তু গতিবেগের দিক হইতে জলপথে মালপত্র প্রেরণ করার অসুবিধা আছে। আশার কথা, বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ায় পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে জাহাজ চালিত হইতেছে। ইহাতে যে শুধু জাহাজের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই নহে, পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন খরচ কম হইলে, জাহাজ চালাইবার খরচ বহুলাংশে কমিয়া যাইবে। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়াতে পারমাণবিক শক্তিচালিত লেনিন নামে যে বরফ-ভাঙা জাহাজ আছে, তাহাতে একবার পারমাণবিক ইন্ধন দিলে এক বৎসরের মধ্যে আর ইন্ধন যোগাইবার প্রয়োজন হয় না।

স্থলপথে রেলগাড়ি বর্তমানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবাহক। রেলগাড়ি দ্রুতগামী এবং ইহার খরচও অত্যন্ত কম। দূরবর্তী স্থানে যাইবার জন্য ও গুরুভার

পণ্যদ্রব্য প্রেরণের জন্য রেলপথ শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমানে মোটরগাড়ি ও লরীর সাহায্যেও বহু যাত্রী ও প্রচুর মাল পরিবাহিত হইতেছে। সকল স্থানে রেলপথ নির্মাণ সম্ভব নহে। ভৌগোলিক অসুবিধা ছাড়াও, সকল সময় গ্রামাঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করিয়া খরচ পোষায় না। কারণ, রেলপথে অধিক মালপত্র ও যাত্রী পরিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য গ্রামাঞ্চলে রেল-স্টেশন হইতে গন্তব্যস্থানে যাইতে মোটরগাড়িই শ্রেষ্ঠ যান। ইহা দ্রুতগামী হইলেও রেলগাড়ি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয়বহুল; কিন্তু অল্পদূরত্বে দ্রুত পরিবহণে রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ অধিক কার্যকরী। মোটরগাড়ি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু রেলগাড়িকে নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট রাস্তায় চলিতে হয়। মোটর পরিবহণও বহুলাংশে খনিজ তৈলের মূল্যের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বহু দেশে সংগঠিতভাবে মোটরপথে প্রচুর মালপত্র পরিবাহিত হইতেছে। বাসে করিয়া যাত্রী-পরিবহণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্যমান।

স্থলপথ অপেক্ষা জলপথের কয়েকটি অসুবিধা আছে। স্থলপথের ন্যায় জলপথে পোতসমূহ যদৃচ্ছা চলাচল করিতে পারে না; কারণ অনেক সময়ই নদীর বা সমুদ্রের গতি এবং পণ্যদ্রব্য পরিবহণের গতি এক নহে; অন্যদিকে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে কয়েকটি সুবিধা বিদ্যমান। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে শুধু যে সুলভে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করা যায় তাহাই নহে, স্টীমার বা জাহাজ পরিচালনার ব্যয় অল্প; জলপথ নির্মাণের জন্য বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যয় হয় না। একমাত্র সমুদ্রপথেই কম খরচে গুরুভার দ্রব্যাদি পরিবহণ করা যায়।

বর্তমান যুগে নলপথ (Pipe line) খনিজ তৈল ও গ্যাস পরিবহণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহার পরিবহণ-খরচ রেলপথের খরচের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং ইহার মাধ্যমে নিরাপদে তৈল ও গ্যাস বহুদূরে পাঠানো যায়।

বাণিজ্যপথ
(Trade Routes)

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সমস্যাও ক্রমশঃ জটিলতর আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন যুগের সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি বহুদিন পূর্বেই অবলুপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে লন্ডনের লোক সকালে উঠিয়াই ভারতের চা, ব্রাজিলের কফি বা ঘানার কোকো পান করে। কোনো দেশ প্রতিটি জিনিস নিজেই উৎপন্ন করে না, পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য যে দেশে সবচেয়ে সুলভে কোনো জিনিস পাওয়া যায়, সেই দেশ হইতে আমদানি করে। ব্রিটেন কার্পাস-বয়ন শিল্পে বিশেষ উন্নত হইলেও ভারত হইতে কার্পাস-বস্ত্র আমদানি করে।

পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েকটি দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে একদেশ হইতে অন্যদেশে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা যায়। সুতরাং কোনো একটি দেশকে সকল জিনিস উৎপন্ন করিতে হয় না; শুধু

যে জিনিসটি সেই দেশ ভালোভাবে কম খরচে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারে সেই জিনিসটি ঐ দেশ উৎপন্ন করে। ইহাকেই **আঞ্চলিক বিশেষীকরণ (Regional Specialisation)** বলে।

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির উপর এই আঞ্চলিক বিশেষীকরণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। পরিবহণ-ব্যবস্থার একটি প্রধান অংগ **বাণিজ্যপথ (Trade route)**। একস্থান হইতে অন্যস্থানে বাণিজ্যিক মালপত্র প্রেরণের জন্য যে পথ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বাণিজ্যপথ বলে ; উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্যপথ, সুয়েজ খালপথ, পানামা খালপথ ও উত্তর আমেরিকার পঞ্চহ্রদ নামক বাণিজ্যপথ ইহার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই সকল বাণিজ্যপথের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই সকল বাণিজ্যপথ সৃষ্টি হইবার ফলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্ভব হইয়াছে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থার ও বাণিজ্যপথের উন্নতিসাধন অপরিহার্য হইয়াছে। ইহার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে নূতন নূতন বাণিজ্যপথের।

পরিবহণ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যপথের উন্নতির জন্য মানুষের **অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (Economic activity)** (যথা, উৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি) বৃদ্ধি পায়। ইহা ঠিক যে বাণিজ্যপথ না থাকিলে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান ইত্যাদি হওয়া সম্ভব নহে এবং ইহার ফলে আঞ্চলিক বিশেষীকরণও কার্যকরী হয় না। উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্যপথের জন্য আজ উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে অত্যধিক বাণিজ্য সম্পন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে।

অন্যদিকে ইহাও সত্য যে, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইবার ফলে বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হইয়াছে। এশিয়ার দেশগুলির অপর্যাপ্ত কাঁচামাল যখন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইল এবং যখন পশ্চিম ইউরোপের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এশিয়ার দেশসমূহে আনিয়া বিক্রয়ের প্রয়োজন হইল তখন সোজাপথে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যপথ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হইল ; সৃষ্টি হইল সুয়েজ খাল ; ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ-অস্ট্রেলিয়া জলপথ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যপথ বলিয়া বিবেচিত হইল। এইভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও বাণিজ্যপথ পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অন্যকে ছাড়া চলিতে পারে না। একদিকে যেমন মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হইতে বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি বাণিজ্যপথের জন্যও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যপথ
(Important Trade Routes of the World)

বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচলের জন্য বিভিন্ন রকম বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হয়। বাণিজ্যপথকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) স্থলপথ, (খ) জলপথ ও (গ) বিমানপথ।

স্থলপথের মধ্যে (১) সড়কপথ ও (২) রেলপথ ; জলপথের মধ্যে (১) সমুদ্রপথ, (২) খালপথ ও (৩) নদীপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিম্নে এই সকল বাণিজ্যপথ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল ঃ

ক (১) সড়কপথ (Roadways)

বিভিন্ন দেশে সুদীর্ঘ সড়কপথ বিদ্যমান। সড়কপথ পীচের ও কংক্রিটের পাকা রাস্তা। এই সকল সড়কপথে সাধারণতঃ দ্রুতগামী মোটর-লরী, বাস প্রভৃতি যাতায়াত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থান বিভিন্ন সড়কপথের সহিত যুক্ত। এই দেশে মোট ৪৮ লক্ষ কিলোমিটার সড়কপথ আছে। প্রতি বর্গকিলোমিটার আয়তনে সড়কপথের পরিমাণ প্রায় ০·৬২ কিলোমিটার। এই দেশের সড়কপথে ৪ কোটি মোটরগাড়ি ও ট্রাক সর্বদা যাতায়াত করে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এত মোটরগাড়ি নাই। বিভিন্ন শহর বড় বড় সড়কপথের সহিত যুক্ত। দেশের পূর্বাংশে সড়কপথ জালের মত বিস্তৃত।

ব্রিটেন—আয়তনের তুলনায় এই দেশে যথেষ্ট সড়কপথ বিদ্যমান—প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১·৪ কিলোমিটার বড় পাকা রাস্তা আছে।

ভারত—বিশাল আয়তনের এই দেশের সড়কপথের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। ভারতে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৪০,৭২০ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে জাতীয় সড়কপথের দৈর্ঘ্য ৩১,৩৫৮ কিলোমিটার।

ভারতে প্রধানতঃ পাঁচটি জাতীয় সড়কপথ বিদ্যমান। প্রথমটি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, ইহা কলিকাতা হইতে বারাণসী, এলাহাবাদ, দিল্লী ও পাকিস্তানের পেশোয়ার হইয়া খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয়টি কলিকাতা-মাদ্রাজ সড়কপথ ; ইহা কলিকাতা হইতে কটক, বিশাখাপতনম্, বেজোয়াদা ও নেল্লোর হইয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়াছে। তৃতীয়টি মাদ্রাজ-বোম্বাই সড়কপথ। ইহা মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর, হুবলী ও পুনে হইয়া বোম্বাই শহর পর্যন্ত গিয়াছে। চতুর্থটি বোম্বাই-দিল্লী সড়কপথ ; ইহা বোম্বাই শহর হইতে ইন্দোর, ঝান্সী ও আগ্রা হইয়া দিল্লী পর্যন্ত গিয়াছে। পঞ্চমটি কলিকাতা হইতে নাগপুর হইয়া বোম্বাই পর্যন্ত গিয়াছে। এই পাঁচটি জাতীয় সড়কপথ ছাড়া আরও পঞ্চাশটি জাতীয় সড়কপথ তৈয়ারি ও চালু হইয়াছে।

সোভিয়েত রাশিয়া—সোভিয়েত রাশিয়ার বিশাল আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন, লোকবসতির অসামঞ্জস্য, কৃষি ও শিল্পের একদেশীভবন প্রভৃতির প্রয়োজনে এই দেশের সড়কপথের উন্নতিসাধন বিশেষ প্রয়োজন। এই দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৬,২০০ কোটি কিলোগ্রাম মালপত্র সড়কপথে লরী মারফত প্রেরিত হয়। মস্কো হইতে এই দেশের বিভিন্ন দিকে বিশাল দৈর্ঘ্যের বহু সড়কপথ আছে। এই সকল সড়কপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,২৫,৭০০ কিলোমিটার।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কমবেশী কিছু পরিমাণে সড়কপথ দেখা যায়।

খ (২) রেলপথ (Railways)

এক মহাসাগরের তীর হইতে মহাদেশের মধ্য দিয়া বহু রেলপথ অপর মহাসাগরের তীর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই সকল রেলপথকে সাধারণতঃ **মহাদেশীয় রেলপথ** (**Trans-continental Railways**) বলা হয়। পণ্যদ্রব্য ও আরোহী দ্রুত পরিবহণের জন্য এই সকল রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এই জাতীয় রেলপথগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

১। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ
২। ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ
৩। ট্রান্স-ককেশীয় রেলপথ
৪। কানাডিয়ান-প্যাসিফিক রেলপথ
৫। কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ
৬। নর্দার্ন-প্যাসিফিক রেলপথ
৭। ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ
৮। সাদার্ন প্যাসিফিক রেলপথ
৯। চিলি-আর্জেন্টাইন রেলপথ
১০। কেপ-টু-কায়রো রেলপথ
১১। ট্রান্স-অস্ট্রেলিয়ান রেলপথ

সোভিয়েত রাশিয়া

এই দেশে নিম্নলিখিত তিনটি মহাদেশীয় রেলপথ আছে ঃ

১। **ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ**—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮,৮০০ কিলোমিটার ; ইহাই পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। সুদূর প্রাচ্যের সহিত ইউরোপীয় রাশিয়া এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই রেলপথের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে ৯½ দিন সময় লাগে। এই পথে দুইটি গাড়ি পাশাপাশি যাইতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী মস্কো হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভ্লাডিভস্টক বন্দর পর্যন্ত এই রেলপথ বিস্তৃত। মস্কো হইতে এই রেলপথ কুইবিশেভ, ইউরাল পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত শিল্পাঞ্চল এবং তৈলকেন্দ্র উফা হইয়া এশিয়াটিক সোভিয়েত রাশিয়ার ওমস্ক শহর পর্যন্ত গিয়াছে ; ইহার পর ওব ও ইনেসী নদী অতিক্রম করিয়া এই রেলপথ ইরকুটস্ক শহরে পেঁছিয়াছে। তারপর বৈকাল হ্রদের দক্ষিণদিক দিয়া ইহা আমুর অববাহিকা ধরিয়া ভ্লাডিভস্টক বন্দরে পেঁছিয়াছে। এই বন্দরের কিছুদূরে হইতে একটি শাখা লাইন হারবিন ও মুকডেন হইয়া চীনের রাজধানী বেজিং পর্যন্ত গিয়াছে। মস্কো হইতে একটি লাইন লেনিনগ্রাড পর্যন্ত গিয়াছে। মস্কোর সহিত বার্লিন ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত।

সোভিয়েত রাশিয়ার এই রেলপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রেলপথের মাধ্যমে চীনদেশের সঙ্গে অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হয়। শাসন পরিচালনার জন্যও এই রেলপথ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই রেলপথের দুইপার্শ্বে অবস্থিত স্থানসমূহের প্রচুর কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদ এই রেলপথে প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে গম, জই, তুলা, বীট, কয়লা, খনিজ তৈল প্রধান। ইহা ছাড়া তৈগা অঞ্চলের কাঠ এবং ইউরাল ও মস্কো অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যও এই রেলপথে প্রেরিত হয়।

২। **ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ**—এই রেলপথ সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলপথ। কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে অবস্থিত **ক্রাস্নোভোডস্ক** হইতে এই রেলপথ তুর্কিস্তানের তুলা অঞ্চলের মধ্য দিয়া মার্ভ, সমরখন্দ, বোখারা হইয়া তাসখন্দ পর্যন্ত গিয়াছে; তাসখন্দ হইতে এই রেলপথ উত্তর দিকে ঘুরিয়া আরল সাগরের পূর্ব দিক দিয়া অগ্রসর হইয়া **চ্কালভ** (ওয়েনবার্গ) হইয়া **কুইবিশেভে** ট্রান্স-সাইবেরিয়ান
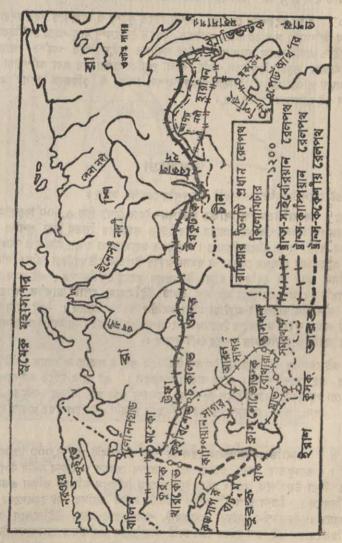
রেলপথের সঙ্গে মিশিয়া মস্কো পর্যন্ত গিয়াছে। মার্ভ হইতে এই রেলপথের একটি শাখা আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত **কুসক্** পর্যন্ত গিয়াছে; কুসক্ হইতে ইরান

সীমান্তের জাহিদান্ মাত্র ৬৪০ কিলোমিটার দূরে। এই ৬৪০ কিলোমিটার রাস্তায় রেলপথ নির্মিত হইলে সোভিয়েত রাশিয়া হইতে রেলপথে ইরান ও পাকিস্তান হইয়া সরাসরি ভারতে গমনাগমন সম্ভব হইবে। কারণ, বর্তমানে জাহিদানের সহিত পাকিস্তান ও ভারত রেলপথে যুক্ত। তুলা, গম, বীট, খনিজ তৈল ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথের মারফত প্রেরিত হয়।

৩। **ট্রান্স-ককেশীয় রেলপথ**—মস্কো হইতে কুরস্ক ও খারকোভ শহর হইয়া এই রেলপথ কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত বিখ্যাত তৈলকেন্দ্র বাকু শহরে পেঁছিয়াছে বাকু হইতে একটি লাইন কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বাটুম শহর পর্যন্ত গিয়াছে। বাকু অঞ্চলে প্রচুর খনিজ-তৈল, লোহ, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং কাস্পিয়ান হ্রদে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, মৎস্য ও কৃষিজাত সম্পদ মস্কো অঞ্চলে এই রেলপথে প্রেরিত হয়।

কানাডা

এই দেশে নিম্নলিখিত দুইটি মহাদেশীয় রেলপথ আছে ঃ

৪। **কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৬০০ কিলোমিটার। এই রেলপথ আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে কানাডার ভিতর দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভ্যাংকুভার বন্দর হইতে এই রেলপথ ফ্রেজার ও থমসন নদীর উপত্যকার উপর দিয়া কিকিং গিরিপথ, মেডিসিন হ্যাট ও রেজিনা হইয়া উইনিপেগ শহরে পেঁছিয়াছে ; এই শহর হইতে রেলপথটি হ্রদ অঞ্চলের উত্তরদিক দিয়া **ফোর্ট উইলিয়াম্, পোর্ট আর্থার, স্যাডবেরি** এবং কানাডার রাজধানী **অটোয়া** হইয়া **মনট্রিল** পর্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান হইতে একটি লাইন **কুইবেক** পর্যন্ত গিয়াছে এবং অপর একটি লাইন আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত **হ্যালিফাক্স** বন্দরে পেঁছিয়াছে।

এই রেলপথ কানাডার অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। উইনিপেগ শহরে এই দেশের বৃহত্তম গমের বাজার অবস্থিত। এই স্থান হইতে এই রেলপথের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রচুর গম বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়। মৎস্য, কাষ্ঠ ও হ্রদ অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এই রেলপথের মাধ্যমে প্রেরিত হয়।

৫। **কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ**—এই রেলপথটি প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। ভ্যাংকুভার বন্দর হইতে এই রেলপথ ফ্রেজার ও থমসন নদীর উপত্যকার উপর দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া ইয়েলোহেড গিরিপথ অতিক্রম করিয়া **এডমন্টনে** পেঁছিয়াছে। **প্রিন্স রুপার্ট** হইতে একটি লাইন আসিয়া এই রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। এডমন্টন হইতে রেলপথটি শাসকাচুয়ান হইয়া উইনিপেগে আসিয়া পেঁছিয়াছে। এই স্থান হইতে রেলপথটি কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের উত্তরদিক দিয়া **কুইবেক** পর্যন্ত গিয়াছে। কুইবেক হইতে একটি লাইন নোভাস্কোসিয়া দ্বীপের হ্যালিফাক্স বন্দরে পেঁছিয়াছে। একটি শাখা-রেলপথ শাসকাচুয়ান হইতে হাডসন

উপসাগরের তীরে অবস্থিত চার্চিল বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। উইনিপেগ হইতে একটি লাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো, বাফেলো প্রভৃতি শিল্পপ্রধান অঞ্চল পর্যন্ত

কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথসমূহ
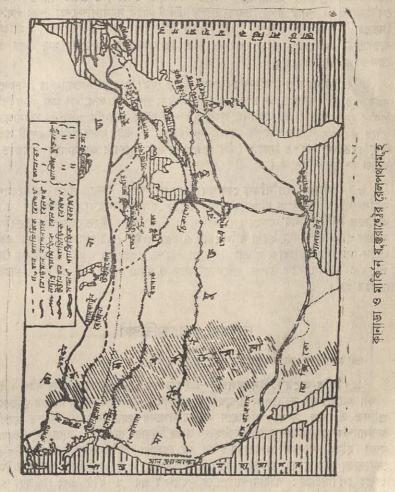
বিস্তৃত রহিয়াছে। এই রেলপথের সাহায্যে প্রচুর গম, কাঠ ও মৎস্য কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিদেশে প্রেরিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

এই দেশে অনেকগুলি বড় রেলপথ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি মহাদেশীয় রেলপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

৬। **নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথ**—এই রেলপথ ৩,০৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। চিকাগো শহর হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া এই রেলপথ সেন্ট পল ও

বিসমার্ক হইয়া ডাকোটা রাজ্যের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া রকি পর্বত ভেদ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত **সেটিল ও পোর্টল্যান্ড** বন্দরে পৌঁছিয়াছে। পোর্টল্যান্ড বন্দর হইতে একটি লাইন স্যানফ্রান্সিস্কো বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। চিকাগো হইতে একটি লাইন নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অধিক গম ও লৌহ উৎপাদনকারী অঞ্চলের মধ্য দিয়া এই রেলপথ চলিয়া গিয়াছে।

৭। **ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ**—ইহার দৈর্ঘ্য ৩,৫২৮ কিলোমিটার। চিকাগো শহর হইতে আইওয়া, নেব্রাস্কা, ইউটা, নেভাডা প্রভৃতি রাজ্যগুলির মধ্য দিয়া রকি পর্বত ভেদ করিয়া এই রেলপথ লবণ হ্রদ পার হইয়া সরাসরি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত স্যানফ্রান্সিস্কো বন্দরে পৌঁছিয়াছে। এই বন্দর হইতে একটি লাইন **লস্ এঞ্জেলস্** পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথের দুই পার্শ্বের অঞ্চলসমূহ কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ।

৮। **সাদার্ন প্যাসিফিক রেলপথ**—স্যানফ্রান্সিস্কো বন্দর হইতে এই রেলপথ ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকা ধরিয়া রকি পর্বত ভেদ করিয়া মেক্সিকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত **নিউ অরলিয়ন্স** বন্দরে পৌঁছিয়াছে। এই বন্দর হইতে রেলপথটি উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া সেন্ট লুই হইয়া **বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটন** পৌঁছিয়াছে। অপর একটি লাইন মিসিসিপি উপত্যকা ধরিয়া চিকাগো পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথের উত্তর পার্শ্বের স্থানগুলিতে উৎপন্ন প্রচুর কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদ এই রেলপথের মারফত প্রেরিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা

এই মহাদেশে একটিমাত্র মহাদেশীয় রেলপথ আছে:

৯। **চিলি-আর্জেন্টাইন রেলপথ**—এই রেলপথ ১,৪১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ। চিলি ও আর্জেন্টিনার কৃষিজাত, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ পরিবহণে এই রেলপথের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস্ আয়ার্স বন্দর হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া এই রেলপথ আন্ডিজ পর্বত ভেদ করিয়া মেনডোজা শহর হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত চিলির **ভালপারাইজো** বন্দরে পৌঁছিয়াছে; প্যারানা-পারাগুয়ে পর্যন্তের গম ও বীট এবং চিলির তাম্র, নাইট্রেট্ প্রভৃতি খনিজ সম্পদ এই রেলপথ মারফত প্রেরিত হয়। এই রেলপথে একাধিক 'গেজ' থাকায় মাল চলাচলের অসুবিধা হয়।

আফ্রিকা

এই মহাদেশের বিভিন্ন রেলপথগুলির মধ্যে একটিই প্রধান:

১০। **কেপ-টু-কায়রো পথ**—আফ্রিকার এই পথটি প্রকৃতপক্ষে রেলপথ, জলপথ ও স্থলপথের সমষ্টি। এই পথটি আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কেপ টাউন

শহর হইতে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কায়রো শহর পর্যন্ত গিয়াছে। এই দুইটি স্থানের দূরত্ব প্রায় ১৪,৪০০ কিলোমিটার। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন হইতে

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মহাদেশীয় রেলপথসমূহ
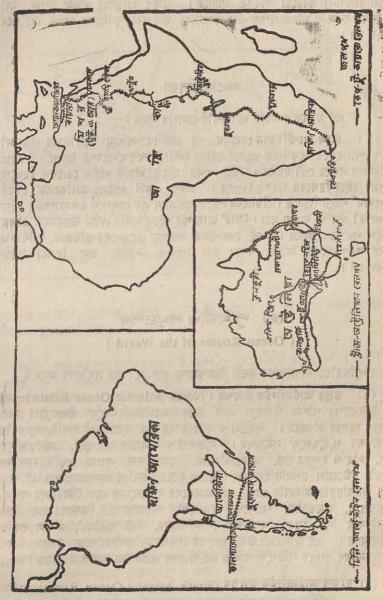
একটি রেলপথ **বুলাওয়ে** হইয়া জায়েরের **বুকুমা** পর্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান হইতে জলপথে ও স্থলপথে খার্টুম পর্যন্ত যাইতে হয়। খার্টুম হইতে একটি রেলপথ

ওয়াদি হাইফা পর্যন্ত গিয়াছে। ওয়াদি হাইফা হইতে নীলনদ দিয়া জলপথে সেলাল পর্যন্ত যাইতে হয়। সেলাল হইতে একটি রেলপথ সংযুক্ত আরব সাধারণ-তন্ত্রের রাজধানী **কায়রো** পর্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ সম্পদ, মধ্য আফ্রিকার বনজ ও খনিজ সম্পদ এবং নীলনদের উপত্যকার কৃষিজাত সম্পদ এই পথে প্রেরিত হয়।

অস্ট্রেলিয়া

এই মহাদেশে একটি মহাদেশীয় রেলপথ আছে ঃ—

১। **ট্রান্স-অস্ট্রেলিয়ান রেলপথ**—এই রেলপথ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ বন্দর হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিখ্যাত স্বর্ণখনি-কেন্দ্র কালগুর্লি হইয়া অ্যাডিলেড বন্দরে পৌঁছিয়াছে। এই বন্দর হইতে একটি লাইন **ব্রোকেন হিল** ও **সিডনী** হইয়া **ব্রিসবেন** পর্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি লাইন **অ্যাডিলেড** হইতে **মেলবোর্ন** শহরে গিয়াছে। **ব্রিসবেন** হইতে বর্তমানে এই রেলপথে **রকহ্যাম্পটন** হইয়া **ক্লনক্যারী** পর্যন্ত যাওয়া যায়। **পোর্ট আগাস্টা** হইতে একটি লাইন উত্তরদিকে **এলিস স্প্রিংস** পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথের সাহায্যে এই দেশের কৃষিজাত, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়।

(গ) পৃথিবীর সমুদ্রপথ

(Ocean Routes of the World)

পৃথিবীতে নিম্নলিখিত ছয়টি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ আছে ঃ

(১) **উত্তর আটলান্টিক জলপথ (North Atlantic Ocean Route)**—এই পথ ইউরোপের পশ্চিম উপকূল এবং উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। পণ্যদ্রব্য ও যাত্রিবহনের দিক হইতে এই পথটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার গম, ভুট্টা, তামাক, খনিজ তৈল, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, অ্যালুমিনিয়াম, তুলা, বস্ত্র, কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ইউরোপে রপ্তানি হয় এবং ইউরোপ হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এই পথে উত্তর আমেরিকায় আমদানি হয়। এই জলপথের বন্দরগুলির মধ্যে ইউরোপের লন্ডন, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, গ্লাসগো, হামবুর্গ, আন্তোয়ার্প, লিসবন এবং উত্তর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, গ্যালভেস্টন, বাল্টিমোর, নিউ অরলিয়ং, মন্ট্রিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই জলপথের উভয় প্রান্তের দেশসমূহ শিল্প-বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত এবং নানাবিধ সম্পদে পরিপূর্ণ বলিয়া এই জলপথ এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে।

(২) **দক্ষিণ আটলান্টিক জলপথ (South Atlantic Ocean Route)**—পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বভাগ এই জলপথে যুক্ত। ইহার একদিকে শিল্পপ্রধান ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে কৃষিজাত,

খনিজ ও প্রাণিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকা। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে চিনি, কোকো, রবার, গম, মাংস, চর্ম, তুলা, গবাদি পশু প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে রপ্তানি হয় এবং এই সকল দেশ হইতে দক্ষিণ আমেরিকা নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। এই জলপথের বন্দরগুলির মধ্যে হাভানা, ভেরাক্রুজ, ট্যাম্পিকো,

পৃথিবীর সমুদ্রপথ
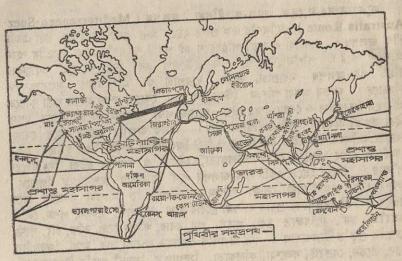
রায়ো-ডি জেনিরো, বুয়েনস্ আয়ার্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই পথে পণ্য-পরিবহণের পরিমাণ খুব বেশী নহে।

(৩) **পানামা পথ (Panama Route)**—১৯১৪ সাল হইতে এই খাল উন্মুক্ত হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সহজ যোগাযোগের বন্দোবস্ত হইয়াছে। পানামা খাল কাটিবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের সহিত এই দেশের পশ্চিম উপকূলের এবং অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, জাপান, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে। জলপথে চা, চিনি, তৈলবীজ, তুলা, যন্ত্রপাতি, কাষ্ঠ, কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড, গবাদি পশু, গম প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়। অকল্যান্ড, ওয়েলিংটন, সিডনি, মেলবোর্ন, ভ্যাংকুভার, প্রিন্স রুপার্ট, নিউ ইয়র্ক, স্যানফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি বন্দর এই জলপথে অবস্থিত।

(৪) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলপথ (Pacific Route)**—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহের সহিত পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডের বন্দরগুলি এই জলপথ দ্বারা যুক্ত। ইহার অন্তর্গত তিনটি প্রধান পথ রহিয়াছে ঃ সিডনি-অকল্যান্ড-ফিজি-হনলুলু-স্যানফ্রান্সিস্কো, ম্যানিলা-হংকং-সাংহাই-ইয়োকোহামা-ভ্যাংকুভার এবং ম্যানিলা-হংকং-সাংহাই-হনলুলু-স্যানফ্রান্সিস্কো। রেশম, চা, চর্ম, রবার পশুলোম, শণ, চিনি, ধান, রাং প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকার দেশসমূহে আমদানি হয় এবং এই সকল দেশ হইতে কাষ্ঠ, মাংস,

মৎস্য, গম, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, তৈল প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যে রপ্তানি হয়। পূর্বে এই জলপথের গুরুত্ব অনেক কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে চীন ও জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ায় এই জলপথের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে।

ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ খাল-অস্ট্রেলিয়া জলপথ (**Mediterranean-Suez-Australia Route**)—পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইবার ইহা একটি দীর্ঘ জলপথ। পণ্যদ্রব্য ও যাত্রী পরিবহণে এই পথটি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিম-ইউরোপ, দক্ষিণ-ইউরোপ এবং উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকার সহিত এই জলপথ মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, দূরপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়ার সংযোগসাধন করিয়াছে। লন্ডন অথবা পশ্চিম ইউরোপের অন্য কোনো বন্দর হইতে যাত্রা করিলে এই পথে জিব্রাল্টার ও সৈয়দ বন্দর হইয়া সুয়েজ খাল অতিক্রম করিয়া এডেন বন্দর হইয়া করাচী অথবা বোম্বাই পেঁছানো যায়। অনেক জাহাজ এডেন হইতে সোজা কলম্বো ও সিংগাপুর হইয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডের বন্দরে গিয়া হাজির হয়। একটি শাখাপথ কলম্বো হইতে কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও রেংগুন হইয়া সিংগাপুরে পেঁছায়। এডেন হইতে একটি শাখা-জলপথ পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহে গিয়াছে। কলম্বো হইতে একটি শাখা সোজা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ফ্রি ম্যান্টল বন্দরের দিকে গিয়াছে। এই জলপথের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে চা, পাট, রেশম, পশম, লৌহ, তৈলবীজ, চর্ম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস, গম, রবার, খনিজ তৈল, কফি, রাং, কাষ্ঠ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই জলপথে অবস্থিত বন্দরগুলির মধ্যে জিব্রাল্টার, সৈয়দ, এডেন, বোম্বাই, কলম্বো, কলিকাতা, সিঙ্গাপুর, সিডনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এডেন, কলিকাতা, জিব্রাল্টার, সৈয়দ, সুয়েজ প্রভৃতি বন্দরে জাহাজে পানীয় জল ও কয়লা ভর্তি করা হয়।

উত্তমাশা অন্তরীপ পথ অপেক্ষা সুয়েজপথে অনেক সুবিধা বিদ্যমান। সুয়েজ পথে যুক্তরাজ্যের লন্ডন হইতে ভারতের বোম্বাই বন্দরের দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম। ইহাতে অনেক কম ভাড়ায় ও কম সময়ে লন্ডন হইতে ভারতে যাওয়া যায়।

(৫) **উত্তমাশা অন্তরীপ জলপথ** (**Cape Route**)—এই পথটি খুব প্রাচীন। ভাস্কো-ডা-গামা এই পথ প্রথম আবিষ্কার করেন। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া যাইতে হয় না বলিয়া এই পথে কোনো শুল্ক দিতে হয় না। সেইজন্য এই জলপথটি অপেক্ষাকৃত সস্তা। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর হইতে এই পথ আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ধরিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের কেপ টাউন বন্দর হইয়া একটি শাখা অস্ট্রেলিয়ার ফ্রি ম্যান্টল বন্দর পর্যন্ত যায়; অপর একটি শাখা কেপ টাউন হইতে কলম্বো হইয়া সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়া যায়। একটি পথ কেপ টাউন বন্দর হইতে পূর্ব আফ্রিকার বন্দরগুলি হইয়া এডেন বন্দর মারফত বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জলপথে রবার, স্বর্ণ, ফল, গম, ভুট্টা, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, তাম্র, হীরক, কাষ্ঠ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হইয়া থাকে। এই জলপথে যাইতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় বলিয়া এই পথে বাহিত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ অনেক কম। এই জলপথের বন্দরগুলির মধ্যে লন্ডন, লিসবন, কেপ টাউন, পোর্ট এলিজাবেথ, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, ফ্রি ম্যান্টল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ (২) খালপথ (Canal Routes)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য-পরিবহণে সমুদ্র সংযোগকারী বিভিন্ন সামুদ্রিক খালের গুরুত্ব কম নহে। পৃথিবীর দুইটি সামুদ্রিক খাল খুবই বিখ্যাত—সুয়েজ খাল ও পানামা খাল। এই সকল খালের মধ্য দিয়া বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

সুয়েজ খালপথ (The Suez Canal Route)—লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে এই খাল সংযুক্ত করিয়াছে। ১৮৫৯ সালে পূর্তবিদ ফার্ডিনান্ড-দ্য লেসেপস্ এই খালটি খনন করান। এই খালের দৈর্ঘ্য ১৬৬ কিলোমিটার, প্রস্থ ৪৬ মিটার এবং গভীরতা ১১ মিটার। মিশরে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পূর্বে খালটি ইঙ্গ-ফরাসী অধিপতিদের অধীন ছিল; কিন্তু এই স্থানটি সম্পূর্ণই মিশরের অন্তর্গত। ১৯৫৬ সালে মিশরের বিপ্লবী সরকার এই খালটিকে মিশরের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং ইহার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এই কর্তৃত্ব হারাইবার ফলে ক্রোধে অন্ধ হইয়া ক্ষমতা-দর্পী ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঐ সময় মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার হুমকিতে শেষ পর্যন্ত ইহারা যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে বর্তমানে এই খালটির উপর মিশর সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যমান।
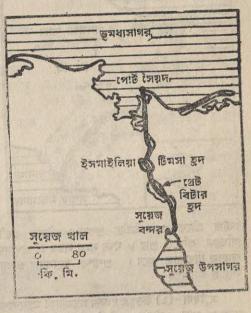
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই খালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বৎসর প্রায় ৬,০০০ জাহাজ এই খালটি অতিক্রম করে; এই জাহাজগুলির বেশীর ভাগ ব্রিটেনের; অবশিষ্ট জাহাজগুলি ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, ইটালি প্রভৃতি দেশের। এই খালের দুইদিকে দুইটি বন্দর আছে—সৈয়দ বন্দর ও সুয়েজ বন্দর।

সুবিধা—(১) এই খালের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশসমূহের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সকল দেশ জলপথে নিকটতর হইয়াছে। লন্ডন হইতে বোম্বাই বন্দরের দূরত্ব উত্তমাশা অন্তরীপের মারফত ১৭,৭০০ কিলোমিটার; কিন্তু সুয়েজ খাল মারফত মাত্র ১০,০০০ কিলোমিটার। লন্ডন হইতে কলিকাতার দূরত্ব সুয়েজ খালের মাধ্যমে ৬,৪০০ কিলোমিটার কমিয়াছে। (২) এইভাবে দূরত্ব কমিবার জন্য স্বভাবতঃই ভাড়া কম হয়। ফলে বাণিজ্যিক

পণ্যের দাম কমিয়া যায়। (৩) পৃথিবীর জনবহুল দেশসমূহ (ইউরোপের দেশসমূহ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি) এই খালের মাধ্যমে বহু যাত্রী ও প্রচুর পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করে। সুতরাং এই খালে সর্বক্ষণ চলাচলের জন্য জাহাজের অভাব হয় না। (৪) এই খালের মধ্য দিয়া যে সকল জাহাজ চলাচল করে তাহাদের কয়লা বা খনিজ তৈলের কোনো অভাব হয় না। পশ্চিম ইউরোপের কয়লা, আরব দেশসমূহ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের খনিজ তৈল সহজেই এই সকল জাহাজে যোগান দেওয়া যায়। (৫) এই খালটি অতিক্রম করিতে মাত্র ১২ ঘণ্টা সময় লাগে।

এই খালপথে যাতায়াতে কয়েকটি **অসুবিধাও** আছে। এখানকার শুল্ক অপেক্ষাকৃত বেশী। খালটি সংকীর্ণ বলিয়া জাহাজগুলিকে মন্থর গতিতে যাইতে হয়। অতিশয় বৃহদাকার জাহাজ এই খালের মাধ্যমে যাইতে পারে না।

পানামা খালপথ (The Panama Canal Route)—উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী যোজকের নাম পানামা যোজক। এই যোজকের মধ্য দিয়া পানামা খাল কাটা হইয়াছে। ১৯১৪ সালে এই খাল জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়। খালটি ৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৯১ মিটার হইতে ৩০০ মিটার প্রশস্ত; ইহার গভীরতা ১২½ মিটার। এই খালটি অতিক্রম করিতে প্রায় ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। দৈনিক এই খালের মধ্য দিয়া গড়ে ৪৮টি জাহাজ যাতায়াত করে। প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে এই খাল সংযুক্ত করিয়াছে।

সুবিধা—(১) উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উভয়তটে অবস্থিত বন্দরসমূহের দূরত্ব হ্রাস পাইয়াছে; নিউ ইয়র্ক হইতে ভ্যালপ্যারাইজোর দূরত্ব ৬,০০০ কিলোমিটার কমিয়া গিয়াছে এবং ওয়েলিংটন বন্দরের দূরত্ব ৪,৫০০ কিলোমিটার কমিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ অনেকটা নিকটতর হইয়াছে। (২) যুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে দ্রুত জাহাজ চলাচলে সুবিধা হয়। (৩) এই খালের জন্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই অঞ্চলের দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য হইয়াছে।

পানামা খালের মাধ্যমে জাহাজ চালাইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়: (১) পানামা খাল পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাইবার ফলে জাহাজগুলিকে অসমতল সমুদ্রপৃষ্ঠ দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। (২) মাত্র ৬৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের খালটি পার হইতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। (৩) খালটির উভয় পার্শ্বের জনসংখ্যা খুব কম এবং বন্দর ও পোতাশ্রয়ের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সুয়েজ খাল ও পানামা খালের তুলনা

সুয়েজ খাল	পানামা খাল
১। সুয়েজ খাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের দূরত্ব হ্রাস করিয়াছে।	১। পানামা খাল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর-সমূহ ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় বন্দর-সমূহের দূরত্ব হ্রাস করিয়াছে।
২। এই খাল স্থানীয় মিশর সরকারের **কর্তৃত্বাধীন**।	২। এই খাল বিদেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের **কর্তৃত্বাধীন**।
৩। এই পথে **ব্রিটেনের জাহাজ** বেশী চলে।	৩। এই পথে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ** বেশী চলে।
৪। এই খালটি ১৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৪৬ মিটার **প্রশস্ত** এবং ১১ মিটার গভীর।	৪। এই খালটি ৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ, ১১ হইতে ৩০০ মিটার **প্রশস্ত** এবং ১২$\frac{১}{২}$ মিটার গভীর।
৫। এই খালটি অতিক্রম করিতে ১২ ঘণ্টা **সময়** লাগে।	৫। এই খালটি অতিক্রম করিতে ৮ ঘণ্টা **সময়** লাগে।
৬। এই খালের **শুল্ক** বেশী। সকলকেই ইহা দিতে হয়।	৬। এই খালের **শুল্ক** অপেক্ষাকৃত কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত সকলকেই ইহা দিতে হয়।
৭। এই খালের **নিকটবর্তী অঞ্চল** জনবহুল; বন্দর, জল ও কয়লার কোনো অভাব নাই।	৭। এই খালের **নিকটবর্তী অঞ্চল** জনবিরল ও অনুন্নত।
৮। ইহার **রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব** অনেক বেশী। কারণ, এখানে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনিগুলি অবস্থিত।	৮। ইহা সম্পূর্ণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করতলগত। ইহার **রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব** অপেক্ষাকৃত কম।
৯। সুয়েজ পথে অধিকতর **পণ্যদ্রব্য** পরিবাহিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল, পাকিস্তানের তুলা, বাংলাদেশের পাট, ভারতের তৈলবীজ, চা, চর্মদ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ার চা ও রবার, চীন ও জাপানের রেশম, পূর্ব আফ্রিকার তুলা, অস্ট্রেলিয়ার গম ও পশম প্রভৃতি এই পথে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে চালান দেওয়া হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য এই সকল দেশে আমদানি হয়।	৯। পানামাপথে অপেক্ষাকৃত কম **পণ্যদ্রব্য** পরিবাহিত হয়। এই পথে ক্যালিফোর্নিয়ার খনিজ তৈল ও ফল, ভ্যাঙ্কুভারের কাষ্ঠ ও মৎস্য, চিলির তাম্র ও নাইট্রেট, হাওয়াই ও ফিজির চিনি, জাপানের রেশম, বলিভিয়ার টিন, নিউ জিল্যান্ডের দুগ্ধজাত দ্রব্য আটলান্টিক মহাসাগরের বন্দরগুলিতে চালান দেওয়া হয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বন্দরগুলিতে মোটরগাড়ি, গম, বস্ত্র, ঔষধ ও লৌহদ্রব্য প্রেরিত হয়।

খ (৩) পৃথিবীর অন্তর্দেশীয় জলপথ (নদীপথসমূহ)
(Inland Waterways of the World)

নিম্নে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য অন্তর্দেশীয় জলপথসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল :

উত্তর আমেরিকা—পঞ্চ হ্রদ অঞ্চল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে **সুপিরিয়র, মিচিগান, হিউরন, ইরি ও অন্টারিও** নামে যে পাঁচটি হ্রদ পাশাপাশি অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাই পঞ্চহ্রদ (**The Great Lakes**) নামে খ্যাত। সেন্ট লরেন্স নদী এই হ্রদসমূহকে আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই পাঁচটি হ্রদ বিভিন্ন খাল দ্বারা পরস্পর যুক্ত বলিয়া হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চল হইতে জলপথে আটলান্টিক মহাসাগরে যাওয়া যায়। সুপিরিয়র ও হিউরন হ্রদের মধ্যে সেন্ট মেরী খাল ('সু' খাল), হিউরন ও ইরি হ্রদের মধ্যে সেন্ট ক্লেয়ার খাল, ইরি ও অন্টারিও হ্রদের মধ্যে নায়াগ্রা জলপ্রপাত অতিক্রম করিবার জন্য ওয়েল্যান্ড খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, অটোয়া নদী ও অন্টারিও হ্রদের মধ্যে রিডু খাল, ইরি হ্রদ ও হাডসন নদীর মধ্যে ইরি খাল, ইলিনয় নদী ও মিচিগান হ্রদের মধ্যে ইলিনয় খাল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে এই হ্রদসমূহের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।
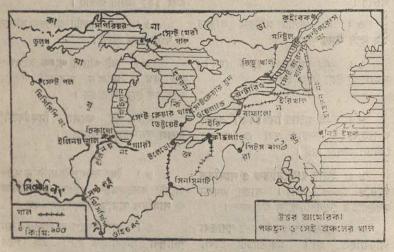
এই হ্রদের জলপথ বৎসরে ৫ মাস বরফাবৃত থাকিলেও বাকী ৭ মাস এই জলপথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়া থাকে। এই হ্রদসমূহের মাধ্যমে খনি হইতে প্রচুর লৌহ আকরিক ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্রে প্রেরিত হয়। গম উৎপাদক অঞ্চল হইতে এই জলপথে গম-রপ্তানির সুবন্দোবস্ত হয়। ইহা ছাড়া তাম্র, নিকেল, সংবাদপত্রের কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্য এই পথে পরিবাহিত হয়। ইহাতে এই অঞ্চলের আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। হ্রদ অঞ্চলে অনেক শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো, বাফেলো, ডুলুথ, ডেট্রয়েট,

গ্যারী, টলেডো ও ক্লীভল্যান্ড এবং কানাডার পোর্ট আর্থার, টরন্টো, কিংস্টন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কানাডার নদীসমূহের মধ্যে সেন্ট লরেন্স, অটোয়া, মেকেঞ্জি, শাস্‌কাচয়ান, ইউকন, নেলসন, আলবানি, কলম্বিয়া, ফ্রেজার, স্কীনা প্রভৃতি নদী উল্লেখযোগ্য। খরস্রোতা বলিয়া এবং অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকে বলিয়া এখানকার অধিকাংশ নদী নাব্য নহে। **সেন্ট লরেন্স নদী** ও হ্রদসমূহের মাধ্যমে অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নদীসমূহের মধ্যে মিসিসিপি, মিসৌরী ও ইহাদের শাখা-নদীসমূহ এবং হাডসন ও টেনেসী নদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিসিসিপি এই দেশের দীর্ঘতম নদী। মিসৌরী নদী সেন্ট লুই শহরের নিকটে মিসিসিপি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। **মিসিসিপি-মিসৌরী** নদীপথ একযোগে প্রায় ৩,২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। ইহাদের উপকূলের কৃষিজাত দ্রব্য, শিল্পাঞ্চলের পণ্যদ্রব্য এবং পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লা এই নদীপথে পরিবাহিত হয়।

মিসিসিপির উপনদী ইলিনয় খাল দ্বারা মিচিগান হ্রদের সহিত যুক্ত। এই নদীর অন্য একটি উপনদী ওহিও কয়লা পরিবহণের জন্য বিখ্যাত। এই দেশের পূর্বাংশে **হাডসন নদী** ইরি খাল দ্বারা অন্টারিও হ্রদের সহিত যুক্ত থাকায় এবং এই নদীর মোহানার নিকট নিউ ইয়র্ক বন্দর অবস্থিত হওয়ায় ইহার গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে টেনেসি নদীর উপর বাঁধ দিয়া ইহার গতি নিয়ন্ত্রিত করায় ইহার পরিবহণ-ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশে উল্লেখযোগ্য তিনটি নদী আছে—আমাজন, প্লাটা ও অরিনোকো। ব্রাজিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া **আমাজন নদী** আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে। এই নদী প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুনাব্য হইলেও উপকূলবর্তী স্থানসমূহ জঙ্গলাকীর্ণ ও অনুন্নত বলিয়া ইহার মাধ্যমে পরিবহণ-ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ব্রাজিলের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন পারানা এবং মত্তোগ্রাসো উচ্চভূমিতে উৎপন্ন পারাগুয়ে একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। **পারানা-পারাগুয়ে** নদীপথে বড় বড় স্টীমার চলে। এই নদীপথের সহিত উরুগুয়ে নদী মিলিত হইবার পর ইহার নাম হইয়াছে প্লাটা নদী; ইহা আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে। পারানা-পারাগুয়ে উপত্যকা **কৃষিজাত** সম্পদে সমৃদ্ধ। গিয়ানা মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া **অরিনোকো** নদী ভেনেজুয়েলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা ১,৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য।

সোভিয়েত রাশিয়া—সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন নদী এই দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবহণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এখানকার **ভল্গা** নদী ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। ভল্গা নদী কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে বলিয়া অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহণে উহা অধিক ব্যবহৃত হয়। এই নদীর মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে অধিকাংশ মাল পরিবাহিত হয়। ইহা ছাড়া ডন, নীপার, নীস্টার ও ডুইনা প্রভৃতি নদীর মাধ্যমেও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচুর পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করা হয়। এই নদীগুলি স্থলবেষ্টিত সাগরে পড়িয়াছে বলিয়া বহির্বাণিজ্যের সহায়ক নহে। সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যান্য নদীতে শীতকালে বরফ জমিয়া থাকে বলিয়া নাব্য নহে।

এশীয়-রাশিয়ার নদীগুলির মধ্যে ওব, **ইনিসি, লেনা** ও **আমুর** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে বিরল লোকবসতি থাকায় এবং এই নদীসমূহ অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকায় এখানকার নদীসমূহ পণ্য পরিবহণের উপযোগী নহে।

জার্মানী—জার্মানী একটি নদীমাতৃক দেশ। এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে স্থানীয় নদীসমূহের প্রচুর অবদান রহিয়াছে। জার্মানীর **রাইন, দানিয়ুব, ওডার, ভিশ্চুলা, এল্‌ব** ও **ওয়েসার** প্রভৃতি নদী সুনাব্য। এই সকল নদী আল্পস-কার্পেথিয়ান নামক পার্বত্য অঞ্চল হইতে উত্তরদিকে বাল্‌টিক্‌ অথবা উত্তর সাগরে পড়িয়াছে। এই নদীসমূহের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রাইন নদীর উপত্যকায় জার্মানীর বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল রূঢ় অবস্থিত। এই নদীর মারফত কয়লা, লৌহ, সিমেন্ট, ইস্পাত, কাঠ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হইয়া থাকে। দানিয়ুব হইতে রাইন-পথে উত্তর-পশ্চিম জার্মানী হইয়া উত্তর সাগরে যাওয়া যায়। জার্মানীর নদীসমূহে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য ওডার নদী স্প্রী ও এল্‌ব নদীর সহিত এবং ওয়েসার নদী রাইন ও এল্‌ব নদীর সহিত খাল দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। এই নদীসমূহের সহিত ফ্রান্সের নদীসমূহের যোগাযোগ রহিয়াছে। এইভাবে পূর্ব জার্মানী হইতে নদী ও খালপথে ইউরোপের পশ্চিমাংশে সহজেই যাতায়াত করা যায়। পূর্ব জার্মানীর **ওডার নদী** বাল্‌টিক্‌ সাগরে এবং মধ্য জার্মানীর **এল্‌ব নদী** উত্তর সাগরে পড়িয়াছে। বাল্‌টিক্‌ সাগর শীতকালে বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া ওডার উপত্যকার পণ্যদ্রব্য স্প্রী খাল ও এল্‌ব নদীর মাধ্যমে হামবুর্গ বন্দরে নেওয়া হয়। বাল্‌টিক সাগরের প্রধান বন্দর কিয়েল হইতে **কিয়েল খাল** কাটিয়া এই সাগরের সঙ্গে উত্তর সাগরের যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। এইভাবে জার্মানীর নদীসমূহ ও বিভিন্ন খাল এই দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তা করিয়াছে। এই সকল নদীর উপর বড় বড় বন্দর স্থাপিত হইয়াছে ; যথা—হামবুর্গ, কলোন ইত্যাদি।

ফ্রান্স—ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ জলপথ পণ্য-পরিবহণের সহায়ক। এই দেশের **রোন, সীন, রাইন-রোন খাল, গ্যারন, লয়ার, সেওন, মার্সাই-রোন খাল** প্রভৃতি নদী ও খাল সুনাব্য। পূর্বে উত্তর ফ্রান্স হইতে পণ্যদ্রব্য জলপথে দক্ষিণ ফ্রান্সে পাঠাইতে হইলে জিব্রাল্টার প্রণালী ঘুরিয়া ভূমধ্যসাগর হইয়া পাঠাইতে হইত। এখন এই সকল নদী ও খালের সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্যে পণ্য-পরিবহণের সুবিধা হইয়াছে। সীন নদীর উপনদী ইওন ও সেওন যোগ করিয়া যে **বার্গাণ্ডি খাল** কাটা হইয়াছে তাহার মাধ্যমে উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণ ফ্রান্স জলপথে যুক্ত হইয়াছে। ফ্রান্সের জলপথসমূহ জার্মানী ও বেলজিয়ামের জলপথ-সমূহের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহাদের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

ব্রিটেন—এই দেশের নদী ও উৎকৃষ্ট খালসমূহ দেশের শিল্পোন্নতির সহায়ক হইয়াছে। **টেম্স্‌, মার্সে, হাম্বার, সেভার্ন** প্রভৃতি নদী সুনাব্য। ৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ **ম্যাঞ্চেস্টার খাল** দিয়া পণ্যবাহী জাহাজ সোজা কার্পাসশিল্পের কেন্দ্রস্থল ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছিতে পারে। ইহা ছাড়া এই দেশে আরও কয়েকটি খাল আছে ; যথা—মার্সে খাল, লীডস্‌ ও লীভারপুল খাল, কেনেট ও আভন খাল ইত্যাদি। স্কটল্যান্ডের ফোর্থ ও ক্লাইড খাল ইহার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহকে

সংযুক্ত করিয়াছে। রেলপথের প্রসার হওয়ায় বর্তমানে এই দেশের জলপথের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে।

চীন—চীন নদীমাতৃক দেশ বলিয়া প্রাচীনকালে এই দেশে সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল। এই দেশের তিনটি নদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য—হোয়াংহো, ইয়াংসি-কিয়াং এবং সি-কিয়াং। **ইয়াংসি-কিয়াং** এই দেশের দীর্ঘতম নদী। এই নদীর প্রায় ২,৫৩০ কিলোমিটার পথ সুনাব্য। এই নদীপথে চীনের কৃষিজাত, খনিজ ও বনজ সম্পদ প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থ বন্দরে নেওয়া যায়। চীনের দক্ষিণাংশে **সি-কিয়াং** নদীর প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার পথ নাব্য। **হোয়াংহো** বা পীত নদী উত্তর চীনের প্রধান নদীপথ। বন্যা ও গতি পরিবর্তনের জন্য পূর্বে এই নদী কুখ্যাত ছিল এবং এই নদী 'চীনের দুঃখ' বলিয়া অভিহিত হইত। বর্তমান চীন সরকার নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পন্থায় এই নদীকে অনেকটা সংযত করিয়াছে। এই সকল নদী ছাড়াও চীন দেশে অসংখ্য খাল রহিয়াছে; ইহার মধ্যে গ্রান্ড খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই খাল ইয়াংসি-কিয়াং ও হোয়াংহোর বদ্বীপ অঞ্চলকে যুক্ত করিয়াছে। চীনের নদী-উপত্যকায় সর্বাপেক্ষা বেশী ফসল উৎপন্ন হয় এবং এই সকল নদীপথ চীনের দ্রুত উন্নতিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

আফ্রিকা—এই মহাদেশের আয়তনের তুলনায় জলপথ অত্যন্ত কম। এখানকার নদীসমূহের মধ্যে নীল, কঙ্গো, নাইজার, জাম্বেসী, অরেঞ্জ ও লিম্পোপো নদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীল নদ প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। মিশরের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে ও পণ্য পরিবহণে নীলনদের দান অসামান্য। সেইজন্য মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয়। **কংগো নদী** প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। জায়েরে প্রজাতন্ত্রের এই নদীই পণ্য পরিবহণের প্রধান পথ। **নাইজার নদী** পশ্চিম সুদানের মধ্য দিয়া গিনি উপসাগরে পড়িয়াছে। ইহা প্রায় ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। পূর্ব আফ্রিকার **জাম্বেসী** প্রায় ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। দক্ষিণ আফ্রিকার **অরেঞ্জ** ও **লিম্পোপো** পণ্য-পরিবহণের উপযোগী নহে।

অস্ট্রেলিয়ার মারে ও ডার্লিং নদী, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী, সিটাং ও সালউইন নদী, থাইল্যান্ডের মেকং ও মেনাম নদী, পাকিস্তানের সিন্ধু ও উহার উপনদীসমূহ, **বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা** প্রভৃতি নদী নাব্য এবং পণ্য-পরিবহণের উপযুক্ত। ভারতের নদীপথ সম্বন্ধে 'ভারত' অংশে আলোচনা করা হইয়াছে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানপথ

(Principal International Air Routes)

বর্তমান যুগে বিমানপথের উন্নতি হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিমানপথের সৃষ্টি হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিমানপথের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি পথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) **ইউরোপ-আমেরিকা বিমানপথ**—(ক) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস্ আয়ার্স পর্যন্ত এবং (খ) ইউরোপ হইতে উত্তর আমেরিকার

নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত দুইটি পথ প্রসারিত। প্রথমোক্ত পথে বিমানপোতসমূহ মার্সেল, জিব্রাল্টার ও আফ্রিকার বাথার্স্ট হইয়া আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া পারনামবুকো পেঁছায়। সেখান হইতে একটি শাখা বুয়েনস্ আয়ার্স পর্যন্ত গিয়াছে; অন্য শাখাটি পারনামবুকো হইতে চিলির সান্টিয়াগো পর্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয় পথটি প্যারিস ও লন্ডন হইতে অটোয়া ও নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত গিয়াছে; পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য শহরের সহিতও এই পথ যুক্ত।

(২) **আমেরিকা-এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমানপথ**—স্যানফ্রান্সিস্কো ও লস্ এঞ্জেলস্ হইতে এই পথ হনলুলু, ম্যানিলা, সাংহাই, সিঙ্গাপুর ও সিডনি হইয়া ওয়েলিংটন পর্যন্ত গিয়াছে। সিট্ল হইতে একটি শাখা টোকিও হইয়া সাংহাই পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) **উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ**—বুয়েনস্ আয়ার্স হইতে পারনামবুকো, ত্রিনিদাদ, হাইতি, কিউবা ও ফ্লোরিডা হইয়া এই পথ নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার একটি শাখা বুয়েনস্ আয়ার্স হইতে ভ্যালপারাইজো ও কিউবা হইয়া নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৪) **ইউরোপ-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া বিমানপথ**—বিভিন্ন দেশের বিমানপোত এই পথে যাতায়াত করে। ইহাদের মধ্যে ব্রিটিশ, ডাচ ও ফ্রান্সের বিমানপোতের সংখ্যাই বেশী। লন্ডন-প্যারিস হইতে মার্সেল, এথেন্স, কায়রো, বাগদাদ, করাচী, যোধপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা ও ডারউইন হইয়া সিডনি পর্যন্ত এই পথ বিস্তৃত।

(৫) **ইউরোপীয় রাশিয়া-পূর্ব এশিয়া বিমানপথ**—মস্কো হইতে কাজান, ওমস্ক, ইরকুটস্ক ও চিতা হইয়া এই পথটি ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৬) **ইউরোপ-আফ্রিকা বিমানপথ**—এই পথটি সাধারণতঃ ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইটালীয় বিমানপোতসমূহ ব্যবহার করে। লন্ডন হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও খার্টুম হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার লাগোস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন পর্যন্ত এই পথ বিস্তৃত। একটি শাখা আলেকজান্দ্রিয়া হইতে মালাগাসি পর্যন্ত গিয়াছে। একটি পথ রোম হইতে ত্রিপলি ও কায়রো হইয়া আবিসিনিয়ার আদ্দিস্-আবাবা পর্যন্ত বিস্তৃত।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমানপথে যাত্রী ও পণ্য-পরিবহণে প্রথম স্থান অধিকার করে; ইহা ছাড়া সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যান্ডস্ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

নিম্নে পৃথিবীর বিখ্যাত বিমানপোত প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম দেওয়া হইল:

দেশ	বিমানপোত প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.)	—Pan American World Airways, United Airlines, American Airlines & Trans-World Airlines.
সোভিয়েত রাশিয়া (U.S.S.R.)	—State Owned Airlines.

দেশ	বিমানপোত প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম
ব্রিটেন (U.K.)	—British Airways, British European Airlines, Quantas Empire Airways.
ভারত (India)	—Air-India International.
চীন (China)	—China National Airways Corporation.
কানাডা (Canada)	—Trans Canada Airlines System.
ফ্রান্স (France)	—Air France.
নেদারল্যান্ডস্ (Netherlands)	—Royal Dutch Airlines (K. L. M.)
ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ে (Denmark, Sweden & Norway)	—Scandinavian Airlines System (S.A.S.)
ইটালি (Italy)	—Alitalia L. A. I.
পাকিস্তান (Pakistan)	—Orient Airways, Pakistan International Airways.

ইহা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অভ্যন্তরীণ বিমানপথ বিদ্যমান।

বাণিজ্যকেন্দ্র (Trades Centres)

পূর্বে মালপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। মানুষের নানাবিধ চাহিদা মিটাইবার জন্য বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য পরিবহণ-ব্যবস্থার মারফত বিক্রয়কেন্দ্রে আনীত হয়। যে সকল স্থানে এই সকল পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয় এবং পরে কিয়দংশ নানাস্থানে প্রেরিত হয় সেই স্থানকে বাণিজ্যকেন্দ্র বলে।

পৃথিবীর বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক কারণে প্রথমে বিভিন্ন স্থানে মানুষের সমাগম হয়। এই সকল মানুষের চাহিদা মিটাইতে পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের জন্য বহু মিলনস্থানের সৃষ্টি হয়। ক্রমে শহর ও নগর গড়িয়া উঠে এবং ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এইভাবে বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের গুরুত্ব বাড়িয়া যায় এবং ইহা বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ (ক) বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং (খ) শহর ও নগর।

(ক) বন্দর ও পোতাশ্রয় (Ports and Harbours)

বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে বন্দর অন্যতম। বন্দর জলপথ হইতে স্থলপথের সংযোগস্থল। ইহা জলপথ হইতে স্থলভাগে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ।

বন্দরের কার্য (Functions of a Port)—সাধারণতঃ বিদেশে জলপথে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিতে হইলে বন্দরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আবার বিদেশ হইতে

নানাবিধ পণ্যদ্রব্য বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করিয়া দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। এইভাবে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াই বন্দরের প্রধান কার্য। অনেক সময় পুনরায় রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ সামগ্রী আমদানি করা হয় ; যে সকল বন্দরে এই প্রকার বাণিজ্যের আধিক্য দেখা যায়, তাহাদিগকে **মাধ্যমবন্দর** (**Entrepot**) বলা হয়।

ছোট-বড় অনেক জাহাজ বন্দরে পণ্যদ্রব্য লইয়া আসে। জাহাজগুলি যাহাতে নিরাপদে বন্দরে থাকিতে পারে এবং মালপত্র উঠাইতে ও নামাইতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত করা বন্দরের অন্যতম কাজ। সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় হইতে জাহাজকে রক্ষা করিতে না পারিলে বন্দরের উন্নতি হয় না। এইজন্য বন্দর সংলগ্ন জলের গভীরতা ও আদর্শ পোতাশ্রয় প্রয়োজন। আফ্রিকার দেশগুলিতে উপকূলবর্তী সমুদ্র অগভীর থাকায় জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং বন্দরের অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকে। এইজন্য এই সকল দেশে ভাল বন্দর গড়িয়া ওঠে না। **জাহাজের নিরাপত্তা** ছাড়াও জাহাজ হইতে মাল খালাস করিবার ও জাহাজে মালপত্র তুলিবার যান্ত্রিক বন্দোবস্ত, আরোহিগণের অবরোহণ ও আরোহণের সুবন্দোবস্ত, মালপত্র মজুত করিবার গুদামঘর ও পণ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করা বন্দরের কার্য।

পোতাশ্রয় (Harbour)—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য আদর্শ পোতাশ্রয় প্রয়োজন। যে স্থানে জাহাজগুলিকে নিরাপদে রাখিয়া পণ্যদ্রব্য উঠা-নামা করাইতে হয় বা অন্যান্য কারণে জাহাজগুলিকে রাখিতে দেওয়া হয় সেই স্থানকে পোতাশ্রয় বলে। পোতাশ্রয় দুইপ্রকার—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। যে সকল পোতাশ্রয়ের নিকটবর্তী সমুদ্রতীর বা নদীতীর অত্যন্ত ভগ্ন এবং যাহার প্রায় চারি-দিকেই স্বাভাবিক স্থলভাগ বিদ্যমান এবং যেখানে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, সেই সকল পোতাশ্রয়কে **স্বাভাবিক পোতাশ্রয়** বলে। লিভারপুল, বোম্বাই প্রভৃতি বন্দরে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বিদ্যমান। যে সকল সমুদ্রোপকূলে এইপ্রকার স্বাভাবিক ভৌগোলিক অবস্থার অভাব এবং যেখানে কৃত্রিম উপায়ে জাহাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হয় তাহাকে **কৃত্রিম পোতাশ্রয়** বলে। প্রাচীর দ্বারা সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গিয়া এবং ড্রেজার দ্বারা পোতাশ্রয়ের গভীরতা বজায় রাখিয়া কৃত্রিম পোতাশ্রয় ব্যবহারযোগ্য রাখা হয়। মাদ্রাজ, লস্ এঞ্জেল্স্ প্রভৃতি বন্দরে এইপ্রকার কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে। আদর্শ পোতাশ্রয় হইতে হইলে উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলের সমুদ্রের যথোপযুক্ত গভীরতা থাকা প্রয়োজন এবং সমুদ্রস্রোত ও ঝড় হইতে জাহাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার ; শীতকালে পোতাশ্রয় বরফমুক্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চাদ্ভূমি (Hinterland)—যে অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য কোনো বন্দরের মারফত বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং ঐ বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত মালপত্র যে সকল অঞ্চলে প্রেরিত হয়, সেই সকল অঞ্চলকে ঐ বন্দরের **পশ্চাদ্ভূমি** বলে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। আসামের চা, উত্তর প্রদেশের কৃষিজাত দ্রব্য, পশ্চিমবঙ্গের পাট ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য, বিহারের খনিজ দ্রব্য কলিকাতা

বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং বিদেশ হইতে ঐ বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি এই সকল অঞ্চলে প্রেরিত হয়। সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলকে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলা হয়।

পশ্চাদ্‌ভূমির বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির উপর বন্দরের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। পশ্চাদ্‌ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রাচুর্য না থাকিলে বন্দরের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে
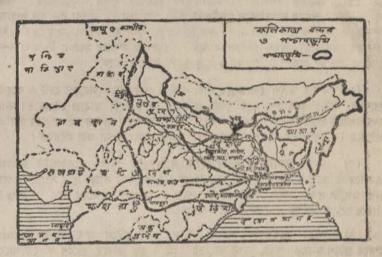
তীরচিহ্ন দ্বারা রপ্তানি-দ্রব্য ও পশ্চাদ্‌ভূমিতে ইহাদের উৎপাদক অঞ্চলসমূহ দেখানো হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইবে না। পশ্চাদ্‌ভূমিতে পণ্যদ্রব্যের চাহিদার অভাব থাকিলে বন্দরের মারফত আমদানির পরিমাণ কম হইবে। এইজন্য শিল্পপ্রধান জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী দেশের বন্দরগুলি সহজেই উন্নতিলাভ করে। শিল্পপ্রধান দেশে প্রচুর কাঁচামাল আমদানি হয় এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়। লন্ডন, লিভারপুল, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি বন্দরের উন্নতির মূলে রহিয়াছে উহাদের পশ্চাদ্‌ভূমির সমৃদ্ধি। বন্দর ও পোতাশ্রয়ে স্বাভাবিক অবস্থা অনুকূলে না থাকিলেও অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে ইহার উন্নতিসাধন করা যায়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পশ্চাদ্‌ভূমির শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করা কষ্টকর।

কোনো কোনো দেশে একই পশ্চাদ্‌ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক বন্দর গড়িয়া উঠে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলের পশ্চাদ্‌ভূমির জন্য এখানকার সমুদ্রের উপকূলে বোম্বাই, ওখা, কান্ডালা প্রভৃতি কয়েকটি বন্দর রহিয়াছে। বন্দরের সহিত পশ্চাদ্‌ভূমির যোগাযোগের জন্য যানবাহন ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে অনেক সময় পশ্চাদ্‌ভূমির পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশ পূর্বে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি ছিল। রাজনৈতিক বিভাগের পর ইহা চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি হইয়াছে।

বন্দর-গঠনের উপযোগী অবস্থা (Conditions for Development of Ports) —বন্দর গঠন করিতে হইলে পূর্ববর্ণিত ইহার কার্যাবলীর কথা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় বন্দর গঠন সহজসাধ্য হইয়া থাকে ঃ

(১) সমুদ্রের উপকূলে বা নদীতীরে সাধারণতঃ বন্দর গড়িয়া উঠে। এই সকল স্থানে **জলের যথোপযুক্ত গভীরতা** থাকা প্রয়োজন। নতুবা বড় বড় জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। সমুদ্রোপকূল ভগ্ন না হইলে জাহাজের পক্ষে বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। বোম্বাই বন্দরের সংলগ্ন উপকূল ভগ্ন হওয়ায় বন্দরের অভ্যন্তরে সহজেই জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে।

(২) বন্দরে আদর্শ **পোতাশ্রয়** থাকা একান্ত প্রয়োজন। সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড়ের প্রকোপ হইতে জাহাজগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এবং জাহাজ মেরামতের জন্য পোতাশ্রয়ের প্রয়োজন। বোম্বাই বন্দরে আদর্শ পোতাশ্রয় থাকায় এই বন্দরের উন্নতি হইয়াছে। পোতাশ্রয় সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) বন্দরে **জাহাজ রাখিবার স্থান সুবিস্তৃত** হইলে অনেকগুলি জাহাজ একসঙ্গে থাকিতে পারে। ইহাতে মাল বোঝাই ও খালাসের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করিয়া জাহাজগুলি সত্বর বন্দর ত্যাগ করিতে পারে। বোম্বাই বন্দরের স্থান সুবিস্তৃত থাকায় অনেক জাহাজ একসঙ্গে থাকিতে পারে।

(৪) বন্দরের **প্রবেশপথ** বোতলের মুখের মতো হইলে জাহাজগুলি সহজেই বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং প্রবেশপথের মুখে বালুচরের সৃষ্টি হয় না। কলিকাতা বন্দরের প্রবেশপথ বোতলের মতো থাকায় জাহাজের পক্ষে নিরাপদে থাকা সম্ভব।

(৫) বন্দরের সন্নিকটে **পানীয় জল** ও **জ্বালানির** সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। কয়লা অথবা খনিজ তৈল জাহাজের চালিকা শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দূরগামী জাহাজগুলিকে বিভিন্ন বন্দর হইতে মাঝে মাঝে কয়লা বা তৈল লইতে হয়। পানীয় ও জাহাজের ইঞ্জিনের জন্য স্বাদুজল প্রয়োজন হয়। কলিকাতা বন্দরের নিকটেই রানীগঞ্জের কয়লাখনি থাকায় এবং শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকায় জ্বালানি ও পানীয় জলের জন্য এই বন্দরের কোনো অসুবিধা হয় না।

(৬) বন্দর গঠনে **জলবায়ুর** প্রভাব বিদ্যমান। বন্দরে বরফ জমিলে ইহা অকেজো হইয়া যায়। বৃষ্টির আধিক্য হইলে জাহাজে মাল ওঠানামা কার্যে বাধার সৃষ্টি হয়। বন্দরটি স্বাস্থ্যকর না হইলে লোকজনের থাকিবার অসুবিধা হয় এবং শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতের জলবায়ুতে বরফ জমিতে না পারায় ভারতের বন্দরসমূহ সারা বৎসর খোলা থাকে।

(৭) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বন্দর-গঠন ও ইহার উন্নতি বহুলাংশে **পশ্চাদ্‌-ভূমির বিস্তৃতি** ও **সমৃদ্ধির** উপর নির্ভরশীল। শিল্পপ্রধান, জনবহুল ও সমৃদ্ধ-শালী পশ্চাদ্‌ভূমি বন্দর গঠনের সহায়ক এবং ইহার উন্নতির উপর বন্দরের আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ নির্ভর করে। পশ্চাদ্‌ভূমি হইতে রপ্তানি-দ্রব্য বন্দরে

আনিবার জন্য এবং আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্য বন্দর হইতে পশ্চাদ্‌ভূমিতে পাঠাইবার জন্য স্থলপথে বা জলপথে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। পশ্চাদ্‌ভূমি সমতল হইলে যানবাহনের উন্নতি সহজসাধ্য হয়। কলিকাতা ও বোম্বাই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ বলিয়া এই সকল বন্দরের উন্নতি হইয়াছে।

(৮) **শুল্ক ও অন্যান্য করের হারের** উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। শুল্ক ও কর অনুসারে আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। সেইজন্য অত্যধিক শুল্ক বা কর বন্দরের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কমাইয়া দেয়। বিভিন্ন দেশের সহিত আর্থিক বিনিময়ের হারও বন্দরের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে।

বন্দরের শ্রেণীবিভাগ—সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশে দুই প্রকার বন্দর পরিলক্ষিত হয়—সামুদ্রিক বন্দর ও নদীতীরস্থ বন্দর। সমুদ্রোপকূলের নিকট অবস্থিত বন্দরকে সাধারণতঃ **সামুদ্রিক বন্দর** বলে এবং নদীতীরে অবস্থিত বন্দরকে **নদী-বন্দর** বলা হয়। হ্রদ, সমুদ্র-খাল, উপসাগর ও নদীর মোহানায় অবস্থিত বন্দরগুলি সামুদ্রিক বন্দরের অন্তর্গত।

(খ) শহর ও নগর (Cities and Towns)

শহর এবং নগরেও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, মানুষের চাহিদা মিটাইবার জন্য পণ্য বিনিময়কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে শহর ও নগরের উৎপত্তি হইয়াছে।

বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার কারণ (Conditions favouring the growth of Trade Centres)—বিভিন্ন কারণে বাণিজ্যকেন্দ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নগর, শহর প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্র সৃষ্টির কারণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) ধর্ম নগর-স্থাপনে সহায়তা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন **তীর্থস্থান** বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং এই সকল স্থানে সুন্দর সুন্দর নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। যথা—কাশী, হরিদ্বার, গয়া, মক্কা প্রভৃতি। (২) **রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলি** শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। যথা—দিল্লী, টোকিও, ওয়াশিংটন ইত্যাদি। (৩) **সমুদ্রতীরবর্তী** কোনো কোনো স্থানে এবং **স্বাস্থ্যকর স্থানে** বহু লোকের সমাগম হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই সকল স্থান শহরে পরিণত হয়। যথা—মধুপুর, ওয়ালটেয়ার, বার্থ ইত্যাদি। (৪) **খনিজ সম্পদের** আবিষ্কারের ফলে অথবা **বৈষয়িক সম্পদের** প্রাচুর্যের জন্য বহুস্থানে লোকসমাগম হয় এবং বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। যথা—কালগুর্লি, ঝরিয়া, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, ডিগবয়, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি। (৫) পৃথিবীর বিখ্যাত **শিক্ষাকেন্দ্রগুলি** বড় বড় শহরে পরিণত হইয়াছে। যথা—অক্সফোর্ড, শান্তিনিকেতন, আলিগড় ইত্যাদি। (৬) বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের সংযোগস্থলে **বিনিময়ের সুবিধার** জন্য বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ পর্বত ও সমতলভূমির মিলনস্থলে এইরূপ বাণিজ্যকেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়। যথা—মিলান, ইম্ফল ইত্যাদি। (৭) **শিল্পকেন্দ্রে** বড় বড় শহরের ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উৎপত্তি হয়। যথা—জামসেদপুর, বার্নপুর, রাউরকেলা, ভিলাই, ম্যাঞ্চেস্টার ইত্যাদি। (৮) **সামরিক গুরুত্বের** জন্য অনেক শহরের উৎপত্তি

হইয়াছে। যথা—পেশোয়ার, পুনে ইত্যাদি। (৯) বিভিন্ন পরিবহণ-ব্যবস্থার সংযোগস্থলে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। যথা—গোয়ালন্দ, খুলনা, কলম্বো, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি।

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র
(Important Ports and Trade Centres)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শহর ও নগরের সংখ্যা প্রচুর। তন্মধ্যে লক্ষাধিক লোকের বসতিপূর্ণ শহরের সংখ্যা ছয় শতের অধিক।

ব্রিটেন (United Kingdom)

নিম্নে বিভিন্ন দেশের কয়েকটি বিখ্যাত শহর ও বন্দরের বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ

লণ্ডন (London)—টেম্স্ নদীর তীরে অবস্থিত লন্ডন শহর ব্রিটেনের রাজধানী। ইহা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম শহর এবং শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। পুনরায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে এখানে বহু পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হয়। ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে কাগজ, রেয়ন, রাসায়নিক ও বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় সকল দেশের সঙ্গে লন্ডনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ রহিয়াছে। চা, কফি, তামাক, রবার, তুল- প্রভৃতি সামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয় এবং কাগজ, বস্ত্রাদি, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।
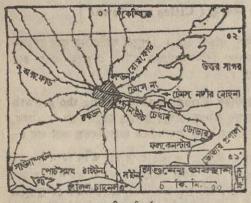
লন্ডনের পারিপার্শ্বিক অবস্থান

ব্রিটেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি।

গ্লাসগো (Glasgow)—ক্লাইড নদীর মোহানায় অবস্থিত স্কটল্যান্ডের এই বন্দরটি পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়; এইজন্য এখানে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে সুন্দর পোতাশ্রয় আছে। গ্লাসগোর সন্নিকটে নদীর গভীরতা অত্যন্ত বেশী। এই সকল সুবিধা থাকার জন্য এখানে জাহাজ-নির্মাণ সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে পশম, কার্পেট, কাগজ ও রাসায়নিক শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। স্কটল্যান্ডের ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি।

লিভারপুল (Liverpool)—ল্যাঙ্কাশায়ার প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে মার্সে নদীর মোহানায় অবস্থিত লিভারপুল বন্দরের মারফত বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি

করা হয় এবং কাঁচামাল ব্রিটেনে আমদানি করা হয়। ইহার পশ্চাদ্ভূমিতে ল্যাংকাসায়ারের বিখ্যাত কার্পাস ও রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। লিভারপুল
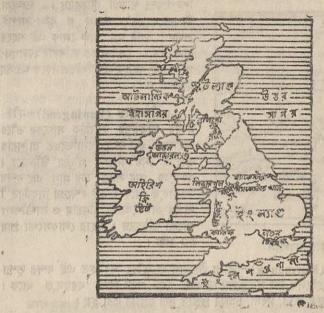
ব্রিটেনের বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র

হইতে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত একটি খাল কাটিয়া ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রাদি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এই বন্দরে আনীত হয়। এই খালের নাম ম্যাঞ্চেস্টার খাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই বন্দর নিকটবর্তী বলিয়া এই বন্দরের মারফত ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অধিক পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে।

ম্যাঞ্চেস্টার (Manchester)—মার্সে নদীর শাখা ইরওয়েল নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে বিখ্যাত কার্পাসশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রগামী জাহাজ লিভারপুল বন্দর হইতে ম্যাঞ্চেস্টার খাল মারফত এই বন্দরে প্রবেশ করে। বয়ন-শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা এবং বিদেশ হইতে তুলা আমদানি করা এই বন্দরের প্রধান কাজ।

কার্ডিফ (Cardiff)—দক্ষিণ ওয়েল্সের টাফ নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত এই বন্দর কয়লা-রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। বর্তমান যুগে কয়লার ব্যবহার কিছুটা কমিয়া যাওয়ায় এই বন্দরের গুরুত্ব কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কয়লা ছাড়া কাষ্ঠ, খাদ্যশস্য ও লৌহ আকরিক এই বন্দরের অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য। ইহার নিকট ইস্পাত শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েত রাশিয়া (U. S. S. R.)

মস্কো (Moscow)—সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী। ইহার নিকট বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে ইস্পাত, চর্ম, কাগজ ও বয়ন-শিল্পই প্রধান ; প্রায় ৭২ লক্ষ লোক এই শহরে বাস করে। সোভিয়েত রাশিয়ার রেলপথগুলি এই শহর হইতে বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইয়াছে।
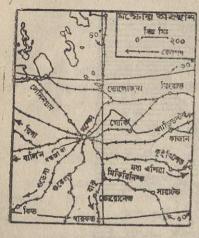
মস্কোর অবস্থান

লেনিনগ্রাড (Leningrad)—নীভা নদীর মোহানায় বালটিক সাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দরে সোভিয়েত রাশিয়ার জাহাজ নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বৎসরের প্রায় সাড়ে চার মাস এই বন্দর বরফাবৃত থাকে। এই বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে কাগজ,অ্যালুমিনিয়াম ও কাষ্ঠশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।

মুরমানস্ক (Murmansk)—কোলা উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর তুন্দ্রা অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের জন্য ইহা সারা বৎসর বরফমুক্ত থাকে। এই বন্দরের মারফত কাষ্ঠ, মৎস্য, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)

নিউ ইয়র্ক (New York)—আটলান্টিক উপকূলে হাডসন নদীর মোহানায় অবস্থিত এই বন্দর মারফত সারা বৎসর আমদানি-রপ্তানি কার্য চলিয়া থাকে। শীতকালে এই বন্দরটি বরফাচ্ছন্ন হয় না। এইজন্য ইহার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বন্দর ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক বৈদেশিক বাণিজ্যদ্রব্য এই বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। পাকা রাস্তা, রেলপথ ও জলপথে এই বন্দরের সহিত দেশের অন্যান্য স্থান যুক্ত। উত্তরে ভার্জিনিয়া হইতে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত সকল রাজ্য এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। কার্পাস, গম, মাংস, ভুট্টা, দুগ্ধজাত দ্রব্য এই বন্দরের মারফত রপ্তানি করা হয় এবং রবার, চা, চিনি, ম্যাঙ্গানিজ, পাটজাত দ্রব্য, নিকেল, টিন প্রভৃতি ইহার মাধ্যমে আমদানি করা হয়।

চিকাগো (Chicago)—মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত এই শহর ও বন্দর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রেলপথের সঙ্গমস্থল। ইহার নিকটবর্তী ভুট্টা-অঞ্চলে প্রচুর পশু পালিত হয় ; এইজন্য এই স্থান মাংস রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। চিকাগো বন্দরের মারফত প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

স্যান ফ্রান্সিস্কো (San Francisco)—ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এইবন্দর মারফত প্রধানতঃ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পানামা খাল কাটিবার পর এই বন্দরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বন্দর মারফত গম, ফল, খনিজ তৈল, স্বর্ণ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং চা, রেশম, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হইয়া থাকে।

বোস্টন (Boston)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই বন্দর পশম-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নিউ ইংল্যান্ডের শিল্পাঞ্চল ইহার প্রধান পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মারফত তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি আমদানি করা হয়; মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, বস্ত্রাদি প্রধানতঃ ইহার মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। ইউরোপীয় বন্দরগুলি হইতে ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটতম বন্দর।

নিউ অরলিন্স (New Orleans)—মিসিসিপি নদীর মোহানায় মেক্সিকো উপসাগরের নিকট অবস্থিত এই বন্দর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান বন্দর। ইহা তুলা-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। মিসিসিপি-মিসৌরী উপত্যকা ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মারফত তুলা, খনিজ তৈল, কাষ্ঠ, গবাদি পশু, গম প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কফি, চিনি, ফল ও পাটজাত দ্রব্য প্রধানতঃ আমদানি করা হয়।

কানাডা (Canada)

ভ্যাংকুভার (Vancouver)—প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভ্যাংকুভার দ্বীপের পিছনে ফ্রেজার নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দর বিভিন্ন মহাদেশীয় রেলপথ দ্বারা ইহার পশ্চাদ্ভূমির সহিত যুক্ত। পশ্চিম প্রেইরি অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার মারফত মৎস্য, তাম্র, রৌপ্য, গম, কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

মন্ট্রিল (Montreal)—অটোয়া ও সেন্ট লরেন্স নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত মন্ট্রিল কানাডার সর্বপ্রধান বন্দর। মহাদেশীয় রেলপথ দ্বারা ইহা দেশের অভ্যন্তরস্থ স্থানসমূহের ও নিউ ইয়র্কের সহিত যুক্ত। শীতকালে এই বন্দর বরফাচ্ছন্ন থাকে। কানাডার পূর্বাংশে কৃষিপ্রধান অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মারফত গম, নিকেল, রৌপ্য, তাম্র, কাষ্ঠ ও কাগজ রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, পশম-বস্ত্র ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গম ও ময়দা রপ্তানির বন্দর।

দক্ষিণ আমেরিকা (South America)

রায়ো ডি জেনিরো (Rio-de-Jeneiro)—আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত **ব্রাজিলের** সর্বপ্রধান বন্দর। উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় থাকায় এই বন্দর ভালোভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সাওপলো, মিনাস্ গেরায়েস্, পানামা প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মারফত রবার, কফি, কোকো, তামাক, চামড়া, লৌহ আকরিক

প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, যন্ত্রপাতি, বস্ত্রাদি, খাদ্যশস্য প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

বুয়েনস্ আয়ার্স (Buenos Aires)—প্লাটা নদীর মোহানায় আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর ও শহর **আর্জেন্টিনার** রাজধানী। আর্জেন্টিনার কৃষিপ্রধান অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভ্যাল্‌প্যারাইজো বন্দর রেলপথে যুক্ত। বুয়েনস্ আয়ার্সের মারফত গম, যব, ভুট্টা, পশম, মাংস, চামড়া, তিসি প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, কার্পাসবস্ত্র, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

ভ্যালপ্যারাইজো (Valparaiso)—প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে **চিলির** এই বন্দরটি অবস্থিত। চিলির সমগ্র খনিজ অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্গত। এই বন্দর মারফত নাইট্রেট, তাম্র, রৌপ্য, পশম, গম প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

আফ্রিকা (Africa)

ডারবান (Darban)—**দক্ষিণ আফ্রিকার** কয়লা অঞ্চলে অবস্থিত এই বন্দরের সহিত দেশের কৃষিজাত ও খনিজসমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই বন্দর মারফত কয়লা, স্বর্ণ, তাম্র, ভুট্টা, গম, চাউল প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, কার্পাস-বস্ত্র ও বিলাসদ্রব্য আমদানি করা হয়।

সৈয়দ বন্দর (Port Said)—সুয়েজ খালের উত্তরে অবস্থিত **মিশরের** এই বন্দর মারফত সুয়েজ খালে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা একটি বিখ্যাত মাধ্যম-বন্দর। এখানে জাহাজে কয়লা ভর্তি করা হয়।

কায়রো (Cairo)—**সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের (মিশর)** রাজধানী কায়রো আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম শহর। নীলনদের তীরে ইহা অবস্থিত। এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে।

আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria)—**মিশরের** সর্বপ্রধান বন্দর। ভূমধ্যসাগরের তীরে সুয়েজ খালের পথে নীলনদের মোহানায় ইহা অবস্থিত। নীলনদের উপত্যকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। ইহার মারফত তুলা, চিনি, চাউল ও নানাবিধ ফল রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, গম, কাষ্ঠ ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়।

ইউরোপের অন্যান্য দেশ

হ্যামবুর্গ (Hamburg)—সমুদ্র হইতে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দূরে এল্‌ব নদীর উপর অবস্থিত এই বন্দর **পশ্চিম জার্মানীর** সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার মারফত জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন এবং বাল্টিক রাজ্যসমূহের পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম-বন্দর (entrepot)। বিখ্যাত রূঢ় অঞ্চলের সহিত ইহা জলপথে যুক্ত। এই বন্দর মারফত কফি, কোকো, চিনি, কয়লা, খনিজ ও অন্যান্য তৈল, পশম, কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য,

লবণ, চিনি ও দুগ্ধজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। এখানকার জাহাজ-নির্মাণশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রটারডাম (**Rotterdam**)—রাইন নদীর শাখা নিউ মাস নদীর উপর অবস্থিত এই বন্দর খাল দ্বারা সমুদ্রের সহিত যুক্ত। **নেদারল্যাণ্ডসের** বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র এই স্থানে অবস্থিত। রাইন নদীর উপত্যকা ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মারফত দুগ্ধজাত দ্রব্য, গবাদি পশু প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং তামাক, রবার, তুলা ও খনিজ তৈল আমদানি করা হয়।

আণ্টোয়ার্প (**Antwerp**)—সেল্ড নদীর মোহানায় **বেলজিয়ামের** এই বন্দরটি অবস্থিত। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম-বন্দর। বেলজিয়াম, পূর্ব ফ্রান্স ও রুঢ় অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর হীরকের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এই বন্দর মারফত কফি, তুলা, পশম, চামড়া, খাদ্যশস্য, লৌহ আকরিক, খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাচ, কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

মার্সেল (**Marseiles**)—রোন নদীর মোহানার পূর্বপ্রান্তে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত **ফ্রান্সের** সর্বপ্রধান বন্দর। ফ্রান্সের উত্তরাংশে অবস্থিত ক্যালে বন্দরের সহিত ইহা রেলপথ দ্বারা যুক্ত। রোন নদীর সমৃদ্ধিশালী অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মারফত রেশমজাত দ্রব্যাদি, সাবান, গন্ধদ্রব্য, বিলাসদ্রব্য, মদ্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, চিনি, গম, পশম, চামড়া, তুলা, রবার, কফি প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

ডানজিগ (**Danzig**)—ভিশ্চুলা নদীর মোহানায় বালটিক সাগরের তীরে **পোল্যাণ্ডের** এই বন্দর অবস্থিত। শীতকালে এই বন্দর বরফাবৃত থাকে। এখানকার জাহাজ-নির্মাণশিল্প বিখ্যাত। কাঠ এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য এবং তুলা, যন্ত্রপাতি, পশম ও ময়দা প্রধান আমদানি দ্রব্য।

জিব্রাল্টার (**Gibralter**)—ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমপ্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবেশপথে স্পেন দেশে অবস্থিত ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত এই বন্দরটি পার্বত্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। এই বন্দরটিকে 'ভূমধ্যসাগরের চাবি' বলা হয়। এখানে জাহাজে কয়লা ভর্তি করা হয়।

এশিয়া (Asia)

করাচী (**Karachi**)—আরব সাগরের তীরে অবস্থিত করাচী **পাকিস্তানের** সর্বপ্রধান বন্দর। পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্ভূমি। গম, তৈলবীজ, তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং কার্পাস-বস্ত্র, চিনি, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য।

রেঙ্গুন (**Rangoon**)—ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত রেঙ্গুন **ব্রহ্মদেশের** রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইরাবতী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত পশ্চাদ্ভূমি জলপথে ও রেলপথে ইহার সহিত যুক্ত। এই বন্দর মারফত চাউল, কাষ্ঠ, খনিজ তৈল প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং রাসায়নিক দ্রব্য, বিলাসদ্রব্য ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

সিংগাপুর (Singapur)—**মালয় উপদ্বীপের** দক্ষিণপ্রান্তে একটি দ্বীপে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা প্রাচ্যের বৃহত্তম মাধ্যম-বন্দর **(entrepot)**; এখানে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। এই স্থানে অধিকাংশ জাহাজে কয়লা ভর্তি করা হয়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া এই বন্দর মারফত উভয় দেশের পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা হয়। এই বন্দর মারফত চাউল, কাষ্ঠ, রবার, নারিকেল, ফল, টিন, টাংস্টেন ইত্যাদি রপ্তানি করা হয় এবং খনিজ তৈল, চিনি, তামাক, বস্ত্রাদি ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

হংকং (Hongkong)—চীনের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সিকিয়াং নদীর মোহানায় একটি দ্বীপে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা ব্রিটেনের অধীন। চীনের সহিত এই বন্দর রেলপথে ও নদীপথে যুক্ত। রেলপথে ও জলপথে পণ্যদ্রব্য এই বন্দরে আনীত হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম-বন্দর। চাউল ইহার প্রধান বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য। ইহা ছাড়া, চিনি, তুলা, চা, কয়লা, গম, তৈল, আফিম প্রভৃতি এই বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি করা হয়। এই স্থান জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। সমগ্র দক্ষিণ চীন ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি।

কলম্বো (Colombo)—**শ্রীলংকার** দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই বন্দরে অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব এশিয়াগামী সকল জাহাজ নোঙ্গর করে এবং কয়লা লয়। কলম্বো শ্রীলংকার রাজধানী ও বিখ্যাত মাধ্যম-বন্দর। নারিকেল দড়ি ও তৈল, রবার, চা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং তৈল, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, চিনি, চাউল, কাগজ ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানি-দ্রব্য।

এডেন (Aden)—আরব উপদ্বীপের এই বন্দর ভারত মহাসাগর হইতে লোহিত সাগরের প্রবেশপথে অবস্থিত। ইহা ব্রিটেনের অধীন। এখানে জাহাজে কয়লা ভর্তি করা হয়। ইয়েমেনের বিখ্যাত কফি এই বন্দর মারফত রপ্তানি করা হয়।

ইয়োকোহামা (Yokohama)—**জাপানের** টোকিও উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর সুরক্ষিত। ইহার মাধ্যমে রেশম, পশম, চা, যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয় এবং খাদ্যদ্রব্য, লৌহ আকরিক, তুলা, ময়দা, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

ওসাকা (Osaka)—**জাপানের** শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। এখানকার কার্পাস-বয়ন শিল্প জগদ্বিখ্যাত। সেইজন্য ইহাকে 'জাপানের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয়। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, কাগজ শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এখানে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

[ভারতের বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র সম্পর্কে এই পুস্তকের 'ভারত' অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।]

অস্ট্রেলিয়া (Australia)

সিডনি (Sydney)—অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ প্রদেশের রাজধানী ও সর্বপ্রধান বন্দর। রেলপথ দ্বারা পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত ইহা যুক্ত। এই বন্দর মারফত অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। ইহার মারফত গম, পশম, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Explain with specific examples the influence of transport in the economic development of a region.

[H. S. Examination, 1979]

(কোনো অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থার ভূমিকা উপযুক্ত উদাহরণসহ পর্যালোচনা কর ।)

উঃ । 'পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা' (২৪৬-২৪৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

2. Describe the role of transport in the economic development of a country. **[Specimen Question, 1978]**

(কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ ব্যবস্থার ভূমিকা পর্যালোচনা কর ।)

উঃ । 'পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা' (২৪৬-২৪৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

3. Narrate the importance of modern transport.

(আধুনিক পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর ।)

উঃ । 'পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা' (২৪৬-২৪৭ পৃঃ) লিখ ।

4. (a) Discuss the importance of transport on the world distribution of productive activities.

(b) Mention the relative importance of various modes of transportation. **[H. S Examination, 1982]**

[(ক) পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বণ্টনে পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর ।

(খ) বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা আলোচনা কর ।]

উঃ । (ক) 'পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা' (২৪৬-২৪৭ পৃঃ) হইতে লিখ ।

(খ) 'বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা' (২৫১-২৫৩ পৃঃ) লিখ ।

5. Discuss the relative importance and drawbacks of different modes of transport. **[H. S. Examination, 1984]**

(বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার পারস্পরিক গুরুত্ব ও অসুবিধার কথা আলোচনা কর ।)

উঃ । 'বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা' (২৫১-২৫৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

6. Discuss with examples the relative importance of land, water and airways as the principal mode of transport.

[H. S. Examination, 1978]

(পরিবহণ ব্যবস্থায় স্থল, জল ও বিমান পথের তুলনামূলক গুরুত্ব উদাহরণ সহ পর্যালোচনা কর।)

উঃ। 'বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা' (২৫১-২৫৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. What are the different modes of modern transport? Compare the relative advantages and disadvantages of the different modes of transport. **[B. U. B. Com. 1971 ; C. U. B. Com. 1971]**

(আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন কি কি ? বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার পারস্পরিক সুবিধা ও অসুবিধাসমূহের তুলনা কর।)

উঃ। 'পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ' (২৪৭ পৃঃ) ও 'বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা' (২৫১-২৫৩ পৃঃ) লিখ।

8. Discuss the role of transportation in the development of any particular country of the world. **[C. U. B. Com. 1967]**

(পৃথিবীর কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা কর।)

উঃ। 'পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা' (২৪৬-২৪৭ পৃঃ) লিখ।

9. How roadways help in the development of a country?

(সড়কপথ কিভাবে দেশের উন্নতিতে সাহায্য করে ?)

উঃ। 'সড়কপথ' (২৪৭-২৪৮ পৃঃ) লিখ।

10. What are the physical and economical factors necessary for the construction of Railways?

(রেলপথ স্থাপনের জন্য কি কি প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন ?)

উঃ। 'রেলপথ-নির্মাণের উপযোগী পরিবেশ' (২৪৮-২৪৯ পৃঃ) লিখ।

11. What are the factors for the navigability of an inland waterways?

(অন্তর্দেশীয় জলপথের নাব্য হইবার উপাদানগুলি কি কি ?)

উঃ। 'অন্তর্দেশীয় জলপথ' (২৪৯-২৫০ পৃঃ) হইতে লিখ।

12. Write short notes on Shipping and Airways.

(জাহাজ চলাচল ও বিমানপথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।)

উঃ। 'জাহাজপথ' (২৫০-২৫১ পৃঃ) ও 'বিমানপথ' (২৫১ পৃঃ) লিখ।

13. Do trade routes arise from economic activity, or does economic activity arise from trade routes? Take concrete examples and discuss. **[C. U. B. Com. 1961]**

(অর্থনৈতিক কার্যাবলী হইতে বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হয়—না বাণিজ্যপথ হইতে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সৃষ্টি হয় ? নির্দিষ্ট উদাহরণ সহ আলোচনা কর।)

উঃ। 'বাণিজ্যপথ' (২৫৩-২৫৪ পৃঃ) লিখ।

14. Describe one of the Trans-continental Railways.

(একটি আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ বর্ণনা কর ।)
উঃ। 'ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ' (২৫৬ পৃঃ) লিখ ।

15. Describe the most important ocean routes of the world.

[**Specimen Question, 1978**]

(পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ বর্ণনা কর ।)
উঃ। 'পৃথিবীর সমুদ্রপথ' (২৬২-২৬৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

16. Describe the importance of North Atlantic Ocean Route or Mediterranean-Suez-Australia route as a highway of commerce.

[**C. U. Pre-Univ., 1962**]

(বাণিজ্যের রাজপথ হিসাবে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ অথবা 'ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ খাল-অস্ট্রেলিয়া জলপথের গুরুত্ব বর্ণনা কর ।)'

উঃ। 'উত্তর আটলান্টিক জলপথ' (২৬২ পৃঃ) ও 'ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ খাল-অস্ট্রেলিয়া জলপথ' (২৬৪ পৃঃ) লিখ ।

17. Describe the North Atlantic Ocean Route and account for its commercial importance. Name five countries that are benefited by this Ocean route. [**H. S. Examination, 1980**]

(উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথের বর্ণনা দাও এবং ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণ দেখাও । এই সমুদ্রপথের সুবিধা ভোগ করে এইরূপ পাঁচটি দেশের নাম কর ।)

উঃ। 'উত্তর আটলান্টিক জলপথ' (২৬২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

18. Examine the importance of the Great Lakes-St. Lawrence system to the U. S. A. and Canada. [**C. U. Inter. 1960**]

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নিকট পঞ্চহ্রদ-সেন্ট লরেন্স জলপথের গুরুত্ব বর্ণনা কর ।)
উঃ। 'উত্তর আমেরিকা-পঞ্চহ্রদ অঞ্চল' (২৬৮ পৃঃ) লিখ ।

19. Discuss the economic importance of the Suez Canal on the growth of international trade.

[**H. S. Examination, 1985**]

(আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সুয়েজ খালের অর্থনৈতিক গুরুত্বের আলোচনা কর ।)

উঃ। 'ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ খাল-অস্ট্রেলিয়া জলপথ' (২৬৪ পৃঃ) ও 'সুয়েজখাল' (২৬৫-২৬৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

20. Briefly discuss the economic importance of the Suez and Panama Canal as important highway of commerce.

[**H. S. Examination, 1981**]

(বাণিজ্যপথ হিসাবে সুয়েজ ও পানামা খালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

উঃ। 'সুয়েজ খাল' (২৬৫-২৬৬ পৃঃ) ও 'পানামা খাল' (২৬৬-২৬৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

21. Describe and point out the relative advantages and dis-advantages of Suez Canal and Panama Canal.

[**Specimen Question, 1978**]

(সুয়েজ ও পানামা খালের বিবরণ দাও এবং এই দুইটি খালপথের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা কর।)

উঃ। 'সুয়েজ খাল' (২৬৫-২৬৬ পৃঃ), 'পানামা খাল' (২৬৬-২৬৭ পৃঃ) এবং 'সুয়েজ খাল ও পানামা খালের তুলনা' (২৬৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

22. On a World map provided, mark and name—Suez route with three intermediate coaling stations.

[**B. S. F. Higher Secondary, 1960**]

(প্রদত্ত পৃথিবীর মানচিত্রে দেখাও এবং নাম লিখ :—পথিমধ্যে তিনটি কয়লা বোঝাইকারী বন্দরসহ সুয়েজ পথ।)

উঃ। ২৬৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখিয়া জিব্রাল্টার, কলিকাতা ও এডেন সহ সুয়েজ পথ অঙ্কন কর।

23. What are the factors for the development of a sea-port and trade centres ? Illustrate with examples of ports of India.

[**B. U. B. Com. 1970 ; C. U. B. Com. 1970**]

(একটি সমুদ্র-বন্দরের ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উন্নতির উপাদানসমূহ কি কি ? ভারতের বন্দরগুলি হইতে উদাহরণ দেখাইয়া উত্তর লিখ।)

উঃ। 'বন্দর গঠনের উপযোগী অবস্থা' (২৭৬-২৭৭ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার কারণ' (২৭৭-২৭৮ পৃঃ) লিখ।

24. Classify ports and discuss the factors favouring the growth of sea-ports.

[**Specimen Question, 197**[illegible]]

(বন্দরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর এবং সামুদ্রিক বন্দর গড়িয়া উঠিবার উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।)

উঃ। 'বন্দর গঠনের উপযোগী অবস্থা' (২৭৬-২৭৭ পৃঃ) ও 'বন্দরের শ্রেণী বিভাগ' (২৭৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

25. Describe the conditions suitable for the development of ports. What do you understand by hinetrland of a port ?

[**H. S. Examination, 1980**]

(বন্দর গাড়িয়া উঠিবার উপযোগী কারণসমূহ বর্ণনা কর। বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলিতে কি বোঝ ?)

উঃ। 'বন্দর গঠনের উপযোগী অবস্থা' (২৭৬-২৭৭ পৃঃ) এবং 'পশ্চাদ্‌ভূমি' (২৭৪-২৭৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

26. What are the conditions favourable for the growth of Trade centres ? [Tripura H. S. Examination, 1981]

(বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার কারণ কি কি ?)

উঃ। 'বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার কারণ' (২৭৭-২৭৮ পৃঃ) লিখ।

27. Describe with suitable illustrations the geographical factors for the growth of trade centres. [H. S. Examination, 1979]

(উদাহরণ সহযোগে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার উপযোগী ভৌগোলিক কারণগুলি নির্দেশ কর।)

উঃ। 'বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার কারণ' (২৭৭-২৭৮ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer/Problem-Type Questions

1. Give a short account of the following ; (a) Liner, (b) Tramp, (c) G. R. T., (d) The Great Lakes, (e) Entrepots.

[নিম্নলিখিতগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও : (ক) লাইনার, (খ) ট্র্যাম্প, (গ) G. R. T., (ঘ) পঞ্চহ্রদ, (ঙ) মাধ্যম-বন্দর।]

উঃ। যথাক্রমে ২৫০ পৃঃ, ২৫০ পৃঃ, ২৫০ পৃঃ, ২৬৮ পৃঃ ও ২৭৪ পৃঃ হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Write correct answers from the following statements :

A. (i) Nagasaki is an important port of China/Kampuchea/Japan. [H. S. Examination, 1982]

(ii) Panama Canal has connected Atlantic Ocean with the Indian Ocean/Pacific Ocean/Mediterranean Sea. [H. S. Examination, 1981]

(iii) Hamburg is a famous sea port/river port of Australia/Germany. [H. S. Examination, 1980]

(iv) The Panama Canal connects North with South America/Atlantic with Pacific Ocean/Mediterranean Sea with Atlantic Ocean. [H. S. Examination, 1979]

(v) Waterways/roads/railways are the cheapest mode of transport.

(vi) Osaka is an important port of Canada/West Germany/Japan. [H. S. Examination, 1984]

(vii) San Francisco is located on the coast of the Pacific Ocean/Mediterranean Sea/Bay of Bengal. [H. S. Examination, 1985]

B. (1) Trans-Siberia/Trans-Caspian Railway extends from Moscow, the Capital of the U.S.S.R. to the port of Vladivostok on the shore of the Pacific Ocean/Atlantic Ocean. (2) The Panama Canal has established link between North and South America/the Atlantic and the Pacific Ocean/the Mediterranean and the Atlantic Ocean. (3) The Suez Canal has joined the Indian Ocean and the Red Sea/the Red Sea and the Mediterranean Sea/The Arabian Sea and the Bay of Bengal (4) The river St. Lawrence/Mississippi of North America has joined the Great Lakes with the Pacific Ocean/the Atlantic Ocean. (5) The export-import activities of the port Chicago/New York/San Francisco/Boston situated at the mouth of the river Hudson along the Atlantic coast goes on all the year round.

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সাহায্যে সঠিক উত্তর তৈয়ারি কর ঃ

ক. (i) নাগাসাকি/চীন/কাম্পুচিয়া/জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

(ii) পানামা খাল আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত ভারত মহাসাগর/প্রশান্ত মহাসাগর/ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করিয়াছে।

(iii) হামবুর্গ অস্ট্রেলিয়ার/জার্মানীর একটি বিখ্যাত সমুদ্র-বন্দর/নদী-বন্দর।

(iv) পানামা খাল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা/আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর/ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করিয়াছে।

(v) জলপথ/সড়কপথ/রেলপথ-এ পরিবহণ সর্বাপেক্ষা সুলভ।

(vi) ওসাকা কানাডা/পশ্চিম জার্মানী/জাপানের এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

(vii) প্রশান্ত মহাসাগর/ভূমধ্যসাগর/বঙ্গোপসাগরের তীরে সান ফ্রান্সিস্কো অবস্থিত।

খ. (১) রাশিয়ার রাজধানী মস্কো হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের/আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভ্লাডিভস্টক বন্দর পর্যন্ত ট্রান্স-সাইবেরিয়ান/ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। (২) পানামা খাল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা/আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর/ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করিয়াছে। (৩) ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর/লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর/আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরকে সুয়েজ খাল সংযুক্ত করিয়াছে। (৪) উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদী/মিসিসিপি নদী পঞ্চহ্রদকে প্রশান্ত/আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। (৫) আটলান্টিক উপকূলে হাডসন নদীর মোহানায় অবস্থিত চিকাগো/নিউ ইয়র্ক/স্যান ফ্রান্সিস্কো/বোস্টন বন্দর মারফত সারা বৎসর আমদানি-রপ্তানি কার্য চলে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রমশিল্প

(The Manufacturing Industries)

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে শ্রমশিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি। মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষ আদিম যুগে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও পশুপক্ষীর সাহায্যে জীবন ধারণ করিত। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মানুষ এই চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিকার্য, বিনিময় প্রথা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তবুও ক্রমবর্ধমান চাহিদার তৃপ্তি হইল না। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তন হওয়ায় চাহিদার বৈচিত্র্যও বাড়িয়া গেল। এইজন্য মানুষ বিভিন্ন কৃষিজাত, বনজ ও খনিজদ্রব্যের রূপ পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়া বিচিত্র চাহিদার তৃপ্তিসাধনে ব্রতী হইল। তুলার রূপ পরিবর্তন করিয়া সৃষ্টি করিল বস্ত্র, ইক্ষুর রূপ পরিবর্তন করিয়া সৃষ্টি করিল চিনি। এইভাবে চর্ম হইতে জুতা, লৌহ আকরিক হইতে ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল। যে সম্পদ পূর্বে মানুষের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পুরাপুরি মিটাইতে পারিত না শিল্পের দক্ষতায় সেই সম্পদ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া মানুষের সেই অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিল। বিভিন্ন দ্রব্যের এই রূপ পরিবর্তন করাকেই শিল্পসৃষ্টি বলা হয়।

যান্ত্রিক শক্তি ও উহার তাৎপর্য (Mechanical Energy and its significance)—শিল্পসৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষ প্রথমে তাহার পেশীশক্তির সাহায্যে ছোটোখাটো কুটির শিল্প আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ পশুশক্তি, বায়ুশক্তি ও জলশক্তি ব্যবহারের দ্বারা মানুষ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এখনও বহু অনুন্নত দেশে পেশীশক্তি ও পশুশক্তি ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও তাঁতী নিজের পেশীশক্তির সাহায্যে ঘরে বসিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে; তৈলবীজ নিষ্কাশনে এখনও গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে উৎপাদনের পরিমাণ কখনও বেশী হওয়া সম্ভব নহে।

আধুনিক শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির মূলে রহিয়াছে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমস ওয়াট (James Watt) প্রথম বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কার করিবার পরেই শিল্পবিপ্লবের শুরু হয়। প্রথমে কয়লার সাহায্যে বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কৃত হইলেও ক্রমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে খনিজ তৈল, জলস্রোত, পীট ও প্রাকৃতিক গ্যাস হইতে যান্ত্রিক শক্তির সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্পে ও পরিবহণ ব্যবস্থায় পারমাণবিক শক্তিও ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যান্ত্রিক শক্তির উপাদানসমূহ থাকিলেই শক্তি উৎপাদিত হইবে না ; ঐ সঙ্গে চাই মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও সুদক্ষ কর্মী।

যান্ত্রিক শক্তি আবিষ্কৃত হইবার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্বে যে কাজ শত শত মানুষের পেশীশক্তির সাহায্যে সম্পন্ন হইত এখন তাহা একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হইতেছে। যান্ত্রিক শক্তি আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে বৃহদাকার শিল্প; ইহার ফলেই শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ প্রভৃতির প্রবর্তন সম্ভব হইয়াছে। প্রথমে কয়লার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তির আবিষ্কার হওয়ায় কয়লা উৎপাদনকারী দেশসমূহ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে এই সকল দেশের কয়লা সম্পদ।

যান্ত্রিক শক্তির উন্নতি শুধু যে শিল্পের উন্নতিতেই সাহায্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহা দ্বারা স্টীমার, জাহাজ, রেলগাড়ি ও বিমানপোত চালাইবার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি সম্ভব হইয়াছে; মানুষ দ্রুতবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতে পারিতেছে এবং শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজেই পরিবাহিত হইতেছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করিয়াছে। বর্তমান যুগে যান্ত্রিক শক্তি শুধু শিল্পে বা পরিবহণ-ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয় না, মানুষের নানা প্রয়োজনে ইহা নিয়োজিত হয়। খনি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে, কৃষিকার্যে, গৃহস্থালিতে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ভারোত্তোলনে, হিসাব-নিকাশ-যন্ত্রে, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণে আজ বৈদ্যুতিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন। একথা ঠিক যে, যান্ত্রিক শক্তি শিল্পের উন্নতিতে যতটা সাহায্য করিয়াছে, অন্যান্য কার্যে ততটা করে নাই।

শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান (Essential factors for development of Industries)—পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকার অতি অল্প অংশেই শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নতি শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যে সকল স্থানে এই সকল অনুকূল পরিবেশের অভাব সেখানে শিল্প-সৃষ্টি অসম্ভব। শিল্প-জগতের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, পৃথিবীর নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে শিল্প কারখানাসমূহ অবস্থিত। ইহার কারণ কি? শিল্প-কারখানা শুধু এই কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ কেন? ইহার প্রধান কারণ এই যে, শ্রমশিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ শুধু পৃথিবীর অল্প কয়েকটি অঞ্চলেই বিদ্যমান।

শ্রমশিল্পের জন্য প্রয়োজন (ক) কাঁচামাল, (খ) শক্তিসম্পদ, (গ) অনুকূল জলবায়ু, (ঘ) পরিবহণ-ব্যবস্থা, (ঙ) শ্রমিক, (চ) চাহিদা, (ছ) মূলধন ও (জ) রাজনৈতিক অবস্থা। এই সকল উপাদান যেখানে সুলভে ও সহজে পাওয়া যাইবে সেখানেই শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিবে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো একটি শিল্প একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার শিল্পের একদেশীভবনের (Localisation of Industries) মূল কারণ এই যে, ঐ শিল্পের উপযোগী সকল প্রকার অবস্থা ও উপকরণ সুলভে ও সহজে ঐ অঞ্চলে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের তুলা অঞ্চলের নিকট অবস্থিত বোম্বাই ও আমেদাবাদের কার্পাসবয়ন শিল্প, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতার পাটশিল্প প্রভৃতি শিল্পের একদেশীভবনের নিদর্শন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পস্থাপনের কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হইল:

(ক) **কাঁচামাল (Raw Materials)**—কাঁচামালের রূপ পরিবর্তন করিয়াই শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। সুতরাং যেখানে কাঁচামাল সুলভে পাওয়া যায়, সেখানেই শিল্পগঠন সম্ভব। বিভিন্ন কৃষিজাত, বনজ ও প্রাণিজ দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, পাট, কাষ্ঠ, লৌহ, পশম প্রভৃতি। কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রের নিকট পাওয়া গেলে পরিবহণের খরচ কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া বহু কাঁচামাল অত্যন্ত ভারি বা পচনশীল বলিয়া ঐ কাঁচামালের সন্নিকটেই শিল্প স্থাপিত হয়। কলিকাতার পাটশিল্প, বোম্বাই অঞ্চলের কার্পাস বয়ন শিল্প, রাউরকেলা ও ইউক্রেন অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কাঁচামালের নিকটে অবস্থিত।

(খ) **শক্তিসম্পদ (Power Resources)**—যে কোনো শিল্পেই শক্তির প্রয়োজন। পৃথিবীর কোনো কোনো অনুন্নত অঞ্চলের কুটিরশিল্পে এখনও পশুশক্তি বা পেশীশক্তি ব্যবহৃত হইলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে অধিকাংশ শিল্প কয়লা, খনিজ তৈল অথবা বিদ্যুৎ হইতে উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে চালিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারাও কোনো কোনো শিল্প চালিত হয়। এই সকল শক্তি-সম্পদ বহু দূরে লইয়া যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এইজন্য অধিকাংশ শিল্প শক্তিসম্পদের সন্নিকটে স্থাপিত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কয়লাখনির নিকটেই অবস্থিত। রুঢ় অঞ্চলের ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা কয়লাখনি অঞ্চলে এবং বোম্বাই ও আমেদাবাদের কার্পাস শিল্প জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের নিকট অবস্থিত।

(গ) **জলবায়ু (Climate)**—শিল্পের অবস্থানের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের শিল্প গড়িয়া উঠে। আর্দ্র জলবায়ুতে কাপড়ের সুতা মিহি হওয়ায় বোম্বাই, ল্যাংকাশায়ার প্রভৃতি আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত স্থানে কার্পাস-বয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। শুষ্ক জলবায়ুতে ময়দা শিল্প উন্নতিলাভ করে; সেইজন্য উইনিপেগ, বুদাপেস্ট, করাচী ও উত্তর প্রদেশে এই শিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এমন কি, চলচ্চিত্র শিল্প জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কারণ, সূর্যকিরণোজ্জ্বল স্থানে চলচ্চিত্রগ্রহণ সহজসাধ্য। সেইজন্য হলিউড, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

এই সকল প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও জলবায়ু পরোক্ষভাবে শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শীতপ্রধান দেশের শ্রমিক অধিক সময় দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারে; কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিছুক্ষণ কাজ করিবার পরেই শ্রমিকগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন কাঁচামাল উৎপাদন এবং পরিবহণ-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। জলবায়ুর উপর শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উন্নতি নির্ভর করে। শিল্পের চাহিদাও কতকাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। শীতপ্রধান দেশে স্বভাবতঃই পশম দ্রব্যের চাহিদা বেশী হইবে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাস দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে; এইজন্য ব্রিটেনে পশম শিল্প এবং ভারতে কার্পাস-বয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে এই সকল প্রাকৃতিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কোনো কোনো কারখানায় প্রয়োজনীয় জলীয়

বাষ্প সৃষ্টি করিয়া বা তাপ নিয়ন্ত্রণ (Air-conditioning) করিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ-সাধনের বা শ্রমিকগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনেক খরচ হওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে অনুকূল জলবায়ুযুক্ত স্থানে শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো কষ্টকর হয়। এইজন্য এখনও শিল্প কারখানা স্থাপনে জলবায়ুর প্রভাব বহুলাংশে বিদ্যমান।

(ঘ) **পরিবহণ-ব্যবস্থা (Transport)**—শিল্প-কারখানায় কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি শক্তিসম্পদ, কাঁচামাল ও শ্রমিক আনিবার জন্য পরিবহণের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠাইতে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এইজন্য জলপথ, রেলপথ বা পাকা রাস্তা না থাকিলে শিল্প-কারখানা স্থাপন করা অসম্ভব। যে সকল দেশে পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত আছে, সেই সকল দেশ শ্রমশিল্পে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। দুর্গাপুর, টাটানগর, নিউ ইয়র্ক, চিকাগো, ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি শহরে অবস্থিত শিল্পের উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থার অবদান কম নহে। অন্যদিকে ব্রাজিল, জায়েরে প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন কাঁচামাল থাকিলেও এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকিলেও পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে ঐ সকল দেশ শ্রমশিল্পে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

(ঙ) **শ্রমিক (Labour)**—প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ্গণের মতে শ্রমিকই শিল্প গঠনের প্রধান হোতা। শ্রমিকের নিপুণতা এবং কর্মক্ষমতার উপর শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। শ্রমিকের মজুরি অত্যধিক হইলে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন খরচ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য সুলভ ও সুনিপুণ শ্রমিকের সরবরাহের উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল। জাপান ও চীনে শ্রমিক সুনিপুণ ও সুলভ বলিয়া ঐ সকল দেশে শিল্পস্থাপন সহজসাধ্য হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকের অভাবে শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই।

(চ) **চাহিদা (Market)**—শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার উপর শিল্প-কারখানার অবস্থান কিছুটা নির্ভর করে। শিল্পের নিকটে বাজার অবস্থিত হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবহণ খরচ কমিয়া যায়। ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীতের প্রকোপ অত্যধিক বলিয়া পশমী দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বেশী ; সেইজন্য এই সকল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পশমবয়ন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। জনসংখ্যা এবং ইহাদের ক্রয়ক্ষমতার উপর চাহিদা নির্ভরশীল ; এইজন্য জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে শিল্প কারখানার আধিক্য দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহের শিল্পোন্নতির ইহাই একটি কারণ। বৈদেশিক বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য বহু শিল্প কারখানা বন্দরের নিকট স্থাপিত হয়। কলিকাতার পাটশিল্প ইহার নিদর্শন। এইভাবে দেখা যায়, চাহিদার উপর অথবা বিক্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তিতার উপর শিল্প কারখানার অবস্থান কিয়দংশে নির্ভরশীল।

বর্তমান যুগে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় সব সময় দেশের চাহিদা অনুসারে শিল্পকারখানা স্থাপিত হয় না।

আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুমান করিয়া শিল্প স্থাপিত হয়। জাপানের কার্পাসবয়ন শিল্প, কলিকাতার পাটশিল্প, ব্রিটেনের যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্প স্থানীয় চাহিদার উপর মোটেই নির্ভরশীল নহে ; এই সকল শিল্প আন্তর্জাতিক চাহিদার উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য বর্তমান যুগে স্থানীয় চাহিদা বা বাজারের নিকটবর্তিতা শিল্প-কারখানার অবস্থান নির্ণয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না।

(ছ) **মূলধন (Capital)**—যে কোনো শিল্প-স্থাপনের জন্য প্রয়োজন মূলধন। জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে, কারখানা-নির্মাণে, কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের যোগান দিতে শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। সমৃদ্ধিশালী দেশের মানুষ নিজেদের আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া মূলধনের সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু অনুন্নত দেশের মানুষ দরিদ্র বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না ; ইহার ফলে মূলধনের অভাব দেখা যায়। এইজন্যই সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহে (উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি) মূলধনের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্প এই কারণে এই সকল সমৃদ্ধিশালী দেশে স্থাপিত হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার কর্তৃক শিল্প স্থাপিত হয় বলিয়া মূলধন প্রধানতঃ সরকারী তহবিল হইতে সরবরাহ করা হয়। সেইজন্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ শিল্পে দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে।

(জ) **রাজনৈতিক অবস্থা (Political Conditions)**—অনেক ক্ষেত্রে দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে শিল্পকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রাখিতে হয়। যেমন, সোভিয়েত রাশিয়ায় সামরিক কারণে শিল্পের বিকেন্দ্রীভবন হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প গড়িয়া উঠে ; যেমন, ঢাকার মসলিন শিল্প, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলাবলয়ের কার্পাসবয়ন শিল্প। আবার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং শান্তিশৃঙ্খলার অভাবে শিল্প স্থাপনে বাধার সৃষ্টি হয় ; যেমন, ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও আইন শৃঙ্খলার অভাবে কোনো শিল্পপতি এখানে নূতন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয় নাই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা সেখানকার শিল্পোন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিল্প-কারখানা স্থাপনের এই সকল উপাদান ছাড়াও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, ভৌগোলিক স্থিতিপ্রবণতা (inertia), স্থানীয় সরকারের শিল্পনীতি, করপ্রথা ও আইন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুবন্দোবস্ত, পেটেন্ট রক্ষা করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি শিল্প-কারখানা স্থাপনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলসমূহ (Principal Industrial Regions of the World)—বর্তমান যুগ শিল্পের যুগ। এই যুগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি শিল্পোন্নতি। এই শিল্পোন্নতি নির্ভর করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। যে সকল দেশে উপরিউক্ত শিল্পের উপযোগী উপকরণসমূহ ও অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান, সেই সকল দেশ শিল্পে উন্নতিলাভ করিবে এবং যেখানে ইহার অভাব, সেই সকল দেশ শিল্পে অনুন্নত থাকিয়া যাইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের ইতিহাস ও গঠন-প্রণালী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ, যেখানে শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ সুলভে পাওয়া যায় এবং পরিবহণ-খরচ সবচেয়ে কম লাগে, সেখানে কোনো একটি বা দুইটি শিল্প গড়িয়া ওঠে। ক্রমশঃ ঐ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের পরিবারবর্গ ঐ স্থানে আসে। ইহার ফলে ঐ স্থানে বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া

ওঠে। ইহা ছাড়া, প্রথমে স্থাপিত প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল

অন্যান্য শিল্পও ঐ অঞ্চলে গড়িয়া ওঠে ; ফলে উহা শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়।

শিল্পোন্নত পৃথিবীর মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অল্প কয়েকটি অঞ্চল শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণ গোলার্ধে শিল্প অত্যন্ত অনুন্নত। নিম্নে পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইলঃ

(১) **উত্তর আমেরিকার মধ্য-পূর্বাংশ**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ এবং কানাডার দক্ষিণ-পূর্বাংশ লইয়া এই শিল্পাঞ্চল গঠিত।

কানাডার অধিকাংশ শিল্প এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই দেশের শিল্প সন্নিকটস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা ও লৌহের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ও কাষ্ঠ কানাডা হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের শিল্পে ব্যবহার করে। কানাডার বিভিন্ন শিল্প আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট চাহিদার উপর নির্ভরশীল। পঞ্চহ্রদ এই দুইটি দেশের শিল্পাঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত ; ইহার ফলে উভয় দেশ সুলভ জলপথের সুবিধা ভোগ করে। কানাডার এই শিল্পাঞ্চলে এই দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই দেশের মন্ট্রিল ও টরেন্টো শহরেই অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শিল্প দেশের পূর্বাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশের নাম উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল এবং দক্ষিণাংশের নাম দক্ষিণ-পূর্ব শিল্পাঞ্চল।

(ক) **উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল এই দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। মেইন ও মেরীল্যান্ড** হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম আইওয়া ও মিসৌরি পর্যন্ত এই শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত। বাল্টিমোর, লুইস্‌ভিল ও সেন্ট লুই ইহার দক্ষিণ সীমা। যদিও এই অঞ্চলের আয়তন সমগ্র দেশের আয়তনের এক-দশমাংশ, কিন্তু মূল্য হিসাবে মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে মার্কিন **যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশী লোক বাস করে। নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া,**

ইলিনয় ও ওহিও রাজ্যে এই অঞ্চলের অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত। শিল্পসমৃদ্ধ শহরের মধ্যে নিউ ইয়র্ক, চিকাগো, ডেট্রয়েট ও ফিলাডেলফিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক, পেনসিলভেনিয়া ও মধ্য সমভূমির কয়লা, খনিজ তৈল ও গ্যাস, ভুট্টা বলয়ের পশুসম্পদ (দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম, মাংস), ফল্ লাইনের জলবিদ্যুৎ, পঞ্চহ্রদের অভ্যন্তরীণ জলপথ, বিস্তীর্ণ রেলপথ, আটলান্টিক মহাসাগরের অপর তীরের ইউরোপ হইতে সুদক্ষ কর্মী ও মূলধন আমদানির সুযোগ, ঘন লোকবসতি, বনভূমির মূল্যবান কাষ্ঠ ও উন্নত ধরনের বন্দর প্রভৃতি। এই অঞ্চলের আটলান্টিক উপকূল ভগ্ন হওয়ায় এবং উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাব থাকায় বন্দর-নির্মাণ সহজসাধ্য হইয়াছে। হ্রদ অঞ্চলের ও নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, নিউ ইংল্যান্ডের কার্পাসবয়ন শিল্প, ফিলাডেলফিয়া ও ক্লীভল্যান্ডের পশমবয়ন শিল্প, প্যাটারসনের রেশমবয়ন শিল্প, ডেট্রয়েটের মোটরগাড়ি-নির্মাণ শিল্প, চিকাগোর মাংস-সংরক্ষণ ও রেলইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প জগদ্বিখ্যাত।
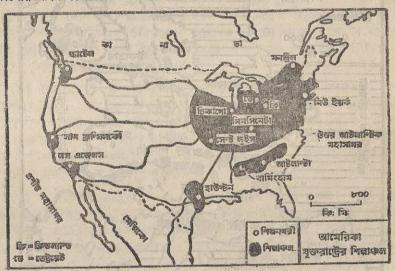
(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব- শিল্পাঞ্চল ভার্জিনিয়া হইতে আলাবামা রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ; উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলের পরেই ইহার স্থান। দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লা, খনিজ তৈল ও গ্যাস, টেনেসি উপত্যকার জলবিদ্যুৎ, আলাবামা রাজ্যের লৌহ আকরিক, তুলাবলয়ের উৎকৃষ্ট তুলা, ভুট্টা-বলয়ের পশুসম্পদ এবং পাইন বনভূমির কাষ্ঠের অপর্যাপ্ত সম্ভার এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এই অঞ্চলের নিকটবর্তী আরকানসাসে এবং টেক্সাসে যথাক্রমে এই দেশের অধিকাংশ বক্সাইট ও সালফার পাওয়া যায়। পূর্বে ইউরোপীয়গণ এই অঞ্চলের নিকটবর্তী ফ্লোরিডা রাজ্যে প্রথমে পদার্পণ করিয়া নিগ্রো ক্রীতদাসগণের সাহায্যে এই অঞ্চলের উন্নতিসাধন করে ; এখানকার নিগ্রো শ্রমিকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে ইহাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। এই সকল অনুকূল অবস্থায়

জন্য এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কার্পাসবয়ন শিল্প, রেয়ন-শিল্প ও চিনিশিল্প প্রভৃতি উন্নতিলাভ করিয়াছে। বার্মিংহাম এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র।

(২) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ**—ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণাংশ এবং চেকোশ্লোভাকিয়া লইয়া এই শিল্পাঞ্চল গঠিত। সর্বপ্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর এই অংশে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়। সুতরাং এই অঞ্চল শিল্পে অত্যন্ত উন্নত হইবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহা ছাড়া, এখানকার বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, লৌহ আকরিক
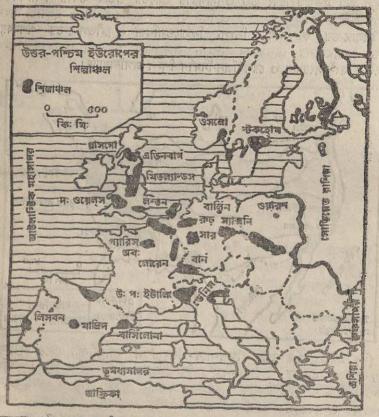
ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষায় এই সকল দেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এই দেশগুলি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া এখানকার জলবায়ু শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ব্রিটেন, জার্মানী, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রচুর সুবিধা পাইয়াছে। এই অঞ্চলের দেশসমূহ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে

এই অঞ্চলের দেশসমূহে কোনো অসুবিধা হয় না। ফ্রান্স ও জার্মানীতে জলপথ উন্নতিলাভ করায় সুলভ পরিবহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানকার দেশসমূহে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বন্দর থাকিবার ফলে বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করা সহজসাধ্য হইয়াছে। এই অঞ্চলের অবস্থান পৃথিবীর মধ্যভাগে হওয়ায় পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা সহজ। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের দেশসমূহ শিল্পে বিশেষ উন্নত। এই সকল দেশের সামগ্রিক উৎপাদন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী (৩০৭ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের অন্তর্গত ব্রিটেনের শিল্পাঞ্চলসমূহের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ড, ক্লাইড উপত্যকা, বার্মিংহাম, ল্যাঙ্কাশায়ার, লন্ডন ও দক্ষিণ ওয়েলস্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশের এক একটি শিল্পাঞ্চল এক একটি শিল্পদ্রব্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এখানকার শিল্প সাধারণতঃ কয়লার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। রূঢ় পশ্চিম জার্মানীর প্রধান শিল্পাঞ্চল ; স্থানীয় অপর্যাপ্ত কয়লা ও লোরেন অঞ্চলের লোহ আকরিক রূঢ়ের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। বেলজিয়ামের অপর্যাপ্ত কয়লা ও লুক্সেমবুর্গের লোহ আকরিকের সাহায্যে উভয় দেশে শিল্পোন্নতি হইয়াছে। সুইজারল্যান্ড সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহভান্ডার। কয়লা অপর্যাপ্ত পাওয়া না গেলেও এই দেশ জলবিদ্যুতের সাহায্যে শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

(৩) সোভিয়েত রাশিয়া—সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ। বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই দেশের শিল্পোন্নতি আরম্ভ হয়। পূর্বে ইউক্রেন অঞ্চলে এখানকার শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল। কাঁচামাল ও শক্তি-সম্পদের নৈকট্য এবং আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসারে এই দেশের শিল্প বিভিন্ন অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় সাধারণতঃ ছয়টি প্রধান শিল্পাঞ্চল আছে ঃ

(ক) মস্কো-গোর্কি-টুলা অঞ্চল—কার্পাসবয়ন শিল্পে ও রসায়ন শিল্পে এই অঞ্চল বিশেষ উন্নত। এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ কার্পাসবয়ন শিল্প মস্কো অঞ্চলে অবস্থিত। আইভানোভ শ্রেষ্ঠ কার্পাসবয়ন কেন্দ্র। এই দেশের শতকরা ৬০ ভাগ রসায়ন শিল্প মস্কো অঞ্চলে অবস্থিত। টুলা অঞ্চল লৌহ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। গোর্কি অঞ্চলে মোটর-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। এই অঞ্চলের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, কাঁচামাল ও কোক কয়লার অভাব। বর্তমানে অন্যান্য অঞ্চল হইতে কাঁচামাল আনিয়া এবং স্থানীয় লিগনাইট কয়লা দ্বারা শিল্পের উন্নতিসাধন করা হইতেছে।

(খ) লেনিনগ্রাড অঞ্চল—কয়লাখনি অঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও লেনিনগ্রাড একটি উৎকৃষ্ট বন্দর বলিয়া জলবিদ্যুতের সাহায্যে এখানে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মস্কো অঞ্চলের লিগনাইট কয়লাও এই অঞ্চলে আনা হয়। এখানে ধাতব শিল্প, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কাগজ শিল্প, জাহাজ-নির্মাণ শিল্প, রসায়ন ও চর্মশিল্প বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

(গ) ইউক্রেন অঞ্চল—ইহা সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। এই দেশের শতকরা ৫৫ ভাগ ইস্পাত ও ৩০ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম এই অঞ্চলে উৎপন্ন

হয়। এখানে প্রচুর চিনির কল, ময়দা ও চামড়ার কারখানা আছে। এখানকার শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে প্রচুর কয়লা ও লৌহের সরবরাহ ; এই অঞ্চলের ডোনেৎস উপত্যকায় এই দেশের শতকরা ৪০ ভাগ কয়লা এবং ক্রিভয় রগে সর্বাপেক্ষা বেশী লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্রসমূহের মধ্যে নীপারপেট্রোভস্ক, ক্রিভয় ও স্টালিনগ্রাড (লৌহ ও ইস্পাত শিল্প), নীপার-

পেট্রোভস্ক (তাপবিদ্যুৎ ও যন্ত্রশিল্প), রোস্টভ ও ওডেসা (কৃষি যন্ত্রপাতি-শিল্প), কিয়েভ (চিনিশিল্প), ভরোশিলভগ্রাড (রেলইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) **ইউরাল অঞ্চল**—ইউক্রেন অঞ্চলের পরেই শিল্পোৎপাদনে এই অঞ্চলের স্থান। ক্রমশঃই এই অঞ্চল এত দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে যে, শীঘ্রই ইহা ইউক্রেন অঞ্চলকে ছাড়াইয়া যাইবে। ইউরাল অঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়ার শতকরা ২০ ভাগ লৌহ আকরিক এবং ৪৪ ভাগ খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়। কুজনেৎস্ক অঞ্চলের সহায়তায় এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। কুজনেৎস্ক অঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়ার শতকরা ২২ ভাগ কয়লা পাওয়া যায়। ইউরাল অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় না এবং কুজনেৎস্ক অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় না। পূর্বে ইউরাল অঞ্চল হইতে যে মালগাড়িতে লৌহ আকরিক কুজনেৎস্ক অঞ্চলে যাইত, সেই গাড়িতেই ঐ অঞ্চল হইতে ইউরাল অঞ্চলে কয়লা আনা হইত। পরিবহণের এই 'দোলক নীতি'র (Pendulum Principle) ফলে উভয় অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে এবং এই সকল শিল্পে পরিবহণ খরচও কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে কারাগান্ডা অঞ্চলে কয়লাখনি এবং কুজনেৎস্ক অঞ্চলে লৌহখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় পরিবহণের এই 'দোলক নীতি'র প্রয়োজন বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইউরাল অঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়ার

শতকরা ২৫ ভাগ ইস্পাত উৎপন্ন হয়। ম্যাগনিটোগর্স্ক এখানকার শ্রেষ্ঠ ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র। ইস্পাতশিল্প ছাড়াও ইউরাল অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্প, রেলইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি শিল্প, অস্ত্রশিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান ও ট্রান্স-ক্যাস্পিয়ান রেলপথ এই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানসমূহকে এবং এই শিল্পাঞ্চলের সহিত দেশের অন্যান্য স্থানকে সংযুক্ত করিয়াছে।

(৪) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া**—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে জাপান, চীন ও ভারত শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। অন্যান্য দেশ এখনও শিল্পে অনুন্নত। জাপান বহুদিন পূর্বেই শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। স্থানীয় কয়লা, লৌহ আকরিক ও অন্যান্য কাঁচামালের উৎপাদনের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হইলেও আমদানির উপর নির্ভর করিয়া এখানকার শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে সুলভ জলবিদ্যুৎ, সুলভ ও নিপুণ শ্রমিক, উৎকৃষ্ট বন্দর, পরিবহণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যের উপযোগী জাহাজের প্রাচুর্য, সুলভে শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা, পূর্বেকার জাপান সাম্রাজ্য ও অনুকূল জলবায়ু প্রভৃতি। এই দেশে প্রধানতঃ তিনটি শিল্পাঞ্চল বিদ্যমান ; যথা,

কোবে-ওকাসা, টোকিও-ইয়োকোহামা ও নাগাসাকি। ইহা ছাড়া, মুর্য়োরান ও কামাইসি অঞ্চলেও কোনো কোনো শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপান প্রধানতঃ পর্বতসঙ্কুল দেশ বলিয়া যেখানে অল্প পরিমাণ সমতলভূমি পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। এই তিনটি অঞ্চল সমতল-ভূমিতে অবস্থিত বলিয়া এবং ইহার সন্নিকটে উৎকৃষ্ট বন্দর থাকায় শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশ শিল্পে অনুন্নত বলিয়া জাপান সহজেই এই সকল দেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে পারে।

চীন কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও বিপ্লবের পর বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই দেশ শিল্পে উন্নতিলাভ করিতেছে। স্থানীয় অপর্যাপ্ত কয়লা, লৌহ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ এবং তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতি কৃষিজাত সম্পদ এখানকার

শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। স্থানীয় ১০০ কোটি লোকের অপর্যাপ্ত চাহিদা শিল্পোৎপাদনের উৎসাহ সৃষ্টি করে। চীনা শ্রমিক অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও নিপুণ। সোভিয়েত রাশিয়ার কারিগরি-সাহায্য ও যন্ত্রপাতি এখানকার বহু শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। এই সকল কারণে বিপ্লবের পর এখানে শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। উত্তর চীন ও মধ্য চীনে অধিকাংশ বৃহদাকার শিল্প অবস্থিত। উত্তর চীনের পিকিং-তিয়েনসিন এবং লায়োনিং-এর আনশান অঞ্চলে অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত। মধ্য চীনের সাংহাই ও হ্যাঙ্কাউ উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল।

ভারত প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানকার কয়লা, লৌহ আকরিক এবং কৃষিজাত কাঁচামালের (তুলা, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি) সাহায্যে নানাপ্রকার শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। এই দেশের সুলভ শ্রমিক ও স্থানীয় ৭০ কোটি লোকের চাহিদা শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। এই দেশের শিল্পাঞ্চলসমূহের মধ্যে পূর্বাংশের কলিকাতা শিল্পাঞ্চল, পশ্চিমাংশের বোম্বাই-আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চল, উত্তর প্রদেশ ও তামিলনাড়ুর শিল্পাঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বাংশের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশে প্রচুর কয়লা ও লৌহ আকরিক পাওয়া যায় বলিয়া বৃহদাকার ধাতুশিল্প এই অঞ্চলে উন্নতিলাভ করিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের তুলার প্রাচুর্যের জন্য জলবিদ্যুতের সাহায্যে প্রধানতঃ কার্পাসবয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। তামিলনাড়ু রাজ্যে কোয়েম্বাটুরে কার্পাসবয়ন শিল্প এবং উত্তর প্রদেশের কানপুর অঞ্চলে পশমবয়ন শিল্প ও চর্মশিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।

(৫) দক্ষিণ গোলার্ধের শিল্পাঞ্চল—কয়লার অভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের অধিকাংশ দেশ শিল্পে অনুন্নত। রাজনৈতিক পরাধীনতা এখানকার শিল্পের অনুন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। এখানকার পশম, তুলা প্রভৃতি কাঁচামাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ গোলার্ধের নিম্নলিখিত কয়েকটি দেশে অল্পবিস্তর শিল্পোন্নতি লক্ষ্য করা যায় : দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশের ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা, মধ্য চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ জিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ। এখানকার শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে স্থানীয় কাঁচামাল হইতে প্রধানতঃ ভোগ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের স্বার্থে এবং কয়লার অভাবে ভারী শিল্প এখানে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
(The Iron And Steel Industry)

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই সর্বপ্রধান শ্রমশিল্প। অন্যান্য শিল্পের উন্নতি ইহার উপর নির্ভরশীল ; কারণ, যন্ত্রপাতি ভিন্ন কোনো শিল্প কারখানা গড়িয়া ওঠে না। যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে এবং কারখানার গৃহাদির নির্মাণকার্যে লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে লৌহ ও ইস্পাতের সরবরাহের উপর ; কারণ, জাহাজ, রেলগাড়ি, রেল লাইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন। দেশরক্ষার জন্য যে অস্ত্রশস্ত্র

প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও লৌহ ও ইস্পাতের উপর নির্ভরশীল। বাসগৃহ, আসবাবপত্র, এমন কি ইস্পাত তৈয়ারির যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতেও লৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন। অন্যান্য ধাতব পদার্থ অপেক্ষা লৌহ ও ইস্পাত অনেক সুলভ বলিয়া অধিকাংশ শিল্পেই ইহা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান যুগে লৌহ ও ইস্পাত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এইজন্য বর্তমান যুগকে ইস্পাতের যুগ বলা যায় এবং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনকে শিল্পোন্নতির মাপকাঠি বলিয়া ধরা হয়।

লৌহ আকরিক খনি হইতে তুলিয়া প্রাথমিক পরিশোধনের পর কোক-কয়লা (Coke), চুনাপাথর (Limestone) ও পুরাতন টুকরা লৌহখণ্ড (Scrap) প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া ধাতচুল্লীতে (Blast Furnace) গলাইলে চুনের সহিত গাদ ভাসিয়া ওঠে এবং লৌহের অংশ নীচে পড়িয়া থাকে। এই লৌহকে কাঁচা-লোহা বলে। ইহাকে তপ্ত অবস্থায় ছাঁচে ঢালা হয়। পূর্বে এই ছাঁচের আকার শূকরের মতো ছিল বলিয়া এইপ্রকার ঢালাই লৌহকে এখনও পিগ্ আয়রন (Pig Iron) বলে। এক মেঃ টন ঢালাই লৌহ প্রস্তুত করিতে ১·৭ মেঃ টন লৌহ আকরিক, ·৯ মেঃ টন কোক কয়লা, ·৪ মেঃ টন চুনাপাথর, ·২ মেঃ টন পুরাতন লৌহ এবং ·৪ মেঃ টন বায়ু (Air) প্রয়োজন। প্রতি মেঃ টন ঢালাই লৌহের সঙ্গে ·৬ মেঃ টন গ্যাস এবং ·৫ মেঃ টন গাদ ধাত-চুল্লী হইতে নির্গত হয়। উৎপন্ন ঢালাই-লৌহের অধিকাংশ ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং কিয়দংশ বাজারে বিক্রয় হয় এবং অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঢালাই লৌহের সঙ্গে অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকন যোগ করিয়া বিভিন্ন পন্থায় সাধারণ ইস্পাত (Steel) প্রস্তুত হয়। বর্তমান যুগে ইস্পাত উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে ; যথা, বেসিমার (Bessemer), প্রকাশ্যচুল্লী (Open Hearth), বৈদ্যুতিক চুল্লী (Electrical Furnace) ও মূষা পদ্ধতি (Crucible Process)। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে বর্তমান যুগে সাধারণ ইস্পাত অপেক্ষা সঙ্কর-ইস্পাতের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইস্পাত প্রস্তুত করিবার সময় ইহার সহিত অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, তাম্র, সীসা, মলিবডেনাম, নিকেল, রূপ, টাংস্টেন, ভ্যানাডিয়াম, দস্তা প্রভৃতি মিশাইয়া নানা প্রকারের সঙ্কর ইস্পাত (Alloy Steel) প্রস্তুত করা হয়। এই জাতীয় ইস্পাত অত্যন্ত শক্ত হয় এবং ইহা দ্বারা ধারালো অস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। ইহাতে কখনও মরিচা ধরে না। বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার জন্য এইজাতীয় ইস্পাত একান্ত প্রয়োজন।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Areas of Production)—ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণই দেশের শিল্পোন্নতির মাপকাঠি। কারণ, ইহার উপর অন্যান্য শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। সেইজন্য সকল দেশই লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে উন্নতিলাভ করিবার চেষ্টা করে। ইহার মধ্যে যে সকল দেশে এই শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, শ্রমিক, চাহিদা ও পরিবহণ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত আছে সেই সকল দেশেই ইস্পাত শিল্প উন্নতিলাভ করে। সাধারণতঃ কয়লা ও লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী দেশসমূহ এই শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপান একত্রে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ইস্পাত উৎপন্ন করে।

পৃথিবীর মোট ইস্পাত উৎপাদন—১৯৮৪

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
সোঃ রাশিয়া	১৫ কোটি ২৫ লক্ষ মেঃ টঃ	চেকোশ্লোভাকিয়া	১ কোটি ৫০ লক্ষ মেঃ টঃ
জাপান	৯ „ ৭০ „	ব্রাজিল	১ „ ৪১ „
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৭ „ ৫৩ „	রোমানিয়া	১ „ ৩১ „
চীন	৪ „ ১ „	স্পেন	১ „ ২৯ „
পঃ জার্মানী	৩ „ ৬০ „	কানাডা	১ „ ২৮ „
ইটালি	২ „ ৯৫ „	বেলজিয়াম	১ „ ২ „
ফ্রান্স	১ „ ৭৬ „	ভারত	১ „ ১ „
পোল্যান্ড	১ „ ৬২ „	দঃ আফ্রিকা	৭১ „
ব্রিটেন	১ „ ৬০ „	অস্ট্রেলিয়া	৫৩ „

(Source: U. N. O. M nthly Bulletin of Statistics, August, 1985)

সোভিয়েত রাশিয়া (U. S. S. R.)—বিপ্লবের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন নগণ্য ছিল। বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে এই দেশ অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদকের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দেশ কয়লা, লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানিজ

উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে; সুতরাং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতি-সাধনের কোনো অসুবিধা হয় না। শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অবলম্বনের ফলে, এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(ক) **ইউক্রেন অঞ্চল**—ক্রিভয় রগ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এবং ডোনেৎস অঞ্চলের কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ এখানকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চল সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল। সোভিয়েত রাশিয়ার মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক লৌহ ও ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। নীপারপেট্রোভস্ক এই অঞ্চলের বিখ্যাত ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। স্টালিনো ও খারকভেও লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে।

(খ) **ইউরাল অঞ্চল**—এই অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় কারাগান্ডা অঞ্চলের কয়লা এই অঞ্চলে আনা হয়। ম্যাগনেট পর্বতে লৌহ-খনির নিকট অবস্থিত ম্যাগনিটোগর্স্ক সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত-উৎপাদন কেন্দ্র। এই অঞ্চলে নির্জানি, তাগিল, স্বার্দলোভস্ক, চেলিয়াবিনস্ক, পার্ম প্রভৃতি স্থানেও ইস্পাত-কারখানা আছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মোট ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

(গ) **মস্কো অঞ্চল**—ইউক্রেনের লৌহ কয়লার উপর এই অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প বহুলাংশে নির্ভরশীল। বর্তমানে স্থানীয় লিগনাইট কয়লা হইতে কয়লার চাহিদা কিছুটা মিটানো হয়। মস্কো, টুলা প্রভৃতি স্থানে বড় বড় ইস্পাত-কারখানা আছে।

ইহা ছাড়া, আজভ-ক্রিমিয়া অঞ্চলে, কুজনেৎস্ক অঞ্চলে, বৈকাল হ্রদের তীরে ইরকুটস্কে ও পেট্রোভস্ক-জাবাইকালস্কিতে এবং আমুর উপত্যকায় কমসোমোলস্কে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)—এই দেশে প্রচুর লৌহ আকরিক ও কয়লা পাওয়া যায়। সুতরাং কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের কোনো অভাব নাই। হ্রদ অঞ্চলের সুলভ জলপথ এবং দেশব্যাপী রেলপথের সুবন্দোবস্ত থাকায় পরিবহণ ব্যবস্থার

কোনো অসুবিধা হয় না। হ্রদ অঞ্চলের (মিনেসোটা ও মিচিগান) লৌহ আকরিক হ্রদ ও খালের মাধ্যমে অতি অল্প ব্যয়ে পূর্বদিকে বিভিন্ন ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্রে আনীত হয়। সমৃদ্ধিশালী, জনবহুল শিল্পপ্রধান দেশ বলিয়া এখানে চাহিদার কোনো অভাব হয় না। বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের প্রভাব আছে। এখানকার শ্রমিকগণও কর্মদক্ষ। এই সকল কারণে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই দেশ পৃথিবীতে

তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে :

(ক) **পিট্‌স্‌বার্গ অঞ্চল**—এই দেশের মোট লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৪৫ ভাগ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা ও হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এখানকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পিটস্‌বার্গ ও ইয়ংস্‌টাউন অঞ্চলের লৌহ আকরিক এখানকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পিটস্‌বার্গ ও ইয়ংসটাউন এই অঞ্চলের বিখ্যাত ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।

(খ) **হ্রদ অঞ্চল**—পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এই অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার শিল্পও হ্রদ অঞ্চলের লৌহ ও অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লার উপর নির্ভরশীল। মিচিগান হ্রদ-সন্নিহিত চিকাগো ও গেরী, ইরি হ্রদ-সন্নিহিত ডেট্রয়েট, বাফেলো, ক্লীভল্যান্ড প্রভৃতি স্থান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(গ) **পেনসিলভানিয়া অঞ্চল**—আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে, বাল্টিমোর, স্প্যারোজ পয়েন্ট, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি **স্থানে স্থানীয় কয়লা ও** আমদানীকৃত লৌহের সাহায্যে বড় বড় ইস্পাত-কারখানা **গড়িয়া উঠিয়াছে।** কানাডা, স্পেন, চিলি, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে লৌহ আমদানি করা হয়।

(ঘ) **বার্মিংহাম অঞ্চল**—আলাবামা রাজ্যের এই অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক, কয়লা, চুনাপাথর ও ডলোমাইট পাওয়া যায় বলিয়া বার্মিংহাম বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

এই চারিটি অঞ্চল ছাড়াও কলোরাডো, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউটা প্রভৃতি রাজ্যে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল রাজ্যের ইস্পাত শিল্পে স্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকরিক ব্যবহৃত হয়।

জাপান (Japan)—উৎকৃষ্ট কয়লা ও লৌহ আকরিক উৎপাদনে জাপানের স্থান অনেক নীচে ; কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই দেশ পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। প্রয়োজনীয় লৌহের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র এই দেশে পাওয়া যায়। বাকী লৌহ ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইনস্, মালয়েশিয়া ও কানাডা হইতে আমদানি করা হয়। নিপুণ শ্রমিক, নিকটবর্তী বন্দর, উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা এই শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ। উত্তর কিউসিউ অঞ্চলে **ইয়াওয়াটায় এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা** অবস্থিত। হনসুর কামাইসি, ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং হোক্কাইডোর মুরোরান এই দেশের উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।

পশ্চিম জার্মানী—(West Germany)—লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে পশ্চিম জার্মানী পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এখানে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহ আকরিক পাওয়া যায় না। ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে অধিকাংশ লৌহ আকরিক আমদানি করিয়া স্থানীয় কয়লার সাহায্যে রূঢ় অঞ্চলে বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সকল কারখানা বিধ্বস্ত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আবার এই শিল্প প্রধানতঃ রূঢ় অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। জার্মানীর মোট লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ রূঢ় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় কয়লা, জলপথের সুবন্দোবস্ত, স্থানীয় শ্রমিকের নিপুণতা ও সরকারের সাহায্য এই দেশের শিল্পোন্নতির প্রধান কারণ। এসেন, বোচাম, ডার্টমন্ড, ডুসেলডর্ফ প্রভৃতি এদেশের উল্লেখযোগ্য ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।

ফ্রান্স (France)—এই দেশের লোরেন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট লৌহখনি আছে। কিন্তু এদেশে কয়লার উৎপাদন অনেক কম। এইজন্য ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানী হইতে কয়লা আমদানি করিয়া এখানকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। লোরেন অঞ্চলেই অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা অবস্থিত। ইহা ছাড়া ক্রুজো অঞ্চলেও ইস্পাত কারখানা আছে। ফ্রান্স বর্তমানে ইস্পাত উৎপাদনে সপ্তম স্থানের অধিকারী।

ব্রিটেন (U. K.)—ইস্পাত শিল্পে একসময় এই দেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত; কিন্তু বর্তমানে নবম স্থান অধিকার করে। উৎকৃষ্ট কয়লা ও লোহের পাশাপাশি অবস্থান, পেনাইন অঞ্চলের চুনাপাথর ও শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তী উৎকৃষ্ট বন্দর এই শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। ইহা ছাড়া সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল দেশ বলিয়া এখানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত বেশী; বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের আধিপত্য ছিল। এই সকল কারণে এই দেশ পূর্বে ইস্পাত শিল্পে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

ব্রিটেনের উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত মিড্‌লস্‌বরো, হার্টলপুল ও ডার্লিংটনে এ দেশের সর্বাপেক্ষা বেশী লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হয়। সুইডেন হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ এই অঞ্চলে আমদানি করা হয়। ব্ল্যাক কান্ট্রি অঞ্চলের বার্মিংহাম, কভেন্ট্রি, ডাড্‌লি, রেড্‌, ডিচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র। এখানকার ইস্পাত হইতে যন্ত্রপাতি, রেলইঞ্জিন ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। শেফিল্ড অঞ্চলে আমদানীকৃত লৌহ দ্বারা ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া উৎকৃষ্ট ছুরি, কাঁচি ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়।

স্কটল্যান্ডের মধ্য-সমভূমি অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প জাহাজ নির্মাণে সহায়তা করে। গ্লাসগো এই অঞ্চলের বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণ ও ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র। দক্ষিণ

ওয়েলসের লান্‌লে, সোয়ানসি ও কার্ডিফ, উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ব্যারো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।

চীন (China)—বিপ্লবের পূর্বে চীনের ইস্পাত উৎপাদন নগণ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে ৪ কোটি মেঃ টনের বেশী ইস্পাত এই দেশে উৎপন্ন হয়। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে স্থানীয় উৎকৃষ্ট কয়লার সরবরাহ, লায়োনিং-এর লৌহ, এই দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও সরকারী কর্মপ্রচেষ্টা। ইয়াংসি নদীর তীরে হ্যাঙ্কাও অঞ্চলে এবং লায়োনিং-এ আনশানে অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা অবস্থিত ; এই দেশের আনশান এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র। ইস্পাত উৎপাদনে চীন এখন পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানের অধিকারী।

বেলজিয়ামের কয়লা ও লুক্সেমবুর্গের লৌহ আকরিক একত্রিত হইয়া এই দুই দেশেই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্পাত রপ্তানিতে বেলজিয়াম পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া ইটালি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, কানাডা, সুইডেন, লুক্সেমবুর্গ, স্পেন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি

দেশের ইস্পাত-শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। বর্তমানে **ইটালি লোহ ও ইস্পাত শিল্পে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী।**

[ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্বন্ধে এই পুস্তকের 'ভারত'-অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।]

বাণিজ্য (Trade)—লোহ ও ইস্পাত বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করায় ঐ সকল দেশে ক্রমশঃই শিল্পোন্নতির চেষ্টা হইতেছে। ইহার ফলে যন্ত্রপাতির তথা লোহ ও ইস্পাতের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতি হইয়াছে ; এই সকল দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুন্নত দেশসমূহের শিল্পোন্নতির জন্য বর্তমানে বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য সরবরাহ করিতেছে। এই সকল দেশের শিল্পোন্নতির চরম বিকাশ হইবার পর ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বাজার কিছুটা সংকুচিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

বর্তমানে বেলজিয়াম, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা, ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশ প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য আমদানি করে।

বয়নশিল্প (The Textile Industry)

আদিম যুগে মানুষ বল্কল ও পশুচর্ম বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিত। সভ্যতার বিকাশের সংগে সংগে মানুষ তুলা হইতে সুতা প্রস্তুতের কৌশল এবং বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি আবিষ্কার করিল। প্রথমাবস্থায় মানুষ হাতেই বস্ত্র বয়ন করিত। এখন ভারত ও অন্যান্য দেশে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় ; এইভাবেই প্রস্তুত হইত ঢাকার বিখ্যাত মস্‌লিন ও কেরালার কেলিকো। ক্রমশঃ পশম ও রেশম দিয়াও বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। চীন ও ভারত প্রাচীনকালে রেশমশিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। যান্ত্রিক যুগে বয়নশিল্পে এক বিরাট পরিবর্তন আসিল : বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ ব্রিটেনে নানা প্রকার বয়নযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বৃহদাকার বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল। জলবিদ্যুৎ ও কয়লার সাহায্যে বয়নযন্ত্রাদি চালিত হইল ; বস্ত্রাদিতে রং দেওয়ার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় বস্ত্রের বৈচিত্র্য ও চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইল।

আধুনিক যন্ত্রচালিত বয়নশিল্প প্রথম আরম্ভ হয় ব্রিটেনে। শিল্পবিপ্লবের পর বিভিন্ন বয়ন-যন্ত্রপাতি এই দেশে আবিষ্কৃত হওয়ায় বয়নশিল্প উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৭৩৩ সনে 'ফ্লাই শাটল' আবিষ্কৃত হওয়ার সংগে সংগে **উপর্যুপরি হারগ্রিভের কার্ডিং যন্ত্র, আর্করাইটের ও ক্রমটনের সুতা কাটার যন্ত্র, কার্টরাইটের শক্তিচালিত তাঁত, হুইটনির কার্পাস-বয়ন যন্ত্র, বেলের বস্ত্র ছাপার যন্ত্র, সবই ব্রিটেনে আবিষ্কৃত হয়।** ইহার ফলে **অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ** শতাব্দীতে **এই**

দেশ পৃথিবীতে বয়নশিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই শিল্প যাহাতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে এইজন্য ব্রিটেন বহু বাধা-নিষেধ আরোপ করিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে এবং ফ্রান্স, জার্মানী, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে আধুনিক বয়নশিল্প ক্রমশঃই ছড়াইয়া পড়ে।

বর্তমান শিল্পোন্নত পৃথিবীতে নিম্নলিখিত বয়নশিল্পসমূহ বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে: (১) কার্পাসবয়ন শিল্প, (২) পশমবয়ন শিল্প, (৩) রেশমবয়ন শিল্প ও (৪) রেয়ন শিল্প।

কার্পাসবয়ন শিল্প

(The Cotton Textile Industry)

প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। সম্ভবতঃ ভারতেই এই শিল্পের পত্তন হইয়াছিল। তুলা এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। কিন্তু সুতা রং করিবার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যও এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া শক্তিসম্পদ, সুলভ শ্রমিক প্রভৃতি এই শিল্পের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর্দ্র জলবায়ুতে তুলা হইতে সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত করা যায় বলিয়া পৃথিবীর আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ কার্পাসবয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তুলা এই শিল্পের প্রধান কাঁচমাল বলিয়া তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলেই এই শিল্পের একদেশীভবন হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু তুলার ওজন হাল্কা বলিয়া বহুক্ষেত্রে অন্য দেশ বা অঞ্চল হইতে তুলা আমদানি করিয়া বহু দেশ কার্পাসবয়ন শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স ও জার্মানীর কার্পাসবয়ন শিল্প আমদানীকৃত তুলার উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানতঃ তুলা অঞ্চলেই এই শিল্পের অধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Areas of Production)—সাধারণতঃ তুলা উৎপাদনের সঙ্গে এই শিল্পের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং এই শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে পৃথিবীর তুলা উৎপাদক অঞ্চলগুলির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। তুলা উৎপাদনকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারত এই শিল্পে বর্তমানে উচ্চস্থান অধিকার করে। এই সকল দেশে অত্যধিক চাহিদা বিদ্যমান থাকায় কার্পাসবয়ন শিল্প অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয় নাই।

ইহা বলিলে ভুল হইবে যে, একমাত্র তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলেই কার্পাসবয়ন শিল্প গড়িয়া উঠে। যেহেতু তুলা একটি খাঁটি কাঁচমাল (Pure material) সেইজন্য ইহার উপর নির্ভরশীল শিল্প কাঁচামালের নিকট স্থাপিত না হইয়া বাজারের নিকটেও স্থাপিত হয়। এই কারণে জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইটালি প্রভৃতি দেশে তুলা উৎপন্ন না হইলেও এই শিল্প বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে। জাপানে এক কিলোগ্রাম তুলা উৎপন্ন না হইলেও এই দেশ পৃথিবীতে কার্পাসবস্ত্র উৎপাদনে পঞ্চম স্থান এবং রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। শক্তিসম্পদ, চাহিদা, সুনিপুণ শ্রমিক, যন্ত্রপাতির সরবরাহ, অনুকূল জলবায়ু, মূলধনের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে এই সকল দেশ কার্পাসবয়ন শিল্পে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

পৃথিবীর মোট কার্পাসবস্ত্র উৎপাদন—১৯৮৩-৮৪

চীন	১,৫১,২০০ লক্ষ মিটার	চেকোশ্লাভাকিয়া	৭,৪৮০ লক্ষ মিটার
সোঃ রাশিয়া	৮১,৪৩২ লক্ষ মিটার	পোল্যান্ড	৭,৩৯২ „ „
ভারত	৭৭,৪৩৬ „ „	দঃ কোরিয়া	৪,৪২০ „ „
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২২,৩৫৬ „ „	যুগোশ্লাভিয়া	৩,৭৯২ „ „
জাপান	২০,৭৮৪ „ „	বুলগেরিয়া	৩,৬৬০ „ „
মিশর	৮,৩৪০ „ „	পাকিস্তান	৩,১০৮ „ „
হংকং	৭,৬৩২ „ „	পঃ জার্মানী	২,৯৭৬ „ „
রোমানিয়া	৭,৪৭৬ „ „	হাঙ্গেরী	২,৮২০ „ „

(Source : U.N.O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1985)

চীন—প্রাচীন সভ্যতার যুগেও চীন বয়নশিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সেই সময় হস্তচালিত তাঁতে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্মানীর শিল্পপতিগণ এই দেশের সাংহাই অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্প স্থাপন করে। ইহার মধ্যে জাপানের

পৃথিবীর কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদন

অংশ ছিল প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। স্থানীয় অপর্যাপ্ত তুলা, সুনিপুণ শ্রমিক, প্রচুর চাহিদা, সুলভ জলপথ ও খালপথ এই দেশের কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার ফলে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্ভবতঃ বর্তমানে এই দেশ কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশের উত্তরাংশে ও মধ্যাংশে অধিকাংশ তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়া সাংহাই, নানকিন, হ্যাঙ্কাও ও তিয়েনসান অঞ্চলে এই শিল্প সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ কার্পাসবয়ন-শিল্পকেন্দ্র সমুদ্রতীরে বন্দরের নিকট অবস্থিত বলিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। বর্তমানে কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানিতে এই দেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

সোভিয়েত রাশিয়া—তুলা-উৎপাদনে এবং কার্পাসবয়ন শিল্পে এই দেশ **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। এই দেশের কাজাকস্তান, ট্রান্স ককেশাস্ ও মধ্য রাশিয়ায় অধিকাংশ তুলা পাওয়া গেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সোভিয়েত রাশিয়ায় কার্পাসবয়ন শিল্প প্রথমে গড়িয়া ওঠে তুলা-উৎপাদক অঞ্চল হইতে বহু-দূরে মস্কো, আইভানভ, লেনিনগ্রাড ও কালিনিন অঞ্চলে ; এই সকল স্থানের সুলভ ও নিপুণ শ্রমিক, শক্তিসম্পদ, উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা এবং সরকারী উদ্যোগ কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। পূর্বে এই সকল স্থানে দেশের শতকরা ৯৩ ভাগ কার্পাসবস্ত্র উৎপন্ন হইত, কিন্তু বর্তমানে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে পশ্চিম সাইবেরিয়ার বার্নাউলে, ককেসাস পর্বতের দক্ষিণে আজারবাইজান, লেনিনাকান ও কাইরভ-আবাদে এবং এশীয় রাশিয়ার দক্ষিণাংশের তাশখন্দ ও ফারঘানা **অঞ্চলে এই শিল্পের উন্নতি** হইয়াছে।

ভারত—প্রাচীন যুগ হইতে ভারত কার্পাস-বয়ন শিল্পে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। পূর্বে কুটিরশিল্প হিসাবে হস্তচালিত তাঁতে অধিকাংশ বস্ত্র উৎপন্ন হইত। তাঁতে প্রস্তুত ঢাকার 'মস্‌লিন' ও কেরালার 'কেলিকো' জগদ্বিখ্যাত ছিল। এখনও ভারতে কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনে হস্তচালিত তাঁতশিল্প উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ রাজত্বে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় এই দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইত। তদানীন্তন সরকার এই দেশের তাঁতশিল্পের ক্ষতিসাধনের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিলেও এই শিল্পের বিশেষ কোনো ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই। ১৮১৮ সালে ভারতে প্রথম আধুনিক যন্ত্রচালিত কার্পাসবয়ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ১৮৫১ সালের পূর্বে এই শিল্পের বিশেষ কোনো উন্নতি হয় নাই। বর্তমানে তুলা-উৎপাদক অঞ্চলেই (মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু) এই দেশের অধিকাংশ কার্পাসবয়ন শিল্প অবস্থিত। ইহার মধ্যে বোম্বাই, আমেদাবাদ, কোয়েম্বাটুর এই শিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, দিল্লী, কেরালা, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যেও এই শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে কার্পাসবস্ত্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে। দেশের চাহিদা মিটাইয়াও ভারত রপ্তানি বাণিজ্যে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দেশের কার্পাসবয়ন শিল্প ব্রিটেন অপেক্ষা নূতন হইলেও বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশের দরুন বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। উৎকৃষ্ট তুলা, শক্তি-সম্পদের প্রাচুর্য, আর্দ্র জলবায়ু, বন্দরের নৈকট্য, জলপথে ও রেলপথে পরিবহণের সুব্যবস্থা, সুনিপুণ ও সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য এখানকার কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল দেশ বলিয়া এখানে কার্পাসবস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের কর্তৃত্ব বিরাজমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শিল্প প্রথম গঠিত হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় সামুয়েল স্লাটার নামক একজন ইংরেজ শ্রমিক ব্রিটেনের সকল প্রকার বাধানিষেধকে ফাঁকি দিয়া নিউ ইংল্যান্ডে আসে এবং নিজস্ব স্মৃতিশক্তি হইতে কার্পাসবয়ন-যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে। এখানকার জলবায়ু শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং

কার্পাসবয়নে সাহায্য করে। মেক্সিকো, ব্রাজিল ও এই দেশের দক্ষিণাংশের তুলা-বলয় হইতে এখানে তুলা আমদানি করা হয়। সুলভ কৃষিজমি ক্রমশঃ কারখানায় রূপান্তরিত হয়। এই শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ, কানাডা, এমন কি ব্রিটেন হইতে বহু দক্ষ তাঁতী উচ্চহারের মজুরির লোভে এখানে চলিয়া আসে। স্থানীয় সুলভ জলবিদ্যুৎ প্রথমাবস্থায় এখানকার শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইভাবে নিউ ইংল্যান্ডের কার্পাসবয়ন শিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠে। **১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল মার্কিন** যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্র উৎপাদক অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইত। ইউরোপের দক্ষ তাঁতীদের আগমনের ফলে এই অঞ্চল **উৎকৃষ্টশ্রেণীর কাপড়ের জন্য** জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠে।

১৯২৯ সালের পর হইতে এই দেশের দক্ষিণাংশের তুলা-বলয়ে উৎপন্ন প্রচুর তুলার সাহায্যে **দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে (জর্জিয়া, আলাবামা, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা,** টেনেসি ও ভার্জিনিয়া রাজ্য) ক্রমশঃ কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতি হয়। স্থানীয় নিগ্রো-শ্রমিককে দিয়া অধিকতর সময় অল্প মজুরিতে **কাজ করানো সম্ভব।** কার্পাসবয়নে তুলা **এবং** শ্রমিকের মজুরি মোট উৎপাদন খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে; দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে এই দুইটিই অত্যন্ত সুলভ। দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা এবং টেনেসি অঞ্চলের সুলভ জলবিদ্যুৎ এখানকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অধিকতর মুনাফার লোভে মূলধনের অভাব সেখানে দেখা যায় নাই। এখানকার শিল্পের উন্নতির জন্য স্থানীয় কর অত্যন্ত কম ছিল বা মোটেই ছিল না। সুলভ জমির কোনো অভাব দেখা যায় নাই। ইহা ছাড়া উত্তরাংশের চেয়ে এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত গরম বলিয়া কার্পাস-বস্ত্রের স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। আমেরিকার এই অঞ্চল হইতে কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানি করা সহজ। এই সকল কারণে কার্পাসবয়ন শিল্প বহুলাংশে নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চল হইতে এই অঞ্চলে সরিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮০ ভাগ কাপাসবস্ত্র এই অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু একথা মনে করা ভুল হইবে যে, নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে এই শিল্পের অস্তিত্ব মোটেই থাকিবে না। নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে যে ধরনের দক্ষ তাঁতী আছে তাহা এই দেশের অন্য কোথাও নাই। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রাদি উৎপাদনে নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অদ্যাপি বজায় আছে।

জাপান—জাপানে প্রয়োজনীয় তুলা পাওয়া না গেলেও এক সময় এই দেশ কার্পাসবয়ন শিল্পে **শ্রেষ্ঠ স্থান** অধিকার করিয়াছিল। উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি, সুলভ ও নিপুণ স্ত্রী-শ্রমিক, আর্দ্র জলবায়ু, উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা, সুলভ জলবিদ্যুৎ নিকটবর্তী বন্দর ও সরকারের সহায়তার জন্য জাপান এই শিল্পে এখনও পৃথিবীতে **পঞ্চম স্থান** অধিকার করে। এই দেশে ছোটখাটো কুটিরশিল্পে বস্ত্রবয়নের সুবন্দোবস্ত আছে। বড় বড় কারখানায় সুতা প্রস্তুত হয় এবং এই সকল কুটিরশিল্পে সরবরাহ করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পুনরায় জাপান এই শিল্পের উন্নতিসাধনে সক্ষম হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মিশর হইতে বর্তমানে প্রচুর তুলা এই দেশে আমদানি হইয়া থাকে। ওসাকা এই দেশের শ্রেষ্ঠ কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্র; এইজন্য ওসাকা 'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাছাড়া কোবে, নাগোয়া এবং টোকিও অঞ্চলেও

এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। চীন ও ভারত ভিন্ন পূর্ব এশিয়ার অন্য কোনো দেশে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় জাপান এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানি করে। বস্ত্র রপ্তানিতে জাপান পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকরা করে।

পশ্চিম জার্মানী—যন্ত্রশিল্পে এই দেশ উন্নতিলাভ করায় আমদানীকৃত তুলা ও স্থানীয় সুনিপুণ শ্রমিকের সাহায্যে এই দেশে কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ব্রিটেনে যখন এই শিল্প অধোগতির দিকে যাইতেছিল সেই সময় ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডে এই শিল্পের ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। রূঢ় অঞ্চলের কয়লা এবং রাইন ও এলব্ নদীর জলপথ জার্মানীর কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। রূঢ় অঞ্চলের বার্মেন ও এলবারফিল্ড এই দেশের প্রধান কার্পাস শিল্পকেন্দ্র।

ফ্রান্স—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানীকৃত তুলার সাহায্যে এই দেশের কার্পাসবয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে সূক্ষ্ম সূতায় কাজ বেশী হয় বলিয়া উৎকৃষ্ট বিলাস-বস্ত্রাদি উৎপাদনে ফ্রান্সের সুনাম আছে। আলসাস অঞ্চলের মুলহাউস এবং ভোজ, উত্তরাঞ্চলের কয়লাখনি অঞ্চলে লীলে ও রুবে এবং সীন নদীর তীরে অবস্থিত রুঁয়ে শহর এই দেশের প্রধান কার্পাস শিল্পকেন্দ্র।

ব্রিটেন—সর্বপ্রথম বয়ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় ব্রিটেনে। ইহা ছাড়া ব্রিটেনের বিশাল সাম্রাজ্য (ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি) হইতে প্রচুর তুলা পাওয়া যাইত। উপনিবেশসমূহে বস্ত্রাদির প্রচুর চাহিদা ছিল। স্থানীয় আর্দ্র জলবায়ু ও কয়লার অপর্যাপ্ত সরবরাহ এই শিল্পের উন্নতিতে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। এই সকল কারণে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বৎসর এই দেশ কার্পাসবয়ন শিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটেন পৃথিবীর মোট বস্ত্র-রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগ সরবরাহ করিত। দুইটি যুদ্ধের আঘাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতিযোগিতা, শ্রমিকের মজুরিবৃদ্ধি এবং সর্বশেষে উপনিবেশসমূহ হারাইবার ফলে বর্তমানে কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনে পৃথিবীতে ব্রিটেনের স্থান অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় সুনিপুণ শ্রমিকের সাহায্যে এখনও সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির উৎপাদনে ব্রিটেনের খ্যাতি বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও ব্রাজিল বর্তমানে এই দেশে তুলা সরবরাহ করে। ল্যাঙ্কাশায়ারের ম্যাঞ্চেস্টার অঞ্চলে কার্পাসবয়নের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান থাকায় প্রধানতঃ এই অঞ্চলেই এই দেশের কার্পাস-শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে।

পোল্যান্ড, রোমানিয়া, মিশর, পূর্ব জার্মানী, কানাডা, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—কার্পাস বস্ত্র রপ্তানিতে জাপান বর্তমানে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহার পরেই ভারতের স্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বর্তমানে চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশমবয়ন শিল্প (The Woolen Industry)

প্রাচীনকালে কুটীর শিল্প হিসাবে পশমবয়ন-শিল্পের সৃষ্টি হইলেও শিল্প-বিপ্লবের পর যন্ত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। কার্পাসবয়ন-শিল্পে যন্ত্রপাতি প্রচলনের পরও বহুদিন পর্যন্ত হস্তচালিত তাঁতে পশমবস্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ পশমবস্ত্র আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশের লোক শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশমবস্ত্র ব্যবহার করে। সেইজন্য ইউরোপ, জাপান ও উত্তর আমেরিকায় ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী।

পশমবয়ন শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শিল্প পশম উৎপাদনকারী দেশে উন্নতি-লাভ না করিয়া শিল্পপ্রধান চাহিদাযুক্ত অঞ্চলে উন্নতিলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহে (অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকা) পৃথিবীর অধিকাংশ পশম উৎপন্ন হয়। ইহারা পৃথিবীর মোট পশম রপ্তানির শতকরা ৯৮ ভাগ সরবরাহ করে। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া এই সকল দেশে পশম বস্ত্রের চাহিদাও বেশী। ইহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কারণে এই সকল দেশে পশমবয়ন-শিল্প উন্নতিলাভ না করিয়া উত্তর গোলার্ধের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে :

প্রথমতঃ, আয়তনের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধের পশম-উৎপাদনকারী দেশসমূহে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম এবং চাহিদাও বেশী নহে। ইহা ছাড়া, শ্রমিকের অভাবে এখানে শ্রমশিল্প চালানো কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ গোলার্ধের এই সকল দেশে শিল্প গঠিত না হইবার সর্বপ্রধান কারণ এই যে, পশম একটি "খাঁটি কাঁচামাল" (Pure material) ; অর্থাৎ এই কাঁচামালটি শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত হইবার পরেও ইহার ওজন বিশেষ কমিয়া যায় না। সুতরাং যখন এই জিনিসটিকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করিয়া শেষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পাঠাইতেই হইবে, তখন কাঁচা পশমরূপে বা শিল্পজাত দ্রব্যরূপে পাঠানো প্রায় একই কথা। সেইজন্য শিল্পগঠনের স্থানীয় অসুবিধা থাকায় শিল্পোন্নত দেশে কাঁচা পশম পাঠাইয়া সেখানে শিল্পগঠন করাই সুবিধাজনক।

তৃতীয়তঃ, বয়ন-যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী দেশসমূহ এই সকল দেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া ভারি যন্ত্রপাতি আমদানি করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। ইহা অপেক্ষা হালকা পশম রপ্তানি করা কম ব্যয়সাধ্য।

চতুর্থতঃ, পশম বহুদিন গুদামজাত করিয়া রাখিলেও নষ্ট হইবার ভয় নাই। সুতরাং ইহা প্রয়োজনমত রপ্তানি করা যায় এবং জাহাজে বেশীদিন থাকিলেও ক্ষতি হয় না ; সেইজন্য ইহা বহুদূরবর্তী দেশেও পাঠানো যায়।

পঞ্চমতঃ, দক্ষিণ গোলার্ধের পশম-উৎপাদনকারী দেশগুলির উপর ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকার ফলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের দেশ-সমূহের শিল্পোন্নতির জন্য ইহারা পশম রপ্তানি করিতে বাধ্য হয়।

এই সকল কারণে পাশ্চাত্য শক্তিশালী দেশসমূহে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি) এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। শীতপ্রধান

দেশ বলিয়া এখানে পশম-বস্ত্রের অপর্যাপ্ত চাহিদা বিদ্যমান। স্থানীয় কর্মঠ ও সুনিপুণ শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতি এই সকল দেশে এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে।

ইহা ছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়াও এই শিল্পে খুবই উন্নতিলাভ করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রচুর পশম উৎপন্ন হয় বলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধের পশমের উপর এই দেশের পশমবয়ন শিল্প নির্ভরশীল নহে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—পশমবয়ন-শিল্পে সাধারণতঃ উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর পশমবস্ত্র উৎপাদন—(১৯৮৩-৮৪)

সোঃ রাশিয়া	৯,৭২৮ লক্ষ মিটার	ফ্রান্স	৮৬৩ লক্ষ মিটার
জাপান	৩,০১৮ ,, ,,	দঃ কোরিয়া	৬৪৭ ,, ,,
ব্রিটেন	৯৯৭ ,, ,,	চেকোশ্লোভাকিয়া	৬১৪ ,, ,,
পোল্যাণ্ড	৯৮৪ ,, ,,	বুলগেরিয়া	৩৬৮ ,, ,,
যুগোশ্লাভিয়া	৯৬৭ ,, ,,	পূর্ব জার্মানী	২৬৮ ,, ,,

Source: U.N.O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1985

সোভিয়েত রাশিয়া—মেষপালনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশে যন্ত্রপাতি ও নিপুণ শ্রমিকের অভাব নাই। কয়লা, জলবিদ্যুৎ ও খনিজ

পৃথিবীর পশম-বস্ত্র-উৎপাদন

তৈল অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া পশমী দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এই সকল কারণে পশমবয়ন শিল্পে এই দেশ বর্তমানে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ গোলার্ধের পশমের উপর সোভিয়েত রাশিয়া নির্ভরশীল নহে। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্পের প্রসার হইয়াছে। তন্মধ্যে মস্কো, লেনিনগ্রাড, কাজাকস্তান, ইউক্রেন, ককেসাস্ প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাপান—বয়নশিল্পে জাপান বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। পশমবয়ন শিল্পে বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। জাপানের ওসাকা ও আইচিতে এই শিল্প বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে। স্থানীয় সুলভ ও সুদক্ষ শ্রমিক এই শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ।

ব্রিটেন—ব্রিটেনের পশমবয়ন একটি পুরাতন শিল্প। পূর্বে হস্তচালিত তাঁতে পশম-বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে এই দেশের পশমবয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। নিকটবর্তী পেনাইন অঞ্চলের স্বচ্ছ জল, স্থানীয় কয়লা ও সুনিপুণ শ্রমিক, পেনাইন অঞ্চলের পশম এবং যানবাহনের সুবন্দোবস্তের জন্য ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে এই শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, ও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তথাকার ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া ব্রিটেনের পক্ষে ঐ সকল দেশ হইতে পশম সংগ্রহ করা খুবই সহজ। শীতপ্রধান সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া স্থানীয় চাহিদাও অত্যন্ত বেশী। ইয়র্কশায়ারের ব্র্যাডফোর্ড, হালিফাক্স, লীডস্, হাডার্সফিল্ড, ডিউস্‌বেরী প্রভৃতি শহর পশমবয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত ইহা ছাড়া, ল্যাঙ্কাশায়ার, ওয়েলস্, আয়ারল্যান্ড ও লিস্টারশায়ার অঞ্চলেও এই শিল্প অল্পবিস্তর উন্নতিলাভ করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—পশমবয়ন-শিল্পের উন্নতির উপযোগী অবস্থা এই দেশে বিদ্যমান থাকায় যথেষ্ট পরিমাণে পশম পাওয়া না গেলেও এই দেশ পশম-বস্ত্র উৎপাদনে পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই দেশের অধিকাংশ পশম উৎপন্ন হয় দেশের পশ্চিমাংশে। অবশ্য স্থানীয় পশম দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সেইজন্য আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হইতে এই দেশে প্রচুর পরিমাণে পশম আমদানি হয়। এইজন্য পূর্বাংশের দক্ষিণ পেনসিলভেনিয়া, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, নিউ ইংল্যান্ড ও মেইন রাজ্যে বন্দরের নিকটে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। এই দেশের শতকরা ৮০ ভাগ পশম-বস্ত্র এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়; ইহার মধ্যে প্রায় অর্ধেক পশমবস্ত্র উৎপাদিত হয় নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে। স্থানীয় আর্দ্র জলবায়ু, কয়লা ও জলবিদ্যুতের সরবরাহ, বন্দরের নৈকট্য ও বয়ন-যন্ত্রপাতির সরবরাহ এখানকার শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। ইহা ছাড়া, দক্ষ ইংরেজ তাঁতীগণ নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিবার ফলে সুনিপুণ শ্রমিকের কোনো অভাব হয় নাই। শীতপ্রধান সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া এই দেশে পশমবস্ত্রের প্রচুর চাহিদা বিদ্যমান। ফিলাডেলফিয়া ও ক্লীভল্যান্ড এই দেশের শ্রেষ্ঠ পশম-শিল্প কেন্দ্র।

ফ্রান্সের রুয়ে, রীম্‌স ও লীলে অঞ্চলে এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। পঃ জার্মানী এই শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই দুইটি দেশ আমদানীকৃত পশমের উপর নির্ভরশীল। চীনের সাংহাই অঞ্চলে, ভারতের কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, ইটালি, স্পেন, যুগোশ্লাভিয়া ও তুরস্কে এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ গোলার্ধের পশম উৎপাদনকারী দেশেও (অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা) এই শিল্প অল্পবিস্তর গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া অল্প পরিমাণে পশমবস্ত্র ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ইটালি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রেশমবয়ন শিল্প

(The Silk Industry)

গুটিপোকার লালা হইতে রেশম প্রস্তুত হয়। গুটিপোকার প্রধান খাদ্য তুঁত গাছের (Mulberry) পাতা। সুতরাং রেশমের উৎপাদন প্রধানতঃ নির্ভর করে তুঁত গাছের উৎপাদনের উপর। গুটিপোকার লালা হইতে রেশম প্রস্তুত করিতে প্রচুর সুনিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন। রেশম-প্রস্তুতের মোট খরচের শতকরা ৪০ ভাগ শুধু শ্রমিকের মজুরির জন্য ব্যয় হয়। কার্পাস ও পশমবয়নের অনেক পরে রেশম-বয়ন আরম্ভ হয়। রেশমবয়নের জন্য প্রয়োজন ধৈর্যশীল ও নিপুণ শ্রমিক। রেশমবস্ত্র উৎপাদনের মোট খরচের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ব্যয় হয় রেশমের মূল্য ও শ্রমিকের মজুরির জন্য। পূর্বে কুটিরশিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিলেও বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রেশমবয়ন-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে রেশমবস্ত্র উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত ; কিন্তু রেয়ন আবিষ্কারের পর ইহার মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ক্রমশঃ রেয়নের সঙ্গে রেশমবস্ত্রকে অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—রেশম অত্যন্ত হালকা বলিয়া ইহার পরিবহণ খরচ খুবই কম। সেইজন্য রেশম আমদানি করিয়া এই শিল্পের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য। পৃথিবীর অধিকাংশ রেশম জাপান ও চীনে উৎপন্ন হয়। ইটালি, ফ্রান্স, তুরস্ক, সিরিয়া ও স্পেনেও রেশম উৎপন্ন হয়। জাপান ও চীনের অধিকাংশ রেশম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি হইয়া থাকে। হালকা কাজ বলিয়া রেশমবয়ন-শিল্পে সর্বত্রই সুলভ স্ত্রী-শ্রমিক নিযুক্ত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক কিলোগ্রাম রেশম উৎপন্ন না হইলেও এই দেশ রেশমবয়ন-শিল্পে পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। জাপান হইতে এই দেশে নিউ ইয়র্ক বন্দর মারফত প্রচুর রেশম আমদানি হয়। এইজন্য নিউ ইয়র্কের নিকটবর্তী রাজ্য-সমূহে এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। স্থানীয় শ্রমিক বয়নশিল্পে নিপুণতার পরিচয় দেয়। অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা ও স্থানীয় জলবিদ্যুৎ এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করে। এই দেশে সমৃদ্ধিশালী লোকের অভাব না থাকায় রেশম-বস্ত্রের চাহিদা প্রচুর। পেনসিলভেনিয়া, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক ও নিউ ইংল্যান্ড রাজ্যে এই শিল্প সর্বাধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। নিউ জার্সির প্যাটারসন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেশমবয়ন-শিল্পকেন্দ্র।

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ রেশমবয়ন-শিল্পে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে ; এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে সুলভ ও সুনিপুণ স্ত্রীশ্রমিক, শক্তি সম্পদের সরবরাহ, সমৃদ্ধিশালী দেশ হওয়ায় অপর্যাপ্ত চাহিদা, সরকারের শিল্প-সংরক্ষণ নীতি প্রভৃতি। ইটালি ও ফ্রান্সে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। চীন ও জাপান হইতেও এখানে প্রচুর রেশম আমদানি হইয়া থাকে। ইটালির মিলান এবং ফ্রান্সের লিয়ঁ এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশেও এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুইজারল্যান্ড স্থানীয় সুলভ জলবিদ্যুৎ ও সুনিপুণ শ্রমিকের সাহায্যে এই শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে; জুরিখ এই দেশের শ্রেষ্ঠ রেশমবয়ন-শিল্পকেন্দ্র। জার্মানীর

রাইন উপত্যকায় ও স্যাক্সনী অঞ্চলে এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে; ক্রেফেল্ড এই দেশের শ্রেষ্ঠ রেশমবয়ন-শিল্পকেন্দ্র। ব্রিটেনের পেনাইন অঞ্চলের নিকটস্থ কার্পাস ও পশমবয়ন কেন্দ্রে এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রাচ্যের দেশসমূহে প্রাচীনকাল হইতেই কুটীরশিল্পের মাধ্যমে প্রচুর রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই সকল দেশের মধ্যে জাপান, চীন ও কোরিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও এই সকল দেশে হস্তচালিত তাঁতে উৎকৃষ্টশ্রেণীর রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হয়। স্থানীয় রেশমের উৎপাদন প্রচুর; এই সকল দেশের শ্রমিক অত্যন্ত সুলভ ও নিপুণ। জাপানের মধ্যাংশে এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। বর্তমানে রেয়ন-বস্ত্রের সঙ্গে রেশম-বস্ত্র প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না বলিয়া এই সকল দেশে, বিশেষতঃ জাপানে রেশমবয়ন-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জাপানে এখনও রেশম-বস্ত্র সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়। ভারতে কুটীরশিল্প হিসাবে এই শিল্প কিছুটা উন্নতিলাভ করিয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—ফ্রান্স, ইটালি, জাপান ও চীন স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও প্রচুর রেশম-বস্ত্র রপ্তানি করিতে সক্ষম। ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ রেশম-বস্ত্রের প্রধান আমদানিকারক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে রেশম-বস্ত্র আমদানি করে।

কৃত্রিম রেশমবয়ন শিল্প

[The Rayon Industry]

গুটিপোকা হইতে রেশমের উৎপাদন নিরীক্ষণ করিয়া মানুষ কৃত্রিম উপায়ে রেশম প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্প্রুস ও পাইন গাছের কাষ্ঠমণ্ড অথবা তুলার মণ্ড হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন প্রস্তুত করা হয়। রেশম দ্রব্য হইতে ইহার মূল্য অনেক কম। অনেক সময় পশম অথবা রেশমের সহিত ইহা মিশাইয়া বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হয়; যেখানে কাষ্ঠমণ্ড বা তুলা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি সহজে পাওয়া যায়, সেইখানেই এই শিল্প গড়িয়া উঠা সম্ভব। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হয় বলিয়া এই শিল্পের জন্য প্রচুর মূলধন ও নিপুণ শ্রমিক প্রয়োজন।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—১৮৯৫ সালে ফ্রান্সে প্রথম রেয়ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে এই শিল্প পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখন পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে ইহা যথেষ্ট উৎপন্ন হয়; সর্বাপেক্ষা বেশী রেয়ন-বস্ত্র উৎপন্ন হয় সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

পৃথিবীর মোট রেয়নবস্ত্র উৎপাদন—১৯৮৩-৮৪

সোঃ রাশিয়া	১০,৯১৬ লক্ষ মিটার	পঃ জার্মানী	৪৮৬ লক্ষ মিটার
ভারত	১০,৩৯৪ " "	হাঙ্গেরী	৩৬৪ " "
জাপান	৭,৭৫০ " "	দঃ কোরিয়া	৩৬০ " "
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৪,১৪০ " "	যুগোশ্লাভিয়া	৩৪৯ " "

Source : U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics. March, 1985

সোভিয়েত রাশিয়া বর্তমানে রেয়ন বস্ত্রের উৎপাদনে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। অপর্যাপ্ত কাষ্ঠসম্পদ এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। মস্কো এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

ভারত রেয়ন উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। এই দেশে নরম কাঠ, তুলা, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি কাঁচামাল প্রচুর পাওয়া যায়। কার্পাসবয়ন শিল্পে উন্নত থাকায় ভারতে রেয়ন-শিল্প গঠনের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। তাহা ছাড়া রেয়ন-বস্ত্রের চাহিদাও ভারতে প্রচুর। বোম্বাই, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।

জাপান রেয়ন-শিল্পে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার সুলভ ও নিপুণ স্ত্রী-শ্রমিক, বনভূমির সরলবর্গীয় কাষ্ঠ, কার্পাসবয়ন শিল্পের পরিত্যক্ত তুলা এবং স্থানীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও চাহিদা এই শিল্পে উন্নতির প্রধান কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, নরওয়ে ও কানাডা হইতে কাঠ এবং ভারত ও চীন হইতে তুলা এই শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয়। হনসু দ্বীপের রেশমবয়ন-শিল্পের নিকটেই রেয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রেয়ন-বস্ত্র রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশসমূহে এখানকার রেয়ন-বস্ত্র রপ্তানি হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া এখানে রাসায়নিক দ্রব্যের কোনো অভাব নাই ; স্থানীয় তুলা ও কাষ্ঠসম্পদ প্রচুর। সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া রেয়ন-বস্ত্রের চাহিদাও প্রচুর। স্থানীয় শ্রমিক রেয়ন-শিল্পে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দেয়। এই দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে তুলাবলয়ের নিকটেই এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। টেনেসি, ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনা ও পেনসিলভেনিয়া রেয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার কার্পাসবয়ন শিল্পে পরিত্যক্ত তুলা এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে রেয়ন-বস্ত্র উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

ইউরোপের দেশসমূহে রেয়ন-শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। এখনও পৃথিবীর মোট রেয়নের শতকরা ৩৫ ভাগ এই মহাদেশে উৎপন্ন হয়। সমৃদ্ধিশালী বলিয়া এখানকার দেশসমূহে রেয়ন-বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। রেয়ন-শিল্পের প্রথম পত্তন হওয়ায় রেয়ন-প্রস্তুতের কারিগরি জ্ঞানে এই সকল দেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইউরোপের রেয়ন উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে **ব্রিটেন, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, ইটালি ও ফ্রান্স** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর্যাপ্ত কাষ্ঠসম্পদ, রাসায়নিক দ্রব্য, সুলভ স্ত্রী-শ্রমিক, কয়লা ও জলবিদ্যুৎ এবং স্থানীয় চাহিদার প্রাচুর্য এখানকার শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ।

বাণিজ্য (Trade)—রেশম-বস্ত্র অপেক্ষা রেয়ন-বস্ত্র অনেক সুলভ বলিয়া সাধারণ লোক ইহা কিনিতে পারে। রেয়ন-বস্ত্রের পোশাক সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এইজন্য ইহার চাহিদা সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপান তাহার মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক বিদেশে রপ্তানি করিয়া রেয়ন-বস্ত্র রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাট শিল্প

(The Jute Industry)

প্রাচীনকালে পাট-চাষ বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই ; কারণ, সেই সময় পাটের বিশেষ কোনো মূল্য ছিল না। শুধু গৃহস্থের বাড়িতে টাকুতে পাটের মোটা সূতা কাটিয়া দড়ি প্রস্তুত করা হইত। ক্রমশঃ হস্তচালিত তাঁতে চট প্রস্তুত করা হইতে লাগিল। পরে কুটিরশিল্প হিসাবে ইহার উন্নতি হইল এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইতে লাগিল। শতাধিক বৎসর পূর্বেও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষ হইতে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইত। ১৮০৫ সালে ব্রিটেনের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানি করিয়া ডান্ডি শহরে পাটশিল্প গড়িয়া তোলে এবং এমনকি ভারতবর্ষেও পুনরায় ডান্ডির পাটজাত দ্রব্য পাঠাইতে শুরু করে। অবশ্য ভারতবর্ষ তখন ইংরেজের অধিকারে ছিল বলিয়া উহা সম্ভব হইয়াছে। ডান্ডির উন্নত ধরনের পাটশিল্পের সঙ্গে ভারতের কুটিরশিল্প প্রতিযোগিতায় হারিয়া গেল। তারপর এই দেশেও ১৮৫৫ সালে আধুনিক পাটকলের প্রতিষ্ঠা হইল।

পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপক। পূর্বে পাট দ্বারা শুধু চট, থলে, দড়ি, সূতা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত ; কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাট হইতে অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত হয়। অবশ্য এখনও পাট-জাত দ্রব্যের মধ্যে থলেই প্রধান। কারণ, থলেতে বিভিন্ন সামগ্রী বস্তাবন্দী করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠান সহজসাধ্য। নূতন পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পেট, কম্বল, বিছানা, ত্রিপল, উৎকৃষ্ট দড়ি, কাপড়-জামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Areas of Production)—সাধারণতঃ পাট উৎপাদন-কারী দেশেই পাট-বয়নশিল্প গড়িয়া উঠে। ২১১ পৃষ্ঠার মানচিত্রে পাট-উৎপাদন-কারী দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, ভারত ও বাংলা-দেশে অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হয়। সেইজন্য পাটশিল্প এই দুইটি দেশেই প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারত—ভারত পাটশিল্পে পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলেই অধিকাংশ পাটশিল্প অবস্থিত। স্থানীয় পাট হইতে অধিকাংশ পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্টশ্রেণীর পাটজাত দ্রব্যের জন্য বাংলাদেশ হইতে কিছু পরিমাণে উৎকৃষ্টশ্রেণীর পাট আমদানি করিতে হয়। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতেও এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। [ভারতের পাটশিল্প সম্বন্ধে এই পুস্তকের ভারত-অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।]

বাংলাদেশ—এই দেশে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টশ্রেণীর পাট উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে পূর্ববঙ্গে পাটবয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। পূর্ববঙ্গের পাট কলিকাতায় আনিয়া হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত বিভিন্ন পাটকলে পাঠানো হইত ; ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে পাটবয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৪টি পাটকল আছে। ইহার অধিকাংশই চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ

পাটকল সরকারী সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছে। দেশের চাহিদা মিটাইয়া বাংলাদেশ প্রচুর পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। বৈদেশিক বাজারে ভারতের পাটশিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। বাংলাদেশের পাটবয়ন-শিল্পে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এবং উৎকৃষ্টশ্রেণীর পাট ব্যবহৃত হয় ; সেইজন্য এখানকার পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের চেয়ে কম। এই দেশে কয়লার অভাব থাকায় এই শিল্প ভারতের কয়লার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এই দেশের পাটশিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে।

ব্রিটেন—বাংলাদেশ ও ভারত হইতে পাট আমদানি করিয়া এখনও ডান্ডি ও বার্নস্লে শহরে পাটবয়ন শিল্প টিকিয়া আছে। এখানে পাটশিল্প পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া এবং স্থানীয় শ্রমিক এই শিল্পে সুনিপুণ হওয়ায় এখানে এখনও উৎকৃষ্টশ্রেণীর পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

ভারত, বাংলাদেশ ও ব্রিটেন ছাড়া চীন, ফ্রান্স, ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, স্পেন ও জাপানে পাটবয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশ হইতে আমদানীকৃত পাট দ্বারা এই সকল দেশে পাটজাত সামগ্রী প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্য (Trade)—পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে ভারত **প্রথম স্থান** এবং বাংলাদেশ **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। ভারতের কলিকাতা বন্দর এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর মারফত এই দুই দেশের পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা অধিক পাটজাত দ্রব্য আমদানি করে। ইহা ছাড়া ব্রিটেন, কানাডা, সোভিয়েত রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ পাটজাত দ্রব্য আমদানি করে।

কাগজ শিল্প
(The Paper Industry)

চীনদেশে ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ছেঁড়া কাপড় হইতে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। ইহার পর ইউরোপেও এইভাবে কাগজ প্রস্তুত হইতে থাকে। ক্রমে জার্মানীতে পুরাতন বস্ত্র ও কাষ্ঠমণ্ডের মিশ্রণে এবং ব্রিটেনে ঘাসের সাহায্যে কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। ১৮৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধু কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ কাষ্ঠমণ্ড হইতে প্রস্তুত হয় ; পুরাতন কাপড় ও চট, তুলা, ধানের খড়, ইক্ষুর ছোবড়া, সাবাই ঘাস প্রভৃতির সাহায্যে বাকী ১০ ভাগ কাগজ প্রস্তুত হয়। কাগজ শিল্পে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Areas of Production)—কাগজ-শিল্পের উপযোগী সকল প্রকার অবস্থা প্রধানতঃ পৃথিবীর দুইটি অঞ্চলে বিদ্যমান—উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং উত্তর ইউরোপের সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানী, ব্রিটেন, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—হ্রদ অঞ্চলের সুলভ জলবিদ্যুৎ ও পরিবহণ-ব্যবস্থা, স্থানীয় নিপুণ শ্রমিক, দেশের উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি এই দেশের কাগজ-শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। বিদেশে কাগজ রপ্তানির সুযোগ

থাকায় এবং উৎপাদক অঞ্চলের নিকটেই বন্দর গড়িয়া উঠায় কাগজ বিক্রয়ে মোটেই অসুবিধা হয় না। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগ কাগজ উৎপন্ন করিয়া কাগজ-উৎপাদনে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। উৎপাদনের তুলনায় কাষ্ঠমণ্ড কম থাকায়, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হইতে এই দেশে কাষ্ঠমণ্ড আমদানি করা হয়।

সোভিয়েত রাশিয়া—এই দেশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিতে প্রচুর নরম কাঠ পাওয়া যায় বলিয়া এখানে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয়। জলবিদ্যুৎ ও রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহের সুবন্দোবস্ত, সুনিপুণ ও কর্মঠ শ্রমিকের সরবরাহ এবং সরকারী সাহায্যের দরুন এই দেশ কাগজ উৎপাদনে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে **প্রথম স্থান** অধিকার করিয়াছে। লেনিনগ্রাড অঞ্চলে কাগজের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী।

কানাডা—হ্রদ অঞ্চলের সুলভ জলবিদ্যুৎ ও পরিবহণ-ব্যবস্থা এবং স্থানীয় কাষ্ঠ-সম্পদ এই দেশের কাগজ শিল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব কানাডা কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ডের উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন ও রপ্তানিতে এই দেশ প্রথম স্থান অধিকার করে।

জার্মানীতে কাগজ শিল্প প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখানে এখনও ছেঁড়া কাপড় হইতে অধিকাংশ কাগজ প্রস্তুত হয়। **ব্রিটেন** পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ কাগজ উৎপন্ন করে। **জাপানে** কাগজের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী ; বিভিন্ন কার্যে এখানে কাগজ প্রয়োজন হয়, সেইজন্য এই দেশে বিভিন্ন রকমের কাগজ প্রস্তুত হয়। কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে কাষ্ঠমণ্ড আমদানি করা হয়। এই দেশের হোক্কাইডো দ্বীপেও কাষ্ঠমণ্ড পাওয়া যায়। **চীনে** খড়ের সাহায্যে সস্তা কাগজ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। **ফিনল্যান্ড, নরওয়ে** ও **সুইডেনে** সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি থাকায় কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদন ও কাগজ শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। এই সকল দেশের কাগজের উৎপাদন স্থানীয় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। সেইজন্য এই সকল দেশ কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ডের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ফ্রান্স, ইটালি, ব্রাজিল, ভারত প্রভৃতি দেশেও কাগজ প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্য (Trade)—কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ রপ্তানিতে **কানাডা** শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশও প্রচুর কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড রপ্তানি করে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন, ভারত, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাসায়নিক শিল্প
(The Chemical Industry)

কোনো দেশ শিল্পে উন্নতিলাভ করিতে না পারিলে বর্তমান জগতে শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া বিবেচিত হয় না। শিল্পসৃষ্টির জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির একান্ত প্রয়োজন। প্রায় সকল শিল্পেই কোনো না কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন। কৃষিকার্যে উন্নতিলাভ করিতে হইলেও রাসায়নিক দ্রব্যের (সার) দরকার। মানুষের বহুবিধ রোগের চিকিৎসার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের (ঔষধ) প্রয়োজন। সুতরাং মানুষের

উন্নতির সর্বস্তরে রাসায়নিক দ্রব্য একান্ত আবশ্যক বলিয়া যে সকল দেশে ইহা উৎপন্ন হয়, সেই সকল দেশ শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

উপাদান—রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বহুবিধ জিনিসের প্রয়োজন হয় ; যথা—গন্ধক, পটাশ, লবণ, খনিজ তৈল, নাইট্রেট, কাঠ, তুলার 'সেলুলোজ' প্রভৃতি। এই সকল দ্রব্য উৎপাদনের প্রথম স্তর। এইগুলির ভিত্তিতে অম্ল বা অ্যাসিড (Acid) ও ক্ষার (Alkali) প্রস্তুত হয়। অম্ল এবং ক্ষার দ্রব্য হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

রাসায়নিক দ্রব্যসমূহকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—গুরু রাসায়নিক দ্রব্য (Heavy Chemicals) এবং লঘু রাসায়নিক দ্রব্য (Fine Chemicals)। প্রথমটি অধিক পরিমাণে অসংস্কৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। ইহার উৎপাদন খরচ অত্যন্ত কম ; কিন্তু বিভিন্ন শিল্পে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ; যথা—সাল্‌-ফিউরিক অ্যাসিড, সোডা অ্যাশ, রাসায়নিক সার, কস্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্যাদির মধ্যে ঔষধপত্র, রং, বার্নিশ, ফটোগ্রাফির জন্য অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল দ্রব্যাদি মূল্যবান ও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid)—এই দ্রব্যটি সকল প্রকার অ্যাসিডের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বহুবিধ শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার উৎপাদন ও ব্যবহার দেশের শিল্পোন্নতির সূচক। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে গন্ধক ও পাইরাইট কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান, চীন তৃতীয় স্থান, জাপান চতুর্থ স্থান এবং পঃ জার্মানী পঞ্চম স্থান ও ফ্রান্স ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া পোল্যান্ড, ব্রিটেন, সুইডেন, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চেকোশ্লোভাকিয়া, ভারত, নেদারল্যান্ডস্‌, মেক্সিকো, স্পেন প্রভৃতি দেশেও এই জাতীয় অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

(খ) সোডা অ্যাশ (Soda Ash)—ইহা বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজন হয়। কাগজ, কাচ, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সোডা অ্যাশ প্রস্তুত করিতে লবণ, চুনাপাথর, কয়লা, কোক প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোডা অ্যাশ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহার পর সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, ব্রিটেন, পোল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের স্থান।

(গ) কস্টিক সোডা (Caustic Soda) এবং (ঘ) ক্লোরিন (Chlorine) লবণ হইতে প্রস্তুত হয়। কাগজ, সাবান, রেয়ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে কস্টিক সোডার প্রয়োজন হয়। জল পরিষ্কার করিতে এবং জীবাণুনাশক, রঞ্জক ও বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতে ক্লোরিন দরকার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, ইটালি, কানাডা ও ভারতে অধিকাংশ কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন পাওয়া যায়।

(ঘ) রাসায়নিক সার (Chemical Fertilizer)—কৃষির উন্নতির জন্য সার প্রয়োজন। সারের উৎপাদনের উপর দেশের কৃষিজাত সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে।

নাইট্রোজেন এবং ইহার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, ফসফরাস ও পটাশ কৃত্রিম সার উৎপাদনের প্রধান উপাদান। গোবর, হাড়ের গুঁড়া, পক্ষী-পুরীষ, মনুষ্য-পুরীষ স্বাভাবিক সারের কাজ করিলেও এইগুলির সরবরাহের অনিশ্চয়তার জন্য খনিজ নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থের সাহায্যে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা হয়।

শোরা বা Sodium Nitrate হইতে আহৃত নাইট্রোজেনের সাহায্যে প্রস্তুত সার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীতে মোট উৎপন্ন শোরার অধিকাংশই দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে পক্ষীর পুরীষ হইতে পাওয়া যায়। শোরার অভাবে বহু দেশে কয়লা ও বাতাস হইতে নাইট্রেট প্রস্তুত করিয়া ইহা হইতে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট **(Ammonium Sulphate)** নামক রাসায়নিক সার উৎপাদন করা হয়। কয়লা উৎপাদনকারী দেশে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রস্তুত হয়। নাইট্রোজেন ঘটিত সারের উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া জার্মানী, নরওয়ে, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, ব্রিটেন, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশেও এই জাতীয় সার উৎপন্ন হয়।

মৃত প্রাণীর হাড় হইতে ফস্‌ফেট পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার সরবরাহের অনিশ্চয়তার দরুন খনিজ ফস্‌ফেট হইতে সুপার ফস্‌ফেট **(Super Phosphate)** নামক উৎকৃষ্টশ্রেণীর সার প্রস্তুত হয়। এইজাতীয় সার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকি-পর্বত অঞ্চলে ফ্লোরিডা ও অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলে সর্বাধিক উৎপন্ন হয়। ইহার পরেই সোভিয়েত রাশিয়ার স্থান। এই দেশের কোলা, মস্কো ও কাজাকস্তান অঞ্চলে অধিকাংশ সুপার ফস্‌ফেট উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া জাপান, ইটালি, নেদারল্যান্ডস্, মরক্কো, স্পেন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও এই জাতীয় সার উৎপন্ন হয়।

পটাশ নামক লবণ-দ্রব্য হইতেও সার উৎপাদন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও পোল্যান্ডে অধিকাংশ পটাশ-ঘটিত সার উৎপন্ন হয়।

(ঙ) **আলকাতরাজাত রং (Colar-tar Dyes)**—বিভিন্ন বস্ত্রাদি রঙীন করিবার জন্য প্রচুর রাসায়নিক রং প্রয়োজন। কয়লা হইতে আলকাতরা বাহির হয়, তাহা হইতে বেন্‌জল প্রস্তুত হয়। এই বেন্‌জলের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া রাসায়নিক রং প্রস্তুত করা হয়। জার্মানী প্রথম ইহার প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করে। বর্ত্তমানে জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এইজাতীয় রং প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(চ) **ঔষধপত্র (Drugs & Medicines)**—বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের রোগনিবারণের জন্য নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ঔষধ প্রস্তুতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

চর্বি ও তৈলের সহিত সোডা ও পটাশ মিশাইয়া **সাবান (Soap)** ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উহার উৎপাদন হইয়া থাকে। পটাশিয়াম নাইট্রেট, গন্ধক প্রভৃতি হইতে **বিস্ফোরক দ্রব্যাদি (Explosives)** প্রস্তুত হয়। খনিজ শিল্পে ও সামরিক কার্যে ইহার প্রয়োজন হয়।

বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীর সকল দেশকেই কোনো-না-কোনো রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। ইহার মধ্যে ভারত, ব্রহ্মদেশ, চীন, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারক এবং ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, সোভিয়েত রাশিয়া, চিলি প্রভৃতি রপ্তানিকারক দেশ।

প্রশ্নাবলী

1. What are the essential factors for the development of industries ?

(শিল্পোন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কি কি ?)

উঃ। 'শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান' (২৯২-২৯৫ পৃঃ) লিখ।

2. Analyes the bases of industrial location and give examples of concentration of industries near raw materials, power and market.

[C U. B. Com, 1964]

(শিল্প-স্থাপনের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ কর এবং কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ ও বাজারের নিকট শিল্পের একাদেশীভবনের উদাহরণ দাও।)

উঃ। 'শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান' (২৯২-২৯৫ পৃঃ) হইতে লিখ।

3. Identify the major industrial regions of the world and explain the reasons for their development. **[H. S. Examination, 1983]**

(পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা কর।)

উঃ। 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলসমূহ' (২৯৫-৩০২ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

4. Identify the geographical factors for the location of industries on any region. Describe the reasons for the regional concentration of Iron and Steel Industry in Ruhr of West Germany. **[H. S. Examination, 1978]**

(কোনো স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠিবার অনুকূল ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর। পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একদেশীভবনের কারণ উল্লেখ কর।)

উঃ। 'শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান' (২৯২-২৯৫ পৃঃ) এবং 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' হইতে 'পশ্চিম জার্মানী' (৩০৬-৩০৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. Analyse the bases of industrial location and give examples of concentration of industries near raw materials, power and market.

[Specimen Question, 1980]

(কোনো স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠিবার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর এবং কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ ও বাজারের নিকট গড়িয়া উঠিয়াছে এমন সব শিল্পের উদাহরণ দাও।)

উঃ। 'শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান' (২৯২-২৯৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Describe the principal industrial regions of the U. S. A. and discuss the causes of localisation of industries in those regions.
[Tripura H. S. Examination, 1979]

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলের বিবরণ দাও এবং ঐ সকল শিল্পাঞ্চলে শিল্পসমাবেশের কারণগুলি বর্ণনা কর।)

উঃ। 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল' হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি শিল্পাঞ্চলের (২৯৭-২৯৮ পৃঃ) বিবরণ লিখ।

7. What are the raw materials for the Iron & Steel industry? Analyse the factors of the location of the industry with reference to any outstanding centre of iron and steel production in the world.
[Specimen Question, 1980 ; C. U. B. Com. 1971]

(লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কি কি? পৃথিবীর যে কোনো একটি বিশিষ্ট লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতকেন্দ্রের উল্লেখ করিয়া উহার অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর।)

উঃ। 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' হইতে কাঁচামাল সম্বন্ধে (৩০২ ৩০৩ পৃঃ) লিখ এবং 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' (৩০৫-৩০৬ পৃঃ) লিখ।

8. What are the geographical and economic factors for the location of an industry in a region? Mention the principal world centres of Iron and Steel production. **[H. S. Examination, 1980]**

(কোনো অঞ্চলে একটি শিল্প গড়িয়া ওঠার অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি কি? পৃথিবীর প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রগুলির উল্লেখ কর।)

উঃ। 'শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান' (২৯২ ২৯৫ পৃঃ) এবং 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' হইতে 'উৎপাদনকারী অঞ্চল' (৩০৩-৩০৯ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

9. Analyse the role of raw materials, transport and market in the location of iron and steel industry of any region.
[C. U. B. Com. 1974]

(কোনো অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় কাঁচামাল, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও বাজার-চাহিদার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।)

উঃ। 'শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান' (২৯২-২৯৯ পৃঃ) এবং 'লৌহ ও ইস্পাতশিল্প' (৩০২-৩০৯ পৃঃ) অবলম্বনে নিজে উত্তর তৈয়ারি কর।

10. What are the suitable geographical factors for the development of cotton textile industry? Mention the important centres of the world producing cotton textiles. **[H S. Examination, 1979]**

(কার্পাস-বয়ন শিল্পের উন্নতির মূলে ভৌগোলিক উপাদান কি কি? পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনকারী কেন্দ্রের উল্লেখ কর।)

উঃ। 'কার্পাস-বয়ন শিল্প' (৩১০-৩১৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. Discuss the causes of localisation of cotton textile industry in Lancashire region and mention the various problems now being faced by the industry. [Tripura H. S. Examination. 1979]

(কার্পাসবয়ন শিল্প ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে গড়িয়া উঠিবার কারণগুলি উল্লেখ কর এবং ঐ শিল্পের বর্তমান সমস্যাগুলি আলোচনা কর।)

উঃ। 'কার্পাস বয়ন শিল্প' হইতে 'ব্রিটেন' (৩১৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

12. What are the reasons for the development of the Cotton Textile Industry of the U. S. A., China, the U. S. S. R., the U. K. and Japan ? Explain how the Western European countries and Japan have become successful in this industry in spite of having practically no cotton of their own.

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন ও জাপানে কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতির কারণ কি কি ? নিজস্ব কোনো তুলা না থাকিলেও জাপান ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি এই শিল্পে কিভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর।)

উঃ। 'কার্পাসবয়ন শিল্প' হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন ও জাপানের শিল্প (৩১১-৩১৪ পৃঃ) সম্বন্ধে লিখ। জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর (৩১৩-৩১৪ পৃঃ) শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাও যে তুলার ওজন কম হওয়ায় ইহা আমদানি করিয়া শিল্পের উন্নতিসাধন করা সম্ভব।

13. (a) Discuss the influence of raw materials and market in the location of Cotton Textile Industry, (b) Name the important cotton textile producing regions of the world,

[H. S. Examination, 1982 & 1985]

[(ক) কার্পাসবয়ন শিল্পের অবস্থানের উপর কাঁচামাল ও বাজার-চাহিদার প্রভাব আলোচনা কর। (খ) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কার্পাস-বয়ন শিল্পাঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর।]

উঃ। 'কার্পাসবয়ন শিল্প' (৩১০-৩১৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

14. Account for the location of Cotton Textile industry in South-eastern region of the U. S. A. [Tripura H. S. Examination, 1981]

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্প গড়িয়া উঠার কারণগুলি বর্ণনা কর।)

উঃ। 'কার্পাসবয়ন শিল্প' হইতে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' (৩১১-৩১২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

15 Analyse the factors for the location of woollen industry citing the example of some outstanding regions of woollen textile production. [C. U. B. Com. 1973]

(পৃথিবীর কয়েকটি বিশিষ্ট পশমবয়ন শিল্পাঞ্চলের উদাহরণ দেখাইয়া উহাদের অবস্থানের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।)

উঃ। 'পশমবয়ন শিল্প' (৩১৪-৩১৭ পৃঃ) লিখ।

16. "About four-fifths of the world's export of wool comes from the three southern continents but the woollen industry has been localised in western countries of the northern continents."

—Elucidate.

("পৃথিবীর প্রায় চার-পঞ্চমাংশ পশম আসে তিনটি দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ হইতে। কিন্তু পশমবয়ন শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে উত্তর গোলার্ধের পশ্চিমী দেশগুলিতে।"—বিশ্লেষণ কর।

উঃ। 'পশমবয়ন শিল্প' (৩১৪-৩১৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

17. Account for the supremacy of the U. S. A. in the Silk Industry even though this country does not produce any raw silk. What other countries have become prominent in this industry ?

(কোনো কাঁচা রেশম উৎপন্ন না করিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেশমবয়ন শিল্পে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কেন তাহা বিশ্লেষণ কর। এই শিল্পে অন্যান্য কোন্ কোন্ দেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে ?)

উঃ। 'রেশমবয়ন শিল্প' হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প (৩১৮ পৃঃ) এবং 'উৎপাদক' অঞ্চল হইতে অন্যান্য দেশের রেশমবয়ন শিল্প (৩১৮-৩১৯ পৃঃ) লিখ।

18. Account for the development of Rayon industry in the U. S. A. and Japan.

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের রেয়নশিল্পের উন্নতির কারণ বর্ণনা কর।)

উঃ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের 'রেয়নশিল্প' (৩১৯-৩২০ পৃঃ) লিখ।

19. What are the raw materials necessary for the growth of jute industry ? Account for the concentration of jute mills in Hooghly Industrial Region. **[H. S. Examination, 1981]**

(পাটশিল্প গঠনে কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয় ? হুগলী শিল্পাঞ্চলে চটকল কেন্দ্রীভবনের কারণ নির্দেশ কর।)

উঃ। 'পাটশিল্প' (৩২১-৩২২ পৃঃ) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 'ভারত' হইতে 'পাটশিল্প' হইতে 'অবস্থান ও অবস্থানের কারণ' লিখ।

20. Describe the role of raw materials in the growth of Jute Industry. Name the important centres where this industry is concentrated. **[H. S. Examination, 1983]**

(পাটশিল্পের উন্নতিতে কাঁচামালের অবদান আলোচনা কর। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নাম কর।)

উঃ। 'পাটশিল্প' (৩২১—৩২২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

21. What are the major factors for the growth of Paper Industry ? Name the important paper producing countries of the world and justify their location. **[H. S. Examination, 1984]**

(কাগজ-শিল্প উন্নয়নের প্রধান কারণ কি কি? পৃথিবীর মুখ্য কাগজ উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর এবং ইহাদের অবস্থানের যৌক্তিকতা সমর্থন কর।)

উঃ। 'কাগজ শিল্প' (৩২২-৩২৩ পৃঃ) লিখ।

22. Discuss the role of heavy chemicals in modern economic development and describe briefly the principal regions of the world well-developed in heavy chemical industries.

[C. U. B. Com. 1969 & 1972]

(আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের ভূমিকা আলোচনা কর এবং পৃথিবীর গুরু রাসায়নিক শিল্পে বিশেষভাবে উন্নত অঞ্চলগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।)

উঃ। 'রাসায়নিক শিল্প' (৩২৩-৩২৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1, Give reasons for the following statements :

(a) Ukraine is the most important industrial region of the U. S. S. R.

(b) The U. S. A. occupies the first place in Silk textile industry though she does not produce any silk.

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কারণ নির্দেশ কর :

(ক) ইউক্রেন সোভিয়েত রাশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল।

(খ) কোনো প্রকার রেশম উৎপাদন না করিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেশমবয়ন শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করে]

উঃ। (ক) 'ইউক্রেন অঞ্চল' (৩০০ পৃঃ) ও (খ) 'রেশমবয়ন শিল্প' (৩১৮-৩১৯ পৃঃ) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Write correct answers from the following statements :

(a) Sindhri is an important centre of iron and steel/chemical products/garments. [H. S. Examination, 1982]

(b) Pittsburgh is the largest centre of cotton textile/iron and steel industry of Germany/United States of America.

[H. S. Examination, 1981]

(c) Osaka is a principal centre of steel industry/sugar industry/cotton textile industry. [H. S. Examination, 1980]

(d) The principal manufacturing region of the U. S. A. is Pacific Sea coast/Mississippi Valley/St. Lawrence Valley/North-Eastern Region.

(e) Pittsburgh is famous for the production of furniture and rubber goods/chemical and glass wears/iron and steel production/ cotton and woollen textiles. [H. S. Examination, 1979]

(f) Cotton industry is concentrated at Bombay-Ahmedabad/ Jammu-Srinagar/Cuttack-Bhubaneswar region.

[H. S. Examination, 1983]

(g) Titagarh has rice/engineering/paper mills

(h) Sulphuric acid is used as a raw material in iron and steel/ chemical fertiliser/cement industry. [H. S. Examination, 1984]

(i) Bauxite/hematite/tin is used as a major raw material in Iron and Steel Industry.

(j) Egypt occupies an important place in the production of cotton/jute and silk in the world. [H. S. Examination, 1985]

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখ :

(ক) মিশর একটি গুরুত্বপূর্ণ লৌহ-ইস্পাত/রাসায়নিক দ্রব্য/পোশাক-পরিচ্ছদ উৎপাদন কেন্দ্র।

(খ) পিটস্‌বার্গ জার্মানীর/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ কার্পাস-বয়ন/লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র।

(গ) ওসাকা ইস্পাত শিল্পের/চিনি শিল্পের কার্পাসবয়ন শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র।

(ঘ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শিল্পাঞ্চল হইল প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল/ মিসিসিপি নদীর অববাহিকা/সেন্ট লরেন্স নদীর উপত্যকা/উত্তর-পূর্ব অঞ্চল।

(ঙ) আসবাবপত্র ও রবারের জিনিস/রাসায়নিক ও কাঁচের জিনিস/লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য/কার্পাস ও পশম বস্ত্র উৎপাদনে পিটস্‌বার্গ সমধিক প্রসিদ্ধ।

(চ) বোম্বাই-আমেদাবাদ/জম্মু-শ্রীনগর/কটক-ভুবনেশ্বর অঞ্চলে কার্পাস-বয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

(ছ) টিটাগড়ে ধানকল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প/কাগজকল আছে।

(জ) লৌহ-ইস্পাত রাসায়নিক সার/সিমেন্ট শিল্পে সালফিউরিক অ্যাসিড কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(ঝ) লৌহ-ইস্পাত শিল্পে বক্সাইট/হেমাটাইট/টিন প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(ঞ) তুলা/পাট রেশম উৎপাদনে মিশর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।]

চতুর্দশ অধ্যায়

বাণিজ্য

(Trade)

পুরাতন দিনগুলির তুলনায় বর্তমান যুগে মানুষ অনেক ভালভাবে জীবন-যাপন করিতেছে ; তাহার অন্যতম কারণ বাণিজ্য।* সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ খাদ্য, কাচাঁমাল, জ্বালানি এবং সমস্ত শিল্পদ্রব্যই নানা বাণিজ্যিক বিনিময়ের মধ্য দিয়া অবশেষে ভোগীদের (Consumers) হাতে প্রতিদিন পেঁছাইতেছে।

বাণিজ্য দুইপ্রকার : (১) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও (২) বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। কোনো দেশের অভ্যন্তরে পণ্য বিক্রয়ার্থে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে, উৎপাদক হইতে পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট এবং তাহার নিকট হইতে খুচরা ব্যবসায়ীর মারফত অবশেষে ভোগীদের নিকট বিক্রয় পর্যন্ত সামগ্রিক ব্যবস্থা **অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের (Internal or Home Trade)** অধীন।

বোম্বাই হইতে কলিকাতায় কাপড় আনিয়া বিক্রয় হইতেছে—মিল হইতে পাইকারদের নিকট, আবার পাইকারদের নিকট হইতে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট, পুনরায় খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ভোগীর নিকট কাপড় বিক্রয় হইতেছে। ইহাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদাহরণ।

এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য (যাহাকে আমদানি-রপ্তানি বলা হয়) **বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (Foreign or International Trade)** পর্যায়ে পড়িবে। কলিকাতা হইতে যখন আমরা পাটজাত দ্রব্য ব্রিটেনে পাঠাই, তখন উহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আওতায় আসিবে।

মানুষের সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা যতই বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যের পরিমাণও ততই বাড়িবে। যন্ত্রসভ্যতার উন্নতির ফলে মানুষের চাহিদার শেষ নাই। এই চাহিদা পূরণ করিবার জন্য মানুষ বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করিতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই চাহিদা পূরণের জন্য শত্রুপক্ষের দেশ হইতেও অপ্রত্যক্ষভাবে পণ্য আমদানি করিতেও কেহ কুণ্ঠাবোধ করে না।

বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি (Trade as an index of economic development)—বর্তমানে সভ্যতার মধ্যাহ্নে দাঁড়াইয়া যদি সভ্যতার ঊষালগ্নের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, পণ্য বিনিময় করিয়াই (Bartar) বাণিজ্য শুরু হইয়াছিল। আদিম যুগে যাহার গৃহে উদ্বৃত্ত শস্য থাকিত, সে তাহার ঐ উদ্বৃত্ত শস্যের বিনিময়ে তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় তৈলবীজ, প্রাণিজ বা অন্যান্য সামগ্রী পাইবার জন্য তৎপর হইত। ব্যবসায়ের প্রথম প্রভাতে ইহাই ছিল রীতি। পরে বিশেষীকরণের ফলে গ্রামের বা গোষ্ঠীর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিনিময়-প্রথার বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। আরও পরে আবার

---

* "One of the reasons why people live more comfortably than in the past is the growth of trade"—*Huntington.*

সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইয়া এক দেশের পণ্য অন্য দেশের পণ্যের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হইত। এইভাবে পণ্য-বিনিময় প্রথা রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া দেশ হইতে বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। কয়েক যুগ পরে দুনিয়ার প্রায় সকল দেশ স্বর্ণকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার ফলে স্বর্ণের বিনিময়ে পণ্য আমদানি-রপ্তানি হইতে শুরু হইল। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে দেশ-দেশান্তরে মুদ্রা ব্যবস্থা (Currency) প্রচলিত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রামানের অনুপাতকে ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা স্বীকৃত হইল। বাণিজ্যের সাথে সাথে উন্নত সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান-উৎকর্ষের ফলশ্রুতি সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের স্থানীয় পরিবেশে সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করিল।

পরে ক্রমশঃ যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ হইল এবং শক্তিসম্পদ হিসাবে কয়লার ব্যবহার শুরু হইয়া গেল। পাল ও দাঁড়যুক্ত কাঠের জাহাজ কয়লা চালিত ইস্পাত-নির্মিত জাহাজে পরিণত হইল, ছোট ছোট জাহাজ-ঘাট বড় বড় বন্দরে রূপান্তরিত হইল, বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরে ঘোড়া বা বলদ-টানা গাড়ির স্থলে আসিল রেল-গাড়ি ও মোটরগাড়ি। এক দেশের উন্নয়নের সংবাদ অন্য দেশে উন্নয়নের উদ্দীপনা সঞ্চার করিল। কিন্তু বাণিজ্যের এই অগ্রগতি মোটেই সহজ বা সরল ছিল না। অশ্রু ও রক্তপিচ্ছিল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বাণিজ্যিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের লোভী মানুষ বাণিজ্যকে অবাধ লুণ্ঠনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিল। আফ্রিকা ও এশিয়ার মূল্যবান সম্পদ তাহারা বাণিজ্যের মাধ্যমে হরণ করিয়াছে। আফ্রিকার মানুষকে ক্রীতদাস বানাইয়াছে, পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় চালান দিয়াছে এবং গোটা আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিকতার নাগপাশে বাঁধিয়াছে। মানবতার এই চরম অবমাননা এই সকল দেশের আশাহত এবং ক্ষুধিত মানুষ একেবারে মানিয়া লয় নাই। তাই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস শৃঙ্খল উন্মোচনের মরণজয়ী আন্দোলনের ইতিহাস। তাই আজ এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষ নবলব্ধ স্বাধীনতার গরিমায় দীপ্ত। এত অনাচার, অবিচার এবং অত্যাচার সত্ত্বেও সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ফলশ্রুতি বিভিন্ন দেশে নূতন স্বাধীনতা, নূতন অগ্রগতি এবং নূতন জীবনের পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে। ফলে কৃষি, শিল্প ও পরিবহণে নূতন নূতন আবিষ্কার আন্তর্জাতিক ব্যবসায়কে নবরূপে রূপান্তরিত করিয়াছে।

বর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্য কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। সম্পদের অসম বণ্টন বাণিজ্যের মূল কথা। কেন না, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবিক সংস্কৃতি সর্বত্র একইভাবে গড়িয়া উঠে নাই। প্রকৃতিও সর্বক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাই ; এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতিকূল জলবায়ু মানুষের শক্তির পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা দিয়াছে। পক্ষান্তরে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষ শক্তি-সম্পদ এবং মানসিক সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রকৃতির সহায়তা লাভ করিয়াছে। আদান-প্রদানের এই সকল পার্থক্য এবং বৈষম্য বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। উপরন্তু কৃত্রিম বাধা-বিঘ্নও আছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি তাহাদের উপনিবেশগুলিতে শিল্পদ্রব্য সরবরাহ করিত এবং সেই সকল স্থান হইতে শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল আমদানি করিত। তাহার ফলে অনেকক্ষেত্রেই উপনিবেশগুলি কাঁচামাল ও খাদ্যের বিনিময়ে শিল্পদ্রব্য গ্রহণ করিত। কাঁচামাল রপ্তানি-ভিত্তিক অর্থনীতি পশ্চাৎপদ এবং অনগ্রসরতার প্রতীক। স্বাধীনতার পূর্বে ভারত কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের অধিকারী হইত। স্বাধীনতার পরের বছরগুলিতে কাঁচামাল এবং সামান্য শিল্পদ্রব্য রপ্তানি এবং যন্ত্রপাতি ও খাদ্যশস্য আমদানিতে ঘাটতি বাণিজ্যের সম্মুখীন হইতেছে। উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি বাণিজ্য যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচায়ক নহে। ব্রিটেনের ঘাটাত বাণিজ্য দ্বারা নিশ্চয়ই তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিমাপ করা যায় না। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বলে বলীয়ান দেশগুলিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মোট পরিমাণ অধিক এবং উহার মূল্য অনেক বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক মোট রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ ৩,৭৪৪ কোটি ডলার এবং মোট আমদানি-বাণিজ্যের পরিমাণ ৩৫৭৮ কোটি ডলার।

বাণিজ্যের মোট পরিমাণ হইতে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করা সম্ভব নহে। সুইডেনের সঙ্গে ভারতের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ সুইডেন অপেক্ষা অনেক বেশী। পরিমাণ অধিক হইবার কারণ ইহার বৃহদায়তন (৩২,৮৭,৭৮২ বর্গ-কিলোমিটার) এবং বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি। অথচ সুইডেনের আয়তন মাত্র ৪ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা মাত্র ৭৫ লক্ষ। জীবনযাত্রার মান বিচার করিলে সুইডেন অগ্রাধিকার পায়। কেন না, মাথাপিছু আয় ভারতের তুলনায় সুইডেনে ৫ গুণ। আবার মাথাপিছু বাণিজ্য বিচার করিলেও দেখা যায় ভারতের ক্ষেত্রে মাথাপিছু বাণিজ্যের পরিমাণ ৫ টাকা, সুইডেনের প্রায় ১,৬০০ টাকা। ইহা সত্য যে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে সোভিয়েত রাশিয়ার তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ কিন্তু মাথাপিছু বাণিজ্যের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, মালয়েশিয়ার মাথাপিছু বাণিজ্য ২৫০ ডলারের অধিক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মাত্র ৫ ডলার। একটি কথা বিচার করিতে হইবে যে, সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা ইত্যাদি দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় গড়া। স্বয়ংসম্পূর্ণতা তাহাদের পরিকল্পনার মূলকথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সোভিয়েত রাশিয়া এবং অন্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ বহির্বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের রপ্তানি করার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সকল দেশের সহিত বাণিজ্যে সে লিপ্ত হয় নাই; কারণ, সাম্যবাদী দেশগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ অবস্থায় মাথাপিছু বহির্বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নতির সঠিক পরিমাপ নাও হইতে পারে। কেন না ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্য যে গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করে, সাম্যবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা ও মালিকানায় মুনাফাহীন বাণিজ্য-ব্যবস্থা সেই গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করে না এবং উভয় ব্যবস্থার ফলশ্রুতি একই রকম নাও হইতে পারে। মালয়েশিয়ার তুলনায় সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষের জীবনমান অনেক উন্নত

অথচ মাথাপিছু বাণিজ্যে তাহা প্রতিফলিত হয় না। সাম্যবাদী দেশগুলির বাণিজ্য-নীতি কল্যাণমূলক, শোষণমূলক নহে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বাণিজ্যনীতি শোষণ-ভিত্তিক এবং নিজ নিজ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ বাণিজ্য এবং ডলার সাহায্যের চাপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিঘ্নিত হইয়াছে। তাহার চরম প্রকাশ ভিয়েতনামের যুদ্ধ। মার্কিন বাণিজ্যের কল্যাণে দক্ষিণ আমেরিকায় কোনো দেশের সরকার দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে না। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে 'মার্শাল প্ল্যান' অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও ডলার-সাহায্যে বহু ইউরোপীয় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো জীর্ণ হইয়া পড়ে এবং ঐ প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রেই জাতীয় অগ্রগতিকে সাহায্য নাও করিতে পারে।

পৃথিবীতে মাথাপিছু বাণিজ্য সর্বাধিক দেখা যায় নিউ জিল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও লুক্সেমবুর্গে (২৫০-৪০০ ডলার)।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়, বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ (Bases of International Trade)—সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়া দেশে দেশে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে কোনো দেশই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘোষণা করিয়া বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া একক থাকিতে পারে না। সর্বসম্পর্ক-রহিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা বোধ হয় কাহারও প্রেয় বা কাম্য নহে। শিল্পোন্নত দেশগুলি কাঁচামালের জন্য অনুন্নত দেশগুলির উপর নির্ভর করে। যেমন, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় রবার উৎপন্ন হয় কিন্তু এই দেশগুলি যন্ত্রশিল্পে অনুন্নত। ব্রিটেনে রবার উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সে যন্ত্রশিল্পে উন্নত। সুতরাং ব্রিটেনকে রবার আমদানি ও যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে উভয় দেশ একই পণ্য উৎপাদন করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাণিজ্য সম্ভব হয়। যেমন, ব্রিটেন গম ও দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদন করে ; নেদারল্যান্ডসও একই ধরনের পণ্য উৎপাদন করে। এখন ব্রিটেনের পক্ষে কোন্‌টি আমদানি ও কোন্‌টি রপ্তানি করা বা নেদারল্যান্ডসের পক্ষে কোন্‌টি রপ্তানি বা আমদানি করা উচিত? তুলনামূলক উৎপাদন খরচ (Comparative cost) বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রিটেনের পক্ষে গম আমদানি করিয়া নেদারল্যান্ডসে দুগ্ধজাত সামগ্রী রপ্তানি করা লাভজনক। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসে হেক্টর-প্রতি গম-উৎপাদন সর্বাধিক এবং তুলনামূলক উৎপাদন-খরচের বিচারে দেখা যায়, নেদারল্যান্ডসের পক্ষে ব্রিটেনে গম রপ্তানি ও ব্রিটেন হইতে দুগ্ধজাত সামগ্রী আমদানি করা সুবিধাজনক। অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের জন্যও বাণিজ্য সংঘটিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের বাণিজ্য এই শ্রেণীর এবং ভারত ইহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ নিম্নরূপ : (১) পরিবেশগত বৈষম্য, (২) অর্থনৈতিক উন্নয়নগত বৈষম্য, (৩) জনসংখ্যাগত বৈষম্য বা (৪) অবস্থানগত বৈষম্য, (৫) পরিবহণ-ব্যবস্থাগত বৈষম্য, (৬) সামাজিক অবস্থাগত বৈষম্য, (৭) রাজনীতিগত বৈষম্য, (৮) সরকারী নীতিগত বৈষম্য, (৯) রাজনৈতিক অবস্থাগত বৈষম্য ও (১০) জাতীয় চরিত্র ও মূল্যবোধের বৈষম্য ইত্যাদি।

(১) **পরিবেশগত বৈষম্য (Differences in Physical Environment)**—পৃথিবী বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত। কোথাও নিরক্ষীয় বৃষ্টিঝরা অরণ্য, কোথাও বর্ষাবিধৌত মৌসুমী অঞ্চল, কোথাও বা শুষ্ক, উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ, কোথাও হিমোষ্ণ অঞ্চলের শীতকালীন তুষারশুভ্র মৌনতা; অর্থাৎ দেশ-দেশান্তরে পরিবেশের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশগত বৈষম্য হইতেই আর্থিক সম্পদ উৎপাদনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে রবার প্রধান অর্থকরী সামগ্রী; নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বিশেষ করিয়া কানাডা ও আর্জেন্টিনায় গম-চাষের প্রাধান্য এবং মৌসুমী প্রভাবযুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধান-চাষের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আবার কোনো কোনো দেশে খনিজ তৈলের বিশাল ভাণ্ডার, কোথাও বা কয়লার প্রচুর সম্ভার, কোথাও বা সম্ভাব্য জলশক্তির অধিকাংশ বিদ্যুতে রূপায়িত। কিউবায় ইক্ষু ও তামাক, সোভিয়েত রাশিয়ায় বীট-চিনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টা ও গমের প্রাচুর্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই ধরনের বৈষম্যের উপর ভিত্তি করিয়াই আঞ্চলিক বিশেষীকরণ (Regional Specialisation) গড়িয়া উঠে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব হয়। সেইজন্যই কিউবাকে চিনি রপ্তানি করিয়া, মালয়েশিয়াকে রবার রপ্তানি করিয়া ও ব্রিটেনকে গম আমদানি করিয়া বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াইতে হয়।

(২) **অর্থনৈতিক উন্নয়নগত বৈষম্য (Differences in Economic Development**—মানবিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির তারতম্যের ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও কারিগরি উন্নতি দেখা যায়। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন, জার্মানী, বেলজিয়াম, কানাডা ও সোভিয়েত রাশিয়া উন্নত, অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি, মালয়েশিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ভারত হইতে চা, অভ্র ও পাটজাত সামগ্রী, বাংলাদেশ হইতে পাট ও পাটজাত সামগ্রী, মালয়েশিয়া হইতে রবার ও টিন আমদানি করে এবং তাহার বিনিময়ে মূলধনগত দ্রব্য (Capital goods) যথা, বিভিন্ন শিল্পের যন্ত্রপাতি, ইস্পাত দ্রব্য, জাহাজ, বিমান, রেলইঞ্জিন, সূতীদ্রব্য ও শোধিত খনিজ তৈল ইত্যাদি রপ্তানি করিয়া থাকে। এইভাবে অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলির সহিত শিল্পোন্নত দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

(৩) **জনসংখ্যাগত বৈষম্য (Differences in Population**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় এই সকল দেশে বিরল লোকবসতি বিদ্যমান। সুতরাং স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় বিরাট উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল এবং শিল্পদ্রব্য ইহারা রপ্তানি করিয়া থাকে। আবার দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে জনসংখ্যার চাপ অধিক এবং তাহার ফলে চাহিদাও বেশী; অথচ নিজ নিজ উৎপাদনের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাদের পক্ষে চাহিদা মিটানো সম্ভব নহে। বর্তমানে শ্রমিকের সহজলভ্যতা এবং অন্যান্য কারণে এই সকল ঘাটতি অঞ্চলে শিল্পায়ন অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের জন্য খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য ভারত, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ আমদানি করিয়া থাকে। শিল্পোন্নত দেশগুলিও খাদ্য ও কাঁচামালের জন্য বৃহদাকার অনুন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরশীল।

(৪) **অবস্থানগত বৈষম্য (Differences in Location)**—বর্তমান শতাব্দীতে পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ও সুষ্ঠু হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারগুলির সান্নিধ্য পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত দেশগুলিকে বিশেষ সুবিধা দান করে। গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থান আদর্শ স্থানীয়। দেশটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। একদিকে আটলান্টিকের অপর পারে দুই আমেরিকা, অন্যদিকে ইউরোপ, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থানের সুবিধা এবং ঐরূপ অবস্থানের জন্য এককালে ব্রিটেন আন্তর্জাতিক বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করিয়াছিল।

নিউ জিল্যান্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় একই ধরনের হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া আন্তর্জাতিক বাজারগুলির সহজনৈকট্য হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে; তাহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাহার গুরুত্ব কম। অন্যদিকে জাপানও পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত—একদিকে দুই আমেরিকা এবং অন্যদিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। অধিকন্তু ইউরোপ দূরে থাকার ফলে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র সীমিত হইয়াছে।

(৫) **পরিবহণ ব্যবস্থাগত বৈষম্য (Differences in Transport facilities)**—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা স্থানগত এবং কালগত অসুবিধা দূর করে। আজ বিশ্বে পরিবহণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। যান্ত্রিক পরিবহণ-ব্যবস্থার আবির্ভাবের পূর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ কম ছিল; কেন না, প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক নানা বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা তখন গ্রহণ করা যাইত না। যে দেশের পরিবহণ ব্যবস্থা যত উন্নত সেই দেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি তত বেশী। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, কানাডা, জাপান ও সোভিয়েত রাশিয়ার বণ্টন ব্যবস্থা উন্নত। ব্যাপক অপচয় নিবারণ-ব্যবস্থা থাকার ফলে এই সকল দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত।

(৬) **সামাজিক অবস্থাগত বৈষম্য (Differences in Social conditions)**—উন্নত জীবনযাত্রার মান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিফলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয় বেশী থাকায় অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা অধিক থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তাহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বিরাট। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উন্নত-জীবনযাত্রার মান উচ্চ ক্রয়ক্ষমতায় পুষ্ট হইয়া চাহিদার পরিমাণ ও বৈচিত্র্যকে বৃদ্ধি করে; তাহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত রাশিয়ার জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলেও শোষণহীন সাম্যবাদী অর্থনীতির ফলে জীবনযাত্রার মান বহির্বাণিজ্যে প্রতিফলিত হয় না। দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বড় কথা। **মুদ্রামানের স্থায়িত্ব বা ভারসাম্য** বিঘ্নিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিঘ্নিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নানাভাবে বিঘ্নিত হইয়াছিল।

(৭) **রাজনীতিগত বৈষম্য (Differences in Politics)**—রাজনীতিগত বিভিন্ন মতবাদের জন্য বাণিজ্য প্রভাবিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সোভিয়েত রাশিয়া ও কিউবা সাম্যবাদী রাষ্ট্র। বিশ্বমৈত্রীর প্রয়োজনে পারস্পরিক সহাবস্থান সম্ভব না হইলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। আন্তর্জাতিক ইতিহাসে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। তথাকথিত উভয় শিবির–

বহির্ভূত দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট হইতে এই সংঘর্ষের সুযোগও লইয়া থাকে। আবার একই রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; যেমন, কমনওয়েলথ, ইউরোপীয় সাধারণ বাজার, কমিকন প্রভৃতি।

৮) **সরকারী নীতিগত বৈষম্য (Differences in State Policies)**—যে কোনো দেশের বাণিজ্যিক গতিপ্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। দেশের শিল্পরক্ষার প্রয়োজনে সরকার সংরক্ষণ শুল্ক চালু করিয়া আমদানি নিষিদ্ধ করিতে পারে। জাপান সরকার বিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে ডাম্পিং (Dumping) নীতি সমর্থন করিয়া এশিয়া ও ইউরোপের বাজার দখল করিয়াছিল। পশ্চিম জার্মানীর বহির্বাণিজ্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নত। সরকারের শুল্ক নীতির উপর বহির্বাণিজ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। সরকারী মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলেও বহির্বাণিজ্যের উন্নতি বা অবনতি হয়।

(৯) **রাজনৈতিক অবস্থাগত বৈষম্য (Differences in Political atmosphere)**—শান্তিপূর্ণ অবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সাহায্য করে, যুদ্ধ-বিগ্রহ তাহাকে সঙ্কুচিত করে। ইজরাইল বনাম আরব দেশগুলির সংঘাতের ফলে এই সকল দেশে বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সহিত সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অন্য দেশের সহিতও বাণিজ্য হ্রাস পায়। যুদ্ধের ঝুঁকির জন্য বীমার হার বৃদ্ধি পায়। উভয় পক্ষের ধনসম্পত্তি ও জীবন নষ্ট হইবার ফলে স্বাভাবিক জীবনে ত্রাসের অন্ধকার নামিয়া আসে; ফলে বহির্বাণিজ্যের সংকোচন হয়।

(১০) **জাতীয় চরিত্র ও মূল্যবোধের বৈষম্য (Differences in National character and Values)**—বিভিন্ন দেশে জাতীয় চরিত্র, অভ্যাস ও প্রথার বৈষম্য দেখা যায়। প্রথা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাগত। গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিকদের সততা, শ্রমশীলতা এবং সংগঠনক্ষমতা উল্লেখযোগ্য; যাহার ফলে একদা তাহাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যাইত না। অভ্যাসও বাণিজ্যকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। চা-পান ব্রিটেন ও জাপানের অধিবাসীদের অভ্যাস। চা ব্রিটেনে উৎপাদিত হয় না। তাই সবটাই আমদানি করিতে হয়। ব্রিটেনের মানুষ আমিষাহারী অর্থাৎ মাংস খাইতে অভ্যস্ত অথচ উপযুক্ত পশুচারণক্ষেত্রের অভাব। সুতরাং মাংস বা মাংসের প্রয়োজনে গরু, ভেড়া, শুকর বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। মধ্য-প্রাচ্যের অধিবাসী অধিকাংশ মুসলমান হওয়ায় মদ্য উৎপাদন তাহাদের ধর্মের বিরোধী। ফলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে প্রচুর আঙ্গুরের উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও মিশর, আলজিরিয়া, লিবিয়া লেবানন, ইরান, ইরাক এবং সৌদি আরবে মদ্যশিল্প গড়িয়া উঠে নাই। জনমতের দ্বারাও বাণিজ্য প্রভাবিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির জন্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলি এই দেশের সহিত কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখে না; কেন না প্রবল জনমত এই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে।

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও বিজ্ঞাপন, দ্বিশক্তি চুক্তি, সহ-অবস্থানের প্রচেষ্টা, ব্যাপক উৎপাদন ও যান্ত্রিকীকরণ প্রভৃতি পদ্ধতি ও রীতি অবলম্বনের ফলে বহির্বাণিজ্য প্রভূত প্রসার লাভ করে।

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চলসমূহ

(Major Commercial Regions of the World)

বর্তমান জটিল অর্থনৈতিক অবস্থায় পৃথিবীর মানুষ নিয়ত চেষ্টা করিতেছে কিভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা যায়। বর্তমান সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানুষের এই চেষ্টা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীর সকল স্থানে সকল প্রকার সম্পদ পাওয়া যায় না। এইজন্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ কোনো-না-কোনো সম্পদের জন্য অন্য দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি করিয়া তাহাদের অভাব-পূরণের চেষ্টা করে। শান্তির সময় এইভাবে অভাবপূরণ সম্ভব হইলেও যুদ্ধের সময় যুদ্ধ লিপ্ত দেশসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে অভাবপূরণ করিতে না পারায় যুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধোত্তরকালে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খলার অবসানের জন্য বিভিন্ন দেশ নিজেদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশের মধ্যে সমান শুল্কহার প্রবর্তন করিয়া বা শুল্ক রহিত করিয়া একটি সাধারণ বাজার সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পৃথিবীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অঞ্চল বিদ্যমান। নিম্নে উহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(ক) **ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market)**— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশের বহু শিল্প যুদ্ধের আগুনে ছারখার হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধোত্তরকালে এই সকল দেশ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু সমস্ত রকম চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাদের শিল্প ও বাণিজ্য আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে না। এইজন্য প্রথমে ইহারা চেষ্টা করে ইস্পাতশিল্পের পুনর্গঠনের জন্য। পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের ইস্পাত শিল্পের একচেটিয়া পুঁজিপতিগণ একত্র হইয়া পৃথিবীর বাজারে তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে। ইহার ফলে ১৯৫০ সালের মে মাসে 'ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায়' (European Coal and Steel Community) গঠিত হয়। প্রথমে ইহার সদস্য হইল **পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, নেদারল্যান্ডস্ ও লুক্সেমবুর্গ**। ইহার ফলে এই কয়েকটি দেশের মধ্যে অবাধে কয়লা, লোহ ও ইস্পাতের বাণিজ্য চলে এবং ইহাদের ইস্পাত শিল্প প্রভুত উন্নতিলাভ করে। ইস্পাত শিল্পের এই সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া এই ছয়টি দেশ নিজেদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য রোমে মিলিত হয় এবং ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি অনুসারে এই ছয়টি দেশ লইয়া **'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়'** (European Economic Community * গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড এই বাজারে যোগদান করায় বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা ৯।

* European Economic Community : published by Deutsche Bank.

রোম চুক্তি (Rome Treaty) অনুসারে প্রথমতঃ সংঘবদ্ধ ছয়টি দেশ লইয়া একই শুল্ক এলাকাভুক্ত একটি অর্থনৈতিক বাজারের সৃষ্টি হয়। ইহার নাম 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' (European Common Market)। এই সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি দেশের মধ্যে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য সংঘটিত হইতে থাকে। সাধারণ বাজার বহির্ভূত দেশের সঙ্গে সমান শুল্কহারে এই ছয়টি দেশকে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে হয়। এই সাধারণ বাজারে মূলধন ও শ্রমিক এক দেশ হইতে অন্য দেশে অবাধে যাতায়াত করিতে পারে। এই ছয়টি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইহারা একটি ইউরোপীয় লগ্নি ব্যাংক (European Investment Bank) গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

রোমচুক্তি অনুসারে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া ইউরোপীয় সাধারণ বাজার গঠিত হইয়াছে: (ক) অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধনের সাহায্যে ছয়টি দেশের উন্নতি-সাধন; খ) অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমিত ক্রমবিকাশ; (গ) ক্রমবর্ধমান অর্থ-নৈতিক স্থায়িত্বসাধন; (ঘ) জীবন-মানের দ্রুত উন্নতি; (ঙ) ছয়টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি।

এই সকল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রোম চুক্তিতে নানাবিধ পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই চুক্তি অনুসারে এই ছয়টি দেশ লইয়া যে একটি সাধারণ বাজার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিবার জন্য একই শুল্ক-নীতি এই ছয়টি দেশ মানিয়া চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এই ছয়টি দেশের মধ্যে অবাধে মূলধন ও শ্রমশক্তি স্থানান্তরিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, কৃষি ও যানবাহনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহারা একই নীতি মানিয়া চলিতেছে। চতুর্থতঃ, এই সকল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির সমন্বয় সাধন করা হইতেছে। পঞ্চমতঃ, সাধারণ বাজারকে কার্যকরী করিবার জন্য অসাধু প্রতি-যোগিতা বন্ধ করা হইয়াছে এবং এই সকল দেশের অভ্যন্তরীণ আইনের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, এই ছয়টি দেশের অন্তর্ভুক্ত পরাধীন দেশসমূহকে সাধারণ বাজারের সহযোগী সদস্য করা হইয়াছে। সপ্তমতঃ, 'ইউরোপীয় সামাজিক তহবিল' (European Social Fund) এবং 'ইউরোপীয় লগ্নি ব্যাঙ্ক' (European Investment Bank) নামে দুইটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার সৃষ্টির পিছনে যে শুধু অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। এই অর্থনৈতিক সংস্থা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন। পৃথিবীতে আজ যে দুইটি বিবদমান শক্তি বিদ্যমান, তাহা এই সাধারণ বাজার গঠনের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উঠিতেছে। ইহার পাশেই অবস্থিত পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি ও বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের উন্নতিতে শিহরিয়া উঠিতেছে। এইজন্য ইহারা একত্রিত হইয়া ইহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পাল্লা দিবার চেষ্টা করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এইজন্য ইউরোপীয় সাধারণ বাজার সৃষ্টির প্রধান উদ্যোক্তা ও সমর্থক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকায় আজ এই ছয়টি দেশ শুধু অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই করিতেছে না, ইহাদের রাজনৈতিক মিলনের পথও সম্প্রসারিত করিতেছে। এইজন্য ইহারা সৃষ্টি করিয়াছে এই ছয়টি

দেশের মিলিত European Parliamentary Association, Court of Justice Council of Ministers ইত্যাদি।*

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ এই বাজার-সৃষ্টির ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সাফল্য লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ছয়টি দেশ লইয়া যে অঞ্চল সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল; ইতিমধ্যে এই সকল দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই সকল দেশের বাণিজ্যের উন্নতির হার ছিল শতকরা ৫ ভাগ। কিন্তু সাধারণ বাজার সৃষ্টির পরে ১৯৬১ সালে এই ছয়টি দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৬০ সাল অপেক্ষা শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ বৎসর পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাণিজ্যের উন্নতির হার ছিল শতকরা মাত্র ৮ ভাগ। অবশ্য ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি দেশের এই উন্নতির হার যে চিরকাল বজায় থাকিবে এবং এইভাবে যে ইহারা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে ছাড়াইয়া যাইবে তাহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই। কারণ, সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন হয় পরিকল্পনা অনুসারে নিজেদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া, কিন্তু ধনতান্ত্রিক এই ছয়টি দেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইলে বাজারে মন্দা দেখা দিবে এবং শেষ পর্যন্ত হয় যুদ্ধের আশ্রয় লইতে হইবে অথবা অর্থনৈতিক অবনতি আসন্ন হইবে।

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ব্রিটেন এই সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ায় সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। সাধারণ বাজার-সৃষ্টির সময় ব্রিটেন আমন্ত্রিত হইলেও যোগদান করে নাই। সাধারণ বাজার-সৃষ্টির পরে ব্রিটেন পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ লইয়া 'অবাধ বাণিজ্য সমিতি' (Free Trade Association) গঠন করিয়াছিল। (এই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।) কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রায় লুপ্ত হওয়ায় এবং ইউরোপের শিল্পোন্নত বাজার কিয়দংশে হারাইবার ফলে ব্রিটেন কয়েক বৎসর পূর্বেও ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের আপত্তির ফলে ব্রিটেন তখন যোগ দিতে পারে নাই। বর্তমানে ব্রিটেন ইহাতে যোগ দেওয়ায় সাধারণ বাজার আরও শক্তিশালী হইয়াছে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতায় পশ্চিম ইউরোপ কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছে। ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ায় শুধু যে ব্রিটেন উপকৃত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার ফলে অন্যান্য ছয়টি দেশও অর্থনৈতিক উন্নতিতে আরও সাফল্যলাভ করিবে। ব্রিটেনের পক্ষে প্রধান অসুবিধা হইয়াছে এই যে, কমনওয়েলথের সদস্যদের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

ব্রিটেনের সহিত আরও দুইটি দেশ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দিয়াছে—আয়ারল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক। তাহা ছাড়া অস্ট্রিয়া, আইসল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও সুইডেন এই বাজারের বিশেষ সুবিধাভোগী অংশীদার হিসাবে আছে।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত আদি সদস্যদের (পঃ জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্ ও লুক্সেমবুর্গ) অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এই বাজার বহুলাংশে সাহায্য করিয়াছে। জার্মানী গত মহাযুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাতের

* External affairs Review, July, 1961, New Zealand.

সম্মুখীন হইয়াছিল ; কিন্তু ইহার পার্শ্ববর্তী ফ্রান্সের ও লুক্সেমবুর্গের সাহায্যে পশ্চিম জার্মানীর ইস্পাত-শিল্প প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় শিল্পাঞ্চলের নিকটেই ফ্রান্সের ও লুক্সেমবুর্গের লৌহখনিসমূহ অবস্থিত। শুল্কের অবসান হওয়ায় অত্যন্ত কম খরচে লৌহ আমদানি করা সম্ভব হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায়। ইস্পাতের উৎপাদন-খরচ কম হইলে, ইহার প্রভাব অন্যান্য শিল্পের উপর বর্তায়। অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানীর কয়লা ফ্রান্স ও ইটালিতে রপ্তানি হওয়ায় উদ্বৃত্ত কয়লা হইতে পশ্চিম জার্মানী প্রভুত লাভ করে। ফ্রান্স উদ্বৃত্ত লৌহ আকরিক রপ্তানি করিয়া এবং কয়লা আমদানি করিয়া ইহার বিভিন্ন শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়াছে। কার্পাসবয়ন, রেশমবয়ন, মদ্য প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি এখন আর কয়লার অভাবে ব্যাহত হয় না। ইটালির শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল কয়লা। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানী ও বেলজিয়াম হইতে এই দেশ অনায়াসে বিনা শুল্কে কয়লা আমদানি করিতে পারে। সেইজন্য এই দেশে ইস্পাত উৎপাদন ১৯৫৭ সালের তুলনায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানকার রেশমবস্ত্র রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ফ্রান্স ভিন্ন সাধারণ বাজারের সকলেই এই দেশ হইতে রেশমবস্ত্র ক্রয় করে। বেলজিয়াম বহুদিন যাবৎ একটি শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। সাধারণ বাজারে এই দেশের পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা সহজ হইয়াছে এবং ফ্রান্স হইতে লৌহ আমদানি করা যাইতেছে। আফ্রিকায় এই দেশের সাম্রাজ্য হারাইবার ফলে স্থানীয় উৎপাদনের উপর এই দেশ বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে। লুক্সেমবুর্গের খনিজ দ্রব্য প্রধানতঃ বেলজিয়ামের শিল্পের উন্নতিতে নিয়োজিত হইত। সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ায় এই দেশের খনিজ দ্রব্যাদির চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নেদারল্যান্ডস্ তাহার সাম্রাজ্য বহুলাংশে হারাইয়াছে। বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়া তাহার হাতছাড়া হওয়ায় এই দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেইজন্য ইহাকে সাধারণ বাজারে যোগ দিতে হইয়াছে।

(খ) **ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল (European Free Trade Areas)**— ইউরোপীয় সাধারণ বাজার সৃষ্টি করিবার পর ব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ভারত, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা, ঘানা, গিনি প্রভৃতি লইয়া গঠিত বিশাল সাম্রাজ্য সে হারাইতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে তাহার অর্থনৈতিক কাঠামো বহুলাংশে বিপর্যস্ত হয়। সেইজন্য ইউরোপীয় সাধারণ বাজার সৃষ্টির এক বৎসর পরেই ১৯৬০ সালের মে মাসে ব্রিটেন পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ লইয়া **'ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতি'** (European Free Trade Association) বা EFTA গঠন করে। প্রথমে ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক এই সাতটি দেশ এই সমিতির সদস্য ছিল। এই সকল দেশের মধ্যে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য চলিত ; কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার সময় এই সকল দেশ নিজস্ব শুল্কনীতি গ্রহণ করিতে পারিত ; যেমন, ভারত ব্রিটেনে অত্যন্ত অল্প শুল্কে বা বিনা শুল্কে চা পাঠাইতে পারিত, কিন্তু সুইডেনে চা পাঠাইতে হইলে ভারতকে সুইডেন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক দিতে হইত।

অবাধ বাণিজ্য এলাকা গঠিত হইবার পর ১৯৬০ সালে এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহের বাণিজ্যিক উন্নতির হার হইয়াছে শতকরা মাত্র ৮ ভাগ, কিন্তু এই সময়

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের উন্নতির হার ছিল শতকরা ২০ ভাগ। এই দুইটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের এই পার্থক্যের মূলে রহিয়াছে ইহার গঠনের উদ্দেশ্যের পার্থক্য। সাধারণ বাজার সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে দাঁড়ানো। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের মূলে এইরকম বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। সেইজন্য যে উদ্দেশ্য ও উদ্দীপনা লইয়া সাধারণ বাজারের সদস্যরা কাজ করিয়াছে, অবাধ বাণিজ্য সমিতির সদস্যদের মধ্যে ততটা উদ্দীপনা দেখা যায় না। ইহার ফলে অবাধ বাণিজ্য সমিতি আর কতদিন টিকিয়া থাকিবে তাহা খুবই সন্দেহজনক।

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতির প্রধান কর্ণধার ব্রিটেন এবং তৎসহ ডেনমার্ক ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করায় এই সমিতির সমাধি রচনার পথ যে প্রশস্ত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

(গ) **কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল (Communist Economic Zone)**— পুঁজিবাদী দেশসমূহে বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপে যখন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে তখন পূর্বাংশের মানুষ তাহাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের চেষ্টায় পিছনে পড়িয়া নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশসমূহ একত্র হইয়া নিজেদের একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে সাহায্য করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের কম্যুনিস্ট সংসদ' (Communist Council of Economic Mutual Aid বা COMECON)। সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি এই সংসদের সদস্য। এই সকল দেশ প্রত্যেকে প্রত্যেককে অর্থনৈতিক সাহায্য দিবে বলিয়া ঠিক হইলেও, একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রধানতঃ সোভিয়েত রাশিয়াই অন্যান্য সকল দেশকে বহুলাংশে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়া থাকে। এই সকল দেশের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী চুক্তি অনুসারে বাণিজ্য চলে। প্রতিযোগিতার কোনো মনোভাব ইহাদের মধ্যে নাই। ইহাদের মধ্যে একমাত্র উন্নতির প্রতিযোগিতা হয়। বর্তমানে এই সকল দেশ পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। ইহা ছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশসমূহকে ইহারা কারিগরি ও অর্থসাহায্য দ্বারা উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে অনুন্নত দেশের সঙ্গে ইহাদের বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল কম্যুনিস্ট দেশের উন্নতির জন্য ইহারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। সেইজন্য ইহাদের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতি বৎসর অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। চীন এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

১৯৬২ সালের ৯ই জুন এই সকল দেশ মস্কোতে মিলিত হইয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; ইহার মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে বিনা বাধায় বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত অন্যতম। ইহারা আরও সিদ্ধান্ত করে যে, 'কমিকনের' দেশসমূহ একত্রিত হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবে, কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে এবং শিল্পের উন্নতিসাধন করিবে। এইভাবে যদি ইহারা সংযুক্ত-

ভাবে হাতে হাত মিলাইয়া চলে, তাহা হইলে এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে রোধ করা কঠিন।

অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চল—উপরে বর্ণিত তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক অঞ্চল ছাড়াও, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্গত দেশসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ ১৯৪৯-৫০ সালে কলম্বোতে একত্রিত হইয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করে। ইহার মধ্যে কমন্‌ওয়েল্‌থের দেশসমূহ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান প্রধানতঃ টাকা লগ্নি করিবার জন্য এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন দেশ অনুন্নত দেশসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দেওয়ায় ইহাদের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, কলম্বো পরিকল্পনা একটি অস্থায়ী সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

কমন্‌ওয়েল্‌থ (Commonwealth) অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অঞ্চল। কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্যদের মধ্যে রহিয়াছে ব্রিটেন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, ঘানা, টাঙ্গানাইকা, কেনিয়া, উগান্ডা, নাইজেরিয়া, জিম্বাবোয়ে প্রভৃতি। এই সকল দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের বহু সুবিধা রহিয়াছে। নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য চালাইবার সময় এই সকল দেশ 'কমন্‌ওয়েল্‌থ প্রেফারেন্স' পায় বলিয়া বিনাশুল্কে বা অল্প শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারে। এই সকল দেশের বাণিজ্যের উপর ব্রিটেনের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। কিন্তু ব্রিটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ায় এই কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হারাইবে এবং কমন্‌ওয়েল্‌থ ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

ইহা ছাড়া এশিয়ার দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহ লইয়া গঠিত **'এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন'** (Economic Commission for Asia & Far East বা ECAFE) নামে একটি সংস্থা এই অঞ্চলের দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিবার ফলে ইহাদের মধ্যে ও সাহায্যকারী পশ্চিমী দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সম্প্রতি আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহকে লইয়া নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি **'আফ্রিকার সাধারণ বাজার'** (African Common Market) সৃষ্টি করিয়াছে। মিশর, গিনি, মালি, ঘানা, মরক্কো ও আলজেরিয়া এই বাজারের সদস্য। আশা করা যায় আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ এই সংস্থার উন্নতিসাধনে সাহায্য করিবে।

প্রশ্নাবলী

(A) Essay-Type Questions:

1. Explain why trade is treated as an index of economic development and of nation's prosperity.

(বাণিজ্যকে অর্থনৈতিক উন্নতির এবং জাতির উন্নতির মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয় কেন?)

উঃ। 'বাণিজ্য—অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি' (৩৩২-৩৩৫ পৃঃ) লিখ।

2. Discuss the bases of International trade.

[C. U. B. Com. 1963]

(আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ আলোচনা কর।)

উঃ। 'আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ' (৩৩৫-৩৩৮ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Identify the geographical bases of International Trade. Describe its recent trends. **[H. S. Examination, 1984]**

(আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভৌগোলিক উপাদানসমূহ নির্দেশ কর। এই বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির বিবরণ দাও।)

উঃ। 'আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ' (৩৩৫-৩৩৮ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

4. Discuss how the pattern of international trade is influenced by the difference in available resources as conditioned by geography.

[C. U. B. Com. 1968]

(ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা সীমিত প্রাপ্ত সম্পদের পার্থক্যের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ধরন কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহা আলোচনা কর।)

উঃ। 'আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ' (৩৩৫-৩৩৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. Divide the world into major commercial regions and indicate the pattern of trade existing between these regions.

[C. U. B. Com. 1973 ; B. U. B, Com, 1965]

(পৃথিবীকে কয়েকটি প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক অঞ্চলে বিভক্ত কর এবং এই সকল অঞ্চলের মধ্যে সম্পাদিত বাণিজ্যের ধরন নির্দেশ কর।)

উঃ। 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' (৩৩৯-৩৪২ পৃঃ) 'ইউরোপের অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল' (৩৪২-৩৪৩ পৃঃ), 'কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল' (৩৪৩ পৃঃ) ও 'অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চল' (৩৪৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

6. Trade is treated as an index of economic development of a country. Explain the reasons. **[Tripura H. S. Examination, 1981]**

(বাণিজ্যকে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করা হয়। —ইহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।)

উঃ। 'বাণিজ্য—অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি' (৩৩২-৩৩৫ পৃঃ) লিখ।

7. Define Trade. Explain why International Trade is treated as an index of civilization and of national prosperity.

[Specimen Question, 1980]

(বাণিজ্যের সংজ্ঞা লিখ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন সভ্যতার ও জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।)

উঃ। 'বাণিজ্য—অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি' (৩৩২-৩৩৫ পৃঃ) লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on : (a) Trade as an index of economic development; (b) E. C. M ; (c) COMECON ; (d) EFTA.

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ (ক) বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি; (খ) ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ; (গ) কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল ; (ঘ) ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতি।]

উঃ। (ক) 'বাণিজ্য ঃ অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি' (৩৩২-৩৩৫ পৃঃ); (খ) 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' (৩৩৯-৩৪২ পৃঃ); (গ) কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল' (৩৪৩ পৃঃ); (ঘ) 'ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতি' (৩৪২-৩৪৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

প্রথম অধ্যায়

ভারত

পরিবেশগত অবস্থা
(Environmental Features)

পরিচয়—ভারতে অবস্থিত গাঙ্গেয় উপত্যকাপ্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সেই

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতের মানুষ এখনও বহন করিয়া চলিয়াছে। ভারতের ভাগ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রকার দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে বহু আক্রমণকারী ভারতকে পদানত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে। শেষকালে প্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ বণিকের বেশে ভারতে আসিয়া ভারতবাসীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। তাহারা প্রায় ২০০ বৎসরের পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভূত বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, ব্রিটিশের স্বার্থে ভারতের অর্থনীতি চলিত; ভারতকে ব্রিটেনের শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী হিসাবে কাজে লাগানো হইত। ১৯৪৭ সালে ইংরেজগণ ভারত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু শোষণের শেষ চিহ্ন হিসাবে ভারতকে দুই অংশে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত করিয়া তাহারা তাহাদের 'বিভক্তীকরণ ও শাসন' (Divide and Rule) নীতির শেষ নিদর্শন পাকা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় প্রজাতন্ত্র (The Republic of India) গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন আইন অনুসারে ভারতকে ভাষার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ২২টি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য এবং ৯টি কেন্দ্রীয় সরকার-শাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ

ক। রাজ্যপাল শাসিত রাজ্যসমূহ	রাজধানী
১। অন্ধ্র প্রদেশ	হায়দরাবাদ
২। আসাম	দিসপুর
৩। উত্তর প্রদেশ	লক্ষ্মৌ
৪। ওড়িশা	ভুবনেশ্বর
৫। কেরালা	ত্রিবান্দ্রম্
৬। গুজরাট	গান্ধীনগর
৭। জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর
৮। পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা
৯। পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়
১০। বিহার	পাটনা
১১। মধ্য প্রদেশ	ভূপাল
১২। মহারাষ্ট্র	বোম্বাই
১৩। কর্ণাটক	বাঙ্গালোর
১৪। তামিলনাড়ু	মাদ্রাজ
১৫। রাজস্থান	জয়পুর
১৬। নাগাল্যান্ড	কোহিমা
১৭। হরিয়ানা	চণ্ডীগড়
১৮। হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
১৯। মেঘালয়	শিলং
২০। ত্রিপুরা	আগরতলা
২১। মণিপুর	ইম্ফল
২২। সিকিম	গ্যাংটক

খ। **কেন্দ্রীয় সরকার-শাসিত অঞ্চলসমূহ**

১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
২। লাক্ষাদ্বীপ
৩। দিল্লী
৪। অরুণাচল প্রদেশ
৫। মিজোরাম
৬। দাদরা ও নগর হাভেলী
৭। গোয়া, দমন, দিউ
৮। পণ্ডিচেরী
৯। চণ্ডীগড়

ভাষার ভিত্তিতে এই সকল রাজ্য পুনর্গঠিত হইলেও জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করিবার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ভারতকে ছয়টি **আঞ্চলিক পরিষদে** বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা, উত্তরাঞ্চল (দিল্লী, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং রাজস্হান) ; উত্তর-পূর্বাঞ্চল (অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা) ; দক্ষিণাঞ্চল (কেরালা, কর্ণাটক, পণ্ডিচেরী, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশ) ; পূর্বাঞ্চল (সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা) ; পশ্চিমাঞ্চল (মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দাদরা ও নগর হাভেলী এবং গোয়া, দমন ও দিউ) এবং মধ্যাঞ্চল (উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ)। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ উল্লিখিত অঞ্চলগুলির বাহিরে রহিয়াছে। আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শাসনকার্যে উপদেষ্টার কাজ করিবে।

অবস্হান ও আয়তন

অবস্হান—এশিয়া পৃথিবীর **বৃহত্তম মহাদেশ**। ভারত এশিয়ার দক্ষিণাংশের মধ্য-উপদ্বীপে অবস্হিত। ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা পূর্ব-পশ্চিমে ধনুকের মত বিস্তৃত রহিয়াছে। হিমালয়ের কোলে অবস্হিত নেপাল ও ভুটান ভারতের উত্তর সীমায় অবস্হান করিতেছে। হিমালয়ের উত্তরে চীনের অন্তর্ভুক্ত তিব্বত বিদ্যমান। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান এবং পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও পূর্বাংশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ অবস্হিত। ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও শ্রীলঙ্কা দ্বীপটি বিদ্যমান।

৮°৪′ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩৭°৬′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৬৮°৭′ পূর্ব দ্রাঘিমা হইতে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্হিত ভারত প্রাচ্য জগতের কেন্দ্রস্হলে অবস্হান করিতেছে। কর্কটক্রান্তি রেখা এই দেশকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করায় ইহার উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে পড়িয়াছে। ৮২½° পূঃ দ্রাঘিমা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত থাকিয়া এই দেশকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করায় ইহার সময়কে ভারতের স্ট্যান্ডার্ড সময় বলিয়া ধরা হয়।

প্রাচ্য জগতের কেন্দ্রস্থলে ভারত

ভারতের স্বাভাবিক সীমা বিদ্যমান। উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী ও উহার শাখা-প্রশাখা এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পর্বতসমূহ চীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণে ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব

সাগর ইহার স্বাভাবিক সীমা হিসাবে বিদ্যমান। তবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে এই দেশের কোনো স্বাভাবিক সীমারেখা নাই।

ভারতের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য ৬,১০০ কিলোমিটার। এই উপকূলরেখা অধিকাংশ স্থানে অভগ্ন হওয়া সত্ত্বেও ভারতের উপদ্বৈপ অবস্থানের জন্য ইহার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বহুসংখ্যক বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চলিয়া আসিতেছে। অতীতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে ভারত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এখনও ঐ সকল দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার, গোমাল ও বোলান গিরিপথের মাধ্যমে মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়িয়াছিল।

ভারতের অবস্থান বাণিজ্যের সহায়ক। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর এই দেশের বহির্বাণিজ্যের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। প্রাচীনকালেও এই সমুদ্রপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হইত। বর্তমানকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের যোগসূত্র হিসাবেও এই দেশ যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের বাণিজ্যপথের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া এই দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিলাভের প্রভূত সম্ভাবনা বিদ্যমান।

আয়তন—আয়তনে ভারত পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে; সোভিয়েত রাশিয়া, কানাডা, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও অস্ট্রেলিয়ার পরেই ভারতের স্থান। ভারতের আয়তন ৩২,৮৭,৫৮২ বর্গ-কিলোমিটার এবং ১৯৮১ সালের আদমশুমারের হিসাব অনুসারে লোকসংখ্যা ৬৮·৩৮ কোটি। উত্তর হইতে দক্ষিণে এই দেশ প্রায় ৩,২১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহার বিস্তার প্রায় ২,৯৩০ কিলোমিটার। ভারতের সৈকতরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬,১০০ কিলোমিটার; অর্থাৎ প্রতি ৫১৩ বর্গ-কিলোমিটারে ১ কিলোমিটার সৈকতরেখা এই দেশে বিদ্যমান। এই দেশের সৈকতরেখা বিশেষ ভগ্ন নহে এবং সমুদ্রোপকূল অগভীর। সেইজন্য দেশের আয়তনের তুলনায় বন্দরের সংখ্যা খুব কম।

প্রাকৃতিক অঞ্চল
(Natural Regions)

বিশাল আয়তনের এই দেশে বিভিন্ন রকমের ভূ-প্রকৃতি থাকা স্বাভাবিক। ভারতের উত্তরাংশে বিশালকায় হিমালয় পর্বতশ্রেণী, মধ্যভাগে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমভূমি, দক্ষিণে দক্ষিণাপথের মালভূমি এবং উপকূলভাগে সংকীর্ণ সমভূমি বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন অংশে এইরূপ বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতি থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু, রীতিনীতি, কৃষিজাত দ্রব্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারতকে প্রধানতঃ পাঁচটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় ঃ—(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (খ) উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি, (গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (ভারত উপদ্বীপের মালভূমি), (ঘ) উপকূলবর্তী সমভূমি এবং (ঙ) দ্বীপ অঞ্চল।

ক। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

হিমালয় পর্বতশ্রেণী কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত পামির গ্রন্থি হইতে নির্গত হইয়া ভারতের উত্তরাংশের উপর দিয়া অরুণাচল প্রদেশের পূর্বসীমা পর্যন্ত

ধনুকের আকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। কাশ্মীর হইতে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ২৪০ কিলোমিটার হইতে ৩২০ কিলোমিটার। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্তের দক্ষিণদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলটি অবস্থিত রহিয়াছে।

উচ্চতা অনুসারে হিমালয় পর্বতমালাকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ
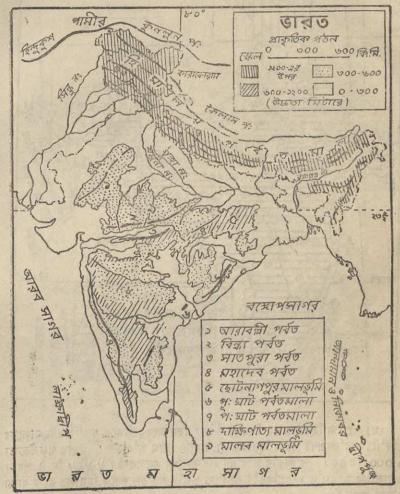
(ক) **বহির্হিমালয় বা শিবালিক**—হিমালয়ের সর্ব-দক্ষিণের নাতি-উচ্চ পর্বত-শ্রেণী বহির্হিমালয় নামে পরিচিত। পশ্চিম ভারতে এই পর্বতশ্রেণী আবার শিবালিক পর্বত নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতা ৩০০ মিটার হইতে ১,৫০০ মিটার। এই পর্বতশ্রেণীর উত্তরের উপত্যকাভূমি পশ্চিমে দুন এবং পূর্বে মারে নামে পরিচিত। বহির্হিমালয়ের দক্ষিণে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি বিদ্যমান।

(খ) **মধ্য হিমালয় বা হিমাচল**—বহির্হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত উপত্যকাভূমির উত্তরের পর্বতশ্রেণীকে মধ্য হিমালয় বা হিমাচল বলা হয়। ইহার উচ্চতা ১,০০০ মিটার হইতে ৫,০০০ মিটার। কাশ্মীর উপত্যকা ও উলার হ্রদ এই অঞ্চলে অবস্থিত।
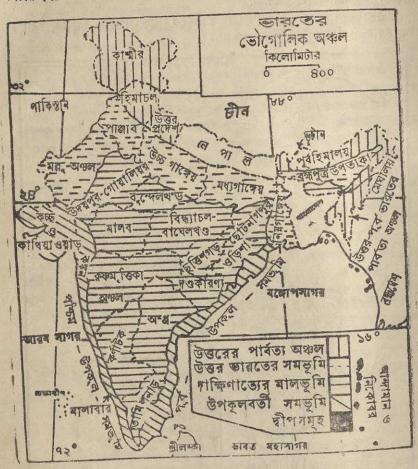
(গ) **প্রধান হিমালয় বা হিমাদ্রি**—মধ্য হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত হিমালয়ের সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী প্রধান হিমালয় বা হিমাদ্রি নামে পরিচিত। ইহার গড় উচ্চতা ৬,০০০ মিটার। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট (৮,৮৪৮ মি.) প্রধান হিমালয়ের অন্তর্গত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ১৪টি পর্বতশৃঙ্গকে হিমালয় বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

বিভিন্ন অংশের উচ্চতা, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) পশ্চিম হিমালয়, (খ) মধ্য হিমালয়, (গ) পূর্ব হিমালয়, (ঘ) উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল বা পূর্বাঞ্চল।

(ক) পশ্চিম হিমালয়—জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল কুমায়ুন
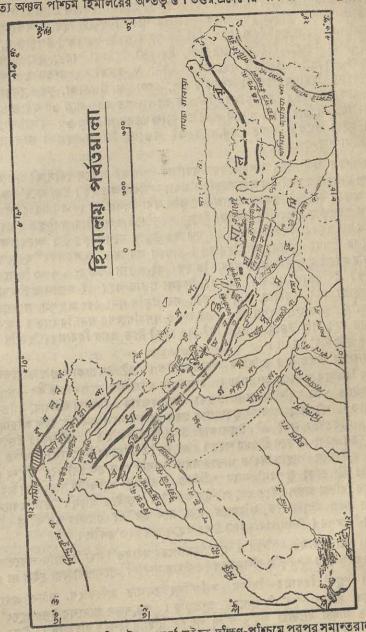
নামে পরিচিত। কাশ্মীরে উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে পরপর সমান্তরালভাবে কুনলুন, কারাকোরাম, লাডাক, জাস্কার, হিমাদ্রি ও পিরপাঞ্জাল—এই ছয়টি পর্বত-

শ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে। পিরপাঞ্জালের দক্ষিণে শিবালিক পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। হিমাদ্রি, পিরপাঞ্জাল, ধওলাধর ও শিবালিক পর্বতশ্রেণী হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে হিমাদ্রি, ধওলাধর ও শিবালিক পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। বিভিন্ন পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলির মধ্য দিয়া সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু, যমুনা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীগুলি প্রবাহিত হইতেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত কাশ্মীর উপত্যকা, হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কুলু ও কাঙড়া উপত্যকা, কুমায়ুনের দুন উপত্যকা বিখ্যাত। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম—গড়ে ৬০ হইতে ১০০ সেন্টিমিটার; তবে উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সেন্টিমিটারের কম হইয়া থাকে। উচ্চতা অনুসারে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিম হিমালয়ের নিম্নাংশের শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলে মৌসুমী অঞ্চলের অরণ্য দেখা যায়। বাঁশ এবং গুল্মভূমিও এখানে পরিলক্ষিত হয়। সেচকার্যের ফলে এই অঞ্চলে গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়। এখানকার লোক-বসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। শিবালিকের নিম্নে সমভূমিতে গঙ্গাতীরে অবস্থিত হরিদ্বার একটি বড় শহর। শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশের অব-হিমালয় (মধ্য হিমালয় বা হিমাচল) অঞ্চলে পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে মূল্যবান কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। এই অঞ্চলের উচ্চতা ১,৫০০ মিটারের অধিক। নৈনিতাল, মুসৌরী, শ্রীনগর, সিমলা প্রভৃতি শহর এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই স্থানে ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, গম প্রভৃতি শস্য এবং আপেল, আঙ্গুর, নাসপাতি প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চল পশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত। অব-হিমালয় অঞ্চলের উত্তরে ৫,৫০০ মিটারের বেশী উচ্চে প্রধান হিমালয় (হিমাদ্রি) অঞ্চলে কৃষিকার্য হয় না।

কাশ্মীর উপত্যকার চারিদিক পর্বতবেষ্টিত। এই উপত্যকা অঞ্চল ভারতের পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম—প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ সেন্টিমিটার। উচ্চতা অধিক হওয়ায় এখানকার জলবায়ু নাতি-শীতোষ্ণ। শীতকালে এখানে তুষারপাত হয়। গ্রীষ্মকালে জলবায়ু বেশ আরাম-দায়ক। বিতস্তা নদী এই উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত। এই নদীর উত্তরে উলার হ্রদ এবং দক্ষিণে শ্রীনগর শহর। এই নদী নৌবহনের উপযোগী ও শান্ত। নদীর দুইপাশে পাহাড়-পর্বত থাকায় সমগ্র অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। কাশ্মীর উপত্যকা ভূ-স্বর্গ নামে পরিচিত। এইজন্য পৃথিবীর নানা দেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু পর্যটক কাশ্মীরে বেড়াইতে আসে। তাই এখানে হোটেল-শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং মনে হয় এই রাজ্যের অর্থনীতি এই পর্যটন-শিল্পের (Tourist trade) উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

(খ) **মধ্য হিমালয়**—পশ্চিম ও পূর্ব হিমালয়ের মধ্যবর্তী মধ্য হিমালয় ভারতের বাহিরে নেপালের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এখানে উহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল না।

(গ) **পূর্ব হিমালয়**—সিকিম, দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ, ভুটান এবং অরুণাচল প্রদেশ পূর্ব হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত। অরুণাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নামচা বারোয়া পর্বত-শৃঙ্গ পর্যন্ত হিমাদ্রি বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সিংগালিলা পর্বতশ্রেণী দার্জিলিংকে নেপাল হইতে পৃথক করিয়াছে।

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল যেন তরাই অঞ্চলের উত্তরে হঠাৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে অব-হিমালয় ও তরাই অঞ্চলের মধ্যে শিবালিক জাতীয় কোনো নিম্ন পার্বত্য অঞ্চল নাই। অরুণাচলে আবার শিবালিক ধরনের পার্বত্য অঞ্চল দেখা যায়। এই অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে শিবালিক পর্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান আছে। শিবালিকের উত্তরে মধ্য হিমালয় (হিমাচল) এবং উহার উত্তরে প্রধান হিমালয় (হিমাদ্রি) দণ্ডায়মান রহিয়াছে; পূর্ব হিমালয়ের তিস্তা, সুবর্ণশ্রী ও ডিহং নদীর উপত্যকা উল্লেখযোগ্য। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী— ২০০ হইতে ৩০০ সেন্টিমিটার। এখানে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পর্বতের উচ্চ অংশে দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। তিস্তা উপত্যকায় ও অরুণাচল প্রদেশে ধান, চা, ভুট্টা, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। দার্জিলিং-এর চা ও কমলালেবু বিখ্যাত। চা এখানকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফসল। দার্জিলিং-এর চা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। দার্জিলিং অঞ্চল এখানকার অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকর্ষণীয় এবং সর্ববিষয়ে উন্নত।

(ঘ) **উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল বা পূর্বাচল**—হিমালয় পর্বতশ্রেণীর পূর্বপ্রান্তে আরও একটি পর্বতগ্রন্থি আছে। এই পর্বতগ্রন্থি হইতে একটি পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া ব্রহ্মদেশের সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল বা পূর্বাচল নামে পরিচিত। এই পর্বতশ্রেণী ভারতে **পাটকই**, নাগা ও **লুসাই** নামে এবং ব্রহ্মদেশে আরাকান য়োমা ও পেগুয়োমা নামে পরিচিত। নাগা পর্বত উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে। **বরাইল** পর্বত নাগা পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সহিত মিলিত হইয়াছে। বরাইল পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জাপভো (৩,০৪৮ মি.) এবং নাগা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সারামতি (৩,৮২৬ মি.)। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণে গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় পর পর পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত হইয়া বরাইল পর্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের উচ্চতা হিমালয়ের উচ্চতা অপেক্ষা অনেক কম। নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। মণিপুরের পর্বতবেষ্টিত উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অঞ্চলের মেঘালয়ের অন্তর্গত মৌসিনরাম-চেরাপুঞ্জি এলাকায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় (১,৩০০ সেন্টিমিটার)। অন্যত্র ২০০ হইতে ৩০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এখানে পর্ণমোচী বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই অরণ্যে প্রচুর কাষ্ঠ পাওয়া যায়। বনে শাল, সেগুন, ছাতিম, গর্জন, পাইন, ওক, বেত প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ধান এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। ইহাছাড়া চা, ইক্ষু, ডাল, পাট, আনারস, কমলালেবু প্রভৃতি স্থানে স্থানে জন্মে। পূর্ব হিমালয় শিল্পে খুব অনুন্নত।

অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের প্রভাব

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অত্যন্ত পর্বতসংকুল বলিয়া এই অঞ্চলে মানুষের জীবিকা অর্জন অত্যন্ত অসুবিধাজনক। এখানকার জমি অসমতল বলিয়া রাস্তাঘাট ও রেলপথ-নির্মাণ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। জমি উঁচু-নীচু হওয়ায় ও

বিক্ষিপ্ত থাকায় কৃষিকার্য করা খুব কষ্টসাধ্য। অনুন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা, সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব, বিরল লোকবসতি ও বাজারের দূরত্বের জন্য এই অঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্যের তেমন প্রসার ঘটে নাই।

হিমালয় পর্বতমালার উপরিস্থ হিমবাহ ও বরফগলা জলে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের অসংখ্য উপনদীর জন্ম সম্ভব হইয়াছে। এই সকল নদ-নদী দেশের কৃষিকার্যে, পরিবহণে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করিয়া ভারতের সমৃদ্ধি ঘটাইতেছে, কিন্তু এই সকল নদ-নদী হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ উপকারে লাগে নাই। পার্বত্য অঞ্চলের নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা হয় বলিয়া এই অঞ্চলের কোনো নদীই নৌ-বহনযোগ্য নহে; বরং নদীগুলি অতিক্রম করা দুঃসাধ্য বলিয়া বিচ্ছিন্নতা আরও বৃদ্ধি করে। শীতকালে অনেক নদীর জল বরফে পরিণত হয়। এই সকল খরস্রোতা নদ-নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চাহিদার অভাবে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণের অসুবিধার জন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য।

জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে নানা প্রকারের উদ্ভিদ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন উচ্চতায় জন্মিয়া থাকে। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলেই হিমালয় অঞ্চলে অপর্যাপ্ত বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই বনভূমির উপর বহুলোকের জীবিকা নির্ভর করে। এখানকার জলবায়ু ও মৃত্তিকা চা, আঙুর, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি ফল উৎপাদনের অনুকূল বলিয়া অধিবাসীরা চা ও ফলের চাষ করে। পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুতে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর ঘাস উৎপন্ন হয়। এই ঘাস খাওয়াইয়া বহুলোক পশুপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পার্বত্য অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর। তাহা ছাড়া গ্রীষ্মকালে পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভাও মনোরম। সেইজন্য দেশবিদেশের বহু ভ্রমণকারী হিমালয় অঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আসে।

মোটের উপর পার্বত্য অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়া এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

হিমালয়ের উপকারিতা—(ক) পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী হিমালয় ভারতের উত্তর সীমায় প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুকে বাধা দিয়া ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাইতেছে। (খ) শীতকালে মধ্য এশিয়ার শীতল ও শুষ্ক বায়ুর দাপট হইতে ইহা ভারতকে রক্ষা করিতেছে। (গ) হিমালয়ের উপরিস্থ হিমবাহ ও বরফগলা জলে উত্তর ভারতে প্রায় সবগুলি নদ-নদী উৎপন্ন হইয়াছে এবং সারা বৎসর পুষ্ট হইতেছে। (ঘ) হিমালয় হইতে পলি বহন করিয়া আনিয়া নদীগুলি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি গঠন করিয়াছে। (ঙ) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নদনদীগুলির খরস্রোত হইতে স্থানে স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করার সুবিধা হইতেছে। (চ) হিমালয়ের বুকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বনভূমি বিদ্যমান। (ছ) হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। (জ) হিমালয়ের বুকে বহু স্বাস্থ্যকর স্থান ও তীর্থস্থান আছে। (ঝ) হিমালয় বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত হইতে ভারতকে কতকাংশে রক্ষা করিতেছে। (ঞ) হিমালয়ের অধিবাসীরা সাহসী ও যোদ্ধা বলিয়া ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

খ। উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি

সিন্ধু (ভারতের অন্তর্ভুক্ত অংশ), গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ইহার

অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এবং পশ্চিমে পাকিস্তান সীমান্ত হইতে পূর্বে উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ইহার অন্তর্গত। ইহার দৈর্ঘ্য ২,৫০০ কিলোমিটারের বেশী এবং প্রস্থ ২৪০ হইতে ৩২০ কিলোমিটার। মরু অঞ্চল ব্যতীত অধিকাংশ স্থানে নদীবাহিত পলিমাটি থাকায় এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। এই অঞ্চলকে নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) **মরু-অঞ্চল**—রাজস্থানের পশ্চিমাংশে থর মরুভূমি অবস্থিত। মৌসুমী-বায়ু যখন এখানে আসিয়া পেঁছায় তখন ইহাতে জলকণা থাকে না বলিয়া এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। এই মরু অঞ্চলে স্বভাবতঃই লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। মরূদ্যান অঞ্চলে জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো কোনো স্থানে কৃষিকার্য হইতেছে। বিকানীর এখানকার উল্লেখযোগ্য শহর।

(২) **পাঞ্জাবের সমভূমি**—পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য এই সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধুনদের উপনদীসমূহের উপত্যকায় ইহা অবস্থিত। পলিগঠিত বলিয়া এতদঞ্চলে কৃষির উন্নতি হইয়াছে। বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম—৫০ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ। সেইজন্য জলসেচের সাহায্যে গম, যব, জোয়ার, বাজরা, তুলা, তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার বনভূমি অঞ্চলে দেবদারু গাছ দেখা যায়। এই অঞ্চল পশমী বস্ত্র বয়নে, চর্মশিল্পে ও দোহশিল্পে (Dairy plant) উন্নতিলাভ করিয়াছে। লুধিয়ানা, অমৃতসর, আম্বালা প্রভৃতি শহর এই অঞ্চলে অবস্থিত।

(৩) **উচ্চগাঙ্গেয় সমভূমি**—দিল্লীর পূর্ব হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ। জলবায়ু অনেকটা শুষ্ক। এখানেও সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। গম, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, ধান, ভুট্টা, তুলা ও তৈলবীজ এখানকার প্রধান কৃষিজাত সম্পদ। এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। চিনি, বস্ত্র, কাগজ, দিয়াশলাই, রাসায়নিক দ্রব্য ও চর্মশিল্প এখানকার উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্প। এলাহাবাদ, লক্ষ্মৌ, কানপুর, মথুরা প্রভৃতি শহর এই সমভূমির শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত।

(৪) **মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি**—পশ্চিমে এলাহাবাদ হইতে পূর্বদিকে বিহারের পূর্বসীমা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। বিহারের উত্তর অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭৫ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ। জলবায়ু সমভাবাপন্ন। উত্তরাংশে সেচ-ব্যবস্থা বিদ্যমান। কৃষিকার্য এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। গম, ধান, যব, জোয়ার, রাই, তিসি, ইক্ষু ও তৈলবীজ এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। এখানকার রেশম ও চিনিশিল্প বিখ্যাত। বারাণসী, ভাগলপুর, মির্জাপুর, মজঃফরপুর প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত শহর।

(৫) **নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি**—গাঙ্গেয় উপত্যকার নিম্নাংশ ইহার অন্তর্গত। উত্তরে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল ও পশ্চিমে পুরুলিয়ার মালভূমি ছাড়া বাকি পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার পলিগঠিত মৃত্তিকা উর্বর হওয়ায় এবং অধিক বৃষ্টিপাতের (১০৫ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ) ফলে কৃষিকার্য ভালো হয়। ধান, পাট, গম, তৈলবীজ, ইক্ষু, ডাল, আলু, পান প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত সম্পদ। রানীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে প্রচুর কয়লা

থাকায় এই অঞ্চল শিল্পে খুব উন্নতিলাভ করিয়াছে। পাট, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক, কাগজ ও বস্ত্রশিল্পের জন্য এই অঞ্চল বিখ্যাত। কলিকাতা, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর এই সমভূমির বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র।

(৬) **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা**—ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় অবস্থিত প্রায় সমগ্র আসাম এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে গড়ে ২৫০ সেঃ মিঃ-এর বেশী বৃষ্টিপাত হয়। ধান, চা, তৈলবীজ, পাট, লেবু, আনারস প্রভৃতি এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য; খনিজ তৈল এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ। বনভূমি হইতে উৎকৃষ্ট কাঠ সংগ্রহ করা হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া আসামের অধিকাংশ কৃষিজাত দ্রব্য এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এখানকার চা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহার সাহায্যে ভারতের বহু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ সুনাব্য বলিয়া পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এই নদীপথে চা ও কাঠ কলিকাতা বন্দরে প্রেরিত হয়। খনিজ তৈল এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সম্পদ। নলযোগে ইহা বিহারে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এখানকার মানুষ প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। শ্রমশিল্প এখনও বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কৃষিজাত সম্পদের মধ্যে ধান ও পাট নদীপথে কলিকাতায় প্রেরিত হয়। খাদ্যে এই অঞ্চল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গৌহাটি এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর উত্তর ভারতের সমভূমির প্রভাব

নদীগঠিত এই সমভূমির ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু ও মৃত্তিকা **কৃষিকার্যের** সহায়ক। এই বিশাল সমভূমির পলিমাটির উপর দিয়া ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী প্রবাহিত থাকায় জলসেচের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলের পূর্বাংশে যথেষ্ট **বৃষ্টিপাত** হয়; ইহা কৃষিকার্যের সহায়ক। বৃষ্টিপাতের ফলে নদ-নদীতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানকার নদ-নদী হইতে খাল কাটিয়া অনায়াসে জলসেচের বন্দোবস্ত করা যায়। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের উপনদীসমূহ **পলিমাটি** বহন করিয়া আনিতেছে বলিয়া এই সমভূমির উর্বরতাশক্তি কখনও হ্রাস পায় না। বাঁধ দিয়া এই অঞ্চলের নদ-নদীগুলিতে **জলসেচের ও জলবিদ্যুৎ** উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

সমভূমিতে রেলপথ ও সড়কপথ নির্মাণ করা সহজসাধ্য; জলপথে নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার প্রভৃতি চলে। সেইজন্য এখানে **পরিবহণব্যবস্থা** উন্নতিলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন পলিমাটিতে গম, আলু, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, ছোলা, তৈলবীজ এবং নবীন পলিমাটিতে ধান, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি ভাল জন্মে। উর্বর মাটিতে পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি **কাঁচামাল** প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই সকল কাঁচামালকে কেন্দ্র করিয়া এখানে নানাপ্রকার **শ্রমশিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল সুবিধা থাকায় এই সমভূমিতে **ঘন লোকবসতি** বিদ্যমান। জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত বলিয়া এখানকার **অধিবাসীরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে** উন্নত।

নদ-নদীগুলি হইতে নানা প্রকার সুবিধা পাওয়া গেলেও কোনো কোনো নদী অনেক সময় মানুষের অশেষ কষ্টের কারণ হয়; ব্রহ্মপুত্র, দামোদর ও কুশী নদী বর্ষাকালে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। ইহার ফলে বন্যা হয় এবং মানুষের দুঃখকষ্টের সীমা থাকে না। মরুভূমি অঞ্চল নদীগঠিত সমভূমি নহে এবং প্রায় বৃষ্টিহীন বলিয়া সমভূমি হওয়া সত্ত্বেও পশ্চাৎপদ।

গ। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
(ভারত উপদ্বীপের মালভূমি)

উত্তর ভারতে সমভূমির দক্ষিণে ভারত উপদ্বীপের বিশাল প্রাচীন মালভূমি অবস্থিত। পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বত হইতে পূর্বে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমি এই মালভূমির উত্তরসীমা; দক্ষিণে ইহা কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মালভূমির পশ্চিমাংশে **পশ্চিমঘাট পর্বত** বা **সহ্যাদ্রি** (১,২০০ মি.) এবং পূর্বাংশে **পূর্বঘাট পর্বত** বা **মলয়াদ্রি** (৬১০ মি.) অবস্থিত।

বহুযুগ ধরিয়া দক্ষিণের এই প্রাচীন ভূখণ্ডটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অঞ্চলগুলি পাহাড়-পর্বতে এবং অপেক্ষাকৃত নরম শিলা দ্বারা গঠিত অঞ্চলগুলি উপত্যকা ও সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে। নদীগুলি এই তরঙ্গায়িত ভূমিভাগের উপর প্রশস্ত উপত্যকা গঠন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

এই মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে **আরাবল্লী** পর্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা পৃথিবীর প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত ভঙ্গিল পর্বত; আরাবল্লীর দক্ষিণে মধ্যভারতের উচ্চভূমি; উহার দক্ষিণে **বিন্ধ্য** পর্বত। বিন্ধ্যের পূর্বে **ভানরার** পর্বত এবং উহার পূর্বে **কৈমুর** পর্বত অবস্থিত। বিন্ধ্যের দক্ষিণে নর্মদা উপত্যকা। এই উপত্যকার দক্ষিণে **সাতপুরা** পর্বত। ভারতের মধ্যভাগের উপর দিয়া **সাতপুরা, মহাদেব** ও **মহাকাল** পর্বত পর পর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। মহাকালের আরও উত্তর-পূর্বে **রাজমহল** পাহাড়। **মাউন্ট আবু** (১,৭২২ মি.) আরাবল্লীর, **ধুপগড়** (১,৩৫০ মি.) সাতপুরার, **পাঁচমারী** (১,০৫০ মি.) মহাদেবের, **অমরকণ্টক** (১,০৫৭ মি.) মহাকালের এবং **পরেশনাথ** (১,৩৫০ মি.) রাজমহলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। তাপ্তী উপত্যকার দক্ষিণে **অজন্তা** পাহাড়।

সাতপুরা, মহাদেব ও মহাকাল পর্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত মালভূমির দক্ষিণাংশটি দেখিতে ত্রিভুজের মত। ত্রিভুজাকৃতি এই মালভূমির পশ্চিমাংশের উপর দিয়া **পশ্চিমঘাট** পর্বতমালা উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত রহিয়াছে। আবার ইহার পূর্বাংশের উপর দিয়া **পূর্বঘাট** পর্বতমালা উত্তর-পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দুইটি পর্বতমালা মালভূমির দক্ষিণ দিকে **নীলগিরি** পর্বতে মিলিত হইয়াছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মাঝে মাঝে কয়েকটি ফাঁক (gap) দেখা যায়; যেমন, থলঘাট ও ভোরঘাট। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা আরব সাগরের উপকূল হইতে খাড়াভাবে উঠিয়া গিয়াছে। ইহা প্রায় একটানাভাবে পশ্চিম উপকূলের সমান্তরালে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পর্বতমালা পূর্বদিকে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে নামিয়া তরঙ্গায়িত মালভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **কালসুবাই** (১,৬৪৬ মি.)। পূর্বঘাট একটি অবিচ্ছিন্ন পর্বতমালা নহে; প্রকৃতপক্ষে মালভূমির কতকগুলি অবশিষ্টাংশ নদ-নদী প্রশস্ত উপত্যকা দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পর্বতাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে **মহেন্দ্রগিরি, ভেলিকোণ্ডা, শেভরয়, পচামালাই** উল্লেখযোগ্য। এইগুলির মধ্যে মহেন্দ্রগিরি (১,৫০৯ মি.) সর্বোচ্চ।

নীলগিরি পর্বতের দক্ষিণে পালঘাট সমভূমি। উহার দক্ষিণে **আন্নামালাই** ও **পালনী** পর্বত এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সর্বদক্ষিণে **কাডার্মম** পর্বত। নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গের নাম দোদোবেত্তা (২,৬৩৭ মি.)। আন্নামালাই পর্বতের **আনাইমুদি** (২,৬৯৫ মি) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এই

মালভূমি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু। উল্লিখিত বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত ভারত উপদ্বীপের মালভূমি অঞ্চলকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ
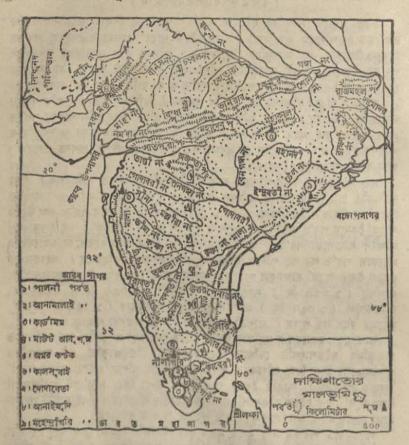
(১) মধ্যভারতের মালভূমি—উত্তর-পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বত হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ পর্যন্ত মধ্যভারতের মালভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানকার বৃষ্টিপাত ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ। তুলা, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য এখানে জন্মে। পূর্বদিকের জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন; কিন্তু রাজস্থান অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক। এখানকার লোকবসতি অপেক্ষাকৃত কম। পশুপালন এখানকার লোকের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। ঝাঁসী, জব্বলপুর, আজমীর, জয়পুর প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহর।

(২) উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল—মহানদী ও গোদাবরী উপত্যকা এবং ছোটনাগপুর মালভূমি ইহার অন্তর্গত। এখানকার বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ১৫০ সেঃ মিঃ। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া জলসেচ করা হয়। কৃষিজাত সম্পদের মধ্যে ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ও তৈলবীজ প্রধান। ভারতের মধ্যে এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে সর্বাধিক উন্নত। কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ সম্পদ এখানে পাওয়া যায়।

(৩) **কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল**—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, পশ্চিম উপকূলের সমভূমি বাদে প্রায় সমগ্র মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাংশ, অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটকের কিয়দংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ব্যাসল্ট লাভা হইতে এখানকার মৃত্তিকা গঠিত বলিয়া ইহার বর্ণ কালো। এখানে বৃষ্টির জল তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায় না। এই কৃষ্ণমৃত্তিকা ভারতের তুলা-চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। সেজন্য অনেকে এই অঞ্চলকে কৃষ্ণ-তুলা-মৃত্তিকা (Black Cotton Soil) অঞ্চল বলে। ইহাছাড়া এখানে গম, ইক্ষু ও বাজরা উৎপন্ন হয়। তুলা চাষের জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ বস্ত্র-শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৪) **দাক্ষিণাপথ অঞ্চল**—কর্ণাটক রাজ্যের দক্ষিণাংশ এবং অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুর মধ্যবর্তী অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত; বৃষ্টিপাত ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ। সেইজন্য পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের উত্তরাংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া বৃষ্টির অভাবে কৃষিকার্যের ক্ষতি হয়। সেইজন্য ইহা দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। দক্ষিণাংশে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, তুলা, কফি, চা, রবার, কাজুবাদাম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন হইয়া থাকে। এখানকার শ্রমশিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, সিমেন্ট শিল্প, বিমানপোত শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহীশূর, বাংগালোর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি এখানকার প্রধান শহর।

অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর দাক্ষিণাত্যের মালভূমির প্রভাব

মালভূমি অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা সমভূমি অঞ্চল হইতে পশ্চাৎপদ, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চল হইতে উন্নত। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখানকার অধিকাংশ জায়গার মৃত্তিকা নদীগঠিত সমভূমির পলিমাটি অপেক্ষা কম উর্বর। সেইজন্য কৃষি-উৎপাদন কম হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পাহাড়-পর্বতময় অঞ্চলে কৃষিকার্য চলে না। তবে এখানকার কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল তুলাচাষের জন্য বিখ্যাত। পশ্চিমঘাট পর্বতের ও মালভূমির বিভিন্ন এলাকা বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ বলিয়া এতদঞ্চলে নানাপ্রকার মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায়। মালভূমি অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। এখানকার ছোটনাগপুর মালভূমি ভারতের মধ্যে খনিজ সম্পদে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। তাহা ছাড়া ছত্তিশগড় ও ওড়িশার উচ্চভূমি এবং কর্ণাটক মালভূমি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। মালভূমি অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। সেইজন্য এখানকার পরিবহণ ব্যবস্থা উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের মত উন্নত নহে। এই সকল কারণে শিল্পের উন্নতিউত্তরের সমভূমি বা উপকূলের সমভূমির মত হয় নাই। বর্তমানে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এলাকাগুলিতে দ্রুত শিল্পের বিকাশ ঘটিতেছে। উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা থাকার দরুন দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমি অপেক্ষা অনেক কম এবং অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত।

ঘ। উপকূলবর্তী সমভূমি

ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে বিস্তীর্ণ সমভূমি বিদ্যমান; পূর্ব উপকূলের পশ্চাতে পূর্বঘাট পর্বতমালা এবং পশ্চিম উপকূলের পশ্চাতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দাঁড়াইয়া আছে। উভয় উপকূলেই মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে

বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিম উপকূলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই উপকূলভূমিকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয় ; যথা ঃ

(১) **গুজরাটের উপকূলভূমি**—এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া এবং ভূমি অনুর্বর হওয়ায় কৃষির উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু যে সকল স্থানে কৃষ্ণমৃত্তিকা আছে, সেখানেই তুলাচাষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। কোনো কোনো স্থানে গম, জোয়ার ও বাদাম জন্মে। এখানে লোকবসতিও কম। চুনাপাথর ও লবণ এখানকার প্রধান খনিজ সম্পদ। কাণ্ডালা, ওখা, পোরবন্দর ও সুরাট এই উপকূলভূমির উল্লেখযোগ্য বন্দর। এই অঞ্চলের পূর্বাংশে অবস্থিত আমেদাবাদে ভারতের শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) **কোঙ্কণ উপকূল**—পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই হইতে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম কোঙ্কণ উপকূল। এখানকার বৃষ্টিপাত ২০০ সেঃ মিঃ হইতে ২৫০ সেঃ মিঃ। সেইজন্য এখানে সেগুন, শাল ও আবলুস বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এখানে নারিকেল, সুপারি, ধান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কয়লার অভাবে জলবিদ্যুতের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পে আমেদাবাদের পরেই এখানকার বোম্বাই-এর স্থান। ইহা ছাড়া তৈল-শোধন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, মুদ্রণশিল্প ইত্যাদি উন্নতি-লাভ করিয়াছে। বোম্বাই ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর। (৩) **মালাবার উপকূল**—পশ্চিম উপকূলে গোয়া হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম মালাবার উপকূল। এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা কোঙ্কণ উপকূল অপেক্ষা উন্নত। আদা, মরিচ, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি এখানকার কৃষিজাত সম্পদ। উচ্চস্থানে সেগুন, চন্দন ও আবলুস বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এখানকার দাঁড়, রবার ও সাবান শিল্প উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। কোচিন, ত্রিবান্দ্রম, কোঝিকোড়, কুইলন ইত্যাদি এখানকার প্রধান শহর। নিউ মাঙ্গালোর, মার্মাগাও, কোঝিকোড ও কোচিন এই উপকূলের উল্লেখযোগ্য বন্দর। (৪) **করমণ্ডল উপকূল বা কর্ণাট অঞ্চল**—পূর্ব উপকূলে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে কৃষ্ণানদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী নহে। সেচব্যবস্থার মাধ্যমে ধান, জোয়ার, বাজরা, তুলা, ইক্ষু, চা, নারিকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বনভূমি অঞ্চলে আবলুস, সেগুন ও সিঙ্কোনা গাছ জন্মে। এখানকার লোকবসতি ঘন। তামিলনাড়ুতে বস্ত্রশিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। মাদ্রাজ, তুতিকোরিণ, পণ্ডিচেরী, মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত শহর। মাদ্রাজ ও তুতিকোরিণ এখানকার প্রসিদ্ধ বন্দর। (৫) **নর্দার্ন সারকার্স (উত্তর সরকার) উপকূল**—অন্ধ্র প্রদেশ ও ওড়িশার উপকূলে কৃষ্ণানদীর মোহানা হইতে মহানদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। এখানকার মৃত্তিকা উর্বর ; সেইজন্য এখানে ধান, জোয়ার, বাজরা, মসলা, নারিকেল, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বনভূমিতে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। এখানে বিশাখাপতনমে ভারতের বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণশিল্প অবস্থিত। কটক, পুরী প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত শহর। বিশাখা-পতনম ও পারাদিপ এই উপকূলের উন্নতিশীল দুইটি বন্দর।

অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর উপকূলের সমভূমির প্রভাব

উপকূলের সমভূমি কৃষিকার্যে উন্নত ; পলিমাটি গঠিত ব-দ্বীপ অঞ্চল কৃষি-

ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চল বিভাগ
ভারত
উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল
উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
উপকূলবর্তী সমভূমি
দ্বীপ অঞ্চল
পূর্ব হিমালয়
পশ্চিম হিমালয়
উঃ-পূঃ পার্বত্য অঞ্চল
মরু অঞ্চল
পাঞ্জাবের সমভূমি
উচ্চগাঙ্গের সমভূমি
মধ্যগাঙ্গের সমভূমি
নিম্নগাঙ্গের সমভূমি
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা
মহারাষ্ট্রের মালভূমি
উত্তর-পূর্ব মালভূমি
কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল
দাক্ষিণাত্য অঞ্চল
গুজরাট উপকূল
কঙ্কণ উপকূল
মালাবার উপকূল
করমণ্ডল উপকূল
নর্দার্ন সারকার্স উপকূল
(উত্তর সরকার উপকূল)
বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
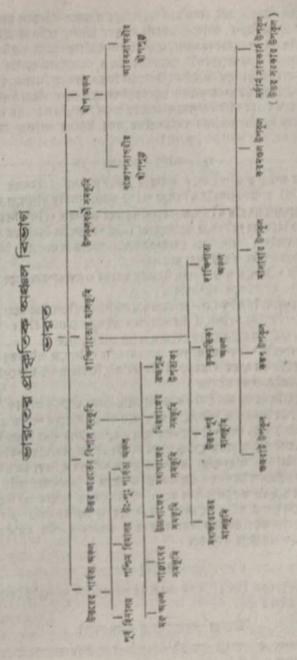
কার্যে বিশেষ উন্নত। এই সমভূমিতে সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে নারিকেল গাছ জন্মে ও নারিকেল উৎপন্ন হয়। উপকূল অঞ্চলের উপহ্রদ (চিল্কা, পুলিকট ইত্যাদি) এবং অগভীর সমুদ্রে নানারকম মৎস্য, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি পাওয়া যায়। রেলপথে, সড়কপথে ও উপকূলবর্তী সমুদ্রপথে উন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বিশাখাপতনম্, মাদ্রাজ, কোচিন, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় বন্দর আছে। প্রত্যেকটি বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। বোম্বাই শিল্পাঞ্চল ভারতের প্রধান শিল্পাঞ্চল। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত বলিয়া লোকবসতির ঘনত্ব উত্তরের গাঙ্গেয় সমভূমির অনুরূপ।

৬। দ্বীপ অঞ্চল

ভারতের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপগুলিকে অবস্থান অনুসারে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও (খ) আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ।

(ক) **বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ**—বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলির মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য। এই দ্বীপগুলি নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণীর উত্থিত অংশ। আন্দামানে কোথাও কোথাও পাহাড় দেখা যায়। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে উল্লেখযোগ্য পাহাড় দেখা যায় না।

এই দুইটি দ্বীপপুঞ্জ ছাড়াও বঙ্গোপসাগরে **ব্যারেন ও নরকোণ্ডাম** নামে দুইটি দ্বীপ আছে। ইহারা মৃত আগ্নেয়গিরি।

(খ) **আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ**—আরবসাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলির মধ্যে লাক্ষা, আমিনদিভি ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি প্রবাল দ্বীপ। দ্বীপগুলির তটরেখার সন্নিকটে কোথাও কোথাও প্রবাল প্রাচীর আছে।

বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকতর উন্নত। মূল ভূখণ্ড হইতে কম দূরত্ব ও প্রবালদ্বীপীয় উর্বর মৃত্তিকার জন্যই আরবসাগরীয় দ্বীপগুলির উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর দ্বীপের প্রভাব

ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলিয়া উহাদের স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়িয়া উঠে নাই। ফলে দ্বীপগুলিকে মূল ভূখণ্ডের উপর নানা বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। সেইজন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডের নিকটবর্তী আরবসাগরের দ্বীপগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত। তাহা ছাড়া এই সকল প্রবাল দ্বীপের মৃত্তিকা উর্বর বলিয়া কৃষিকার্যে ও নারিকেল উৎপাদনে উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখানকার প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১,২৫৮ জন লোক বাস করে। অন্যদিকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মূল ভূখণ্ড হইতে দূরবর্তী ও বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য কৃষিকার্যে অনুন্নত বলিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়া অনগ্রসর। এখানকার প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে মাত্র ২৩ জন লোক বাস করে।

নদ-নদী

ভারত নদীমাতৃক দেশ। নিম্নে ভারতের প্রধান প্রধান নদ-নদীর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল:

উত্তর ভারতের নদ-নদী

সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উপনদী ও শাখানদীসহ উত্তর ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সিন্ধু—তিব্বতের মালভূমিতে মানস সরোবরের প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া কাশ্মীর রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া বাহির হইয়া সিন্ধু নদ পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতে সিন্ধুর দৈর্ঘ্য মাত্র ৭০৯ কিলোমিটার। সিন্ধুর উপনদী শিয়োক কেবলমাত্র কাশ্মীরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা সিন্ধুর পাঁচটি প্রধান উপনদী। বিতস্তা কাশ্মীর উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর তীরে শ্রীনগর শহরটি অবস্থিত। চন্দ্রভাগা হিমাচল প্রদেশ ও জম্মুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতী হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের উপর দিয়া বাহিয়া যাইতেছে। হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলার
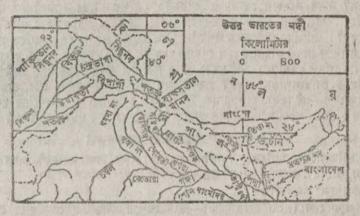
রোটাং গিরিপথের কাছে উৎপন্ন হইয়া বিপাশা ভারতেই শতদ্রু নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অন্যান্য উপনদীগুলি সবই পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে।

গঙ্গা—ভারতের নদ-নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ; কোনো কোনো ভূগোলবিদ পণ্ডিতের মতে গঙ্গা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদী। ইহার দৈর্ঘ্য ২,৪০০ কিলোমিটার। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহের গোমুখ গহ্বর হইতে গঙ্গার উৎপত্তি।

গঙ্গোত্রী হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমস্থ পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া ২০৮ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া এই রাজ্যের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পতিত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। গঙ্গার বামতীর হইতে রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, বুড়ী গণ্ডক ও কুশী এবং দক্ষিণ তীর হইতে যমুনা, শোণ প্রভৃতি উপনদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। হিমালয়ের যমুনোত্রী নামক হিমবাহ হইতে যমুনার উৎপত্তি। যমুনা গঙ্গার প্রধান উপনদী। আবার চম্বল ও বেত্রোয়া যমুনার উপনদী।

পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া গঙ্গা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। মূলশাখা পদ্মা নামে বাংলাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। অপর শাখা ভাগীরথী নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি উপনদীসমূহ ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে; ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী গঙ্গার ব-দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। গঙ্গার অধিকাংশ

নৌবহনযোগ্য। গঙ্গানদীর তীরেই **হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, কলিকাতা, হাওড়া** প্রভৃতি শহর এবং যমুনার তীরে **বৃন্দাবন, মথুরা ও আগ্রা শহর** অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র নদ—তিব্বতের **মানস সরোবরের** ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ **সাংপো** নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া অরুণাচল প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত নামচা বারওয়া পর্বতশৃঙ্গের নিকটে ডানদিকে বাঁকিয়া **ডিহং** নামে অরুণাচল প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই অংশে **ডিবং ও লোহিত (লুহিত)** ডিহং-এর সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে ইহাদের মিলিত স্রোত **ব্রহ্মপুত্র** নাম গ্রহণ করিয়া সাদিয়ার কাছে আসামের সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। **সুবর্ণশ্রী, ভরলী, মানস, সংকোশ, তোর্সা ও তিস্তা** ইহার দক্ষিণ তীরের উপনদী এবং **বুড়ি-ডিহিং, দিসাং, ধনশ্রী, কোপিলি, ডিগারু, সিংরা, জিনিরাম** প্রভৃতি ইহার বামতীরের উপনদী। আসামের সমভূমির উপর দিয়া ব্রহ্মপুত্র ধুবড়ী পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেখানে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া **বঙ্গোপসাগরে** পতিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে অবস্থিত **সাদিয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী** প্রভৃতি আসামের বড় বড় শহর। চীন, ভারত ও বাংলাদেশ—এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত। ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৬০০ কিলোমিটার; কিন্তু ভারতে ইহার দৈর্ঘ্য মাত্র ৮৮৫ কিলোমিটার।

দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী

দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত নদ-নদীগুলির মধ্যে সুবর্ণরেখা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা ও তাপ্তী উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববাহিনী নদ-নদী:

সুবর্ণরেখা (৪৩০ কিলোমিটার)—ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী বিহার ও ওড়িশার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বালেশ্বরের নিকট বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর রাঁচীর নিকটবর্তী হুড্রু জলপ্রপাত ভারতবিখ্যাত।

মহানদী (৯০০ কিলোমিটার)—এই নদী দণ্ডকারণ্যের উত্তর প্রান্তের উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্য প্রদেশ ও ওড়িশার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। **ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী** সহ মহানদী বিশাল বদ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। কটক শহরের নিকট হইতে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া মহানদী ব-দ্বীপের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। **সম্বলপুর ও কটক** মহানদীর তীরবর্তী বিখ্যাত শহর।

গোদাবরী (১,৪৪০ কিলোমিটার)—পশ্চিম উপকূল হইতে ৮০ কিলোমিটার পূর্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নাসিক জেলায় **ত্রিম্বকের** নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া দাক্ষিণাত্যের বৃহত্তম নদী গোদাবরী মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার মোহানায় প্রশস্ত ব-দ্বীপ আছে। পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা ও বেনগঙ্গার মিলিত প্রবাহের নাম প্রাণহিতা। **প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী** ও **মঞ্জিরা** গোদাবরীর প্রধান উপনদী।

কৃষ্ণা (১,৪০০ কিলোমিটার)—আরবসাগর হইতে ৬৫ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমঘাটের **মহাবালেশ্বরের** নিকটে উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণানদী মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া **বঙ্গোপসাগরে** পতিত হইয়াছে। **ভীমা** ইহার বাম তীরের এবং **তুঙ্গভদ্রা** ইহার দক্ষিণ তীরের উপনদী। কৃষ্ণার ব-দ্বীপ গোদাবরীর ব-দ্বীপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। **সাতারা** ও **বেজওয়াদা** এই নদীর তীরে অবস্থিত দুইটি বড় শহর। অন্ধ্র প্রদেশে এই নদীতে বিখ্যাত নাগার্জুনসাগর বাঁধ (Dam) নির্মিত হইয়াছে।

কাবেরী (৮০০ কিলোমিটার)—**পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ব্রহ্মগিরি** পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কাবেরী কর্ণাটক ও তামিলনাডু রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া **বঙ্গোপসাগরে** পতিত হইয়াছে। এই নদীর গতিপথে শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত ও কোনো কোনো স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বিদ্যমান। **শিমসা** কাবেরীর উল্লেখযোগ্য উপনদী। শ্রীরঙ্গমের পরে কাবেরী দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর-পূর্বমুখী মূল শাখা **কোলরুণ** নামে এবং অপর শাখা কাবেরী নামেই বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। কাবেরীর ব-দ্বীপ বেশ বড়। এইগুলি ছাড়া **পেনার, পালার** ও **ভাইগাই** নদী পূর্ব-উপকূলে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পশ্চিমবাহিনী নদ-নদী ঃ

নর্মদা (১,২৮০ কিলোমিটার)—মহাকাল পর্বতের **অমরকণ্টক শৃঙ্গ** হইতে উৎপন্ন হইয়া নর্মদা সাতপুরা পর্বতের উত্তর দিকের গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া **কাম্বে** উপসাগরে পতিত হইয়াছে। জব্বলপুরের নিকট এই নদী মার্বেল পাহাড় ভেদ করিয়াছে। পাহাড় হইতে অবতরণ কালে নর্মদা জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। এই নদীর মোহানায় কোনো ব-দ্বীপ নাই। **ব্রোচ** শহর নর্মদার মোহানায় অবস্থিত।

তাপ্তী (৭৫০ কিলোমিটার)—**মহাদেব** পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণদিকের গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদী কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপনদীর নাম পূর্ণা। তাপ্তীর মোহানায়ও কোনো ব-দ্বীপ নাই। **সুরাট** বন্দর এই মোহানায় অবস্থিত।

আরবসাগরে পতিত পশ্চিম উপকূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ-নদীগুলির মধ্যে **বৈতরণী, উলহাস,** আম্বা, **নেত্রবতী, পেরিয়ার** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিমোগার নিকটে উৎপন্ন হইয়া **শরাবতী** নদী আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্বতগাত্রে ২৫০ মিটার উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইয়া এই নদী যোগ জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে।

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীর তুলনা

উত্তর ভারতের নদ-নদী	দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী
১। অধিকাংশ নদ-নদী হিমবাহ হইতে উৎপন্ন ; সেইজন্য সমস্ত বৎসর তুষারগলা জলে ও বৃষ্টির জলে এইগুলি পুষ্ট থাকে।	১। হিমবাহ হইতে উৎপন্ন নহে বলিয়া কেবল বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পুষ্ট হয় ; অন্য সময়ে জল বিশেষ থাকে না বা কম থাকে।

উত্তর ভারতের নদ-নদী	দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী
২। নদীর খাতগুলি চওড়া ও গভীর হয়; সমস্ত বৎসরই জল থাকে বলিয়া অধিকাংশ নদ-নদী নৌ-বহনযোগ্য।	২। বর্ষাকালে স্রোত অত্যন্ত প্রবল হয় এবং নদীখাতগুলি গভীর ও অপ্রশস্ত; সমস্ত বৎসর জল থাকে না বলিয়া নৌ-বহনযোগ্য নহে।
৩। নদ-নদীগুলি নবীন ও সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া প্রায়ই গতি পরিবর্তন করে।	৩। নদ-নদীগুলি প্রাচীন ও মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া গতি পরিবর্তন করে না।
৪। নদ-নদীগুলি প্রশস্ত বলিয়া স্রোতের বেগ কম থাকে। এইজন্য নদ-নদীগুলি সমতলভূমিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল নহে।	৪। নদ-নদীগুলি অপ্রশস্ত গভীর খাতের মধ্য দিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল।
৫। নদ-নদীগুলির দৈর্ঘ্য অনেক বেশী।	৫। নদ-নদীগুলির দৈর্ঘ্য অনেক কম।
৬। তীরে বড় বড় শহর ও শিল্পাঞ্চল আছে।	৬। তীরে শহর ও শিল্পাঞ্চল অনেক কম ও ছোট ছোট।

অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর নদ-নদীর প্রভাব

জল ছাড়া মানুষ ও অন্যান্য কোনো প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীন কালে নদীই ছিল জলের প্রধান উৎস; সেইজন্য নদীতীরেই প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বিকাশ ঘটিয়াছিল। বর্তমানকালে জলের জন্য নদীর উপর নির্ভরতা অনেক কমিয়াছে সত্য, তথাপি নদীর গুরুত্ব হ্রাস পায় নাই। কারণ, নদীর জলকে নূতন নূতন ভাবে ব্যবহার করিয়া সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হইতেছে। নদীগঠিত সমভূমি উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া কৃষিকার্যে উন্নত। তাহা ছাড়া এই সমভূমিতে নদী হইতে জলসেচ করা সহজ হয়। সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র গঠিত উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি কৃষিকার্যে উন্নত। সাধারণতঃ সমভূমি অঞ্চলের নদ-নদী নাব্য হইয়া থাকে। অনেক নদীতে স্টীমার চলে। সেইজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদ-নদীর অবদান কম নহে। উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদ-নদীতে এবং দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো নদীর নাব্য অংশে নৌকা, স্টীমার প্রভৃতি চলাচল করে। নদীর জল বিশুদ্ধ করিয়া বড় বড় শহরে পানীয় জল হিসাবে সরবরাহ করা হয়; যেমন, হুগলী নদীর জল বিশুদ্ধ করিয়া কলিকাতা শহরে সরবরাহ করা হয়। ভারতের নদনদীগুলি হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে মৎস্য আহরণ করা হয়। বিভিন্ন শিল্পে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়; যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। ভারতের প্রত্যেকটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা কোনো না কোনো নদীতীরে অবস্থিত। আধুনিক যুগে বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে নদ নদীতে বাঁধ দিয়া জলসেচের ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতে দামোদর, মহানদী প্রভৃতি বহু নদ-নদীতে বাঁধ দিয়া জলসেচের ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। (এই বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।) ভারতের বহুসংখ্যক শহর নদ-নদীর তীরে অবস্থিত: যেমন, কলিকাতা, পাটনা, বারাণসী, গৌহাটি প্রভৃতি। নদ-নদী হইতে এত সুবিধা পাওয়া গেলেও ভারতের কোনো কোনো নদীতে প্রতি বৎসরই বন্যা দেখা দেয় ও অধিবাসীদের অশেষ ক্ষতি সাধন করে।

জলবায়ু

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য—জলবায়ু বলিতে সাধারণতঃ কোনো একস্থানের বায়ু-প্রবাহের তাপ ও বেগ, বৃষ্টিপাত, সূর্যকিরণের প্রখরতা প্রভৃতির সমষ্টিগত অবস্থার দীর্ঘদিনের (অন্ততঃ ৩৫ বৎসরের) গড় বুঝায়। অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, সমুদ্রস্রোত, বায়ুপ্রবাহের গতিপথ, পর্বতশ্রেণীর অবস্থান, বৃষ্টিপাত, অরণ্য প্রভৃতির উপর জলবায়ু নির্ভরশীল। জলবায়ুর এই সকল উপাদান এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের বলিয়া ভারতের জলবায়ু সর্বত্র একরূপ নহে। বিশাল আয়তনের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়।

কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উত্তর অক্ষরেখা) ভারতকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। সুতরাং এই দেশের উত্তরাংশে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং দক্ষিণাংশে উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান থাকায় উত্তর হইতে শীতল বায়ু এই দেশে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার ফলে এবং উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থান নিম্নসমভূমির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভারতের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য রাজস্থানে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তরের শীতল বায়ু প্রবেশ করিতে না পারায় শীতকালে এই দেশে শীতের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্ন স্থানের উচ্চতাও স্থানীয় তাপমাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের দক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও মালভূমি থাকায় এবং সমুদ্র-সান্নিধ্যহেতু এখানকার তাপমাত্রা অত্যধিক নহে। উপকূলভাগ সমতলভূমি বলিয়া সেখানে অধিকতর তাপ অনুভূত হয়। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের প্রভাবেও কোনো কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা সমভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ভারত মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত। 'মৌসিম' শব্দের অর্থ ঋতু। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে মৌসুমী বায়ু বলে। মৌসুমী অঞ্চলের ঋতুসমূহ স্পষ্টভাবে বিভক্ত। এক ঋতুর সহিত অন্য ঋতুর পার্থক্য সহজেই অনুভব করা যায়। ভারতেও ঋতু অনুসারে জলবায়ুর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের উপর এখানকার বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা অনুসারে ভারতে প্রধানতঃ চারিটি ঋতু লক্ষ্য করা যায়—শীতকাল, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎ ও হেমন্তকাল। বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর পার্থক্য পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(ক) **শীতকাল** (ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত) —শীতকালে সূর্য মকরক্রান্তি রেখার(২৩½°দক্ষিণ অক্ষরেখা)উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলিয়া উত্তর গোলার্ধের মধ্য এশিয়ায় উচ্চ-চাপবলয়ের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন অত্যধিক উত্তাপের জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে মধ্য এশিয়া হইতে বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে আসে বলিয়া এই বায়ুপ্রবাহের নাম উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। হিমমণ্ডল হইতে নির্গত হওয়ায় এবং স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এই বায়ু শুষ্ক ও শীতল। হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান থাকায় এই শুষ্ক ও শীতল বায়ু সরাসরি ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না; এইজন্য ভারত তীব্র শীতের কবল হইতে রক্ষা পায়। হিমালয় পর্বতের নিম্নাংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় তুষারকণা হইতে অল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে

বলিয়া উত্তর ভারতের কোনো কোনো অংশে শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। শীতকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে ছোট ছোট বায়ুতরঙ্গ ইরানের মালভূমিঅতিক্রম করিয়া পাকিস্তানের পেশোয়ার অঞ্চলে এবং ভারতের কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশে ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে সামান্য ঘূর্ণিবৃষ্টির সৃষ্টি করে। এই বায়ুপ্রবাহ ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেও জলীয়বাষ্পের অভাবে পূর্বভারতে ইহার ফলে বিশেষ বৃষ্টি হয় না। শীতকালে জানুয়ারী মাসে পাঞ্জাব, কাশ্মীর,

হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে ৭·৫—১২·৫ সেঃ মিঃ, ভারতের উত্তর-পূর্বাংশের অল্প স্থানে এবং তামিলনাড়ু ও কেরালার উপকূলে ২·৫ সেঃমিঃহইতে ৭·৫ সেঃমিঃ এবং অন্যান্য স্থানে ২·৫ সেঃ মিঃ অপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হইলেও গম, যব প্রভৃতি রবিশস্যের পক্ষে ইহা অত্যন্তপ্রয়োজন। শীতকালে তাপমাত্রা সাধারণতঃ ১০° সেঃ হইতে ২৫° সেঃ পর্যন্ত উঠা-নামা করে। উত্তরাংশের তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা কম। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোথাও কোথাও এই সময় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫° সেঃ হইয়া থাকে। যতই দক্ষিণে যাওয়া যায়, তাপমাত্রা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলের উপকূলবর্তী সমভূমিতে তাপমাত্রা ২৪° সেঃ-র নীচে বিশেষ নামে না।

(খ) গ্রীষ্মকাল (মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত)—মার্চ মাস হইতে সূর্য ক্রমশঃই মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং এই সময় ভারতের তাপমাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় গঙ্গানদীর উপত্যকায় গড়ে ২৭° সেঃ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় ; যতই উত্তরে যাওয়া যায়, ক্রমশঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের তাপমাত্রা ৪৯° সেঃ পর্যন্ত ওঠে। মে মাসে কলিকাতা শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩° সেঃ পর্যন্ত উঠিলেও গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২৭° সেঃ-এর বেশী হয় না। দাক্ষিণাত্য কর্কট-ক্রান্তির দক্ষিণে অবস্থিত হইলেও উচ্চতার দরুন ও সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে এই সময় উত্তর ভারত অপেক্ষা সেখানে কম তাপমাত্রা অনুভূত হয়। এই সময় উত্তর হইতে যতই দক্ষিণে যাওয়া যায় তাপমাত্রা ততই কমিতে থাকে। উত্তরাংশের অত্যধিক তাপমাত্রার দরুন নিম্নচাপবলয়ের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বায়ুপ্রবাহ ঐ দিকে ধাবিত হওয়ায় ঝড়ের সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্প থাকায় এই ঝড়ের সহিত সামান্য বৃষ্টিপাতও হইয়া থাকে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে 'কালবৈশাখী' (Norwesters) এবং আসামে 'ধান্যবর্ষণ' নামক ঝড়বৃষ্টি অপরাহ্ণের দিকে হইয়া থাকে। আউশ ধানের পক্ষে এই বৃষ্টি খুবই উপকারী। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশেও এই সময় ঝড়বৃষ্টি হয় ; আম ও কফি চাষের পক্ষে ইহা খুবই উপকারী বলিয়া ইহাকে 'আম্রবর্ষণ' বা 'কফিবর্ষণ' বলা হয়। ভারতের মোট বৃষ্টি-পাতের শতকরা ১০ ভাগ বৃষ্টিপাত এই ঋতুতে হইয়া থাকে।

(গ) বর্ষাকাল (জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত)—গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কট-ক্রান্তির উপর অবস্থান করায় ভারতের উত্তরাংশের তাপমাত্রা ৩২.৫° সেঃ-এর উপরে উঠে। দক্ষিণে ক্রমশঃ তাপমাত্রা কমিতে কমিতে শেষ পর্যন্ত ২৭.৪° সেঃ-এর নীচে নামিয়া যায়। ইহাতে উত্তরাংশে নিম্নচাপবলয়ের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য ভারতের পশ্চিমে ও দক্ষিণে অবস্থিত আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত বায়ুরাশি উত্তর-পূর্ব দিকে ধাবিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আসে বলিয়া এই বায়ু-প্রবাহকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বলে। সমুদ্র হইতে আসে বলিয়া এই বায়ু-প্রবাহ জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে।

আরব সাগর হইতে আগত বায়ু প্রথমে পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০ সেঃ মিঃ-এর অধিক। পশ্চিমঘাট পর্বত অতিক্রমকালে এই বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া যায়। এইজন্য পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বদিকের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে (মহারাষ্ট্র রাজ্যের পূর্বাংশ, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাডুর দক্ষিণাংশ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৫০ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ। আরব সাগর হইতে আগত বায়ুপ্রবাহের অপর একটি শাখা রাজস্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় আরাবল্লী পর্বতে বিশেষ কোনো বাধা পায় না, কারণ এই পর্বত উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহের সমান্তরাল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইজন্য ও অন্যান্য কারণে রাজস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য। এই বায়ুপ্রবাহের অন্য একটি শাখা বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নর্মদা ও তাপ্তী নদীর উপত্যকায় বৃষ্টিপাত ঘটায়। আরব সাগরের এই বায়ুপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত মধ্য প্রদেশ ও ওড়িশা অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমী বায়ুর সহিত মিলিত হয়।

বঙ্গোপসাগর হইতে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে ও আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। মেঘালয়ের খাসিয়া পর্বতের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত চেরাপুঞ্জী-মৌসিনরাম অঞ্চলে বৎসরে ১,৩৫০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। খাসিয়া

পর্বতের উত্তর ঢালে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া শিলং ও গৌহাটির বৃষ্টিপাতের পরিমাণ চেরাপুঞ্জী অপেক্ষা অনেক কম। এই বায়ুপ্রবাহের একটি শাখা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত

হয় এবং এই দুইটি রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ হইতে আগত এই দুইটি বায়ুপ্রবাহ একসঙ্গে মিলিত হইয়া গঙ্গানদীর উপত্যকা ধরিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যতই পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে এই বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ততই কমিতে থাকে; সেইজন্য পূর্ব হইতে পশ্চিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই বায়ুপ্রবাহ যখন রাজস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন ইহাতে জলকণা মোটেই থাকে না। সেইজন্য রাজস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য।

বর্ষাকালে জুলাই মাসে সর্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টিপাত হয়। এই মাসে উত্তর-পূর্ব ভারতের স্থানে স্থানে ও পশ্চিম উপকূলে ১০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী এবং

পূর্ব কাশ্মীর, রাজস্থান ও কর্ণাটকের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে ৫ সেঃমিঃ-এর কম বৃষ্টি-পাত হয়। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৭৫ ভাগ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সারা ভারতেই বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা সর্বত্রই কমিয়া যায়। জুলাই মাসে কেবলমাত্র রাজস্থানের মরু অঞ্চলে তাপমাত্রা ৩৭° সেন্টিগ্রেডের বেশী থাকে, অন্যত্র তাপমাত্রা অনেক কমিয়া যায়। আগস্ট মাসে তাপমাত্রা আরও কিছুটা হ্রাস পায়; কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত কমিতে থাকে বলিয়া তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই দেশের অধিকাংশ কৃষিকার্য দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সাহায্যে হইয়া থাকে। খারিফ শস্যের পক্ষে এই বৃষ্টিপাত বিশেষ কার্যকরী।

(ঘ) **শরৎ ও হেমন্তকাল** (অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত) —দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাইবার পর উত্তর ভারতে উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। এই সময় সূর্যের মকরক্রান্তি অভিমুখে প্রত্যাগমন এই উচ্চচাপ বলয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সেইজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ক্রমশঃ পিছনের দিকে ঘুরিতে থাকে এবং গতি পরিবর্তন করিতে থাকে। প্রত্যাবর্তনকারী এই বায়ু প্রবাহ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি করে। পরে জলীয় বাষ্প-সমৃদ্ধ এই ঘূর্ণবাত তামিলনাড়ু ও কেরালায় বৃষ্টিপাত ঘটায়। অনেক সময় এই ঘূর্ণবাত ওড়িশা ও মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলেও বৃষ্টি-পাতের কারণ হয়। পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে 'আশ্বিনে ঝড়' বলে। এই ঋতুতে উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাত বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। এই সময়ে সমগ্র দেশে তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ১৩ ভাগ এই ঋতুতে হইয়া থাকে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

অঞ্চল ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	অঞ্চল ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
(ক) মেঘালয়, কঙ্কণ ও মালাবার উপকূল, অরুণাচল প্রদেশ—৩০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী।	(ঘ) তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশ, অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিমাংশ, রাজস্থানের পূর্বাংশ, গুজরাটের পূর্বাংশ, পাঞ্জাবের পূর্বাংশ, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ, মহারাষ্ট্র—৬০-১০০ সেঃ মিঃ।
(খ) নাগাল্যান্ড, আসামের পূর্বাংশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, পশ্চিম উপকূলের কোনো কোনো অংশ, দার্জিলিং জেলা—২০০ ৩০০ সেঃমিঃ।	(ঙ) কর্ণাটক, রাজস্থানের অধিকাংশ, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ—২০ ৬০ সেঃমিঃ।
(গ) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল, বিহার, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ, তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূল, অন্ধ্র প্রদেশের পূর্বাংশ—১০০-২০০ সেঃ মিঃ।	(চ) রাজস্থানের মরু অঞ্চল, কচ্ছ ও লাডাক—২০ সেঃ মিঃ-এর কম।

ভারতের বৃষ্টিপাত-অঞ্চল
(Rainfall-regions of India)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু বিদ্যমান থাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০

সেঃ মিঃ-এর বেশী ; আবার কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০ সেঃ মিঃ-এর কম। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুসারে ভারতকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় :

(ক) **মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, কঙ্কণ ও মালাবার উপকূল**—এই সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী। এই সকল অঞ্চলে চা, নারিকেল, ধান প্রভৃতির চাষ হয়।

(খ) **নাগাল্যান্ড, আসামের পূর্বাংশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, দার্জিলিং**—এই সকল স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০—৩০০ সেঃ মিঃ। চা, ধান, পাট প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান ফসল।

(গ) **পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অংশ**—এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০-২০০ সেঃ মিঃ। এই সকল স্থানে ধান, পাট, গম, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(ঘ) তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশ, অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিমাংশ, রাজস্থানের পূর্বাংশ, গুজরাটের পূর্বাংশ, পাঞ্জাবের পূর্বাংশ, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ, মহারাষ্ট্র—এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০-১০০ সেঃ মিঃ। এই অঞ্চলে তুলা, তামাক, ইক্ষু, গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(ঙ) কর্ণাটক, রাজস্থানের অধিকাংশ, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ—এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০-৬০ সেঃ মিঃ। গম, ইক্ষু, তুলা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি এই অঞ্চলের ফসল।

(চ) রাজস্থানের মরু অঞ্চল, কচ্ছ ও লাডাক—এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০ সেঃ মিঃ-এর চেয়েও কম। এখানে বিশেষ কোনো শস্য উৎপন্ন হয় না। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে জল আনিয়া সুরতগড়ে কৃষিকার্য করা হইতেছে এবং গম উৎপন্ন হইতেছে।

ভারতের জলবায়ু অঞ্চল

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু দৃষ্ট হয়। উষ্ণতা ও বৃষ্টি-পাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে প্রধানতঃ ১০টি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়।* নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

(১) অতি আর্দ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চল—মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচ-বিহার জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০০ সেন্টিমিটারের অধিক ; মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জী-মৌসিনরামের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০০ সেন্টিমিটারেরও অধিক। এখানকার জুলাই মাসের উষ্ণতা ১৫° সেন্টিগ্রেড হইতে ৩০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে এবং জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ১১° সেন্টিগ্রেড হইতে ২৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। কিন্তু হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে শীতকালের উষ্ণতা ০°-এর নীচে নামিয়া যায়।

এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শাল, সেগুন, ছাতিম, গর্জন, পাইন, ওক প্রভৃতি বৃক্ষ ও বাঁশ, বেত, সাবাই ঘাস প্রভৃতি বনজ সম্পদ ও ধান, পাট, মেস্তা, চা, ডাল, তামাক, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

(২) আর্দ্র সহ্যাদ্রি ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চল—পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণাংশ (কঙ্কণ, কর্ণাটক ও মালাবার উপকূল) ও ইহার সংলগ্ন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম ঢালে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেন্টিমিটারের অধিক। এখানকার জুলাই মাসের উষ্ণতা ২৬° সেন্টিগ্রেড হইতে ৩২° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে এবং জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ১৯° সেন্টিগ্রেড হইতে ২৮° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

এই অঞ্চলের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম ঢালে ও পাদদেশে শাল, সেগুন, চন্দন, মেহগনি প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ ও সমুদ্রের উপকূলবর্তী বেলে মাটিতে নারিকেল ও কাজুবাদাম জন্মে। চা, কফি, রবার, গোলমরিচ, এলাচি, ধান, রাগি, টেপিওকা, তিল, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

(৩) আর্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গের বাকী অংশ, বিহারের দক্ষিণাংশ, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশের পূর্বাংশ, উত্তর প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ এবং অন্ধ্র প্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশ ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের

* R. L. Singh-এর *India* অবলম্বনে লিখিত।

পরিমাণ ১০০ সেন্টিমিটার হইতে ২০০ সেন্টিমিটার এবং জুলাই মাসের উষ্ণতা ২৬° সেন্টিগ্রেড হইতে ৩৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ও জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ১২° সেন্টিগ্রেড হইতে ২৭° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট বনভূমিতে শাল, সেগুন, পলাশ, কুল, মহুয়া, বাঁশ, বেত প্রভৃতি গাছ জন্মে। ধান, পাট, গম, ভুট্টা, ডাল, আলু প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চল কৃষিকার্যে উন্নত।
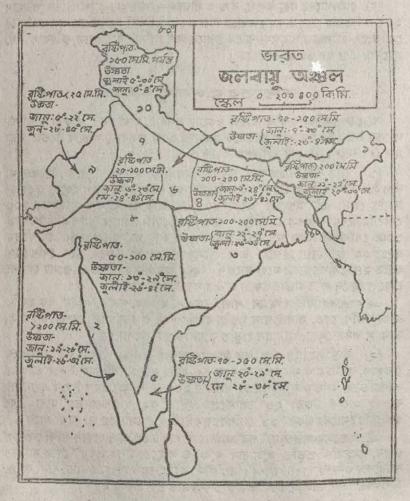
(৪) নাতি-আর্দ্র ক্রমপরিবর্তনশীল অঞ্চল—বিহারের উত্তরাংশ, উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ এবং মধ্য প্রদেশের উত্তর-পূর্বের সামান্য অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেন্টিমিটার হইতে ২০০ সেন্টিমিটার। এখানকার জুলাই মাসের উষ্ণতা ২৬° সেন্টিগ্রেড হইতে ৪১° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে এবং

জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ৯° সেণ্টিগ্রেড হইতে ২৪° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। পূর্ব হইতে পশ্চিমে বৃষ্টিপাত ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

এই অঞ্চলের বনভূমি ও বনভূমির প্রায় সমগ্র অংশই কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। তরাই অঞ্চলের বনভূমিতে শাল, অর্জুন, জারুল, বাঁশ, সাবাই ঘাস প্রভৃতি জন্মে। গম, ইক্ষু, ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ডাল, তৈলবীজ, তামাক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের উন্নতি ঘটিতেছে।

(৫) **নাতি-আর্দ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল**—তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে একবার এবং শীতের প্রারম্ভে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনকালে আর একবার বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সেণ্টিমিটার হইতে ১৫০ সেণ্টিমিটার এবং মে মাসের উষ্ণতা ২৮° সেণ্টিগ্রেড হইতে ৩৮° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে ও জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ২০° সেণ্টিগ্রেড হইতে ২৯° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

এই অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ কম। কারণ, অধিকাংশ বনভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। উপকূলের প্রায় সর্বত্র নারিকেল, তাল, সুপারী প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। ধান, তামাক, তৈলবীজ, তুলা, ডাল, বাজরা প্রভৃতি শস্য ও গোলমরিচ, লংকা, এলাচি, দারুচিনি প্রভৃতি মসলা জন্মে। কৃষিকার্যে এই অঞ্চল ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে।

(৬) **নাতি-আর্দ্র মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল**—উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও মধ্য প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সেণ্টিমিটার হইতে ১৫০ সেণ্টিমিটার এবং জুলাই মাসের উষ্ণতা ২৬° সেণ্টিগ্রেড হইতে ৪১° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

এই অঞ্চলের বনভূমি ও তৃণভূমি অধিকাংশই কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। গম, ইক্ষু, ভুট্টা, তুলা, ছোলা, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্য এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

(৭) **শুষ্কপ্রায় উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চল**—হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের পূর্বাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫ সেণ্টিমিটার হইতে ১০০ সেণ্টিমিটার এবং মে মাসের উষ্ণতা ২৪° সেণ্টিগ্রেড হইতে ৪১° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে ও জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ৬° সেণ্টিগ্রেড হইতে ২০° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

এই অঞ্চলের বনভূমি ও তৃণভূমি অধিকাংশই কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতের গমবিপ্লব সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইক্ষু, তুলা, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(৮) **শুষ্কপ্রায় ক্রান্তীয় অঞ্চল**—কচ্ছ উপদ্বীপ ব্যতীত গুজরাট, উপকূলবর্তী সমভূমি ব্যতীত মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুর উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০ সেণ্টিমিটার হইতে ১০০ সেণ্টিমিটার এবং জুলাই মাসের উষ্ণতা ২৬° সেণ্টিগ্রেড হইতে ৪২° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে ও জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ১৩° সেণ্টিগ্রেড হইতে ২৯° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

এই অঞ্চলের মালভূমি ও পাহাড়িয়া এলাকায় বনভূমি বিদ্যমান। এখানে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র অরণ্য দেখা যায়। শাল, সেগুন, চন্দন প্রভৃতি

মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। কর্ণাটকের চন্দন কাঠ বিখ্যাত। নাগপুরের সেগুন সকলের নিকট আদৃত। বাঁশ ও বেত বনভূমির সর্বত্র জন্মে। তুলা কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের প্রধান ফসল। ইহা ছাড়া গম, যব, জোয়ার, বাজরা, ধান, রাগি, ইক্ষু, তৈলবীজ, চা, কফি, রবার প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

(৯) শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চল—রাজস্থানের পশ্চিমাংশ ও গুজরাট রাজ্যের কচ্ছ উপদ্বীপ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫ সেন্টিমিটারের কম এবং জুন মাসের উষ্ণতা ২৮° সেন্টিগ্রেড হইতে ৪৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ও জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ৫° সেন্টিগ্রেড হইতে ২০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে বালুকাময় মৃত্তিকা ও পাথর থাকায় বনভূমির প্রসার ঘটে নাই। কোনো কোনো স্থানে ফণিমনসা, বাবলা, খয়ের প্রভৃতি কাঁটা-গাছ ও ঝোপ দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানে জমিতে চাষ হয়। জোয়ার ও বাজরা এখানকার প্রধান শস্য।

(১০) পশ্চিম হিমালয়ের শীতল জলবায়ু অঞ্চল—উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ ১১৫ সেন্টিমিটারের মধ্যে; তবে সর্বত্র সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। লাডাক উচ্চভূমিতে বৃষ্টিপাত ২০ সেন্টিমিটারের কম। এই অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত হয়। এখানকার জুলাই মাসের উষ্ণতা ৫° সেন্টিগ্রেড হইতে ৩০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে এবং জানুয়ারী মাসের উষ্ণতা ০° সেন্টি-গ্রেডের নিম্ন হইতে ৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

এখানকার পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমিতে পাইন, ফার, উইলো, দেবদারু, চির-পাইন প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। পর্বতের নিম্নাংশে ও পাদদেশে শাল, শিশু, ওক, বাঁশ, বেত প্রভৃতি জন্মে। এখানে প্রচুর পরিমাণে সাবাই ঘাস জন্মে। গম, ভুট্টা, বাজরা, ধান, তুঁত, চা প্রভৃতি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্যে এই অঞ্চলে তেমন উন্নতি ঘটে নাই। অধিকাংশ স্থানে কৃষিকার্য চলে না। আপেল, আঙুর, নাসপাতি প্রভৃতি ফল এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফল উৎপাদনে এই অঞ্চল ভারতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে।

ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব (Effects of Indian Monsoons)—ভারতের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১২৫ সেঃ মিঃ। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সকল বৎসরে সমান হয় না; কোনো কোনো বৎসর ইহার পরিমাণ কমিয়া ৭৭ সেঃ মিঃ পর্যন্ত নামিয়া আসে এবং কোনো কোনো বৎসরে ইহা বাড়িয়া ১৩৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত উঠে। ইহা ছাড়া, ভারতের সর্বত্র সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। ভূ-প্রকৃতির উপর এখানকার বৃষ্টিপাত বহুলাংশে নির্ভরশীল; কারণ, বায়ু পাহাড়-পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত না হইলে সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় না। অনেক সময় মৌসুমী বৃষ্টিপাত নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হয় না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক নহে। ইহার ফলে কৃষিকার্যের অসুবিধা হয়। সময় মতো বৃষ্টিপাত না হওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা অনেক পরে বৃষ্টিপাতের অন্তর্ধান ঘটা এবং স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাত হইতে কম বা বেশী বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য ভারতের কোনো না কোনা স্থানে প্রায় প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়।

ভারতে মৌসুমী বায়ুর অপরিসীম প্রভাব বিদ্যমান। জলবায়ু সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও ভারতের উপর মৌসুমী বায়ুর মতো সুদূরপ্রসারী প্রভাব অন্য কোথাও দেখা যায় বলিয়া মনে হয় না। ভারতের

কৃষিকার্যের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এখানকার মৌসুমী বায়ু। কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায় প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী বা কম হওয়ায় অথবা নির্দিষ্ট সময় মতো মৌসুমী বায়ু না আসায় বহুবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং সেই সব দুর্ভিক্ষের কাহিনী ভারতের ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। ভারতের বনভূমি মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে ও হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাতের অভাবে রাজস্থানের পশ্চিমাংশে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন স্থানে নানারকমের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করা যায়, ভারতের যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী ও সুনিশ্চিত, সেখানে ধানের চাষ প্রাধান্য লাভ করে। মাঝারি বৃষ্টিপাত ও সেচযুক্ত অঞ্চলে গম ও ইক্ষুর চাষ বেশী হয় এবং প্রায় শুষ্ক ও শুষ্ক অঞ্চলে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ও রাগির চাষ প্রাধান্য লাভ করে। উত্তর ভারতের মাঝারি বৃষ্টিপাত-অঞ্চলের গম, ইক্ষু, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের অত্যধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলের ধান, পাট ও চা, পশ্চিমাংশের মাঝারি বৃষ্টিপাত অঞ্চলের তুলা ভারতের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভারতের কৃষিকর্ম সম্পূর্ণভাবে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। কোনো বৎসরের মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও এই বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার ও শেষ হওয়ার সময় জানিলেই অনুমান করা যায় যে, সেই বৎসর ভারতে কি পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। ভারতের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক কৃষিকার্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং মৌসুমী বৃষ্টিপাত এই সকল লোকের অদৃষ্ট লইয়া খেলা করিতে পারে। কৃষিপ্রধান এই দেশের বাৎসরিক সরকারী বাজেটও মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে; কারণ কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হইলে সরকারী আয়ও কমিয়া যায়। তুলা, ইক্ষু, পাট, চা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের উপর এখানকার কার্পাসবয়ন, চিনি, পাট ও চা শিল্প নির্ভরশীল। সুতরাং এই সকল কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হইলে শিল্পের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি। ফলে রপ্তানি-বাণিজ্যেরও ক্ষতি হয়। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের উপর ভারতের কৃষকগণ একটা নির্ভরশীল বলিয়া তাহারা অত্যন্ত অদৃষ্টবাদী ও ভগবানে বিশ্বাসী হইয়া থাকে। তাহাদের ধারণা মৌসুমী বৃষ্টিপাত ভগবানের দান। এমন কি বহু স্থানে বৃষ্টির জন্য দেবদেবীর পূজা করা হয়।

মৃত্তিকা

মৃত্তিকা শিলার রূপান্তর মাত্র। হিমবাহ, নদী, রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও রাসায়নিক শক্তির প্রভাবে এবং জীবজন্তু দ্বারা শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে কালক্রমে পৃথিবীর উপরিভাগে যে সূক্ষ্ম শিথিল পদার্থের আবরণ সৃষ্টি হয়, উহাকেই মৃত্তিকা বলে।

ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ—ভারতের মত বিশাল আয়তনের দেশে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। এখানকার মৃত্তিকা কোনো স্থানে উর্বর, আবার কোনো স্থানে অনুর্বর। ভারতের মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়:

(১) **পার্বত্য মৃত্তিকা**—হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ দ্বারা আনীত নুড়ি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি জমিয়া পর্বতগাত্রে যে মাটির সৃষ্টি হয়, উহাকে পার্বত্য

মৃত্তিকা বলে। ইহার নীচে হিমবাহ যেখানে শেষ হইয়া আসে, সেখানে নুড়ি-পাথর মিশানো কাদামাটি দেখা যায়।

(২) **পডসল মৃত্তিকা**—হিমালয়ে পার্বত্য মৃত্তিকার নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ স্থানে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। পাতা পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া এই মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। ইহাতে কিছু পরিমাণ লৌহচূর্ণ পাওয়া যায়। এই মাটি অনুর্বর বলিয়া কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে।
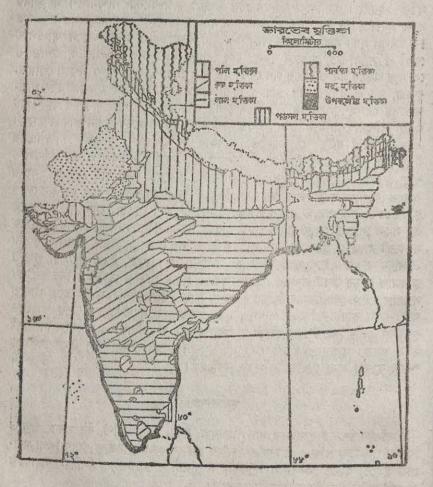
(৩) **সমভূমির পলি মৃত্তিকা**—উত্তর-ভারতের নদ-নদী-বিধৌত সমভূমিতে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। গঙ্গা ও উহার উপনদী-শাখানদী, সিন্ধুর উপনদী, ব্রহ্মপুত্র ও উহার উপনদী-বাহিত পলিমাটি দ্বারা এই বিশাল সমভূমি গঠিত হইয়াছে। জৈব পদার্থ বেশী থাকে বলিয়া পলিমৃত্তিকা উর্বর। এই মৃত্তিকা সাধারণতঃ দুই প্রকার—প্রাচীন পলিমাটি বা ভাঙ্গর এবং নূতন (নবীন) পলিমাটি বা খাদর। দুই নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় প্রাচীন পলিমাটি দেখা যায়। ইহা নবীন পলিমাটি

অপেক্ষা কম উর্বর ও প্রাচীন। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অধিকাংশ স্থানে ও উত্তরবঙ্গে এই প্রকার মাটি দেখা যায়। এই মাটিতে গম, ভুট্টা, তৈলবীজ প্রভৃতি ভাল জন্মে। উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাংশে, বিহারের মধ্যভাগে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে এবং আসামের প্রায় সর্বত্র নবীন পলিমাটি দেখা যায়। পূর্ব উপকূলের মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর ব-দ্বীপে নবীন পলিমাটি বিদ্যমান। এই মাটি অত্যন্ত উর্বর। এই মাটিতে পাট ও ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

(৪) **মরু মৃত্তিকা**—রাজস্থানের মরু অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান বালুকাময়। কোনো কোনো স্থানে লবণাক্ত বালুমাটি এবং বাদামী ও লাল রঙের বালুমাটি দেখা যায়। এই মাটি শুষ্ক এবং অনুর্বর।

(৫) **কৃষ্ণ মৃত্তিকা**—ইহা ব্যাসল্ট লাভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার রঙ্ কালো। এই মাটি রেগুর নামেও পরিচিত। কৃষ্ণমৃত্তিকায় সাধারণতঃ নাইট্রোজেন, ফসফরিক অ্যাসিড ও জৈব পদার্থ কম থাকে ; কিন্তু পটাশ, লৌহ, চুন, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট বেশী থাকায় মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়। এই মাটির জল ধরিয়া রাখার ক্ষমতা বেশী। ইহা তুলা-চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। সেইজন্য অনেকে এই মৃত্তিকাকে **কৃষ্ণ তুলা-মৃত্তিকা** বলে। মহারাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র এবং গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও মধ্য প্রদেশের স্থানে স্থানে কৃষ্ণমৃত্তিকা বিদ্যমান।

(৬) **লাল মৃত্তিকা**—এই মাটির সঙ্গে লোহা মিশান থাকে বলিয়া ইহার রঙ লাল হইয়া থাকে। এই মাটিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(ক) লাল দো-আঁশ মৃত্তিকা—ছোটনাগপুরের প্রায় সর্বত্র, ছত্তিশগড়, বুন্দেলখণ্ডের উত্তরাংশ (মধ্য প্রদেশ), অন্ধ্র প্রদেশের রয়েলসীমা অঞ্চল, কর্ণাটকের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও উহার পূর্বঢাল, কেরালার পূর্বাংশ ও তামিলনাড়ুর কোনো কোনো স্থানে লাল দো-আঁশ মাটি দেখা যায়। ইহা ছাড়া নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয় ও মিজোরামের প্রায় সর্বত্র লাল দো-আঁশ মৃত্তিকা বিদ্যমান। এই মাটিতে চুন ও কার্বনেটের অভাব থাকায় এবং নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও জৈব পদার্থ কম থাকায় ইহার উর্বরতা কম। তাহা ছাড়া জলধারণের ক্ষমতাও ইহার কম। জলসেচ করিতে পারিলে এই মাটিতে ইক্ষু, তুলা, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

(খ) লাল বালুকাময় মৃত্তিকা—লাল দো-আঁশ মাটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বালুকাময় লাল মাটি দেখা যায়। মধ্য প্রদেশের পূর্বাংশ এবং ওড়িশা, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুর পার্বত্য প্রদেশে এই জাতীয় পলিমাটি দেখা যায়।

(গ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা—এই মাটিতে লৌহ থাকে বলিয়া ইহা লাল ; কিন্তু অন্যান্য লাল মাটি হইতে ইহা ভিন্ন রকমের হয়। ল্যাটেরাইটে অ্যালুমিনিয়াম থাকে। এই মাটিতে চুন, ফসফেট ও জৈব পদার্থ থাকে না। সেইজন্য ইহা অনুর্বর। তাহা ছাড়া এই মাটির জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাও কম। ল্যাটেরাইটের উপরের স্তরে কঠিন আবরণ দেখা যায়। ছোটনাগপুরের পূর্বাংশ, অন্ধ্র প্রদেশ ও কেরালার কোনো কোনো স্থানে এবং পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে এই মাটি বিদ্যমান।

উপকূলীয় মৃত্তিকা—পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমিতে সাধারণতঃ বালুকাময় লবণাক্ত পলিমাটি দেখা যায়। এই মাটিতে নারিকেল ও সুপারি প্রচুর উৎপন্ন হয়।

অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর মৃত্তিকার প্রভাব

ভারত কৃষিপ্রধান প্রাচীন সভ্য দেশ। এই দেশের প্রাচীন সভ্যতা সিন্ধু-গঙ্গা

সমভূমিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার বহু কারণের মধ্যে প্রধান কারণটি হইল নদীগঠিত পলিমাটির শস্য উৎপাদনের ক্ষমতা অন্যান্য সকল প্রকারের মাটি হইতে অধিক। তাই দেখা যায় যে, সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এবং মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের পলিমাটি কৃষিকার্যে উন্নত বলিয়া ভারতের অধিকাংশ লোক এই সকল স্থানে বসবাস করে। এই মৃত্তিকায় পাট, ইক্ষু প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল উৎপন্ন হয় বলিয়া এতদঞ্চলে পাটশিল্প ও চিনিশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত পৃথিবীতে এই দুইটি শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে পলিমাটির পরেই ব্যাসল্ট লাভা হইতে সৃষ্ট কৃষ্ণ-মৃত্তিকার স্থান। এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। তুলাকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলে ও উহার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে কার্পাস-বয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।

অন্যান্য শ্রেণীর মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা কম বলিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্যশস্য ও শিল্প-শস্য সেই সমস্ত মৃত্তিকা-অঞ্চলে কম উৎপন্ন হয়; অর্থনৈতিক দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলে লোকবসতি-ঘনত্ব পলিমাটি ও কৃষ্ণ-মৃত্তিকা-অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে।

ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ (Soil erosion & Conservation of soil)—ভূ-ত্বকের উপরের স্তর কৃষিকার্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। জৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া এই স্তর সাধারণতঃ উর্বর। বিভিন্ন কারণে ভূমির উপরিভাগের এই উর্বর অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত ইত্যাদি দ্বারা এই ক্ষয়সাধন হইয়া থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে জমি অনুর্বর হয়; সুতরাং ক্ষয়প্রাপ্ত জমিতে কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না। উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্বত-সংলগ্ন অঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে ভূমিক্ষয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে সম-পরিমাণ ক্ষয় (Sheet erosion), বিহার, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের বহু অঞ্চলে প্রণালী ক্ষয় (Gully erosion) এবং পাঞ্জাব ও রাজস্থানে বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয়ের (Wind erosion) আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ভূমিক্ষয় ভারতে একটি বিরাট সমস্যা। ইহার ফলে প্রায় ৮০ লক্ষ হেক্টর জমি কৃষিকার্যের অনুপযোগী হইয়াছে এবং ৪ কোটি হেক্টর জমি কৃষির জন্য পুনঃসংস্কার করিতে হইয়াছে। ভূমিক্ষয়ের বিভিন্ন **কারণ** ও ভূমি-সংরক্ষণের বিভিন্ন **উপায়** সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইলঃ

(ক) **বনোৎপাটন** ভূমিক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ। গাছপালা থাকিবার ফলে বৃষ্টির ফোঁটা গাছের ডাল ও পাতায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সজোরে মাটিতে পড়িতে পারে না। উহার ফলে বৃষ্টির ফোঁটা সরাসরি মাটিতে পড়িয়া মৃত্তিকার উপরিভাগকে ক্ষয় করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। গাছের তলায় যে আগাছার সৃষ্টি হয়, তাহাও বৃষ্টির জলের গতিতে বাধা সৃষ্টি করে; ফলে ভূমিক্ষয় রোধ হয়। ইহা ছাড়া গাছ-পালার শিকড় ও বনভূমির ঘাস মাটি আঁকড়াইয়া থাকে বলিয়া সহজে ভূমিক্ষয় হইতে পারে না। এইজন্য বনভূমি সংরক্ষণ করিয়া, ঘাস উৎপাটন নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং নূতন বনভূমির সৃষ্টি করিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। ভারতে ১৯৭৮ সালে বনভূমি আইন (Forest Act) বিধিবদ্ধ করিয়া বনভূমির সংরক্ষণের প্রথম বন্দোবস্ত করা হয়।

(খ) **পশুচারণ** ভূমিক্ষয়ের অন্যতম কারণ। বিভিন্ন পশু মাঠের ঘাস তুলিয়া খাইলে মাটি আলগা হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জলে মাটি ধুইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পশুচারণের জমি নির্দিষ্ট করিয়া এবং পশুচারণ-ক্ষেত্র হইতে পশুর মল সরাইয়া লওয়া বন্ধ করিয়া কিয়দংশে মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করা যায়।

(গ) **জুম চাষের** ফলে ভূমিক্ষয় সাধিত হয়। আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়গণ বনভূমির কতকাংশ পরিষ্কার করিয়া গাছপালা জমির উপরেই পোড়াইয়া ফেলে এবং পরে এই জমিতে চাষ করে। বনভূমি পরিষ্কার করিবার ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই জমিতে দুই-এক বৎসর চাষ করিয়া জুমিয়ারা অন্যত্র চলিয়া যায়। উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা এইপ্রকার কৃষি-পদ্ধতি বন্ধ করিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা প্রয়োজন।

(ঘ) **অবৈজ্ঞানিক চাষের** জন্যও ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে। চাষ করিবার সময় কৃষিক্ষেত্রে নালা কাটিয়া দেওয়ায় এই নালার সাহায্যে মৃত্তিকার উপরিভাগ অন্যত্র চলিয়া যায়। চাষ করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিলেও বৃষ্টির জলে ভূমিক্ষয় হইতে পারে। পাহাড়ের গায়ে ঢালু জমিতে যেদিকে জমি ঢালু সেইদিকে লাঙ্গল চালাইলে বৃষ্টির জল সহজেই জমি হইতে মৃত্তিকা বাহিরে লইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঢালু জমির সমকোণে লাঙ্গল চালাইলে (Contour Farming) এই প্রকার ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। জমির কিনারায় আইল দিয়াও কৃষিজমির ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

(ঙ) **বাতাসের** প্রকোপেও ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে। বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয় বন্ধ করিতে হইলে যেদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেইদিকে বনের সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(চ) জমির উপরের অংশ কাটিয়া **রাস্তা নির্মাণ** করিলেও ভূমিক্ষয় হয়। রাস্তা নির্মাণের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিয়া মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করা যায়।

ইহা ছাড়া বাঁধের সাহায্যে বন্যা নিবারণ করিয়া, শস্যানুবর্তন করিয়া এবং উদ্ভিদের দ্বারা ভূমি ঢাকিয়া রাখিয়াও ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

ভারত সরকার স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমি-ক্ষয় রোধ করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** কার্যকালে ১৯৫৩ সালে একটি 'কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা' (Central Soil Conservation Board) গঠিত হইয়াছে। প্রতিটি রাজ্যেও অনু-রূপ একটি করিয়া সংস্থা গঠিত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় বাঁধ ও খাল নির্মাণ, প্রণালী-পূরণ, ধাপ-সৃজন প্রভৃতির সাহায্যে ১·৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তামিলনাড় ও মহারাষ্ট্রে প্রায় ২·৮ লক্ষ হেক্টর পরিমিত জমিতে ভূমিক্ষয়রোধের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূমিক্ষয়-রোধের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় পশ্চিম ও মধ্য ভারতে বালিয়াড়ি অপসারণ করিয়া, পূর্ব ভারতের নদী-উপত্যকায় নূতন অরণ্য রচনা করিয়া, দাবাগ্নি রোধ ও সমোন্নত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া, কেরালায় প্রাচীরের সাহায্যে সামুদ্রিক বন্যার হাত হইতে ভূমিকে রক্ষা করিয়া মৃত্তিকার ক্ষয়রোধের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় মৃত্তিকা-সংরক্ষণ ব্যবস্থাদির জন্য ৭২ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছিল ; কৃষি-জমির চতুর্দিকে বাঁধ দিয়া ও শুষ্ক চাষের সাহায্যে প্রায় ১·৩ কোটি হেক্টর জমিতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পরিকল্পনায় দামোদর, হীরাকুদ, ভাকরা-নাঙ্গাল প্রভৃতি বহুমুখী পরিকল্পনার অন্তর্গত জলাধারসমূহের নিকটস্থ ৪০ লক্ষ হেক্টর পরিমিত স্থানের ভূমি সংরক্ষণের জন্য ১১ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ভূমিক্ষয় রোধ করিবার জন্য গবেষণা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনায় ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য ৫৯·৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং ৫৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূমিক্ষয়-নিবারণের বন্দোবস্ত করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় ভূমিক্ষয়-নিবারণ ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ খাতে ২১১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনায় উক্ত খাতে প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ৩৯০ কোটি টাকা।

১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে ভারতে মোট ২৬০ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিকে মৃত্তিকা-সংরক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ২০ লক্ষ হেক্টর চাষের অযোগ্য জমিতে বনভূমি-সৃষ্টি ও ঘাস-উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বসাকুল্যে ৬৬৪ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

(A) Essay-Type Questions

1. (a) Describe the geographical location of India. (b) Discuss the role of such location on the economic life of Indian people.

[H. S. Examination, 1981]

[(ক) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা দাও। (খ) ভারতীয়দের অর্থনৈতিক জীবনের উপর এইরূপ অবস্থানের প্রভাব আলোচনা কর।]

উঃ 'পারিবেশগত অবস্থা' হইতে 'অবস্থান' অংশ (৩-৪ পৃঃ) লিখ।

2. Discuss the influence of environment on the economic activities of India with the help of three illustrations.

[H. S. Examination, 1978]

[পরিবেশ ভারতের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা তিনটি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।]

উঃ অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর যে কোনো তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের প্রভাব অবলম্বনে (৯-১০ পৃঃ, ১২ পৃঃ ও ১৫ পৃঃ) লিখ।

3. Name the major physical regions of India. Describe the landforms of any one of them and mention their influence on the economic activities of the region. [H. S. Examination, 1984]

[ভারতের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির নাম কর। ইহাদের যে কোনো একটির ভূমিরূপ বর্ণনা করিয়া ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ভূমিরূপের প্রভাব উল্লেখ কর।]

উঃ 'প্রাকৃতিক অঞ্চল' (৪ পৃঃ) এবং 'উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি' (১০—১২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Discuss the influence of (a) topography and (b) river on the economic life of Indian people.

[Specimen Question of H. S. Council, 1981]

[ভারতের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদীর প্রভাব আলোচনা কর।]

উঃ 'প্রাকৃতিক অঞ্চল' (৪—১৮ পৃঃ) এবং 'নদ-নদী' (১৮—২২ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লইয়া উত্তর তৈয়ারি কর।

5. Discuss how physical features and drainage have influenced the economic activities of India. [H. S. Examination, 1982]

[প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নদ-নদী কিভাবে ভারতের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা আলোচনা কর।]

উঃ 'প্রাকৃতিক অঞ্চল' হইতে 'অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের প্রভাব' (৯-১০ পৃঃ, ১২ পৃঃ, ১৫ পৃঃ, ১৬ এবং ১৯ পৃঃ) এবং 'অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর নদ-নদীর প্রভাব' (২২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Describe the natural environment of Gangetic Valley in India and explain how it has influenced the economic activities in this region. Give illustrations. **[H. S. Examination, 1980]**

[ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা কর এবং ইহা ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে কিরূপে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর।]

উঃ 'উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি' (১০-১২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. What do you know about the climatic features of India? Divide India into climatic regions and point out the natural vegetation and principal agricultural crops of each such region.

[H. S. Examination, 1981]

[ভারতের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লিখ। ভারতকে জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত কর এবং এইরূপ প্রত্যেকটি অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ এবং প্রধান কৃষিজাত শস্য কি কি তাহা নির্দেশ কর।]

উঃ 'জলবায়ু' হইতে 'জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য' (২২—২৭ পৃঃ) এবং 'ভারতের জলবায়ু অঞ্চল' (২৯—৩২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

8. Discuss the role of climate on the economic activities of India. Give examples. **[H. S. Examination, 1983]**

[ভারতের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর জলবায়ুর প্রভাব উদাহরণ সহ আলোচনা কর।]

উঃ 'ভারতের জলবায়ু অঞ্চল' (২৯-৩২ পৃঃ) এবং 'ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব' (৩২-৩৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. Name the different soil regions of India. Discuss how does soil exercise its influence on agriculture with examples from different parts of India. **[H. S. Examination, 1981]**

[ভারতের বিভিন্ন মৃত্তিকা অঞ্চলের নাম কর। মৃত্তিকা কিভাবে কৃষিকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উদাহরণ সহ উত্তর দাও।]

উঃ 'মৃত্তিকা' (৩৩—৩৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10. Examine briefly the soil conservation programme introduced in India during Five-Year Plan periods.

[Specimen Question of H. S. Council, 1978]

[ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অবলম্বিত ভূমি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

উঃ 'ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ' (৩৬—৩৮ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. Give the distribution of different types of soil in India.

Briefly examine the soil conservation programme introduced in this country in recent years.

[Specimen Question of H. S. Council, 1980 & 1981]

[ভারতের বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বণ্টন উল্লেখ কর। সম্প্রতিকালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য যে সকল পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

উঃ 'ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ' (৩৩—৩৫ পৃঃ) এবং 'ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা-সংরক্ষণ' (৩৬—৩৮ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

12. Discuss about the problem of soil erosion of India and its conservation. **[Tripura H. S. Examination, 1982]**

[ভারতের ভূমিক্ষয় সমস্যা ও উহার সমাধান আলোচনা কর।]

উঃ 'ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ' (৩৬—৩৮ পৃঃ) লিখ।

13. Discuss about the influence of climate on India's economic condition. **[Tripura H. S. Examination, 1982]**

[ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর।]

উঃ 'জলবায়ু' হইতে 'ভারতের জলবায়ু অঞ্চল' (২৯—৩২ পৃঃ) এবং 'ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব' (৩২—৩৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

(B) Short Answer/Problem-Type Questions

1. Write short notes explaining the following statements :

(a) The Himalayan Ranges act as a natural protective wall for India.

(b) India is a riverine country.

(c) India is a land situated in the Monsoon region.

(d) India is a vast country where different kinds of soils are naturally found.

(e) Physical and non-physical environments of north-east hilly regions are retarding the development of economic and cultural resources of India. **[H. S. Examination, 1981]**

[নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির ব্যাখ্যামূলক টীকা লিখঃ

(ক) হিমালয় পর্বতমালা ভারতের রক্ষাকারী স্বাভাবিক প্রাচীরের কাজ করে।

(খ) ভারত নদী-মাতৃক দেশ।

(গ) ভারত মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ।

(ঘ) ভারতের মত বিশাল দেশে স্বভাবতঃ বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়।

(ঙ) উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।]

উঃ (ক) 'হিমালয়ের উপকারিতা' (১০ পৃঃ) ; (খ) 'নদ-নদী' (১৮-২২ পৃঃ) ; (গ) 'জলবায়ু' (২২-৩৩ পৃঃ) ; (ঘ) 'মৃত্তিকা' (৩৩-৩৫ পৃঃ) এবং ঙ) 'উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল' (৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

C. Objective Questions

1. Frame correct answers from the following statements :

(a) The Himalayan Mountain Ranges stand in the North/South/West of India.

(b) Upper Gangetic Plains extends from Delhi to Ahmedabad/Kanpur/Allahabad.

(c) Manas Sarowar is a vast lake situated in the plateau of Nepal/Tibet.

(d) The average rainfall in India is 50/70/105 cm.

(e) The highest rainfall of India occurs at Cherrapunji/Mahabaleswar/Bombay. **[H. S. Examination, 1983]**

[নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে সঠিক উত্তর তৈয়ারি কর:

(ক) হিমালয় পর্বতমালা ভারতের উত্তরে/দক্ষিণে/পশ্চিমে অবস্থিত।

(খ) উচ্চগাঙ্গেয় সমভূমি দিল্লী হইতে আমেদাবাদ/কানপুর/এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

(গ) বিশাল হ্রদ মানস সরোবর নেপাল মালভূমিতে/তিব্বতে অবস্থিত।

(ঘ) ভারতের গড় বৃষ্টিপাত ৫০/৭০/১০৫ সেন্টিমিটার।

(ঙ) চেরাপুঞ্জি/মহাবালেশ্বর/বোম্বাই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল স্থান।

2. Find out the correct answers from the following statements :

(i) The Ganga plain is rich in mineral/forest/agricultural wealth. (ii) The Black Soil region of Deccan is formed of alluvium/volcanic materials/sands. (iii) India is a land of trade wind/monsoon wind/westerly wind. (iv) The climate of India usually remains wet in the month of July/January/April. **[H. S. Examination, 1984]**

[(i) গাঙ্গেয় সমভূমি খনিজ/বনজ/কৃষিজাত সম্পদে সমৃদ্ধ। (ii) দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল পলিমাটি/আগ্নেয় উপাদান/বালুকণা দ্বারা গঠিত। (iii) ভারতবর্ষ বাণিজ্য বায়ু/মৌসুমী বায়ু/পশ্চিমা বায়ুর দেশ। (iv) জুলাই/জানুয়ারী/এপ্রিল মাসে ভারতের জলবায়ু সাধারণতঃ আর্দ্র থাকে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষিকার্য

(Agriculture)

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৭০ জন লোক চাষে নিযুক্ত থাকে; ইহা ছাড়া শতকরা আরও ১০ জন লোক পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে কৃষির উন্নতিসাধন একান্ত প্রয়োজন।

উৎপাদনের সময় অনুসারে ভরতের কৃষিজাত-দ্রব্যকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—খারিফ শস্য ও রবিশস্য। বর্ষাকালের প্রারম্ভে বীজ বপন করিয়া হেমন্ত কালে যে শস্য পাওয়া যায় তাহাকে খারিফ শস্য বলে; যথা, ধান, পাট, তুলা, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, তামাক, বাদাম, রেড়ি, তিল প্রভৃতি। শীতকালের শুরুতে বীজ বপন করিয়া যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে **রবিশস্য** বলে। যথা, গম, যব, মটর, ছোলা, সরিষা, শণ প্রভৃতি। ধান, ভুট্টা ও বাদাম গ্রীষ্মকালেও চাষ হয়।

বিশাল আয়তনের এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু, মৃত্তিকা ও লোকবসতি বিদ্যমান থাকায় নানারকমের কৃষি-পদ্ধতি এই দেশে পরিলক্ষিত হয়। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত (২০০ সেঃ মিঃ-এর অধিক) অঞ্চলে আর্দ্র পদ্ধতি অনুসারে ধান, পাট, চা, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হয়। মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত (১০০-২০০ সেঃ মিঃ) অঞ্চলে স্বল্পার্দ্র কৃষি-পদ্ধতিতে গম, ভুট্টা, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ হয়। অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত (৫০-১০০ সেঃ মিঃ) অঞ্চলে সেচ কৃষি-প্রথায় গম, তুলা, ইক্ষু ও ভুট্টার চাষ হইতে পারে। প্রায় বৃষ্টিহীন (৫০ সেঃ মেঃ-এর কম) অঞ্চলে শুষ্ক কৃষি প্রথায় জোয়ার, বাজরা, ডাল প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা ও জলবায়ুর তারতম্যের জন্য সকল অঞ্চলে সমানভাবে কৃষিকার্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য স্থানের মৃত্তিকা অনুর্বর বলিয়া কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যগুলির বনভূমির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এই রাজ্যগুলির কৃষিকার্যের উন্নতির অন্তরায়। রাজস্থানের শুষ্ক মরু অঞ্চলে জলাভাবে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করা খুবই দুষ্কর। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সুসংগঠিতভাবে কৃষি-কার্যের উন্নতি সাধন করা কষ্টকর।

ভারতের কৃষিসমস্যা ও ইহার সমাধান (India's Agricultural Problems and its Solution)—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানকার কৃষি-পদ্ধতি এখনও অত্যন্ত প্রাচীন। ইহার ফলে ভারত ১৯৭১ সালের পূর্বে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ভারতের বিভিন্ন শিল্প কৃষিজাত-দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল; যথা, পাটশিল্প, চিনিশিল্প, কার্পাস-বয়ন শিল্প প্রভৃতি। এই সকল শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করা একান্ত প্রয়োজন। রপ্তানি-বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে হইলেও কৃষিজাত-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; কারণ ভারত প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্য বা এই সকল জিনিসের উপর নির্ভরশীল শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিকার্যের ভূমিকা এতটা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এই দেশ কৃষি-ব্যবস্থায় অত্যন্ত অনগ্রসর। মোট জমির অনুপাতে এখানকার কৃষিজাত-দ্রব্যের উৎপাদন অত্যন্ত কম। ভারতের কৃষিকার্যে আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কারণসমূহ প্রধানতঃ দায়ী:

(ক) ভারতের কৃষিকার্যে প্রধান সমস্যা এই যে, এখানে কৃষিজাত দ্রব্যের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম। সময়মত পর্যাপ্ত জলের অভাব, জমির উর্বরতাশক্তির

অভাব, সারের অপ্রতুলতা, উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহে সুবন্দোবস্তের অভাব, কৃষিজমি-বণ্টনে অব্যবস্থা, কৃষকের শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতির জন্য এই দেশের কৃষির উন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে সম্প্রতি ভারতের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে।

বিভিন্ন দেশে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন (মেঃ টন)
(১৯৮১)

	গম	ধান	ভুট্টা		গম	ধান	ভুট্টা
সোভিয়েত রাশিয়া	১·৬	৪·২	২·৮	চীন	১·৪	৩·৬	২·৮
ইটালি	২·৭	৫·১	৭·০	জাপান	৩·০	৫·৭	—
ফ্রান্স	৫·২	—	৫·৩	ব্রিটেন	৫·৭	—	—
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২·২	৪·৯	৫·৭	ভারত	১·৪	২·০	১·১
পঃ জার্মানী	৪·৯	—	৫·৬	আর্জেন্টিনা	১·৬	৩·২	২·৬
মিশর	৩·২	৫·৭	৩·৯	মোরক্কো	৩·৩	২·৮	১·০

হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উন্নত ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা এবং চাষীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা একান্ত প্রয়োজন। চাষীর সহযোগিতা পাইতে হইলে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা দরকার। এখনও অধিকাংশ চাষী হয় অন্যের জমি ভাগে চাষ করে, নতুবা অন্যের জমিতে দিন-মজুর হিসাবে কাজ করে। দিনের শেষে তাহার প্রাপ্য মজুরি পাইয়া সে বিদায় লয়। স্বভাবতঃই কৃষির হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে চাষীর স্বার্থ থাকে না। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে সর্বক্ষেত্রে **চাষের জমি চাষীকে** (Land to the tillers) দিতে হইবে। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে এই কথা স্বীকার করিলেও অধিকাংশ স্থানে এখনও এই নীতি কার্যে পরিণত হয় নাই। যতদিন চাষী জমি না পাইবে, যতদিন চাষী না জানিবে যে জমির উৎপাদিত ফসলের মালিক সে ছাড়া আর কেহ নহে, ততদিন হেক্টর-প্রতি আশানুরূপ উৎপাদন বাড়ানো অসম্ভব। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইতে হইলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সার-প্রয়োগের ও জলসেচের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট ধরনের বীজ কৃষককে সরবরাহ করিবার এবং বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতিতে কৃষককে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিলেই অন্যান্য দেশের মতো ভারতের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে।

(খ) ভারতের জনপ্রতি কৃষি-জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম—মাত্র ·৪২ হেক্টর : এই দেশের পরিবার-প্রতি কৃষি-জমির পরিমাণ মাত্র ৩ হেক্টর। কিন্তু অন্যান্য দেশে ইহার পরিমাণ অনেক বেশী। প্রতি পরিবারের কৃষি-জমির পরিমাণ নিউ জিল্যান্ডে ১১৬ হেক্টর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮৬ হেক্টর, ব্রিটেনে ২৬ হেক্টর এবং ডেনমার্কে ১৫ হেক্টর। উত্তরাধিকারপ্রথা অনুসারে ভারতের কৃষি-জমির আয়তন ক্রমশঃই কমিয়া যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত ধরনের চাষ করিতে হইলে কৃষি-জমির আয়তন বড় হওয়া প্রয়োজন। কৃষি-জমির আয়তন ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ায় কৃষকগণের পক্ষে ক্ষুদ্র আয়তনের জমি চাষ করিয়া সংসার চালানো কঠিন : ফলে বহু কৃষক গ্রাম ছাড়িয়া শহরাঞ্চলের কারখানায় চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্য জমির একত্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে সমবায় প্রথায় চাষের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। দেশে **সমবায় কৃষি** (Co-operative Farming) প্রবর্তিত হইলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে শুধু যে জমির একত্রীকরণ সম্ভব হইবে তাহাই নহে, এই ব্যবস্থায়

উৎকৃষ্ট বীজ ও সার সংগ্রহে সুবিধা হইবে, গরীব চাষীকে অত্যধিক হারের সুদে টাকা ধার করিতে হইবে না এবং সমবায়ের মারফত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ করিয়া হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে। বর্তমানে কৃষিজাত দ্রব্য বাজারে অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইলেও ইহার অল্প অংশই কৃষকের হাতে আসে। কারণ, মজুতদার ও ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন কৌশলে অল্প মূল্যে কৃষকগণের নিকট হইতে কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করিয়া গুদামজাত করে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারে।

(গ) ভারতে **ভূমিক্ষয়ের** দরুন বহু জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ভূমির উপরের অংশ উর্বর। বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি ভূমির উপরের অংশ অন্যত্র সরাইয়া লয়। ইহাতে ভূমি অনুর্বর হইয়া পড়ে। ভারতের প্রায় ১·২ কোটি হেক্টর জমি এই-ভাবে কৃষির অযোগ্য হইয়া পড়িয়া আছে। এই ভূমিক্ষয়ের প্রতিকার না করিলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। বৃক্ষরোপণ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ, কৃষি-জমিতে পশুচারণ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ভূমিক্ষয় রোধ করা যাইতে পারে। ('ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা-সংরক্ষণ' ৩৬—৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) **প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে** (বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির জন্য) জমির উৎপাদন ব্যাহত হয়। এইজন্য বন্যানিয়ন্ত্রণের ও জলসেচের বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারতে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা—দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা, ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা ইত্যাদি। এই সকল পরিকল্পনায় জলসেচ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভারতের জলসেচের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নগণ্য। কারণ, ইহাতে মোট কৃষি-জমির এক-চতুর্থাংশে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং জল-সেচ-ব্যবস্থা যাহাতে আরও অধিক জমিতে কার্যকর করা যায় তাহার বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

(ঙ) ভারতের **চাষীরা অধিকাংশই অশিক্ষিত**। ইহারা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখে নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের প্রথা সম্বন্ধে ইহাদের এখনও সম্যক্ ধারণা নাই। সুতরাং চাষীর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেই উহা কৃষির উন্নতির সহায়ক হইবে।

ভারতের কৃষি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Indian Agriculture and Five-Year Plans)—ভারত কৃষিকার্যের দেশ বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন সর্বদাই কৃষিকার্যের উন্নতির দিকে নজর রাখিয়াছেন ; বিশেষতঃ কৃষিকার্যের উন্নতির মাধ্যমে খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬) খাদ্যশস্য ও শিল্পশস্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য এই পরিকল্পনায় ২৯০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ ২·৭৫ লক্ষ মেঃ টন হইতে বাড়াইয়া ৬·১ লক্ষ মেঃ টন করিবার জন্য, ট্রাক্টরের সাহায্যে ৯·৬ লক্ষ হেক্টর পরিমিত জমির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য, কৃষি-জমির আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫·২২ কোটি মেঃ টন হইতে ৬·৫৮ কোটি মেঃ টনে, তৈলবীজ ৫১ লক্ষ মেঃ টন হইতে ৫৬ লক্ষ মেঃ টনে, ইক্ষুগুড় ৫৬ লক্ষ মেঃ টন হইতে ৬০ লক্ষ মেঃ টনে, তুলা ২৯ লক্ষ গাঁট হইতে ৪০ লক্ষ গাঁটে এবং পাট ৩৩ লক্ষ গাঁট হইতে ৪২ লক্ষ গাঁটে উন্নীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের উপর আরও গুরুত্ব

আরোপ করা হয়। ৮·০৫ কোটি মেঃ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা হইলেও ১৯৬০-৬১ সালে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন হয় ৭·৬ কোটি মেঃ টন। শিল্প-শস্যের উৎপাদনের উপরও অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিকল্পনায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খরচ হইয়াছে ৫৪৯ কোটি টাকা। কিন্তু এই পরিকল্পনায় প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নাই।

এই পরিকল্পনায় ৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, ৮০ লক্ষ হেক্টর জমির মৃত্তিকা সংরক্ষণ করা হইয়াছিল, ৫৮ লক্ষ হেক্টর পতিত জমি উদ্ধার করা হইয়াছিল এবং ৩ লক্ষ মেঃ টন রাসায়নিক সার কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। সারের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, কৃষিবিভাগসমূহের কার্যকারিতা ও সংগঠন উন্নত করিয়া এবং সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী করিয়া, সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মাধ্যমে কৃষককে সাহায্য দিয়া, জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য এই পরিকল্পনায় বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যয় হইয়াছিল ১,০৮৯ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে জলসেচের জন্য ৭৭৬ কোটি টাকা, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২২৬ কোটি টাকা, মৃত্তিকা-সংরক্ষণের জন্য ৭৩ কোটি টাকা, সমবায় আন্দোলনের জন্য ৮০ কোটি টাকা এবং সমষ্টি-উন্নয়নের জন্য ২৬ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছিল।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারের খাদ্য পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। ধান উৎপাদনে উন্নতির পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র শতকরা একভাগ। গমের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়াছিল, হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও কমিয়াছিল। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে লজ্জার কথা ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা বলা যায়। এই পরিকল্পনায় খাদ্য-শস্যের উৎপাদন কমিয়াছিল প্রায় ৭০ লক্ষ মেঃ টন।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য ব্যয় হইয়াছিল ২,৩২০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার কার্যকালে ১৯৭১ সালে ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন-লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ১২·৯ কোটি মেঃ টন। এই পরিকল্পনায় অধিকতর সার প্রয়োগ, উন্নত ধরনের ও অতি-উৎপাদনশীল বীজ-বপন, কৃষিক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গ বিনাশের বন্দোবস্ত, উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন, কৃষি-ঋণের সুবন্দোবস্ত এবং জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিকল্পনায় গ্রাম উন্নয়ন ও কৃষির উন্নতির জন্য মোট ৩,৭৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও ৪,৪৩২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ১৪ কোটি মেঃ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া খাদ্যে স্বয়ম্ভর হইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। এইজন্য উন্নত ধরনের সেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার কার্যকালে ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গ্রাম উন্নয়ন ও কৃষির উন্নতির জন্য ১১,০৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মৎস্য-চাষ ও বন উন্নয়নের জন্য ১,০৬৪ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও ১২,১৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। সুতরাং কৃষি, মৎস্যচাষ, বন ও সেচব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মোট ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৩,২১৯ কোটি টাকা। এই ধার্য অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হইলে কৃষি-ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষির উন্নতিসাধন ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইয়াছেঃ।

(ক) **কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি**—ভারতের ভৌগোলিক আয়তন ৩২·৮৮ কোটি হেক্টর। কৃষিকার্যের উপযুক্ত জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৭½ কোটি হেক্টর। তবে সমগ্র জমি এখনও কৃষিকার্যের আওতায় আসে নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ছিল ১১·৮৭ কোটি হেক্টর। চাষযোগ্য পতিত জমি উদ্ধার করিয়া এবং জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করিয়া মোট আবাদী জমির (Cropped-area) পরিমাণ ১৯৭৯-৮০ সালে ১৭·৫১ কোটি হেক্টর হইয়াছে।

(খ) **ভূমি সংস্কার**—চাষীদের চাষের জমির মালিক হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলেও চাষের উন্নতি হয়। এইজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় চাষের জমি চাষীকে দিবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে একজন জোতদারের হাতে বেশি জমি রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রভাবশালী জোতদারগণের প্রভাবে এই আইন সর্বত্র সম্পূর্ণ চালু করা সম্ভব হয় নাই। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এই আইন অধিকতর কার্যকর হওয়ায় কৃষির সর্বাধিক উন্নতি হইয়াছে।

(গ) **জলসেচ**—ভারত সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনায় জলসেচের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মোট ১৭·৫১ কোটি হেক্টর আবাদযোগ্য জমির মধ্যে ১৯৮১-৮২ সালে ৫·৮৭ কোটি হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। (বিস্তৃত বিবরণ ৪৬-৫০ পৃঃ দ্রঃ)

(ঘ) **সার**—জমিতে সার দিলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়। সেই কারণে সারের চাহিদা মিটাইবার জন্য ভারত সরকার রাসায়নিক সার উৎপাদনের ও আমদানির ব্যবস্থা করিয়া সারা দেশে সার বিতরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য সিন্ধ্রি, আলয়ে, গোরক্ষপুর, নাঙ্গাল, নেভেলী, হলদিয়া, ট্রম্বে, নামরূপ, কোচিন, বিশাখাপতনম, মাদ্রাজ ও অন্যান্য বহু স্থানে প্রচুর সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। ১৯৮১-৮২ সালে প্রায় ৬০·৬৪ লক্ষ মেঃ টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরকার চাষীদের জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহিত করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে **গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট** চালু করিবার জন্য চেষ্টা চালানো হইতেছে। ইহার মাধ্যমে সার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। ১৯৮০-৮১ সালে আনুমানিক ২২,৯৩৮ লক্ষ মেঃ টন কম্পোস্ট সার উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে হেক্টর-প্রতি সারের ব্যবহার ছিল ০·৫ কিলোগ্রাম ; ১৯৭৪-৭৫ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ কিলোগ্রামে দাঁড়াইয়াছে : এখন উহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঙ) **বীজ**—উচ্চফলনশীল বীজের মাধ্যমে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া ভারত সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনায় উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উন্নত মানের তাইচুং ১নং I.R. R. I, ৫, ৮, ২০, ২২ ২৬নং রত্না, জয়া, পদ্মা, যমুনা, কৃষ্ণ, কাবেরী, সবরমতী প্রভৃতি বীজধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছেন। সোনালিকা, হীরা, কল্যাণ প্রভৃতি উন্নতমানের বীজের সাহায্যে চাষ করার ফলে ভারতে গমের উৎপাদন ১৯৬৪-৬৫ সালে ১ কোটি ২৩ লক্ষ মেঃ টন হইতে ১৯৮১-৮২ সালে প্রায় ৪ কোটি মেঃ টনে দাঁড়ায়। অর্থাৎ গমের উৎপাদন বাড়িয়া আড়াই গুণের বেশী হইয়াছে। ভুট্টা, বাজরা, ইক্ষু প্রভৃতি শস্যেরও উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী ফার্মগুলিতে এবং সুরতগড়, জেতসার, হিসার, ঝাড়সাগুড়া, রায়চুর, কান্নানোর, লাধোয়াল, চেংগাম, কোকিলা-

বাড়ি, লোকিচেরা, লুসাইচেরা, বাহরাইচ এবং খাম্মামের রাষ্ট্রীয় খামারে উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন করা হয়।

(চ) শস্যের কীটনাশ—প্রতি বৎসর কীট, পঙ্গপাল প্রভৃতির উপদ্রবে লক্ষ লক্ষ টন শস্য নষ্ট হয়। এইজন্য ভারত সরকার বিভিন্ন কীটনাশক ঔষধ যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এইভাবে চাষীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হইতেছে।

(ছ) **কৃষি-শিক্ষা**—কৃষি-শিক্ষার উন্নতির জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। ১৯৬০ সালের তুলনায় বর্তমানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে মোট ১৯টি কৃষি-বিদ্যালয় ও ৯৩টি কৃষি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া ২৩টি কৃষি গবেষণাগার কৃষির উন্নতির জন্য গবেষণা কার্য চালাইয়া যাইতেছে।

(জ) জেলাভিত্তিক নিবিড় কৃষি-উন্নয়ন সূচী—তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে ১৯৬১ সালে সেচ, সার, উন্নতমানের বীজ, কীটনাশক ঔষধ, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য জেলাভিত্তিক নিবিড় কৃষি-উন্নয়ন সূচী (Intensive Agricultural District Programme) গ্রহণ করা হয়। সারা ভারতে ৩৭টি জেলায় এই কর্মসূচী চালু করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় এই কর্মসূচী প্রবর্তিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শস্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম ও হিমায়ন-ব্যবস্থা (Cold Storage) চালু করা হইয়াছে।

কৃষিতে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলঃ বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উপরিউক্ত পন্থাসমূহ গ্রহণ করার ফলে ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাইবেঃ

কৃষিজাত দ্রব্য	১৯৫০-৫১		১৯৭০-৭১		১৯৮০-৮১*	
চাউল (মেঃ টন)	২ কোটি	৬ লক্ষ	৪ কোটি	২৪ লক্ষ	৫ কোটি	৩২ লক্ষ
গম ,,		৬৫ ,,	২ ,,	৩২ ,,	৩ ,,	৬৫ ,,
জোয়ার ,,		৬২ ,,		৯০ ,,	১ ,,	৫ ,,
যব ,,		২৪ ,,		২৯ ,,		২২ ,,
ভুট্টা ,,		১৭ ,,		৭৪ ,,		৬৮ ,,
আলু ,,		১৭ ,,		৪৬ ,,	১ ,,	১ ,,
ইক্ষু ,,	৫ ,,	৭১ ,,	১২ ,,	৮৮ ,,	১৫ ,,	৫ ,,
তামাক ,,		২·৬ ,,		৩·৫ ,,		৪·৫১ ,,
চীনাবাদাম ,,		৩৫ ,,		৬১ ,,		৫০ ,,
তুলা (গাঁট†)		২৯ ,,		৪৬ ,,		৭৬ ,,
পাট (গাঁট)		৩৩ ,,		৪৯ ,,		৬৫ ,,
মেস্তা ,,		৭ ,,		১৩ ,,		১[illegible] ,,
চা (মেঃ টন)		২·৮ ,,		৪·২ ,,		৫·৬৭ ,,
কফি ,,		·২৫ ,,		১·১ ,,		১·৪[illegible] ,,
রবার ,,		·৪ ,,		·৯ ,,		৩[illegible] ,,

* India-81 হইতে সংগৃহীত।

† ১ গাঁট=১৮০ কে. জি.

জলসেচ-ব্যবস্থা

কৃষিকার্যের একটি প্রধান উপাদান হইল জল। ভারতের সর্বত্র সমানভাবে বৃষ্টিপাত না হওয়ার ফলে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন অপরিহার্য হইয়াছে।

জলসেচের প্রয়োজনীয়তা—ভারতে কৃষিকার্যে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারত মৌসুমী বৃষ্টিপাতের দেশ; তৎসত্ত্বেও ভারতে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। নিম্নে উহার কারণ বর্ণিত হইলঃ

(ক) ভারতের সর্বত্র **সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত** হয় না; কোথাও বেশী, কোথাও বা মাঝারি এবং কোথাও বা অত্যন্ত কম বৃষ্টিপাত হয়। ভারতের প্রায় অর্ধাংশে ২৫—১২৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ইহার ফলে মাঝারি ও কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জলসেচের প্রয়োজন হয়।

(খ) ভারতে কেবলমাত্র **বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত** হয়; সুতরাং রবিফসল চাষ করিবার সময় শীতকালে প্রায় সর্বত্র জলসেচের প্রয়োজন দেখা দেয়।

(গ) বর্ষাকালেও **বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা** দেখা দেয়। যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা ২০% কম হয়, তাহা হইলে শস্যের উৎপাদন কিছু কম হয়; কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত অপেক্ষা ৪০% কম হইলে ব্যাপক শস্য-হানি ঘটে এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যও জলসেচের প্রয়োজন।

(ঘ) জলসেচের মাধ্যমে নদীগুলিতে **বন্যানিয়ন্ত্রণ** করা সম্ভব ও **পরিমিত জলের** সাহায্যে চাষ করিলে শস্য ভাল হয়।

(ঙ) অনেক স্থানে মাটির **জলধারণ ক্ষমতা** কম থাকে; ফলে জলসেচের প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই সকল কারণে ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনোত্তর যুগে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচ-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হইয়াছে।

ভারতে জলসেচ-ব্যবস্থার সুযোগঃ (ক) উত্তর ভারতে নদ-নদীসমূহ হিমালয়ের তুষার-গলা জলে প্রায় সারা বৎসরই পুষ্ট থাকে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে যে বৃষ্টিপাত হয় উহার জলে এখানকার নদ-নদীগুলি দীর্ঘদিন পরিপূর্ণ থাকে। (খ) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলের নদ-নদী বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হয়; ঐ জল মালভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন জলাধারে সঞ্চিত রাখিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। (গ) ভারতের সমভূমি অঞ্চলের ভূমিভাগের ঢাল খুব কম হওয়ায় খাল খনন করা সহজসাধ্য ও কম ব্যয়সাধ্য। (ঘ) ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূ-ভাগ পলিমাটি-গঠিত হওয়ায় বৃষ্টির জল সমভূমিতে পলিস্তরের নীচে সঞ্চিত হয়। ইহার ফলে কূপ খনন করিয়া এই জলরাশি জলসেচের জন্য ব্যবহার করা সহজসাধ্য।

জলসেচ পদ্ধতি—ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা প্রভৃতির পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় জলসেচ-পদ্ধতিরও প্রভেদ দেখা যায়। প্রধানতঃ তিন প্রকারের সেচ-পদ্ধতি এই দেশে বর্তমান রহিয়াছেঃ কূপ, জলাশয় ও খাল।

(ক) **কূপ ও নলকূপ**—কূপ ও নলকূপের সাহায্যে ভারতের বহু স্থানে বিশেষতঃ উত্তর ভারতে জলসেচ হইয়া থাকে। ভারতের মধ্যে নলকূপ ব্যবহারে উত্তর প্রদেশ শীর্ষ স্থানের অধিকারী। রাজস্থান, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে বহু নলকূপ আছে। বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে নলকূপ হইতে জল তুলিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। বহু জায়গায় এখনও পুরাতন প্রথায় কপিকলের সাহায্যে গো-বাহিত যন্ত্র ও পারসিক চক্রের (Persian wheel) সাহায্যে কূপ হইতে জল তুলিয়া জলসেচ করা হয়।

(খ) **জলাশয়**—প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলাধারে বর্ষাকালে জল সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনমত সেই জল সেচকার্যে ব্যবহার করার প্রথা ভারতে প্রাচীন যুগ হইতেই বিদ্যমান। নদীর উপর বাঁধ দিয়া বৃহদাকার জলাধারের সৃষ্টি করিয়া উহাতে বর্ষাকালে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে এই প্রকারের জলসেচ-ব্যবস্থা অধিক পরিলক্ষিত হয়। উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যেও জলাশয়ের সাহায্যে জলসেচ হইয়া থাকে।

(গ) **খাল**—নদী বা জলাধার হইতে খাল কাটিয়া জলসেচের বন্দোবস্ত করার প্রথা ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সমতলভূমিতে খালের সাহায্যে জলসেচ করা সহজসাধ্য বলিয়া অধিকাংশ খাল উত্তর ভারতে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির ব-দ্বীপ সমভূমিতে, উপকূলবর্তী সমভূমিতে ও নদী-উপত্যকার সমভূমির স্থানে স্থানে খাল কাটিয়া জলসেচ করার রীতি প্রচলিত আছে। খাল সাধারণতঃ দুই প্রকার—**নিত্যবহ খাল ও প্লাবন খাল**। নিত্যবহ খালগুলিতে বৎসরের সকল ঋতুতেই জল থাকে। নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল উঁচুতে তুলিয়া নদীর উভয় কূল হইতে খাল কাটা হয়; সেইজন্য নিত্যবহ খালে সর্বদাই জল পাওয়া যায়। বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সকল খালই নিত্যবহ খাল। প্লাবন খালে বৎসরের সকল সময় জল থাকে না; কারণ, যে নদী হইতে খালে জল আসে, সেই নদীর জল গ্রীষ্মকালে নীচে নামিয়া যায় বা শুকাইয়া যায়। নদীতে বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি পাইলে বা প্লাবন হইলেই এই সকল খালে জল আসে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণে এই জাতীয় খাল বিশেষ উপযোগী।

যন্ত্রের সাহায্যে খালের জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা যায় বলিয়া প্রয়োজন অনুসারে খালের জল কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যায়। কৃষক তাহার প্রয়োজনের সময় কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করিতে পারে। স্বাধীনোত্তর যুগে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থায় খালের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ভারতের সেচ-ব্যবস্থায় কূপের ব্যবহার অপেক্ষা খালের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

পুরাতন সেচখালঃ পুরাতন সেচখালগুলির মধ্যে যেগুলি এখনও কাজে লাগিতেছে নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

(১) **পাঞ্জাব রাজ্যের** (ক) **শিরহিন্দ খাল** রূপারের নিকটবর্তী স্থানে শতদ্রু নদী হইতে খনন করা হয়; ইহার দৈর্ঘ্য ২,১৬৫ কিলোমিটার। ইহার সাহায্যে লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, হিসার ও নাভা জেলার ৫·৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ-ব্যবস্থা চলিতেছে।

(খ) **পশ্চিম যমুনা খাল** দিল্লীর নিকট যমুনা নদী হইতে খনন করা হয়; ইহার দৈর্ঘ্য ৩,০৬০ কিলোমিটার। এই খালের সাহায্যে রোটক, হিসার, পাতিয়ালা ও ঝিন্দ অঞ্চলে প্রায় ৩·৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ-ব্যবস্থা চলিতেছে।

(গ) উচ্চ বারি দোয়াব খালটি মধুপুরের নিকট ইরাবতী নদী হইতে কাটা হইয়াছে। এই খালের সাহায্যে গুরুদাসপুর ও অমৃতসর জেলায় ইরাবতী ও বিপাশা (বিয়াস) নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে ৩·৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা যাইতেছে।

(২) **উত্তর প্রদেশের** (ক) উচ্চগঙ্গা খালটি হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা নদী হইতে খনন করা হয়। ইহার সাহায্যে সাহারাণপুর, মজঃফরপুর, মীরাট, বুলন্দশর, আলিগড়, মথুরা ও এটাওয়া জেলায় প্রায় ৪·৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হইতেছে। (খ) নিম্নগঙ্গা খাল বুলন্দশর জেলায় নরোরার নিকট গঙ্গা হইতে খনন করা হয়। ইহার সাহায্যে আলিগড়, এটা, মৈনপুরী, এটাওয়া, কানপুর ও ফতেপুর জেলায় প্রায় ৪·৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হইতেছে। (গ) **সারদা খাল**

নেপাল সীমান্তে অবস্থিত বানবাসার নিকটে সারদা নদী হইতে কাটা হইয়াছে। এই খালের সাহায্যে হরদোই, পিলিভিত, এলাহাবাদ, সাজাহানপুর খেরি, সীতাপুর, প্রভৃতি জেলায় প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচকার্য চলে। (ঘ) পূর্ব যমুনা খাল ফৈজাবাদের নিকট যমুনা নদী হইতে কাটা হয়। সাহারাণপুর, মজঃফরপুর ও মীরাট জেলায় এই খালের সাহায্যে প্রায় ১·২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ কার্য চলে। (ঙ) আগ্রা খাল দিল্লীর নিকটস্থ ওখলায় যমুনা নদী হইতে কাটা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে দিল্লী, পাঞ্জাবের গুরগাঁও এবং উত্তর প্রদেশের মথুরা ও আগ্রা জেলায় ১·৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইয়া থাকে। এই পাঁচটি প্রধান খাল ছাড়াও

উত্তর প্রদেশে যমুনার বিভিন্ন শাখানদী হইতে বেতোয়া খাল, কান খাল ও ধাসান খাল কাটিয়া বিস্তৃত এলাকায় সেচব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৩) বিহারে ১৮৭৪ সালে শোণ নদ হইতে বহু খাল কাটিয়া সাহাবাদ, গয়া ও পাটনা জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। এই পুরাতন খালগুলিকে বর্তমানে সংস্কার করা হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইতেছে। শোণ নদের উপর অ্যানিকট বাঁধ নির্মাণ করিয়া খাল কাটিয়া প্রায় ৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বাঁধটি ৩,৮০০ মিটার লম্বা ও ৪৬ মিটার চওড়া।
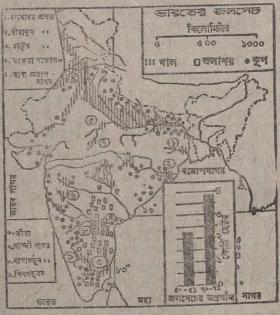
(৪) দাক্ষিণাত্যে প্রধানতঃ জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। দাক্ষিণাত্যে নিম্নলিখিত খালসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :— (ক) কার্ডামম পর্বতের পাদদেশে পেরিয়ার নদীতে বাঁধ দিয়া পেরিয়ার খাল

কাটা হইয়াছে। একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া এই খাল মাদুরার শুষ্ক অঞ্চলে জলসেচের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। (খ) কাবেরী নদীর উপর মেতুরে বাঁধ নির্মাণ করিয়া কাবেরী ব-দ্বীপ খালটি কাটা হইয়াছে। এই খালটির সহায়তায় ৪ লক্ষ হেক্টর পরিমিত জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ১,৬১৬ মিটার ও উচ্চতা ৫৪ মিটার। (গ) বেজওয়াদা শহরের নিকট কৃষ্ণা নদীর উপর বাঁধ দিয়া কৃষ্ণা ব-দ্বীপ খালটি কাটা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে কৃষ্ণা, গুণ্টুর ও নেল্লোর জেলার প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হইতেছে। (ঘ) গোদাবরী ব-দ্বীপ খালের সহায়তায় প্রধানতঃ শ্রীকাকুলাম, বিশাখাপত্তনম, পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী জেলার ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই খালগুলি ছাড়া পেনার-তুঙ্গভদ্রা নদীর সংযোগকারী কুর্ণুল, কুড্ডাপা খাল, আর্কট শহরের দক্ষিণস্থ পৈনী-পালার ও সৈয়ার খাল, কৃষ্ণা নদীর বাকিংহাম খাল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের উল্লেখযোগ্য সেচখাল। মহারাষ্ট্রের গোদাবরী ও উহার উপনদী প্রবরা, কৃষ্ণা ও উহার উপনদী ভীমা, ঘাটপ্রভা ও মালপ্রভা প্রভৃতির খাল দ্বারা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলসেচ হইয়া থাকে।

(৫) পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী আমলে নিম্নলিখিত চারটি খাল খনন করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ; (ক) ইডেন খাল (৭২ কিলোমিটার), (খ) দামোদর খাল (২,৩৩৪ কিলোমিটার), (গ) বক্রেশ্বর খাল (৩৪ কিলোমিটার) ও (ঘ) মেদিনীপুর খাল (৬৬২ কিলোমিটার)।

স্বাধীনোত্তর ভারতে জলসেচের অগ্রগতি—স্বাধীনতার পর ভারত সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বহু স্থানে নদীতে বাঁধ দিয়া খালের সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেন। প্রথম পরিকল্পনায় বহুমুখী নদী প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ হেক্টর এবং ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহুমুখী নদী-প্রকল্পের মাধ্যমে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ৮৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ-চালিত নলকূপের সাহায্যে অতিরিক্ত ০·৬৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনায় ৯৫টি নূতন ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার পর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ৫৩৬টি বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পের মাধ্যমে ৭৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় জলসেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য ৫,১২৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কালের মধ্যে ৪০ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচ-ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৭,৬০৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় গৃহীত প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

(১) বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দামোদর পরিকল্পনা, (২) হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য শতদ্রু নদীর উপর ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ ও গোবিন্দ সাগর জলাধার এবং বিপাশা প্রকল্প, (৩) ওড়িশার মহানদী প্রকল্প ও হীরাকুদ বাঁধ, (৪) অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা নদীর বাঁধ ও নাগার্জুনসাগর, জলাধার (৫) তামিলনাড়ুর কোণ্ডা নদী-প্রকল্প, (৬) কর্ণাটকের তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প, (৭)

মহারাষ্ট্রের কয়না নদী প্রকল্প ও গিরনা নদী-প্রকল্প, (৮) মধ্য প্রদেশের চম্বল নদীর বাঁধ ও গান্ধীসাগর জলাধার, (৯) রাজস্থানের চম্বল নদীর দুইটি বাঁধ এবং রাণাপ্রতাপসাগর ও জওহরসাগর জলাধার, রাজস্থান খাল প্রকল্প, (১০) গুজরাটের তাপ্তী নদীর উপর কাকড়াপাড়া বাঁধ ও মাহী প্রকল্প, (১১) উত্তর প্রদেশের রামগঙ্গা প্রকল্প, (১২) বিহারের গণ্ডক ও কুশী নদী প্রকল্প, (১৩) পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী প্রকল্প ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে উত্তর ভারতে গভীর ও অগভীর নলকূপের সংখ্যা এবং দক্ষিণ ভারতে পুষ্করিণীর সংখ্যা এই সময়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। (বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলির বিস্তৃত বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে ১১৮-১৩১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।)

ভারতে আবাদযোগ্য জমির মোট পরিমাণ ১৭.৫০ কোটি হেক্টর। এই সকল উন্নতির ফলে যেখানে ১৯৫০-৫১ সালে ২.২৬ কোটি হেক্টর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল সেখানে ১৯৮০-৮১ সালে ৫.৮৭ কোটি হেক্টর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে।*

কৃষিজাত দ্রব্য

ধান (Rice)

ধান ভারতের প্রধান ভক্ষ্যশস্য। খৃষ্টপূর্ব ১০০০ সালের পূর্বেও ভারতে ধান চাষের প্রচলন ছিল বলিয়া অথর্ববেদে উল্লেখ আছে।

চাষের উপযোগী অবস্থা—অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী-উপত্যকায় পলিময় অঞ্চলে ধানের চাষ হয়। এখনও প্রকৃতির খেয়াল-খুশির উপর ধানের উৎপাদন নির্ভরশীল। ধান-চাষের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ১৬° সেঃ হইতে ১৭° সেঃ উত্তাপ এবং ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ধান-চাষের জন্য প্রয়োজন। সময়োপযোগী অধিকতর বৃষ্টিপাত হইলেও ক্ষতি হয় না। ফসল কাটার সময় শুষ্ক আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন; বৃষ্টি হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। নদী-উপত্যকার পলিমাটিতে ধান ভাল জন্মে। জল ধরিয়া রাখিবার উপযুক্ত কাদামাটি ধান-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, চারাগাছগুলিকে বীজতলা হইতে তুলিয়া লইয়া কৃষিক্ষেত্রে রোপণ, ফসল-কাটা প্রভৃতি কার্যে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন।

ধান উৎপাদনের উপযোগী এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ভারতে বিদ্যমান। এইজন্য ধান উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতের সমতলভূমিতে তিনপ্রকার ধান উৎপন্ন হয়। যথা—আউশ, আমন ও বোরো। বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রকার ধান-উৎপন্ন হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে কম বৃষ্টিপাতে আউশ ধান এবং বর্ষাকালে বেশী বৃষ্টিপাতে আমন ধানের চাষ করা হয়। আমন ধান উৎকৃষ্টশ্রেণীর এবং আউশ ধান অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টশ্রেণীর। বোরো ধান আরও নিকৃষ্টশ্রেণীর। শীতকালে অনুর্বর জমিতে উহার চাষ হয়।

ভারতে প্রধানতঃ দুই প্রথায় ধানের চাষ হইয়া থাকে—বপন প্রথায় ও রোপণ প্রথায়। বপন প্রথায় বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বর্ষার শেষে গাছ পুষ্ট হইলে ধানগাছের পরিপক্ক শীষ কাটিয়া লওয়া হয়। রোপণ প্রথায় প্রথমে অল্প একখণ্ড জমিতে বীজ বপন করিয়া ধানগাছের চারা সৃষ্টি করা হয়। বৃষ্টিপাতের পরে এই চারা তুলিয়া বিস্তীর্ণ কর্দমাক্ত কৃষিক্ষেত্রে উহা হাতে রোপণ করিতে হয়। ইহাতে প্রচুর কৃষি-মজুরের প্রয়োজন হয়। ভারতে কৃষি-মজুরের অভাব না থাকায় এইজাতীয় ধান-চাষ বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

* India—1983; Page 256

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় বলিয়া কোনো বৎসরে অসময়ে বা অপরিমিত বৃষ্টিপাত হইলে ধানচাষ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।
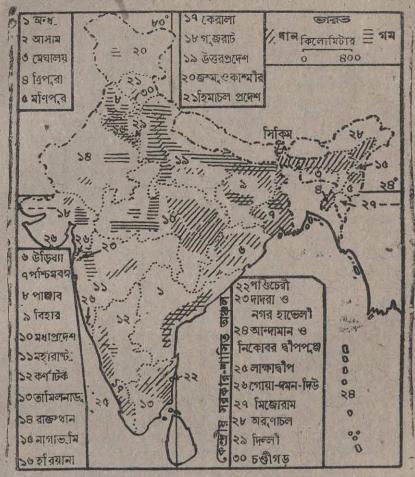
ধান চাষের বিভিন্ন সমস্যা—ভারত মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ধান-চাষের প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও বিভিন্ন সমস্যা থাকায় ধান উৎপাদনের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। সেইজন্য ভারত এখনও ধান উৎপাদনে স্থায়িভাবে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। ধান-চাষের প্রধান সমস্যা এই যে ধানের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম। চীনে হেক্টর-প্রতি ৩,৬০০ কিলোগ্রাম ধান উৎপন্ন হয়; কিন্তু ভারতে উৎপন্ন হয় মাত্র ২,০০০ কিলোগ্রাম। পূর্বে ভারতে হেক্টর-প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ আরও কম ছিল। ধান-চাষে জাপানী পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বর্তমানে কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জাপানী প্রথায় ধানের চাষ হইতেছে।

ধান-চাষের দ্বিতীয় সমস্যাটি হইতেছে কৃষকের ধান বিক্রয়ের অসুবিধা। ধান চাষ করিবার সময় চাষের খরচ সংকুলানের জন্য বা অন্য প্রয়োজনে কৃষক মহাজনের

নিকট হইতে টাকা ধার করে ; ধান কাটিবার পরে মহাজনকে অত্যন্ত অল্পমূল্যে ধান বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে ধান চাষ করিয়া কৃষকের বিশেষ লাভ হয় না এবং ধানচাষে সে বিশেষ উৎসাহিত হয় না। সমবায় প্রথার মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার এবং ন্যায্য মূল্যে ধান-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই কমবেশী ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা ও কেরালা রাজ্যে ধান উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী। ভারতে মোট ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পাললিক মৃত্তিকা ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ধান-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া এই রাজ্য ধান-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার বর্ধমান, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া ও কোচবিহার জেলায় অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়। সমগ্র আসাম ও বিহারের উত্তরাংশ ধান উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল। ওড়িশার কটক, পুরী ও সম্বলপুর জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী, তামিলনাড়ুর চিংলিপুট ও থাঞ্জাভুর এবং কর্ণাটকের উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। পূর্বে দেশের পূর্বাংশে ও দক্ষিণাংশে অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হইত ; কিন্তু বর্তমানে দেশের উত্তরাংশে, মধ্যাংশে এবং পশ্চিমাংশেও প্রচুর ধান উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব ভারত ও দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান ; ভারতের অন্যান্য অংশের অধিবাসীরাও ভাত খাইতে অভ্যস্ত।

উৎপাদন—এই সকল অসুবিধা কিছুটা দূর করিয়া চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকালে ১৯৭১ সালে ভারত ধান-উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। ১৯৮২ সালে ধান হইতে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫'৩৬ কোটি মেঃ টন ; অর্থাৎ ধানের উৎপাদন এই বৎসর পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বেশী হইয়াছে।

বাণিজ্য—পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশী ধান উৎপন্ন হইলেও স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া এই রাজ্য পার্শ্ববর্তী ওড়িশা ও অন্যান্য রাজ্য হইতে প্রচুর চাউল আমদানি করে। তামিলনাড়ু, বিহার, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশে আটা ও ময়দা ব্যবহৃত হয় বলিয়া চাউলের ঘাটতি দেখা যায় না। অধিকাংশ ধান স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয় হয় বলিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রাপ্ত চাউলের পরিমাণ খুব কম। ওড়িশা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, আসাম ও মধ্য প্রদেশ অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন করে বলিয়া ইহারা অন্যান্য রাজ্যে, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে চাউল প্রেরণ করে।

ভারতে অভ্যন্তরীণ চাউল-ব্যবসায়ের প্রধান সমস্যা এই যে, মজুতদারগণ বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদের নিকট হইতে ধান ক্রয় করিয়া গুদামজাত করে এবং অস্বাভাবিক ভাবে চাউলের মূল্য বাড়াইয়া দেয়। সরকার মাঝে মাঝে চাউল-ব্যবসায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিলেও মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য সম্বন্ধে অসাধু ব্যবসায়িগণকে কখনই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। ইহার একমাত্র সমাধান চাউলের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া।

ভারতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় চাউল আমদানির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে পাইতে ১৯৭৮ সাল হইতে আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বরং ১৯৭৯ সাল হইতে ভারত ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মরিশাস, বাংলাদেশ, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশে অল্প পরিমাণ চাউল রপ্তানি করিতেছে।

গম (Wheat)

গম ভারতের দ্বিতীয় ভক্ষ্যশস্য। মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার ইতিহাসে ভারতে গমচাষের নিদর্শন পাওয়া যায়।

চাষের উপযোগী অবস্থা—হিমোষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে শুষ্ক কৃষি-ভিত্তিক গমের চাষ হইয়া থাকে। গমের বিশেষত্ব এই যে, ইহার চাষ মৃত্তিকা অপেক্ষা জলবায়ুর উপর অধিক নির্ভরশীল।

গম উৎপাদনের জন্য ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং অন্ততঃ ১৪° সেঃ উত্তাপের প্রয়োজন। গম-চাষের প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ শীতল ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং ফসল কাটিবার সময় উষ্ণ আবহাওয়া ও সূর্যালোক প্রয়োজন হয়। গম উৎপাদনের উপযোগী এই প্রাকৃতিক অবস্থা এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান। ভারতে প্রধানতঃ দুইটি ঋতুতে গম উৎপন্ন হয়—শীতকালে ও বসন্তকালে। শীতকালীন গমের প্রথমাবস্থায় কম উত্তাপ ও পাকিবার সময় অধিক উত্তাপ প্রয়োজন হয়। এইজন্য নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ইহার চাষ হয় এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে শস্য কাটা হয়। ভারতের অধিকাংশ গম এইভাবে চাষ হইয়া থাকে; বাসন্তিক গম চাষ হয় এপ্রিল মাসে এবং শস্য তোলা হয় আগস্ট মাসে। এই দেশে গম-চাষের জন্য ৩ মাস হইতে ৬ মাস সময় লাগে। ভারী দো-আঁশ মাটি ও কাদামাটিতে গমের চাষ ভাল হয়। গম-চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন। কারণ, জমিকর্ষণ, বীজবপন, শস্য-তোলা প্রভৃতি সকল কাজই মানুষের সাহায্যে হইয়া থাকে। ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চলে গমের চাহিদা বেশী এবং শ্রমিকেরও কোনো অভাব নাই, এইজন্য উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে অধিক গম-চাষ পরিলক্ষিত হয়। ভারতে প্রধানতঃ দুইপ্রকার গম উৎপাদিত হয় সাধারণ রুটির উপযুক্ত গম এবং মাকারোণি গম। এঁটেল মাটিতে জলসেচের সাহায্যে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে রুটির উপযোগী গম প্রচুর জন্মে। মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ এবং অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিমাংশের কৃষ্ণমৃত্তিকায় বৃষ্টির জলের সাহায্যে মাকারোণি গম উৎপন্ন হয়।

গম চাষের বিভিন্ন সমস্যা—ভারতে গম-চাষের প্রধান সমস্যা এই যে, এখানে হেক্টর-প্রতি গম উৎপাদন (৮৭০ কিলোগ্রাম) অত্যন্ত কম ছিল। অন্যান্য গম-উৎপাদক দেশে গমের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বেশী। বিভিন্ন পরিকল্পনায় জলসেচ ও সারের বন্দোবস্ত করায় ক্রমশঃ গম-চাষের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। পুষার 'কেন্দ্রীয় গম গবেষণাগার' গমের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গবেষণাকার্য চালাইয়া যাইতেছে। বর্তমানে অতি-উৎপাদনশীল বীজ বপনের ফলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১,৪০০ কিলোগ্রামে দাঁড়াইয়াছে। গমের কৃষি-জমির জনপ্রতি পরিমাণ ভারতে অত্যন্ত কম। এখানে প্রতি ২৫ জন লোকের জন্য এক হেক্টর গমের কৃষি-জমি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় জনপ্রতি এক হেক্টর, ইটালি ও ফ্রান্সে প্রতি ৭ জনে এক হেক্টর গম চাষের জমি বিদ্যমান।

উৎপাদন—গম চাষের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করায় এই পরিকল্পনার কার্যকালে ১৯৭১ সালে ভারত গম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। ভারতে ঐ বৎসরে ২ কোটি ৩২ লক্ষ মেঃ টন গম উৎপন্ন হয়। ১৯৮২ সালে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ মেঃ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে। গম উৎপাদনে ভারত বর্তমানে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে; সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরেই ভারতের স্থান।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে মোট ২ কোটি ২১ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম চাষ হয়।

উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে গম উৎপাদনের আদর্শ প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান বলিয়া এই তিনটি রাজ্য প্রচুর গম উৎপাদন করে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত গমচাষের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে গম উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য। পরিমিত জলের ব্যবহার গম-চাষের উপযোগী বলিয়া জলসেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে গম-চাষ সহজসাধ্য হয়। এইজন্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে গমের চাষ হইয়া থাকে (১৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

উত্তর প্রদেশ গম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যের দেরাদুন, সাহারাণপুর, মজঃফরপুর, মীরাট, মোরাদাবাদ, এটাওয়া, বুদাউন, শাহজাহানপুর, নৈনিতাল ও গোরক্ষপুর জেলায় অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদনে পাঞ্জাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মধ্য প্রদেশের নর্মদা উপত্যকায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় গম চাষ হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে গমের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাণিজ্য—ভারতের মোট উৎপন্ন গমের শতকরা ৪৫ ভাগ উৎপাদক অঞ্চলেই ব্যয়িত হয়; বাকী ৫৫ ভাগ বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে। গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বাড়িয়া যাওয়ায় ভারতকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর গম আমদানি করিতে হইত। খাদ্যে স্বাবলম্বী হইবার জন্য ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় গম-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইহাতে গমের উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে। ১৯৭৮ সাল হইতে ভারত গম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

যব—গম ও যব উৎপাদনের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় একই রকম। গমের তুলনায় যব চাষে জলের প্রয়োজন কম হয় বলিয়া অনেক জায়গায় জলের অভাবে গমের পরিবর্তে যবের চাষ হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বিহার ও ওড়িশায় অধিকাংশ যব উৎপন্ন হয়।

১৯৮২ সালে ১৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ২২·৪ লক্ষ মেট্রিক টন যব উৎপন্ন হইয়াছে।

ভুট্টা—ভুট্টা উৎপাদনে গম অপেক্ষা অধিকতর উত্তাপ ও গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ইহার চাষ ভাল হইয়া থাকে। ১৫°-২৭° সেঃ উত্তাপ এবং ৫০—১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতে ভুট্টা চাষ হয়। উর্বর মৃত্তিকায় জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে উৎপাদন ভাল হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—সারা ভারতেই কম বেশী ভুট্টা উৎপন্ন হইলেও উত্তর ভারতেই ইহার বেশীর ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে ভুট্টা বেশী জন্মে। রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরেও ইহার চাষ হয়।

১৯৮২ সালে ভারতে ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছে।

মিলেট (Millets)

জোয়ার, বাজরা, রাগি, শ্যামা, চিনা প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকৃতি ও নিকৃষ্ট ধরনের দানাবিশিষ্ট শস্যকে মিলেট বলে।

জোয়ার—উৎপাদনের পরিমাণের বিচারে ধান ও গমের পরেই ইহার স্থান। ২৬°—৩২° সেঃ উত্তাপ ও ৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত জোয়ার চাষের পক্ষে প্রয়োজন। অনুর্বর এবং শুষ্ক জমিতে ইহার চাষ হয়। তাহা ছাড়া জোয়ার চাষে অতি

সামান্য জলসেচ প্রয়োজন হয়। ইহা খরা ও বন্যা দুই রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই সহ্য করিতে পারে। এই সকল কারণে দাক্ষিণাত্যে জোয়ার চাষ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল—মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটকে জোয়ার চাষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। গুজরাট, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র জোয়ার চাষে ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

১৯৮২ সালে ভারতে ১ কোটি ৬১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১ কোটি ৫ লক্ষ মেট্রিক টন জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছে।

বাজরা—জোয়ারের অনুরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাজরার চাষ হয়। তবে যে সকল অঞ্চলে মাটি নিকৃষ্ট ও বালিপ্রধান এবং বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা বেশী সেই সব অঞ্চলেই জোয়ারের পরিবর্তে বাজরা চাষ হইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল—রাজস্থান ও গুজরাটে বাজরার চাষ বেশী হয়। পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশের শুষ্ক অঞ্চলেও ইহার চাষ হইয়া থাকে।

১৯৮২ সালে ১ কোটি ১৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৫৪ লক্ষ ১৮ হাজার মেট্রিক টন বাজরা উৎপন্ন হইয়াছে।

রাগি—উষ্ণ ক্রান্তীয় ও শুষ্ক অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। জোয়ার ও বাজরার তুলনায় ইহার হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ। রাগি খারিফ শস্য। ২৫° সেঃ উত্তাপ ও ৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে রাগি জন্মে।

১৯৮২ সালে ২৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন রাগি উৎপন্ন হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার ডাল—পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে শীতকালে রবিশস্য হিসাবে ছোলা, মুগ, মসুর, মটর, অড়হর প্রভৃতি নানা ধরনের ডাল উৎপন্ন হয়। ১৯৮২ সালে ১ কোটি ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রকার ডাল উৎপন্ন হইয়াছে।

চাউল ও গমের আমদানি বন্ধ হওয়ার পূর্ব বৎসর (১৯৭৭) হইতেই ভারতে অন্যান্য দানাশস্যের আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইক্ষু (Sugar-cane)

ইক্ষু হইতে চিনি ও গুড় তৈয়ারি হয়; ইহা মানুষের দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। খ্রীষ্টপূর্ব ৫,০০০ সালে ভারতে রচিত অথর্ববেদে ইক্ষুর উল্লেখ আছে। সুতরাং সেই সময়েও যে এই দেশে ইক্ষুর চাষ হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। এখানকার ইক্ষুগাছ সাধারণতঃ ২½ মিটার হইতে ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ইক্ষুগাছের রসের সহিত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া চিনি প্রস্তুত হয়। ভারতে ইক্ষু হইতে গুড় ও চিনি উভয়ই প্রস্তুত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা—ইক্ষু ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলসেচিত এলাকায় ইহার চাষ দেখা যায়। চাষের জন্য ২৭° সেঃ উত্তাপ ও গ্রীষ্মকালে কমপক্ষে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বর্ষাকাল দীর্ঘদিন স্থায়ী (প্রায় ৭—৯ মাস) হওয়ায় ইক্ষুগাছগুলি যথাযথ বাড়িতে পারে। শীতকালে ইক্ষুর রসস্থ এবং পরিণত হইবার সময়। তখন শুষ্ক জলবায়ু প্রয়োজন। কুয়াশা বা তুহিন ইক্ষু-চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। ২৭° সেঃ-এর নীচে তাপ নামিলে গাছের বৃদ্ধি হয় না এবং ২০° সেঃ-এর কম উত্তাপ হইলে গাছের নানাভাবে ক্ষতি হয়। সমুদ্র উপকূলে ইক্ষুর ফলন ভাল হয়। কারণ, নোনা

বাতাস ও নোনা মাটি ইক্ষুর উৎপাদনে সাহায্য করে। ইক্ষু-চাষের জমিতে প্রচুর নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করিতে হয়। ইক্ষু-চাষের জন্য চুন ও লবণ মিশ্রিত দো-আঁশ মাটি প্রয়োজন। ইক্ষু-চাষের এই সব প্রাকৃতিক অবস্থা ভারতে বিদ্যমান থাকায় এই দেশ ইক্ষু-উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু এই দেশের ইক্ষু-চাষে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান থাকায় চিনি উৎপাদনে ও ইক্ষুর হেক্টর প্রতি উৎপাদনে এই দেশ এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

ইক্ষুর হেক্টর-প্রতি উৎপাদন (মেঃ টন)

হাওয়াই	১৭৫	পোর্টোরিকো	৬০	কিউবা	৪৩
জাভা (ইন্দোনেশিয়া)	১৪১	অস্ট্রেলিয়া	৫১	ভারত	৪০

ইক্ষু-চাষের বিভিন্ন সমস্যা—ইক্ষু-চাষের অনুন্নতির মূলে রহিয়াছে ভূমি-ব্যবস্থার কুফল, জলসেচ ও সারের অপ্রতুলতা এবং পুরাতন প্রথায় চাষ। ভারতের উত্তরাংশে অধিকাংশ (৭০%) ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও দক্ষিণ ভারতে ইক্ষু চাষের আদর্শ জলবায়ু থাকায় এখানকার হেক্টর-প্রতি উৎপাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা ৩/৪ গুণ বেশী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মৃত্তিকা ইক্ষু-চাষের বিশেষ উপযোগী না হওয়ায় শুধু খালসমূহের নিকটেই ইক্ষু-চাষ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। অধিকাংশ খালের জল খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত হওয়ায় ইক্ষু-চাষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নহে। ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যের মোট ইক্ষু উৎপাদন অনেক কম। ভারতের ইক্ষু-চাষের অন্যতম সমস্যা এই যে, এখানকার মানুষ গরীব বলিয়া অত্যধিক দামে চিনি কিনিতে পারে না। সেইজন্য অধিকাংশ ইক্ষু গুড়-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। মাত্র

এক চতুর্থাংশ ইক্ষু চিনির কলে প্রেরিত হয়। ইহার ফলে চাষীর পক্ষে ইক্ষুর উপযুক্ত মূল্য পাওয়া কঠিন। ভারতের ইক্ষু-রসে চিনির অংশ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। সেইজন্য প্রচুর ইক্ষু হওয়া সত্ত্বেও চিনি উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। জাভার অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। এই জন্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি (Indian Central Sugar-cane Committee) ইক্ষু-চাষের উন্নতির জন্য এবং ইক্ষু-রসে চিনির অংশ বৃদ্ধির জন্য গবেষণা চালাইয়া যাইতেছে।

ভারতের কৃষকগণ অশিক্ষিত বলিয়া ইক্ষুর ছোবড়া অধিকাংশই জ্বালানি

হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু ইহা দ্বারা বোর্ড প্রস্তুত করিলে চাষী ছোবড়া বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্য পাইতে পারে। গুড় প্রস্তুত করিবার সময় সরাসরি উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত না থাকায় চাষী উহার মূল্য হইতেও বঞ্চিত হয়। সমবায়ের মাধ্যমে চাষীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইক্ষু চাষের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত জলসেচ, সার প্রভৃতির ব্যবস্থা করায় ক্রমশঃ হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কিছুটা বাড়িতেছে।

উৎপাদক অঞ্চল—মোট উৎপাদনের শতকরা ৪৬ ভাগ উৎপন্ন করিয়া উত্তর প্রদেশ ইক্ষু উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সাহারানপুর, শাহ জাহানপুর, ফৈজাবাদ, গোরক্ষপুর আজমগড়, বালিয়া, জৌনপুর, বারাণসী ও বুলন্দশর জেলায় অধিকাংশ ইক্ষু উৎপন্ন হয়। বিহারের সারণ, চম্পারণ, দারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর জেলায় অধিকাংশ ইক্ষু উৎপন্ন হয়; পাঞ্জাবের অমৃতসর ও জলন্ধর, হরিয়ানার রোহ্‌টক জেলায় ইক্ষু চাষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু রাজ্যেও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের বীরভুম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় ইক্ষুর চাষ সীমাবদ্ধ।

উৎপাদন—১৯৮২ সালে ২৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১৮ কোটি ৩৬ লক্ষ মেঃ টন ইক্ষুদণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা প্রায় ২ কোটি মেঃ টন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বাণিজ্য—ইক্ষু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা কঠিন। কারণ, ইক্ষু কাটিয়া বিছুদিন রাখিয়া দিলে ইহার রস শুকাইয়া যায়। সেইজন্য অধিকাংশ ইক্ষু সন্নিকটস্থ চিনির কলে প্রেরিত হয় বা উৎপাদন-স্থলের নিকটেই ইহা দ্বারা গুড় প্রস্তুত হয়। সেইজন্য ইক্ষুর বাণিজ্য সাধারণতঃ স্থানীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। মূল্য-নির্ধারণ ইক্ষু-ব্যবসায়ের প্রধান সমস্যা। চিনির কলের মালিকগণ বিভিন্নভাবে কম মূল্যে ইক্ষুক্রয়ের চেষ্টা করে। ইহাতে কৃষকগণ ইক্ষু বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হয় না বলিয়া ইক্ষু উৎপাদনে তাহারা কিছুটা নিরুৎসাহ হয়। ইক্ষুর উচিত মূল্য নির্ধারণের জন্য সরকারকে বহুবার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে; কিন্তু সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই।

পাট (Jute)

পাট ভারতের প্রধান তন্তু ফসল। ইহার বাণিজ্যিক মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারতের অর্থনীতিতে পাট যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হইত পূর্ববঙ্গে; সেখানকার পাট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এই পাট সোজা কলিকাতায় পাটের কলে চলিয়া আসিত; কারণ, ভারতের প্রায় সকল পাটকল কলিকাতার নিকটে অবস্থিত ছিল। দেশ বিভক্ত হওয়ায় ভারতে পাট-সরবরাহের এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। এইজন্য ভারত সরকার পাট উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। বিভিন্ন রাজ্যে পাট-চাষ ছড়াইয়া দিয়া পাটের উৎপাদন বাড়াইবার বন্দোবস্ত করা হইল। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী রাজ্যসমূহে পাটের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। পাটের পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে মেস্তার উৎপাদনও বাড়ানো হয়। ভারতে পাট ও মেস্তার মতো আর কোনো কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এতটা বৃদ্ধি পায় নাই।

পাটের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এখনও কিছুটা কম। এইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে মেস্তার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। মহারাষ্ট্রে 'আমবাদী' নামে, অন্ধ্র প্রদেশে 'বিমলি' নামে, হায়দরাবাদে 'দাক্ষিণাত্যের শণ' নামে, বিহারে 'পুষার শণ' নামে এবং পশ্চিমবঙ্গে 'মেস্তা' নামে ইহা পরিচিত। পাট-চাষের অনুপযুক্ত জমিতে ও

অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতে মেস্তা উৎপন্ন হইতে পারে। পাট অপেক্ষা মেস্তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর তন্তু। থলিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। পাটের অভাব পূরণে মেস্তা প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও বিহারে অধিকাংশ মেস্তার চাষ হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে পাটের চাষ সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলে শতকরা ৯৯ ভাগ পাট উৎপন্ন হয়। উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ু পাট-চাষের উপযোগী। ২৫° সেঃ উত্তাপ এবং ১৫০-২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত পাট-চাষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বায়ুতে প্রচুর আর্দ্রতা থাকা চাই। নবীন পলিমাটি বা দোঁ-আশ মাটি পাট-চাষের পক্ষে উপযুক্ত। পাট পচাইয়া আঁশ বাহির করিবার জন্য খাল, বিল, জলা প্রভৃতি স্থির জলের জলাশয় প্রয়োজন। পাট-চাষের জন্য প্রচুর সুলভ অথচ অভিজ্ঞ শ্রমিক প্রয়োজন। জমি চাষের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বীজবপন, নিড়ানো, পাট-ভিজানো, আঁশ ছাড়ানো প্রভৃতি কাজ হাতে করিতে হয় বলিয়া প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

পাট-উৎপাদনের উপযোগী আদর্শ জলবায়ু ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে বিদ্যমান। এখানকার অত্যধিক বৃষ্টিপাত, সুলভ শ্রমিক, পললমাটি পাট-চাষের উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। ভারতে পাটগাছ সাধারণতঃ ১½ হইতে ৩½ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। নদী-উপত্যকায় পলিমাটি পাট-চাষের উপযোগী বলিয়া গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পাট-চাষ প্রায় সীমাবদ্ধ। প্রতি বর্ষায় পলি জমিয়া জমির উর্বরতাশক্তি বজায় থাকে বলিয়া সারের প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে ইহার চাষ শুরু হয় এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে ফসল কাটা হয়। পশ্চিমবঙ্গে জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে ফসল কাটা হইয়া যায়। পাট কাটিবার পর ডোবা, পুকুর প্রভৃতিতে ভিজাইয়া ইহা পচাইতে হয়। সেইজন্য ফসল কাটিবার সময় ডোবা বা পুকুরে স্বচ্ছ জল থাকা প্রয়োজন। পাট পচিবার পর ডাঁটা হইতে বাকল ছাড়াইয়া লওয়া হয়; পাটগাছের বাকল ধুইয়া শুকাইয়া পাট প্রস্তুত করা হয়।

পাট-চাষের বিভিন্ন সমস্যা—ভারতের পাট-চাষে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান থাকায় সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কিছুটা কম। প্রথমতঃ, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট চাষের জন্য প্রয়োজন স্রোত বর্জিত স্থির স্বচ্ছ জল—যাহাতে পাট ভিজাইয়া পচানো যায়। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বন্যায় নূতন জল

আসিয়া ডোবা ও খাল ভর্তি করে। সেইজন্য এখানকার পাট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের খালবিলে এইজাতীয় জলের অভাব থাকায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপাদন করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব থাকায় বহু স্থানে কৃষকগণ পাট-চাষ না করিয়া খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তৃতীয়তঃ পাটকলের মালিকগণ কৃত্রিম উপায়ে পাটের দাম কমাইয়া রাখে। ফড়িয়াগণও মধ্যপথে পাট চাষীকে ঠকাইয়া প্রচুর মুনাফা করে। এই সকল কারণে পাট-চাষে কৃষকগণ বিশেষ উৎসাহিত হয় না। চতুর্থতঃ, ভারতে পাটের হেক্টর-প্রতি গড় উৎপাদন অনেক কম—১,৩০০ কিলোগ্রাম। বিভিন্ন রাজ্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদন সমান নহে। প্রতি হেক্টর জমিতে আসামে ১,৪৭০ কিলোগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে ১ ৩৮৪ কিলোগ্রাম, উত্তর প্রদেশে ১,১৪১ কিলোগ্রাম, ত্রিপুরায় ১,০৯১ কিলোগ্রাম, এবং বিহারে ৯৯০ কিলোগ্রাম পাট উৎপন্ন হয়। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য উন্নত ধরনের পাট-চাষের খরচ কমাইবার জন্য 'ভারতের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (Indian Agricultural Research Institute) বিভিন্ন ভাবে গবেষণা চালাইতেছে। এই গবেষণার ফলে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগাইয়া পাট-চাষের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেত পরিষ্কার করা যাইবে এবং চাষের খরচ কিয়দংশ কমিয়া যাইবে।

উৎপাদন অঞ্চল—স্বাধীনতার সমসাময়িক কালে পশ্চিমবঙ্গেই অধিকাংশ পাট-চাষ হইত। কিন্তু পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে পাট-চাষের বিস্তার হয়। দেখা গিয়াছে যে, এই সকল রাজ্যেও ভালোভাবে পাট-চাষ করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল জেলায় কম-বেশী পাট উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বর্ধমান, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও মেদিনীপুর জেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ ও তেজপুর পাট-চাষের জন্য বিখ্যাত। আসামে পাট-উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়ানো সম্ভবপর। কারণ, এখানে পাট-চাষের আদর্শ জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিদ্যমান। উত্তর প্রদেশের হিমালয় সন্নিহিত সরযু, ঘর্ঘরা ও চণ্ডকা নদীর উপত্যকা পাট-চাষের বিশেষ উপযোগী। পাট-উৎপাদনের খরচ কিছু বেশী হইলেও মহারাষ্ট্র রাজ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপাদন সম্ভবপর। ওড়িশার কটক জেলায় এই রাজ্যের অধিকাংশ (৯২%) পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যও পাট-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। বিহারের মোট উৎপন্ন পাটের শতকরা ৯০ ভাগ আসে পূর্ণিয়া জেলা হইতে। বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি (Indian Central Jute Committee) ভারতে পাট-চাষের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

উৎপাদন ১৯৮২ সালে ১১·৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট এবং মেস্তা চাষ করা হয়। উৎপাদনের পরিমাণ পাট ও মেস্তা একত্রে ৮৪ লক্ষ গাঁট*। পাট-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থানের অধিকারী।

বাণিজ্য ভারতে উৎপন্ন অধিকাংশ পাট কলিকাতার সন্নিকটস্থ পাটকলে বিক্রয় হয়। অন্যান্য অঞ্চলের পাটকলে স্থানীয় পাট ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাঁচা পাটের চাহিদা মিটায় বাংলাদেশ। ভারতে পাটের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায়

* ১ গাঁট=১৮০ কিলোগ্রাম

কম বলিয়া, এই দেশের পক্ষে রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে ; অবশ্য ভারত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু পাট কলিকাতা বন্দর মারফত রপ্তানি করে। ১৯৮১ ৮২ সালে ভারত বাংলাদেশ হইতে অল্প পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট আমদানি করিয়াছে।

তুলা (Cotton)

তুলা ভারতের দ্বিতীয় তন্তু ফসল ; ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্বও যথেষ্ট। প্রাচীন যুগে লিখিত বেদশাস্ত্রে তুলা চাষের উল্লেখ আছে। মহেঞ্জোদড়োতে ৫,০০০ বৎসর পূর্বেকার তুলো-চাষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারত যে প্রাচীনকালেও তুলা-চাষে উন্নতিলাভ করিয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমান যুগেও ভারত তুলা-উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতের অর্থপ্রসূ শস্যের মধ্যে তুলার স্থান সকলের উপরে।

চাষের উপযোগী অবস্থা—তুলা গাছের গুটিফল ফাটিবার পূর্বে ৬৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। কিন্তু গুটিফল ফাটিয়া তুলা বাহির হওয়ার পর বৃষ্টিপাত হইলে ইহা তুলা চাষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সময় মতো জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২৪° সেঃ উত্তাপে তুলোগাছ ভালো জন্মে। কিন্তু তুলার ফল বাহির হইবার পর অত্যধিক গরম পড়িলে তুলা ঝরিয়া পড়ে। চাষের প্রাথমিক অবস্থায় আর্দ্র সমুদ্রবায়ু এবং পরে সূর্যকিরণ ও শুষ্ক আবহাওয়া বাঞ্ছনীয়। তুলা চাষের সময় অন্ততঃ ২০০টি তুহিন-মুক্ত দিবস প্রয়োজন। চুন-মিশ্রিত উর্বর দো-আঁশ মাটি তুলা-চাষের উপযোগী। কৃষ্ণ-মৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে খুব ভালো। এইজন্য ইহাকে "কৃষ্ণ-তুলা মৃত্তিকা" (Black Cotton Soil) বলা হয়। তুলা চাষের জমিতে জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। তুলা গাছ হইতে গুটি তোলা এবং গুটি হইতে তুলা ছাড়াইবার জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন।

তুলা চাষের বিভিন্ন সমস্যা – ভারতে তুলা-চাষের সকল প্রকার ভৌগোলিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও বিভিন্ন সমস্যা থাকায় তুলার উৎপাদনে আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে হেক্টর প্রতি তুলার উৎপাদন অনেক কম—মাত্র ১২২ কিলোগ্রাম ; পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ৯১০ কিলোগ্রাম। পরিমিত জলের অভাবে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কমিয়া যায়। বর্তমানে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচ-ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় ক্রমশঃ হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলা-উৎপাদনের আদর্শ জলবায়ু থাকায় এবং জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিমিত জল ব্যবহার করায় পাঞ্জাবে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী—প্রায় ২৪০ কিলোগ্রাম। ভারতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হইলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলার উৎপাদন অত্যন্ত কম। ভারতে প্রধানতঃ তিন প্রকার তুলা উৎপন্ন হয়—দীর্ঘ আঁশযুক্ত, মাঝারি আঁশযুক্ত ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা ২·৯ সেঃ মিঃ হইতে দীর্ঘ ; ইহার সাহায্যে সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হয়। মাঝারি আঁশযুক্ত তুলা ২·২-২·৯ সেঃ মিঃ দীর্ঘ এবং ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা ২·২ সেঃ মিঃ হইতেও ছোট। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার সাহায্যে কর্কশ ও মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারতের অধিকাংশ (৬৬%) তুলা ক্ষুদ্র ও মাঝারি আঁশযুক্ত ; এইজন্য পরিমাণের দিক হইতে তুলার ব্যাপারে ভারত স্বাবলম্বী হইলেও দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা ভারতকে আমদানি করিতে হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনার মারফত বর্তমানে ভারতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। পাঞ্জাবের ভাকরা ও নাঙ্গাল বাঁধের জলসেচের সাহায্যে প্রচুর দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন

হইতেছে। গুজরাট রাজ্যের কাকরাপাড়া এবং রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের চম্বল বাঁধের জলসেচ-ব্যবস্থা এই সকল রাজ্যের দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কাল হইতে কর্ণাটক ও কেরালায় জলসেচের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাগরদ্বীপীয় দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইতেছে। আশা করা যায় এইভাবে ভারত শীঘ্রই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবে। ভারতে তুলা-চাষের অন্যতম সমস্যা বল্ উইভিল ও অন্যান্য পোকার উপদ্রব। ইহারা প্রচুর পরিমাণে তুলা নষ্ট করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার তুলাগাছে নানাপ্রকার কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্তমানে 'ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি' (Indian Central Cotton Committee) নানাবিধ গবেষণা দ্বারা তুলা চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় তুলা চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় তুলার চাষ হইয়া থাকে। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে তামিলনাড়ুর ত্রিনেভেলি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বহু স্থানে তুলা উৎপন্ন হইলেও দাক্ষিণাত্যে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী। শুষ্ক ও মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত (১০০ সেঃ মিঃ-এর কম) অঞ্চলে এবং কৃষ্ণমৃত্তিকায় তুলার চাষ ভালো হয়। জলসেচের মাধ্যমে পরিমিত জল দিলে তুলার হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তুলা-চাষের আদর্শ জলবায়ু ও মৃত্তিকা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু মধ্য প্রদেশ, কর্ণাটক ও পাঞ্জাবে বিদ্যমান। এইজন্য এই ছয়টি রাজ্যে তুলার উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী। অন্যান্য রাজ্যেও কমবেশী তুলার চাষ হয়।

উৎপাদন—১৯৮২ সালে ভারতে ৭৯.৮৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৭৮.২৬ লক্ষ গাট* তুলা উৎপন্ন হইয়াছে।

বাণিজ্য—পরিমাণের দিক হইতে ভারত তুলা উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইলেও সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় সামান্য কম। এইজন্য ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান, টাঙ্গানাইকা, কেনিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ১৯৮১-৮২ সালে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করে। অন্যদিকে এই দেশ ঐ বৎসরে ১৬৫ কোটি টাকা মূল্যের নিকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারত ঐ বৎসর ৬৫৫ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাস বস্ত্র ও পোশাক বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। ভারতের অভ্যন্তরে তুলার প্রধান ক্রেতা বস্ত্র-শিল্পের মালিকগণ। সেইজন্য কৃষকগণ এক্ষেত্রেও ন্যায্যমূল্যে তুলা বিক্রয় করিতে পারে না।

অন্যান্য তন্তুজাতীয় ফসল (Bast Fibres)—পাট ছাড়াও ভারতে আরও কয়েকটি তন্তুজাতীয় ফসল উৎপন্ন হয়, যথা—মেস্তা, শণ প্রভৃতি। পাট উৎপাদনের উপযোগী অবস্থায় মেস্তাও উৎপন্ন হয়। সুতরাং যেখানেই পাট উৎপন্ন হয়, সেখানেই নিকৃষ্ট জমিতে মেস্তাও উৎপন্ন হয়।

শণ সাধারণতঃ ৪০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ও ১০° সেঃ তাপমাত্রায় কাদাযুক্ত দো-আঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। এই ভৌগোলিক অবস্থা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান থাকায় মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে প্রচুর পরিমাণে শণের চাষ হয়। সিমলা, কাশ্মীর, কুমায়ুন, কাঙ্গড়া প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে গাঁজা-গাছের বহিরাবরণ হইতে ভারতীয় শণ প্রস্তুত হয়। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিমুল গাছের বহিরাবরণ হইতে শিমুল শণ উৎপন্ন হয়।

*১ গাঁট=১৭০ কিঃ গ্রাঃ

চা (Tea)

চা ভারতের প্রধান পানীয় ; ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব যথেষ্ট। বাণিজ্যিক হারে চায়ের চাষ ভারতের পূর্বে শুরু হয় চীনদেশে। চীনদেশের চায়ের বাজারের উপর ব্রিটেনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু ১৮২৩ সালে ব্রিটেন এই কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে। তখন তাহারা ভারতে চা উৎপাদনের চেষ্টা চালাইতে থাকে। ইতিমধ্যে বর্মা যুদ্ধের পর ব্রুস (Bruce) ভ্রাতৃদ্বয় ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিং-ফু অঞ্চল হইতে চায়ের বীজ আনিয়া আসামের সদিয়া অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে চা-বাগান শুরু করে। এদিকে ১৮২৩ সালে চীন হইতে বীজ, চারাগাছ, এমনকি চীনা কৃষক ভারতে আমদানি করিয়া আসাম ও দার্জিলিং অঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলে চা-বাগান শুরু করা হয়। কিন্তু ক্রমশঃই স্থানীয় বীজের ব্যবহার বাড়িতে থাকে এবং চীনের বীজের ব্যবহার কমিতে থাকে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম ব্যবহারযোগ্য চা উৎপন্ন হয় ১৮৩৬ সালে এবং ব্রিটেনে প্রথম রপ্তানি হয় ১৮৩৮ সালে। ক্রমশঃ চায়ের উৎপাদন ও বাণিজ্য এত লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয় যে বহু ব্রিটিশ ব্যবসায়ী লন্ডনে ও কলিকাতায় বহু চা-কোম্পানী স্থাপন করেন এবং আসামে ও দার্জিলিং-এ চায়ের উৎপাদন শুরু করেন।*

চাষের উপযোগী অবস্থা – চা-চাষের জন্য ২৭° সেঃ উত্তাপ এবং ১৫০—২৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এই পরিমাণ বৃষ্টিপাত মৌসুমী অঞ্চলে হয় বলিয়াই এই অঞ্চলে অধিকাংশ চা উৎপন্ন হয়। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে নূতন পত্র এবং অঙ্কুরোদ্গম হয়। সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে চা-গাছের চাষ হয়। চা-বাগানে জল জমিলে চা-গাছ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া পাহাড়-পর্বতের ঢালে জল নিকাশের সুব্যবস্থা যুক্ত ঢালু জমিতে চা-চাষ হইয়া থাকে। চা-চাষের পক্ষে লৌহমিশ্রিত বালি-প্রধান দোআঁশ মৃত্তিকা বিশেষ উপযুক্ত।

চা-চাষের উপযোগী সকলপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা এই দেশের উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে বিদ্যমান। এই সকল অঞ্চলের অত্যধিক বৃষ্টি-পাত (১৫০ সেঃ মিঃ-এর অধিক), উর্বর ঢালু জমি এবং ২৭° সেঃ পরিমিত উত্তাপ চা-উৎপাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। চা ভারতের অর্থনীতিতে, বিশেষতঃ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। চা-শিল্পে প্রায় ১০ লক্ষ লোক কাজ করে। চা-আবাদের ফলে ভারতের বহু স্থানে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে, অস্বাস্থ্যকর স্থান বাসযোগ্য হইয়াছে এবং ভূমিক্ষয় কিয়দংশে বন্ধ হইয়াছে। চা-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

চা-চাষের বিভিন্ন সমস্যা – চা উৎপাদনে এই দেশকে বিশেষ কোনো অসুবিধা ভোগ করিতে না হইলেও বিক্রয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। উৎপাদনের সমস্যার মধ্যে অনুন্নত পদ্ধতিতে আবাদ, শ্রমিকের কর্মদক্ষতার অভাব এবং চা-এর বাক্সের (Tea chest) সরবরাহে অনিশ্চয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সময়মতো চারাগাছ ছাঁটিয়া এবং সার প্রয়োগ করিয়া চা-উৎপাদনের খরচ কমাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ভারতে হেক্টর-প্রতি চা-এর উৎপাদন সর্বত্র সমান নহে। তামিলনাডুতে হেক্টর-প্রতি চা-উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী—প্রায় ১,১৪০ কিলোগ্রাম ; প্রতি হেক্টর জমিতে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে ১,০৮৩ কিলোগ্রাম এবং পাঞ্জাবে ৩০৩ কিলোগ্রাম চা উৎপন্ন হয়।

* Source—Amrita Bazar Patrika, Tea Industry & Trade Supplement, 22nd April, 1964.

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের চা-উৎপাদনে প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে—উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল (আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ) এবং দাক্ষিণাত্যের কেরালা ও তামিলনাড়ু। ইহা ছাড়া পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়, উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে এবং বিহারের রাঁচি, পূর্ণিয়া ও হাজারিবাগে, ত্রিপুরায়, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটকে অল্প-বিস্তর চা উৎপন্ন হয়। আসামের চা-উৎপাদনকারী জেলাসমূহের মধ্যে দরং, শিবসাগর, লক্ষীমপুর ও কাছাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশী উৎপন্ন করিয়া এই রাজ্য চা-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। রেলপথে ও ব্রহ্মপুত্রের জলপথে এখানকার চা কলিকাতা বন্দরে রপ্তানির জন্য লইয়া যাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। চা-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার চা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। ভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ চা এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্যের কেরালা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়; ইহার মধ্যে কানন দেভন্‌স্‌ ও ওয়েনাদ অঞ্চল চা-উৎপাদনে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তামিলনাড়ুর নীলগিরি ও আনামালাই অঞ্চল চা-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

উৎপাদন—১৯৮২ সালে ভারতে ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার মেঃ টন চা উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য—ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে চা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। চা রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে বর্তমানে প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় মোট উৎপাদনের শতকরা ৪৮ ভাগ চা (২·৩৩ লক্ষ মেঃ টন) বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার ফলে ১৯৮১-৮২ সালে প্রায় ৪২৫·৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ব্রিটেন ভারতীয় চা-এর প্রধান ক্রেতা; ইহার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। ইহা ছাড়া, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, কানাডা ও পশ্চিম জার্মানী ভারত হইতে চা আমদানি করে। ভারতের চা-শিল্পের প্রধান সমস্যা এই যে, এই শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগীর আবির্ভাব হইলে বা শুল্ক-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলে চা-শিল্প সর্বনাশের সম্মুখীন হইবে। ব্রিটেন ১লা জানুয়ারী, ১৯৭০ তারিখ হইতে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে (European Common Market) যোগ দেওয়ায় ভারতের চা-শিল্প এক অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। কারণ, শুল্কের ব্যাপারে ভারত আর কমনওয়েলথের সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছে না এবং ইহার ফলে ব্রিটেনে চা-রপ্তানি কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। পূর্বে ভারতীয় রপ্তানিযোগ্য চা-এর শতকরা ৬৬ ভাগ একা ব্রিটেন আমদানি করিত। অবশ্য ১৯৬৪ সালের শুরু হইতেই E.C.M. কর্তৃপক্ষ তাহাদের দেশগুলিতে চা আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস করিয়াছিল। ইহার ফলে ভারতের পক্ষে ইউরোপীয় দেশসমূহে চা-রপ্তানি বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকার ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে চা-রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সহজ হইয়াছে। এই দিকে আরও দৃষ্টি দেওয়া ভারতের কর্তব্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রীলঙ্কার রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে শ্রীলঙ্কা চা-রপ্তানিতে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া চীন ব্রিটেনের বাজারে প্রচুর চা রপ্তানি করিতেছে। এই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে ভারতীয় চা-এর উৎপাদন খরচ আরও কমাইতে হইবে এবং উন্নততর পন্থায় চা উৎপন্ন করিতে হইবে। চা-এর বাণিজ্যের অন্যতম সমস্যা ভারতে অভ্যন্তরীণ চাহিদার অভাব। ভারতে চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে সর্বদা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা যে-কোনো শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। বর্তমানে

ভারত সরকার চা-শিল্পের উন্নতির ভার 'টি বোর্ড' (Tea Board) নামক একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই সংস্থা চা-রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালাইতেছে। দেশ-বিদেশে চা-পানের উপকারিতা ও সুফল সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রচারের সাহায্যে এই সংস্থা চা-এর চাহিদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। সার সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া এবং

চা-বাগানসমূহকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া চা-এর উৎপাদন খরচ কমাইবার জন্যও এই স্ংস্থা চেষ্টা করিতেছে। চা-এর উৎপাদন-খরচ কমাইতে পারিলে বিদেশে প্রাতযোগিতা করা সহজসাধ্য হয়। টি বোর্ডের প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা গত দশ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

ভারতে চা-শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ করিলে উৎপাদন-খরচ কমিয়া যাইবে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে : (১) চা-এর উৎপাদন-খরচ কমাইবার জন্য হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। সার সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির সাহায্যে চা তুলিবার বন্দোবস্ত করিলে অনেক খরচ বাঁচে। চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে বিভিন্ন ফলের গাছ সৃষ্টি করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করিলে চা-এর নীট উৎপাদন-খরচ কিছু কমে। (২) চা-রপ্তানির সুবন্দোবস্তের জন্য বিদেশী জাহাজ ব্যবহার করিলে বেশী ভাড়া দিতে হয় এবং সময়মতো চা বিদেশের বাজারে পেঁছায় না। সেইজন্য ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। (৩) চা-এর বাক্স প্রধানতঃ প্রস্তুত হয় প্লাইউডের সাহায্যে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চা-এর বাক্স প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন, যাহাতে বাহিরের বাষ্প ঢুকিয়া চা-এর রং ও স্বাদ নষ্ট করিতে না পারে। (৪) অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া এবং বিদেশের বাজারে প্রচারের সুবন্দোবস্ত করিয়া ভারতীয় চা-এর মোট চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে চুক্তির মারফত

চা রপ্তানি বৃদ্ধি করা সহজ। এইভাবে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলে আশা করা যায় চা-এর উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে।

কফি (Coffee)

কফি ভারতের দ্বিতীয় পানীয় শস্য। ভারতে প্রথম কফির চাষ আরম্ভ হয় ১৮০০ সালে।

চাষের উপযোগী অবস্থা—কফি-চাষের জন্য ১৫° সেঃ হইতে ৩০° সেঃ উত্তাপ ও ১৭৫ সেঃ মিঃ হইতে ২২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। প্রবল বায়ু কফি গাছের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক ; এইজন্য কফিক্ষেত্রে বায়ু-প্রতিরোধকারী বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। চাষের প্রথমাবস্থায় সূর্যকিরণ হইতে চারাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য কফির ক্ষেত্রে চারাগুলির পাশে কলাগাছ বা ভুট্টাগাছ লাগানো হয়। কফি চাষের জন্য যৌগিক লোহ, পটাশ এবং নাইট্রোজেন-মিশ্রিত উর্বর জলনিকাশী মৃত্তিকা প্রয়োজন। এই ধরনের মৃত্তিকা সাধারণতঃ লোহিত হয়। পর্বতগাত্রে ও ঢালু জমিতে কফির চাষ ভাল হয়।

কফি-চাষের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা দাক্ষিণাত্যের আনামালাই, নীলগিরি ও কার্ডামম পাহাড়ে বিদ্যমান। কফি-চাষের উপযোগী ভূমির উচ্চতা (৬০০-১২০০ মিটার), জলনিকাশী লৌহমিশ্রিত জমি, আর্দ্র উষ্ণ জলবায়ু এই অঞ্চলে বিদ্যমান। ভারতে প্রধানতঃ দুইপ্রকার কফিগাছ বিদ্যমান—আরবীয় ও রোবাস্তীয়। আরবীয় কফি অল্প বৃষ্টিপাতেও ভাল জন্মে। সেইজন্য কর্ণাটকে পার্বত্য ঢালে বৃষ্টিবিরল অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পাহাড়ের নীচে জন্মে রোবাস্তীয় কফি। আরবীয় কফি স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় এবং ভারতে ইহার উৎপাদনই বেশী। ভারতে হেক্টর-প্রতি কফি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৮৪০ কিলোগ্রাম। বর্ষাকালেই এই দেশে কফির চারা রোপণ করা হয়। চারা গাছ রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না বলিয়া আচ্ছাদনের জন্য কলাগাছ বা অন্য গাছ লাগাইতে হয়। কফির চারা বড় হইতে ৩/৪ বৎসর সময় লাগে ; কিন্তু ফল দিতে আরম্ভ করিলে ৩০ বৎসর পর্যন্ত ফল দেয়। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে কফিফল গাছ হইতে তুলিয়া শুকাইয়া ভাজিয়া কফি প্রস্তুত করা হয়। কর্ণাটকের যে কোনো বাগানের কফি স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে ১,৭২,০০০ হেক্টর জমিতে কফির চাষ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে $\frac{৭}{১৫}$ ভাগ জমিতে আরবীয় কফি এবং $\frac{৮}{১৫}$ ভাগ জমিতে রোবাস্তীয় কফির চাষ হয়। ভারতের অধিকাংশ (৬০%) কফি উৎপন্ন হয় কর্ণাটক রাজ্যে। এই রাজ্যের মালনাদ অঞ্চলের কাদুর, শিমাগো ও হাসানে অধিকাংশ কফি বাগান অবস্থিত। কেরালা (২১%) ও তামিলনাড়ু (১৮%) রাজ্যেও কফির চাষ হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলে অল্পবিস্তর কফির চাষ হয়।

উৎপাদন—১৯৮২ সালে ভারতে ১'৩৭ লক্ষ মেঃ টন কফি উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য—ভারতের অধিকাংশ কফি বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ ম্যাঙ্গালোর, কোচিন, কালিকট ও মাদ্রাজ বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। অধিকাংশ কফি ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, ইরাক, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। ইহা দ্বারা ১৯৮১-৮২ সালে প্রায় ১৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতের শতকরা ৬০ ভাগ কফি বিদেশে রপ্তানি হইত। যুদ্ধের সময় বৈদেশিক বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য 'ইন্ডিয়ান কফি বোর্ড' (Indian Coffee Board) গঠিত হয়। এই সংস্থা ভারতের বিভিন্ন শহরে 'কফি হাউস' প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং প্রচারকার্য চালাইয়া ভারতের

অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সংস্থা বিভিন্ন কফি বাগানে কফির চারা সরবরাহ করিয়া, অধিক জমিতে কফিচাষের সুব্যবস্থা করিয়া, কফি সংস্কারের বন্দোবস্ত করিয়া এবং কফির উপজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া কফিচাষের উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইহাতে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কফির চাহিদা বেশী; উত্তর ভারতে অধিকাংশ লোক চা পান করে।

ভারতে কফির চাহিদা-বৃদ্ধির প্রধান সমস্যা এই যে, ভারতীয়গণ অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া চা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান কফি ক্রয় করিতে পারে না। ইহার ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। তবে পূর্বের তুলনায় এখন অভ্যন্তরীণ চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কফি-চাষের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বর্তমানে কফির উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

বর্তমানে 'ভারতীয় কফি বোর্ড'' বিদেশে কফির রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে প্রচার চালাইতেছে। কিন্তু বৈদেশিক বাজারে ব্রাজিলের সস্তা কফির সঙ্গে আঁটিয়া ওঠা ভারতের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রবার (Rubber)

রবার একটি বাণিজ্যিক ফসল।

ভারতে প্রথম রবারের চাষ হয় ১৯০২ সালে কেরালায় পেরিয়ার নদীর উপত্যকায়। দক্ষিণ আমেরিকার পারা রবারের বীজ ব্রিটেন হইতে আনিয়া এখানে আবাদী রবার উৎপাদন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতে রবার উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়।

চাষের উপযোগী অবস্থা—রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল। আবাদী রবারচাষের জন্য কমপক্ষে ২৭°—৩০° সেঃ উত্তাপ এবং ২০০ সেঃ মিঃ বা ততোধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। প্রতি মাসেই বৃষ্টিপাত সম-পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন এবং তাপমাত্রাও খুব কম-বেশী যেন না হয়। রবার-চাষের জন্য জলনিকাশী উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা দরকার। সাধারণতঃ জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত পাহাড়ের ঢালে রবার গাছের চাষ ভাল হয়। রবারের আঠা সংগ্রহ করিবার জন্য এবং সংগ্রহের স্থানেই রবার শোধন করিবার জন্য সুলভ এবং সুদক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।

ভারতের দক্ষিণাংশে রবার উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান। নিরক্ষ-রেখার নিকটবর্তী বলিয়া এখানকার উত্তাপ ২৭° সেঃ অপেক্ষা বেশী এবং বৃষ্টি-পাতও প্রচুর (২০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী)। ইহা ছাড়া এখানকার জলবায়ুর সহিত অন্যতম উল্লেখযোগ্য রবার উৎপাদক শ্রীলঙ্কার জলবায়ুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই সকল কারণে ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রবারের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

রবার-চাষের বিভিন্ন সমস্যা—ভারতে রবারের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সন্তোষজনক নহে। মালয়েশিয়ায় হেক্টর-প্রতি গড় উৎপাদন ৫১০ কিলোগ্রাম, শ্রীলঙ্কায় ৪০০ কিলোগ্রাম, কিন্তু ভারতে সর্বোচ্চ উৎপাদন মাত্র ৩৮০ কিলোগ্রাম। এই দেশের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চারাগাছের সাহায্যে রবারের চাষ করিতে হইবে। ভারতে বরার-চাষের আরও একটি সমস্যা হইল এই যে, এখানকার উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী। শ্রমিকের অধিকতর মজুরি ও কর্মক্ষমতার অভাব ইহার প্রধান কারণ। ইহা ছাড়া রবারের মূল্যের স্থিতিশীলতা না থাকায় রবার-চাষে আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে উৎপন্ন মোট প্রাকৃতিক রবারের মধ্যে কেরালা রাজ্যে উৎপন্ন হয় শতকরা ৯৬ ভাগ। ইহা ছাড়া কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে অল্পবিস্তর রবারের চাষ হয়। ভারতে বর্তমানে ৩২,০০০ মেঃ টন কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হয়।

উৎপাদন—ভারতে ১৯৮২ সালে ১,৩৫,০০০ মেঃ টন প্রাকৃতিক রবার উৎপন্ন হইয়াছে।

বাণিজ্য—ভারতে রবারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা মিটাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে 'ভারতীয় রবার বোর্ডে'র' Indian Rubber Board) উপর ; ইহার প্রধান কার্যালয় কোট্টয়ামে। রবার শিল্পের উন্নতি, রবারের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য-নির্ধারণ এই সংস্থার প্রধান কাজ। সম্প্রতি এই সংস্থা রবারের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন জমি রবার-চাষের আওতায় আনিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে উৎপন্ন রবারের দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানি হইত। কিন্তু স্বাধীনতার পর রবার-শিল্পের উন্নতি হওয়ায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং রবার আমদানি শুরু হয়। এইজন্য ভারতের রবার উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেও রবার শিল্পের উন্নতি হওয়ায় এই দেশে রবারের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আশা করা যায়, অল্পকালের মধ্যেই ভারত রবার উৎপাদনে সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হইবে।

তৈলবীজ (Oil-seeds)

বিভিন্ন তৈলবীজ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শস্য। ইহার কোনো কোনোটি খাদ্যশস্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তৈলবীজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

ভারতে বিভিন্ন রকমের তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। ইহা এই দেশের অন্যতম প্রধান অর্থপ্রসূ ফসল। তৈলবীজ উৎপাদনে ও রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এখানকার তৈলবীজ হইতে তৈল, সালাড, খাদ্যদ্রব্য, রং, গন্ধদ্রব্য, বার্নিশ, মোমবাতি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ভারতে দুইপ্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন হয়—ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য। ভক্ষ্য (Edible) তৈলবীজের মধ্যে চীনাবাদাম, সরিষা, তিল ও কার্পাস বীজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভক্ষ্য (Non-edible) তৈলবীজের মধ্যে তিসি ও রেড়িই প্রধান। পূর্বে অধিকাংশ শস্য তৈলবীজ আকারেই বিদেশে রপ্তানি হইত, বর্তমানে বহুলাংশে বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর তৈল রপ্তানি হয় ; ইহার ফলে যে খইল পাওয়া যায়, তাহা গবাদি পশুর খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ভারতে তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য প্রায় ১৮ কোটি হেক্টর পরিমিত জমি ব্যবহৃত হয়। ১৯৮৩ সালে উৎপাদন হইয়াছে ১ কোটি ২০ লক্ষ মেঃ টন।

ভারতের তৈলবীজ-উৎপাদন (১৯৮৩)

	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	পৃথিবীতে ভারতের স্থান		উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	পৃথিবীতে ভারতের স্থান
চীনাবাদাম	৫৭·০০	প্রথম	রেড়ি	৩·০২	প্রথম
সরিষা	২৩·৬৩	দ্বিতীয়	তিসি	৪·৭৪	তৃতীয়
তিল	৪·৭৫	প্রথম	কার্পাস বীজ	২৬·২০	চতুর্থ

ভারতের তৈলবীজ-উৎপাদনের প্রধান সমস্যা এই যে, উৎপাদক অঞ্চলে এখনও ভালভাবে তৈল-নিষ্কাশন ও উপজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের সুবন্দোবস্ত হয় নাই।

ইহার ফলে চাষী তৈলবীজের উপযুক্ত মূল্য পায় না। ১৯৫৬ সালে 'ভারতীয় কেন্দ্রীয় তৈলবীজ কমিটি (Indian Central Oil-seed Committee) গঠিত হয়। এই সংস্থা তৈলবীজের উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য চেষ্টা করিতেছে। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, উন্নততর বীজ সরবরাহ করিয়া, তৈলবীজে কীটনাশের ব্যবস্থা করিয়া এই সংস্থা তৈলবীজের উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে। ভারতে তৈলবীজের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমানে রপ্তানির প্রধান সমস্যা এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সহিত ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখে ভারতকে তৈলবীজ রপ্তানি করিতে হইতেছে। অন্য একটি সমস্যা ভারতের তৈলবীজের অত্যধিক উৎপাদন-খরচ। ইহাতে বৈদেশিক বাজারে রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। ভারতে অভক্ষ্য তৈলবীজ হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কার্পাস বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের জন্য এবং মহুয়া, নিম প্রভৃতি তৈলবীজ শিল্পে নিয়োগের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী জমিতে অবসর সময়ে তৈলবীজের চাষ করিয়া এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুপযোগী জমিতে তৈলবীজ উৎপাদন করিয়া ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার ও রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থাও বিভিন্ন পরিকল্পনার মারফত করা হইয়াছে।

চীনাবাদাম (**Groundnut**)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ উৎপন্ন করিয়া ভারত চীনাবাদাম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। বনস্পতি, কেশতৈল ও সাবান প্রস্তুত করিতে ও রন্ধনকার্যে প্রধানতঃ ইহা ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে ভারতের অধিকাংশ চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। ইহা প্রধানতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের ফসল বলিয়া দাক্ষিণাত্যে ইহার চাষ প্রায় সীমাবদ্ধ। মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর মারফত ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ব্রিটেন ও ইটালিতে প্রচুর পরিমাণে চীনাবাদাম রপ্তানি হয়।
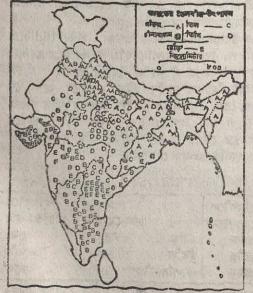
সরিষা (**Mustard and Rape-seed**)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ উৎপন্ন করিয়া ভারত সরিষা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রধানতঃ গমের সহিত ইহার চাষ হইয়া থাকে। রন্ধনকার্যে, গাত্রমর্দনে ও সাবান প্রস্তুত করিতে সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতে অধিকাংশ সরিষা উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ,

পাঞ্জাব, বিহার, আসাম ও ওড়িশায় অধিকাংশ সরিষা উৎপন্ন হয়। ভারতের প্রায় অর্ধেক সরিষা আসে উত্তর প্রদেশ হইতে। কানপুর ও কলিকাতা সরিষার তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। কলিকাতা বন্দর মারফত অল্প পরিমাণে সরিষা ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

তিল (Sesamum seed —পৃথিবীর মোট তিল উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ উৎপন্ন করিয়া ভারত তিল-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে ; ভারতের পরেই চীনের স্থান। কেশতৈল প্রস্তুত করিতে ও রন্ধনকার্যে তিলতৈল ব্যবহৃত হয়। মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ ও গুজরাটে অধিকাংশ তিল উৎপন্ন হয়। বোম্বাই বন্দর মারফত অধিকাংশ রপ্তানিযোগ্য তিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইটালি, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

রেড়ি (Castor seed)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন করিয়া ভারত রেড়ি উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ; ভারতের পরেই ব্রাজিলের স্থান। রেড়ির তৈল হইতে ঔষধ, সাবান, কেশ-তৈল, পিচ্ছিলকারক তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ভুট্টা-অঞ্চলেই অধিকাংশ রেড়ি উৎপন্ন হয় ; যথা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক মহারাষ্ট্র মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর মারফত অধিকাংশ রেড়ির তৈল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম, ইটালি, জার্মানী ও স্পেনে রপ্তানি হইয়া থাকে।

তিসি (Linseed) – পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৪ ভাগ উৎপন্ন করিয়া ভারত তিসি উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহা প্রধানতঃ বীজের জন্য চাষ করা হয়। তিসির তৈল হইতে রং, বার্নিশ, 'অয়েল ক্লথ' প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ তিসি উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মধ্য প্রদেশ এবং এক-চতুর্থাংশ উত্তর প্রদেশে উৎপন্ন হয়। বোম্বাই বন্দর মারফত অধিকাংশ তিসি রপ্তানি হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস্ ও ইটালি ভারতীয় তিসির প্রধান আমদানিকারক।

কার্পাস বীজ (Cotton seed —কার্পাস বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয় ; ইহা রন্ধনকার্যেও ব্যবহার করা যায়। জলপাই তৈলের পরিবর্তেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কার্পাস বীজের খইল পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। ভারত কার্পাস বীজ উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে অধিকাংশ কার্পাস বীজ উৎপন্ন হয়। বোম্বাই বন্দর মারফত অল্প পরিমাণে কার্পাস বীজ বিদেশে রপ্তানি হয়।

ভারতে নারিকেল হইতেও তৈল প্রস্তুত হয়। নারিকেলের ছোবড়া দড়ি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ নারিকেল জন্মে। নারিকেলের তৈল, শুষ্ক শাঁস, ছোবড়া, পাপোশ ইত্যাদি ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। ঐ সকল দেশে নারিকেলের শুষ্ক শাঁস হইতে মার্গারিন প্রস্তুত হয়। কোচিন নারিকেলজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির প্রধান বন্দর। ১৯৮২ সালে ভারতে প্রায় ৬০০ কোটি নারিকেল উৎপন্ন হয়।

তামাক
(Tobacco)

১৫০৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বীজ আনিয়া পর্তুগীজগণ ভারতে প্রথম তামাক চাষের সূচনা করে।

চাষের উপযোগী অবস্থা—ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে তামাক-চাষ ভাল হয়। উষ্ণ-নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১৩°—১৮° সেঃ উত্তাপ এবং ৫০-১১০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত তামাক-চাষের পক্ষে প্রয়োজন। তামাক চাষে প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। বালুকাময় দো-আঁশ মাটিতে তামাকের চাষ ভাল হয়। ভারী দো-আঁশ মৃত্তিকায় উৎপন্ন তামাক পাতায় তীব্র গন্ধ হয়। তামাক গাছের জন্য প্রয়োজন অধিক উত্তাপ ও মাঝারি বৃষ্টিপাত। জমির উর্বরতা ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের উপর তামাকের গুণ, গন্ধ এবং হেক্টর-প্রতি উৎপাদন নির্ভর করে। অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকায় বর্তমানে ভারত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তামাক-উৎপাদক দেশ। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পরেই ভারতের স্থান। ভারত ও ব্রাজিলের উৎপাদন প্রায় সমান। ভারতে প্রধানতঃ দুইশ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয়—'নিকোটিনা ট্যাবুকাম' এবং 'নিকোটিনা রাস্টিকা'। ইহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ প্রথমোক্ত শ্রেণীর তামাক। ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ অতি উচ্চশ্রেণীর ভার্জিনিয়া শ্রেণীর তামাক; বৈদেশিক বাজারে ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। ভারতে তামাক প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় সিগারেট, চুরুট, বিড়ি ও নস্য প্রস্তুত করিতে, চিবাইয়া খাইবার জন্য এবং হুঁকায় টানিবার জন্য। তামাকের চাষ হয় প্রধানতঃ জুন হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে। ফসল তোলা হয় ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে।

তামিলনাড়ুতে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন প্রায় ১,৩৭০ কিলোগ্রাম, অন্ধ্র প্রদেশে ৯০০ কিলোগ্রাম এবং কর্ণাটকে ৪২৫ কিলোগ্রাম। ভারতে হেক্টর-প্রতি গড় উৎপাদন প্রায় ৮৮১ কিলোগ্রাম; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেক্টর-প্রতি তামাক উৎপন্ন হয় ২,২০০ কিলোগ্রাম এবং চীনে ১,৩৯৮ কিলোগ্রাম। ভারতের তামাক-চাষের উন্নতির পক্ষে ইহা একটি প্রধান সমস্যা। ইহা ছাড়া ভারতের অধিকাংশ তামাকের রং কালো, পাতা পুরু এবং স্বাদ কড়া; এজন্য ইহা সিগারেট-উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী নহে। শুধুমাত্র অন্ধ্র প্রদেশের ভার্জিনিয়া জাতীয় তামাক সিগারেট তৈরির উপযোগী। তামাক-চাষের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করিবার দায়িত্ব ভারত সরকার 'ভারতীয় কেন্দ্রীয় তামাক কমিটি' (Indian Central Tobacco Committee) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিয়াছেন। এই কমিটি সিগারেট শিল্পে অধিকতর ভারতীয় তামাক ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণার জন্য রাজমুন্দ্রীতে (অন্ধ্র প্রদেশ) একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে। তামিলনাড়ুর ভেদাসনদাস, বিহারের পুষা এবং পশ্চিমবঙ্গের দিনহাটায় আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। মনে হয়, কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে, ভারতে রপ্তানিযোগ্য উচ্চশ্রেণীর তামাকের উৎপাদন সম্ভবপর হইবে। ভারতের তামাক-শিল্পের একটি প্রধান সমস্যা এই যে, এই শিল্পের শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদন এখনও বিদেশী কোম্পানীগুলির অধীন। এই জন্য এই শিল্পে অধিকতর পরিমাণে ভারতীয় মূলধন নিয়োগ করা সম্ভবপর নহে।

উৎপাদক অঞ্চল—তামাক উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ভারতের প্রায় সকল অংশেই কমবেশী তামাক উৎপন্ন হইলেও প্রধানতঃ দুইটি

অঞ্চলে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী—বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ লইয়া গঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তামিলনাডু, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও গুজরাট লইয়া গঠিত দক্ষিণাঞ্চল।

অন্ধ্র প্রদেশে ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ তামাক উৎপন্ন হয়। গুন্টুর, বিশাখাপতনম ও পূর্ব গোদাবরী জেলায় অধিকাংশ তামাক পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ তামাক পাওয়া যায় গুন্টুর জেলা হইতে। এখানকার তামাক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং সিগারেট, চুরুট, নস্য প্রভৃতি প্রস্তুত করার উপযুক্ত। গুজরাট রাজ্যের বরোদা ও কৈরা জেলায় অধিকাংশ তামাক পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুর ডাণ্ডিগাল, মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লী ও কোয়েম্বাটুর তামাক উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানকার তামাক প্রধানতঃ চুরুট ও বিড়ি প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কর্ণাটক রাজ্যের নদী-উপত্যকায় ও অন্ধ্র প্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় অধিকাংশ তামাক উৎপন্ন হয়। বিহারের মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলায় এই রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ তামাক উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ও হুগলী জেলায় অধিকাংশ তামাক পাওয়া যায়। এখানকার তামাক প্রধানতঃ সিগারেট, বিড়ি ও হুঁকার তামাক প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া পাঞ্জাবের জলন্ধর, হোসিয়ারপুর ও গুরুদাসপুর জেলায়, মহারাষ্ট্রের মিশানি অঞ্চলে, উত্তর প্রদেশের মৈনপুরী, এটাওয়া ও বারাণসী জেলায় এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় অল্পবিস্তর তামাক উৎপন্ন হয়।

উৎপাদন—১৯৮২ সালে ভারতে মোট ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার হেক্টর জমিতে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার মেঃ টন তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।

বাণিজ্য—ভারতের মোট উৎপন্ন তামাকের শতকরা ১২ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্ধ্র প্রদেশের উৎকৃষ্টশ্রেণীর ভার্জিনিয়া তামাক অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়; মোট রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগ তামাক মাদ্রাজ বন্দর মারফত প্রেরিত হয়; ভারত তামাক রপ্তানি করিয়া ১৯৮১-৮২ সালে প্রায় ২২৮·৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ভারতে তামাকের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার প্রচুর। সুতরাং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকের উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে ভারতে তামাক-চাষের ও তামাক-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া মনে হয়। তামাকের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে তামাক রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা (**Tobacco Export Promotion Council**) গঠন করিয়াছেন। এই সংস্থা নূতন নূতন বৈদেশিক বাজার অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্তমানে ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, এডেন, শ্রীলঙ্কা, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও নেদারল্যান্ডস্-এ ভারতীয় তামাক রপ্তানি হয়। পশ্চিম জার্মানী, মধ্যপ্রাচ্য ও সোভিয়েত রাশিয়ায় তামাকের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার বিশেষ সচেষ্ট আছেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল গুন্টুর। এই শহরে প্রচুর তামাক বেচাকেনা হয় এবং এই স্থান হইতে রপ্তানিযোগ্য তামাক মাদ্রাজ ও বিশাখাপতনম্ বন্দরে প্রেরিত হয়।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. What are the main features of the Indian Agricultural system ? What are the methods for its improvement ?

(ভারতের কৃষিব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? ইহার উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ?)

উঃ 'ভারতের কৃষি-সমস্যা ও ইহার সমাধান' (৪২—৪৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

2. Discuss fully the problems of agricultural production in India. [B. U. B. Com. 1966 ; C. U. B. Com. 1962]

(ভারতের কৃষি-উৎপাদনের সমস্যাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।)

উঃ 'ভারতের কৃষি-সমস্যা ও ইহার সমাধান' (৪২—৪৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

3. Examine the importance of irrigation in India. What are the different modes of irrigation practised in the country ? Examine the various irrigation development programme introduced in India. [Specimen Question, 1978]

(ভারতের সেচব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা কর। এদেশে অনুসৃত বিভিন্ন সেচ-পদ্ধতিগুলি কি কি ? ভারতের সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য অবলম্বিত কার্যক্রম পর্যালোচনা কর।)

উঃ 'জলসেচ-ব্যবস্থা' (৪৮—৫২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. What are the different modes of irrigation practised in India ? Which one is most widely practised ? Give reasons. [H. S. Examination, 1978]

(ভারতে অনুসৃত বিভিন্ন জলসেচ-ব্যবস্থা কি কি ? কোন্‌টি সবচেয়ে বেশী অনুসৃত হয় ? উহার কারণ কি ?)

উঃ 'জলসেচ-ব্যবস্থা' (৪৮—৫২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. What are the major food crops of India ? Describe the geographical conditions under which any two are grown. [H. S. Examination, 1978]

(ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য কি কি ? যে কোনো দুইটি খাদ্যশস্য যে যে ভৌগোলিক অবস্থায় জন্মায় তাহা বর্ণনা কর।)

উঃ 'ধান' (৫২—৫৫ পৃঃ), 'গম' (৫৫—৫৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Indicate the principal rice producing regions of India, mentioning the geographical conditions for its growth. [H. S. Examination, 1982]

(ভারতের প্রধান প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলির কথা উল্লেখ কর এবং কি কি ভৌগোলিক অবস্থায় ধান উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা কর।)

উঃ 'ধান' (৫২—৫৫ পৃঃ) হইতে 'উৎপাদক অঞ্চল' ও 'চাষের উপযোগী অবস্থা' লিখ।

7. Discuss the geographical conditions favouring the cultivation of wheat. Write what are the main producing areas of wheat in India. [H. S. Examination, 1979 ; Tripura H. S. Examination, 1982]

(গম-চাষের উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা কর। ভারতে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ অঞ্চলে গম উৎপাদিত হয় তাহা লিখ।)

উঃ 'গম' (৫৫—৫৬ পৃঃ) হইতে 'চাষের উপযোগী অবস্থা' ও 'উৎপাদক অঞ্চল' অবলম্বনে লিখ।

8. Narrate the geographical conditions under which wheat is grown in India. Account for the present success in production.
[H. S. Examination, 1983]

(কি কি ভৌগোলিক পরিবেশে ভারতে গম চাষ হয়, তাহা বর্ণনা কর। এই ফসলের বর্তমান সমৃদ্ধির কারণ নির্দেশ কর।)

উঃ 'গম' (৫৫–৫৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. Describe the areas of cotton cultivation in India and the geographical conditions under which it is cultivated. Is the production of raw cotton in India sufficient to meet the requirements of the cotton textile industry ? If not, how is the deficit met ?

(ভারতের যে সমস্ত অংশ এবং যে যে ভৌগোলিক অবস্থায় তুলা চাষ হয় তাহা বর্ণনা কর। ভারতে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা এখানকার কার্পাসবয়ন শিল্পের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট কি ? তাহা না হইলে কিভাবে সে অভাব পূরণ করা হয় ?)

উঃ 'তুলা' (৬২—৬৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10. Describe the geographical conditions favourable for the cultivation of jute and cotton in India. [H. S. Examination, 1980]

(পাট ও কার্পাস চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণনা কর। ভারতের প্রধান পাট ও কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলগুলি উল্লেখ কর।)

উঃ 'পাট' (৫৯—৬২ পৃঃ) এবং 'তুলা' (৬২—৬৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. Describe the favourable geographical conditions for the cultivation of jute in India. How does this crop help in the economic development of this country ?
[H. S. Examination, 1984]

(ভারতে পাট-চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ফসল কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ?)

উঃ 'পাট' (৫৯—৬২ পৃঃ) লিখ।

12. (a) Describe the favourable geographical and economic conditions under which jute and tea are grown in India. (b) Which state of India leads in the production of jute and tea ?
[H. S. Examination, 1982]

[ক) কি কি ধরনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ভারতে পাট ও চা উৎপাদন করা হয় তাহা বর্ণনা কর।

খ) ভারতে কোন্ কোন্ রাজ্য পাট ও চা উৎপাদনে অগ্রণী ?]

উঃ 'পাট' (৫৯—৬২ পৃঃ) ও 'চা' (৬৪—৬৭ পৃঃ) হইতে 'চাষের উপযোগী অবস্থা' ও 'উৎপাদক অঞ্চল' লিখ।

13. (a) Describe the geographical conditions favourable for the cultivation of sugarcane. (b) Name the Indian States where sugarcane is largely produced. (c) Suggest measures to increase the production of sugarcane in India. [H. S. Examination, 1981]

[(ক) ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলির বর্ণনা দাও। (খ) অধিক ইক্ষু উৎপাদনশীল ভারতীয় রাজ্যগুলির নাম লিখ। (গ) ভারতে ইক্ষুর উৎপাদনবৃদ্ধির পন্থা নির্দেশ কর।]

উঃ 'ইক্ষু' (৫৭—৫৯) পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

14. Describe the geographical conditions and areas of production of the following crops in India : (a) Rice, (b) Tea, (c) Jute, (d) Sugarcane. [Specimen Question, 1980]

[নিম্নলিখিত শস্যগুলির উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদক অঞ্চল বর্ণনা কর : (ক) ধান, (খ) চা, (গ) পাট, (ঘ) ইক্ষু ।]

উঃ 'ধান' (৫২—৫৫ পৃঃ), 'চা' (৬৩ -৬৭ পৃঃ), 'পাট' (৫৯—৬২ পৃঃ) ও 'ইক্ষু' (৫৭—৫৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ ।

15. Narrate the plantation crops of India. Discuss the geographical and economic conditions under which tea is grown in India. Which are the main tea producing areas in India ? [Specimen Question, 1980 & 1981]

(ভারতের বাগিচা ফসলগুলির নাম লিখ । ভারতের যে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় চা উৎপন্ন হয় তাহা আলোচনা কর । ভারতের প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চলগুলি কি কি ?)

উঃ ভারতের বাগিচা ফসল হিসাবে উল্লেখযোগ্য চা, কফি, রবার ও তামাক । ইহার পর 'চা' (৬৪—৬৭ পৃঃ) অবলম্বনে উত্তর তৈয়ারি কর ।

16. What are the principal plantation crops of India ? Select any one of them and describe the geographical environments favourable for its production and areas of its concentration. [H. S. Examination, 1983]

(ভারতের প্রধান প্রধান বাগিচা ফসল কি কি ? উহাদের যে কোনো একটি ফসলের উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির কেন্দ্রীভবন সম্বন্ধে লিখ ।)

উঃ ভারতের বাগিচা ফসল চা, কফি, রবার ও তামাক । ইহার পর 'চা' (৬৪—৬৭ পৃঃ) অবলম্বনে উত্তর তৈয়ারি কর ।

17. Discuss the geographical conditions of tea production in India. State the areas where it is grown. [B. U. B. Com. 1969]

(ভারতের চা উৎপাদনের ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর । যে সকল অঞ্চলে ইহা উৎপাদিত হয় তাহা বর্ণনা কর ।)

উঃ 'চা' (৬৪ - ৬৭ পৃঃ) হইতে লিখ ।

18. Name the principal oil-seeds of India describing the area where these are grown and the ways these are used. [B. S. E. Higher Secondary, 1966]

(ভারতের প্রধান প্রধান তৈলবীজের নাম লিখ এবং ঐগুলি কোথায় জন্মে তাহার এলাকা ও উহাদের ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা কর ।)

উঃ 'তৈলবীজ' (৬৯—৭১ পৃঃ) লিখ ।

19. Draw a full page map of the Indian Union and insert the tea producing areas. [B. S. E. Higher Secondary, 1966]

(ভারতের একটি পূর্ণ পৃষ্ঠার মানচিত্র আঁকিয়া চা উৎপাদক অঞ্চলগুলি দেখাও ।)

উঃ ৬৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য ।

20. What are the principal commercial crops of India? Where do they grow and under what geographical conditions? [Specimen Question, 1978]

(ভারতে উৎপন্ন প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ফসল কি কি? ঐগুলি কোন্ কোন্ ভৌগোলিক পরিবেশে ভারতের কোথায় কোথায় জন্মে?)

উঃ 'পাট' (৫৯—৬২ পৃঃ), 'তুলা' (৬২—৬৪ পৃঃ), 'চা' (৬৪—৬৭ পৃঃ), 'কফি' (৬৭—৬৮ পৃঃ), 'তৈলবীজ' (৬৯—৭১ পৃঃ) এবং 'ইক্ষু' (৫৭—৫৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes explaining the following statements :

(a) Coffee is grown in South India.

(b) Darjeeling region produces quality tea.

(c) In India Kerala is responsible for the production of 96% of the total production of rubber.

(d) Uttar Pradesh occupies the first place in wheat production.

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) দক্ষিণ ভারতে কফি উৎপন্ন হয়।

(খ) দার্জিলিং অঞ্চলে উন্নত ধরনের চা উৎপন্ন হয়।

(গ) ভারতের মধ্যে কেরালায় ৯৬% রবার উৎপন্ন হয়।

(ঘ) গম উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।]

উঃ (ক 'কফি' (৬৭—৬৮ পৃঃ); (খ) 'চা' (৬৪—৬৭ পৃঃ); (গ) 'রবার' (৬৮—৬৯ পৃঃ) এবং (ঘ) 'গম' (৫৫—৫৬ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

C. Objective Questions

1. Frame correct answers from the following :

(a) The Punjab is famous for the cultivation of Wheat/Millet.

(b) West Bengal is famous for the cultivation of Rice/Cotton.

(c) Tea is grown in Assam/Kashmir.

[H. S. Examination, 1978]

(d) In India Sugarcane is mainly grown in West Bengal/Uttar Pradesh.

(e) Maharastra/Tamilnadu/West Bengal is famous for cultivation of jute in the world.

(f) About 60% of the Indian coffee is produced in Tripura/Himachal Pradesh/Kerala/Karnatak.

(g) Jute/sugarcane/rubber is known as a plantation crop in India.

(h) West Bengal/Assam/Kerala occupies the leading place in the production of coffee and rubber in India.

[H. S. Examination, 1982]

(i) The Duars Plain is noted for the production of mulberry/apple/timber/tea. [H. S. Examination, 1983]

(j) Jhum cultivation is practised in Meghalaya/North Bihar plain/Godavari Valley.

(k) Pineapple is grown on an extensive scale at Terai plain/ Shillong plateau/Tripura highlands.

(l) Rubber is grown in Periyar/Narmada/Son Valley.

[**H. S. Examination, 1984**]

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে সঠিক উত্তর তৈয়ারি কর :

(ক) পশ্চিমবঙ্গ ধান/তুলা চাষের জন্য বিখ্যাত।

(খ) পাঞ্জাব গম/জোয়ার চাষের জন্য বিখ্যাত।

(গ) চা আসামে/কাশ্মীরে জন্মায়।

(ঘ) ভারতে ইক্ষু প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে/উত্তর প্রদেশে উৎপন্ন হয়।

(ঙ) পাট উৎপাদনে মহারাষ্ট্র/তামিলনাড়ু/ পশ্চিমবঙ্গ পৃথিবী-বিখ্যাত।

(চ) ভারতের ৬০% কফি ত্রিপুরায়/হিমাচল প্রদেশে/কেরালায়/কর্ণাটকে উৎপন্ন হয়।

(ছ) পাট/ইক্ষু/রবার ভারতের বাগিচা ফসলরূপে পরিচিত।

(জ) ভারতে চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ/আসাম/তামিলনাড়ু প্রথম স্থান অধিকার করে।

(ঝ) তুঁতফল/আপেল/কাঠ/চা উৎপাদনে ডুয়ার্সের সমভূমি উন্নত।

(ঞ) মেঘালয়/উত্তর বিহারের সমভূমি/গোদাবরী উপত্যকায় ঝুম চাষ করা হয়।

(ট) তরাই সমভূমি/শিলং মালভূমি/ত্রিপুরার উচ্চভূমি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আনারস চাষ করা হয়।

(ঠ) পেরিয়ার/নর্মদা/শোন নদীর উপত্যকায় রবার চাষ হয়।]

———

তৃতীয় অধ্যায়

পশুপালন ও মৎস্য-চাষ

(Pastoral Resources & Fishing)

পশুপালন

ভারতে নানা প্রকার পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গ প্রতিপালিত হয়। উহাদের মধ্যে (ক) গবাদি পশু, (খ) মেষ ও ছাগ, (গ) হাঁস-মুরগী, (ঘ) রেশমকীট ও লাক্ষাকীট এবং (ঙ) মৌমাছি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের জীবজন্তুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল ও মেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবাদি পশুর সংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ গরু ও মহিষ উভয় প্রাণী পালনেই পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৮৩ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে গরুর সংখ্যা ১৮ কোটি ২০ লক্ষের বেশী; মহিষের সংখ্যা ৬ কোটি ২৭ লক্ষ, শূকরের সংখ্যাও প্রায় ৮৬ লক্ষ। ভারতে মেষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ১৭ লক্ষ এবং ছাগলের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ। সাধারণতঃ দুগ্ধ, চর্ম ও মাংসের জন্য এই সকল পশু পালন করা হয়।

গবাদি পশুপালন—ভারতে গবাদি পশুর মধ্যে গরু ও মহিষ প্রধান; পার্বত্য অঞ্চলে ইয়াক প্রতিপালিত হয়।

ভারতে নানা জাতের গরু দেখা যায়; ইহাদের মধ্যে হরিয়ানা, হিসার, মন্টোগোমারী, থরপার্কার, সিন্ধি, মেওয়াতী, অমৃতমহল, নাগৌরি, নেল্লার, কাংক্রেজ, কৃষ্ণাউপত্যকা, গির, খিলারী ও দেওনি উল্লেখযোগ্য। নানা জাতের মহিষের মধ্যে মুড়া, সুরাটী, জাফরবাদী, নাগপুরী, মেহ্সানা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

পৃথিবীতে গবাদি পশু পালনে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও গো-মাংস উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে ভারত বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। হিন্দুরা গো-মাংস ভক্ষণ করা এবং গো-মাংসের ব্যবসায় করা ধর্মবিগর্হিত কাজ বলিয়া মনে করে। এইজন্য গো-মাংস রপ্তানিতে এই দেশ বিশেষ কোনো অংশ গ্রহণ করে না। বহু গরু ভূমিকর্ষণে ও ভারবহনে নিযুক্ত হয় বলিয়া এবং গাভী প্রতি দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম বলিয়া উদ্বৃত্ত দুগ্ধ বেশী পরিমাণে না পাওয়ায় দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প উন্নতিলাভ করে নাই। ভারতে গো-পালনের উপযুক্ত জলবায়ু থাকায় গবাদি পশুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। অধিকাংশ গবাদি পশু গৃহপালিত পশু হিসাবে পালিত হয়। বৃহদাকার বাণিজ্যিক পশুচারণ ক্ষেত্রের সংখ্যা খুব কম। মধ্য প্রদেশ, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। অন্যান্য রাজ্যেও অল্প বিস্তর গবাদি পশু পাওয়া যায়।

কৃষিকার্যে লাঙ্গল-টানা, ঘানি ও গাড়ি-টানা, সেচের জন্য কূপের জল তোলা প্রভৃতি কার্যে গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য দুগ্ধ উৎপাদনের দিকে বহু লোক বিশেষ নজর দেয় না। আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতে এখনও দুগ্ধসংক্রান্ত শিল্প (Dairy Farming) ভালোভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ক্রেতাদের উন্নত মানের দুগ্ধ সরবরাহের জন্য সারা দেশে সরকার পরিচালিত ও সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত মোট ১৯০টি দোহশালা (Dairy plants) আছে; ঐগুলি হইতে প্রতিদিন ৯৭ লক্ষ লিটার দুগ্ধ সরবরাহ হইতে পারে।

এখানে ১৯৮২ সালে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ মেঃ টন গো-দুগ্ধ ও ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন মহিষের দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ; গো-মহিষের মাংস উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ২ লক্ষ ৯২ হাজার মেঃ টন।

গবাদি পশুপালনের সমস্যা—ভারতে জীবজন্তু প্রতিপালনের এখনও কোনো সুবন্দোবস্ত হয় নাই। এখানে পশুপালনে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়।

(১) এখানকার গরু-মহিষাদি মোটেই উন্নতশ্রেণীর নয়। নানাপ্রকার ব্যাধির প্রকোপে গবাদি পশু রুগ্ন ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। ফলে দুগ্ধের পরিমাণও কমিয়া যায়।

(২) অধিকাংশ স্থানেই গো-চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নাই। গো-চিকিৎসকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

(৩) গবাদি পশুর খাদ্যের ভাল ব্যবস্থা নাই।

(৪) লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোচারণভূমি ক্রমশঃ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

(৫) পুষ্টিকর পশুখাদ্য উৎপাদনের কোনো বন্দোবস্ত নাই।

(৬) উন্নত গো-প্রজনন ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত নাই। উচ্চজাতীয় ষাঁড়ের অভাবে গো-বংশের অবনতি ঘটিতেছে।

(৭) গাভী-প্রতি দুগ্ধের উৎপাদন ভারতে অনেক কম। নিউ জিল্যান্ডে সমগ্র দুগ্ধ দানকালে (কয়েক মাস) গাভী-প্রতি প্রায় ৩·৪ মেঃ টন দুগ্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে পাওয়া যায় ০·৫৩১ মেঃ টন।* গাভী-প্রতি দুগ্ধের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উন্নতশ্রেণীর গাভী, উৎকৃষ্ট খাদ্য ও রোগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

(৮) দারিদ্র্যের জন্য ভারতে দুগ্ধের চাহিদা অত্যন্ত কম। এখানে বৎসরে জন-প্রতি দুগ্ধের চাহিদা মাত্র ১৫ লিটার ; কিন্তু স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে প্রত্যহ কমপক্ষে জনপ্রতি ১৫ আউন্স দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়া প্রয়োজন।

সম্প্রতি বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে গবাদি পশুর দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পের (Dairy Farming) উন্নতির জন্য ভারত সরকার নিম্নলিখিত বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন :

(১) দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুর শ্রীবৃদ্ধির জন্য কোনো কোনো স্থানে উৎকৃষ্ট-শ্রেণীর ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রজননের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

(২) গবাদি পশুর বিচরণের জন্য মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি, উহাদের পুষ্টির জন্য বিভিন্ন পশু-খাদ্যোৎপাদন, রোগ নির্ধারণের জন্য ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা কোনো কোনো অঞ্চলে করা হইয়াছে।

(৩) কলিকাতার নিকট হরিণঘাটায় ও ডানকুনিতে এবং দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বাই (আরে) শহরের নিকট আধুনিক ধরনের ডেয়ারী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলি ছাড়া আরও নানাস্থানে বেসরকারী প্রচেষ্টায় এই শিল্প উন্নতিলাভ করিতেছে। পুনে, দুর্গাপুর, গুন্টুর, কুর্ণুল, কুর্গ, আলিগড়, অমৃতসর, আনন্দ প্রভৃতি স্থানের ডেয়ারী কারখানা উল্লেখযোগ্য। গুজরাট রাজ্যে সমবায় প্রথায় গঠিত ডেয়ারী কারখানা দুগ্ধ, গুঁড়াদুধ, শিশুখাদ্য, মাখন, পনীর প্রভৃতি উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

(৪) এই সকল আধুনিক ডেয়ারী কারখানায় গ্রামাঞ্চল হইতে দুগ্ধ আনিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং সুলভে জনসাধারণকে বোতল প্যাক করা দুগ্ধ সরবরাহ করা হইতেছে। অবশ্য চাহিদার তুলনায় এই সরবরাহ অত্যন্ত কম।

*F. A. O. Monthly Bulletin, February, 1982 হইতে সংগৃহীত।

(৫) ডেয়ারী শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

ছাগ ও মেষপালন—ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর মেষ পালিত হয়। ১৯৮৩ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে মেষের সংখ্যা ৪ কোটি ১৭ লক্ষ। মেষ শুষ্ক, প্রায় শুষ্ক ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিপালিত হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, গুজরাট ও উত্তর প্রদেশের বহুস্থান লইয়া গঠিত শুষ্ক পশ্চিমাঞ্চলে মেষ প্রতিপালিত হয়। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুর কিছু কিছু অংশ লইয়া গঠিত শুষ্কপ্রায় দক্ষিণাঞ্চলে এবং কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য অঞ্চল লইয়া গঠিত নাতিশীতোষ্ণ হিমালয় অঞ্চলে মেষ প্রতিপালিত হয়।

ভারতে প্রতিপালিত বিভিন্ন জাতের মেষের মধ্যে দেশী, বিকানীরি, হিসারডেল, গণ্ডী প্রভৃতি এবং বিদেশী জাতের মধ্যে মেরিনো, করিডেল, র‍্যামবুইলেট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উত্তরাঞ্চলের শীতপ্রধান স্থানসমূহে মেষের সংখ্যা বেশী। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে অধিক সংখ্যায় মেষ পালিত হয়। মেষের লোমের সাহায্যে এখানে পশমী দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কাশ্মীর ও পাঞ্জাব পশমী দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন প্রকারের সংকর মেষ প্রজননের ব্যবস্থা করিয়া পশম উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতেছে। ভারতে উন্নত ধরনের মেষ প্রজননের জন্য ১৯৭৪-৭৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়া হইতে ১,৩০২টি মেরিনো মেষ আমদানি করা হয়।

ভারতে বৎসরে মেষ-প্রতি ০·৮ হইতে ০·৯ কিঃ গ্রাঃ পশম পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যত্র উহার পরিমাণ ৪ হইতে ৫ কিঃ গ্রাঃ। আমাদের দেশে বাৎসরিক পশম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি কিঃ গ্রাঃ।

ভারতে বিভিন্ন অংশেই ছাগল প্রতিপালিত হয়। মেষ অপেক্ষা ছাগল সহজে এবং স্বল্পব্যয়ে পালন করা যায়; ইহারা অধিকতর কষ্ট সহ্য করিতে পারে। বিভিন্ন জাতের ছাগলের মধ্যে কাশ্মীরী, গদ্দী, চাম্বা, মেহ্সানা, যমুনাপাড়ী, চেগু ও মাড়ওয়ারী উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৩ সালের হিসাব অনুসারে ভারতের ছাগলের সংখ্যা ৭ কোটি ৭৫ হাজার। ছাগ-মাংস ভারতবাসীর খুব প্রিয় খাদ্য বলিয়া ইহার চাহিদা অন্যান্য মাংস হইতে অধিক। ভারতীয়রা মেষ-মাংসও খাইয়া থাকে। ছাগল দুধ দেয়; মেষ দুধ দেয় না বলিলেই চলে। যমুনাপাড়ী, মেহ্সানা ও মাড়ওয়ারী ছাগল দুধের জন্য প্রসিদ্ধ। অ্যাঙ্গোরা, কাশ্মীরী প্রভৃতি ছাগলের পশম উৎকৃষ্ট।

১৯৮৩ সালে ভারতে মোট ৪ লক্ষ ১৫ হাজার মেঃ টন ছাগ ও মেষ-মাংস উৎপন্ন হইয়াছে। মাংসের জন্য ভারতের নানা স্থানে শূকর প্রতিপালিত হয়। শূকরের মাংস মুসলমানগণ আহার করে না। ১৯৮৩ সালে ভারতে ৮০ হাজার মেঃ টন শূকর-মাংস উৎপন্ন হইয়াছে।

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ছাড়াও ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, হাতি, উট প্রভৃতি **ভারবাহী পশু** ভারতের কোনো কোনো স্থানে প্রতিপালিত হয়। ঘোড়া গাড়ি টানে, পিঠে মাল বহন করে, লাঙ্গল টানে, সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘোড়ার মত দ্রুতগামী পশু বিরল। গাধা ও খচ্চর মাল বহন করে। পার্বত্য অঞ্চলে খচ্চর ও ঝব্বু মাল বহনে বিশেষ সাহায্য করে। মরুভূমি অঞ্চলে (রাজস্থানে) ও উত্তর ভারতের নানা জায়গায় উট মাল বহন করিয়া থাকে। আসাম ও দাক্ষিণাত্যের অরণ্য অঞ্চলে হাতি কাঠ ও ভারী মাল বহনের কার্যে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে চর্ম উৎপাদন—ভারতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা চামড়া উৎপন্ন হয়। বাবলা, গর্জন, সোঁদাল প্রভৃতি গাছের ছাল ও হরীতকীর রসের সাহায্যে এই দেশে কাঁচাচামড়া শোধন করা হয়। লবণ ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যেও চর্ম শোধন করা হইয়া থাকে।

ভারতের তামিলনাড়ু অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক চামড়া পাওয়া যায়। কারণ এখানে গবাদি পশুর মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা বেশি। ইহার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্র হইতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে চামড়া পাওয়া যায়। ভারতীয় চামড়ার শতকরা ৮০ ভাগ গরুর চামড়া। মেষ ও ছাগলের চামড়াও মূল্যবান সম্পদ। এই চামড়া দিয়া জুতা, দস্তানা ও অন্যান্য নানাবিধ জিনিস তৈয়ারি হয়।

চামড়ার বাণিজ্য – ভারতের মোট উৎপন্ন চামড়ার শতকরা ২০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়; বাকী ৮০ ভাগ দেশীয় চর্মশিল্পে (জুতা প্রস্তুত ইত্যাদি কার্যে) ব্যবহৃত হয়। পাকিস্তান হইতে কিছু চামড়া ভারতে বিশেষ কাজের জন্য আমদানি করা হইলেও ভারত চামড়া রপ্তানিতে পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী প্রভৃতি দেশ ভারতীয় চামড়ার প্রধান আমদানিকারক। কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের মাধ্যমে অধিকাংশ চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে ১৯৮১-৮২ সালে ৩৭৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের চর্ম ও চর্মনির্মিত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

হাঁস মুরগী প্রতিপালন – ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতে প্রায় সর্বত্র হাঁস ও মুরগী প্রতিপালিত হয়। পূর্বে সাধারণতঃ গৃহস্থগণ অন্যান্য পশুর সঙ্গে দুই চারিটি হাঁস-মুরগী প্রতিপালন করিত। মুরগীর মাংস ও ডিম এবং হাঁসের ডিমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা পূরণের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পোলট্রি ফার্ম গঠিত হইয়াছে। সরকারও হাঁস-মুরগী পালনে উৎসাহিত করিবার জন্য নানা উপায়ে সাহায্য করিতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, বাঙ্গালোর, ভুবনেশ্বর, চণ্ডীগড়, পুনে প্রভৃতি শহরে বড় বড় পোলট্রি ফার্ম আছে। হাঁস-মুরগী প্রতিপালনে দক্ষিণ ভারত অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছে। ১৯৮২ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে মুরগীর সংখ্যা ১৫ কোটির বেশী। যেখানে ১৯৬১ সালে ২৮০ কোটি হাঁস মুরগীর ডিম উৎপন্ন হইয়াছিল সেখানে ১৯৮২ সালে উৎপন্ন হইয়াছে ১,৩০০ কোটি।

কীট-পতঙ্গ প্রতিপালন—রেশমকীট হইতে রেশম, লাক্ষাকীট হইতে গালা এবং মৌমাছি হইতে মধু ও মোম পাওয়া যায়। তুঁতগাছের পাতা খাইয়া রেশমকীট জীবন ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, কাশ্মীর, আসাম, বিহার, মধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। পলাশ, কুল, কুসুম, খয়ের প্রভৃতি গাছে লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। ছোটনাগপুর মালভূমি, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা, আসাম, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ রেশমকীট প্রতিপালনের জন্য বিখ্যাত।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানে এবং সুন্দরবনে মৌমাছি প্রতিপালিত হয়। প্রাচীনকাল হইতেই মধু ও মোমের জন্য মৌমাছি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

মৎস্য-চাষ

ভারতে পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ অভাব বিদ্যমান। অগণিত দরিদ্র অধিবাসীর পক্ষে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। নদ-নদী, খাল-বিল প্রভৃতিতে সমাচ্ছন্ন ও তিন দিকে সমুদ্রবেষ্টিত ভারতের অধিবাসীরা মৎস্য হইতে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব অনেকাংশে পূরণ করিতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের জন্য ভারতের বহুসংখ্যক লোক নিরামিষাশী বলিয়া তাহারা মৎস্য ভক্ষণ করে না।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, গোয়া ও কেরালা রাজ্যের অধিবাসীরা মৎস্যাশী; অন্যান্য রাজ্যের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে মৎস্য খাওয়ার প্রচলন আছে। ভারতের মৎস্যাশী জনসাধারণের অধিকাংশ অর্থাভাবে নিয়মিত মৎস্য কিনতে না পারায় মৎস্যের চাহিদা লোকসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। ভারতে মৎস্যের চাহিদা বৎসরে জনপ্রতি মাত্র ২ কিলোগ্রাম। এখানে নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার মৎস্য খুব জনপ্রিয়। অন্যান্য মৎস্য সাধারণ লোক পছন্দ করে না। ভারতের মৎস্য-চাষ দরিদ্র ধীবরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এখনও সুসংবদ্ধভাবে এই ব্যবসায় গড়িয়া উঠে নাই।

সামুদ্রিক মৎস্য এবং স্বাদুজলের মৎস্য—এই দুই প্রকারের মৎস্যই ভারতে পাওয়া যায়। পঞ্চম পরিকল্পনায় মৎস্য-চাষের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে দেশের জনসাধারণের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব যেমন পূরণ হইবে তেমনি বিদেশে মৎস্য রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাইবে।

মৎস্যশিকার—ভারতের মৎস্যশিকার-ক্ষেত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) গভীর সমুদ্রের মৎস্যশিকার-ক্ষেত্র, (খ) উপকূলবর্তী সামুদ্রিক মৎস্যশিকার-ক্ষেত্র ও (গ) অভ্যন্তরীণ স্বাদুজলের মৎস্যশিকার-ক্ষেত্র।

গভীর সমুদ্রের মৎস্যশিকার-ক্ষেত্র—গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে ভারত অন্যান্য উন্নত দেশ হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও মৎস্যশিকারে ব্যবহারোপযোগী বড় জাহাজ না থাকায় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে এখনও সুবন্দোবস্ত করা যায় নাই। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট সরকার সামুদ্রিক মৎস্যশিকারের উন্নত ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

উপকূলবর্তী সামুদ্রিক মৎস্যশিকার-ক্ষেত্র—ভারতের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৭০০ কিলোমিটার। উপকূলবর্তী অগভীর মহীসোপান ও সামুদ্রিক মগ্নচড়ার আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় মৎস্যশিকারের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। তথাপি উপকূলবর্তী সামুদ্রিক মৎস্য আহরণেও ভারত অনেক পিছনে পড়িয়া আছে; কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন পন্থায় মৎস্য শিকার করা হয়। ট্রলার, ড্রিফ্টার ইত্যাদির ব্যবহার খুবই নগণ্য। বর্তমানে সমবায় প্রথার মাধ্যমে কোনো কোনো অঞ্চলে ট্রলারের সাহায্যে সামুদ্রিক মৎস্য শিকার করা হয়। সমুদ্রোপকূলে চিংড়ি, ইলিশ, ভেটকি, চাঁদা, পমফ্রেট, কড, স্যামন, হেরিং, ম্যাকারেল, হাঙ্গর প্রভৃতি শিকার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা, কেরালা, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যের সমুদ্রোপকূলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করা হয়। পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ, মসুলিপতনম্, বিশাখাপতনম্ এবং পশ্চিম উপকূলের ম্যাঙ্গালোর, কালিকট ও কোচিন প্রভৃতি স্থানে মৎস্য-বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্রায় ৩ হাজার মেঃ টন সামুদ্রিক মৎস্য শিকার করা হয়। এখানে সমবায়ের মাধ্যমে ও সরকারের সহায়তায় ট্রলারের সাহায্যে সমুদ্র হইতে মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অভ্যন্তরীণ স্বাদুজলের মৎস্যশিকার-ক্ষেত্র—২৯,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদ-নদী, ৩০ লক্ষ হেক্টর জলাধার (reservoirs), ১৫ লক্ষ হেক্টর দীঘি ও ডোবা এবং ১৪ লক্ষ হেক্টর ঈষৎ নোনাজলের জলাভূমি (ভেড়ি) লইয়া ভারতের অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্র গঠিত। স্বাদুজলের মৎস্য নদ-নদী পুকুর, হ্রদ, খাল বিল, নদীর উপর

নির্মিত বাঁধের পশ্চাদ্‌বর্তী জলাশয় ও ভেড়িতে পাওয়া যায়। এই মৎস্য খুবই জনপ্রিয়। এইপ্রকার মৎস্যের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, চিংড়ি, ইলিশ, কই ইত্যাদি বিখ্যাত। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে এই সকল মৎস্য ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী, হুগলী, দামোদর প্রভৃতি নদ তে, ওড়িশার মহানদীতে ও চিল্কা হ্রদে, বিহারের গঙ্গানদীতে, উত্তর প্রদেশের যমুনা, গঙ্গা ও উহার উপনদীসমূহে এবং হিমালয়ের উপরিস্থিত নৈনিতাল, ভীমতাল প্রভৃতি হ্রদে, অন্ধ্র প্রদেশের গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীতে এবং পুলিকট ও কল্লেরু হ্রদে, মণিপুরের লোগতাক হ্রদে, আসামের ব্রহ্মপুত্র নদে, কাশ্মীরের উলার হ্রদে প্রচুর স্বাদুজলের মৎস্য আহরণ করা হয়। মহানদী শতদ্রু দামোদর প্রভৃতি নদনদীর উপর যে সকল বাঁধ দেওয়া হইয়াছে উহাদের পশ্চাদ্বর্তী জলাশয়ে মৎস্যচাষের বন্দোবস্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার ইলিশ খুবই সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক লক্ষ লোক মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

মৎস্য উৎপাদন ভারতে মৎস্যের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যেখানে ১৯৫১ সালে ৭·৫২ লক্ষ মেঃ টন মৎস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, সেখানে ১৯৮২ সালে প্রায় ২৫ লক্ষ মেঃ টন মৎস্য উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপন্ন মৎস্যের এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী স্বাদুজলের মাছ, বাদবাকী সামুদ্রিক নোনা জলের মাছ।

মৎস্য রপ্তানি—ভারত হইতে সামুদ্রিক মৎস্য বিদেশে রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্বাদুজলের মৎস্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার পক্ষেই যথেষ্ট নহে বলিয়া বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। মৎস্য রপ্তানি করিয়া ভারত ১৯৭৬-৭৭ সালে যেখানে ১৮০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে, সেখানে ১৯৮১-৮২ সালে অর্জন করিয়াছে ২৭৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। মৎস্য রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে ভারত মৎস্য রপ্তানি করে।

মৎস্য-চাষ উন্নয়ন—ভারতে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন :

(ক) ভারতে মৎস্য-চাষের উন্নতি করিতে হইলে ট্রলার, ড্রিফ্টার প্রভৃতির সাহায্যে মৎস্য আহরণ করা প্রয়োজন।

(খ) মৎস্যজীবীদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়া তাহাদের মৎস্য-শিকারে সাহায্য করা দরকার; সমবায় সংস্থার মাধ্যমে তাহাদের সংগঠিত করিলে মৎস্য চাষের প্রভূত উন্নতি হইবে।

(গ) মৎস্য-সংরক্ষণের জন্য হিমঘরের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

(ঘ) টিনবন্দী করিয়া মৎস্য রপ্তানির বন্দোবস্ত করিলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

(ঙ) সামুদ্রিক মৎস্য হইতে তৈল, সার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিলে বহু মূল্যবান জিনিস মৎস্য হইতে পাওয়া যাইবে।

ভারত সরকার মৎস্য-চাষ উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন :

(ক) তুতিকোরিণ, বিজিনগম (Vizhingom), কারওয়ার, ধর্মা ও পোর্টব্লেয়ার প্রভৃতি স্থানে মধ্যমাকৃতির মৎস্য-শিকারের জাহাজ ভিড়িবার উপযুক্ত মৎস্যবন্দর

নির্মাণের কার্য সমাপ্তির মুখে ; মাদ্রাজ, রায়চৌক, বিশাখাপতনম্, মালপে এবং কোচিনে বৃহৎ মৎস্য-বন্দর স্থাপনের কাজ চলিতেছে। হোন্নাভার (কর্ণাটক), মালিপতনম্ ও কোড্ডাক্কারি (তামিলনাড়ু), কাকিনাড়া (অন্ধ্র প্রদেশ), পোরবন্দর (গুজরাট), রত্নগিরি (মহারাষ্ট্র) প্রভৃতি স্থানে স্বয়ংসম্পূর্ণ মৎস্য-বন্দর গড়িয়া উঠিতেছে। উল্লিখিত প্রকল্পগুলি ছাড়া আরও ৭০টি স্থানে আংশিকভাবে মৎস্য-বন্দরের কাজ চলিতেছে।

(খ) দূরবর্তী গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য ১২টি কেন্দ্র (bases) হইতে ২৫টি ট্রলারের সাহায্যে অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে।

(গ) বিভিন্ন রাজ্যে অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষের উন্নয়নের জন্য মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করিয়া মৎস্যচাষের আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ২৮টি সংগঠন দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যরত আছে।

(ঘ) বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, ব্যারাকপুর ও আগ্রাতে মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।

(ঙ) ১৯৭৭-৭৮ সাল হইতে হিমায়ন ব্যবস্থা সম্বলিত ৮টি রেল-ভ্যান দীর্ঘপথে মৎস্য পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এই ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা চলিতেছে।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. (a) Describe the problems faced in animal rearing in India.
   (b) Describe the Indian trade in Hides and Skins.

[(ক) ভারতে পশুপালনে কি কি সমস্যা দেখা যায় বর্ণনা কর। (খ) ভারতের চর্মব্যবসায় বর্ণনা কর।]

উঃ 'গবাদি পশুপালনের সমস্যা' (৮০ পৃঃ) এবং 'ভারতের চর্ম উৎপাদন' ও 'চামড়ার বাণিজ্য' (৮১ ৮২ পৃঃ) লিখ।

2. Describe the factors that account for successful development of dairy farming in India. **[B. S. E. Higher Secondary, 1967]**

(ভারতের দুগ্ধসংক্রান্ত শিল্পের সাফল্যজনক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের বর্ণনা কর।)

উঃ 'গবাদি পশুপালন' (৭৯ – ৮১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Examine the present position of dairy farming in India.
[Specimen Question, 1978]

(ভারতের দুগ্ধসংক্রান্ত শিল্পের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ কর।)

উঃ 'গবাদি পশুপালন' (৭৯ – ৮১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Examine the present position of fishing industry in India.
[Specimen Question, 1978]

(ভারতের মৎস্যশিল্পের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ কর।)

উঃ 'মৎস্য চাষ' (৮২ - ৮৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. What are the different types of fisheries found in India? What measures have been taken to improve the condition of fishing industry in this country?
[Specimen Question, 1980 & '81]

(ভারতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মৎস্যক্ষেত্র দেখা যায়? এই দেশে মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?)

উঃ 'মৎস্য-চাষ' (৮২–৮৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Write short notes on Fishing in the Indian Union.

[C. U. Pre-Univ. 1962]

(ভারতের মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।)

উঃ 'মৎস্য-চাষ' (৮২—৮৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. (a) Briefly describe the different sources of fishing in India.
(b) Examine the present position of fishing industry in India.

[H. S. Examination, 1981]

[(ক) ভারতের মৎস্যশিকারের বিভিন্ন উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
(খ) ভারতের মৎস্যশিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর।]

উঃ 'মৎস্য-চাষ' (৮২–৮৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

8. Justify the location of principal fishing grounds of India. Discuss the present position of this resource in India.

[H. S. Examination, 1984]

[ভারতের প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির অবস্থানের যথার্থতা নির্দেশ কর। মৎস্য সম্পদে ভারতের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।]

উঃ 'মৎস্য চাষ' (৮২–৮৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Objective Questions

1. Frame correct answers from the following statements :
(a) At Malda/Haringhata a dairy farm of modern style has been grown up.
(b) Sweet-water fishes are available from the seas/rivers.

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে সঠিক উত্তর তৈয়ারি কর :
(ক) মালদায়/হরিণঘাটায় আধুনিক ডেয়ারি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।
(খ) সমুদ্রে/নদীতে স্বাদুজলের মৎস্য পাওয়া যায়।]

2. Fill up the blanks :
(i) Though India holds the — place among the countries of the world in cattle-rearing, she has not succeeded in making any notable progress in the production and export of — and in the — industry. (ii) Cold northern regions of India have the major portion of sheep, the more important regions being —, the Punjub, — and —. woollen goods are manufactured from the fleece (fur) of the sheep in these states,— and — are famous for woollen goods. (iii) fish ports have been built up in—, —, — of the eastern coast, and—, —, — etc. of the western coast.

[শূন্যস্থান পূর্ণ কর : (i) পৃথিবীতে গবাদি পশুপালনে ভারত — স্থান অধিকার করিলেও — উৎপাদনে ও রপ্তানিতে এবং — শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। (ii) ভারতের উত্তরাংশে শীতপ্রধান অঞ্চলেই মেষের সংখ্যা বেশী ; — পাঞ্জাব, — ও — অধিক পশমী দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। (iii) পূর্ব উপকূলের —,—,— এবং পশ্চিম উপকূলের —,—,— প্রভৃতি স্থানে মৎস্য-বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।]

চতুর্থ অধ্যায়

খনিজ-সম্পদ

(Minerals)

প্রকৃতি ভারতকে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে খনি হইতে এই সম্পদ আহরণের পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ছিল। ইহা ছাড়া সেই সময় খনিজ সম্পদ উত্তোলিত হইত প্রধানতঃ ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে শিল্পোন্নতি আরম্ভ হওয়ায় খনিজ সম্পদের প্রচুর চাহিদা বাড়িয়া যায়। সেইজন্য খনিজ সম্পদ আহরণের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারত সরকার স্বাধীনতা লাভের পর 'জাতীয় খনিজ নীতি' (National Mineral Policy গ্রহণ করেন। খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন, প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কয়েকটি জাতীয় সংস্থা স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে 'ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা' (Geological Survey of India), 'তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন' (Oil & Natural Gas Commission) এবং 'ভারতীয় খনি সংস্থা' (Indian Bureau of Mines) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সংস্থার কার্যকলাপ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। এই সকল সংস্থার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চিত খনিজ সম্পদের নূতনভাবে পরিমাপ করা হয় এবং নূতন খনি আবিষ্কারের বন্দোবস্ত হয়। ইহার ফলে বহু নূতন খনি বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সিঙ্গরাউলি মধ্য প্রদেশ) অঞ্চলের কয়লাখনি, কিরিবুরু (ওড়িশা) অঞ্চলের লৌহখনি, ক্ষেত্রী (রাজস্থান) ও সিকিমের তাম্রখনি এবং কাম্বে-আংকলেশ্বর (গুজরাট), নাহারকাটিয়া ও শিবসাগর (আসাম) অঞ্চলের তৈলখনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল আবিষ্কারের ফলে ভারতের খনিজ সম্পদের মানচিত্র বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তিত হইবে।

ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় খনিজ সম্পদের গুণাগুণ ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এবং ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়। বিভিন্ন খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে গবেষণার বন্দোবস্ত করা হয়। কয়লা, লৌহ আকরিক প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও এই পরিকল্পনায় বন্দোবস্ত করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারতে শিল্প সংগঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সেইজন্য শিল্পে প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, জিপসাম, সীসা, দস্তা, রাং, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরিমাপের ভার 'ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা', 'ভারতীয় খনি সংস্থা' এবং 'তৈল ও স্বাভাবিক গ্যাস কমিশন'-এর উপর ন্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন, অনুসন্ধান, গবেষণা প্রভৃতির জন্য প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প আরও প্রসার লাভ করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়। খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার নানাবিধ ব্যবস্থা

এই পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছিল। কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৯.৭ কোটি মেঃ টন এবং লৌহ আকরিকের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৩ কোটি মেঃ টনে পরিণত করিবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় খনিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য, সঞ্চিত খনিজ সম্পদের সঠিক পরিমাপের জন্য, খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য, খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী খাতে মোট ৫০৮ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছিল। আমদানীকৃত খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও উৎপাদন, রপ্তানিযোগ্য খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য দ্রব্যের নূতন খনি আবিষ্কারের জন্য এই পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। সঞ্চিত খনিজ সম্পদের পরিমাপ, অনুসন্ধান প্রভৃতির জন্য 'ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা'কে ১০ কোটি টাকা এবং ভারতীয় খনি সংস্থাকে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছিল। এই দুই প্রতিষ্ঠান কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, বক্সাইট, চুনাপাথর, তাম্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান, পরিমাপ প্রভৃতি কার্য এই পরিকল্পনার কার্যকালে চালাইয়াছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্যের উত্তোলনের জন্য ৫১০.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের উত্তোলনের লক্ষ্য বর্ধিত করা হইয়াছিল এবং খনিজ শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। ভারত কোক কয়লা লিমিটেডের উপর কোক কয়লা উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্যান্য কয়লা উৎপাদনের দায়িত্ব কয়লাখনি কর্তৃপক্ষের (**Coal Mines Authority**) উপর অর্পিত হয়। এই পরিকল্পনাকালেই 'ভারত স্বর্ণখনি লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়; বিভিন্ন স্থানে দস্তা উত্তোলনের সুব্যবস্থার জন্য হিন্দুস্থান জিংক লিমিটেড গঠন করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ২,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এই পরিকল্পনায় নিম্নরূপ উৎপাদন লক্ষ্য ধার্য হয়ঃ লৌহ আকরিক—৫ কোটি ৬০ লক্ষ মেঃ টন, তাম্র—৩৭ হাজার মেঃ টন, অ্যালুমিনিয়াম—৩ লক্ষ ১০ হাজার মেঃ টন, দস্তা—৮০ হাজার মেঃ টন।

ভারতে খনিজ দ্রব্য আহরণে বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে; তন্মধ্যে ৩.৯ লক্ষ লোক কয়লাখনিতে ও ৬ লক্ষ লোক লৌহখনিতে কাজ করে। ভারতে বিভিন্ন রকমের খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হইলেও সবগুলির গুরুত্ব সমান নহে। কয়েকটি খনিজ সম্পদ উৎপাদনে ভারতের স্থান অনেক উচ্চে; যেমন, অভ্র ও জিরকন উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয়, লৌহ আকরিকে ষষ্ঠ, কয়লায় ষষ্ঠ ও লবণে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনে ভারত স্বাবলম্বী হইলেও এখনও এই দেশকে অনেক খনিজ দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। নির্ভরশীলতা অনুসারে এই দেশের খনিজ দ্রব্যসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা,

(ক) এই সকল খনিজ সম্পদে ভারত স্বাবলম্বী—কয়লা, স্বর্ণ, জিপসাম, ক্রোমিয়াম, চুনাপাথর, ডলোমাইট, পাইরাইট, নাইট্রেট, ফসফেট, জিরকন, ভ্যানাডিয়াম, তাম্র, গৃহাদি নির্মাণের দ্রব্যাদি, সোহাগা ইত্যাদি।

(খ) নিম্নলিখিত খনিজ সম্পদে ভারত শুধু স্বাবলম্বী নহে, রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্তও প্রচুর। যথা—লৌহ আকরিক, টাইটানিয়াম, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসাইট, বক্সাইট, সিলিকা, মোনাজাইট, কারান্ডাম, বেরোলিয়াম প্রভৃতি।

(গ) নিম্নলিখিত খনিজ সম্পদের জন্য ভারতকে বহুলাংশে আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়—নিকেল, খনিজ তৈল, গন্ধক, সীসা, দস্তা, রাং, পারদ, টাংস্টেন, মলিবডেনাম, গ্রাফাইট, প্লাটিনাম, পটাশ, অ্যাসফাল্ট প্রভৃতি।

খনিজ দ্রব্যসমূহকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) ধাতব খনিজ ও (২) অধাতব খনিজ। ভারতে উত্তোলিত ধাতব খনিজগুলির মধ্যে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, ক্রোমাইট, টাংস্টেন, রাং, দস্তা, সীসা প্রভৃতি এবং অধাতব খনিজ-গুলির মধ্যে কয়লা, লিগনাইট, খনিজ তৈল, অভ্র, চুনাপাথর, বক্সাইট, জিপসাম, অ্যাসবেস্টস্, লবণ, ডলোমাইট, ম্যাগনেসাইট, গ্রাফাইট, কায়ানাইট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অধাতব খনিজের মধ্যে কয়লা, লিগনাইট, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি খনিজের অন্তর্ভুক্ত। ইউরেনিয়াম, বেরিল, থোরিয়াম প্রভৃতি আণবিক জ্বালানির অন্তর্ভুক্ত।

উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের মূল্য (কোটি টাকায়)

বৎসর	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৭৫	১৯৮১	১৯৮২
মূল্য	৮২.৩	১৮১.২	৫০২.৯	১,২২৪	৩,৫৪০.২	৫,০৫৫.২

উপরের তালিকা হইতে ভারতের খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের অগ্রগতি সম্বন্ধে আংশিক ধারণা লাভ করা যায়।

বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য

নিম্নে ভারতে উত্তোলিত খনিজ দ্রব্যসমূহের বিবরণ দেওয়া হইল। প্রথম খণ্ডের খনিজ সম্পদ আলোচনার সময় প্রত্যেকটি খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে উহার পুনরাবৃত্তি করা হইল না।

কয়লা (Coal)

কয়লা জ্বালানি খনিজ। ভারতে কয়লা উত্তোলন প্রথম আরম্ভ হয় ১৮১৪ সালে রানীগঞ্জের সীতারামপুর অঞ্চলে। সেই সময় যানবাহনের অভাবে কয়লা উত্তোলনের অসুবিধা হইত। পরে পূর্ব ভারত রেলপথ কোম্পানী' (East Indian Railway) কয়লাখনি-অঞ্চলে রেলপথ স্থাপন করায় কয়লা উত্তোলন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কয়লা ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ দ্রব্য। ভারতে সঞ্চিত কয়লার আনুমানিক পরিমাণ ৮,৫৭৭ কোটি মেঃ টন। লিগনাইট কয়লার আনুমানিক সঞ্চয় ২১০ কোটি মেঃ টন। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ কয়লা উৎপন্ন করিয়া ভারত কয়লা উৎপাদনে পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ভারতের কয়লাখনিসমূহে প্রায় চার লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই দেশের মোট খনিজ দ্রব্যের মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ শুধু মাত্র কয়লা হইতে আসে।

সমস্যা—কয়লা উৎপাদনে এই দেশকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ, ভারতীয় কয়লা সাধারণতঃ মধ্যমশ্রেণীর। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহের কয়লা হইতে এখানকার কয়লার তাপ উৎপাদন শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। কয়লায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী থাকায় এখানকার কয়লা হইতে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হয়। এখানে উৎকৃষ্টশ্রেণীর বিটুমিনাস্ জাতীয় কোক কয়লার পরিমাণ খুবই কম। ইহার উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে আগামী ৮০/৯০ বৎসরে ইহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যানবাহনের সুবন্দোবস্ত না থাকায় ভারতে কয়লার উত্তোলন বৃদ্ধি পায় না। জলপথের সুবিধা না থাকায় এবং সমুদ্র-বন্দর দূরবর্তী হওয়ায় কয়লা পরিবহণের জন্য একমাত্র রেলপথের উপর নির্ভর করিতে হয়। রেলপথের মাসুল অত্যধিক হওয়ায় কয়লার দাম বাড়িয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের কয়লাখনিসমূহ প্রধানতঃ একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। রানীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলেই

ভারতের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ফলে অন্যত্র কয়লা পাঠাইতে প্রচুর মাসুল দিতে হয়। দক্ষিণ ভারতে কয়লার উৎপাদন নগণ্য বলিয়া এখানকার শিল্পোন্নতি ব্যাহত হয়; চতুর্থতঃ, গরম দেশ বলিয়া ভারতীয় শ্রমিকগণ অন্যান্য দেশের শ্রমিকগণের মতো কর্মক্ষম না হওয়ায় এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে এখানে মাথাপিছু উৎপাদন অনেক কম। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক কয়লা ভূগর্ভে থাকিয়া যায়। কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য অনেক শ্রমিক বৎসরের সকল সময় খনিতে কাজ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, কয়লা হইতে উপজাত দ্রব্য (By-products) প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত না হওয়ায় কয়লার দাম বাড়িয়া যায়।

বর্তমানে ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় কোনো কোনো সমস্যার সমাধান হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন কয়লা সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন কার্যকরী করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দেশে শিল্পের উন্নতির জন্যই কয়লার উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে কয়লা ও কোক-কয়লা শিল্প জাতীয়করন করা হইয়াছে এবং সরকার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সমস্ত খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারী সংস্থা 'কোল ইন্ডিয়া লিঃ'-এর উপর কয়লা উৎপাদনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু রেলপথ সর্বদা কয়লা বহনে সক্ষম না হওয়ায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লা উত্তোলন করা যায় না। কয়লা-শিল্পে উন্নতির জন্য ধানবাদে 'জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (Fuel Research Institute) বিভিন্ন গবেষণা কার্য চালাইতেছে। কয়লাখনি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য 'কোল-বোর্ড' (Coal Board) গঠিত হইয়াছে। ১৯৭৫ সালের ১লা নভেম্বর তারিখ হইতে ভারতে সমস্ত সরকারী কয়লাসংস্থা 'কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে চলিয়া আসে। বর্তমানে 'কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড' ভারতে কয়লা শিল্পের যাবতীয় কার্যের তত্ত্বাবধান করে।

ভারতে কয়লার ব্যবহার—ভারতে উৎপন্ন কয়লা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে, ট্রেন ও জাহাজ চালাইবার জন্য, বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত কারখানায় তাপ উৎপাদনে, ঢালাই কারখানায়, কাচ, সিমেন্ট ও মৃৎশিল্পে এবং গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

রেলওয়ে, লৌহ ও ইস্পাত এবং পিতলের কারখানাসমূহ ভারতে উৎপন্ন কয়লার অর্ধাংশের অধিক ব্যবহার করে। এখন ট্রেন চালনার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লার ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কয়লা ব্যবহৃত হয়; তারপর যথাক্রমে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ও রেলওয়ের স্থান।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কয়লাখনি আছে—গণ্ডোয়ানা ও টার্শিয়ারী। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের খনিসমূহ গণ্ডোয়ানা শ্রেণীভুক্ত; আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যের কয়লাখনি টার্শিয়ারী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান ও তামিলনাড়ু রাজ্যে লিগনাইট কয়লার খনি আছে। ১৯৮২ সালে ভারতে মোট কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে ১২ কোটি ৮২ লক্ষ মেঃ টন। মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৮ ভাগ গণ্ডোয়ানা কয়লা এবং ২ ভাগ টার্শিয়ারী কয়লা। ঐ বৎসর লিগনাইট কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে ৬৭ লক্ষ মেঃ টন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, লিগনাইটের তাপ-উৎপাদন ক্ষমতা গণ্ডোয়ানা শ্রেণীর কয়লার অর্ধেক মাত্র; অর্থাৎ ১ মেঃ টন গণ্ডোয়ানা শ্রেণীর কয়লায় যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন

হইবে সেই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করিতে ২ মেঃ টন লিগনাইটের প্রয়োজন হইবে।

ভারতে মোট ৮০০ কয়লা খনির মধ্যে বিহারের স্থান সকলের উপরে। ভারতের মোট উৎপন্ন কয়লার প্রায় অর্ধেক আসে এই রাজ্য হইতে। এই রাজ্যের খনিসমূহের মধ্যে ঝরিয়া অঞ্চলেই অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। বিহারের কয়লাখনিসমূহের উপর এখানকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, সারের কারখানা, চিনি শিল্প, সিমেন্টশিল্প প্রভৃতি নির্ভরশীল। বিহারের অন্যান্য কয়লাখনিসমূহের মধ্যে কারাণপুরা গিরিডি, ডাল্টনগঞ্জ, বোকারো প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রানীগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য কয়লা খনি অঞ্চল। এখানকার কয়লা অত্যন্ত উৎকৃষ্টশ্রেণীর। এই কয়লাখনির নিকটেই বিখ্যাত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। এখানকার কয়লাখনির উপর পশ্চিমবঙ্গের দুইটি লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, রেলইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কাগজ শিল্প, পাট শিল্প, কার্পাস-বয়ন শিল্প প্রভৃতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লার সাহায্যে এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, দুর্গাপুরকে বর্তমানে 'ভারতের রূঢ়' (Ruhr of India) বলা হয়।

মধ্য প্রদেশের ভিলাইয়ে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় খনিসমূহ হইতে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 'কোল ইন্ডিয়া লিঃ' নূতন নূতন খনিতে কাজ শুরু করিয়াছে। তন্মধ্যে পেঞ্চকানহান, বিসরামপুর, কোরবা, সিঙ্গারাউলি, চিরিমিরি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্য প্রদেশের পুরাতন খনিসমূহের মধ্যে উমারিয়া, সোহাগপুর ও মোহপানী উল্লেখযোগ্য। ওড়িশা রাজ্যের তালচের খনি হইতে প্রধানতঃ রাউরকেলার লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় কয়লা প্রেরিত হয়। ১৯৬২ সালে তালচের অঞ্চলে একটি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্র বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিল নাড়ুতে প্রয়োজনের তুলনায় কয়লার উৎপাদন খুব কম। মহারাষ্ট্রের কাম্পতি ও অন্ধ্র প্রদেশের সিঙ্গারেণীতে অবস্থিত কয়লাখনি দুইটি হইতে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রের পুরাতন খনিসমূহের মধ্যে চান্দা ও বল্লারপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কটে নূতন লিগনাইট কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানকার নেভেলিতে এই লিগনাইট হইতে প্রচুর তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে এবং লিগনাইটের গুঁড়া হইতে কয়লার ইট (Briquets) প্রস্তুত হইতেছে। তামিলনাড়ু ভিন্ন জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি, আসামের নাজিরা ও মাকুম, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও রাজস্থানের পালনা অঞ্চলে টার্শিয়ারী কয়লা পাওয়া যায়।

কয়লা সংরক্ষণ—ভারতের কয়লা-সম্পদ সংরক্ষণ অপচয় নিবারণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ; অর্থাৎ যদি শুধুমাত্র কয়লার অপচয় নিবারণ করা যায়, তবে প্রচুর পরিমাণে কয়লা বাঁচিয়া যাইবে।

কয়লা উত্তোলনকার্যে নানাবিধ ত্রুটি থাকায় কয়লার খুব অপচয় হইয়া থাকে। যদি প্রাচীন উত্তোলন পদ্ধতি বর্জন করিয়া আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তবে এই অপচয় অনেকটা দূর করা যাইবে। তাহা ছাড়া যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিলে শ্রমিকগণের উৎপাদন-ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

কয়লাকে সোজাসুজি শক্তি উৎপাদক হিসাবে ব্যবহার করিলেও কয়লার অপচয় ঘটিয়া থাকে ; কারণ ফার্নেসে এক মেঃ টন কয়লা জ্বালাইয়া যে শক্তি উৎপন্ন হয়, ঐ কয়লা দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিলে অনেক বেশী শক্তি পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া কয়লাকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করিলে কয়লা হইতে অনেক রকমের উপজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়। কয়লাকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করিলে শিল্পে ব্যবহৃত জ্বালানির $\frac{2}{3}$ অংশ এবং কয়লা খনিতে ব্যবহৃত জ্বালানির $\frac{8}{৫}$ অংশ সাশ্রয় হয়।

কয়লা উত্তোলনের সময় উহা টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ভারতে উৎপন্ন কয়লার একটা বৃহৎ অংশের খণ্ডগুলির ব্যাসরেখার দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চিরও কম। সুতরাং প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ঝুরা কয়লা দারুণ সমস্যার সৃষ্টি করে। এই কয়লার চাহিদাও খুব কম। ঝুরা কয়লা দিয়া গুল তৈয়ারি করিয়া গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

কয়লা উত্তোলনের আধুনিক পদ্ধতিগুলি ভারতে ক্রমশঃ অবলম্বিত হইতেছে। ইহাতে কয়লার অপচয় অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

বাণিজ্য—ভারত প্রতিবৎসর প্রায় ১৬ লক্ষ মেঃ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি করে। মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ পাঠানো হয় বাংলাদেশে। বাকি অংশ পাকিস্তান, ফ্রান্স, শ্রীলংকা, হংকং, ফিলিপাইনস, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতের পূর্বাংশে অধিকাংশ কয়লাখনি অবস্থিত। সেইজন্য দেশের এই অংশ হইতে চতুর্দিকে কয়লা প্রেরিত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক হইলেও যানবাহনের অভাবে দূরবর্তী স্থানে রেলপথে কয়লা প্রেরণে অসুবিধা সৃষ্টি হইতেছে ; এইজন্য বর্তমানে কয়লাখনির নিকটবর্তী অঞ্চলে সড়ক-পথে কয়লা প্রেরিত হইতেছে। পূর্বে ভারতের কয়লা বহুলাংশে বন্দর মারফত সমুদ্রপথে প্রেরিত হইত।

খনিজ তৈল (Petroleum)

খনিজ তৈল জ্বালানি খনিজ। বর্তমান যুগে শিল্পোন্নতির অন্যতম সোপান খনিজ তৈল। কিন্তু ভারতের তৈল-উৎপাদন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় নগণ্য। বর্তমানে অনুমান করা হয় যে, পূর্ব ভারতে ও গুজরাট অঞ্চলে ১০'৩৬ হাজার বর্গ-কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া তৈলখনি বিদ্যমান। আসামের মাকুম অঞ্চলে ১৮৬৭ সালে প্রথম তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়। এই অঞ্চলের ডিগবয় ভারতের প্রথম তৈল-উৎপাদন কেন্দ্র ও শোধনাগার। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র ডিগবয় হইতেই তৈল পাওয়া যাইত। কিন্তু ডিগবয়ের তৈল চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল বলিয়া ভারতকে অধিকাংশ তৈল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত।

স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা কমিশন তৈল সরবরাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারতে তৈল-উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার এবং আমদানীকৃত ও স্থানীয় তৈল শোধনের জন্য শোধনাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন তৈলখনি আবিষ্কার করিবার জন্য তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন' (Oil & Natural Gas Commission) বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে। রোমানিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়া এই বিষয়ে ভারত সরকারকে কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য দিতে আগাইয়া আসে ; ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন তৈলখনি ইহাদের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় গুজরাটের ক্যাম্বে আঙ্কলেশ্বর ও কালোলে মূল্যবান তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিমাচল প্রদেশের জ্বালামুখী অঞ্চলে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চলে একটি তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এই খনি হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৭·৫ লক্ষ মেঃ টন তৈল উত্তোলিত হইতেছে। আসামের রুদ্রসাগর ও লাকোয়া অঞ্চলেও তৈল উত্তোলিত হইতেছে। 'স্ট্যানভ্যাক' নামক একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে তৈল অনুসন্ধানের কাজ চলে ; কিন্তু ইহা ব্যর্থ হইয়াছে পুনরায় সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় এখানে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হইয়াছে। রাজস্থানের যশলমীর অঞ্চলে তৈল অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে। ত্রিপুরা ও কাশ্মীরে তৈলখনি আছে বলিয়া তৈল-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। এখানে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হইয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্যে ১৯৭১ সালে ক্যাম্বে উপসাগরের সন্নিকটে তৈলকূপ খনন করিয়া আলিয়াবেত নামক স্থানে তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। সাগর সম্রাট' নামক জাহাজ মঞ্চে করিয়া অনুসন্ধান চালাইয়া বোম্বাই দরিয়া অঞ্চলে সমুদ্রতলদেশে বিশাল এলাকায় বিস্তৃত তৈলবাহী স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তৈল উৎপাদন শুরু হইয়াছে। এখানে প্রচুর তৈল পাওয়া যাইতেছে। নলপথে এই তৈল ট্রম্বে আনিবার ব্যাবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দরিয়ায় বঙ্গোপসাগরে এবং অরুণাচল প্রদেশে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শীঘ্রই এই সকল স্থান হইতে তৈল উত্তোলিত হইবে। সৌরাষ্ট্রের উপকূলেও তৈলের অনুসন্ধান চলিতেছে।
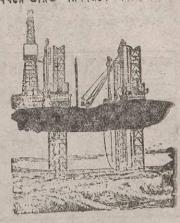
সাগর সম্রাট

আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, গাঙ্গেয় উপত্যকা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চল (তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ ও কেরালা উপকূল) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপে তৈলবাহী স্তর আছে।

উৎপাদক অঞ্চল—সোভিয়েত রাশিয়ার তৈলবিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতে সঞ্চিত খনিজ তৈলের পরিমাণ ৫০০ কোটি মেঃ টন। ১৯৮২ সালে ভারতে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ মেঃ টন খনিজ তৈল উত্তোলিত হইয়াছে।

(ক) বর্তমানে ভারতের সর্বাধিক তৈল উৎপন্ন হয় আসামের তৈলখনি অঞ্চল হইতে। ডিগবয় ভারতের প্রাচীনতম তৈলকেন্দ্র। লক্ষীমপুর জেলায় ডিগবয়, বাপ্পাপুং ও হানসাপুং নামক তিনটি স্থানে প্রধানতঃ ডিগবয়ের তৈল উত্তোলিত হয় ; ডিগবয় অঞ্চলের বাৎসরিক তৈল-উত্তোলনের পরিমাণ ৪ লক্ষ মেঃ টন। সুরমা উপত্যকার বদরপুর, মাসিমপুর ও পাথারিয়া অঞ্চলেও অল্পবিস্তর নিকৃষ্টশ্রেণীর তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের তৈলে মোমের আধিক্য থাকায় ডিগবয় শোধনাগার হইতে কলিকাতা

বন্দর মারফত প্রায় ৩ কোটি টাকার মোমজাতীয় দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। আসামের রুদ্রসাগর, লাকোয়া, নাহারকাটিয়া, মোরান, গেলেকি প্রভৃতি স্থানে নূতন তৈলখনি হইতে তৈল উত্তোলিত হইতেছে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তৈলখনি নাহারকাটিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর প্রায় ২৭৫ লক্ষ মেঃ টন তৈল উত্তোলিত হইতেছে। এই তৈলখনি নলযোগে নূনমাটি ও বারাউনির সহিত সংযুক্ত।

ইহা ছাড়া আসামের রুদ্রসাগরে অন্যতম তৈল খনি অবস্থিত। আসামের শিবসাগর তৈলখনি হইতেও শীঘ্রই তৈল-উত্তোলন আরম্ভ হইবে।

(খ) বর্তমানে পশ্চিম ভারতের গুজরাটের আংকলেশ্বর, কোসাম্বা, কালোল, মেসানা, নওগাম, ঢোলকা, লুনেজ, সানন্দ, কাডি, ওয়াভেল, আমেদাবাদ, বাকল, কাথানা প্রভৃতি স্থানে তৈল পাওয়া যাইতেছে।

গুজরাটের আংকলেশ্বর তৈলখনি হইতে তৈল-উত্তোলন আরম্ভ হইয়াছে। এখানে বাৎসরিক তৈল-উৎপাদনের ক্ষমতা ২০ হইতে ২৫ লক্ষ মেঃ টন। গুজরাটের কালোলে একটি বৃহদাকার তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তৈল উত্তোলিত হইতেছে।

পশ্চিম উপকূলের তৈলখনি

(গ) ১৯৭০ সালে ভারতের ক্যাম্বে উপসাগরে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে তৈলকূপের খনন কার্য শুরু হয় এবং ১৯৭১ সালে আলিয়াবেত নামক স্থানে তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়।

বোম্বাই-এর নিকটবর্তী বোম্বাই দরিয়া অঞ্চলের সমুদ্রের নীচেও তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। আলিয়াবেত ও বোম্বাই দরিয়া হইতে তৈল উত্তোলন ও শোধন শুরু হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের সমুদ্রেও তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

তৈল-শোধনাগার (**Oil Refinery**)—অপরিশ্রুত তৈল (Crude oil) আমদানি করিয়া ভারতে পরিশোধনের ব্যবস্থা করিলে ইহা হইতে নানাবিধ উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় এবং ইহার ফলে তৈলের উৎপাদন খরচ কমিয়া যায়। সেইজন্য ভারতে সরকারী প্রচেষ্টায় এই দেশের বিভিন্ন স্থানে শোধনাগার প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত হয়। বর্তমানে ভারতে ১২টি তৈল-শোধনাগার আছে। উহাদের মধ্যে কেবলমাত্র ডিগবয়ের তৈল-

শোধনাগারটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। অন্যগুলি সরকার পরিচালিত। বার্মাশেলের ট্রম্বে ও ক্যালটেক্সের বিশাখাপতনম তৈল-শোধনাগার ১৯৭৬ সালে সরকার অধিগ্রহণ করিয়াছেন। এই ১২টি তৈল-শোধনাগারে ১৯৮২ সালে মোট ৩ কোটি ২ লক্ষ মেঃ টন অপরিশোধিত তৈল পরিশোধিত হয় উহার মধ্যে ভারতে উৎপন্ন অপরিশোধিত তৈলের পরিমাণ মাত্র ১ কোটি ৯৭ লক্ষ মেঃ টন, বাকী সবটা আমদানীকৃত। নিম্নে ভারতের শোধনাগারগুলির বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) ডিগবয় (Digboi)—ভারতে সর্বপ্রথম খনিজ তৈল পরিশোধিত হয় আসাম অয়েল কোম্পানীর ডিগবয় তৈল-শোধনাগারে। ১৯০১ সালে ইহার উৎপাদন শুরু হয়। স্থানীয় খনি হইতে উত্তোলিত তৈল এইখানে পরিশোধিত হয়। নানাবিধ উপজাত দ্রব্যও এই শোধনাগারে প্রস্তুত হয়। ইহার বাৎসরিক পরিশোধন ক্ষমতা ৫ লক্ষ মেঃ টন।

(২-৩) ট্রম্বে (Trombay)—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্যানভ্যাক-অয়েল কোম্পানী' (বর্তমান ESSO) এবং ব্রিটেনের বার্মাশেল (Burmah-Shell) অয়েল কোম্পানী বোম্বাই শহরের নিকট ট্রম্বে নামক স্থানে দুইটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন করিয়াছে। এই দুইটি তৈল-শোধনাগারে প্রধানতঃ মধ্যপ্রাচ্য হইতে আমদানীকৃত তৈল পরিশোধন করা হয়। বর্তমানে আঙ্কলেশ্বরের তৈলও এখানে পরিশোধিত হয়। এখানে খনিজ তৈলের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যও প্রস্তুত করা হয়। উহাদের মধ্যে এক-টিতে ১৯৫৪ সালে ও অপরটিতে ১৯৫৫ সালে তৈলশোধন শুরু হয়। উহাদের বাৎসরিক তৈল শোধন ক্ষমতা যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ মেঃ টন ও ৫২·৫ লক্ষ মেঃ টন।

(৪) বিশাখাপতনম্ (Visakhapatnam)—ক্যালটেক্স কোম্পানীর তৈল-শোধনাগার এইখানেই অবস্থিত। ইহার পরি-শোধনের ক্ষমতা প্রায় ১৫ লক্ষ মেঃ টন। এখানে ১৯৫৭ সালে তৈল-শোধন আরম্ভ হয়। আমদানীকৃত অপরিস্রুত তৈল এই শোধনাগারে পরিস্রুত হইবার পর দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়।
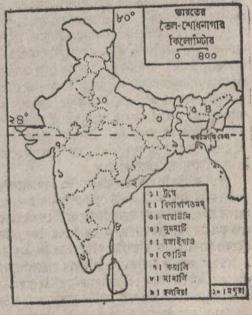
(৫-৬) বারাউনি ও নুনমাটি (Barauni & Nunmati)—তৈল-শিল্পে বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়িগণের আধিপত্যের ফলে ভারতে তৈলশিল্পের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় ভারত সরকার স্বীয় প্রচেষ্টায় তৈলশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করেন। সোভিয়েত রাশিয়া ও রোমানিয়া হইতে অত্যন্ত কম মূল্যে তৈল আমদানি হওয়ায় এবং এই তৈল ব্রিটিশ ও মার্কিন কোম্পানীসমূহ শোধন করিতে অস্বীকার করায় ভারত সরকার 'ভারতীয় শোধনাগার লিমিটেড' (Indian Refineries Ltd.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান

সৃষ্টি করেন। এই প্রতিষ্ঠান রোমানিয়ার কারিগরি ও অর্থসাহায্যে আসামের নূন-মাটিতে (গৌহাটির নিকট) এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে বিহারের বারাউনিতে দুইটি বিশালকায় শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করে। নূনমাটি শোধনাগারে প্রতিবৎসর ৮·৫০ লক্ষ মেঃ টন এবং বারাউনি শোধনাগারে ৩৫ লক্ষ মেঃ টন তৈল পরিশোধিত হইতে পারে। নাহারকাটিয়া হইতে নলপথ (Pipeline) নূনমাটি হইয়া বারাউনি শোধনাগার পর্যন্ত গিয়াছে; এই নলপথটির দৈর্ঘ্য ১,১৬০ কিলোমিটার। ১৯৬২ সালে নূনমাটিতে এবং ১৯৬৪ সালে বারাউনিতে তৈল পরিশোধন শুরু হয়। নাহারকাটিয়ার তৈল এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও রোমানিয়া হইতে আমদানীকৃত তৈল এই দুইটি শোধনাগারে পরিশোধিত হইতেছে।

(৭) **কয়ালি (Koyali** —তৃতীয় পরিকল্পনায় গুজরাটের তৈলখনিসমূহের তৈল-পরিশোধনের জন্য এই রাজ্যের কয়ালিতে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে একটি নূতন শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ১৯৬৫ সালে তৈল-শোধন আরম্ভ হয়। বর্তমানে এখানে ৭৩ লক্ষ মেঃ টন তৈল পরিশোধিত হইতে পারে।

(৮) **কোচিন Cochin**)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিপস্ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী ও ভারত সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় স্থাপিত এই শোধনাগারের পরিশোধনকার্য শুরু হয় ১৯৬২ সালে। বর্তমানে এখানে প্রতিবৎসর প্রায় ৩৩ লক্ষ মেঃ টন তৈল পরিশোধিত হইতে পারে। মধ্য প্রাচ্যের তৈল এখানে পরিশোধিত হয়।

(৯) **মানালি Manali**) – ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন কোম্পানী, প্যান-আমেরিকান ইন্টার-ন্যাশনাল কোম্পানী এবং ভারত সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মাদ্রাজের নিকট এই শোধনাগার স্থাপিত হয়। এখানে ১৯৬৯ সালে তৈল শোধন আরম্ভ হয়। ইহার পরিশোধন ক্ষমতা ২৮ লক্ষ মেঃ টন। এখানকার উপজাত দ্রব্যের মধ্যে গন্ধক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১০) **হলদিয়া (Haldia**)—কলিকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলের কাছাকাছি হুগলী ও হলদি নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত এই বন্দরে ভারত সরকার ফরাসী ও রোমানিয়ার সহায়তায় একটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৭৫ সালে এই শোধনাগারে তৈল শোধন শুরু হয়। এখানে প্রায় ২৫ লক্ষ মেঃ টন তৈল প্রতি বৎসর পরিশোধিত হইতে পারে।

(১১) বঙ্গাইগাঁও (Bongaigaon)—১৯৭২ সালে আসামের বঙ্গাইগাঁও নামক স্থানে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি তৈল-শোধনাগার স্থাপনের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ মেঃ টন। নাহারকাটিয়া ও মোরাণের তৈল-খনির তৈল এখানে পরিশোধিত হইবে। আসামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য এখানকার উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে।

(১২) সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় নির্মিত মথুরায় অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম তৈল-শোধানাগারটিতে উৎপাদন কার্য শুরু হইয়াছে। এই শোধনাগারে বৎসরে ৫০ লক্ষ মেঃ টন অপরিশোধিত তৈল শোধন করা যাইবে।

ইহা ছাড়াও ট্রম্বেতে Esso-এর সহযোগিতায় ১৯৭০ সালে পিচ্ছিলকারক তৈল পরিশোধনের জন্য একটি শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। লিউব ইন্ডিয়া লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে ইহার কাজ চলিতেছে। ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা ১·৬৪ লক্ষ মেঃ টন। তাহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুব্রিজল কর্পোরেশনের সহায়তায় ভারত সরকার বিশেষ ধরনের পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার জন্য একটি কারখানা স্থাপন করেন। ইহার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬ লক্ষ মেঃ টন। সম্প্রতি সোঃ রাশিয়ার সহযোগিতায় নির্মিত মথুরায় অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম তৈল শোধনাগারটিতে উৎপাদন কার্য শুরু হইয়াছে। এই শোধনাগারে বৎসরে ৬০ লক্ষ মেঃ টন অপরিশোধিত তৈল শোধন করা যাইবে।

বাণিজ্য—ভারত চিরকাল তৈলের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তৈলের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪০ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহার তুলনায় ১৯৮২ সালে অপরিশোধিত তৈল উৎপন্ন হইয়াছে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ মেঃ টন এবং আমদানীকৃত অপরিশোধিত তৈল সহ তৈল পরিশোধিত হইয়াছে মাত্র ৩ কোটি ১ লক্ষ মেঃ টন। বঙ্গাইগাঁওয়ের উৎপাদন শুরু হওয়ায় বর্তমানে ভারতে তৈল পরিশোধনের ক্ষমতা দাঁড়াইয়াছে ৩৬৭ লক্ষ মেঃ টন। চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এখনও পরিশোধিত তৈল আমদানি করিতে হইতেছে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারত প্রায় সমগ্র পরিস্রুত (Refined) তৈল ও উপজাত দ্রব্য আমদানি করিত বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অধিক ব্যয় হইত। বর্তমানে দেশে শোধনাগার স্থাপিত হওয়ায় সুলভে অপরিস্রুত তৈল আমদানি করা হয়। ইহা ছাড়া সোভিয়েত রাশিয়া ও রোমানিয়া হইতে অত্যন্ত কম মূল্যে তৈল আমদানি হওয়ায় মার্কিন ও ব্রিটিশ একচেটিয়া তৈল কোম্পানীগুলিও তৈলের মূল্য বহুলাংশে কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া গিয়াছে। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া, রোমানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইরান, ইরাক, বাহরিন, সৌদি-আরব, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ভারত তৈল আমদানি করে। তৈল ও উপজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত হইয়াছে সরকার নিয়ন্ত্রিত 'ভারতীয় তৈল কর্পোরেশন' (Indian Oil Corporation)-এর উপর। এখনও ভারতের তৈল ব্যবসায়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ তৈল কোম্পানীসমূহের কর্তৃত্ব বহুলাংশে বিদ্যমান। ১৯৮১-৮২ সালে ভারতে ৫,১৮৯ কোটি টাকা মূল্যের পরিস্রুত ও অপরিস্রুত খনিজ তৈল আমদানি করা হয়। ভারত কিছু কিছু পেট্রোলজাত দ্রব্য রপ্তানি করিতেছে; ১৯৮১-৮২ সালে রপ্তানীকৃত খনিজ জ্বালানি ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের মূল্য ছিল প্রায় ২৪·৩ কোটি টাকা।

ব্যবহার—ভারতে উৎপন্ন অপরিশোধিত খনিজ তৈল ও আমদানীকৃত খনিজ তৈল হইতে পেট্রোলিয়াম, উচ্চমানের জ্বালানি তৈল, ডিজেল, কেরোসিন ও পিচ্ছিলকারক তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ বিমান, বাস, লরি, রেলইঞ্জিন, মোটর সাইকেল, স্কুটার প্রভৃতি চালাইতে, আলো ও স্টোভ জ্বালাইতে ব্যবহৃত হয়। খনিজ তৈলের অভাব হইলে পরিবহণ-ব্যবস্থা প্রায় অচল হইয়া পড়িবে। বিভিন্ন প্রকারের তৈল ছাড়াও প্যারাফিন (মোম), রং, বার্নিস, প্লাস্টিক, কৃত্রিম রবার, অ্যালকোহল, জ্বালানি গ্যাস, নাইলন ও টেরিলিন জাতীয় কৃত্রিম তন্তু, সুগন্ধি দ্রব্য, অ্যাসফ্যাল্ট প্রভৃতি খনিজ তৈলের উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়।

ভারতের তৈল উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম বলিয়া এই দেশে কৃত্রিম তৈল (Synthetic fuel oil) প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইক্ষুর গুড় প্রস্তুতের সময় সুরাসার (Alcohol) পাওয়া যায়; বর্তমানে এই দেশে প্রায় ৫ কোটি লিটার সুরাসার প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পেট্রোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোটরগাড়িতে ব্যবহার করা যায়। তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কটে প্রচুর লিগনাইট পাওয়া যায়। এই লিগনাইট হইতে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করা যায়। এই সকল উপায়ে কৃত্রিম তৈলের উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে ভারতে খনিজ তৈলের আমদানির পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে এবং খনিজ তৈলের সমস্যার কিছুটা সমাধান হইবে।

লৌহ আকরিক (Iron Ore)

লৌহ ধাতব খনিজ। বর্তমান যুগে লৌহ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধাতু। বর্তমান শিল্পপ্রধান সভ্যতার মূলে রহিয়াছে এই ধাতু। যন্ত্রপাতির উৎপাদন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ সকলই লৌহের সাহায্যে সংঘটিত হইয়াছে। বিহার, গোয়া, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে লৌহ আকরিক সঞ্চিত আছে। ভারতে সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের মোট পরিমাণ ১,২৬৩ কোটি মেঃ টন (পৃথিবীর মোট লৌহভাণ্ডারের শতকরা ২৫ ভাগ)। কিন্তু উৎপাদনে এখনও ভারত পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থানে পড়িয়া আছে। এখানকার লৌহ আকরিকের মধ্যে হেমাটাইট জাতীয় আকরিকের পরিমাণ ১,০১৭ কোটি মেট্রিক টন এবং ইহাতে লৌহের পরিমাণ কোনো কোনো স্থানে শতকরা ৬৫ ভাগেরও অধিক। কিন্তু ইউরোপের দেশসমূহের আকরিকে লৌহের পরিমাণ শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ ভাগ। ভারতের লৌহখনির নিকট কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। সেইজন্য লৌহ আকরিক হইতে কাঁচা লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করিতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই কারণে এখানকার লৌহ-খনির নিকটবর্তী স্থানে বড় বড় ইস্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের লৌহ শিল্পের উন্নতির জন্য অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাজত্বকালে লৌহ বা ইস্পাত উৎপাদনের দিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কারণ কম মূল্যে লৌহ আকরিক ব্রিটেনে লইয়া যাওয়া এবং উচ্চমূল্যে লৌহদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি ব্রিটেন হইতে এই দেশে আমদানি করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের মূলনীতি। সেইজন্য ব্রিটেনের চাহিদার অতিরিক্ত লৌহ আকরিক উৎপাদন করার দিকে সরকারের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে লৌহ আকরিকের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতের লৌহ আকরিক উৎপাদনের প্রধান সমস্যা এই যে, যান্ত্রিকীকরণের অভাবে উৎপাদনের পরিমাণ সঞ্চিত আকরিকের পরিমাণের তুলনায় অনেক কম; তাহাছাড়া মোট উৎপন্ন লৌহ আকরিক ব্যবহার করিবার মতো শিল্প এখনও এই দেশে গড়িয়া ওঠে নাই। স্বাধীনতার পূর্ববর্তিকালের তিনটি ইস্পাত কারখানা ছাড়াও ভিলাই, রাউরকেলা, দুর্গাপুর ও বোকারোতে আরও চারিটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কারখানার চাহিদা মিটাইয়া এখনও প্রচুর লৌহ আকরিক বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। যথেষ্ট পরিমাণে কোক-কয়লা এখনও এই দেশে পাওয়া যায় না। কোক কয়লার অভাবে অধিক পরিমাণে লৌহ আকরিক গলানো সম্ভব নহে। সেইজন্য লৌহ আকরিক রপ্তানি করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। তবে লৌহ আকরিক রপ্তানি যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই মঙ্গল।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে অধিকাংশ লৌহ আকরিক ওড়িশা, বিহার, গোয়া, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে পাওয়া যায়।

ভারতের লৌহ আকরিক উৎপাদন (১৯৮২)

৪ কোটি ৯ লক্ষ মেঃ টন

ওড়িশা	৯৯ লক্ষ মেঃ টন	কর্ণাটক	৩৫ লক্ষ মেঃ টন
বিহার	৭৮ ”	অন্ধ্র প্রদেশ	১২ ”
গোয়া	৭৭ ”	মহারাষ্ট্র	৯ ”
মধ্য প্রদেশ	৫৫ ”	অন্যান্য	৪৪ ”

ওড়িশা—ভারতের লৌহ আকরিক উৎপাদনে ওড়িশা প্রথম স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যের উৎপাদন ভারতের মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ। এই রাজ্যে কেওনঝাড় জেলার অন্তর্গত বাগিয়াবুরু অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ইহার নিকটেই ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথরের খনি বিদ্যমান। ময়ূরভঞ্জ জেলার গুরুমহিশানি, সুলাইপাত ও বাদাম পাহাড় অঞ্চলে এবং বোনাই পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই রাজ্যের কিরিবুরু অঞ্চলের খনি হইতে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে এবং বিশাখাপতনম্ ও পারাদিপ বন্দর মারফত জাপানে রপ্তানি হইতেছে। ওড়িশার খনিসমূহের সহিত টাটানগর, বার্নপুর ও রাউরকেলার ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রগুলি রেলপথ দ্বারা যুক্ত। ওড়িশা হইতে প্রচুর লৌহ আকরিক এই রেলপথে বিভিন্ন ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

বিহার—ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ লৌহ আকরিক উৎপন্ন করিয়া বিহার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যের সিংভূম জেলার অন্তর্গত নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, বুদাবুরু ও পানশিরাবুরু অঞ্চলের লৌহখনিসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে উৎকৃষ্ট হেমাটাইট জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের লৌহ টাটানগর, দুর্গাপুর, বোকারো ও অন্যান্য ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রে রেলপথের মারফত প্রেরিত হয়।

গোয়া অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয়।

মধ্য প্রদেশে দুর্গ জেলায় প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। বাস্তার অঞ্চলেও লৌহখনি বিদ্যমান। ডাল্লি ও রাজহারা পর্বতে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই রাজ্যের অধিকাংশ লৌহ আকরিক ভিলাই ইস্পাত কারখানায় প্রেরিত হয়।

কর্ণাটকের বাবাবুদান পর্বত, সাঁদুর ও বেল্লারী অঞ্চলে প্রচুর হেমাটাইট-জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই লৌহ ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানায় প্রেরিত হয়। কয়লার অভাবে এখানে কাঠকয়লা ও জলবিদ্যুৎ দ্বারা লৌহ গলানো হয়।

অন্ধ্র প্রদেশে নেল্লোর, কুড্ডাপা ও কুর্ণুল অঞ্চলে, **তামিলনাড়ুর** তিরুচিরাপল্লী ও সালেম জেলায় এবং **মহারাষ্ট্রের** রত্নগিরি ও চান্দা জেলায় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে অল্পবিস্তর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

বাণিজ্য—শিল্পে উন্নত না হওয়ায় পূর্বে ভারতের লৌহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত কম ছিল। ইস্পাত শিল্পের প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানকার অধিকাংশ লৌহ বিদেশে রপ্তানি হইত। টাটানগর ও বার্নপুরে ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যায়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের উন্নতি হওয়ায় এবং এই দেশ শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ায় লৌহের চাহিদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতে বর্তমানে ৭টি ইস্পাতের কারখানা আছে এবং আরও চারিটি নির্মিত হইতেছে। ভারতে লৌহ আকরিকের উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই চাহিদা মিটাইয়াও রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন খনির সহিত বন্দরের সরাসরি যোগসাধন করিয়া লৌহ আকরিকের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বন্দরের উন্নতিসাধনের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ৫৮ ভাগ লৌহ আকরিক জাপানে প্রেরিত হয়; বাকী অংশ পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, ইটালি ও পূর্ব জার্মানীতে

রপ্তানি হইয়া থাকে। অধিকাংশ লৌহ আকরিক কলিকাতা ও ওড়িশার পারাদিপ বন্দর মারফত রপ্তানি হইয়া থাকে। লৌহের রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার ভার বর্তমানে 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন' (State Trading Corporation) নামক একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ভারতের লৌহ রপ্তানি সবটাই ইহার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। সম্প্রতি ইটালির সহযোগিতায় গোয়া রাজ্যে একটি লৌহ কারখানা স্থাপিত হইতেছে। ইহার ফলে ইটালিতে লৌহ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

'জাতীয় খনি উন্নয়ন কর্পোরেশন লিঃ' (National Mineral Development Corporation Ltd.) নামক একটি সরকারী কোম্পানী ভারতের লৌহ খনির উন্নতিসাধনের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালাইতেছে। এই কোম্পানী কর্ণাটকের দোণীমালাই ও কুদ্রামুখ অঞ্চলে লৌহ আকরিক উত্তোলনের বন্দোবস্ত করিতেছে।

তাম্র
(Copper)

তাম্র ধাতব খনিজ। প্রাচীন কাল (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ সাল) হইতে ভারতে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। পূর্বে এখানকার তাম্র দেশীয় প্রথায় নিষ্কাশিত হইত এবং ইহা দ্বারা দেব-পূজায় ব্যবহৃত বাসনপত্র প্রস্তুত হইত। বিদ্যুৎ শক্তি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে তাম্র প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ পরিবহণের তার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে। ইহা ছাড়া এই দেশে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তারের জন্য এবং রেলইঞ্জিন ও জাহাজ নির্মাণের জন্যও তাম্র ব্যবহৃত হয়। ভারতের শিল্পোন্নতির সঙ্গে এই সকল দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাম্রের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে পিতলের দ্রব্যাদি ও মুদ্রা প্রস্তুত করিতেও তাম্র ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রচুর তাম্র প্রয়োজন হয়। ভারতের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন খুবই কম। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় ভারতের তাম্র-উৎপাদন নগণ্য। অন্যান্য

শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভারতের তাম্রের চাহিদা এখনও অনেক কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি ৮ কিলোগ্রাম এবং ব্রিটেনে ৭ কিলোগ্রাম তাম্র ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ভারতে ব্যবহৃত হয় জনপ্রতি মাত্র '১১ কিলোগ্রাম। ভারতে সঞ্চিত আকরিক তাম্রের আনুমানিক পরিমাণ ৪০ কোটি মেঃ টন এবং ঐ আকরিক হইতে ৫১ লক্ষ মেঃ টন ধাতব তাম্র নিষ্কাশিত হইতে পারে। ভারতে তাম্রশিল্পের প্রধান সমস্যা এই যে এখানকার খনিজ তাম্র হইতে তিন শতাংশের বেশী ধাতব তাম্র পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া ভারতীয় তাম্রের সহিত নিকেল মিশ্রিত থাকায় অধিকাংশ তাম্র হইতে বৈদ্যুতিক তার নির্মাণ করা কষ্টকর।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে তাম্রের উৎপাদন প্রায় একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ—বিহারের সিংভূম অঞ্চলে। প্রায় ৩,০০০ বৎসর পূর্বে এখানে তাম্র উত্তোলিত হইলেও রাজনৈতিক কারণে ইহার উত্তোলন বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমান যুগে ১৮৩৯ সালে William Jones পুনরায় এই খনিটি আবিষ্কার করেন। এখানে ২৭ বর্গ-কিলোমিটার স্থান ব্যাপিয়া ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি তাম্র-খনি বিদ্যমান। মোসাবনি, ঘাটশিলা ও ধোবানি এই অঞ্চলে প্রধান তাম্র-উত্তোলন কেন্দ্র। Indian Copper Corporation Ltd. নামক একটি ব্রিটিশ কোম্পানী এই সকল তাম্রখনির মালিক ছিল। ভারত সরকার এই কোম্পানীটি অধিগ্রহণ করিয়াছেন। ঘাটশিলার নিকট মহুভাণ্ডারে এই কোম্পানীর একটি তাম্র গালাইবার কারখানা আছে। সম্প্রতি সিংভূমের নিকট রোম সিদেশ্বরে একটি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজস্থানের ক্ষেত্রী ও রাখা, মধ্য প্রদেশের মালঞ্জখণ্ড, বিহারের হাজারিবাগ, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ, কল্যাডি ও থিনথিনি এবং অন্ধ্র প্রদেশের অগ্নিগুণ্ডালায় তাম্রখনি আছে। ইহা ছাড়া গুজরাট, ওড়িশা ও সিকিম রাজ্যে অল্প পরিমাণ তাম্র সঞ্চিত আছে। বর্তমানে ক্ষেত্রীতে একটি সরকারী তাম্র কারখানায় তাম্র উৎপাদন শুরু হইয়াছে। ইহা ভারতের দ্বিতীয় তাম্র কারখানা। ভারতে ১৯৮২ সালে ২০ লক্ষ ১৮ হাজার মেঃ টন আকরিক তাম্র উত্তোলিত হইয়াছে।
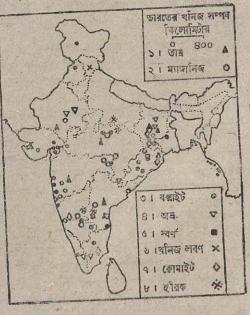
বাণিজ্য—ভারতে চাহিদার তুলনায় তাম্রের উৎপাদন অত্যন্ত কম। এই দেশে বৎসরে মাত্র ২৪,০০০ মেঃ টনের কাছাকাছি ধাতব তাম্র পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার বর্তমান চাহিদা প্রায় ১,২৫,০০০ মেঃ টন। সেইজন্য প্রতি বৎসর প্রায় ১২৫ কোটি টাকা মূল্যের তাম্র আমদানি করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মোট আমদানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয়। বাকী অংশ আসে ব্রিটেন, কানাডা, চিলি ও বেলজিয়াম হইতে।

ম্যাঙ্গানিজ
(Manganese)

ম্যাঙ্গানিজ ধাতব খনিজ। ইহা প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত শক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া এনামেল, ব্লিচিং পাউডার, কাচ ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার জন্যও ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন। ইস্পাত প্রস্তুত করিতে ম্যাঙ্গানিজ অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া সকল শিল্পোন্নত দেশেই ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুখের বিষয় ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে; সোভিয়েত রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই ভারতের স্থান। স্বাধীনতার পর ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ ৮ কোটি মেঃ টন।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের মধ্যে অধিকাংশ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ও সংকর-ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী এবং অল্প পরিমাণ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ভারতে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে প্রায় ৮০,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

ভারতের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন—১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার মেঃ টন (১৯৮২)

ওড়িশা	৫ লক্ষ মেঃ টন	মহারাষ্ট্র	২ লক্ষ মেঃ টন
কর্ণাটক	৪ " "	গুজরাট	১ " "
মধ্য প্রদেশ	২ " "	অন্ধ্র প্রদেশ	১ " "

বর্তমানে ওড়িশা রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের গাঙ্গপুর, বোনাই, কেওনঝাড় ও সুন্দরগড় অঞ্চলে অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশে ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ বালাঘাট, জব্বলপুর, ছিন্দওয়ারা ও ঝাবুয়া অঞ্চলে। মহারাষ্ট্রের নাগপুর, পাঁচমহল, ছোট উদয়পুর ও ভাণ্ডারা অঞ্চলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলম ও বিশাখাপতনম্ অঞ্চলে, কর্ণাটকের বেলারি, শিমোগা ও চিত্রদুর্গ জেলায়, বিহারের কালাহান, সিংভূম ও চাইবাসা অঞ্চলে এবং গোয়াতে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। বিশাখাপতনমে বন্দর স্থাপিত হওয়ায় মধ্য প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, এই বন্দর মারফত কম রেল ভাড়ায় বিদেশে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করা সহজসাধ্য। (১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

বাণিজ্য—ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের প্রধান ক্রেতা। অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন বলিয়া ভারতের ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি বহুলাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও মজুতের উপর নির্ভর করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালি ও জাপান ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের অন্যান্য আমদানিকারক দেশ। ব্রাজিল, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতার ফলে এই সকল দেশেও ভারতের ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি হইতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন ৩২ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ১৩ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে।

উৎপাদনের তুলনায় ভারতে ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা অত্যন্ত কম—মাত্র ৯০,০০০ মেঃ টন। সেইজন্য ম্যাঙ্গানিজ-শিল্পের উন্নতি রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভর করে। ভারতে ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন-খরচ না কমাইতে পারিলে বিদেশে সাফল্যের সহিত রপ্তানি বৃদ্ধি করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব হইবে না। এইজন্য ভারতের খনি-মালিকদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ বিশাখাপতনম্ বন্দর মারফত রপ্তানি হইয়া থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মার্মাগাঁও বন্দরও কিছু পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করে।

বক্সাইট
(Bauxite)

বক্সাইট ধাতব খনিজ ; ইহা হইতে প্রধানতঃ অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। বর্তমান যুগে অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। ইহা প্রধানতঃ বিমানপোত নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বাসস্থান, মোটরগাড়ি ও বাসনপত্র প্রস্তুত করিতেও অ্যালুমিনিয়াম প্রয়োজন। খাদ্য সংরক্ষণে ও ফটোগ্রাফিতে ইহা একান্ত প্রয়োজন। তাম্র, নিকেল, দস্তা প্রভৃতির সহিত ইহা মিশাইয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। বক্সাইট, কোরান্ডাম ও কায়ানাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হইলেও ইহার মধ্যে বক্সাইটের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে প্রচুর সুলভ বিদ্যুৎ (সাধারণতঃ জলবিদ্যুৎ) প্রয়োজন বলিয়া এবং ব্রিটিশ রাজত্বকালে জলবিদ্যুতের উৎপাদন কম থাকায় এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। সেইজন্য অধিকাংশ বক্সাইট বিদেশে রপ্তানি হইত। বর্তমানে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে সঞ্চিত সকল রকমের বক্সাইটের আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ২৪০ কোটি মেঃ টন। চাহিদার উপর বক্সাইটের উৎপাদন নির্ভরশীল। ভারতে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বক্সাইটের উৎপাদনও বাড়িয়া গিয়াছে; ১৯৮২ সালে ১৮ লক্ষ ৫৪ হাজার মেঃ টন বক্সাইট উৎপন্ন হইয়াছে।

বিহার, গুজরাট, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুতে বক্সাইটের খনি আছে। অন্ধ্র প্রদেশ, কেরালা, উত্তর প্রদেশ এবং গোয়ায় বক্সাইট পাইবার সম্ভাবনা আছে।

বিহারের লোহারডাঙ্গা (রাঁচী) অঞ্চলে, ওড়িশার সম্বলপুর জেলায়, তামিলনাড়ুর সালেম অঞ্চলে, মধ্য প্রদেশের বালাঘাট, মান্দলা ও জব্বলপুরে, কর্ণাটকের বাবাবুদান পাহাড়ে, মহারাষ্ট্রের থানা অঞ্চলে, গুজরাটের কৈরা ও জামনগরে এবং কাশ্মীরে অধিকাংশ বক্সাইট পাওয়া যায় (১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। অন্ধ্র প্রদেশ, গোয়া, কেরালা ও উত্তর প্রদেশে বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; এই সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট পাইবার সম্ভাবনা আছে।

বাণিজ্য—ভারতে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বক্সাইটের চাহিদা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও পূর্বে এই দেশ হইতে বক্সাইট বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইত, কিন্তু বর্তমানে রপ্তানির পরিমাণ কম। আসানসোল, আলয়ে, বেলুড়, মুরী, কালোয়া, মেতুর, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে অ্যালুমিনিয়াম শিল্প উন্নতিলাভ

করায় বক্সাইটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। (ভারতের শ্রমশিল্পের অন্তর্গত 'অ্যালুমিনিয়াম' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।)

অভ্র (Mica)

অভ্র একটি অধাতব খনিজ দ্রব্য। ভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভ্র উৎপাদক দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অভ্র এই দেশে উৎপন্ন হয়।

প্রাচীনকালে ভারতে ঔষধ-প্রস্তুত কার্যে ও সাজসজ্জার জন্য অভ্র ব্যবহৃত হইত। বর্তমান যুগে অভ্র প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক শিল্পে। বেতার, বিমানপোত ও মোটরগাড়ি-নির্মাণ শিল্পের ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। তাপের বিকিরণ রোধ করিতে অভ্র একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া প্রতিমার সাজ ও অলংকার প্রস্তুতকার্যে, চুল্লীর জানালা নির্মাণে, তাপরক্ষক প্রলেপ-নির্মাণে, রং প্রস্তুত করিতে অভ্র ব্যবহৃত হয়। এইজন্য অভ্রের চাহিদা সর্বত্র বিদ্যমান; বিশেষতঃ শিল্পোন্নত দেশে প্রচুর পরিমাণ অভ্র প্রয়োজন। ভারতে অভ্র-শিল্পে প্রায় ২ লক্ষ লোক কাজ করে।

উৎপাদক অঞ্চল—প্রধানতঃ তিনটি রাজ্যে অভ্র পাওয়া যায়—বিহার, রাজস্থান ও অন্ধ্র প্রদেশ। বিহার রাজ্যের হাজারিবাগ, গয়া, মুঙ্গের ও মানভূম জেলায় ৯৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ২৩ কিলোমিটার প্রশস্ত অভ্রখনি বিদ্যমান। ভারতে মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ অভ্র বিহারের এই অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। এখানকার অভ্র অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর রুবী জাতীয় বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। অন্ধ্র প্রদেশের নেল্লোর জেলার গুড়ুর, কভালী, আত্মাকুর ও রাজপুরে ৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৬ কিলোমিটার প্রশস্ত অভ্রখনি বিদ্যমান। এখানকার অভ্র ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং বিহারের অভ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। রাজস্থানের আজমীর ও জয়পুর অঞ্চলে প্রচুর অভ্র পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের অভ্র রপ্তানিযোগ্য করিবার জন্য বিহারে প্রেরিত হয়। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে, কর্ণাটকের হাসান জেলায় এবং কেরালার ইরানিয়াল অঞ্চলে অল্পবিস্তর অভ্র পাওয়া যায়। (১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ১৯৮২ সালে ভারতে ১২.৯৬১ মেঃ টন অভ্র উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য—উৎপাদনের অনুপাতে ভারতের নিজস্ব অভ্রের চাহিদা অত্যন্ত কম। সেই জন্য অধিকাংশ অভ্র বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পঃ জার্মানী, জাপান ও ফ্রান্স ভারতীয় অভ্রের প্রধান আমদানিকারক। এই সকল দেশ ছাড়াও নেদারল্যান্ডস্, ইটালি, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ভারত হইতে অভ্র আমদানি করে।

অভ্র রপ্তানি করিয়া ভারত ১৯৮১-৮২ সালে প্রায় ২৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে। সম্প্রতি কানাডা ও ব্রাজিল হইতে ব্রিটেন কিছু পরিমাণ অভ্র আমদানি করায় ভারতের রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। আমদানিকারক দেশসমূহে সম্প্রতি কৃত্রিম অভ্র প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং ভারতের অভ্রের উৎপাদন-খরচ কৃত্রিম অভ্রের উৎপাদন-খরচ অপেক্ষা কম রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া ভারতে বৈদ্যুতিক শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারাও অভ্রের স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সম্প্রতি ঝুমরী-তিলায়া অঞ্চলে একটি অভ্রসংক্রান্ত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; সরকারী আওতায় ভূপালেও একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয়

অভ্র শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য এবং রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে 'অভ্র রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা' (Mica Export Promotion Council) গঠন করেন। ভারতের অধিকাংশ অভ্র (৮৫%) কলিকাতা বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। ইহা ছাড়া মাদ্রাজ (১৪%) ও বোম্বাই বন্দরও (১%) অভ্র রপ্তানি করে।

চুনাপাথর (Limestone)

চুনাপাথর অধাতব পদার্থ। লৌহ গলাইতে চুনাপাথর একান্ত প্রয়োজন। সিমেন্ট প্রস্তুত করিতে, খনিজ সীসা গলাইতে ও পাকাবাড়ি নির্মাণ করিতেও চুনাপাথরের দরকার হয়। বর্তমানে ভারতে চুনাপাথরের উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫ সালে মাত্র ৬২ লক্ষ মেঃ টন চুনাপাথর উৎপন্ন হয়, কিন্তু ১৯৮২ সালে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ মেঃ টন চুনাপাথর এই দেশে উৎপন্ন হইয়াছে।

বিহারের সাহাবাদ, হাজারিবাগ, সিংভূম ও পালামৌ জেলায়, মধ্য প্রদেশের দুর্গ, বিলাসপুর ও ইয়োটমল জেলায়, রাজস্থানের বুঁদি, যোধপুর ও উদয়পুর জেলায়, ওড়িশার সুন্দরগড়, সম্বলপুর ও কোরাপুট জেলায়, অন্ধ্র প্রদেশের কুর্ণুল জেলায়, তামিলনাড়ুর সালেম জেলায়, কর্ণাটকের শিমোগা জেলায় অধিকাংশ চুনাপাথরের খনি বিদ্যমান। চুনাপাথর স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয় হয় বলিয়া ইহার আমদানি-রপ্তানি হয় না বলিলেই চলে।

ভারতের অন্যান্য খনিজ সম্পদ

স্বর্ণ (Gold)—ইহা ধাতব খনিজ। খনিজ প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে অধিকাংশ স্বর্ণ মিশ্রিত থাকে। নদী উপত্যকার বা নদীগর্ভের বালুকণার মধ্যেও অল্প পরিমাণে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রস্তুতকার্যে অধিকাংশ স্বর্ণ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন শিল্পে ও ঔষধ প্রস্তুত করিতেও স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর মোট স্বর্ণ উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২ ভাগ স্বর্ণ ভারতে পাওয়া যায়। এই দেশে ১৯৮২ সালে মোট স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২,২০৮ কিলোগ্রাম। ইহার মূল্য প্রায় ২৪·৭৭ কোটি টাকা। ভারতের স্বর্ণ-উত্তোলনের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। সেইজন্য অল্পবিস্তর স্বর্ণ এই দেশে আমদানি করা হয়। ভারতের অধিকাংশ স্বর্ণ (প্রায় ৯৯%) কর্ণাটকের কোলার জেলার কোলার ও রায়চুর জেলার হুট্টি স্বর্ণখনিতে পাওয়া যায় (১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই খনির প্রস্তরের মধ্য হইতে স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। কর্ণাটক জেলায় আনুমানিক ৪১,৬৯০ কিঃ গ্রাঃ স্বর্ণ সঞ্চিত আছে। অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুর জেলার রামগিরি স্বর্ণখনিতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্য প্রদেশের নদীগর্ভে এবং নদী-উপত্যকায় বালুকণার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়।

রৌপ্য (Silver)—ইহা ধাতব খনিজ। তাম্র, স্বর্ণ ও সীসকের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় সাধারণতঃ রৌপ্য পাওয়া যায় ; কোনো কোনো খনিতে শুধু রৌপ্যও পাওয়া

যায়। অলঙ্কার, মুদ্রা, তৈজসপত্র ও ঔষধ প্রস্তুতকার্যে রৌপ্য ব্যবহৃত হয়। ভারতে অল্প পরিমাণ রৌপ্য পাওয়া যায়। তথাপি ১৯৬৫-৬৬ সাল হইতে অল্প পরিমাণ রৌপ্য প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। বিহারের সিংভূম অঞ্চলে, রাজস্থানের জাওয়ারে এবং কর্ণাটকে অন্যান্য ধাতুর সহিত রৌপ্য পাওয়া যায়। ১৯৮২ সালে মাত্র ১৪,৫০৪ কিলোগ্রাম রৌপ্য উৎপন্ন হইয়াছে।

হীরক (Diamond)—প্রাচীনকাল হইতে ভারতে হীরক পাওয়া যায়; কিন্তু বর্তমানে ভারতে অতি অল্প পরিমাণে হীরক উৎপন্ন হয়। ১৯৮২ সালের বাৎসরিক উৎপাদন ১২,৯১৩ ক্যারেট মাত্র। ইহার মূল্য প্রায় ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। মধ্য প্রদেশের পান্না, ছাতারপুর ও সাতনা জেলার খনিতে, অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুর, কুড্ডাপা, কৃষ্ণা ও কুর্ণুল জেলায়, উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায়, কর্ণাটকের বেল্লারী জেলায় সামান্য পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়। ভারত সরকার সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতায় মধ্য প্রদেশে মাজগাওয়ান অঞ্চলে একটি নূতন খনি হইতে হীরক উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। (১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

ক্রোমাইট (Chromite)—ক্রোমাইট ধাতব খনিজ। এই খনিজ পদার্থ হইতে ক্রোমিয়াম প্রস্তুত হয়। উজ্জ্বল এবং তাপরোধক ও অম্লরোধক ক্রোম স্টীল প্রস্তুত করিতে ক্রোমিয়াম ব্যবহার করা হয়। চামড়া পাকা করিতে, কাচ কলাই করিতে এবং রং ও ঔষধ প্রস্তুত করিতে ক্রোমিয়াম ব্যবহৃত হয়। মাটির সহিত ক্রোমিয়াম মিশ্রিত করিয়া যে ইট প্রস্তুত হয়, উহা তাপ সহনশীল চুল্লী-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সর্বপ্রকারের সঞ্চিত ক্রোমাইটের মোট পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৮২ সালে প্রায় ৩·৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রোমাইট খনি হইতে উত্তোলিত হয়। বিহার, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও তামিলনাড়ু রাজ্যের ক্রোমাইট খনিজ উল্লেখ-যোগ্য। কর্ণাটক রাজ্যের শিমোগা ও হাসান অঞ্চলে, ওড়িশার কেওনঝাড় ও কটক জেলায় এবং বিহারের সিংভূম অঞ্চলে অধিকাংশ ক্রোমাইট পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিহারের রাঁচি ও ভাগলপুরে, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং কাশ্মীরে কোনো কোনো স্থানে অল্প পরিমাণ ক্রোমাইট পাওয়া যায় (১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

পূর্বে ভারতের অধিকাংশ ক্রোমাইট ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হইত। ভারতে ইস্পাত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রোমাইটের রপ্তানি কমিয়া আসিতেছে। ভারত সরকার বর্তমানে ক্রোমাইট রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

লবণ (Salt)—ভারতে সাধারণতঃ তিনপ্রকার লবণ পাওয়া যায়; সমুদ্রের জল শুকাইয়া, অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও মৃত্তিকা হইতে এবং খনি হইতে এখানে লবণ উৎপন্ন হয়। গুজরাটের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী সামুদ্রিক লবণ উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ু, কেরালা, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থানে সমুদ্রের জল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রকার লবণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন হ্রদের জল হইতে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয়। রাজস্থানের সম্বর হ্রদ, যোধপুরের দিদেয়ানা ও ফালোদি হ্রদ ও বিকানীরের লুণকরণসার হ্রদ হইতে লবণ সংগৃহীত হয়। হিমাচল প্রদেশের মণ্ডী অঞ্চলের লবণ-খনি হইতে খনিজ লবণ ও সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায় (১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

পূর্বে এডেন, পাকিস্তান ও লোহিত সাগরের বিভিন্ন বন্দর হইতে ভারত লবণ আমদানি করিত। কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়ে ভারত স্বাবলম্বী হইয়াছে। এই দেশে বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ভারতে চাহিদা মাত্র ২৪ লক্ষ মেঃ টন। সেইজন্য বর্তমানে ভারত জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালে লবণ রপ্তানি করিতেছে।

মোনাজাইট (Monazite)—খনি হইতে যে মোনাজাইট উত্তোলিত হয় তাহা হইতে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। গ্যাস ও অন্যান্য বাতির ম্যান্টল্ প্রস্তুত করিতে ও আণবিক শক্তি উৎপাদনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ মোনাজাইট ভারতে পাওয়া যায়। কেরালা, ওড়িশা, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ইহা প্রধানতঃ পাওয়া যায়। এই দ্রব্য আণবিক শক্তি উৎপাদনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্তমানে ভারত সরকার ইহার রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ইলমেনাইট (Ilmenite)—ইলমেনাইট আকরিক হইতে টাইটানিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। এই ধাতু শুধু রং প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভারতে ইহা পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বালুকারাশির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সঞ্চিত ইলমেনাইটের আনুমানিক পরিমাণ ১৩ কোটি ৮ লক্ষ মেঃ টন। কেরালা রাজ্যে কুমারিকা অন্তরীপের নিকট ভারতের মোট উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ ইলমেনাইট পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ুতে কিছু ইলমেনাইট পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতে বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ মেঃ টন ইলমেনাইট উত্তোলিত হয়। ইলমেনাইট উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারত তৃতীয় স্থান এবং রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ভারতীয় ইলমেনাইটের প্রধান আমদানিকারক।
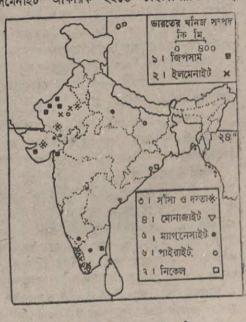
ম্যাগনেসাইট (Magnesite)—ম্যাগনেসাইট আকরিক হইতে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। ইহা কাচ, সিমেন্ট, কাগজ, রং প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সঞ্চিত ম্যাগনেসাইটের আনুমানিক পরিমাণ ৫২ কোটি ৪১ লক্ষ মেঃ টন। এখানে ১৯৮২ সালে ৪ লক্ষ ৭ হাজার মেঃ টন ম্যাগনেসাইট আকরিক উত্তোলিত হয়। কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুর সালেম অঞ্চলে ও উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলায় অধিকাংশ ম্যাগনেসাইট পাওয়া যায়। রাজস্থান ও বিহারেও ইহা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইউরোপীয় দেশসমূহে ইহা রপ্তানি করা হয়।

সিলিমানাইট (Sillimanite)—ভারতে সঞ্চিত সিলিমানাইটের আনুমানিক পরিমাণ ৩·৫ লক্ষ মেঃ টন। মেঘালয়ের সোনাপাহাড় ও মধ্য প্রদেশের পিপ্‌রা অঞ্চলে সিলিমানাইট পাওয়া যায়। কেরালা ও তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী বালুকারাশির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সিলিমানাইট পাওয়া যায়। ১৯৮২ সালে ভারতে প্রায় ১৩ হাজার মেঃ টন সিলিমানাইট উৎপন্ন হইয়াছে।

কায়ানাইট (Kyanite)—ভারতে কায়ানাইটের আনুমানিক সঞ্চয় ৩৪ লক্ষ মেঃ টন। বিহার, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও ওড়িশাতে ইহা পাওয়া যায়। বিহারের সিংভূম জেলায় লাপসাবুরুতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ কায়ানাইট সঞ্চিত আছে। ১৯৮২ সালে ৩৪ হাজার মেঃ টন কায়ানাইট উৎপন্ন হইয়াছে।

জিপসাম (Gypsum)—বিভিন্ন শিল্পে ইহা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কাগজ, সিমেন্ট ও সারের কারখানায় ইহা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সঞ্চিত জিপসামের আনুমানিক পরিমাণ ১২০ কোটি ৪৫ লক্ষ মেঃ টন। রাজস্থানের বিকানীর, যোধপুর ও যশলমীর অঞ্চলে, জম্মু ও কাশ্মীরে এবং তামিলনাড়ুতে জিপসাম পাওয়া যায়। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন খনি হইতে এই দেশে প্রায় ৯ লক্ষ ৭০ হাজার মেঃ টন জিপসাম উত্তোলিত হয়।

টাংস্টেন (Tungsten)—ইহা ধাতব খনিজ। ভারতে উলফ্রাম হইতে টাংস্টেন ধাতু নিষ্কাশিত হয়। রাজস্থানের যোধপুর, বিহারের কালিমাটি ও মধ্য প্রদেশে উলফ্রামে টাংস্টেন পাওয়া যায়।

রাং (Tin)—ইহা ধাতব খনিজ। ভারতে অতি অল্প পরিমাণে রাং পাওয়া যায়। মালয়েশিয়া ও ব্রহ্মদেশ হইতে রাং আমদানি করিয়া এই দেশের চাহিদা মিটানো হয়। বিহারের হাজারিবাগ জেলায় অল্পবিস্তর রাং পাওয়া যায়।

দস্তা ও সীসা (Zinc & Lead)—এই দুইটি ধাতব খনিজ। গুজরাট ও রাজস্থানে, অন্ধ্র প্রদেশের অগ্নিগুণ্ডালা ও ওড়িশার সরগিপল্লেতে সীসা সঞ্চিত আছে। ভারতে যে সামান্য দস্তা ও সীসা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ উত্তোলিত হয় রাজস্থানের জাওয়ার ও বাজারি অঞ্চলে। সীসা শোধন করা হয় ধানবাদের নিকট টুণ্ডু নামক স্থানে ও অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপতনমে। দস্তা শোধন করা হয় রাজস্থানের দেবারিতে, অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপতনমে ও কেরালার আলয়ে নামক স্থানে (১০৭ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। রাজস্থান ও গুজরাটে দস্তার খনি আছে।

নিকেল (Nickel)—ওড়িশার কটক ও ময়ূরভঞ্জ জেলায় নিকেল আকরিক পাওয়া যায়। ভারতে সঞ্চিত নিকেলের পরিমাণ ৫ কোটি ৮১ লক্ষ মেঃ টন।

অ্যাস্‌বেস্‌টস (Asbestos)—ইহা একটি তন্তুময় খনিজ দ্রব্য। তাপ ও বিদ্যুৎ প্রতিরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহার করা হয়। গৃহাদি নির্মাণে এবং তাপ বিকিরণের আবরক হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কর্ণাটকের বাঙ্গালোর অঞ্চলে, রাজস্থানের আজমীর অঞ্চলে এবং অন্ধ্র প্রদেশের কুড্ডাপা জেলায় সামান্য অ্যাস্‌-বেস্‌টস পাওয়া যায়। ভারতে বৎসরে মাত্র ২৪,৫০০ মেঃ টন অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ইহা আমদানি করিতে হয়।

শোরা (Saltpetre)—খাদ্য সংরক্ষণে, বারুদ প্রস্তুত করিতে, কাচ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে এবং সার হিসাবে শোরা ব্যবহৃত হয়। উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যে অধিকাংশ শোরা পাওয়া যায়। ভারতীয় শোরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, শ্রীলংকা, মরিশাস ও চীনে রপ্তানি হয়।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Give a detailed account of the distribution of coal producing areas in India. What are the important uses of coal in the country? [H. S. Examination, 1979]

(ভারতের মুখ্য কয়লা-উৎপাদক স্থানগুলির অবস্থান সবিস্তারে বর্ণনা কর। ভারতে কয়লা প্রধানতঃ কি কি ব্যবহারে লাগে ?)

উঃ—'কয়লা' (৮৯—৯২ পৃঃ) হইতে লিখ।

2. What are the main uses of coal in India ? Describe the geographical distribution of major coal-fields of the country. [H. S. Examination, 1982]

(ভারতের কয়লা প্রধানতঃ কিরূপে ব্যবহার করা হয় ? এই দেশের প্রধান প্রধান কয়লা খনির ভৌগোলিক বণ্টন সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

উঃ—'ভারতে কয়লার ব্যবহার' (৯০ পৃঃ) এবং 'উৎপাদক অঞ্চল' (৯০—৯২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Examine the distribution of coal-fields in India. What steps have been taken to develop coal-mining industry in India during the last twenty five years ?

(ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কয়লাখনিসমূহ অবস্থিত তাহা পর্যালোচনা কর। বিগত ২৫ বৎসরে ভারতের কয়লা উত্তোলন শিল্পের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?)

উঃ—'কয়লা' (৮৯—৯২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Give the Geographical distribution of the oil-fields in India. Mention the progress of petroleum refining industry in this country. [H. S. Examination, 1973]

(ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর। তৈলশোধন শিল্পে ভারতের অগ্রগতির রূপরেখা বর্ণনা কর।)

উঃ—'খনিজ তৈল' হইতে 'উৎপাদক অঞ্চল' (৯৩—৯৪ পৃঃ) ও 'তৈল শোধনাগার' (৯৪—৯৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. Write short notes explaining the following : There are a number of refineries in India though she produces small amount of petroleum. [H. S. Examination, 1979]

(নিম্নলিখিত বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : ভারতে অনেকগুলি খনিজ তৈল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, যদিও এই দেশে খনিজ তৈল অল্পই উৎপাদিত হয়।)

উঃ—'খনিজ তৈল' (৯২—৯৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Give an account of the distribution of oil-fields of India and describe the measures adopted to augment mineral oil production in this country. [H. S. Examination, 1983]

(ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির অবস্থান বিষয়ে আলোচনা কর এবং খনিজ তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই দেশে যে সকল প্রচেষ্টা লওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ কর।)

উঃ—'খনিজ তৈল' (৯২—৯৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. Examine the present position and future prospects of Indian petroleum mining and petroleum refining industry.

[Specimen Question, 1978]

(ভারতের পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও পেট্রোলিয়াম পরিশোধন শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পর্যালোচনা কর।)

উঃ—'খনিজ তৈল' (৯২—৯৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

8. Give the geographical distribution of oil-fields and refineries of India. Is India self-sufficient in petroleum production ?

[H. S. Examination, 1980]

(ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির এবং তৈলশোধনাগারগুলির ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা কর। খনিজ তৈল উৎপাদনে ভারত কি স্বয়ংসম্পূর্ণ ?)

উঃ—'খনিজ তৈল' (৯২—৯৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. Examine the distribution of oil-fields in India. Give the present position and future prospects of oil-refining industry in this country. [Specimen Question, 1930]

(ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে তৈলখনিসমূহ অবস্থিত, তাহা পর্যালোচনা কর। এই দেশের তৈল পরিশোধন শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে লিখ।)

উঃ—'খনিজ তৈল' হইতে 'উৎপাদক অঞ্চল' (৯৩—৯৪ পৃঃ) ও 'তৈলশোধনাগার' (৯৪—৯৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10. Write an account of the iron-ore producing regions of India. Discuss its role in the development of industries in this country.

[H S. Examination, 1984]

(ভারতের লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও। এই দেশের শিল্পায়নে ইহার অবদান আলোচনা কর।)

উঃ—'লৌহ আকরিক' (৯৮—১০০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. Mention the uses of Iron. Give the location of Iron-ore mining centres in India. [Tripura H. S. Examination, 1981]

(লৌহের ব্যবহার উল্লেখ কর। ভারতের লৌহ খনিগুলির অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা কর)।

উঃ—১ম খণ্ডের লৌহ আকরিক হইতে 'ব্যবহার' এবং ২য় খণ্ডের লৌহ আকরিক হইতে 'উৎপাদক অঞ্চল' (৯৮—৯৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

12. Name the places where the following minerals are found in India and describe the uses to which they are put—(a) Iron ore, (b) Bauxite, (c) Copper, (d) Manganese, (e) Mica.

[B. U. Univ. Ent. 1931]

(ভারতের যে সকল স্থানে নিম্নলিখিত খনিজ দ্রব্যসমূহ পাওয়া যায় তাহাদের

নাম এবং তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখ।—(ক) লৌহ আকরিক, (খ) বক্সাইট, (গ) তাম্র, (ঘ) ম্যাঙ্গানিজ, (ঙ) অভ্র।

উঃ—'লৌহ আকরিক' (৯৮—১০০ পৃঃ), 'বক্সাইট' (১০০—১০৪ পৃঃ), 'তাম্র' (১০০—১০১ পৃঃ), 'ম্যাঙ্গানিজ' (১০২—১০৩ পৃঃ) ও 'অভ্র' (১০৪—১০৫ পৃঃ) লিখ।

13. What are the principal uses of Aluminium ? Give a detailed account of the Bauxite producing areas in India.

[H. S. Examination, 1980]

(অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান ব্যবহারগুলি কি কি ? ভারতের বক্সাইট উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দাও।)

উঃ—প্রথম খণ্ডের 'অ্যালুমিনিয়াম' হইতে 'ব্যবহার' লিখ এবং 'ভারতের খনিজ সম্পদ হইতে 'বক্সাইট' (১০৩—১০৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

14. (a) Describe the uses of copper and mica. (b) Name the areas in India where these are mined. [H. S. Examination, 1981]

[(ক) তাম্র ও অভ্রের ব্যবহারের বর্ণনা দাও। (খ) ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে এইগুলি উত্তোলন করা হয় তাহাদের নাম লিখ।]

উঃ—'তাম্র' (১০০—১০১ পৃঃ) ও 'অভ্র' (১০৪—১০৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write notes on the following :

(a) The uses of Coal in India ;
(b) Bombay High ;
(c) Sagar Samrat.

[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) ভারতে কয়লার ব্যবহার ; (খ) বোম্বাই দরিয়া ; (গ) সাগর সম্রাট।]

উঃ—(ক) 'ভারতে কয়লার ব্যবহার' (৯০ পৃঃ) ; (খ) ও (গ) 'খনিজ তৈল' (৯০—৯৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

2. Write short notes on explaining the following statement :

There are a number of refineries in India though she produces small amount of petroleum. [H. S. Examination, 1979]

(নিম্নলিখিত বিবৃতিটির কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর :

ভারতে অনেকগুলি খনিজ তৈল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে যদিও এই দেশে খনিজ তৈল অল্পই উৎপাদিত হয়।)

(উঃ—'খনিজ তৈল' (৯২—৯৭ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

C. Objective Questions

1. Give the correct answers from the following :

(i) In India, mineral oil was first refined in the Trombay/Digboy/Nunmati/Barauni refinery.

(ii) India occupies the Fifth/Seventh/First place in the world in the production of mica.

(iii) Coal is mined in Raniganj region/Panagarh region.
[H. S. Examination, 1978]

(iv) India's largest oil refinery is under construction at Kanpur/Mathura/Haldia. [H. S. Examination, 1982]

(v) West Bengal is rich in coal/manganese/iron ore.
[H. S. Examination, 1983]

(vi) Karanpura has bauxite/iron-ore/coal mines.
[H. S. Examination, 1984]

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখ :
(i) ভারতে সর্বপ্রথম খনিজ তৈল পরিশোধিত হয় ট্রম্বে/ডিগবয়/নুনমাটি/বারাউনি তৈল-শোধনাগারে।
(ii) অভ্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে পঞ্চম/সপ্তম/প্রথম স্থান অধিকার করে।
(iii) কয়লা রানীগঞ্জ অঞ্চলে/পানাগড় অঞ্চলে খনন করা হয়।
(iv) ভারতের বৃহত্তম তৈল-শোধনাগারটি কানপুরে/মথুরায়/হলদিয়াতে গড়িয়া উঠিতেছে।
(v) কয়লা/ম্যাঙ্গানিজ/লৌহ-আকরিক উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।
(vi) করণপুরায় বক্সাইট/লৌহ-আকরিক/কয়লা খনি আছে।]

2. Insert tick mark (√) against the correct sentences and cross mark (×) against the incorrect sentences :

(a) About 50% of India's total coal production comes from Bihar. (b) Raniganj is the principal coal-mining region in West Bengal. (c) Ankleswar of Assam is the first oil producing centre and oil refinery in India. (d) A big oil-mine in Gujarat is Kalol. (e) An oil refinery has been set up at Haldia. (f) Bihar occupies the first place in India in the production of iron-ore. (g) Copper mine is situated in Singhbhum district in Bihar. (h) Bihar is the largest producer of manganese in India. (i) The producing regions of bauxite are Lohardanga in Bihar and Sambalpur in Orissa (j) India is producing mica more than three quarters of the world's total production. (k) Diamond is available in Kolar.

[শুদ্ধ বাক্যের পাশে √ (টিক) চিহ্ন এবং ভুল বাক্যের পাশে × (ক্রশ) চিহ্ন দাও : (ক) ভারতে মোট উৎপন্ন কয়লার প্রায় অর্ধেক বিহারে উৎপন্ন হয়। (খ) রানীগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য কয়লা খনি অঞ্চল। (গ) আসামের আঙ্কলেশ্বর ভারতের প্রথম তৈল উৎপাদনকেন্দ্র ও তৈল শোধনাগার। (ঘ) গুজরাটের কালোলে একটি বৃহদাকার তৈলখনি আছে। (ঙ) হলদিয়ায় একটি তৈল-শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। (চ) ভারতে লৌহ আকরিক উৎপাদনে বিহার প্রথম স্থান অধিকার করে। (ছ) বিহারের সিংভূম জেলায় তাম্রখনি আছে। (জ) বিহার রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হয়। (ঝ) বিহার রাজ্যের লোহারডাঙ্গা অঞ্চলে ও ওড়িশার সম্বলপুর জেলায় বক্সাইট পাওয়া যায়। (ঞ) পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অভ্র ভারতে উৎপন্ন হয়। (ট) কোলারে হীরক পাওয়া যায়।]

পঞ্চম অধ্যায়

জলশক্তি, জলবিদ্যুৎ ও বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা

(Water-power, Hydro-electricity and Multipurpose River Valley Projects)

জলবিদ্যুৎ

প্রস্তাবনা— খরস্রোতা নদী, জলপ্রপাত, ঝরনা ইত্যাদির জলের বেগে টারবাইনের চাকা ঘুরাইয়া ডায়নামোর মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয় উহাকে জলবিদ্যুৎ বলে। ডায়নামোর মধ্যে বৈদ্যুতিক চুম্বক থাকে। প্রবহমান জলের দ্বারা সৃষ্ট যান্ত্রিক শক্তি (**Mechanical energy**) এই বৈদ্যুতিক চুম্বক দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিতে (**Electrical energy**) পরিণত হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে উচ্চমানের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও সুদক্ষ কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন। সেইজন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রারম্ভিক ব্যয় অত্যন্ত অধিক। কিন্তু একবার উৎপাদন শুরু হইলে ব্যয় অনেক কমিয়া যায়। কারণ এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোনো পৌনঃপুনিক কাঁচামালের প্রয়োজন হয় না, শুধু মূল্যহীন জলের প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে জলবিদ্যুৎ তাপবিদ্যুৎ অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে পাওয়া যায়। ভারতের মত দরিদ্র দেশে জলবিদ্যুৎ একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের অপর্যাপ্ত জলশক্তি হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিপাতের কোনো অভাব এই দেশে নাই ; নদী, খাল প্রভৃতি অধিকাংশ সময়েই জলপূর্ণ থাকে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের এই সকল অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা ভারতে বিদ্যমান। অবশ্য বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য ও জলপ্রবাহ সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় এদেশে কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করিয়া অধিকাংশ স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে হয়। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ আমলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা হয় নাই।

এদেশ হইতে কাঁচামাল রপ্তানি করা এবং ব্রিটেন হইতে শিল্পজাত দ্রব্য এদেশে আমদানি করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের মূল নীতি। জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করিয়া ব্রিটেনে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার চিরকাল উদাসীন ছিল। ব্রিটিশ সরকার কোলার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ আহরণের তাগিদে ১৯০০ সালে শিবসমুদ্রমে প্রথম জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। জনমতের চাপে ১৯১৮ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইল। কিন্তু অনুসন্ধানের ফল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে ইহার কাজ চাপা পড়িয়া গেল। টাটা কোম্পানীর প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উৎপাদন-কেন্দ্র এবং টাটা কোম্পানীর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ছাড়া অন্য কোনো স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ কোনো চেষ্টা হয় নাই। উত্তর ভারতে ছোটোখাটো কয়েকটি উৎপাদন-কেন্দ্র বহুদিন পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা— ভারতের সঞ্চিত কয়লা ও খনিজ তৈলের

পরিমাণ খুব বেশী নহে। ক্রমক্ষীয়মাণ এই সকল শক্তিসম্পদের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে দ্রুত শিল্পোন্নতির জন্য শক্তিসম্পদের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রামাঞ্চলে গার্হস্থ্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ও কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য এবং শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সুলভ শক্তিসম্পদের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য (গভীর ও অগভীর নলকূপ চালনায়) এবং রেলগাড়ি চালাইবার কাজে সুলভ জলবিদ্যুতের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। ভারতের মত নদীমাতৃক বিশাল ও জনবহুল দেশে একমাত্র জলশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াই শক্তিসম্পদের বিপুল চাহিদা সুলভে মিটান সম্ভব। এই সকল কারণে ভারতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের জলশক্তি—ভারতের প্রচ্ছন্ন জলশক্তির পরিমাণ ৪ কোটি কিলোওয়াটের অধিক। জলশক্তিতে ভারত পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সোভিয়েত রাশিয়া ও জায়েরের পরেই ভারতের স্থান। জলশক্তির ৬০ শতাংশ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলসহ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যমান। আবার ইহার অর্ধাংশ উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রহ্মপুত্র নদ, মণিপুর নদ ও তায়ো (Tyao) নদীর অববাহিকায় সঞ্চিত আছে; ইহার এক-চতুর্থাংশ ভারতের অন্তর্গত সিন্ধু ও উহার উপনদীগুলিতে সঞ্চিত রহিয়াছে এবং ইহার বাকী এক চতুর্থাংশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বিদ্যমান।

ভারতের প্রচ্ছন্ন জলশক্তির ২০ শতাংশ সঞ্চিত আছে দক্ষিণ ভারতের পূর্ববাহিনী নদ-নদীগুলিতে এবং অবশিষ্ট ২০ শতাংশ দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের পশ্চিম-বাহিনী নদ-নদীগুলিতে বিদ্যমান। নিম্নে ভারতের বিভিন্ন নদী-অববাহিকার প্রচ্ছন্ন জলবিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ তালিকাবদ্ধ করা হইল :

ভারতের প্রচ্ছন্ন জলবিদ্যুৎ শক্তি

নদী অববাহিকার নাম	জলবিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ
ব্রহ্মপুত্র	১২৫ লক্ষ কিলোওয়াট
গঙ্গা	৪৮ „ „
সিন্ধু	৬৬ „ „
মধ্য ভারতের নদ-নদী	৪৩ „ „
দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদ-নদী	৪৪ „ „
দক্ষিণ ভারতের পূর্ববাহিনী নদ-নদী	৮৬ „ „
	মোট—৪১২ „ „

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীগুলি তুষারগলা জলে উৎপন্ন ও পুষ্ট নহে; এখানকার নদীগুলি শুধু বর্ষাকালেই বৃষ্টির জলে পুষ্ট থাকে। সেইজন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে অসুবিধা হয়। তবুও প্রধান শক্তিসম্পদ কয়লার অভাব থাকায় এই অঞ্চলেই ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হইয়াছিল এবং এখনও পর্যন্ত উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে বেশী জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing areas)—স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। কয়লার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা ও খনিজ

তৈলের অভাবের জন্য এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে কুটীরশিল্পের উন্নতি, জলসেচের বন্দোবস্ত ও রেলগাড়ি চলাচলের জন্য জলবিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা ভারত সরকার বহন করিতেছেন। বহু ইঞ্জিনীয়ার বিদেশ হইতে আনয়ন করা হইতেছে। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান। সুতরাং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে না।

১৯৮২ সালে ভারতে প্রায় ১১৫.৬ লক্ষ কিলোওয়াট (১১.৬ হাজার মেগা-ওয়াট) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান কেন্দ্রগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বেকার পুরাতন কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মারফত সৃষ্ট কেন্দ্রসমূহ।

কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাবের জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রথম জলবিদ্যুতের উৎপাদন শুরু হয়। দক্ষিণ ভারতের খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাত, পশ্চিমঘাটের অত্যধিক বৃষ্টিপাত, উন্নতিশীল শিল্পাঞ্চলের চাহিদা এখানকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করিয়াছে। জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই অঞ্চলে কূপ হইতে জলসেচের জন্য জল তোলা হয়। বিভিন্ন শিল্পেও এই জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে পরিকল্পনা-পূর্ববর্তী যুগে নির্মিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বিবরণ দেওয়া হইল :

মহারাষ্ট্র রাজ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে নির্গত নদীগুলির জলস্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। লোনাভলার হ্রদে বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া খোপলিতে, অন্ধ্র নদীতে বাঁধ দিয়া কৃত্রিম হ্রদে জল সঞ্চয় করিয়া ভীবপুরীতে এবং নীলামুলা নদীর জলস্রোত হইতে ভীরাতে টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক এজেন্সী ২.৭৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ১৯১৫ সালে ইহার কাজ শুরু হয়। এই বিদ্যুৎ দ্বারা ট্রাম, রেল ও বিভিন্ন শিল্প চালিত হয়।

কর্ণাটক রাজ্যে কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে শিবসমুদ্রমে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া কোলার স্বর্ণখনিতে সরবরাহ করা হয়। ইহাই ভারতের একটি প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। ইহার কাজ ১৯০২ সালে আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া এই রাজ্যে সীমুসা ও যোগ জলপ্রপাত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

তামিলনাড়ু রাজ্যের নীলগিরি জেলায় পাইকারা নদীর জলপ্রপাত হইতে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এই নদীর জলের সাহায্যে ময়ার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রটি পরিচালিত হয়। কাবেরী নদীর উত্তরে মেত্তুরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বাঁধ স্থাপন করা হইয়াছে। মেত্তুরে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ এখানকার বিভিন্ন শিল্পে সরবরাহ করা হয়। তাম্রপর্ণী নদীর জলপ্রপাত হইতে পাপনাশনে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

কেরালা রাজ্যে মুদীরপুঝা নদীর জলপ্রপাত হইতে পল্লীভাসালে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া এখানকার অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পে সুলভে সরবরাহ করা হয়।

উত্তর ভারতের নদীগুলিতে বৎসরের প্রায় সকল সময় জল থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক জলপ্রপাত না থাকায় কৃত্রিম হ্রদে জল সঞ্চয় করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে হয়।

ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এই অঞ্চলে যন্ত্রশিল্পের প্রসার হওয়ায় এখানে বিদ্যুতের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। উত্তর ভারতে পরিকল্পনা-পূর্ববর্তী যুগের কেন্দ্রসমূহের মধ্যে কাশ্মীরের ঝিলাম নদীর জলস্রোত হইতে বরমূলার নিকট অবস্থিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবের উল নদীর জলস্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া বিভিন্ন শহরে (লুধিয়ানা ও অমৃতসর) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

যোগীন্দ্রনগর বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে ১২,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উত্তর প্রদেশে গঙ্গা নদীর বিভিন্ন খালের জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এখানে বাহাদুরাবাদ, হরিদ্বার, ভোলা, মোহম্মদপুর, সালওয়া, পালরা, সুমেরা প্রভৃতি স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে নির্মিত হইয়াছে এইরূপ অনেকগুলি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। নিম্নে উহাদের নাম দেওয়া হইল:

জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত সালাল ও নিম্ন ঝিলাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প;

হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত শতদ্রু-বিপাশা সংযোগ ও বয়রা-সিউল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র;

উত্তর প্রদেশে অবস্থিত যমুনা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প;

মণিপুরে অবস্থিত লোগতাক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র;

কর্ণাটকে অবস্থিত সরাবতী ও যোগ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ;

অন্ধ্র প্রদেশে অবস্থিত নিম্ন ও উচ্চসিলেরু, শ্রীশৈলম ও মাচকুন্দ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ;

তামিলনাডুতে অবস্থিত কুণ্ডা, পেরিয়ার ও কোদায়ার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ;

কেরালায় অবস্থিত ইডুক্কি, শবরীগিরি, কুট্টিয়াডি ও সোলায়ার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

ইহাদের মধ্যে সরাবতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, নিম্ন ও উচ্চ সিলেরু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, শ্রীশৈলম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, কুণ্ডা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও ইডুক্কি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এখন করা হইতেছে। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্পগুলির মধ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হইল :

ভাকরা-নাঙ্গাল, তুঙ্গভদ্রা, কোশী, হীরাকুদ, রিহাণ্ড, চম্বল, দামোদর, ময়ূরাক্ষী, ককরাপার, পারাম্বিকুলম-আলিয়ার, তাওয়া, উকাই, গিরনা, পেরিয়ার, ভদ্রা, মালপ্রভা ইত্যাদি।

নিম্নে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির তালিকা দেওয়া হইল :

অঞ্চল/রাজ্য	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (মেগাওয়াট)
উত্তরাঞ্চল		
ভাকরা-বিপাশা	ভাকরা রাইট	৬০০.০
ম্যানেজমেন্ট বোর্ড	ভাকরা লেফট	৪৫০.০
	গাঙ্গোয়াল	৭৭.৫
	কোটলা	৭৭.৫
বিপাশা কনস্ট্রাকশন	ডিহার	৬৬০.০
বোর্ড	পঙ্	২৪০.০
হিমাচল প্রদেশ	গিরি বাটা	৬০.০
	বাসশি	৪৫.০
	বয়রা সিউল	১২০.০
জম্মু ও কাশ্মীর	নিম্ন ঝিলাম	১০৫.০
	সালাল হাইডেল	৭১.৪
রাজস্থান	রানা প্রতাপ সাগর	১৭২.০
	জওহর সাগর	৯৯.০
পাঞ্জাব	সানান	৫১.০
	UBDC	৪৫.০
উত্তর প্রদেশ	রিহাণ্ড	৩০০.০

অঞ্চল/রাজ্য	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (মেগাওয়াট)
উত্তর প্রদেশ	যমুনা স্টেজ II	২৪০·০
	যমুনা স্টেজ I & V	১১৪·০
	চিল্লা	১০৮·০
	ওবরা	৯৯·০
	গঙ্গা ক্যানাল	৪৫·২
	খতিমা	৪১·৪
	মাটাটিলা	৩৯·০
	রাম গঙ্গা	১৯৮·০
	অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ	৪,০৪৯·৮
পশ্চিমাঞ্চল		
গুজরাট	উকাই	৩০০·০
মধ্য প্রদেশ	গান্ধী সাগর	১১৫·০
মহারাষ্ট্র	কয়না	৮৮০·০
	টাটা	২৭৬·০
	ভাইতেরণ্য	৬০·০
	অন্যান্য	৪৭·০
	অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ	১,৬৭৮·০
দক্ষিণাঞ্চল		
অন্ধ্র প্রদেশ	নিম্ন সিলেরু	৪০০·০
	উচ্চ সিলেরু	১২০·০
	মাচকুন্দ	১১৪·৭
	নাগার্জুন সাগর	২১০·০
	তুঙ্গভদ্রা ড্যাম	৭২·০
	নিজাম সাগর	১০·০
কর্ণাটক	সরাবতী	৮৯১·০
	কালীনদী	২৭০·০
	যোগ	১২০·০
	ভদ্রা	৩৩·২
	শিবসমুদ্রম	৪২·০
	শিমসাপুরা	১৭·২

অঞ্চল/রাজ্য	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (মেগাওয়াট)
কর্ণাটক	মুনিরাবাদ	২৭·০
	লিঙ্গনামাক্কি	৫৫·০
কেরালা	ইডুক্কি	৩৯০·০
	শবরি গিরি	৩০০·০
	কুট্টিয়াডি	৭৫·০
	শোলায়ার	৫৪·০
	সেঙ্গুলাম	৪৮·০
	নেরিয়া মঙ্গলম	৪৫·০
	পল্লী ভাসাল	৩৭·০
	পোরিঙ্গল	৩২·০
	পান্নিয়ার	৩০·০
তামিলনাড়ু	কুণ্ডা I—V	৫৩৫·০
	মেত্তুর	২৪০·০
	পেরিয়ার	১৪০·০
	কোদায়ার 1 & 2	১০০·০
	শোলায়ার 1 & 2	৯৫·০
	পাইকারা	৭০·০
	আলিয়ার	৬০·০
	সরকার পথী	৫০·০
	মোয়ার	৩৬·০
	সুরুলিয়ার	৩৫·০
	পাপনাশনম্	২৮·০
	অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ	৪,৭৬২·৬
পূর্বাঞ্চল		
বিহার	কোশী	১৫·০
	সুবর্ণরেখা	১৩০·০
দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন	মাইথন	৬০·০
	পাঞ্চেৎ	৪০·০
	তিলাইয়া	৪·০
ওড়িশা	বালিমেলা	৩৬০·০
	হীরাকুদ	২৭০·০
পশ্চিমবঙ্গ	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন কেন্দ্র	৩৩·০

অঞ্চল/রাজ্য	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (মেগাওয়াট)
সিকিম	নিম্ন লাগায়াপ	১২.০
	অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ	৯২৪.০
উত্তর-পূর্বাঞ্চল মেঘালয় ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড	কর্দম কুলাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন কেন্দ্র " " " "	৬০.০ ৬৫.২ ১১.৫
	অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ—	১৩৬.৭
	সর্বমোট উৎপাদনের পরিমাণ—	১১,৫৫১.৬

বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, ভারতে এখনও পর্যাপ্ত জলসেচের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেও ভারতের স্থান অনেক নীচে। স্বাধীনতা পাইবার পর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। নদীর উপর বাঁধ দিয়া বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের বন্দোবস্ত করা হইলে তাহাকে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বলে। নদীর উপর বাঁধ দিয়া কিভাবে কি কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে উহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

নদীর উপর কংক্রীটের বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া একটি জলাশয় বা কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করা হয়। এই জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। জলাশয় হইতে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে জল ছাড়িয়া জলের গতিবেগে টারবাইন ঘুরাইয়া জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী সকল অবস্থা ভারতে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া কৃত্রিম হ্রদে মৎস্য চাষ করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীর জলের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাতে বন্যানিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য হয়। বাঁধ নির্মাণে ও অন্যান্য কাজে এখানে বহু লোক আসিয়া জড় হয় এবং এই সকল অঞ্চল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। ইহার ফলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইয়া থাকে। পার্বত্য অঞ্চলেই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করা হইয়া থাকে। এই সকল স্থান খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। বাঁধ নির্মাণের ফলে এখানে জনবসতি স্থাপিত হয়। বহু লোক অবসর বিনোদনের জন্য এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এখানে আসিয়া অস্থায়িভাবে বাস করে। এখানে বৃক্ষাদি রোপণ, পথ নির্মাণ ইত্যাদি কাজও হইয়া থাকে।

বৃক্ষাদি রোপণের ফলে ভূমিক্ষয় নিবারিত হয়। নদীর উপর বাঁধ দিয়া এইভাবে বহু উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এইজন্য এই সকল পরিকল্পনাকে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বলে। পূর্বে মানুষ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই যে, নদী হইতে এত উপকার সাধিত হইতে পারে। অবশ্য এই সকল পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে বহু কোটি টাকা ও সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। এই সকল পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে বহু ইঞ্জিনিয়ার আনা হইয়াছে এবং সরকার এই সকল পরিকল্পনার যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেছেন। ভারতের প্রধান প্রধান বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project)

চীনের হোয়াংহো নদীর মতো দামোদরকে সকলে দুঃখের নদী বলিয়া জানিত। ইহার বন্যার স্রোতে বহু লোকের জীবনহানি ঘটিয়াছে, বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে এবং পল্লীবাংলার বহু ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। দামোদর নদের উপর বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন, জলসেচ, বন্যা-রোধ, মৎস্য-চাষ ও নৌ-চলাচলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে দামোদর-উপত্যকা কর্পোরেশন (Damodar Valley Corporation বা D. V. C.) নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়া উহার উপর এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

দামোদর নদ ৫৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ। বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির পালামৌ জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া বিহারের মালভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয়া ২১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিয়া এই নদ পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলী নদীর সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। বিহারের হাজারিবাগ, পালামৌ, রাঁচি, মানভূম এবং সাঁওতাল পরগনা জেলার উপর দিয়া দামোদর উচ্চ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদের নিম্নাংশে পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমির কৃষি-

প্রধান অঞ্চল ও বিখ্যাত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। উচ্চ দামোদরের তীরে প্রচুর কাষ্ঠ, লাক্ষা, কয়লা, বক্সাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে দামোদরের তিনটি শাখানদীর (বরাকর, বোকারো ও কোনার) উপর বাঁধ (Dam) দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে বরাকর নদীর উপর তিলাইয়া ও মাইথন বাঁধ, কোনার নদীর উপর কোনার বাঁধ এবং দামোদর নদের উপর পাঞ্চেৎ বাঁধ ও উহাদের সংলগ্ন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। দামোদর নদের উপর আয়ার ও বার্মো বাঁধ, বোকারো নদীর উপর বোকারো বাঁধ এবং বরাকর নদীর উপর বলপাহাড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল; ইহাদের কাজ আপাততঃ স্থগিত আছে।

তিলাইয়া বাঁধ নির্মিত হয় ১৯৫৩ সালে; ইহার দৈর্ঘ্য ৩৬৬ মিটার এবং উচ্চতা ৩৪ মিটার। কোনার বাঁধের দৈর্ঘ্য ৩.৯২১ মিটার এবং উচ্চতা ৬০ মিটার। ১৯৫৪ সালে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হয়। পাঞ্চেৎ বাঁধের দৈর্ঘ্য ৩,৫৯০ মিটার এবং উচ্চতা ৪৮ মিটার। এই সকল বাঁধ বিহারে অবস্থিত।

জলসেচ—পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর একটি সেচ-বাঁধ (Barrage) নির্মাণ করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে ইহার কাজ শেষ হইয়াছে। এই সেচ-বাঁধটি ৬৭২ মিটার লম্বা এবং প্রায় ১১½ মিটার উঁচু। নদীর দুইদিকে ২,৪৯৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সেচখাল কাটিয়া প্রায় ৫.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হইয়াছে। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা এই জলসেচের সুবিধা পাইতেছে। ১৯৮২ সালে ৪.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইয়াছে। দুর্গাপুর হইতে ১৪৫ কিলোমিটার লম্বা একটি খাল কাটিয়া হুগলী নদীর সঙ্গে মিশানো হইয়াছে। এই খাল দ্বারা জলসেচ ও পরিবহণ এই উভয় কাজই সাধিত হইতে পারে। এই খাল দিয়া জলপথে কয়লাখনি অঞ্চল ও কলিকাতার মধ্যে কয়লা ও শিল্পজাত দ্রব্য চলাচলের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন—দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত বোকারো তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। স্থানীয় নিকৃষ্ট ধরনের কয়লা পোড়াইয়া এই তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া চন্দ্রপুরা নামক স্থানেও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুরে আরও একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে প্রতি বৎসর ১,১৮১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে; ইহার মধ্যে তাপবিদ্যুৎ ১,০৭৭ মেগাওয়াট ও জলবিদ্যুৎ ১০৪ মেগাওয়াট।

বিভিন্ন শিল্পে ও বাসস্থানে এই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইতেছে। সিন্ধ্রির সারের কারখানা, আসানসোলের অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন কারখানা এই বিদ্যুৎ সুলভে পাইতেছে। এই পরিকল্পনার ফলে দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত স্থানগুলির আরও উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা (The Bhakra-Nangal Project)

পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান রাজ্যে কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাবে জল-বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এই রাজ্যগুলিতে জল-

সেচের চাহিদা প্রচুর। এইজন্য এই রাজ্যগুলির জন্য একটি বৃহৎ নদী-পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। ১৯০৮ সালে ইহা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্নর স্যার লুই ডেন (Sir Louis Dane)। তিনি বর্তমান পরিকল্পনার অনুরূপ

একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব তদানীন্তন পাঞ্জাব সরকারকে দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪০ সালের পূর্বে তাঁহার এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার কোনো বন্দোবস্ত হয় নাই। এই সময় তদানীন্তন সিন্ধু সরকারের বাধাদানের ফলে কাজ বন্ধ হইয়া যায়। দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে আবার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫১ সালে ইহার কাজ আরম্ভ হয়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে শতদ্রু নদীর উপর দুইটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ভাকরা গিরিখাতে শতদ্রু নদীর উপর একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধের নাম ভাকরা বাঁধ; রুপার হইতে ভাকরা বাঁধ ৮০ কিঃ মিঃ উত্তরে অবস্থিত। ভাকরা বাঁধ ৫১৮ মিটার দীর্ঘ, ৩০৫ মিটার প্রশস্ত এবং ২২৬ মিটার উচ্চ। ভাকরা বাঁধের পিছনে ১৩০ বর্গ-কিলোমিটার আয়তনের একটি জলাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। জলসেচের জন্য এই জল ব্যবহার করা হয়।

ভাকরা বাঁধের ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে শতদ্রু নদী যেখানে সমতলভূমিতে পড়িয়াছে, সেইখানেই নদীর উপর নাঙ্গাল নামক স্থানে আরও একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩১৪ মিটার, প্রস্থ ১২২ মিটার ও উচ্চতা ২৯ মিটার। যদিও

প্রায় ২৩৬ কোটি টাকা খরচ করিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে, ইহার তুলনায় উপকারও যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। ভারতের যে সকল বহুমুখী নদী পরিকল্পনার কার্য সমাপ্ত হইয়াছে উহাদের মধ্যে ইহা বৃহত্তম।

জলসেচ—এই পরিকল্পনা হইতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের প্রভূত উপকার হইতেছে। ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পের অন্তর্গত প্রধান সেচখালের দৈর্ঘ্য ১,১০০ কিঃ মিঃ এবং এই খালগুলি হইতে কাটা শাখা খালের দৈর্ঘ্য ৩,৪০০ কিঃ মিঃ। এই পরিকল্পনায় মোট ১৪.৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ১৩ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য, ৮ লক্ষ মেঃ টন তুলা, ৫ লক্ষ মেঃ টন ইক্ষু এবং ১ লক্ষ মেঃ টন তৈলবীজ অতিরিক্ত উৎপন্ন হইতেছে। এই অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের মূল্য প্রায় ৯০ কোটি টাকা। পৃথিবীতে অন্য কোনো পরিকল্পনায় এত অধিক অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় নাই।

বিদ্যুৎ উৎপাদন—নাঙ্গাল বাঁধের পশ্চাৎ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধার্থে দ্রুতগতিতে জল নির্গমনের জন্য ৬৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি প্রণালী (Hydel channel) খনন করা হইয়াছে। ইহা **নাঙ্গাল খাল** নামে খ্যাত। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভাকরা বাঁধের সংলগ্ন এলাকায় দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং নাঙ্গাল খালের তীরে গাঙ্গোয়াল ও কোটলা নামক স্থানে আরও দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত চারিটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে প্রায় ১,২০৪ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। এই বিদ্যুৎ বিভিন্ন শিল্পে এবং ১২৮টি শহরে সরবরাহ করা হইতেছে। এই জলবিদ্যুতের সাহায্যে নলকূপ হইতে জল তুলিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মহানদী পরিকল্পনা (The Mahanadi Project)

ওড়িশার বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই পরিকল্পনা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ওড়িশার মহানদী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদী। পূর্বে এই নদীর বন্যায় বহু জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে মহানদীর উপর তিনটি বাঁধ দেওয়া হইবে। হীরাকুদ, টিকারপাড়া ও নারাজে এই বাঁধ নির্মিত হইবে। ইহার ফলে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে, জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং বন্যানিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য হইবে।

সম্বলপুরের ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে হীরাকুদ বাঁধ নির্মিত হইয়াছে; ইহা ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪.৮ হাজার মিটার; ইহার পশ্চাতে একটি বৃহদাকার কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে হীরাকুদ বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে। হীরাকুদ বাঁধ নির্মাণ করিতে ৬৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

জলসেচ—এই বাঁধ হইতে প্রায় ২.৫১ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই জলসেচ দ্বারা সম্বলপুর ও বোলাঙ্গীর জেলার কৃষিক্ষেত্র উপকৃত হইতেছে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর ৩.৫ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এবং ২.৪ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হইতেছে। হীরাকুদ বাঁধ নির্মাণের ফলে ইতিমধ্যে চাউলের উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে এবং ওড়িশা এখন পশ্চিমবঙ্গে চাউল সরবরাহ করিতেছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন—হীরাকুদ বাঁধ হইতে বর্তমানে ২৭০'২ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। রাউরকেলায় ইস্পাত শিল্পে ও হীরাকুদের নূতন অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় এই বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে।
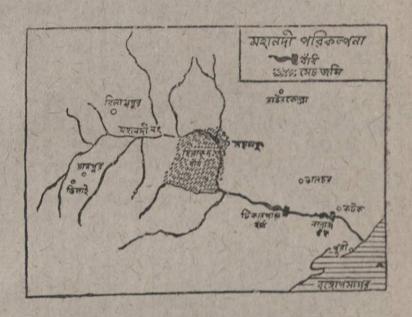
ওড়িশায় প্রচুর খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। এখানে লোহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে জলবিদ্যুৎ শক্তির সংযোগ হওয়ায় ওড়িশা শিল্পসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যে রাউরকেলায় ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং আরও বহু নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

মহানদীর উপর আরও দুইটি বাঁধ দেওয়া হইবে। ঢেনকানল জেলার টিকারপাড়ায় এবং কটকের নিকট নারাজে এই বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। এই বাঁধগুলির প্রধান উদ্দেশ্য জলসেচের ব্যবস্থা করা এবং বন্যানিয়ন্ত্রণের সহায়তা করা। মহানদী পরিকল্পনার তিনটি বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইবে এবং ৩'৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। এই পরিকল্পনার ফলে নৌ চলাচলের সুবন্দোবস্ত হইবে।

ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা (The Farakka Barrage Project)

বর্তমানে ভাগীরথী নদী খুবই শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শতাধিক বৎসর পূর্বে হঠাৎ ভৌগোলিক কোনো কারণে গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত ভাগীরথী নদী হইতে পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যায়। ইহার ফলে পদ্মা নদী গঙ্গার প্রধান জলস্রোতে পরিণত

হয় এবং ভাগীরথীর স্রোতের বেগ কমিয়া যায়। এইজন্য কলিকাতা বন্দরে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃই ভাগীরথী সংকীর্ণ হওয়ায় ভাগীরথী-হুগলী নদীতে ক্রমাগত পলি সঞ্চয় শুরু হয়। অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী বালি, কাদা ইত্যাদি হুগলী নদীতে আনিয়া ফেলে। স্রোতের জোর কম থাকায় হুগলী নদীর পক্ষে এইগুলি সরাইয়া ফেলা কঠিন। ফলে কলিকাতা বন্দরে জাহাজ আসা দুঃসাধ্য হইল। এখন এই পলিমাটি ড্রেজার যন্ত্রের সাহায্যে সরাইয়া ফেলিতে হয় এবং পাইলটের (পথপ্রদর্শক) সাহায্যে সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে লইয়া আসিতে হয়। ড্রেজার ও পাইলটের (Pilot) বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানকে (Calcutta Port Commissioners) কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে হয়। নদীতে জলাভাবের জন্য উত্তর ভারতের সহিত কলিকাতার নৌ-চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। জলের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় নদীর জলে লবণের অনুপাত বাড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য কলকাতায় পানীয় জল লবণাক্ত হইয়া যায়, ফলে নানাবিধ রোগ দেখা দেয়। এই জল পরিস্রুত করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন বহু অর্থব্যয়ে যে সকল মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনিয়া আনে সেইগুলি লবণাক্ত জলের জন্য তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য ৬৬ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকট তিলডাঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এই বাঁধের নাম ফারাক্কা বাঁধ (**Farakka Barrage**)। জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর অপর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ফারাক্কা বাঁধের পিছন দিক হইতে একটি খাল কাটিয়া জঙ্গীপুর বাঁধের দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইলে গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত ভাগীরথী নদীতে ফিরিয়া আসিত এবং ভাগীরথী-হুগলী নদীতে পুনরায় জলবৃদ্ধি ঘটিত ; জলাভাবের দরুন উপরে বর্ণিত যে সকল অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর হইত। ভাগীরথীর জলবৃদ্ধির দরুন পলিমাটি ও বালুচর ধুইয়া সাগরে চলিয়া যাইত। কলিকাতা বন্দরে ড্রেজার ও পাইলটের প্রয়োজন কমিয়া যাইত এবং অনেক খরচ বাঁচিয়া যাইত। কলিকাতার পানীয় জল লবণাক্ত হইত না ; তজ্জনিত রোগ কমিয়া যাইত এবং

কলিকাতা কর্পোরেশনের জল পরিশোধনের যন্ত্রপাতি সহজে নষ্ট হইত না ; কলিকাতা হইতে উত্তর ভারতে যাইবার নৌ-চলাচলের সুবিধা হইত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার এই পরিকল্পনাকে দ্রুত কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফারাক্কার খালের মাধ্যমে প্রায় ৪০,০০০ কিউসেক জল ছাড়া হইতেছিল। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির ফলে ভারত সরকার এই জলের কিয়দংশ বাংলাদেশকে ছাড়িয়া দিতেছেন বলিয়া গ্রীষ্মকালে প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায় না ; ফলে, কলিকাতা বন্দরের সমস্যার ও অন্যান্য সমস্যার সুরাহা হয় নাই। এই পরিকল্পনায় প্রকৃত খরচের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫৬ কোটি টাকা।

পূর্বে কলিকাতা হইতে রেলপথে বা সড়কপথে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যাইবার কোনো রাস্তা ছিল না। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ায় ফারাক্কা বাঁধের উপর দিয়া সড়কপথ ও রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের সহিত উত্তরবঙ্গের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং কলিকাতা হইতে রেলপথে ও স্থলপথে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যাওয়া যাইতেছে।

কুশী পরিকল্পনা (The Kosi Project)

হিমালয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া নেপাল ও বিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কুশী গঙ্গা নদীতে পড়িয়াছে। এই নদীকে বিহারের দুঃখ বলা হয়। এই নদীর বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ; কারণ, নদীর গতিপথ সচরাচর পরিবর্তিত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতে ও বরফ-গলা জলের স্রোতে হঠাৎ বন্যা আসিয়া বহু জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করে ; বন্যা-পীড়িত স্থান বালিতে ঢাকিয়া যায় এবং অনুর্বর হয়। বিহারে প্রায় ৭ ৬৮০ বর্গ-কিলোমিটার জমি এইভাবে অনুর্বর হইয়াছে।

প্রধানতঃ বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচের ব্যবস্থা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কুশী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কুশী নদীর উপর বিহার-নেপাল সীমান্তে হনুমাননগরে একটি সেচ-বাঁধ দেওয়া হইবে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি খাল কাটিয়া উত্তর বিহারে প্রায় ০.৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইবে। পশ্চিম কুশী খাল দ্বারা নেপালেরও প্রায় ১১.৭ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। এই বাঁধের সাহায্যে প্রথমাবস্থায় প্রায় ২১,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। নেপালের ছাত্রা গিরিখাতের নিকট কুশী নদীর উপর ২২৯ মিটার উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইবে। এই পরিকল্পনায় ১৮ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পরিকল্পনাটি অত্যন্ত বড় বলিয়া ইহাকে সাতটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে ; প্রথম স্তরের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। হনুমাননগরে সেচ-বাঁধটি ১৯৬৫ সালে নির্মিত হইয়াছে ; পূর্ব-কুশী খাল খননের কাজও প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তরের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই স্তরে ২০,০০০ কিলোওয়াট্ (২০ মেগাওয়াট্) বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটি পাওয়ার হাউস, পশ্চিম-কুশী খাল প্রকল্প, রাজপুর খাল এবং বন্যাপ্রতিরোধক বাঁধ নির্মিত হইবে। ১৯৮২ সালের মধ্যে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে।

চম্বল পরিকল্পনা (The Chambal Project)

যমুনা নদীর উপনদী চম্বলের উপর একাধিক বাঁধ দিয়া রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের উন্নতিসাধনের জন্য এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইহা ভারতের বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্পগুলির অন্যতম। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে এই প্রকল্পের কার্য আরম্ভ হয়।

এই প্রকল্পটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে দুইটি পর্যায়ের কার্য শেষ হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে গান্ধীসাগর বাঁধ ও জলাধার এবং কোটা সেচবাঁধ নির্মাণের কার্য শেষ হয় ও জলসেচের জন্য বহু খাল খনন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রানা প্রতাপসাগর জলাধারের নির্মাণকার্য শেষ হয় ও বহু সেচখাল খনন করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে জওহর সাগর জলাধার ও ৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইবে।

গান্ধীসাগর বাঁধটির দৈর্ঘ্য ৫০৪ মিটার ও উচ্চতা ৬২ মিটার। এই বাঁধের পশ্চাতের জলাধারটির আয়তন ৭০১ বর্গ-কিলোমিটার। রানা প্রতাপসাগর বাঁধটির দৈর্ঘ্য ১,০৮৬ মিটার ও উচ্চতা ৩৭ মিটার। এই বাঁধের পশ্চাতের জলাধারটির আয়তন প্রায় ২০২ বর্গ-কিলোমিটার। কোটা শহরের ১৬ কিলোমিটার দূরে চম্বলের উচ্চ অববাহিকায় জওহরসাগর বাঁধটির নির্মাণকার্য চলিতেছে। এই বাঁধগুলি রাজস্থানে অবস্থিত।

জলসেচ—এই পরিকল্পনার দ্বারা রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা উপকৃত হইতেছে। ১৯৮২ সালে এই অঞ্চলের ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইয়াছে। ফলে দুর্ভিক্ষকবলিত এই অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদ্যুৎ-উৎপাদন—গান্ধীসাগর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র ও রানা প্রতাপসাগর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র দুইটি নির্মিত হইয়াছে। গান্ধীসাগর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১১৫ মেগাওয়াট এবং রানা প্রতাপসাগর বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৭২ মেগাওয়াট। জওহরসাগর বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে আরও ৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের চম্বল উপত্যকায় ব্যাপক শিল্প গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং এই শক্তি সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া বহু শিল্পকেন্দ্র নির্মিত হইতেছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (The Mor Project)

বিহারের দেওঘরের নিকট ত্রিকূট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ময়ূরাক্ষী নদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া ভাগীরথী নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিহারের ম্যাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর এই বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। কানাডা সরকারের সহায়তায় এই বাঁধ নির্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে কানাডা বাঁধ। এই বাঁধ ৬৪০ মিটার দীর্ঘ ও ৪৭ মিটার উচ্চ।

জলসেচ—পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলার তিলপাড়ায় অপর একটি সেচ-বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার দুইদিকে খাল কাটিয়া বীরভূম জেলায় প্রায় ২·৫১ লক্ষ

হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে। এই খাদ্যশস্যের মূল্য প্রায় ১০ কোটি
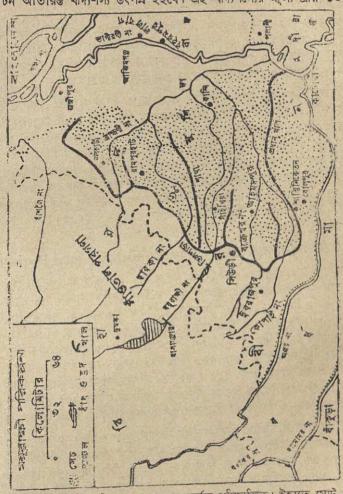
টাকা। এই পরিকল্পনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ইহাতে মোট ২০'৪৬ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজ ১৯৫৫ সালে শেষ হইয়াছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন—এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ৪,০০০ কিলোওয়াট (৪ মেগাওয়াট) জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা দ্বারা বিহারের দুমকা অঞ্চল বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছে।

বিপাশা পরিকল্পনা (The Beas Project)

পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। এই পরিকল্পনা তিনটি পর্যায়ে বিভক্তঃ (১) বিপাশা-শতদ্রুর সংযোগে

সাধন। (২) পঙ্ নামক স্থানে বিপাশা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ ও (৩) বিপাশা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণ। এই পরিকল্পনার কার্য সম্পন্ন করিতে ৭১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

জলসেচ—পঙ্ নামক স্থানে বিপাশা নদীর উপর বাঁধটির নির্মাণকার্য ১৯৭৪ সালে শেষ হইয়াছে। এই বাঁধের পশ্চাতের জলাধারে জল সঞ্চিত করিয়া সেই জলের সাহায্যে রাজস্থান ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে জলসেচকার্য চলিতেছে। এই বাঁধ প্রধানতঃ জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য নির্মিত হইয়াছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন—বিপাশা-শতদ্রু সংযোগ প্রকল্পটি মূলতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই গৃহীত হইয়াছে। এই প্রকল্প অনুসারে প্রত্যেকটি ১৬৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন চারিটি বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র এবং প্রয়োজনে অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন আরও দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইবে বলিয়া ধার্য করা হয়। ১৯৭৭ সালে বিপাশা নদীর প্রবাহের গতি পরিবর্তিত করিয়া উহাকে হিমাচল প্রদেশের শ্লাপার (Slapper) নামক স্থানে শতদ্রুর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় এবং তখন হইতে ক্রমে ক্রমে উল্লিখিত চারিটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ করা হইয়াছে এবং বাড়তি উৎপাদনকেন্দ্র দুইটির নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে।

রাজস্থান খাল প্রকল্প (The Rajasthan Canal Project)

রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিমের থর মরুভূমির অন্তর্ভুক্ত অংশে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করার জন্য এই প্রকল্প গৃহীত হয়। বিপাশা নদীর পঙ বাঁধের জলাধার হইতে ২০৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সরবরাহকারী খালের মাধ্যমে জল প্রবাহিত করিয়া রাজস্থানের সেচ এলাকায় আনা হইবে। এই প্রকল্প অনুসারে ২০৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ জল সরবরাহকারী খাল যাহার ১৬৭ কিঃ মিঃ পাঞ্জাব-হরিয়ানার মধ্য দিয়া ও বাকী ৩৭ কিঃ মিঃ রাজস্থানে এবং ৪৪৫ কিঃ মিঃ প্রধান খাল যাহার সবটাই রাজস্থানে নির্মিত হইবে বলিয়া ধার্য হয়। যাহাতে জল শুকাইয়া না যায়, সেইজন্য খালের পার্শ্ব ও তলদেশে বিশেষ ধরনের আস্তরণের ব্যবস্থা হইবে। এই প্রকল্পের কার্য শেষ হইলে রাজস্থানের মরু অঞ্চল ভারতের একটি শস্যশালিনী অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম পর্যায়ে সরবরাহকারী খালের সম্পূর্ণ অংশ, প্রধান খালের ১৮০ কিঃ মিঃ এবং প্রধান খাল হইতে ৩,০০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ শাখা সেচখাল নির্মিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫৬ কিঃ মিঃ প্রধান খাল এবং ৩,৫০০ কিঃ মিঃ শাখা সেচখাল নির্মিত হইবার কথা। দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং উহা ১৯৮৫-৮৬ সালে শেষ হইবে। (১২৩ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

জলসেচ—এই প্রকল্পের কার্য সমাপ্ত হইলে ইহার মাধ্যমে ১২.৫৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা যাইবে। ১৯৮২ সালের জুন মাসের মধ্যে ৫.৬০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইলেও কার্যতঃ ৪.০২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইয়াছে। এই জলের সাহায্যে সুরতগড়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় একটি আধুনিক কৃষিখামার গড়িয়া উঠিয়াছে।

রিহান্ড পরিকল্পনা (The Rihand Project)—এই পরিকল্পনা অনুসারে উত্তর প্রদেশে শোণ নদীর শাখা রিহান্ড নদীর উপর **পিপরী** নামক স্থানে একটি বাঁধ

নির্মাণ করা হইয়াছে। এই বাঁধের পিছনে ভারতের বৃহত্তম জলাধার সৃষ্টি হইয়াছে; এই জলাধারের আয়তন প্রায় ৪৬৬ বর্গ-কিলোমিটার। এই জলাধারের জল হইতে উত্তর প্রদেশে ও বিহারে ৭.৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা এবং ২.৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের এবং কলিকাতা হইতে রিহান্ড উপত্যকা পর্যন্ত নৌ-চলাচলের বন্দোবস্ত হইতেছে। এই পরিকল্পনাটি উত্তর প্রদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ইহাতে মোট ৪৫.২৬ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। ইহার কাজ শেষ হইয়াছে।

তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা (The Tungabhadra Project)—এই পরিকল্পনা অনুসারে দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা নদীর শাখা তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর কর্ণাটক রাজ্যের মালাপুরম নামক স্থানে ২,৪৪১ মিটার দীর্ঘ ও ৪৯.৩৮ মিটার উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। বাঁধটির দুইদিকে খাল কাটিয়া অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটক রাজ্যে প্রায় ৩.২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইতেছে। কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশ সরকার কর্তৃক এই পরিকল্পনা পরিচালিত হইয়াছে। ইহার জন্য মোট ১৯ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে।

রামাপদসাগর পরিকল্পনা—অন্ধ্র প্রদেশের গোদাবরী নদীর উপর রামাপদসাগরের নিকট একটি বাঁধ দিয়া প্রায় ১০.৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইবে এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা—অন্ধ্র প্রদেশের নন্দিকোণ্ডা গ্রামের নিকট কৃষ্ণা নদীর উপর ১,৪৫০ মিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে। নদীর দক্ষিণ তীর হইতে ২০৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ও বাম তীর হইতে ১৭৯ কিঃ মিঃ দীর্ঘ খাল কাটা হইবে। খাল কাটার কাজ সম্পূর্ণ হইলে মোট ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনায় মোট খরচ হইবে ১৬৩.৫ কোটি টাকা। খাল কাটার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৮২ সালে ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইয়াছে।

কাকড়াপাড়া পরিকল্পনা— গুজরাট রাজ্যে সুরাটের নিকট কাকড়াপাড়ায় তাপ্তী নদীর উপর বাঁধ দিয়া ২.২৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইতেছে এবং ৮০ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সঙ্গমেশ্বরম্ পরিকল্পনা—কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট সঙ্গমেশ্বরমে কৃষ্ণা নদীর উপর একটি বাঁধ দিয়া অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইতেছে। এই পরিকল্পনায় প্রায় ৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশ সরকার এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

কুণ্ডা পরিকল্পনা—তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে কুণ্ডা নদীর উপর বাঁধ দিয়া ১ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। কানাডা সরকারের সহায়তায় ইহার নির্মাণকার্য চলিতেছে। ইহা তামিলনাড়ুর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা।

প্রশ্নাবলী

(A) Essay-Type Questions

1. Account for the importance of hydel-power in Indian economy. Enumerate the geographical conditions favourable to harness hydel-power and name the areas in India where such conditions are found.

[H. S. Examination, 1981]

(ভারতীয় অর্থনীতিতে জলশক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। জলশক্তি উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলি লিপিবদ্ধ কর এবং ভারতের যে অঞ্চলসমূহে এইরূপ পরিবেশ বিদ্যমান তাহাদের নাম লিখ।)

উঃ—'ভারতের জলশক্তি' (১১৪ পৃঃ) ও 'জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা' (১১৩—১১৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

2. Write an account of the water-power resources of India and examine the benefits derived from them. [**H. S. Exam, 1983**]

(ভারতের জলবিদ্যুৎ সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং সেই সম্পদ হইতে আমরা কিভাবে উপকৃত হই, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

উঃ—'জলবিদ্যুৎ' (১১৩—১২০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Discuss the importance of water-power in the context of Indian condition. Give a brief account of water-power development in South India. [**Specimen Question, 1980**]

(ভারতের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জলবিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর। দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ-শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।)

উঃ—'জলবিদ্যুৎ' (১১৩—১২০ পৃঃ) এবং 'বহুমুখী নদী পরিকল্পনা' (১২০—১৩১ পৃঃ) হইতে দক্ষিণ ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলি অবলম্বনে উত্তর তৈয়ারি কর।

4. What do you mean by the term, 'Multipurpose river valley project'? Illustrate your answer with reference to any such project in India.

[**C. U. B. Com, 1974 & Tripura H. S. Examination**]

('বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা' বলিতে কি বুঝায়? ভারতের যে কোনো একটি নদী-পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া প্রশ্নটির উত্তর দাও।)

উঃ—'বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা' (১২০—১২১ পৃঃ) এবং 'ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা' (১২২—১২৪ পৃঃ) লিখ।

5. What is meant by a multipurpose river valley project? Describe the main features of the Bhakra Nangal Project.

[**H. S. Examination, 1980**]

(বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়? ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।)

উঃ—'বহুমুখী নদী পরিকল্পনা' (১২০—১২১ পৃঃ) ও 'ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা' (১২২—১২৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Discuss the salient features of the Damodar multipurpose river valley project. [**H. S. Examination, 1979**]

(দামোদর বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার বিশিষ্ট দিক্‌গুলি উল্লেখ কর।)

উঃ—'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' (১২১—১২২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. Describe the salient features of the Damodar Valley Project. What are the benefits derived by West Bengal from this Project? **[H. S. Examination, 1982]**

(দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল রূপরেখা বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনা হইতে পশ্চিমবঙ্গ কি কি সুবিধা পায়?)

উঃ—'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' (১২১—১২২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

8. Describe the importance of Damodar Valley Project in the well-being of West Bengal. **[Tripura H. S. Examination, 1982]**

(পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর।)

উঃ—'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' (১২১—১২২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. "Ganga-barrage Project is essential for saving the port of Calcutta."—Discuss **[C. U. Inter, 1957]**

("কলিকাতা বন্দর রক্ষার জন্য গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনা অপরিহার্য।"—মন্তব্য লিখ।)

উঃ—'ফারাক্কা-বাঁধ পরিকল্পনা' (১২৫—১২৭ পৃঃ) লিখ।

10. Give an account of any major multipurpose river valley project in India and state the benefits that are being derived from such project. **[H. S. Examination, 1981]**

(ভারতের যে কোনো বৃহৎ বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার বিবরণ দাও এবং এইরূপ পরিকল্পনা হইতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বিবৃত কর।)

উঃ—'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' (১২১—১২২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes explaining the following statements :

(a) Industries in western and southern India depend mostly on hydro-electricity. **[H. S. Examination, 1980]**

(b) In Kerala a hydro-electric station has been mainly set up in Pallivasal.

(c) In Tamilnadu three important hydro-electric power stations mainly supply hydro-electricity to the state.

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলির কারণ নির্দেশ করিয়া টীকা লিখঃ

(ক) পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শিল্পগুলি প্রধানতঃ জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল।

(খ) কেরালার পল্লীভাসালে একটি প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

(গ) তামিলনাডুতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে প্রধানতঃ রাজ্যের জলবিদ্যুৎ পাওয়া যায়।]

উঃ—'উৎপাদনকারী অঞ্চল' (১১৪—১২০ পৃঃ) অবলম্বনে উত্তরগুলি লিখ।

2. Mention the names of four multipurpose river projects in India. **[Tripura H. S. Examination, 1982]**

(ভারতের চারিটি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার নাম লিখ।)

উঃ—'বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা' (১২০—১৩১ পৃঃ) হইতে চারিটি পরিকল্পনার নাম লিখ।

C. Objective Questions

1. Fill up the gaps : (a) ———electricity is produced more in ——— India than —— India. **[H. S. Examination, 1979]**

[শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ (ক) — ভারত অপেক্ষা —— ভারতে অধিক —— বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।]

2. Frame correct answer from the following statements :

(a) (i) Bandel is a centre for the production of Thermal electricity/Hydro-electricity. **[H. S. Examination, 1978]**

(ii) Mettur/Sivasamudram/Maithon is the oldest hydro-electric centre of India.

(iii) The highest dam of India is located at Hirakud/Tilaiya/Bhakra. **[H. S. Examination, 1983]**

(b) (i) Bandel is a thermal-power/hydro-electricity producing station. (ii) A barrage has been erected on the Damodar at Durgapur/Chandrapura. (iii) Bokaro is a hydro-electricity/thermal power station. (iv) A dam has been constructed at Bhakra/Nangal, a place where the river Sutlej has entered the plains. (v) The Maithon/the Hirakud/the Nangal dam situated about 14 km. west of Sambalpur is the longest in India. (vi) A barrage has been constructed across the Godavari/the Krishna/the Kaveri river at Nagarjun Sagar in Andhra Pradesh.

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলির সহযোগে সঠিক উত্তর তৈয়ারি করঃ

(ক) (i) ব্যান্ডেল একটি তাপবিদ্যুৎ/জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র।

(ii) মেত্তুর/শিবসমুদ্রম/মাইথন ভারতের প্রাচীনতম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র।

(iii) হীরাকুদ/তিলাইয়া/ভাকরায় ভারতের সর্ব্বোচ্চ বাঁধ অবস্থিত।

(খ) (i) ব্যান্ডেলে একটি তাপবিদ্যুৎ/জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র আছে। (ii) দুর্গাপুরে/চন্দ্রপুরায় দামোদর নদের উপর একটি সেচ-বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। (iii) বোকারোতে একটি জলবিদ্যুৎ/তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। (iv) শতদ্রু নদী যেখানে সমভূমিতে পড়িয়াছে সেখানে ভাকরা/নাঙ্গাল বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। (v) সম্বলপুরের ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে মাইথন্/হীরাকুদ/নাঙ্গাল বাঁধ ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ। (vi) অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জুনসাগরে গোদাবরী/কৃষ্ণা/কাবেরী নদীর উপর একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।]

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনভূমি ও বনজ সম্পদ

[Forest and Forest Products]

বনজ সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ। এই দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২২.৭ ভাগ বনভূমি। জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিদ পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বনভূমির মোট আয়তন প্রায় ৭ কোটি ৪২ লক্ষ হেক্টর ; ইহার মধ্যে ৭২ লক্ষ হেক্টর সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি ; বাকী ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টর অন্যান্য শ্রেণীর বনভূমি। এই দেশে প্রায় ৫,০০০ রকমের গাছ-পালা থাকিলেও, ইহার অর্ধেক লতা ও গুল্ম এবং বাকী অর্ধেক হইতে প্রয়োজনীয় কাঠ পাওয়া যায়। বনভূমি সংরক্ষণের ভিত্তিতে ভারতের বনভূমিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, **খাস বনে** (**Reserve Forest**) সরকারী বনরক্ষকের অনুমতি ব্যতীত কেহ কাঠ কাটিতে বা পশুচারণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, **সংরক্ষিত বনে** (**Protected Forest**) স্থানীয় লোকের পশুচারণ, জ্বালানি কাঠ ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করিবার অধিকার থাকে। বনরক্ষক এই সকল বনের তদারক করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, **অশ্রেণীভুক্ত বনে** (**Unclassified Forest**) বনজ সম্পদ সংগ্রহের কোনো বাধানিষেধ নাই এবং ইহার তত্ত্বাবধানেরও কোনো বন্দোবস্ত নাই ; সরকার এই সকল বনভূমির মালিক। ইহা ছাড়া বে-সরকারী মালিকানায় বা তত্ত্বা-বধানেও ভারতে সামান্য কিছু বনভূমি রহিয়াছে। বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ বনভূমি সরকারী মালিকানার অধীন।

বনভূমি বণ্টন (**Distribution of Forest**)—বনজ সম্পদে ভারতের সকল স্থান সমানভাবে সমৃদ্ধ নহে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বনভূমির আয়তন অপেক্ষাকৃত কম হইলেও এই দেশের রাজস্থানের মরুভূমি হইতে উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় সকল স্থানেই কম বেশী বনভূমি বিদ্যমান। এই দেশের অধিকাংশ বনভূমি ক্রান্তীয় শ্রেণীভুক্ত। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, উত্তাপ ও উচ্চতার উপর বনভূমির বিস্তার নির্ভরশীল। মোটামুটি ২০০ সেঃ মিঃ-এর অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি, ১০০-২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি, ৫০-১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে লতা-গুল্ম ও তৃণভূমি এবং ৫০ সেঃ মিঃ-এর কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মরু অঞ্চলের গাছপালা দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতা অনুসারে কোথাও সরলবর্গীয় বৃক্ষ, কোথাও পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে ; এইজন্য হিমালয় ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে এই জাতীয় বৃক্ষাদি দেখা যায়। জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(ক) **চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি**—অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল, পূর্ব হিমালয়, উত্তর পূর্বের পার্বত্য রাজ্যসমূহ ও আসামে এই জাতীয় বনভূমি বিদ্যমান। মোটামুটি ২০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী বৃষ্টিপাত ও ২৫° সেঃ উত্তাপ এই বনভূমি সৃষ্টির সহায়ক।

যানবাহনের অসুবিধা, নিবিড় জঙ্গল এবং একই স্থানে এক ধরনের বৃক্ষাদির

অভাবে এই অঞ্চলের বনভূমির বনজ সম্পদ মানুষের প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। এখানকার বৃক্ষাদির মধ্যে চাপলাশ, চিকরাশি, গোলাপ, শিশু, গর্জন, তেল-সুর, নাহার, পুন, তুন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বাঁশ, জাম এবং রবার গাছও এখানে জন্মে।

(খ) **মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি**—মাঝারি বৃষ্টিপাত (১০০-২০০ সেঃ মিঃ) অঞ্চলে এই জাতীয় বনভূমির সৃষ্টি হয়। হিমালয়ের নিম্নদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে এই জাতীয় বনভূমি বিদ্যমান। কোনো কোনো অঞ্চলে এই সকল বনভূমি পরিষ্কার করিয়া জমি কৃষি-কার্যের আওতায় আনা হইয়াছে। এখানকার মূল্যবান বৃক্ষসমূহের মধ্যে শাল, সেগুন, অর্জুন, জারুল, বহেড়া, গামারি, তুঁত, আবলুস, খয়ের, শিরিষ, শিমুল, হরীতকী, মহুয়া, পলাশ, কুসুম, অঞ্জন, বাঁশ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(গ) **পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি**—বৃষ্টিপাত ও উচ্চতা অনুসারে এই বনভূমি বিভিন্ন আকার ধারণ করে। হিমালয়ের পাদদেশে বাঁশ, শাল ও সেগুন গাছ জন্মে। পূর্ব হিমালয় ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে ১,০০০ মিটার হইতে ৩,০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু পর্বতে ওক, ম্যাপল্ প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং ৩,০০০ মিটারের অধিক উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে পাইন, স্প্রুস, ফার, সীডার, দেবদারু প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে।

(ঘ) তটদেশীয় **বনভূমি**—নদীর ব-দ্বীপ ও সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে নোনা-জল প্রবাহিত হওয়ায় জলাভূমির অরণ্য (Mangrove) পরিলক্ষিত হয়। তাল, নারিকেল, সুন্দরী ও পুসুর গাছ এখানে প্রচুর জন্মে। নৌকা ও গৃহাদি নির্মাণে এবং জ্বালানি হিসাবে এখানকার কাঠ ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) **গুল্ম ও তৃণভূমি**—অল্প বৃষ্টিপাত (৫০-১০০ সেঃ মিঃ) এবং চরম জলবায়ুতে গুল্ম ও তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে গুল্মলতা এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমিতে, পার্বত্য অরণ্যের মধ্যভাগে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে 'সাভানা' তৃণভূমি দেখা যায়। এই সকল তৃণভূমিতে সাবাই ঘাস জন্মে। ইহা কাগজ শিল্পে ও দড়ি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(চ) **শুষ্ক অঞ্চলের বনভূমি**—পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যের ৫০ সেঃ মিঃ-এর কম বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক অঞ্চলে কাঁটা ও শাঁসালো ডাঁটাযুক্ত গাছ দেখা যায়। এই অঞ্চলের বাবুল, ফণীমনসা, তেশিরা প্রভৃতি গাছ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় গাছ হইতে গঁদ প্রস্তুত হয়। ইহাদের বাকল রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই কমবেশী বনভূমি বিদ্যমান। ইহার মধ্যে মধ্য প্রদেশে বনভূমির আয়তন সর্বাপেক্ষা বেশী।

বনভূমির আয়তন—৭৫০ লক্ষ হেক্টর
(লক্ষ হেক্টর)

মধ্য প্রদেশ	১৫০	ওড়িশা	৪৫	তামিলনাড়ু	২১
আসাম	৭৫	বিহার	৩৯	রাজস্থান	১৪
মহারাষ্ট্র	৭৩	উত্তর প্রদেশ	৩৯	কেরালা	১১
অন্ধ্র প্রদেশ	৬০	কর্ণাটক	২৮	পশ্চিমবঙ্গ	৯

বনভূমির ব্যবহার (Utilisation of Forest)—বনভূমির বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করিয়া ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে কাঠচেরাই করার মিস্ত্রী, গাড়োয়ান প্রভৃতি প্রধান। বনভূমি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ, ইহা বৃষ্টিপাতের সহায়ক। গাছপালাসমূহ শিকড় দ্বারা জমির মাটি আঁকড়াইয়া বনভূমির ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভারতের বনভূমি হইতে আহৃত সম্পদকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—কাষ্ঠসম্পদ ও উপজাত দ্রব্য।

(ক) **কাষ্ঠসম্পদ**—বনভূমি হইতে যে সকল বৃক্ষাদি সংগ্রহ করা হয়, তাহা চেরাই-কাঠ হিসাবে বিভিন্ন কার্যে এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চেরাই কাঠের ব্যবহার (হাজার মেঃ টন)

রেলওয়ের পাটাতন	৩৪০	দিয়াশলাই	১২০
রেলগাড়ির বগি	৮০	প্যাকিং বাক্স	৭৫
সামরিক কার্য, জাহাজ ও বিমানপোত নির্মাণ এবং অন্যান্য সরকারী কার্য	১৬০	প্লাইউড	৬০
		চায়ের বাক্স	৬০
		আসবাবপত্র ও গৃহাদি নির্মাণ	৮৬০
		অন্যান্য	৪০
শিল্প	৩৩৫	মোট	২,১৩০

খেলাধূলার সামগ্রী প্রস্তুত করিতে, ভদ্রাবতী ইস্পাত-কারখানায় ইস্পাত গলাইতে, বিদ্যুৎ-পরিবহণের তার খাটাইতেও কাঠ ব্যবহৃত হয়। ভারতে চেরাই-কাঠ প্রস্তুত হয় সাধারণতঃ সেগুন, শাল, চিকরাশ, তুন, বার্চ, শিরিষ, আবলুস, গামারি, পুন, জারুল, চাপলাশ, বহেড়া, শিমুল, পাইন, স্প্রুস, ফার, দেবদারু, পুসুর, সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে। চেরাই কাঠ ছাড়া বনভূমি হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫৭ লক্ষ মেঃ টন জ্বালানি কাঠ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে বিভিন্ন কারণে বনভূমি হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহে বাধাবিঘ্ন দেখা যায়। ভারতের বনভূমির অধিকাংশ স্থান দুর্গম। কাষ্ঠ আহরণ করিবার উপযোগী যানবাহনের অভাবে বনভূমি হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। একজাতীয় বহু বৃক্ষ একই স্থানে পাওয়া যায় না বলিয়া একজাতীয় কাষ্ঠসংগ্রহ অনেক পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য। কাগজ তৈয়ারির উপযোগী মূল্যবান নরম কাষ্ঠ কোনো কোনো অঞ্চলে পাওয়া গেলেও ইহা সংগ্রহ করা কঠিন। রীতিমতো যত্নের অভাবে, দাবানল বা অন্যান্য কারণে বহু গাছপালা নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃক্ষাদি কর্তন

করা হয় না। অধিক মূল্য দিলেই যে কোনো গাছ কাটা যায়। ইহা বনভূমি সংরক্ষণের সহায়ক নহে।

ভারতে সঞ্চিত কাষ্ঠসম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৮৬ কোটি কিউবিক মিটার ; ইহার মধ্যে ২২৮ কোটি কিউবিক মিটার শক্ত কাঠ এবং ৫৮ কোটি কিউবিক মিটার সরল-বর্গীয় বৃক্ষের নরম কাঠ। ১৯৮২ সালে প্রায় ১০২.৩ লক্ষ কিউবিক মিটার কাঠ বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয় ; ইহার মধ্যে ১৪.৪ লক্ষ কিউবিক মিটার জ্বালানি কাঠ এবং ৮৭.৯ লক্ষ কিউবিক মিটার শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ। এই কাঠ হইতে সরকারের আয় হইয়াছে ২৭৭ কোটি টাকা। ভারতের জনপ্রতি চেরাই-কাঠের উৎপাদন মাত্র .০০৪ কিউবিক মিটার, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার পরিমাণ ১.৭ কিউবিক মিটার। দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাষ্ঠের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন উপায়ে কাষ্ঠসংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বনভূমি অঞ্চলে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া, কাষ্ঠসংগ্রহে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া, কাষ্ঠের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিয়া বর্তমানে এই দেশে কাষ্ঠশিল্পের উন্নতিসাধন করা হইতেছে।

(খ) **উপজাত দ্রব্য**—ভারতের বনভূমিতে বিভিন্ন ধরনের উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় ; কিন্তু বনজ সম্পদ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া উপজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। পলাশ, পিপুল, কুসুম প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া লাক্ষা-কীট বাঁচিয়া থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব বিহার, মধ্য প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে এই জাতীয় বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এইজন্য এই তিনটি রাজ্যে ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ লাক্ষা পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যগুলির বনভূমিতেও অল্পবিস্তর লাক্ষা পাওয়া যায়। লাক্ষা-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। বার্নিশ, ছাপার কাজ, বিদ্যুৎরোধক **পদার্থ** তৈয়ারি ও গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য অধিকাংশ লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রায় ২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। অধিকাংশ লাক্ষা কলিকাতা বন্দর মারফত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জার্মানীতে রপ্তানি হইয়া থাকে। বর্তমানে থাইল্যান্ডের সুলভ লাক্ষার সঙ্গে ভারতকে প্রতিযোগিতা করিতে হয় বলিয়া লাক্ষার রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে।

চিরপাইন গাছ হইতে **ধুনা (Resin)** সংগ্রহ করা হয়। ইহা হইতে তার্পিন তেলও পাওয়া যায়। হিমালয় ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানতঃ ধুনা পাওয়া যায়। কাচের সহিত মিশাইতে, কাগজশিল্পে, সাবান, ঔষধ ও বার্নিশ প্রস্তুত করিতে ধুনা ব্যবহৃত হয়। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে হরীতকী পাওয়া যায়। চামড়া পাকা করিতে এবং ঔষধ ও রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। আসামে এণ্ডি ও মুগা রেশম রং করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রচুর পরিমাণে হরীতকী ভারত হইতে ব্রিটেন, জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। নীলগিরি ও দার্জিলিং-এর বৃষ্টিবহুল উচ্চভূমিতে সিঙ্কোনা বৃক্ষের চাষ হয় ; ইহার বাকল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়। মালাবার উপকূল ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে প্রচুর সুপারি জন্মে। পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের তালগাছ হইতে তালরস, গুড়, তাড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মরু অঞ্চলে খেজুর গাছ হইতে খেজুর পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে খেজুর গাছের রস হইতে গুড়, চিনি ও তাড়ি প্রস্তুত হয়। ওড়িশা, আসাম,

ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর বাঁশ জন্মে। বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমি হইতে চন্দন, কেন্দুপাতা, নানাবিধ তৈল, ভেষজ দ্রব্য, বেত, খস, হোগলা, শোলা, মাদুর কাঠি, মধু ও সাবাই ঘাস ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভারতে বনভূমির উপজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ১৯৭৮-৭৯ সালে প্রায় ১১০ কোটি টাকা অর্জিত হইয়াছে। ভারতে বনজ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য, ইহার অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য, শিল্পে ইহার প্রয়োগ-বৃদ্ধির জন্য দেরাদুনে ভারতীয় বনবিজ্ঞান গবেষণাগার (Forest Research Institute) বিভিন্ন গবেষণাকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

বনভূমির সংরক্ষণ (Conservation of Forests)—বনজ সম্পদ প্রকৃতির দান। পরিকল্পিত উপায়ে ইহা ব্যবহৃত হইলে যুগ যুগ ধরিয়া এই সম্পদ মানুষ ভোগ করিতে পারে ; কারণ, বনভূমি প্রবহমান সম্পদ। ভারতে বৃষ্টিপাতের সমতারক্ষার জন্য, ভূমিক্ষয় রোধ করিবার জন্য, বন্যা-নিরোধের জন্য বনভূমির সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। বনভূমি হইতে বৃক্ষাদি কর্তন নিয়ন্ত্রণ করিয়া অপরিণত বৃক্ষাদি বাড়িতে দেওয়া প্রয়োজন। বনমহোৎসবের মাধ্যমে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষাদি রোপণ করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বৃক্ষাদি কাটিবার সময় যাহাতে অন্যান্য ছোটখাট গাছ নষ্ট না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃক্ষাদি কাটা প্রয়োজন। প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি কম থাকায় ভারতে প্রতি বৎসর বনমহোৎসবের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে বনভূমিহীন অঞ্চলে নূতন নূতন বৃক্ষাদি রোপণ করা হইতেছে।

ভারতে বর্তমানে মোট ভূমিভাগের শতকরা মাত্র ২২·৭ ভাগ বনভূমি। কিন্তু কমপক্ষে এই দেশের এক-তৃতীয়াংশ জমিতে বনভূমি থাকা একান্ত দরকার। ভারত সরকার বনভূমির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০,০০০ হেক্টর জমিতে নূতন বন রচনা করা হইয়াছে, ৪,৮০০ কিলোমিটার রাস্তা বিভিন্ন বন অঞ্চলে নির্মাণ করা হইয়াছে, ৮০ লক্ষ হেক্টর পরিমিত বনভূমিকে বেসরকারী পরিচালনা হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হইয়াছে, দিয়াশলাই শিল্পের উপযোগী কাষ্ঠের আবাদ প্রতি বৎসর ১,২০০ হেক্টর করিয়া বাড়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ১৯৫২ সালে 'বন্যপ্রাণীর জন্য ভারতীয় সংস্থা' (Indian Board for Wild Life) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় প্রায় ৯·৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১·৫ লক্ষ হেক্টর পরিমিত জমিতে মূল্যবান শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষরোপণ, ২০ হাজার হেক্টর জমিতে দিয়াশলাই শিল্পের উপযোগী কাষ্ঠের এবং ৫,২০০ হেক্টর জমিতে কাগজ ও রেয়নশিল্পের উপযোগী বৃক্ষের উৎপাদন, বনভূমি অঞ্চলে ৯,৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ, কাষ্ঠ সংরক্ষণ ও সহনশীল-করণের কারখানা স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে বনজ সম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও ইহার উন্নতিসাধন প্রভৃতি কার্যের জন্য ১৯·৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) বনভূমির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ৫১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ৮৪,০০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে সেগুন গাছ, ১৬,০০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে বাঁশ, ২৪,০০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে দিয়াশলাই শিল্পের উপযোগী কাষ্ঠের গাছ, ৮,৮০০ হেক্টর পরিমিত জমিতে ওয়াট্‌ল্‌

গাছ, ১২,৪০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠের গাছ এবং ১,৩০,০০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে অন্যান্য গাছপালা নূতন করিয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে যাহাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জ্বালানি কাষ্ঠের বৃক্ষাদি রোপণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেলপথ, বড় রাস্তা, খাল প্রভৃতির উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থা হইয়াছে। উন্নত ধরনের কাষ্ঠসংগ্রহের ও অরণ্য অঞ্চলে ২৪,১৫০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের বন্দোবস্ত এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কষ্ঠ সহনশীল করিবার জন্য, বনভূমির পরিমাপের জন্য, বনজ সম্পদ সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য, কর্মীদের বনবিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য, বনভূমির শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ মিটাইবার জন্য এই পরিকল্পনায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বনভূমির উন্নতির জন্য ১১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় ৯.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে শাল, সেগুন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি সৃষ্টির, ১৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জ্বালানি কাষ্ঠের বনভূমি সৃষ্টির এবং বনাঞ্চলে ১৬ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

এইভাবে চতুর্থ পরিকল্পনা শেষ হওয়া পর্যন্ত ২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে মনুষ্যসৃষ্ট বনভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে এইপ্রকার বনভূমি গড়িয়া উঠিবে।

পঞ্চম পরিকল্পনায় বনভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ২৩৯ কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এই খাতে ৬৯২.৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

A. Fssay-Type Questions

1. Show the relationship between the distribution of rainfall and the distribution of the different types of forests in India. What are principal commercial products from these forests ?

[C. U. B. Com. 1960]

(ভারতে বৃষ্টিপাতের বণ্টন ও বিভিন্ন প্রকার বনভূমি-বণ্টনের সম্পর্ক দেখাও। এই সকল বনভূমির প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক সম্পদ কি কি?)

উঃ—'বনভূমির বণ্টন' (১৩৫—১৩৬ পৃঃ) ও 'বনভূমির ব্যবহার' (১৩৭—১৩৯ পৃঃ) হইতে লিখ।

2. Classify the forest resources of India and narrate their economic importance. [H. S. Examination, 1983]

(ভারতের বনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।)

উঃ—'বনভূমির বণ্টন' (১৩৫—১৩৬ পৃঃ) ও 'বনভূমির ব্যবহার' (১৩৭—১৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Classify the forests of India and mention the areas where these are found. What are the principal forest products of India?

[H. S. Examination, 1980]

(ভারতের অরণ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ কর এবং এগুলি কোন্ কোন্ অঞ্চলে দেখা যায় তাহার উল্লেখ কর। ভারতের প্রধান অরণ্যজাত দ্রব্যগুলি কি কি?)

উঃ—'বনভূমির বণ্টন' (১৩৫—১৩৬ পৃঃ) এবং 'উপজাত দ্রব্য' (১৩৮—১৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. What are the different types of forests found in India? Give the important products of Indian forests.

[**Specimen Question, 1980 & 1981**]

(ভারতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর অরণ্য দেখা যায়? ভারতের অরণ্যজাত দ্রব্য সমূহের বিবরণ দও।)

উঃ—'বনভূমির বণ্টন' (১৩৫—১৩৬ পৃঃ) এবং 'উপজাত দ্রব্য' (১৩৮—১৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. Indicate the present state of lumber industry of India.

(ভারতে কাষ্ঠশিল্পের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর।)

উঃ—'বনভূমির ব্যবহার' (১৩৭—১৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. In what ways the different types of forests could be economically utilised? Assess the importance of the forest resources in India from the standpoint of their economic utilisation.

(বিভিন্ন প্রকার বনভূমির অর্থনৈতিক ব্যবহার কিভাবে করা যাইতে পারে? অর্থনৈতিক ব্যবহারের দিক বিবেচনা করিয়া ভারতের বনজ-সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা কর।)

উঃ—'বনভূমির ব্যবহার' (১৩৭—১৩৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. Describe the chief forest areas of India and write an account of the forest products of the country.

[**Tripura H. S. Examination, 1981**]

(ভারতের প্রধান প্রধান বনভূমি অঞ্চল বর্ণনা কর এবং এই দেশের বনজ সম্পদের বিবরণ দাও।)

উঃ—'বনভূমির বণ্টন' (১৩৫—১৩৬ পৃঃ) ও 'বনভূমির ব্যবহার' (১৩৭—১৩৯ পৃঃ) হইতে লিখ।

8. Classify the forests of India and describe their utilisation. Examine the forest conservation programme introduced in India during the Five-Year Plan periods. [**Specimen Question, 1978**]

(ভারতের বনভূমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর এবং ঐগুলির ব্যবহার বর্ণনা কর। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বনভূমি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা কর।)

উঃ—'বনভূমির বণ্টন' (১৩৫—১৩৬ পৃঃ) ও 'বনভূমির-সংরক্ষণ' (১৩৯—১৪০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes explaining the following statements:

(a) 'Savana' grasslands are found in the central part of the Deccan.

(b) Cinchona is found in regions having heavy rainfall.

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলির কারণ নির্দেশ করিয়া সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ

(ক) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যাঞ্চলে 'সাভানা' তৃণভূমি দেখা যায়।
(খ) যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, সেই সকল অঞ্চলে সিঙ্কোনা জন্মে।]

উঃ—'গুল্ম ও তৃণভূমি' (১৩৬ পৃঃ) হইতে ক-এর এবং 'উপজাত দ্রব্য' (১৩৮—১৩৯ পৃঃ) হইতে খ-এর উত্তর লিখ।

C. Objective Questions

1. Construct correct answers from the following statements :

(a) The major products of Indian forests are timber and fire wood/coal and oil.

(b) The major by-products of Indian forests are sugar and barley/resin and cinchona.

(c) There are dense Sal forests in the Western Ghats/Deccan Lava Country/Central Indian High Lands.

[H. S. Examination, 1984]

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর প্রস্তুত করঃ
(ক) ভারতের বনভূমির প্রধান উৎপন্নদ্রব্য কাষ্ঠসম্পদ ও জ্বালানি কাঠ/কয়লা ও খনিজ তৈল।
(খ) ভারতের বনভূমির প্রধান উপজাত দ্রব্য চিনি ও বার্লি/ধুনা ও সিঙ্কোনা।]
(গ) পশ্চিমঘাট পর্বত/দাক্ষিণাত্যের লাভা অঞ্চল/মধ্য ভারতের উচ্চভূমি অঞ্চলে ঘন শালবন আছে।]

2. Fill up the blanks :

(a) Evergreen forests occur in heavy rainfall areas of the —— coast of the Deccan, —— and Assam. Generally, rainfall of —— cm. and temperature of —— °C favour the growth of such forests. (b) Monsoon deciduous forests are found at the foot of the Himalayas and on the —— plateau. (c) Lac worms live on the leaves of ——, ——, —— trees etc., which grow abundantly in the states of south-east Bihar, —— and ——. About ——% of the total lac production comes from these three states. India occupies the —— place in lac production in the world. (d) —— is collected from Chirpine trees. —— oil is also gathered from it.

২। শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ (ক) অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত দাক্ষিণাত্যের — উপকূলে, — ও আসামে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি বিদ্যমান। মোটামুটি — সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ও — সেন্টিগ্রেড উত্তাপ এই বনভূমি সৃষ্টির সহায়ক। (খ) হিমালয়ের পাদদেশে ও —মালভূমিতে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি বিদ্যমান। (গ) —, —, — প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া লাক্ষাকীট বাঁচিয়া থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব বিহার, — ও — এই জাতীয় বৃক্ষ প্রচুর জন্মায়। এইজন্য এই তিনটি রাজ্যে ভারতের শতকরা — ভাগ লাক্ষা পাওয়া যায়। লাক্ষা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে — স্থান অধিকার করে। (ঘ) চিরপাইন গাছ হইতে — সংগ্রহ করা হয়। ইহা হইতে — তৈল পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়

পরিবহণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যপথ, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র

(Transport System, Trade Routes, Ports & Trade Centers)

পরিবহণ-ব্যবস্থা ও বাণিজ্যপথ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্হা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একস্হান হইতে অন্যস্হানে দ্রুত যাতায়াতের জন্য এবং দ্রুত পণ্যদ্রব্য ও ডাক পরিবহণের জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। ব্রিটিশ রাজত্বে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন করা হইয়াছিল দেশ শাসনের সুবিধার জন্য, ভারত হইতে কাঁচামাল ব্রিটেনে লইয়া যাইবার জন্য এবং ব্রিটেন হইতে এদেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানির জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই দেশ শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতেছে। সাধারণ মানুষ যাহাতে সহজে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভালভাবে যাতায়াত করিতে পারে, যাহাতে দ্রুত মালপত্র প্রেরণ করিয়া শিল্পের অগ্রগতিতে সাহায্য করা যায়, ইহাই বর্তমান সরকারের পরিবহণ নীতি। সেইজন্য নূতন নূতন রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মিত হইতেছে, সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, রেল-ইঞ্জিন ও বিমানপোত-নির্মাণের সুবন্দোবস্ত হইতেছে, রেলপথের পুনর্বিন্যাস হইতেছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত পরিবহণ-ব্যবস্হার উন্নতি-সাধনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হইতেছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৪৭৬ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১,২৪১ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ২,১১২ কোটি টাকা, চতুর্থ পরিকল্পনায় ৩,০৮০ কোটি টাকা এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় ৬,৮৭১ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে।

ভারতে প্রধানতঃ চারশ্রেণীর পরিবহণ-ব্যবস্হা বিদ্যমান ঃ সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথ। সড়কপথে মোটরগাড়ি, ট্রামগাড়ি, গরু-মহিষাদির গাড়ি প্রভৃতির সাহায্যে মানুষ ও পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হইয়া থাকে। জলপথকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—অভ্যন্তরীণ জলপথ ও সামুদ্রিক জলপথ। সকল প্রকারের পরিবহণ-ব্যবস্হায়ই সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের পরিবহণ ব্যবস্হা বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন পরিবহণ-ব্যবস্হার খরচের উপরও ইহার ব্যবহার বহুলাংশে নির্ভরশীল।

ভারতের রেলপথের প্রধান সমস্যা এই যে, ইহার ভাড়া অত্যন্ত বেশী। অভ্যন্তরীণ জলপথের ভাড়া ইহার তুলনায় অনেক কম। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোটর-পথেও রেলপথ অপেক্ষা ভাড়া কম। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে কয়লা অল্প-দূরের স্হানসমূহে মোটরপথে প্রেরিত হইতেছে। রেলপথসমূহকে দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র লইয়া যাওয়া যায় না ; কারণ, ইহাতে রেলপথ-নির্মাণের খরচ সকল সময় পোষায় না। সেইজন্য অভ্যন্তরস্হ গ্রামাঞ্চলের পরিবহণ-ব্যবস্হায় মোটরগাড়ি, নৌকা ও স্টীমার ব্যবহৃত হওয়া উচিত। রেলগাড়ি নির্দিষ্ট পথে ও নির্দিষ্ট সময়ে চলে ; কিন্তু মোটরগাড়ি যে-কোনো সময়ে যে-কোনো রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। গুরুভার দ্রব্যাদির পরিবহণে জলপথ সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ; কারণ ধীরগামী হইলেও জলপথে ভাড়া সর্বাপেক্ষা কম। দ্রুত পরিবহণের জন্য বিমানপথ, মোটরপথ ও রেলপথের সাহায্য লইতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যধিক ভাড়ার জন্য বিমানপথের সুযোগ লওয়া সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য ভারতে মোটরপথ ও রেলপথ সর্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য পরিবহণ ব্যবস্থা। লঘুভার ও দ্রুত পচনশীল দ্রব্যাদি বহনের পক্ষে রেলপথ ও মোটরপথই শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতে চাহিদার তুলনায় রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটে নাই। সেইজন্য দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য অভ্যন্তরীণ নদী ও খালপথ এবং মোটরপথের উন্নতিসাধন করাও একান্ত প্রয়োজন।

যে কোনো দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের মতো ক্রমোন্নতিশীল দেশের পক্ষেও পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতের ভূ-প্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ; কোথাও পার্বত্যভূমি, কোথাও মরুভূমি, কোথাও মালভূমি আবার কোথাও সমতলভূমি। ইহা ছাড়া নদী, সাগর, মহাসাগর তো আছেই। এইজন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতে এখনও পরিবহণকার্যে পশু ব্যবহৃত হয়—গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি এদেশে আজও প্রচলিত। আবার যান্ত্রিক যানেরও অভাব নাই—মোটর গাড়ি, লরী, বাস প্রভৃতি বিদ্যমান। রেলপথ ও আকাশপথেরও ব্যবহার যথেষ্ট আছে। এই সকল বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা বিশেলষণ করিয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের পরিবহণ ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রয়োজন। যেমন, পার্বত্য অঞ্চলে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, বা মোটরগাড়ির ব্যবস্থা করা উচিত ; এইরূপ স্থানে বিমানপোতের বন্দোবস্তও থাকা প্রয়োজন। আবার সমতলভূমিতে সকল রকম পরিবহণ-ব্যবস্থাই থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই সকল পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসার করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, একশ্রেণীর পরিবহণ-ব্যবস্থা অন্য শ্রেণীর পরিবহণ-ব্যবস্থার সহিত যেন প্রতিযোগিতা করিয়া জাতীয় অপচয় না ঘটায়। যেমন, সমতলভূমির একই অঞ্চলে সমান্তরাল রাস্তায় রেলপথ ও মোটরপথের প্রচলন থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় অপচয়ের কারণ ঘটিতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন পরিবহণ-ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করিয়া ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা একান্ত প্রয়োজন এবং উপরে বর্ণিত কারণে পরিবহণ-ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৫৯ সালে নিয়োগী কমিটি গঠিত হয় ; উহার রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন ভারতে পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইহার ফলে, সড়কপথ-রেলপথ (Road-rail), সড়কপথ-জলপথ (Road-sea) ও রেলপথ-জলপথের (Rail-sea) সমন্বয় সাধনের বন্দোবস্ত করা হয়।

সড়কপথ (Roadways)

ভারতের সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। সভ্যতার নিত্যসঙ্গী রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা। সুতরাং ভারতে যে প্রাচীনকাল হইতেই রাস্তাঘাট বিদ্যমান ছিল, ভারতের বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মোগল ও পাঠান রাজত্বের সময়ও ভারতে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে নূতনভাবে বিশেষ কিছু নির্মিত হয় নাই, শুধু ইহার সংস্কার ও পরিবর্ধন হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে নাগপুরে ভারতের রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাগপুরের এই সভায় যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাহা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় এই দেশের রাস্তাঘাটের পরিমাণ দেশের আয়তনের তুলনায় নগণ্য ছিল।

নূতনভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ পুনরায় আরম্ভ হয় স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই সকল পরিকল্পনায় নাগপুর পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধনের চেষ্টা হয়। ইহা ছাড়া পুরাতন রাস্তাঘাটের সংস্কার ও বহু সেতু নির্মাণও এই সকল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ৩৩টি বৃহদায়তনের সেতু নির্মিত হয় এবং বহু নূতন রাস্তা নির্মিত হয়। ইহার জন্য মোট ব্যয় হয় ১৪৭ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহু নূতন রাস্তা ও ৬০টি বৃহদায়তনের সেতু নির্মিত হয় এবং ২,৭০০ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার সাধন করা হয়। ইহার জন্য মোট খরচ হইয়াছে ২২৪ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য ৩২৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার কার্যকালে নূতন ৪০,০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল। জাতীয় সড়কপথসমূহের উন্নতিসাধনও এই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক-পথের উন্নয়নের জন্য মোট ১,১৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় সড়কপথের উন্নতির জন্য ৪২৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ভারতের সড়কপথের দৈর্ঘ্য হইয়াছিল ৩৮৫ লক্ষ কিলোমিটার। পঞ্চম পরিকল্পনায় পাটনায় গঙ্গার উপর সেতু এবং কলিকাতায় হুগলী নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য ২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে সর্বপ্রকার আবহাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত সড়ক নির্মাণের জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হয় ১,৩৪৮ কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সড়কপথ উন্নয়নের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ৩,৪৩৯ কোটি টাকা।

বর্তমানে ভারতে জাতীয় সড়কপথ, রাজ্য সড়কপথ ও বিভিন্ন রাজ্যের P. W. D. পরিচালিত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৫,৪০,৭২০ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ৪,২০,১৬৫ কিলোমিটার এবং কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১,২০,৫৫৫ কিলোমিটার। ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ৬,৭৪,২৮০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা আছে। মোট রাস্তার পরিমাণ ১২,১৫,০০০ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে জাতীয় সড়কপথের (National Highways) দৈর্ঘ্য ৩১,৩৫৮ কিলোমিটার।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যপথের মাধ্যমে বাণিজ্যকেন্দ্রের সংযোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। ইহা একমাত্র রাস্তার উন্নতিসাধনের দ্বারাই সম্ভব। শিল্পের উন্নতির জন্য রাস্তাঘাটের প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চল হইতে কাঁচামাল আনিতে এবং গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যাদি পৌঁছাইয়া দিতে রাস্তাঘাটের প্রয়োজন।

ভারতের রাস্তাসমূহকে প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়—জাতীয় সড়কপথ, রাজ্য সড়কপথ, জেলা সড়কপথ ও গ্রাম্যপথ। জাতীয় পথসমূহ পাকা রাস্তা। এইগুলি দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সড়কপথ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে থাকে। রাজ্য সড়কপথ রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও জাতীয় সড়কপথের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এই সড়কপথ রাজ্যের এক জেলা হইতে অন্য জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। জেলা-সড়কপথসমূহ জেলার অভ্যন্তরে বা অন্য জেলার সহিত যোগাযোগের জন্য নির্মিত হয়। ইহা জেলাবোর্ডের অধীন। গ্রাম্য

রাস্তাসমূহ প্রধানতঃ গ্রামের মধ্যে চলাচলের জন্য ও গ্রামের চারিদিকে গন্তব্যস্থানে যাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভারতে মোট ৫৫টি জাতীয় সড়কপথ আছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত আটটি সড়কপথ বিখ্যাত। প্রথমটি **গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড** ; ইহা কলিকাতা হইতে বারাণসী, এলাহাবাদ, দিল্লী ও পাকিস্তানের পেশোয়ার হইয়া খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত
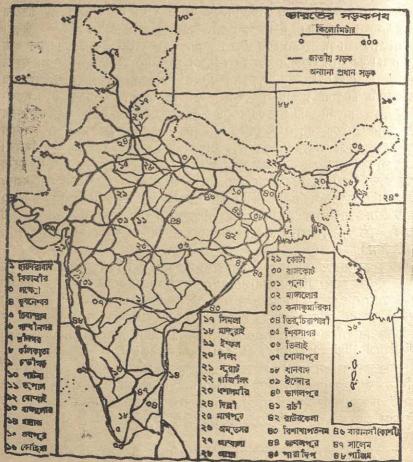
গিয়াছে। দ্বিতীয়টি **কলিকাতা-মাদ্রাজ সড়কপথ** ; ইহা কলিকাতা হইতে কটক, বিশাখাপতনম্ বেজোয়াদা ও নেল্লোর হইয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়াছে। তৃতীয়টি **মাদ্রাজ ও বোম্বাই সড়ক পথ** ; ইহা মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর, হুবলী ও পুনে হইয়া বোম্বাই শহর পর্যন্ত গিয়াছে। চতুর্থটি **বোম্বাই-দিল্লী সড়কপথ** ; ইহা বোম্বাই শহর হইতে ইন্দোর, ঝাঁসী ও আগ্রা হইয়া দিল্লী পর্যন্ত গিয়াছে। পঞ্চমটি **কলিকাতা হইতে নাগপুর হইয়া বোম্বাই** পর্যন্ত গিয়াছে। ষষ্ঠটি **বোম্বাই-দিল্লী সড়কপথ** ; ইহা জয়পুর, উদয়পুর আমেদাবাদ ও বরোদা হইয়া দিল্লী পর্যন্ত গিয়াছে। সপ্তমটি **বারাণসী-কন্যাকুমারী সড়কপথ** ; ইহা নাগপুর

হায়দরাবাদ ও বাঙ্গালোর হইয়া কন্যাকুমারী পর্যন্ত গিয়াছে। অষ্টমটি **কলিকাতা-তাম্মু সড়কপথ** ; ইহা বহরমপুর, মালদহ, শিলিগুড়ি, গোহাটি, গোলাঘাট ও ইম্ফল হইয়া ব্রহ্মসীমান্তে তাম্মু শহর পর্যন্ত গিয়াছে। এইগুলি ছাড়া আমেদাবাদ-পোরবন্দর ও সালেম-কন্যাকুমারী জাতীয় সড়কপথ দুইটি উল্লেখযোগ্য। ভারতের এই সকল জাতীয় সড়কপথ এই দেশের প্রধান **বাণিজ্যপথ** হিসাবে কাজ করে। জাতীয় সড়কপথ অপেক্ষা ভারতের প্রাদেশিক সড়কপথ ও গ্রাম্য রাস্তার দৈর্ঘ্য অনেক বেশী।

ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই **সীমান্ত পথের (Frontier Routes)** মারফত বাণিজ্য চলিতেছে। এই সীমান্ত পথ ভারতের সীমান্তবর্তী দেশসমূহের সহিত ভারতের প্রধান বাণিজ্যপথ হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে সীমান্ত পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৮০০ কিলোমিটার। ভারত হইতে উত্তর বা পূর্ব সীমান্তের দেশসমূহে যাইবার জন্য কোনো রেলপথ নাই। সেইজন্য সীমান্ত পথের মাধ্যমেই যাতায়াত করিতে হয়। চমরী গাই, অশ্বতর, ঘোড়া, উষ্ট্র প্রভৃতিতে চড়িয়া এই পথ অতিক্রম করিতে হয়। কাশ্মীরের লেহ্ হইতে একটি সীমান্ত পথ চীনের তিব্বত ও সিংকিয়াং পর্যন্ত গিয়াছে। প্রায় ৫,৫০০ মিটার উচ্চ কারাকোরম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া এই পথ চলিয়া গিয়াছে। দার্জিলিং, নৈনিতাল ও চৌতিয়া হইতে তিব্বত যাইবার সীমান্ত পথ আছে। এই সকল পথের মাধ্যমে বাণিজ্য সংঘটিত হয়। আসামের লেডো হইতে স্টিলওয়েল রোড (লেডো-বর্মা রোড) ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীনের কুনমিং পর্যন্ত গিয়াছে। লেডো হইতে এই পথের মাধ্যমে কুনমিং-এর দূরত্ব প্রায় ১,৬৮০ কিলোমিটার। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রেলপথে ও জলপথে বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

ভারতে আয়তন ও প্রয়োজনের তুলনায় এখনও রাস্তাঘাটের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। এখানে প্রতি ১০০ বর্গ-কিলোমিটার এলাকায় ৩৭ কিলোমিটার সড়কপথ আছে। এখনও প্রতি ১ লক্ষ লোকের জন্য এই দেশে মাত্র ২২২ কিলোমিটার রাস্তা আছে; কিন্তু প্রতি ১ লক্ষ লোকের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪,০০০ কিলোমিটার, ফ্রান্সে ১,৫০০ কিলোমিটার এবং ব্রিটেনে ৬৪০ কিলোমিটার রাস্তা আছে। এই দেশের অধিকাংশ রাস্তায় বহু ত্রুটি দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে প্রশস্ত রাস্তা নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশ রাস্তাই অতি সংকীর্ণ। বহু রাস্তার অন্তর্বর্তী নদীর উপর এখনও সেতু নির্মিত না হওয়ায় রাস্তাসমূহ বিশেষ কাজে লাগে না। বহু ক্ষেত্রে রাস্তাসমূহ সংস্কারের অভাবে অকেজো হইয়া যায়।

সড়কপথ প্রকৃতপক্ষে রেলপথের প্রতিযোগী নহে ; উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। রেলপথ প্রধানতঃ দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সহায়ক। সড়কপথসমূহ গ্রামাঞ্চল হইতে রেলপথ পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখে। অল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে সড়কপথ অধিকতর কার্যকরী। সুতরাং ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইলে রেলপথ ও সড়কপথ উভয়েরই উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন।

রেলপথ (Railways)

আধুনিক যুগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্বে এই দেশে কোনো রেলপথ ছিল না। দেশ শাসনের সুবিধার জন্য, বিদ্রোহ দমনের জন্য, এই দেশের কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানির

উদ্দেশ্যে বন্দরে যাইবার জন্য ব্রিটিশ সরকার এদেশে ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল প্রথম রেলপথ স্থাপন করে; বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত প্রথমে ৩২ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপিত হয়। রেলপথের অভাবে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিতে ব্রিটিশ সরকারকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য ১৮৫৭ সালের পর সরকার রেলপথের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়। ক্রমে ক্রমে ব্রিটেন হইতে E. I. Railway Co., B. N. Railway Co., M. S. M. Railway Co. ইত্যাদি বিভিন্ন রেল কোম্পানীর আগমন হইল। এই সকল রেল কোম্পানী এদেশ হইতে প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিয়া ব্রিটেনে লইয়া যাইত। পরে ব্রিটিশ সরকার দুই একটি করিয়া রেলপথের জাতীয়করণ শুরু করে।

দেশ স্বাধীন হইবার পর বড় রেলপথসমূহের জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের পরে ১৯৫১-৫২ সালে ভারত সরকার রেলপথসমূহের পুনর্বিন্যাস (Re-grouping of Railways) সাধন করেন এবং সমগ্র রেলপথকে ৮টি রেলপথ-অঞ্চলে বিভক্ত করেন। ইহার পর ১৯৬৫ সালে পুনরায় দক্ষিণ ও মধ্য রেলপথকে পুনর্বিন্যাস করিয়া আরও একটি রেলপথের সৃষ্টি হয়। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে অনেক সুবিধা দেখা গিয়াছে। বর্তমানে প্রতিটি রেলপথ-অঞ্চল এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা। ইহার ফলে পরিচালনার ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে এবং রেলপথের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'গেজ' হিসাবে রেলপথকে ভাগ করিলে দেখা যাইবে যে, একটি রেলপথে সাধারণতঃ একপ্রকার গেজের আধিক্য থাকে। পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ-মধ্য রেলপথে ব্রডগেজের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব রেলপথে মিটার গেজের পথ বেশী।

ভারতের অধিকাংশ রেলপথের জাতীয়করণ হইলেও বর্তমানে ৭২৮ কিলোমিটার রেলপথ বে-সরকারী মালিকানায় ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সরকারী রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬১,২৩০ কিলোমিটার। ভারতের রেলপথে সাধারণতঃ তিন প্রকার গেজ দেখা যায়—ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ। রেলপথের পুনর্বিন্যাসের ফলে বর্তমানে ৯টি রেলপথ-অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে ইহাদের বিবরণ দেওয়া হইল:

(১) **পূর্ব রেলপথ (Eastern Railway)**—এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য ৪,২০৪ মিটার; ইহার সদর দপ্তর **কলিকাতা**। হাওড়া-বর্ধমান-মোগলসরাই, হাওড়া-কিউল, শিয়ালদহ-লালগোলাঘাট, শিয়ালদহ-বাংলাদেশ সীমান্ত, শিয়ালদহ-ডায়মন্ড-হারবার প্রভৃতি এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ঝরিয়া ও রানীগঞ্জের কয়লাখনি, বিহারের অভ্রখনি, চিত্তরঞ্জনের রেল কারখানা, সিন্ধ্রির সার কারখানা, বার্নপুর ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি ও কলিকাতার নিকটবর্তী কাগজ, বস্ত্র, পাট, মোটরগাড়ি, চর্মদ্রব্য, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

(২) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (South-Eastern Railway)**—এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য ৭,০৪১ কিলোমিটার; সদর দপ্তর **কলিকাতা**। হাওড়া-টাটানগর (জামসেদপুর), রাউরকেলা-ভিলাই-নাগপুর, হাওড়া-কটক-পুরী-ওয়ালটেয়ার, হাওড়া-গোমো এবং টাটানগর-আদ্রা-আসানসোল প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য লাইন। কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, চুনাপাথর প্রভৃতি খনি অঞ্চল হইতে তিনটি ইস্পাত কারখানায় (ভিলাই, রাউরকেলা ও টাটানগর) লইয়া যাওয়া এই রেলপথের অন্যতম প্রধান কাজ।

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ওড়িশার কাগজ, সিমেন্ট ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, অভ্র ও লৌহ-রপ্তানি প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।
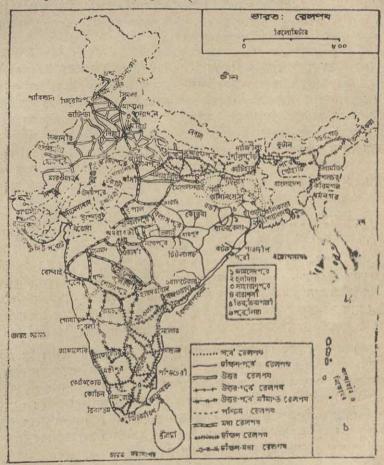
(৩) **উত্তর রেলপথ (Northern Railway)**—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০,৯৭২ কিলোমিটার ; ইহার সদর দপ্তর **দিল্লী**। পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী এবং রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান লাইনসমূহঃ দিল্লী-আম্বালা-অমৃতসর, দিল্লী-যোধপুর-পাকিস্তান সীমান্ত প্রভৃতি। গম, তুলা, পশম, তৈল-বীজ, চর্ম, চিনি প্রভৃতি এই রেলপথ পরিবহণ করিয়া থাকে। দিল্লী ও কানপুরের কার্পাস বয়ন শিল্প, কানপুরের চর্মশিল্প ও পশমশিল্প এবং উত্তর প্রদেশের চিনিশিল্প এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

(৪) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ (North-Eastern Railway)**—ইহার দৈর্ঘ্য ৫,১৬৩ কিলোমিটার ; সদর দপ্তর **গোরক্ষপুর**। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের উত্তরাংশ ইহার

অন্তর্ভুক্ত। গোরক্ষপুর-বারাণসী-এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর-কাটিহার, গোরক্ষপুর-লক্ষ্মৌ-কানপুর প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য লাইন। এই রেলপথ এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্মৌ ও বারাণসীতে উত্তর রেলপথের সহিত এবং কাটিহারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইক্ষু, চিনি, পাট, চাউল, ফল, সিমেন্ট, কাষ্ঠ প্রভৃতি এই রেলপথ পরিবহণ করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের শ্রম-শিল্পের মধ্যে চিনিশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (North-Eastern Frontier Railway)**—ইহার দৈর্ঘ্য ৩,৬১৩ কিলোমিটার ; সদর দপ্তর গৌহাটির নিকটবর্তী **মালিগাও**। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এই রেলপথের অন্তর্গত। মণিহারিঘাট হইতে ইহার প্রধান লাইন কাটিহার, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, পাণ্ডু ও তিনসুকিয়া হইয়া সাইখোয়াঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। মণিহারিঘাট হইতে পাণ্ডু পর্যন্ত এই রেলপথকে **আসাম লিংক (Assam Link)** বলা হয়। একটি লাইন লামডিং হইতে শিলচর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা এবং ডিগবয়ের খনিজ তৈল এই রেলপথের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ইহা ছাড়া পাট, ফল, ইক্ষু, ধান, কাঠ প্রভৃতি এই রেলপথে পরিবাহিত হয়।

(৬) **পশ্চিম রেলপথ (Western Railway)**—ইহার দৈর্ঘ্য ১০,২৯৩ কিলোমিটার ; সদর দপ্তর **বোম্বাই চার্চগেট**। গুজরাট, উত্তর মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান লাইনসমূহ ঃ বোম্বাই-আমেদাবাদ-ভিরমগাম, বোম্বাই-বরোদা-আগ্রা, বোম্বাই-আমেদাবাদ-জয়পুর-দিল্লী, দিশা-গান্ধীগ্রাম-কাণ্ডলা ইত্যাদি। বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বরোদার কার্পাস-বয়নশিল্পে এই রেলপথের দান অসামান্য। গুজরাটের লবণ ও রাসায়নিক শিল্প, বোম্বাই ও কাণ্ডলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

(৭) **মধ্য রেলপথ (Central Railway)**—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,৩০৯ কিলোমিটার, সদর দপ্তর **বোম্বাই**। মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান লাইনসমূহ ঃ বোম্বাই-ভূপাল-ঝাঁসী-দিল্লী, বোম্বাই-পুনে-রায়চুর, বোম্বাই-নাগপুর ইত্যাদি। তুলা, ম্যাঙ্গানিজ, কাষ্ঠ, তৈলবীজ, গম, চিনি, চর্মদ্রব্য প্রভৃতি এই রেলপথ পরিবহণ করে। বোম্বাই বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, বোম্বাই-এর কার্পাসশিল্প, মধ্য প্রদেশের সিমেন্ট-শিল্প প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

(৮) **দক্ষিণ রেলপথ (Southern Railway)**—ইহার দৈর্ঘ্য ৬,৭০৩ কিলোমিটার ; সদর দপ্তর **মাদ্রাজ**। কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান লাইনসমূহ মাদ্রাজ-নেল্লোর-ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ-রায়চুর, মাদ্রাজ-সালেম-কোঝিকোড-ম্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ-রামেশ্বরম্‌, মাদ্রাজ-মাদুরাই-ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি। তুলা, তৈলবীজ, লবণ, ইক্ষু, কাষ্ঠ, চা, কফি, মসলা, স্বর্ণ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, চর্ম প্রভৃতি এই রেলপথে পরিবাহিত হয়। তামিলনাড়ুর কার্পাসশিল্প, বাঙ্গালোরের বিমানপোত নির্মাণ শিল্প, ভদ্রাবতীর ইস্পাতশিল্প প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। নেভেলীতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইলে এই রেলপথের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া যাইবে।

(৯) **দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ** (**South-Central Railway**)—১৯৬৫ সালে এই নূতন রেলপথটির সৃষ্টি হয়। ইহা ভারতের **নবম** রেলপথ। ইহার দৈর্ঘ্য **৬,৯৩২** কিলোমিটার। ইহার সদর দপ্তর **সেকেন্দ্রাবাদ**। মধ্য রেলপথের শোলাপুর ও সেকেন্দ্রাবাদ বিভাগ (পুনে-ধন্দ-মানমদ শাখা ব্যতীত) এবং দক্ষিণ রেলপথের হুবলী ও বেজওয়াদা বিভাগ লইয়া এই নূতন রেলপথটি সৃষ্টি হইয়াছে। মানমদ, হায়দরাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, বেজওয়াদা, হুবলী প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ভারতের এই সকল রেলপথ দেশের বাণিজ্যপথ হিসাবে কাজ করে।

১৯৭৭ সালের ২রা অক্টোবর হইতে দক্ষিণ-মধ্য রেলপথের শোলাপুর ডিভিশন, মধ্য রেলপথের এবং দক্ষিণ রেলপথের গুন্টকল (Guntkal) ডিভিশন দক্ষিণ-মধ্য রেলপথের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways)

ভারত নদীমাতৃক দেশ। নদী উপত্যকায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে নদীপথে ও খালপথে নৌকা, স্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে পরিবহণ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। নদী হইতে বা বৃহদাকার জলাশয় হইতে সাধারণতঃ খাল কাটিয়া পরিবহণ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়। ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থায় রেলপথের পরেই অভ্যন্তরীণ জলপথের স্থান। এই দেশে বর্তমানে প্রায় ১৪,১৫০ কিলোমিটার সুনাব্য নদীপথ ও খালপথ বিদ্যমান। ৫,২০০ কিলোমিটার নদীপথ ও ৪৮৫ কিলোমিটার খালপথ স্টীমার ও লঞ্চ চলার উপযুক্ত; কিন্তু মাত্র ১,৭০০ কিলোমিটার নদীপথে ও ৩৩১ কিলোমিটার খালপথে স্টীমার চলে। অন্যত্র ছোট-বড় নৌকা চলাচল করে। এখনও ভারতে জলপথে মালপত্র পরিবহণের পরিমাণ অনেক কম। একথা ঠিক যে, জলপথে মালপত্র পরিবহণের জন্য অধিক সময় প্রয়োজন ; কিন্তু জলপথ অত্যন্ত সুলভ। সেইজন্য ভারী পণ্যদ্রব্য সর্বদা সময় হাতে রাখিয়া জলপথে পাঠানো উচিত ; তাহা হইলে একদিকে রেলপথের উপর চাপ কমিয়া যাইবে, অন্য-দিকে জলপথের উন্নতি সাধিত হইবে।

উত্তর ভারতের নদীসমূহ সারা বৎসর তুষার-গলা জলে পূর্ণ থাকে বলিয়া সাধারণতঃ নৌ-চলাচলের উপযুক্ত। উত্তর ভারতের নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বর্তমানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল নদীর মাধ্যমে বিস্তীর্ণ বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হইয়াছে।

গঙ্গা—ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হইতে নির্গত হইয়া হরিদ্বারের নিকট এই নদী সমতলভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার একটি শাখা বাংলাদেশে পদ্মা নামে প্রবাহিত ; অপর শাখা পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নামে এবং কলিকাতার নিকট হুগলী নামে খ্যাত। উপনদী চম্বল ও বেতোয়াসহ যমুনা এবং শোণ নদী গঙ্গার সহিত উহার দক্ষিণ তীরে মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার বামতীরের উপনদীসমূহের মধ্যে গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গঙ্গানদী উত্তর ভারতের জলপথে প্রধান পরিবাহক। এই নদীর তীরে কলিকাতা, ভাগলপুর, পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, হরিদ্বার প্রভৃতি শহর অবস্থিত। যমুনা নদীর তীরে দিল্লী, মথুরা, আগ্রা প্রভৃতি শহর অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র—এই নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৭০০ কিলোমিটার। তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট হইতে নির্গত হইয়া সদিয়া নামক স্থানে আসামে প্রবেশ করিয়া আসাম ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদ বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। তিব্বতে সান্‌পো নামে, উত্তর-পূর্ব আসামে ডিহং নামে এবং নিম্ন আসামে ইহা ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। আসামের চা ও পাট এবং বাংলাদেশের পাট এই নদীপথে কলিকাতায় আনীত হয়। ইহার উপনদীসমূহের মধ্যে সুবর্ণশ্রী, তিস্তা, করতোয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই নদীর তীরে ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি শহর অবস্থিত।

দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহ গ্রীষ্মকালে জলাভাবে শুকাইয়া যায় এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পাইয়া খুব খরস্রোতা হয়। সেইজন্য এখানকার নদীসমূহ নৌ-চলাচলের উপযোগী নহে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে এই সকল নদী খুবই কার্যকরী। নর্মদা নদী মহাকাল পর্বত হইতে এবং তাপ্তী নদী মহাদেব পর্বত হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। অন্যান্য নদী পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **মহানদী** প্রধানতঃ মধ্য প্রদেশ ও ওড়িশার মধ্য দিয়া, **গোদাবরী** ও **কৃষ্ণা** মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের মধ্য দিয়া, **কাবেরী** কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উপনদীসমূহের মধ্যে কৃষ্ণার উপনদী তুঙ্গভদ্রা এবং মহানদীর উপনদী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে পেন্নার ও পেরিয়ার নামে দুইটি ছোট নদী আছে। গোদাবরীর তীরে রাজমহেন্দ্রী, কৃষ্ণা নদীর তীরে সাতারা ও বেজওয়াদা, কাবেরী নদীর তীরে তিরুচিরাপল্লী ও কুম্ভকোণম্‌, নর্মদা নদীর তীরে জব্বলপুর ও ব্রোচ, তাপ্তী নদীর তীরে সুরাট এবং মহানদীর তীরে সম্বলপুর ও কটক অবস্থিত।

ভারতের বিভিন্ন নদীর সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি খাল কাটা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে ইস্টার্ন সার্কুলার খাল, হরিদ্বার ও কানপুরের মধ্যে গঙ্গানদীর খাল, তামিলনাড়ুতে কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যে সংযোগ-সাধনের জন্য বাকিংহাম খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতের নদীপথের উন্নতির জন্য ভারত সরকার 'কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি কমিশন' (Central Irrigation & Power Commission) নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছেন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৫২ সালে 'গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র জলপথ বোর্ড' (The Ganga-Brahmaputra Water Transport Board) স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাকিংহাম খাল, দক্ষিণ উপকূলের খাল এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র জলপথের উন্নতির জন্য ৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় জলপথের উন্নতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছিল ৭.৫ কোটি টাকা। ব্রহ্মপুত্র ও হুগলী নদীর জন্য ড্রেজারের বন্দোবস্ত করা, রাজস্থান খাল, কেরালার পশ্চিম উপকূল খাল এবং ওড়িশার তালডাঙ্গা ও কেন্দ্রপাড়া খালসমূহের উন্নতিসাধন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় জলপথের উন্নতির বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এইজন্য এবং অভ্যন্তরীণ জলপথের অন্যান্য উন্নতির জন্য ১১ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় পাণ্ডু ও যোগীঘোপা বন্দরের উন্নতিসাধন এবং কলিকাতা রাজাবাগান ডকের আধুনিকীকরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। **পঞ্চম পরিকল্পনায়** অভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নতি-কল্পে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। **ষষ্ঠ পরিকল্পনায়** অভ্যন্তরীণ জল-পথের উন্নতিকল্পে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

সমুদ্রপথ (Ocean Transport)

সেই সময় ভারতীয় জাহাজেই মালপত্রের আদান-প্রদান হইত। ব্রিটিশ রাজত্বের সময় ভারতের সমুদ্রপথে ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটে। ১৯২০ সালে সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিঃ সামুদ্রিক বাণিজ্যে অবতীর্ণ হইলেও ব্রিটিশ সরকারের চাপে এই ভারতীয় কোম্পানীটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোক্রমে টিঁকিয়া থাকায় কোম্পানী ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে পরিবহণের অনুমতি পাইতে আরম্ভ করে।

উপকূল বাণিজ্য (Coasting Trade)—ভারতে দীর্ঘ উপকূল পথে জাহাজ চলাচলের বন্দোবস্ত আছে। ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যে বাণিজ্য চলে তাহাকে উপকূল বাণিজ্য (Coasting Trade) বলা হয়। উপকূল বাণিজ্যে দেশীয় নৌকা, স্টীমার ও জাহাজ ব্যবহৃত হয়। পূর্বে বিদেশী জাহাজ এই উপকূল বাণিজ্য দখল করিয়াছিল। স্বাধীনতা পাইবার পর এদেশের সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং ভারত সরকারের সহায়তায় এই সকল উপকূল-বাণিজ্যের মালপত্র পরিবহণ করিবার সুযোগ পায়। ১৯৫১ সাল হইতে উপকূল বাণিজ্য শুধুমাত্র ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ; ইহাতে শত্রুর হাত হইতে উপকূল রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে, আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে এবং ভারতের জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় ভারতীয় জাহাজের মালবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ৯৬ লক্ষ মেঃ টন (GRT) করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯৮৩ সালের ৩১শে মার্চ ভারতীয় জাহাজের মালবহনের ক্ষমতা দাঁড়াইয়াছিল ৫৮·৮৯ লক্ষ মেঃ টন (GRT)। ভারতের উপকূলের বন্দরসমূহের মধ্যে কলিকাতা, পারাদিপ, বিশাখাপতনম্, মাদ্রাজ, কোচিন, বোম্বাই, কাণ্ডলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাহাজ পরিবহণ বিষয়ে উপদেশদানের জন্য ভারত সরকার ১৯৬১ সালে 'ন্যাশনাল শিপিং বোর্ড' গঠন করেন।

ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই দেশের জাহাজসমূহ এখনও সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। ভারতীয় বন্দর হইতে নিকটবর্তী দেশসমূহের (শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি) সহিত যে বাণিজ্য চলে তাহার শতকরা ১০০ ভাগ এবং দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ পণ্যদ্রব্য ভারতীয় জাহাজে পরিবাহিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত সরকার একটি সংস্থার মারফত এই সকল জাহাজ সংগ্রহের ও চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। পূর্বে এই সংস্থার দুইটি শাখা ছিল—ইস্টার্ন শিপিং কর্পোরেশন সমুদ্রপথে ভারতের সহিত অস্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিত ; অন্যটি ওয়েস্টার্ন শিপিং কর্পোরেশন পারস্য উপসাগরস্থ দেশসমূহ, পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা, সোভিয়েত রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সহিত বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য পরিবহণ করিত। এখন এই দুইটি কর্পোরেশন মিলিত হইয়া একটিতে পরিণত হইয়াছে ; উহার নাম The Shipping Corporation of India। এখনও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজ কোম্পানিগুলি (B. I. S. N. Co., P. O. Co.) আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। পূর্বে ভারতীয় জাহাজশিল্প এই সকল কোম্পানীর আধিপত্যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। দেশ স্বাধীন হইবার পর সরকার ১৯৬৯ সালে 'ন্যাশনাল শিপিং বোর্ড' গঠন করেন।

সমুদ্রপথে (**Ocean Routes**) ভারতীয় জাহাজ নিম্নলিখিত পথে চলাচল করে—(ক) ভারত-ব্রিটেন-ইউরোপের অন্যান্য বন্দর, (খ) ভারত-জাপান ও দূরপ্রাচ্য, (গ) ভারত-রেঙ্গুন-সিংগাপুর, (ঘ) ভারত-পারস্য উপসাগর-কৃষ্ণসাগর-সোভিয়েত রাশিয়া, (ঙ) ভারত-বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া, (চ) ভারত-পূর্ব আফ্রিকা, (ছ) ভারত-পোল্যান্ড, (জ) ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা, (ঝ) ভারত-মিশর, (ঞ) ভারত-পূর্ব জার্মানী। সমুদ্রপথে এই সকল জলপথ ভারতের প্রধান বাণিজ্যপথ।

ভারতের উপকূল-বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাহাজের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য বিশাখাপতনমে বিরাট জাহাজ-নির্মাণ শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। সিন্ধিয়া কোম্পানী প্রথমে এই শিল্পটি আরম্ভ করে। বর্তমানে ভারত সরকার ও সিন্ধিয়া কোম্পানীর যুগ্ম মালিকানায় হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক এই শিল্পটি পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতার গার্ডেনরীচে ও বোম্বাই-এর মাজগাঁও ডকে দুইটি জাহাজ-নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা আছে। কোচিনে একটি জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য জাহাজ একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতে হইলেও ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীসমূহ কখনই ভারতের স্বার্থে এবং তাহাদের দেশের স্বার্থের প্রতিকূলে এই দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবে না। এইজন্য জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য কোচিনে একটি নূতন জাহাজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি বহুলাংশে বৈদেশিক মুদ্রা-সংগ্রহ ও শক্তিশালী বিদেশী শক্তিসমূহের সদাশয়তার উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য ভারতের ইচ্ছা থাকিলেও সর্বদা জাহাজ-সংগ্রহ আশানুরূপ হয় না।

বিমানপথ (Airways)

১৯১১ সালে ভারতে প্রথম বিমান চলাচলের সূত্রপাত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে মাত্র ২টি কোম্পানী ছোটখাট বিমান চালাইত। ১৯২৯ সালে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সাপ্তাহিক বিমানপথ খোলা হইল। ইহার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বিমান-পথের উন্নতি আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে সমগ্র ভারত বিমানপথে ছাইয়া গেল, বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠিত হইল, নূতন নূতন বিমানপথ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। যুদ্ধের পরে উদ্‌বৃত্ত বিমান ক্রয় করিয়া বহু কোম্পানী নূতন নূতন বিমানপথ খুলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ১৯৩৮ সালে এই দেশের বিমানপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৮,৩০০ কিলোমিটার ; ১৯৫০ সালে ইহা দাঁড়াইল ৩৫,৩০০ কিলোমিটার।

বিশাল আয়তনের এই দেশে বিমানপথের প্রয়োজনীয়তা যে অত্যন্ত বেশী, ইহা বলাই বাহুল্য। দেশরক্ষার কার্যে, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য, দ্রুত যাতায়াত ও মালপত্র প্রেরণের জন্য বিমানপথ বর্তমান সভ্যজগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ভারত অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ায় এবং স্বাধীনতার পর দেশরক্ষার গুরু দায়িত্ব এই দেশের উপর অর্পিত হওয়ায় বিমানপথের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য ১৯৫৩ সালে ভারতের বে-সামরিক বিমানপথ জাতীয়করণ করা হয়।

ভারতে চারিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে—দমদম (কলিকাতা), সান্তাক্রুজ (বোম্বাই), পালাম (দিল্লী) ও মীনামবক্কম্ (মাদ্রাজ)। ইহা ছাড়া আমেদাবাদ, আগর-

তলা, অমৃতসর, নাগপুর, জয়পুর, তিরুচিরাপল্লী, গৌহাটি, লক্ষ্মৌ, সাফদারজঙ্গ-
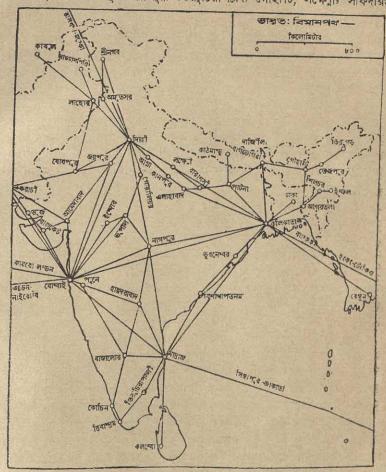
(দিল্লী), বেগমপেট, বারাণসী ও পাটনায় ১২টি প্রধান বিমানবন্দর আছে। এইগুলি ছাড়া ৭৪টি মাঝারি ও ছোটোখাটো বিমানবন্দর এই দেশে বিদ্যমান। সম্প্রতি এই দেশে আরও ১৪টি নূতন বিমানবন্দর খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯৫৩ সালে বিমানপথ জাতীয়করণের পর অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের জন্য ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশন এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার জন্য এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল নামে দুইটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশন (I. A. C) ভারতের প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দরসমূহের মধ্যে এবং নিকটবর্তী দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। দ্রুত ডাক-চলাচলের জন্য নাগপুরের মাধ্যমে দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে রাত্রিতে বিমানপোত চলাচল করে। বর্তমানে কলিকাতা, দিল্লী, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম, পুনে, অমৃতসর, শ্রীনগর, জয়পুর, যোধপুর, আমেদাবাদ,

ভূপাল, ইন্দোর, নাগপুর ও দার্জিলিং প্রভৃতি শহরের সহিত বিমানপথে ভারতের অন্যান্য বড় শহরের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশন্যাল (A. I. I.) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতকে বিমানপথে যুক্ত করিয়াছে। কলিকাতা-বোম্বাই-কায়রো-লন্ডন, কলিকাতা-ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর-জাকার্তা, কলিকাতা-হংকং-টোকিও, দিল্লী-তাসখন্দ-মস্কো, বোম্বাই-এডেন-নাইরোবি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিমানপথে ১৪টি দেশে ভারতীয় বিমানপোত যাতায়াত করতেছে।

ইহা ছাড়া ভারতের উপর দিয়া যাইবার জন্য কয়েকটি বৈদেশিক বিমান প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহারা সকলেই আন্তর্জাতিক বিমান প্রতিষ্ঠান। ইহাদের মধ্যে British Airways, Trans-World Airlines (T.W.A.), Air France, Royal Dutch Airlines (K.L.M.), Pan-American World Airways, Scandinavian Airlines, Bangladesh Biman, Pakistan International Airways-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর ভারতে বিমানপথের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমানপথের চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়া গিয়াছে। মালপত্র প্রচুর পরিমাণে বিমানপথে পরিবাহিত হইতেছে। কিন্তু ভারতের বিমানপথের উন্নতিতে প্রধান অন্তরায় তৈলের অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য। আমদানীকৃত তৈলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ভারতের বিমানপথের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব—রাত্রে ডাক-পরিবহণ, নাগপুরকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ডাক রাত্রিতে প্রেরিত হয়।

বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমানে বিমানপথের উন্নতি হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বে-সামরিক বিমানপথের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বিমানবন্দরের উন্নতিসাধন, কর্মীদের ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত, গবেষণা প্রভৃতির জন্য এই পরিকল্পনায় নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বেসামরিক বিমানপথের উন্নতির জন্য ২০২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৭২ কোটি টাকা বে-সামরিক বিমান বিভাগের জন্য, ৫৫ কোটি টাকা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের জন্য, ৬০ কোটি টাকা এয়ার ইন্ডিয়ার জন্য এবং ভারতীয় আবহবিদ্যা বিভাগের জন্য ও কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজ বিমানবন্দরকে বোয়িং ৭৩৭ (জাম্বো) বিমান নামিবার উপযোগী করিবার জন্য ১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ ও এয়ার-ইন্ডিয়ার বিমানের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হইয়াছে।

পঞ্চম পরিকল্পনায় ২৯টি বোয়িং ৭৩৭ বিমানবহরের পরিবহণ-ক্ষমতার সমান পরিবহণ ক্ষমতার সৃষ্টি করা হয় এবং এজন্য আরও নূতন বিমান ক্রয় করিয়া ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ ও এয়ার ইন্ডিয়ার পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এই পরিকল্পনা-কালে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলির উন্নতিসাধন করা হয়।

বন্দর (Ports)

ভারতের উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৬০০ কিলোমিটার হইলেও, অধিকাংশ স্থানে ইহা অভগ্ন। পশ্চিম উপকূলের সন্নিকটে ইহার সমান্তরাল হইয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা চলিয়া গিয়াছে ; এই উপকূল সেইজন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ ; উপকূলসংলগ্ন এই সমুদ্র সাধারণতঃ অগভীর ও বালুকাময়। এইজন্য পশ্চিম উপকূলের অধিকাংশ

স্থানে বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা কষ্টকর। এই উপকূলে মাত্র তিনটি স্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে—বোম্বাই, মার্মাগোয়া (Marmagoa)* ও কোচিন। বোম্বাই ও মার্মাগোয়া ব্যতীত এই উপকূলের অন্যান্য বন্দর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সময় মে হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। পূর্ব উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র অগভীর ও তরঙ্গসংকুল বলিয়া স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা কষ্টকর। এই উপকূলের অধিকাংশ পোতাশ্রয় কৃত্রিম। এখানকার পোতাশ্রয়সমূহ অগভীর হওয়ায় সর্বদা ড্রেজারের সাহায্যে ইহা উন্মুক্ত রাখিতে হয়। এই প্রথা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এইজন্য পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, পশ্চাদ্ভূমির প্রসার ও সমৃদ্ধি, বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে ভারতের বন্দরসমূহকে দুই-ভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রধান ও অপ্রধান বন্দর। পশ্চিম উপকূলের কাণ্ডলা, বোম্বাই, মার্মাগোয়া ও কোচিন এবং পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ, বিশাখাপতনম্, পারাদিপ ও কলিকাতা ভারতের প্রধান বন্দর (Major Ports)। ১৯৭৫ সালে ম্যাঙ্গালোর ও তুতিকোরিন বন্দরদ্বয় প্রধান বন্দর হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। প্রধান বন্দর-সমূহ মারফত এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রধান বন্দর ছাড়াও ভারতে ১৬০টির বেশী অপ্রধান বন্দর (Minor Ports) রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে ওখা, পোরবন্দর, সুরাট, কোঝিকোড, কুইলন, তেলিচেরী, নেগাপত্তন, মসুলীপত্তন, বেদী ও হলদিয়া বন্দর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হলদিয়া দ্রুত ভারতের একটি প্রধান বন্দরে পরিণত হইয়াছে।

বন্দরের কার্যকারিতা নির্ভর করে ইহার পশ্চাদ্ভূমির অর্থনৈতিক উন্নতির উপর। রপ্তানি ও আমদানিযোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই বন্দরের উন্নতি হয়। স্বাধীনতার পর ভারত অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ায় এই দেশের বন্দরসমূহের কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্পের উন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি আমদানির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইজন্য ভারত সরকার বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য এবং নূতন বন্দর স্থাপনের জন্য বিভিন্ন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম পরি-কল্পনার কার্যকালে করাচীর পরিবর্ত-বন্দর হিসাবে কাণ্ডলাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করা হয়, বোম্বাই বন্দর সংলগ্ন তৈল শোধনাগারসমূহের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই বন্দরের আরও উন্নতিসাধন করা হয় এবং কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ বন্দরের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হয় ৩১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে অপ্রধান বন্দরসমূহের উন্নতিসাধন, মালপে, পারাদিপ ও ম্যাঙ্গালোর বন্দরের পোতাশ্রয়ের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং বাতিঘরের উন্নতির জন্য মোট ৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রধান বন্দরসমূহের উন্নতিসাধন করিয়া ইহাদের পণ্য-পরিবহণের ক্ষমতা ৪৯ কোটি মেঃ টন পর্যন্ত বাড়ানো হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরের উন্নতির জন্য ফারাক্কাতে বাঁধ নির্মাণ, হলদিয়াতে নূতন পরিপূরক বন্দর-স্থাপন, ড্রেজারের সংখ্যাবৃদ্ধি, বোম্বাই, বিশাখাপতনম্, মাদ্রাজ, কাণ্ডলা ও কোচিন বন্দরের উন্নতিসাধন প্রভৃতি এই পরি-কল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল ১২৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৮০ কোটি টাকা প্রধান বন্দরসমূহের জন্য, ২৫ কোটি টাকা ফারাক্কা বাঁধের জন্য এবং ১০ কোটি টাকা ম্যাঙ্গালোর ও তুতি-

* India 1976 Page no, 319.

কোরিন বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য ব্যয় করা হইয়াছিল। অপ্রধান বন্দরসমূহের উন্নতির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার জন্য ব্যয় হইয়াছিল যথাক্রমে ১·৫ কোটি ও ৫ কোটি টাকা। পারাদিপ বন্দরের উন্নতিসাধন করিয়া সুকিন্দ-দাইতেরী অঞ্চলের লৌহ আকরিক রপ্তানির বন্দোবস্ত করিবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের ছোটখাটো বন্দরের উন্নতিসাধন, ড্রেজারের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতিও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বন্দরসমূহের উন্নতির জন্য ২৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল। হলদিয়া বন্দর নির্মাণ এবং ম্যাঙ্গালোর ও তুতিকোরিন বন্দর দুইটিকে প্রধান বন্দরে উন্নীতকরণ এই পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। ইহা ছাড়া বোম্বাই বন্দরের পরিবর্ধন এবং মাদ্রাজে তৈলের জন্য ডক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ড্রেজিং সংস্থা (Central Dredging Organisation) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এই সংস্থার মাধ্যমে সকল বন্দরের ড্রেজিং কার্যের মূলধনী খরচের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। এই পরিকল্পনায় আন্দামান ও লাক্ষাদ্বীপের বন্দরসমূহ এবং পোরবন্দর, মীর্জা বে ও কুড্ডালোর বন্দরের উন্নতিসাধন করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রধান বন্দরগুলির পণ্যবহনের ক্ষমতা হয় ১১·৫ কোটি মেঃ টন এবং অপ্রধান বন্দরগুলির ক্ষমতা ৮০ লক্ষ মেঃ টন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বন্দরের উন্নতির জন্য এই পরিকল্পনায় ৩৫৩ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

প্রধান বন্দর (Major Ports)

বোম্বাই (Bombay)—আরব সাগরের তীরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বোম্বাই বন্দর অবস্থিত। ইহা ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এখানে একটি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। বড় বড় জাহাজ এখানে নিরাপদে থাকিতে পারে। সালসেট নামক অন্য একটি দ্বীপের মারফত এই বন্দর দেশের অভ্যন্তরভাগের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই বন্দরের বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমি রহিয়াছে। সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট ও রাজস্থান এবং কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। বোম্বাই শহরের নিকট ভারতের বিখ্যাত বয়ন শিল্পকেন্দ্র অবস্থিত।

এখানকার কাপড় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে প্রেরিত হয়। এই বন্দরের মারফত প্রধানতঃ তুলা, লৌহ আকরিক, ডিজেল, চিনি, তৈলবীজ ও বস্ত্রাদি রপ্তানি করা হয় এবং খনিজ তৈল, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, ইস্পাতদ্রব্য, তুলা, কোক-কয়লা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সার আমদানি করা হয়। বোম্বাই মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী।

কলিকাতা (Calcutta)—বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে প্রায় ১৮২ কিলোমিটার দূরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম শহর ও দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। এখানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে। হুগলী নদীতে জলের গভীরতা কম থাকায় বন্দর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত জলপথের নানা স্থানে বালুচরের সৃষ্টি হয়। এইজন্য সর্বদা ড্রেজার যন্ত্র দ্বারা নদীর মাটি কাটিয়া জাহাজ ভিতরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। নদীর সংকীর্ণতার জন্য সুদক্ষ পাইলটের সাহায্যে জাহাজ বন্দরের মধ্যে লইয়া আসিতে হয়। এইজন্য এই বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যকরী হইলে এই সকল অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই বন্দরের বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমি রহিয়াছে। সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। ছাড়া জলপথে এই বন্দর হইতে গঙ্গানদী মারফত উত্তর ভারতে ও ব্রহ্মপুত্র নদ মারফত বাংলা-কলিকাতা রেলপথে যুক্ত। ইহা এই সকল রাজ্যের সহিত দেশের মধ্য দিয়া আসামে যাওয়া যায়। এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে প্রচুর কৃষিজাত, খনিজ ও শিল্পজাত সম্পদ পাওয়া যায়। কলিকাতার নিকট ইঞ্জিনিয়ারিং, পাট, ইস্পাত, কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম ও বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা, কয়লা ও পাটজাত দ্রব্য, বিহারের তৈলবীজ, লাক্ষা, কয়লা, লৌহ আকরিক ও অভ্র, উত্তর প্রদেশের তৈলবীজ, চামড়া, চিনি ও বস্ত্রাদি, ওড়িশার লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই বন্দরের মারফত রপ্তানি করা হয়। বিদেশ হইতে নানাবিধ সামগ্রী এই বন্দরে আমদানি করিয়া ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি অঞ্চলে প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে গম, চাউল, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, কাগজ, মোটরগাড়ি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যই প্রধান। কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাটশিল্পকেন্দ্র। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

মাদ্রাজ (Madras)—ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত মাদ্রাজ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর ও চতুর্থ শহর। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় না থাকায় তীরবর্তী সমুদ্রের মধ্যে ৮০ হেক্টর পরিমিত স্থান ঘিরিয়া কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈয়ারি করা হইয়াছে। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের অধিকাংশ, অন্ধ্র প্রদেশের ও কেরালার কিয়দংশ এই বন্দরের

পশ্চাদ্‌ভূমি। মাদ্রাজ বন্দরের সহিত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি রেলপথে যুক্ত। এই বন্দর মারফত চাউল, চামড়া, তৈলবীজ, তামাক, তেঁতুল, কফি, কাপড় ইত্যাদি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, খনিজ তৈল, কাগজ, মসলা, কাষ্ঠ, মদ্য, তুলা, মোটর-গাড়ি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। ইহা তামিল-নাড়ু রাজ্যের রাজধানী।
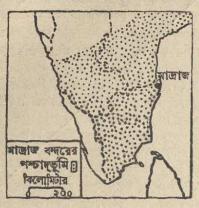
বিশাখাপতনম্ (Vishakhapatnam)—বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত এই বন্দরে ভারতের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ শিল্পটি অবস্থিত। ইহা ভারতের চতুর্থ প্রধান বন্দর। এই বন্দরে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির কিছুটা অংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ওড়িশা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যসমূহের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত এই বন্দর রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই বন্দর মারফত লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, তৈলবীজ, মসলা, কাষ্ঠ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, বিলাসদ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

কোচিন (Cochin)—মালাবার উপকূলে অবস্থিত কেরালা রাজ্যের এই বন্দর ভারতের প্রধান পাঁচটি বন্দরের অন্যতম। এখানকার পোতাশ্রয়টি স্বাভাবিক। কেরালা ও তামিলনাড়ু রাজ্যের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। রেলপথে পশ্চাদ্‌-ভূমির সহিত বন্দরটি যুক্ত। নারিকেল তৈল ও দড়ি, চা, রবার, কফি, মসলা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, রাসায়নিক সার, কয়লা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য। কোচিনে একটি জাহাজ-নির্মাণের কারখানা অবস্থিত।

কাণ্ডলা (Kandla)—কচ্ছ উপসাগরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত গুজরাট রাজ্যের এই বন্দর ভারত সরকার **১৯৫১** সালে নির্মাণ করেন। এখানে একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। করাচী বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বন্দর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। এখানে পানীয় জলের অভাব থাকায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে নলযোগে জল আনিতে হয়। গুজরাট, পাঞ্জাব, দিল্লী, রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। রেলপথ নির্মাণ করিয়া এই পশ্চাদ্‌-ভূমির সহিত বন্দরটিকে যুক্ত করা হইয়াছে। এই বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ইহার মাধ্যমে খনিজ তৈল, তুলা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, কয়লা, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং সিমেন্ট, লবণ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

নিউ ম্যাঙ্গালোর (New Mangalore)—মালাবার উপকূলে কর্ণাটক রাজ্যের এই বন্দরে বর্তমানে ছোটখাটো জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। এই বন্দর মারফত চা, কফি, চাউল, কাজুবাদাম, মৎস্য, রবার, গ্রানাইট পাথর ইত্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে। চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকালে এই বন্দরটিকে একটি প্রধান বন্দরে উন্নীত করা হইয়াছে এবং পোতাশ্রয় নির্মাণ করিয়া সারা বৎসর এই বন্দরে কাজকর্ম করিবার ব্যবস্থা করা

হইয়াছে। কুদ্রেমুখ খনি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ মেঃ টন লৌহ আকরিক রপ্তানির জন্যই প্রধানতঃ এই বন্দরের উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। কর্ণাটক এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি।

নিউ তুতিকোরিন (New Tuticorin)—করমণ্ডল উপকূলে তামিলনাডু রাজ্যের দাক্ষিণাংশে অবস্থিত এই বন্দরের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার সহিত ব্যাপকভাবে বাণিজ্য চলে। দক্ষিণ তামিলনাডু ও দক্ষিণ কেরালা ইহার পশ্চাদ্ভূমি। তুলা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, গবাদি পশু ইহার রপ্তানি-দ্রব্য। চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকালে ইহা একটি প্রধান বন্দরে উন্নীত হইয়াছে।

মোর্মুগাও (Mormugao)—কঙ্কণ উপকূলে বোম্বাই ও কোচিনের মধ্যস্থলে গোয়ার ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে এই বন্দর অবস্থিত। গোয়া, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের কিছু কিছু বাণিজ্যদ্রব্য এই বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, বাদাম, তুলা, নারিকেল ইত্যাদি ইহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। আমদানি দ্রব্য খুবই নগণ্য।

পারাদিপ (Paradip)-বঙ্গোপসাগরের তীরে ওড়িশা রাজ্যে অবস্থিত এই বন্দরটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে নির্মিত হইয়াছে। এই বন্দর মারফত প্রচুর লৌহ আকরিক জাপানে প্রেরিত হয়। ওড়িশার লৌহ আকরিক জাপানে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার জাপানের নিকট হইতে এই বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য প্রচুর সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। জাপান নিজের স্বার্থে লৌহ আকরিক আমদানির জন্য এই বন্দরের উন্নতিসাধন কার্যে ভারতকে সাহায্য করিতেছে।

হলদিয়া (Haldia)—কলকাতা বন্দর হইতে ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে এই বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরের উন্নতিসাধন করিয়া কলিকাতা বন্দরের উপর চাপ কমানো হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বন্দরের নির্মাণকার্য শুরু হইয়াছিল ; ইহার নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। খড়্গপুর হইতে একটি রেলপথ এই বন্দর পর্যন্ত আনা হইয়াছে। এই বন্দর স্থাপিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার বহু স্থান এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এখানে একটি তৈল শোধনাগার ও একটি সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানে জাহাজ মেরামতের একটি কারখানার নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

অপ্রধান বন্দর (Minor Ports)

ওখা (Okha)—গুজরাট রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই বন্দরটিতে উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় আছে। কিন্তু ইহার প্রবেশপথ অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া বিপদ-সংকুল। গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি ইহার পশ্চাদ্ভূমি। যানবাহন চলাচলের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় এই বন্দর বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। ইস্পাত-সামগ্রী, বিলাসদ্রব্য, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, কয়লা, খনিজ তৈল ইহার প্রধান আমদানি-দ্রব্য। তুলা, লবণ, সিমেন্ট প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

পোরবন্দর (Porbandar)—আরব সাগরের তীরে অবস্থিত গুজরাট রাজ্যের এই বন্দরটি সাধারণতঃ উপকূলীয় বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। এই বন্দরের ভিতরে বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। খেজুর, কাষ্ঠ, নারিকেল প্রভৃতি ইহার প্রধান আমদানি-দ্রব্য এবং সিমেন্ট, লবণ ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

সুরাট (Surat)—গুজরাট রাজ্যের এই প্রাচীন বন্দরটি ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। কাণ্ডলা বন্দরের জন্য ইহার গুরুত্ব বর্তমানে বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

কোঝিকোড (কালিকট) (Kozhikhode)—মালাবার উপকূলে কেরালা রাজ্যের এই বন্দরের নিকট বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পোতাশ্রয় অগভীর। নারিকেল দড়ি, রবার, কাজুবাদাম, চা, কফি প্রভৃতি ও গবাদি পশু ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং কয়লা, কাষ্ঠ, যন্ত্রপাতি, তালপাতা প্রভৃতি প্রধান আমদানি দ্রব্য।

ইহা ছাড়া মালাবার উপকূলে অবস্থিত কুইলন ও তেলচেরী, করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত নেগাপত্তন ও মসলীপত্তন, কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত বেদী প্রভৃতি বন্দর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্য কেন্দ্র

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। উপরে বর্ণিত বন্দরগুলি সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা ছাড়া আরও বহু বাণিজ্যকেন্দ্র আছে। এইগুলি সম্পর্কে নিম্নে রাজ্য-ভিত্তিক আলোচনা করা হইলঃ

পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal)

দার্জিলিং (Darjeeling)—হিমালয় পর্বতের প্রায় ২,১৩৪ মিটার উচ্চে এই শহরটি পশ্চিমবঙ্গের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। ইহা একটি সুন্দর শৈলাবাস ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্র। এই অঞ্চলে প্রচুর চা বাগান আছে। **কালিম্পঙ (Kalimpong)**—ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শৈলাবাস। পূর্বে এই শহর মারফত তিব্বতের সহিত বাণিজ্য চলিত। ইহা পশম-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। **শিলিগুড়ি (Siliguri)**—দার্জিলিং যাইবার প্রবেশপথে এই শহর অবস্থিত। এখানকার চা, কমলালেবু ও কাষ্ঠ বিখ্যাত। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলকেন্দ্র। শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করিয়া একটি শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে। কিছুদিন পূর্বে এখানে চা নিলামের একটি বাজার স্থাপিত হইয়াছে। **জলপাইগুড়ি (Jalpaiguri)**—ইহা উত্তরবঙ্গের একটি বিখ্যাত শহর; চা ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। **রানীগঞ্জ (Raniganj)**—বর্ধমান জেলার পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলে এই শহর অবস্থিত। এখানে কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া কাগজের কল, মৃৎশিল্পের কারখানা ও অন্যান্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **আসানসোল (Asansol)**—ইহাও বর্ধমান জেলার একটি বিখ্যাত কয়লাখনি অঞ্চল। এখানে নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে কুলটি ও বার্নপুরের বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, অনুপনগরের অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, স্থানীয় মৃৎশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা একটি প্রধান রেলকেন্দ্র। **দুর্গাপুর (Durgapur)**—কয়লাখনি অঞ্চলের নিকট অবস্থিত এই শহরটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে একটি বড় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং সংকর ইস্পাত তৈয়ারির আরও একটি কারখানা আছে। ইহা ছাড়া এখানে কোক-কয়লা উৎপাদনের জন্য একটি বড় কোক চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর একটি বিশাল সেচ-বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে একটি বড় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কার-

খানা আছে এবং একটি রাসায়নিক কারখানা ও গ্যাস উৎপাদনের কারখানা আছে। এই শহরটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। **বর্ধমান (Burdwan)**—ইহা একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ধান ও চাউলের ব্যবসায়কেন্দ্র। **চিত্তরঞ্জন (Chittaranjan)**—বিহার সীমান্তে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত এই নূতন শহরটি রেল-ইঞ্জিন কারখানার জন্য বিখ্যাত। ইহার নিকটবর্তী রূপনারায়ণপুরে টেলিফোনের তার নির্মাণের একটি কারখানা আছে। **শ্রীরামপুর (Serampur)**—কলিকাতার ২০ কিলোমিটার উত্তরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরের নিকট কয়েকটি পাট ও কাপড়ের কল আছে। ইহা একটি প্রাচীন শহর। ইহার নিকটবর্তী **কোন্নগরে (Konnagar)** রসায়ন, প্লাস্টিক, রং, কাচ ও বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই স্থানটি একটি প্রাচীন শহর। **বহরমপুর (Berhampur)**—রেশম শিল্পের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার এই স্থানটি বিখ্যাত। **দমদম (Dum Dum)**—কলিকাতার নিকটে অবস্থিত এই স্থানে একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে। **হাওড়া (Howrah)**—হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ইহা একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র; এই শহর পাট, লৌহ ও বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি-নির্মাণের বহু কারখানা আছে। **বাটানগর (Batanagar)**—হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত ২৪পরগনা জেলার এই শহরে জুতা তৈয়ারির একটি বড় কারখানা আছে। **খড়্গপুর (Kharagpur)**—দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেল-জংশন। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত।

বিহার (Bihar)

পাটনা (Patna)—গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর বিহারের রাজধানী ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পাটনার লঙ্কা ও চাউল বিখ্যাত। এখানে চিনি ও বিজলী বাতি তৈয়ারির কারখানা আছে। **বারাউনি (Barauni)**—এখানে ভারত সরকারের একটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। আসাম হইতে নলযোগে এখানে তৈল আনীত হয়। **রাঁচি (Ranchi)**—ইহা একটি স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস ও বিহারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এখানে লাক্ষা ও রেশম সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানা আছে। এই শহরের নিকট বিখ্যাত হুড্রু জলপ্রপাত রহিয়াছে। হাজারিবাগের অভ্রখনি ইহার নিকটেই অবস্থিত। **ডালমিয়ানগর (Dalmianagar)**—শোণ নদের তীরে অবস্থিত এই শহরে চিনি, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বিহারের একটি উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। **জামসেদপুর (Jamshedpur)**—ভারতের অন্যতম বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানার জন্য এই শহর বিখ্যাত। ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা ও চুনা পাথর, সিংভূম ও ওড়িশার লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ এই কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এখানে একটি বড় রেল-ইঞ্জিন কারখানা আছে। **সিন্দ্রী (Sindhri)**—এখানে এশিয়ার বৃহত্তম সারের কারখানা অবস্থিত। একটি সিমেন্টের কারখানাও এই স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহরটি বিহারের একটি উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। **বোকারো (Bokaro)**—এখানে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট কয়লা হইতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি বড় কারখানা এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় এখানে একটি বড় ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। **ঝরিয়া ও ধানবাদ (Jharia & Dhanbad)**—

কয়লাখনির জন্য বিখ্যাত। ভারতের মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৫০ ভাগ ঝরিয়ায় পাওয়া যায়। **গিরিডি (Giridih)**—কয়লা ও অভ্রখনির জন্য বিখ্যাত।

ওড়িশা (Orissa)

ভুবনেশ্বর (Bhubaneswar)—ওড়িশার রাজধানী। এখানে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। ইহা হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে একটি বিমানঘাঁটি আছে। **কটক (Cuttack)**—মহানদীর ব-দ্বীপের মুখে অবস্থিত এই শহরটি ওড়িশার পূর্বতন রাজধানী। এই স্থান কাষ্ঠ, তাঁতশিল্প, গালা ও হাতীর দাঁতের জিনিসের জন্য বিখ্যাত। ইহা ওড়িশার সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ইহা একটি বড় স্টেশন। **পুরী (Puri)**—সমুদ্রতীরে অবস্থিত এই শহর ও বন্দর হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান। ইহা ওড়িশার একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যাবাস। পিতল-কাঁসার জিনিসপত্র এবং নানাবিধ সুন্দর সুন্দর অলংকার এখানে পাওয়া যায়। সমুদ্র অগভীর বলিয়া এখানে বন্দর ভালোভাবে গড়িয়া উঠে নাই। **সম্বলপুর (Sambalpur)**—মহানদীর তীরে অবস্থিত এই শহরের নিকটবর্তী হীরাকুদে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার কার্পাস ও রেশম-শিল্প বিখ্যাত। এখানে একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ওড়শার একটি উন্নতিশীল শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **রাউরকেলা (Rourkela)**—ওড়িশার সর্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। এই শহরে একটি বড় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে অন্যান্য উপজাত শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে।

আসাম (Assam)

গৌহাটি (Gauhati)—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ইহা আসামের সর্বপ্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই শহর হইতে বাংলাদেশের মধ্য দিয়া জলপথে কলিকাতা বন্দরে যাওয়া যায়। ইহার নিকট পাণ্ডু একটি বড় রেলকেন্দ্র। আসামের চা, কাষ্ঠ প্রভৃতির অধিকাংশই গৌহাটি হইয়া কলিকাতায় আসে। **দিসপুর (Dispur)**—গৌহাটির সন্নিকটে অবস্থিত আসামের নূতন রাজধানী। **ডিগবয় (Digboi)**—লখিমপুর জেলার এই শহর খনিজ তৈলের জন্য বিখ্যাত। এখানে একটি উৎকৃষ্ট তৈল শোধনাগার আছে। **ডিব্রুগড় (Dibrugarh)**—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত এই শহর আসামের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা একটি উৎকৃষ্ট নদী-বন্দর। ইহার মারফত আসামের চা ও কাষ্ঠ এবং ডিগবয়ের খনিজ তৈল রপ্তানি হইয়া থাকে। **নুনমাটি (Nunmati)**—গৌহাটির নিকট এই শহরে ভারতের অন্যতম বৃহদাকার তৈল-শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশ (U. P.)

লক্ষ্ণৌ (Lucknow)—গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষ্ণৌ উত্তর প্রদেশের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। মুসলমান রাজত্বের বহু নিদর্শন এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আছে। এই শহর সোনা, রূপা ও হাতীর দাঁতের জিনিসপত্রের ব্যবসায়স্থল এবং রেলকেন্দ্র। **এলাহাবাদ (Allahabad)**—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহর হিন্দুদেরতীর্থস্থান। এক সময় ইহা উত্তর প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখানে একটি

বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তর প্রদেশের হাইকোর্ট আছে। ইহা একটি বড় রেলস্টেশন ও বিমানঘাঁটি। এখানে চিনি, তৈল, কাচ ও ময়দার কল আছে। নিকটবর্তী অঞ্চলের জোয়ার, বাজরা, তিসি, তামাক, আম প্রভৃতি এই শহর মারফত বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। **বারাণসী বা কাশী (Varanashi)**—গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে তৈল, চিনি ও ময়দার কল আছে। এখানকার রেশমী বস্ত্র, পিতলের জিনিস ও জর্দা বিখ্যাত। বারাণসীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহার নিকটেই বিখ্যাত সারনাথের মন্দির অবস্থিত। **কানপুর (Kanpur)**—গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর উত্তর প্রদেশের সর্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানকার চর্মশিল্প ও পশমশিল্প বিখ্যাত। ইহা ছাড়া কার্পাস, পাট, চিনি ও তৈল শিল্প এখানে উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই শহর উত্তর ও উত্তর-পূর্ব রেলপথের মিলনস্থল। এখানে একটি বড় সেনানিবাস আছে। **আগ্রা (Agra)**—যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর মোগল রাজত্বের রাজধানী ছিল। জগদ্বিখ্যাত তাজমহল এখানে অবস্থিত। মোগলযুগে নির্মিত 'আগ্রা ফোর্ট' ও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রাসাদ এখানে বিদ্যমান। বর্তমানকালেও এই স্থান কারুশিল্প ও নকশাদার দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে জুতা, গালিচা ও পিতলের জিনিসপত্র প্রস্তুত হয়। **মির্জাপুর (Mirzapur)**—গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত এই শহর পশমী দ্রব্য, গালিচা ও পিতল দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে উৎকৃষ্ট গালার দ্রব্য, ছুরি, কাঁচি ও মৃন্ময় দ্রব্য পাওয়া যায়। **আলিগড় (Aligarh)**—এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দুগ্ধজাত দ্রব্য, তালা, ছুরি-কাঁচি ও পিতল-কাঁসার দ্রব্যের জন্য এই শহর বিখ্যাত। **গোরক্ষপুর (Gorakhpur)**—রাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত এই স্থান ইক্ষু ও চিনির বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা ছাড়া ময়দা ও কাষ্ঠ এখানে পাওয়া যায়। উত্তর-পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর এখানে অবস্থিত। **হাপুর (Hapur)**—ভারতের খাদ্যশস্যের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। গম, ডাল, তৈলবীজ, কলাই প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

পাঞ্জাব (Punjab)

অমৃতসর (Amritsar)—এই শহর শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। একটি সরোবরে (সর) শিখদের স্বর্ণমন্দির স্থাপিত বলিয়া ইহার নাম 'অমৃতসর' হইয়াছে। এখানে কার্পাস, রেশম ও পশম শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে; অমৃতসরের গালিচা, শাল ও নকশাদার কাষ্ঠের জিনিস বিখ্যাত। ইহা উত্তর রেলপথের শেষ বড় রেল-স্টেশন। **লুধিয়ানা (Ludhiana)**—পশমী দ্রব্যের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। ইহা ছাড়া, কাশ্মীরী শাল ও কার্পাসদ্রব্যও এখানে পাওয়া যায়। এখানে সৈন্যদের জন্য বড় পাগড়ির কাপড় ও পাগড়ি তৈয়ারির সুবন্দোবস্ত আছে।

মধ্য প্রদেশ (M. P.)

জবলপুর (জব্বলপুর) (Jabbalpur)—ইহা একটি বড় রেল জংশন ও বাণিজ্য-কেন্দ্র, এই শহরের নিকট মার্বেল পাথরের পাহাড় আছে। এই পাহাড় হইতে নর্মদা নদী নীচে পড়িয়া সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে সিমেন্ট, কাঁচ, পিতল-কাঁসা, গোলাবারুদ ও রেলের কারখানা আছে। **ভূপাল (Bhopal)**—মধ্য প্রদেশের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে নূতন নূতন শিল্প গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে।

ইন্দোর (Indore)—গম, ইক্ষু, সরিষা, তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এবং নানাবিধ খনিজ দ্রব্য নিকটে থাকায় এখানে বস্ত্রশিল্প, মৃৎপাত্র, চামড়া ও কাঁচের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা মধ্য প্রদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। **গোয়ালিয়র (Gwalior)**—ইহা একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র। এখানকার প্রস্তরশিল্প বিখ্যাত। এই শহরে একটি সিগারেটের কারখানা ও কাপড়ের কল আছে। **নেপানগর (Nepanagar)**—এখানে ভারতের পত্রিকার কাগজ (Newsprint) উৎপাদনের বিখ্যাত কারখানাটি অবস্থিত। **ভিলাই (Bhilai)**—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইস্পাতশিল্প কেন্দ্র। সোভিয়েত রাশিয়ার ইঞ্জিনীয়ারগণের সাহায্যে এখানে একটি বৃহদাকার লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা।

রাজস্থান (Rajasthan)

জয়পুর (Jaipur)—এই স্থানের মৃৎশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি বিখ্যাত। ইহা রাজস্থানের রাজধানী ও প্রধান শহর। ইহার নিকটে অভ্রের খনি আছে। **যোধপুর (Jodhpur)**—এই স্থানের জিপসাম দিয়া সিন্ধ্রীতে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা হয়। ইহা একটি দুর্গ নগরী এবং বিমান-বন্দর। এখানে পশম ও কার্পাস শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **বিকানীর (Bekanir)**—এখানেও জিপসাম পাওয়া যায়। নিকটবর্তী পালনা অঞ্চলে সামান্য কয়লা পাওয়া যায়। **গঙ্গানগর**—রাজস্থানের একটি উন্নতিশীল শহর; এখানে কার্পাস-বয়ন শিল্প, পশম-বয়ন শিল্প, চিনির কল ও ময়দার কল আছে।

গুজরাট (Gujrat)

আমেদাবাদ (Ahmedabad)—সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর গুজরাট রাজ্যের সর্বপ্রধান শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পূর্বতন রাজধানী। ইহা ভারতের বৃহত্তম কার্পাসশিল্প কেন্দ্র। এখানে প্রায় ৬৯টি কাপড়ের কল আছে। ইহা ছাড়া চামড়া ও কাগজশিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। **গান্ধীনগর (Gandhinagar)**—আমেদাবাদের নিকট অবস্থিত গুজরাটের নূতন রাজধানী। **বরোদা (Baroda)**—কাম্বে উপসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত এই শহর কার্পাস শিল্পের ও তুলা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এখানে বহু হিন্দু মন্দির আছে। **আংকলেশ্বর (Ankleswar)**—গুজরাটের তৈলখনি অঞ্চলের নিকটস্থ এই শহরে সোভিয়েত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় বিরাট তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র (Maharastra)

নাগপুর (Nagpur)—এই শহর পূর্বে ভোঁসলা-রাজাদের রাজধানী ছিল, বর্তমানে মহারাষ্ট্রের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই শহরের নিকট প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়; সেইজন্য এখানে বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য রেলপথের সংযোগস্থল এবং একটি প্রসিদ্ধ বিমান বন্দর। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কমলালেবু ও ম্যাঙ্গানিজ ইহার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। **পুনে (Pune)**—পশ্চিমঘাট পর্বতগাত্রে ৫৭০ মিটার উচ্চে এই শহর অবস্থিত। এখানে বড় সৈন্যাবাস এবং হাওয়া অফিস আছে। ইহা মহারাষ্ট্রের একটি উন্নতিশীল শিল্প-

কেন্দ্র। পুনে মারাঠা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। **ট্রম্বে (Trombay)**—বোম্বাই শহরের সন্নিকটে এই স্থানে দুইটি বৃহদাকার তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে।

অন্ধ্র প্রদেশ (Andhra Pradesh)

হায়দরাবাদ (Hyderabad)—পূর্বে নিজামের রাজধানী ছিল। বর্তমানে অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী। এখানে বহু মসজিদ ও মুসলমান-কৃষ্টির নিদর্শন দেখা যায়। কৃষ্ণার উপনদী মুছির তীরে এই শহর অবস্থিত। এই স্থান হইতে স্থলপথে, জলপথে ও আকাশপথে নানা স্থানে যাওয়া যায়। **বেজওয়াদা (Bezwada)**—ইহা অন্ধ্র প্রদেশের একটি উন্নতিশীল শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা একটি বড় রেল স্টেশন।

কর্ণাটক (Karnatak)

বাঙ্গালোর (Bangalore)—সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯১৫ মিটার উচ্চে অবস্থিত এই শহর কর্ণাটকের রাজধানী এবং শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে তুঁতের চাষ হয়; সেই জন্য এই শহর একটি বিখ্যাত রেশম শিল্পকেন্দ্র। এখানকার বিজ্ঞান পরিষদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার জন্য এখানে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। এখানে বিমানপোত নির্মাণের একটি কারখানা আছে। ইহা ছাড়া সাবান, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া, কার্পাসদ্রব্য, ঘড়ি, বৈদ্যুতিক বাতি প্রভৃতি তৈয়ারির কারখানা আছে। **মহীশূর (Mysore)**—কর্ণাটক রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত একটি বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। **ভদ্রাবতী (Bhadrabati)**—এখানে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে। ইহা কর্ণাটকের একটি বড় শিল্পপ্রধান স্থান। এখানে কাগজের কল ও সিমেন্টের কারখানা আছে।

তামিলনাড়ু (Tamilnadu)

কোয়েম্বাটুর (Coimbatore)—নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে একটি শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা সুপারী, বাদাম ও তুলা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। নিকটবর্তী পাইকারা বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের জলবিদ্যুতের সাহায্যে এখানে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে; এখানে কার্পাস-শিল্প খুব উন্নতিলাভ করিয়াছে। **মাদুরৈ (মাদুরা) (Madurai)**—এখানে অনেকগুলি কারুকার্যখচিত হিন্দু-মন্দির আছে। তন্মধ্যে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শহরকে 'দক্ষিণের কাশী' বলা হয়। লোকসংখ্যায় মাদ্রাজের পরেই ইহার স্থান। এখানে কার্পাস ও রেশম-দ্রব্য এবং কাঁসা ও পিতলের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। **তিরুচিরাপল্লী (ত্রিচিনাপল্লী) (Tiruchira-palli)**—অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান। ইহার নিকটবর্তী ডিণ্ডিগাল চুরুটের কারখানার জন্য বিখ্যাত। এখানকার কার্পাস-শিল্প ও চাউলের ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **পেরাম্বুর (Perambur)**—এখানে রেলের ওয়াগন নির্মাণের একটি বিরাট কারখানা আছে।

কেরালা (Kerala)

ত্রিবান্দ্রম (Trivandram)—কেরালা রাজ্যের রাজধানী। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি দুর্গ ও অনেকগুলি মন্দির আছে। এই

শহরে নারিকেলের দড়ি ও সিমেন্টের কারখানা আছে। এখানে কাজুবাদাম ও হাতীর দাঁতের নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। **কুইলন (Quilon**—মালাবার উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর ও শহর। নারিকেলের দড়ি ও তৈল, মৎস্য, ইলমেনাইট প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি দ্রব্য। **আলেপ্পি (Alleppi)**—কোচিনের ৫৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি বন্দর ও শহর; নারিকেলজাত দ্রব্য, মরিচ, আদা প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত।

জম্মু ও কাশ্মীর (Jammu & Kashmir)

শ্রীনগর (Srinagar)—ঝিলাম নদীর তীরে কাশ্মীর উপত্যকায় অবস্থিত পর্বত-বেষ্টিত এই শহর কাশ্মীরের রাজধানী। এখানকার উলার হ্রদ ও ইহার চতুর্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। সেইজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে মানুষ এখানে বেড়াইতে আসে। এই স্থান পশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত; ইহা ছাড়া এখানকার নকশাদার কার্পেট ও শাল সর্বত্র উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। ইহার নিকটবর্তী বরমুলায় একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এখানে কোনো রেলপথ না থাকিলেও ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে এখানে যাইবার জন্য সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। **জম্মু (Jammu)**—পাকিস্তান সীমান্তের নিকট অবস্থিত এই শহর অন্যান্য স্থানের সহিত রেলপথে যুক্ত। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং শস্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

ত্রিপুরা (Tripura)

আগরতলা (Agartala)—ত্রিপুরার রাজধানী। এখানকার পাট, তুলা, চা, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এবং কাঠের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য।

হিমাচল প্রদেশ (Himachal Pradesh)

সিমলা (Simla)—২,২০০ মিটার উচ্চে হিমালয় পর্বতগাত্রে অবস্থিত শৈলাবাস। তিব্বত ও চীনের সঙ্গে স্থলপথে এই শহরের মাধ্যমে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ইহা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী।

মেঘালয় (Meghalaya)

শিলং (Shillong)—১,৫০০ মিটার উচ্চে ইহা একটি শৈলনিবাস; এই শহর মেঘালয়ের রাজধানী। গৌহাটি হইতে এই স্থানে মোটরে যাইতে হয়। এখানে ফল, কাষ্ঠ, চা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

মণিপুর (Manipur)

ইম্ফল (Imphal)—মণিপুরের রাজধানী। এখানকার কুটিরশিল্প বিখ্যাত।

কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত অঞ্চল

দিল্লী (Delhi)—যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই শহর ভারতের রাজধানী। ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ইহা ভারতের অন্যতম বড় শহর। মোগলযুগের স্থাপত্য শিল্পের

বহু নিদর্শন এখানে আছে। তন্মধ্যে কুতুব মিনার, জুম্মা মসজিদ, লালকেল্লা প্রভৃতি বিখ্যাত। ইহা বিভিন্ন রেলপথের সঙ্গমস্থল। এখানকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের নক্শাদার অলঙ্কার এবং রেশম ও কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও জরির কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শহরে ময়দা, চিনি ও কাপড়ের বহু কল আছে।

চণ্ডীগড় (Chandigarh)—হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের রাজধানী ও নূতন শহর। এখানে ক্রমশঃই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. What role the Railways and Roadways play in the internal transport system of India ? Discuss their relative contribution and drawbacks. **[C. U. B. Com. 1968]**

(ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ-ব্যবস্থায় রেলপথ ও সড়কপথ কি ভূমিকা অবলম্বন করে? উহাদের পারস্পরিক অবদান ও অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা কর।)

উঃ। 'রেলপথ' (১৪৭—১৫১ পৃঃ) এবং 'সড়ক পথ' (১৪৪—১৪৭ পৃঃ) লিখ।

2. Describe the various Railway Zones of India. **[Specimen Question, 1978]**

(ভারতের বিভিন্ন রেলপথ অঞ্চলের বিবরণ দাও।)

উঃ। 'রেলপথ' (১৪৭—১৫১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. What are the railway zones of India ? Describe any one of these zones with special reference to the part played by railway in the economic development of the region. **[Specimen Question, 1980]**

(ভারতের রেলপথ অঞ্চলগুলি কি কি ? এই অঞ্চলগুলির মধ্যে যে কোনো একটির বিবরণ দাও ও তৎপ্রসঙ্গে অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর এই রেলপথের প্রভাব বর্ণনা কর।)

উঃ। 'রেলপথ' (১৪৭—১৫১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Describe the importance of transport in Indian economy. Write in brief the conditions of railway transport in the zone covered by Eastern Railway. **[H. S. Examination, 1978]**

(ভারতের অর্থনীতিতে পরিবহণের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ভারতের পূর্ব রেলওয়ে সেবিত অঞ্চলের রেল-পরিবহণ সম্পর্কে বিবরণ লিখ।)

উঃ। 'পরিবহণ-ব্যবস্থা ও বাণিজ্যপথ' (১৪৩—১৪৪ পৃঃ) এবং 'পূর্ব রেলপথ' (১৪৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. (a) Name the different Zones of India.

(b) Describe the role of Eastern Railway on the economic development of the region served by it. **[H. S. Examination, 1981]**

[(ক) ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক রেলপথগুলির নাম লিখ।

(খ) পূর্ব রেলপথভুক্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই রেলপথের অবদান বর্ণনা কর।]

উঃ। 'রেলপথ' (১৪৭—১৫১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Describe the pattern of railway communication in India and discuss the problems that arise in the light of her requirement of transport. What do the roads play in easing the situation ?

[C. U. B. Com. 1964]

(ভারতে রেলপথের যোগাযোগ-ব্যবস্থার ধরন বর্ণনা কর এবং ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যাগুলি আলোচনা কর। এই সমস্যার সমাধানে সড়কপথ কি ভূমিকা অবলম্বন করে ?)

উঃ। 'পরিবহণ-ব্যবস্থা' (১৪৩—১৪৪ পৃঃ) এবং 'সড়কপথ' (১৪৪—১৪৭ পৃঃ) ও 'রেলপথ' (১৪৭—১৫১ পৃঃ) হইতে লিখ।

7. What do you mean by major and minor ports of India ? Illustrate your answer with suitable examples.

[Specimen Question, 1978]

(ভারতের প্রধান ও অপ্রধান বন্দর বলিতে কি বুঝ ? উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা তোমার উত্তর বুঝাইয়া দাও।)

উঃ। 'প্রধান বন্দর' (১৫৮—১৬১ পৃঃ) ও 'অপ্রধান বন্দর' (১৬১—১৬২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

8. What are the major ports of India ? Describe the hinterland and pattern of trade of any one of the major ports of India.

[Specimen Question, 1980]

(ভারতের প্রধান বন্দরগুলি কি কি ? যে কোনো একটি প্রধান বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর।)

উঃ। 'বন্দর' (১৫৬—১৫৮ পৃঃ) 'প্রধান বন্দর' হইতে কলিকাতা (১৫৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. Analyse the geographical conditions that have contributed to the location and development of the port of Calcutta. What are the navigational difficulties facing the port and how can they be remedied ? [C. U. B. Com. 1960]

(কলিকাতা বন্দরের অবস্থান ও উন্নতিতে যে সকল ভৌগোলিক অবস্থার অবদান) রহিয়াছে তাহা বর্ণনা কর। এই বন্দরের নৌ-পরিবহণের অসুবিধাসমূহ কি কি এবং সেইগুলি কিভাবে সমাধান করা যায় ?)

উঃ। 'কলিকাতা' (১৫৯ পৃঃ) এবং 'ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা' (১২৬—১২৭ পৃঃ হইতে লিখ।

10. Mention the names of three important ports of India and describe their (a) location, (b) exports and (c) imports.

[H. S. Examination, 1983]

(ভারতের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া ইহাদের (ক) অবস্থান, (খ) রপ্তানি ও (গ) আমদানি বিষয়ে আলোচনা কর।

উঃ। 'প্রধান বন্দর' ১৫৮—১৬১ পৃঃ) হইতে 'বোম্বাই,' 'কলিকাতা' ও 'মাদ্রাজ' অবলম্বনে লিখ।

11. Describe the hinterland of two major ports of the Indian Union and state the nature of the trade passing through the ports so selected. [C. U. Pre-Univ. 1968 & N. B. U. Pre-Univ. 1963]

(ভারতের দুইটি প্রধান বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি বর্ণনা কর এবং নির্ধারিত এই বন্দরসমূহের মাধ্যমে সংঘটিত বাণিজ্যের প্রকৃতি বর্ণনা কর।)

উঃ। 'কলিকাতা' (১৫৯ পৃঃ) ও 'বোম্বাই' (১৫৮—১৫৯ পৃঃ) লিখ।

12. Describe the hinterland and the pattern of trade of the major ports of India. [Specimen Question, 1978]

(ভারতের প্রধান বন্দরগুলির পশ্চাদ্ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর।)

উঃ। 'প্রধান বন্দর' (১৫৮—১৬১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

13. (a) Give the names of *any two* ports of Kathiawar-Kutch coast. (b) Explain the importance of hinterland. (c) Make a comparative assessment of the structure of Calcutta, Madras and Bombay Ports.

Or,

(a) Give the names of *any two* ports of Corromondal coast. (b) Describe the principal problems of Calcutta Port. (c) Give a brief account of inland waterways of India.

[Tripura H. S. Examination, 1979]

[(ক) কাথিয়াওয়ার ও কচ্ছ উপকূলে যে কোনো দুইটি বন্দরের নাম লিখ। (খ) পশ্চাদ্ভূমির গুরুত্ব আলোচনা কর। (গ) কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরের গঠন প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা কর।]

অথবা,

[(ক) করমণ্ডল উপকূলের দুইটি বন্দরের নাম লিখ। (খ) কলিকাতা বন্দরের প্রধান সমস্যাগুলি উল্লেখ কর। (গ) ভারতের আন্তর্দেশিক জলপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

উঃ। ১৫৮-১৬২ পৃষ্ঠার অন্তর্গত কাণ্ডলা, ওখা, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই অবলম্বনে লিখ। পশ্চাদ্ভূমির গুরুত্বের জন্য প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত দ্বাদশ অধ্যায়ের 'পশ্চাদ্ভূমি' (২৮৪-২৮৫ পৃঃ) লিখ।

অথবা,

১৫৮—১৬২ পৃষ্ঠার অন্তর্গত মাদ্রাজ, তুতিকোরিন, কলিকাতা বন্দর অবলম্বনে লিখ। 'অভ্যন্তরীণ জলপথ' (১৫১-১৫২ পৃঃ) অবলম্বনে শেষ অংশের উত্তর লিখ।

14. Discuss the factors suitable for the development of ports in India with examples of two ports of South India.

[H. S. Examination, 1979]

(দক্ষিণ ভারত হইতে দুইটি উদাহরণ সহযোগে ভারতে বন্দর গড়িয়া উঠিবার কারণসমূহ আলোচনা কর।)

উঃ। প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত দ্বাদশ অধ্যায় হইতে 'বন্দর গঠনের উপযোগী অবস্থা' (২৮৬-২৮৭ পৃঃ) এবং 'বোম্বাই' ও 'মাদ্রাজ' (১৫৮—১৬০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on *any four* of the following :

Bhilai (B. U. '62), Jalpaiguri (B. U. '61), Nepanagar (B. U. '61), Siliguri (N. B. U. '63), Dum-Dum (N. B. U. '63), Delhi (N. B. U. '63), Varanasi (N B. U. '61).

(নিম্নলিখিত যে কোনো চারিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :

ভিলাই, জলপাইগুড়ি, নেপানগর, শিলিগুড়ি, দমদম, দিল্লী, বারাণসী।)

Digboy, Durgapur, Allahabad, Kandla, Vishakhapatnam, Ranchi, Ahmedabad.

[C. U. Pre-Univ. 1963]

(ডিগবয়, দুর্গাপুর, এলাহাবাদ, কাণ্ডলা, বিশাখাপতনম্, রাঁচী, আমেদাবাদ।)

Nunmati, Barauni, Trombay, Ankleswar, Cochin, Visakhapatnam.

[B. U. Univ. Ent. 1964]

(নুনমাটি, বারাউনি, ট্রম্বে, আঙ্কলেশ্বর, কোচিন, বিশাখাপতনম্।)

Jamshedpur, Magolsarai, Sindhri, Chittaranjan, Barauni.

[C. U. Pre-Univ. 1965]

(জামসেদপুর, মোগলসরাই, সিন্ধ্রি, চিত্তরঞ্জন, বারাউনী।)

Rourkela, Srinagar, Candla, Chittaranjan, Digboy.

[C. U. Pre-Univ. 1966]

(রাউরকেলা, শ্রীনগর, কাণ্ডলা, চিত্তরঞ্জন ও ডিগবয়।)

Trivandram, Chandigarh, Bhopal, Bangalore, Nagpur.

[C. U. Pre-Univ. 1967]

(ত্রিবান্দ্রম, চণ্ডীগড়, ভূপাল, বাঙ্গালোর, নাগপুর।)

উঃ। ১৫৮—১৬৮ পৃষ্ঠা হইতে লিখ।

2. State the geographical location and account for the importance of *any four* of the following :—(a) Darjeeling, (b) Durgapur, (c) Bangalore, (d) Cochin, (e) Kanpur, (f) Ahmedabad.

[B. U. Univ. Ent. 1968]

[ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত যে কোনো চারিটি স্থানের গুরুত্ব বর্ণনা কর :

(ক) দার্জিলিং, (খ) দুর্গাপুর, (গ) বাঙ্গালোর, (ঘ) কোচিন, (ঙ) কানপুর, (চ আমেদাবাদ।]

উঃ। ১৫৮—১৬৮ পৃষ্ঠা হইতে লিখ।

3. Write notes on : The port of Madras suffers from some geographical disadvantages. [C. U. Univ. Ent. 1971]

(টীকা লিখ : মাদ্রাজ বন্দরের কতকগুলি ভৌগোলিক অসুবিধা আছে।)

উঃ। ১৫৯—১৬০ পৃষ্ঠা হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Write correct answer from the following statements :

A. (i) Murmugao is a noted industrial centre/port/hill station in Western India. (ii) The headquarter of Central Railway is located at Pune/Nagpur/Bombay. (iii) Kanpur/Allahabad/Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. [H. S. Examination, 1982]

B. (i) Haldia is a subsidiary port of Madras/Calcutta/Cochin. (ii) Kandla is Locatec in Kerala/Gujrat/Andhra Pradesh. (iii) Bhopal has a very large electric engineering/iron and steel/railway workshop plant.(iv) National Highway 2 connects Bombay with Madras/Delni with Amritsar/Calcutta with Delhi. (v) Bombay/Calcutta/Madras handles the largest volume of overseas trade. (vi) The largest urban concentration of India is Bombay/Calcutta/Delhi.

[H. S. Examination, 1983]

C. (i) Sriharikota is famous for steel industry/space research/ship building. (ii) Renukut is a famous industrial city/trade centre/port of Uttar Pradesh. (iii) Bilaspur is located along the South-Eastern/Eastern/North-East Frontier Railway. (iv) Bokaro is an industrial city/hill station/sea-side resort. [H. S. Examination, 1984]

[১। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে সঠিক উত্তর তৈয়ারি কর :

A. (i) মার্মাগাও পশ্চিম ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র/বন্দর/শৈলাবাস। (ii) মধ্য রেলপথের সদর দপ্তর পুনে/নাগপুর/বোম্বাইতে অবস্থিত। (iii) কানপুর/এলাহাবাদ/লক্ষ্ণৌ উত্তর প্রদেশের রাজধানী।

B. (i) মাদ্রাজ/কলিকাতা/কোচিনের পরিপূরক বন্দর হিসাবে হলদিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। (ii) কেরালা/গুজরাট/অন্ধ্র প্রদেশে কান্ডলা অবস্থিত। (iii) ভূপালে একটি সুবৃহৎ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং/লৌহ ও ইস্পাত/রেলগাড়ি মেরামতের কারখানা অবস্থিত। (iv) ২নং জাতীয় সড়কটি বোম্বাইয়ের সহিত মাদ্রাজ/দিল্লীর সহিত অমৃতসর/কলিকাতার সহিত দিল্লীর যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। (v) ভারতের সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক বাণিজ্য বোম্বাই/কলিকাতা/মাদ্রাজের মাধ্যমে হইয়া থাকে। (vi) বোম্বাই/কলিকাতা/দিল্লী ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর-গোষ্ঠী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

C. (i) ইস্পাত শিল্প/মহাকাশ গবেষণা/জাহাজ-নির্মাণ-এ শ্রীহরিকোটা খ্যাতি-লাভ করিয়াছে। (ii) রেণুকুট উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শিল্পনগরী/বাণিজ্য-কেন্দ্র/বন্দর। (iii) দক্ষিণ-পূর্ব/পূর্ব/উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের উপর বিলাসপুর অবস্থিত। (iv) বোকারো একটি শিল্পনগরী/শৈলাবাস/সৈকতাবাস।]

2. Delete the incorrect words from the following sentences and frame correct sentences :

(i) The total length of the railways under state control is 60,231/38,980 km. in India. (ii) India has four big international air-ports at Dum Dum, Santacruz, Palam and Meenambakkam/Safdarjung, Begumpet, Varanasi and Patna. (iii) Bombay port is situated on the eastern/western coast of India. (iv) Calcutta is the largest city and biggest/second biggest Port in India. (v) Visakhapatnam, situated in Andhra Pradesh on the coast of the Bay of Bengal, is the centre of the largest Ship-building/Aircraft industry in India. (vi) Madras is a port/hill resort. (vii) Kandla port is situated in Maharashtra/Gujarat. (viii) Kandla is a natural/artifiicial port (ix) Chittaranjan is famous for its locomotive manufacturing/ship building industry. (x) Ranchi is a hill resort/port. (xi) Bhubaneswar is the capital of Karnatak/Orissa. (xii) Gauhati, situated on the bank of the Ganga/Brahmaputra, is a trade centre, (xiii) Lucknow/Kanpur, situated on the bank of the Gomati, is the capital of Uttar Pradesh. (xiv) Amritsar is the best holy place of the Jains/Shikhs. (xv) Jabbalpur is an industrial trade centre/river port. (xvi) Jaipur/Jodhpur is the principal city and capital of Rajasthan. (xvii) Ahmedabad is the capital/former capital of Gujarat. (xviii) Mysore/Bangalore is the capital of Karnatak. (xix) Trivandrum /Quilon is the principal city of Kerala. (xx) Srinagar is situated on the bank of the river Sutlez/Jhelum. (xxi) Calcutta is the capital of India/West Bengal.

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্যাংশ বর্জন করিয়া শুদ্ধ বাক্য রচনা কর : (i) ভারতে সরকারী রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬০,২৩১/৩৮,৯৮০ কিলোমিটার।(ii) ভারতে চারিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে—দমদম, সান্তাক্রুজ, পালাম ও মীনামবক্কম/সফদারজঙ্গ, বেগমপেট, বারাণসী ও পাটনা। (iii) বোম্বাই ভারতের পূর্ব/পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর। (iv) কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম শহর ও বৃহত্তম/দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। (v) বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত বিশাখাপতনমে ভারতের বৃহত্তম জাহাজ-নির্মাণ/বিমানপোত-নির্মাণ শিল্পটি অবস্থিত। (vi) মাদ্রাজ একটি বন্দর/শৈলাবাস। (vii) কাণ্ডলা বন্দরটি মহারাষ্ট্রে/গুজরাটে অবস্থিত। (viii) কাণ্ডলা একটি স্বাভাবিক/কৃত্রিম বন্দর। (ix) চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন/জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। (x) রাঁচি একটি শৈলাবাস/বন্দর। (xi) ভুবনেশ্বর কর্ণাটকের/ওড়িশার রাজধানী। (xii) গৌহাটি গঙ্গার/ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। (xiii) গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষ্ণৌ/কানপুর উত্তর প্রদেশের রাজধানী। (xiv) অমৃতসর জৈনদের/শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। (xv) জব্বলপুর একটি শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র/নদীবন্দর। (xvi) জয়পুর/যোধপুর রাজস্থানের রাজধানী ও প্রধান শহর। (xvii) আমেদাবাদ গুজরাটের রাজধানী/পূর্বতন রাজধানী। (xviii) কর্ণাটকের রাজধানী মহীশূর/বাঙ্গালোর। (xix) কেরালার শ্রেষ্ঠ শহর ত্রিবান্দ্রম/কুইলন। (xx) শ্রীনগর শতদ্রু/ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত। (xxi) কলিকাতা ভারতের/পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রমশিল্প

(Manufacturing Industries)

স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের শিল্পোন্নতি (Industrial Development since Independence)—প্রাচীন যুগে মানুষ কৃষিকার্যের সাফল্য অনুসারে দেশের উন্নতির বিচার করিত। সেই যুগে চীন ও ভারত পৃথিবীর সভ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। প্রকৃতির দান কৃষিজাত সম্পদের সাহায্যে জীবনধারণ করিয়া এখানকার মানুষ তখন ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির অবদানে জগতের মন জয় করিয়াছিল। শিল্প-বিপ্লবের পর যান্ত্রিক সভ্যতা প্রচলিত হওয়ায় শিল্পোন্নত দেশসমূহ জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। খনিজ সম্পদ ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনুসারে বর্তমানে দেশের উন্নতির বিচার করা হয়। সেইজন্য আজ শিল্পোন্নত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর দরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। খনিজ সম্পদের আবিষ্কার ও উত্তোলন এবং উহা শিল্পে ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান যুগে শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়। ভারতে পূর্বে পেশীশক্তি ও পশুশক্তির সাহায্যে কুটীরশিল্পের উন্নতি হইলেও আধুনিক যন্ত্রশিল্পে এই দেশ বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ বিদেশীয়গণ কর্তৃক এই দেশের সম্পদ লুণ্ঠন। শিল্পবিপ্লবের যুগে যখন পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হইতেছিল সেই সময় ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ পরাধীনতার তীব্র গ্লানি ভোগ করিতেছিল। সেই সময় ইংরেজগণ ভারতকে পদানত রাখিয়া এখানকার কাঁচামাল লইয়া নিজেদের শিল্পের উন্নতিসাধন করিত এবং ব্রিটেন হইতে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য এখানে আনিয়া বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রায় এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল; শুধু দুই এক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রয়োজনে ইংরেজগণ এই দেশে কিছু কিছু শিল্প স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিল।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত। পরাধীনতার বন্ধনমুক্ত হওয়ায় ভারত দেশের প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে শুরু করিল। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের (কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্য) উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল; চাহিদা বৃদ্ধির জন্য মানুষের অর্থনৈতিক মান উন্নত করিবার বন্দোবস্ত হইল। এইভাবে ভারতে 'শিল্প বিপ্লবের' যুগ আরম্ভ হইল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রধানতঃ কৃষির উপর জোর দেওয়া হইলেও এই পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতির সূচনা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় ভোগ্যদ্রব্যের বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন কিছুটা বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিল্পে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়। যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল, লোহ ও ইস্পাত শিল্প, জাহাজ-নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি। এই পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় শিল্পের

উন্নতিসাধনের উপর ; ইহার মধ্যে ভারী শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ভারতের 'শিল্প বিপ্লব' প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। ১০ লক্ষ মেঃ.টন ইস্পাত উৎপাদনক্ষম তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন এই পরিকল্পনায় কার্যকরী করা হয়। পুরাতন তিনটি ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিও এই পরিকল্পনার ফল। ইহা ছাড়া ভারী যন্ত্রপাতি, গুরু রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনায় কার্যকরী করা হয়। এই পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ভারতের সংগঠিত শিল্পের উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর আরও জোর দেওয়া হইয়াছিল। ভারী শিল্পের উৎপাদনের লক্ষ্য বহুলাংশে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। শক্তিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কয়লা ও জলবিদ্যুতের উৎপাদন-বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রেলপথের উন্নতিসাধন করিয়া শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত-দ্রব্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিবহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রপ্তানির উপযুক্ত শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামশিল্প ও খনিজ শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য মোট ২,৯৯৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ভারী শিল্পের উন্নতিসাধন। ইস্পাত ও গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন, তৈল শোধনাগার স্থাপন এবং ভারী ও লঘু যন্ত্রপাতি-নির্মাণের উপর এতটা জোর দেওয়া হইয়াছিল যে, এই পরিকল্পনার লক্ষ্য পূর্ণ হইলে তৃতীয় পরিকল্পনা ভারতের শিল্পের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আমদানীর পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি না করিয়া এবং স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে যে সকল শিল্প স্থাপন করা যায়, সেই সকল শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৩,৩৩৭৭ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ২,২৫৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় নূতন নূতন কারখানায় সার, ঔষধ, রসায়ন, লৌহেতর ধাতু, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, সিমেন্ট প্রভৃতি উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। শিল্প ও খনিজ খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য হইয়াছিল ১৩,৫২৮ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছিল ৯,৬৯১ কোটি টাকা।

শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেও এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখনও এই দেশে ৬টি **শিল্পাঞ্চলে** অধিকাংশ শিল্প কেন্দ্রীভূত (১) **কলিকাতার নিকটস্থ হুগলী উপত্যকার শিল্পাঞ্চল,** (২) **বোম্বাই শিল্পাঞ্চল,** (৩) **আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চল,** (৪) **দামোদর উপত্যকা-ছোটনাগপুর-জামসেদপুর-শিল্পাঞ্চল,** (৫) **তামিলনাড়ুর নীলগিরি শিল্পাঞ্চল** এবং (৬) **কানপুর শিল্পাঞ্চল**। হুগলী উপত্যকায় প্রধানতঃ পাট, কার্পাসবয়ন, কাগজ,

চর্মদ্রব্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চলে কার্পাসবয়ন, তৈল পরিশোধন, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে। ছোটনাগপুর-জামসেদপুর শিল্পাঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, সিমেন্ট শিল্প ও রাসায়নিক শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। তামিলনাড়ুর নীলগিরি শিল্পাঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পের এবং কানপুরে পশমবয়ন, কার্পাসবয়ন ও চর্মশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাউরকেলা, রাঁচি, ভিলাই, ভূপাল প্রভৃতি অঞ্চলও ভারীশিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
(Iron and Steel Industries)

উৎপত্তি ও বিকাশ—প্রাচীনকাল হইতে ভারতে লৌহশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকটস্থ অর্ধসমাপ্ত ৭ মিটার উচ্চ 'লৌহস্তম্ভ' ইহার নিদর্শন। ১,৫০০ বৎসর পূর্বে এই স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। সেই সময় পৃথিবীর বহু দেশেই এই শিল্পের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ভারত বিভিন্ন বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া অতিক্রম করায় এবং বিদেশী শক্তির প্রভাবে পরবর্তিকালে এই শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

ভারতে ১৭৭৯ সাল হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি লৌহের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল। যতদূর জানা যায় শিল্প বিপ্লবের পর ১৭৭৯ সালে মট্টি ও ফার্কার (Mottee & Farquhar) ভারতে সর্বপ্রথম আধুনিক লৌহ-কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহারা বীরভূমের লৌহখনিসমূহের ইজারা লইয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। ইহার পর ১৮৩০ সালে হীথ (Josiah Marshall Heath) নামে একজন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক সহায়তায় আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করেন। ইহার ফলে দক্ষিণ আর্কটের পোর্টো নোভো অঞ্চলে লৌহ-উৎপাদন আরম্ভ হয়। কিন্তু শক্তিসম্পদ ও যন্ত্রপাতির অভাবে এবং হীথ মারা যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই কারখানা ১৮৮৪ সালে বন্ধ হইয়া যায়। ঐ বৎসর আবার ঝরিয়া কয়লাখনির সাহায্যে কুলটিতে 'বরাকর আয়রন ফাউনড্রী' নামে একটি লৌহ কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯০০ সালে এই কারখানা হইতে প্রায় ৩৫,৫৬০ মেঃ টন লৌহ উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে এই কারখানা বর্তমান 'ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোং লিঃ'-এর অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় ১৯০৭ সালে। সেই বৎসর বিহারের সাকচীতে জে. এন. টাটা নামক বোম্বাই-এর জনৈক পার্শী ব্যবসায়ী একটি বড় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করেন। সাকচীর বর্তমান নাম জামসেদপুর। ক্রমশঃ বার্নপুর ও ভদ্রাবতীতেও লৌহ ও ইস্পাত-কারখানা স্থাপিত হইল। ভারতে এইভাবে ইস্পাত শিল্পের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়।

ভারতের ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদনের গতি (লক্ষ মেঃ টন)

১৯৫০-৫১	১৪.৭	১৯৬৫-৬৬	৬৫.৩
১৯৫৫-৫৬	১৭.৩	১৯৭০-৭১	৬১.৪
১৯৬০-৬১	৩৪.২	১৯৭৯-৮০	৮০.৩

স্বাধীনোত্তর ভারতে ইস্পাত শিল্পের অগ্রগতি (Progress of Steel Industry in India since Independence)—স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ হইলেও ব্রিটেন হইতে ইস্পাত আমদানি বজায় রাখিবার জন্য এই দেশে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অল্প। ইস্পাতের অভাবে এই দেশে শিল্পোন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটে। স্বাধীনতার পর **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়** লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য সক্রিয় চেষ্টা করা না হইলেও বে-সরকারী ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হয় এবং সরকারী আওতায় নূতন ইস্পাত কারখানা শুরু করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং সরকার স্বয়ং তিনটি ইস্পাত কারখানায় (ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুর) লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন শুরু করে। এই পরিকল্পনায় ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা ধার্য করা হয় ৬২ লক্ষ মেঃ টন। **তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬)** লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির উপর আরও জোর দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় ইস্পাত কারখানাসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা ধার্য হইয়াছিল ১০২ লক্ষ মেঃ টন। এই পরিকল্পনায় পুরাতন কারখানাসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার এবং বোকারোতে একটি নূতন কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কটের নেভেলীতে লিগনাইট কয়লার সাহায্যে ঢালাই-লৌহ উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়। এখানে ৫ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাত উৎপাদনক্ষম একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে অনুসন্ধানও এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য কয়লা ও লৌহের উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছিল। ডালি-রাজহারা ও বারসুয়া অঞ্চলে লৌহ উৎপাদনের জন্য, নন্দিনী অঞ্চলে চুনাপাথর উত্তোলনের জন্য, বোকারোতে নূতন ইস্পাত-কারখানা তৈয়ারির জন্য, ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরের কারখানাসমূহের সম্প্রসারণের জন্য এবং তামিলনাড়ুতে ঢালাই-লৌহের কারখানা স্থাপনের জন্য এই পরিকল্পনায় ৫২৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া এই পরিকল্পনার কার্যকালে দুর্গাপুরে **সংকর ইস্পাত** ও বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদনের জন্য একটি স্বতন্ত্র কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে মোট খরচ হইয়াছে ৫০ কোটি টাকা। দেশরক্ষা বিভাগের কাশীপুর ও কানপুরের কারখানায়ও ৫০,০০০ মেঃ টন সংকর-ইস্পাত প্রস্তুতের বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

চতুর্থ **পরিকল্পনায় (১৯৬৯-৭৪)** ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ মেঃ টন এবং সংকর-ইস্পাতের উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ২২ লক্ষ মেঃ টন। এই পরিকল্পনার কার্যকালে ভিলাই-এর উৎপাদনের ক্ষমতা ৩২ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত করার কথা ছিল, বোকারো হইতে ১৭ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইবার কথা ছিল এবং বোকারোর উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ লক্ষ মেঃ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার কথা ছিল। ইহা ছাড়া হসপেট, সালেম ও বিশাখাপতনমে ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিকল্পনায় ইস্পাতশিল্পের জন্য ১,৬২২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা

হয়। এই পরিকল্পনার শেষে ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ মেঃ টন। এই পরিকল্পনায় ভিলাইতে ৪০ লক্ষ মেঃ টন ও বোকারোতে ৪৭.৫ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হয়। তাহা ছাড়া বিশাখাপতনম্ ও বিজয়নগরে নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবার এবং দুর্গাপুর, ভদ্রাবতী ও সালেমে সংকর-ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্য ধার্য হয়।

ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের **সমস্যাসমূহের** মধ্যে মূলধন ও যন্ত্রপাতির অভাব এবং ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত কোক-কয়লার অপ্রাচুর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশন বৈদেশিক মূলধন, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতে বর্তমানে কোক-কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু এই দেশে সঞ্চিত কোক-কয়লার পরিমাণ খুব যথেষ্ট নহে। সেইজন্য এই দেশকে এখনও লৌহ আকরিক বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়।

কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ—লৌহ-আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ডলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ পদার্থ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কয়লা এই শিল্পের প্রধান শক্তিসম্পদ। কয়লাও খনিজ পদার্থ। এই শিল্প মূলতঃ খনিজ সম্পদকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। উল্লিখিত খনিজদ্রব্যসমূহ ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

অবস্থান ও অবস্থানের কারণ—ভারতে বর্তমানে সাতটি কারখানায় ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে ভিলাই, রাউরকেলা, দুর্গাপুর, বোকারো ও ভদ্রাবতী কারখানা সরকারী আওতায় (Public Sector) এবং জামসেদপুর ও বার্নপুর বে-সরকারী আওতায় (Private Sector) চালিত হইতেছিল। বার্নপুরের পরিচালনার ভারও সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী উদ্যোগে অন্ধ্র প্রদেশের বালাচেরুভু (বিশাখাপতনম্) ও কর্ণাটকের বিজয়নগর (হসপেট) নামক স্থানে দুইটি ইস্পাত শিল্প স্থাপনের কাজ শুরু হইয়াছে। ইহা ছাড়া তামিলনাডুর সালেম অঞ্চলে একটি

সঙ্কর ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইতেছে। ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরের কারখানাসমূহ 'হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড' নামক এবং বোকারোর কারখানাটি 'বোকারো স্টীল লিঃ' নামক সরকারী কোম্পানীর অঙ্গীভূত।

ভারতে ৭টি ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে ৬টি কেন্দ্র এই দেশের উত্তর-পূর্বাংশের খনি অঞ্চলে অবস্থিত। কোনোটি কয়লাখনির নিকটে, কোনোটি লৌহখনির নিকটে, আবার কোনোটি উভয় প্রকার খনির মধ্যবর্তী রেলপথে অবস্থিত। বার্নপুর ও দুর্গাপুরের শিল্পগুলি রানীগঞ্জ কয়লাখনির উপরেই অবস্থিত এবং বোকারোর কারখানাটিও স্থানীয় কয়লাখনির উপরে অবস্থিত ; কিন্তু জামসেদপুর, রাউরকেলা ও ভিলাই লৌহখনি ও কয়লাখনির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই শেষোক্ত তিনটি কেন্দ্র কয়লাখনি হইতে কম দূরে অবস্থিত। এই সকল শিল্পকেন্দ্র বিভিন্ন খনির সঙ্গে রেলপথে যুক্ত।

লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলির ঢালাই লৌহ, ইস্পাত পিণ্ড ও বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদন—১৯৮৩*

(লক্ষ মেট্রিক টন)

কারখানা	ঢালাই লৌহ (বিক্রয়ের জন্য)	ইস্পাত পিণ্ড	বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত
ভিলাই	৪·৫৭	২১·৩০	১৮·৩৮
দুর্গাপুর	১·০৫	৯·৫২	৮·১২
রাউরকেলা	·২৯	১১·৪৪	৯·৯২
বোকারো	৩·৯৩	১৮·২৯	১৪·৭২
ইস্কো (বার্নপুর)	১·১৯	৬·২৪	৫·০০
টিস্কো (জামসেদপুর)	—	১৯·৪৬	১৬·২০

[India—84 হইতে সংগৃহীত]

ভিলাই—মধ্য প্রদেশের দুর্গ জেলার এই স্থানে সোভিয়েত রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যে ভারত সরকার কর্তৃক একটি বৃহদাকার ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে এই কারখানায় ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়। দুর্গ জেলায় ডালি-রাজহারা অঞ্চলের উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক, কোরবা অঞ্চলের কয়লা, টাণ্ডলা খালের জল, মধ্য প্রদেশের বালাঘাট, ছিন্দোয়ারা ও জব্বলপুরের ম্যাঙ্গানিজ কারখানার সংলগ্ন অঞ্চলের চুনাপাথর এবং স্থানীয় সুলভ ও কর্মঠ শ্রমিকের সাহায্যে এখানে ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মাধ্যমে ভিলাই বিভিন্ন খনিজ কাঁচামাল ও কয়লার উৎসের সহিত সংযুক্ত। ভারতের পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলের ইস্পাতের চাহিদা এই স্থান হইতে মিটানো সহজসাধ্য হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই কারখানা স্থাপিত হয়। ভিলাই ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সুতরাং দেশের সকল শিল্পেই এই কারখানা হইতে ইস্পাত সরবরাহ করা যায়। বিশাখাপতনমের জাহাজ-নির্মাণ শিল্প এবং বোম্বাই-এর শিল্পাঞ্চল এই কারখানা হইতে প্রভূত সাহায্য পাইতেছে। প্রথমে এই কারখানায় ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ১০ লক্ষ মেঃ টন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায়

* ভদ্রাবতীতে সামান্য ইস্পাত পিণ্ড উৎপন্ন হয়, উৎপাদনের বাকী সবটা সংকর ইস্পাত।

এই কারখানা সম্প্রসারিত করিবার পর ইহার ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা হইয়াছে ২৫ লক্ষ মেঃ টন এবং ঢালাই লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতা হইয়াছে ১০ লক্ষ মেঃ টন। '১৯৬৬ সালে ভিলাই ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় পরিণত হইয়াছে। এই কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ৪০ লক্ষ মেঃ টন করার কাজ এখন সমাপ্তির মুখে।

দুর্গাপুর—'ইস্কন' নামক একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহায়তায় ভারত সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় এই কারখানা দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে এই কারখানায় ইস্পাত-উৎপাদন শুরু হয়। ঝরিয়া ও রানীগঞ্জের কয়লা, বিহারের সিংভূম ও ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের লৌহ আকরিক, বীরমিত্রপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানিজ, স্থানীয় নিপুণ শ্রমিক এবং দামোদর নদের জল এখানে ইস্পাত কারখানা স্থাপনে সাহায্য করিয়াছে। নিকটবর্তী কলিকাতা বন্দর মারফত লৌহ ও ইস্পাত-দ্রব্য রপ্তানি করা সহজসাধ্য। কলিকাতা বন্দর এই শিল্প-কেন্দ্র হইতে ১৬০ কিলোমিটার দূরবর্তী। রেলপথে এই বন্দর দুর্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত আছে। ইহা ছাড়া দুর্গাপুর হইতে নৌবহনযোগ্য একটি খাল কাটিয়া হুগলী নদীর সঙ্গে মিশান হইয়াছে ; ইহাতেও সুলভ পরিবহণের সুবিধা হইয়াছে। দুর্গাপুর অঞ্চলে বর্তমানে নানাবিধ শিল্প স্থাপিত হওয়ায় ইস্পাতের স্থানীয় চাহিদাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আধুনিক জগতে সুসংগঠিত শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় অঞ্চলের নাম অত্যধিক জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। রূঢ় উপত্যকার সঙ্গে দামোদর উপত্যকার তুলনা চলে। কারণ, রূঢ় অঞ্চলে যেমন প্রচুর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়, দুর্গাপুরেও রানীগঞ্জের উৎকৃষ্ট কয়লা বিদ্যমান। রূঢ় উপত্যকায় বিভিন্ন শিল্পের বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সকল প্রকার সুযোগ বিদ্যমান। ভারতের দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত দুর্গাপুর অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সহ অন্যান্য শিল্পবিকাশের সুযোগ বিদ্যমান। রূঢ় অঞ্চলে যেমন ইস্পাত শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, দুর্গাপুরের নিকটেও সেইরূপ বহু শিল্প

গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমে ইহার ইস্পাত-উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১০ লক্ষ মেঃ টন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই কারখানার ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা হইয়াছে ১৬ লক্ষ মেঃ টন এবং ঢালাই লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতা হইয়াছে ৩ লক্ষ মেঃ টন। এখানে স্বতন্ত্র একটি কারখানায় বৎসরে ১ লক্ষ মেঃ টন সংকর ইস্পাত উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ১·৬ লক্ষ মেঃ টন করা হইতেছে। চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন শিল্প, রূপনারায়ণপুরের তারের কারখানা, আসানসোলের অ্যালুমিনিয়াম ও সাইকেলের কারখানা, সিন্ধ্রির সারের কারখানা এবং স্থানীয় কার্পাসবয়ন, সিমেন্ট, কাগজ ও অন্যান্য নানাবিধ কারখানা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের নিকটেই অবস্থিত। বার্নপুর ইস্পাত কারখানা এবং আরও উত্তরে স্থাপিত বোকারোর ইস্পাত কারখানা ইহার অদূরেই অবস্থিত। এইভাবে দেখা যায় যে, দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত এই শিল্পাঞ্চলকে রুঢ় শিল্পাঞ্চলের সংগে তুলনা করা যায় এবং সেইজন্য ইহাকে **ভারতের রুঢ় (The Ruhr of India)** বলা হয়।

রাউরকেলা—ওড়িশা রাজ্যের লৌহখনি অঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত রাউরকেলায় জার্মানীর ক্রুপস-দেমাগ নামক একটি কোম্পানীর সহায়তায় ভারত সরকার কর্তৃক একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রাথমিক অবস্থায় ইহার ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ মেঃ টন। ১৯৫৯ সালে এই কারখানায় ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়। নিকটবর্তী কিরিবুরু ও বোনাই অঞ্চলের লৌহ আকরিক, রানীগঞ্জ, ঝরিয়া ও তালচের অঞ্চলের কয়লা, হীরাকুদের জলবিদ্যুৎ, স্থানীয় ম্যাংগানিজ, চুনাপাথর ও ডলোমাইট এবং ওড়িশার সুলভ শ্রমিক এই কারখানা স্থাপনে সহায়তা করিতেছে। যে গাড়ি এই অঞ্চল হইতে লৌহ আকরিক, ম্যাংগানিজ, চুনাপাথর ও ডলোমাইট লইয়া জামসেদপুর ও দুর্গাপুরে যায়, সেই গাড়িতেই ঝরিয়া ও রানীগঞ্জ হইতে কয়লা আনা হয়। ইহাতে পরিবহণ খরচ বাঁচিয়া যায়। নিকটবর্তী ব্রাহ্মণী নদী হইতে প্রচুর জল পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ইহার ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ১৮ লক্ষ মেঃ টন করা হইয়াছে।

বোকারো—তৃতীয় পরিকল্পনায় এখানে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে সাহায্য না দেওয়ায় সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। বোকারো স্টীল লিঃ নামক একটি সরকারী কোম্পানীর উপর এই কারখানার পরিচালনভার ন্যস্ত হইয়াছে। বর্তমানে এই কারখানায় ২৫ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাতপিণ্ড ও ৩৫ লক্ষ মেঃ টন ঢালাই লৌহ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। ইহার ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ৪০ লক্ষ মেঃ টন করার কার্য এই বৎসরের মধ্যেই শেষ হইবে। স্থানীয় কয়লা, ময়ূরভঞ্জ ও সিংভূমের লৌহ আকরিক, গাঙ্গপুরের ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথর, দামোদর নদের জল এবং পূর্ব রেলপথের পরিবহণ-ব্যবস্থার সাহায্যে এখানে ঢালাই-লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন সহজসাধ্য হইয়াছে। এই কারখানাটি অচিরেই ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা হিসাবে গণ্য হইবে।

ভদ্রাবতী—কর্ণাটকে অবস্থিত এই কারখানাটি অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট। পশ্চিম কর্ণাটকের বনভূমি অঞ্চলে ভদ্রা নদীর তীরে এই কারখানাটি অবস্থিত। এখানে

পূর্বে মাত্র ২৫,০০০ মেঃ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইত। এখানে পূর্বে কিছু পরিমাণে সঙ্কর ইস্পাতও (Alloy steel) প্রস্তুত হইত। এখন এখানে অধিকাংশই সঙ্কর-ইস্পাত উৎপাদিত হইতেছে। বর্তমানে এই কারখানার সঙ্কর ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা ৭৭,০০০ মেঃ টন এবং ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা ৪৭,০০০ মেঃ টন। নিকটবর্তী কোথাও কয়লা পাওয়া যায় না বলিয়া কয়লার অভাবে শিমোগা ও কাদুরের বনভূমি হইতে সংগৃহীত কাঠ-কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হইত; এখন যোগ জলপ্রপাতের জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই কারখানা চালানো হয়। এই রাজ্যের বাবাবুদান পর্বতের কেমানগুণ্ডির খনির লৌহ, শিমোগা ও চিত্রদুর্গ অঞ্চলের ম্যাঙ্গানিজ এবং ভাণ্ডিগুড্ডার চুনাপাথর এই কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এই কারখানায় জলবিদ্যুতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ফার্নেস জ্বলে বলিয়া এখানে সঙ্কর ইস্পাত তৈয়ারি করাই লাভজনক।

জামসেদপুর—১৯১১ সালে জামসেদপুরে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে জামসেদপুরের দান অসামান্য। এখানে এই শিল্প গড়িয়া ওঠার প্রধান কারণ এই যে, ইহার উত্তরে ঝরিয়া ও বোকারোর কয়লা-খনি এবং দক্ষিণে সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝাড়ের লৌহখনি এবং গাঙ্গপুরের ম্যাঙ্গানিজ খনি অবস্থিত। ঐ সকল খনি হইতে কয়লা, লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানিজ এই কারখানায় আনা হয়। ওড়িশার গাঙ্গপুর অঞ্চলের চুনাপাথর ও ডলোমাইট এখানে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা বিভিন্ন খনি অঞ্চলের সহিত জামসেদপুর যুক্ত। সুবর্ণরেখা নদী এই স্থানের পাশ দিয়া প্রবাহিত বলিয়া জলের কোনো অভাব হয় না। মধ্য প্রদেশ ও ছোটনাগপুরের সুলভ শ্রমিক এবং ভারতে ইস্পাতের প্রচুর চাহিদা এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। কলিকাতা বন্দর এই স্থান হইতে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইহার ফলে কাঁচা লৌহ রপ্তানি সহজসাধ্য হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই কারখানার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া এখানকার ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়াইয়া ২০ লক্ষ মেঃ টন করা হইয়াছে।

বার্নপুর—১৯১৮ সালে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়। ঝরিয়া ও রানীগঞ্জের কয়লা, সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মারফত এখানে আনা হয়। স্থানীয় শ্রমিক এই শিল্পে নিপুণতার পরিচয় দেয়। বিহার ও ওড়িশা হইতেও প্রচুর সুলভ শ্রমিক এখানে আসে। কলিকাতা বন্দর এই কারখানা হইতে বেশী দূরে নহে; কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে ইস্পাতের চাহিদা যথেষ্ট। এই সকল কারণে বার্নপুরের নিকট কুলটি ও হীরাপুরে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে ইহার ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়াইয়া ১০ লক্ষ মেঃ টন করা হইয়াছে। এখন এই কারখানাটি ভারত সরকারের পরিচালনাধীন।

সালেম—তামিলনাডু রাজ্যের সালেম নামক স্থানে চতুর্থ পরিকল্পনার কার্য-কালে ৩৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সঙ্কর ইস্পাত উৎপাদনের জন্য এই কারখানার নির্মাণকার্য শুরু হয়। এখানকার ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ২২ লক্ষ মেঃ টন। নেভেলিতে লিগনাইট কয়লা, সালেম ও তিরুচিরাপল্লীতে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে সঞ্চিত লৌহ-

ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটি মেঃ টন। সুতরাং সালেমে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠার ও সমৃদ্ধিলাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। ১৯৮১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কারখানাটি চালু হইয়াছে। এখানে বর্তমানে বৎসরে ৩২ হাজার মেঃ টন সংকর ইস্পাত উৎপন্ন হইতে পারিবে। কারখানাটির নির্মাণকার্যে এখন পর্যন্ত ২৬৭ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বিশাখাপতনম—চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অন্ধ্র প্রদেশে বিশাখাপতনমের নিকটে বালাচেরুভু নামক স্থানে ১৯৭১ সালের ২০শে জানুয়ারী পঞ্চম সরকারী ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হইয়াছে। অন্ধ্র প্রদেশের সিঙ্গারেণী কয়লাখনি হইতে এই কারখানায় কয়লা আনা হইবে। এই রাজ্যের নেল্লোর, কুড্ডাপা ও কুর্ণুল অঞ্চলের এবং মধ্য প্রদেশের বৈলাডিলা অঞ্চলের লৌহ আকরিক এই কারখানায় ব্যবহৃত হইবে। বিশাখাপতনম বন্দরের সাহায্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি এবং রপ্তানিযোগ্য ইস্পাতদ্রব্য রপ্তানি করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হইবে। আশা করা যায়, আগামী চার বৎসরের মধ্যে এই কারখানার প্রথম অংশের কাজ শেষ হইবে। এই কারখানার ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ৩০ লক্ষ মেঃ টন।

বিজয়নগর (হস্‌পেট)—১৯৭১ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে কর্ণাটক রাজ্যের বিজয়নগরে এই ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য শুরু হয়। এখানকার ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ৩০ লক্ষ মেঃ টন। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক, চুনাপাথর, ডলোমাইট ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। অপর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও এখানে বিদ্যমান। এই স্থান সারা ভারতের সহিত রেলপথ ও রাজপথের দ্বারা সুন্দরভাবে যুক্ত। হস্‌পেট অঞ্চলের সঞ্চিত লৌহ আকরিকের পরিমাণ প্রায় ১২৫ কোটি মেঃ টন। এই আকরিক অতি উচ্চশ্রেণীর। অন্যান্য সুবিধা অপর্যাপ্ত থাকার ফলে দূরবর্তী স্থান হইতে কয়লা আনিবার খরচ পোষাইয়া যাইবে।

উৎপাদন—১৯৮৩ সালে ভারতের লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রে মোট ৭২·৯ লক্ষ মেঃ টন বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত এবং ৮৬·২৫ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাত পিণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে।

বাণিজ্য—ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। লৌহ আকরিক, কয়লা, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ও ডলোমাইটের অপর্যাপ্ত সম্ভার এই দেশে বিদ্যমান। পরিকল্পনা কমিশন এই শিল্পের উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিদেশ হইতে মূলধন ও কারিগরি সাহায্যের কোনো অভাব এই দেশে পরিলক্ষিত হয় না; এইজন্য ক্রমশঃ লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ছয় গুণ হইয়াছে। কিন্তু ভারতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতের চাহিদা অসম্ভব হারে বাড়িয়া গিয়াছে, এখনও উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী। আমদানি করিয়া এই চাহিদা মিটাইতে হইতেছে। ভারতে বর্তমানে ইস্পাতের মোট চাহিদা জনপ্রতি মাত্র ১৫ কিলোগ্রাম, কিন্তু ইহার পরিমাণ ব্রিটেনে জনপ্রতি ২০০ কিলোগ্রাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬০ কিলোগ্রাম এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় ৩০০ কিলোগ্রাম।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় নূতন নূতন যন্ত্রপাতি-শিল্প স্থাপিত হওয়ায় লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও আমদানি কমিয়া আসিতেছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ইহার প্রধান কারণ। ভারতে ঢালাই লৌহের উৎপাদন অবশ্য চাহিদার তুলনায় বেশী। এইজন্য ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে ঢালাই-লৌহ রপ্তানি করা হয়। ইহা ছাড়া লৌহ ও ইস্পাতের টুকরা ব্রিটেন ও জাপানে রপ্তানি করা হয়। প্রধানতঃ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে ইস্পাতদ্রব্য আমদানি হয়। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সাম্প্রতিক উন্নতির ফলে এই দেশ নিকটবর্তী দেশসমূহে (ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন, শ্রীলংকা প্রভৃতি) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইস্পাত দ্রব্য রপ্তানি করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৮১-৮২ সালে ভারত ৩১৫ কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাত ও ঢালাই লৌহ রপ্তানি করে এবং ১,১৩৬ কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাতদ্রব্য আমদানি করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কয়লার অভাবে ইস্পাত শিল্পের উন্নতিসাধন করা খুব কঠিন। সুতরাং ভারতীয় ইস্পাতের উৎপাদন-খরচ বর্তমানের মতো কম রাখিতে পারিলে এই সকল বাজার বজায় রাখা মোটেই কঠিন হইবে না। এইভাবে দেখা যায় যে, ভারতের ইস্পাত-রপ্তানির ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা—ভারতের বিকাশ-উন্মুখ ইস্পাত শিল্পের কিছু কিছু সমস্যা আছে। যেমন, (ক) উৎকৃষ্ট মানের কোক-কয়লার উৎপাদন এই শিল্পের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নহে ; (খ) সর্বত্র প্রয়োজন মত উন্নত মানের চুনাপাথর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না ; (গ) দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত ভদ্রাবতী কারখানায় কয়লার অভাবে পূর্বে বনভূমির কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হইত ; এখন জলবিদ্যুৎ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় ; (ঘ) কোনো কোনো কাঁচামাল বেশ দূরবর্তী স্থান হইতে কারখানায় আনয়ন করিতে হয় বলিয়া পরিবহণ-ব্যয় বেশী হয় ; (ঙ) উৎপাদন-ব্যয় অধিক ইত্যাদি।

কিন্তু উল্লিখিত সমস্যা সত্ত্বেও এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেক বেশী উজ্জ্বল। কারণ.(ক) বিহারের ঝরিয়া ও বোকারো, পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ, মধ্য প্রদেশের কোরবা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। বিহারের সিংভূম, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝাড়, কর্ণাটকের বাবাবুদান, মধ্য প্রদেশের দুর্গ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশ, বিহার ও ওড়িশায় প্রচুর ডলোমাইট, চুনাপাথর ও ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য **কাঁচামাল** ও **শক্তিসম্পদের** অভাব নাই। (খ) দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব রেলপথ এবং বিভিন্ন জাতীয় সড়ক এই সকল অঞ্চলকে শিল্পকেন্দ্র ও বন্দরের সহিত যুক্ত করিয়াছে ; সুতরাং শিল্পের পক্ষে **পরিবহণ-ব্যবস্থা** বেশ উন্নত। (গ) ভারত বিভিন্ন শিল্পে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি, কাঁচা লৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন। এখনও প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাত ও ইস্পাতদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। সুতরাং ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদার অভাব নাই। (ঘ) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে

উন্নতি না ঘটায় ইহার **রপ্তানি বাণিজ্যের** প্রচুর **সুযোগ** বিদ্যমান। (ঙ) এই শিল্পের জন্য **সুলভ শ্রমিকের** কোনো অভাব ভারতে নাই। (চ) সরকারী আওতায় পড়ে বলিয়া এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব নাই। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই সকল কারণে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আরও উন্নতি ঘটিবে।

কার্পাসবয়ন শিল্প
(Cotton Textile Industry)

উৎপত্তি ও বিকাশ—প্রাচীনকাল হইতেই ভারত কার্পাসবয়ন শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তখন তকলী দ্বারা সুতা প্রস্তুত করিয়া তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করা হইত। কোনো কোনো কাপড় এত সূক্ষ্ম হইত যে, বর্তমান যুগের কাপড়ের কলেও এত ভালো কাপড় প্রস্তুত হয় না। এক সময়ে কালিকটের 'ক্যালিকো' এবং ঢাকার 'মসলিনের' কথা পৃথিবীর সকলেই জানিত। ভারতের তাঁতশিল্প এত উন্নত যে, এই যান্ত্রিক যুগেও ইহা ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রাদি এই দেশে বিক্রয় করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতের তাঁতশিল্পের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয় নাই।

১৮১৮ সালে কলিকাতার নিকট ঘুষুড়ী নামক স্থানে ভারতে প্রথম আধুনিক ধরনের কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট তুলা না পাওয়ায় ১৮৫১ সালের পূর্বে ভারতে কাপড়ের কলসমূহের বিশেষ কোনো উন্নতি হয় নাই। ঐ সময় জলবিদ্যুতের সাহায্যে আমেদাবাদ ও বোম্বাই শহরে কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়ার পর ইহার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দেশের কার্পাস শিল্প প্রভূত উন্নতিলাভ করে। ১৯২৭ সালে সংরক্ষণ শুল্ক বসাইবার পর এই শিল্পের দ্রুত প্রসার হয়। বর্তমানে কার্পাসবয়ন ভারতের **সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প**। ভারত কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনে পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** এবং রপ্তানিতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে।

এখানে কাপড়ের কলে ও তাঁতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। কাপড়ের কলগুলি তিন প্রকারের হইয়া থাকে: **সুতা কল (Spinning Mills)**, **বয়ন-কল (Weaving Mills)**, **সুতা ও বয়ন কল (Composite Mills)**। তাঁতগুলি মিলের সুতা বা হাতে কাটা সুতা ব্যবহার করে।

হস্তচালিত ও শক্তিচালিত **তাঁতশিল্প** ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বস্ত্র তাঁতশিল্প হইতে আসে। সুতরাং ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে তাঁতশিল্পের উন্নতির দিকে নজর রাখিতে হইবে। প্রাচীনকালে এই তাঁতশিল্পজাত বস্ত্র জগতে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেইজন্য স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা কমিশন ইহার উন্নতির জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কৃষকের আয়ের দ্বিতীয় পন্থা হিসাবে তাঁতশিল্পের প্রসার হইলে শুধু যে কৃষকই উপকৃত হইবে তাহা নহে, তাঁত-শিল্পে বস্ত্রের উৎপাদন খরচও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার লুংগী, তোয়ালে, গামছা, জরি ও মুগার কাপড়, রংগীন শাড়ী প্রভৃতির

উৎপাদন শুধু তাঁতশিল্পের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। সমবায়ের মারফত শক্তিচালিত তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার অর্থসাহায্য করিতেছেন। ইহার ফলে এই দেশের তাঁতশিল্প উন্নতিলাভ করিতেছে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় মিলজাত কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড় উৎপাদনের উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্প স্বাধীনতার পূর্বেই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মাধ্যমে এই শিল্পের আরও উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে তাঁত ও মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, উৎপাদন আরও উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, মোট উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা কমিশন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলার উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। জলসেচের বন্দোবস্ত করিয়া এই জাতীয় তুলার উৎপাদন বাড়ানো হইতেছে। তাঁতশিল্পকে আর্থিক সাহায্য দিয়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া ইহার উন্নতিসাধনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। মিলের সহিত তাঁতশিল্পের সমন্বয়-সাধনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে বৎসরে জনপ্রতি মাত্র ১৫ মিটার কাপড় ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ইহা অত্যন্ত কম। আশা করা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইবে ও উৎপাদন বাড়িবে।

কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ—এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কার্পাস তুলা। ইহা কৃষিজাত দ্রব্য। ইহা ছাড়া নানা প্রকার রঙের প্রয়োজন। এই শিল্পে কয়লা, তাপবিদ্যুৎ অথবা জলবিদ্যুৎ শক্তিসম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস তুলা উৎপন্ন হয়। (কৃষিজাত দ্রব্য হইতে 'তুলা' দ্রষ্টব্য)। ভারতে এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিসম্পদেরও অভাব নাই।

অবস্থান ও অবস্থানের কারণ—ভারতে বর্তমানে (১৯৮২) প্রায় ৮০৩টি আধুনিক ধরনের কাপড়ের কল আছে—৫২২টি সুতাকল এবং ২৮১টি সুতা ও কাপড়ের কল। ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ১০৭টি, গুজরাটে ১১৭টি, তামিলনাড়ু রাজ্যে ২১৯টি, পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি, উত্তর প্রদেশে ২৭টি, অন্ধ্র প্রদেশে ৩২টি, কর্ণাটকে ৩৩টি, মধ্য প্রদেশে ২৪টি, কেরালায় ২৮টি, রাজস্থানে ২১টি, পাঞ্জাবে ৯টি, পণ্ডিচেরীতে ৫টি, বিহারে ৬টি, ওড়িশায় ৫টি, দিল্লীতে ৪টি, আসামে ২টি এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ১টি কাপড়ের কল আছে। ইহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩ লক্ষ তাঁতে প্রচুর তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়।

মহারাষ্ট্র—এই রাজ্যেই **বোম্বাই শিল্পাঞ্চলে** এই শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে (১৮৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই অঞ্চলে ৫৪টি কাপড়ের কল আছে। ইহা ছাড়া এই রাজ্যের শোলাপুর, পুনে, হুবলী, জলগাঁও, নাগপুর ও আকোলা শহর অঞ্চলে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে।

বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। যথা, (ক) কৃষ্ণমৃত্তিকার জন্য এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী তুলা উৎপন্ন হয়। (খ) এখানকার আর্দ্র জলবায়ু সূক্ষ্ম সুতা উৎপাদনের সহায়ক। (গ) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের

সুবন্দোবস্ত থাকায় এই সকল কাপড়ের কলে সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। (ঘ) স্থানীয় শ্রমিক এবং দাক্ষিণাত্যের সুলভ শ্রমিক এই শিল্পে নিয়োজিত হয়। (ঙ) বোম্বাই-এর ভাটিয়া ধনিকগোষ্ঠী এই শিল্পের মূলধন যোগাইয়াছে এবং স্থানীয় ব্যাংকসমূহ হইতে এই শিল্পের জন্য প্রচুর ঋণ পাওয়া যায়। (চ) বোম্বাই বন্দরের
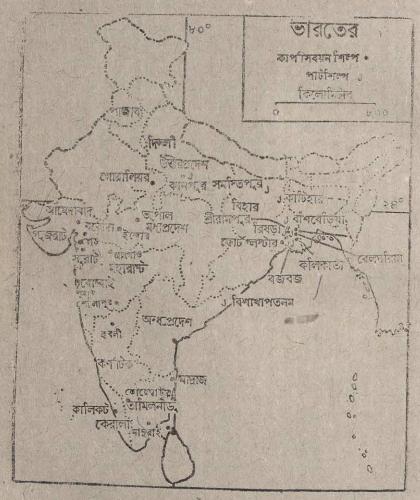
মারফত তুলা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা ও বস্ত্রাদি রপ্তানি করা সহজ। (ছ) এই অঞ্চলে রেলপথের সুবন্দোবস্ত থাকায় তুলা আনিবার ও বস্ত্রাদি পাঠাইবার কোনো অসুবিধা হয় না। (জ) এই অঞ্চলে ও ইহার পার্শ্ববর্তী জনবহুল অঞ্চলে এখানকার কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে।

গুজরাট—এই রাজ্যের আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পের একদেশীভবন ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলে ৬৯টি কাপড়ের কল আছে। ইহা ছাড়া এই রাজ্যের সুরাট, ব্রোচ ও বরোদা অঞ্চলে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে।

বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চলের কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। (ক) গুজরাট রাজ্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর তুলা ও পার্শ্ববর্তী তুলা উৎপাদক রাজ্যগুলি হইতে আমদানীকৃত তুলা এখানকার কলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। (খ) কয়লার অভাব জলবিদ্যুতের সাহায্যে পূরণ করা হয়। (গ) গুজরাটের ধনিক-বণিক গোষ্ঠী এই শিল্পের মূলধন যোগাইতেছে। (ঘ) স্থানীয় দক্ষ শ্রমিক ও রাজস্থানের সুলভ শ্রমিক এই শিল্প বিকাশের সহায়ক হইয়াছে। (ঙ) গুজরাট উপকূলের বিভিন্ন বন্দর এই শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত ; তাছাড়া বোম্বাই বন্দরও খুব দূরে অবস্থিত নহে। এই সকল বন্দরের মাধ্যমে বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা ও শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা সহজসাধ্য। (চ) আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চল সড়কপথে ও রেলপথে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের সহিত যুক্ত থাকায় তুলা আনিবার ও বস্ত্রাদি বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠাইবার কোনো অসুবিধা হয় না। (ছ) এই অঞ্চলে ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখানকার কাপড়ের চাহিদা আছে। এই সব কারণে আমেদাবাদকে কেন্দ্র করিয়া গুজরাটের কার্পাসবয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।

তামিলনাড়ু—এই রাজ্যে আধুনিক কাপড়ের কল ও তাঁতশিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের **কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চলের** তুলা, উন্নত জলবিদ্যুৎ শক্তি, আর্দ্র জলবায়ু, সুলভ শ্রমিক, সড়কপথ ও রেলপথের প্রসার এই রাজ্যের কার্পাসশিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে ; এখানকার অধিকাংশ মিলে শুধু সুতা প্রস্তুত হয় ; এই সুতার বেশীর ভাগ শক্তি ও হস্তচালিত তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত হয়। এখানকার তাঁতশিল্পের উন্নতিতে সুতাকলগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তামিলনাড়ু রাজ্যে বর্তমানে ২১৯টি কাপড়ের কল আছে ; **কোয়েম্বাটুর** (১১৪টি) এই রাজ্যের বৃহত্তম কার্পাস শিল্পকেন্দ্র। পাইকারা জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রের বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে এই শহরের মিলগুলি চালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ—সর্বপ্রথম কাপড়ের কল এই রাজ্যে স্থাপিত হইলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বস্ত্র উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। তুলা একটি ওজন-হ্রাসপ্রাপ্ত খাঁটি কাঁচামাল বলিয়া কাঁচামালের প্রাপ্তিস্থান হইতে বহু দূরে বাজারের নিকট পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার অধিকাংশ মিল হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। বর্তমানে আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও কয়েকটি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মোটেই তুলা উৎপন্ন হয় না ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে এই রাজ্যে আধুনিক কার্পাসবয়ন শিল্পের ও তাঁতশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁতশিল্পে তামিলনাড়ুর পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান।

উন্নতির কারণ—প্রথমতঃ, কলিকাতা বন্দরের মারফত তুলা-আমদানি ও বস্ত্র-রপ্তানি সহজসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, নিকটবর্তী রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লার সাহায্যে এখানে শিল্প স্থাপন করা সহজ। তৃতীয়তঃ, পূর্ব ভারতের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের বস্ত্রের বিরাট চাহিদা মিটানো এই রাজ্যের পক্ষে সহজ ; কারণ, পূর্ব ভারতে বস্ত্র প্রেরণ করিতে বোম্বাই অঞ্চল অপেক্ষা এখানকার রেলভাড়া কম লাগে। ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। স্থানীয় মিলসমূহ এই চাহিদা মিটাইতে

না পারায় বোম্বাই অঞ্চল হইতেও এখানে বস্ত্রাদি আমদানি করিতে হয়। চতুর্থতঃ, এই রাজ্যের পরিবহণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। পঞ্চমতঃ, পশ্চিমবঙ্গে ও ইহার নিকটবর্তী বিহার, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্য হইতে সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র অন্তরায় তুলার অভাব। তুলা-সংগ্রহের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিলে এই রাজ্যের পক্ষে কার্পাসবয়ন শিল্পে উন্নতিলাভ করা সহজ। বর্তমানে এই রাজ্যে ৪১টি কাপড়ের কল আছে। আর্থিক, রাজনৈতিক ও শ্রমিক সমস্যার জন্য এখানকার অধিকাংশ কাপড়ের কল বহুদিন বন্ধ ছিল। সরকারের আর্থিক সাহায্যের ফলে অনেক মিল পুনরায় চালু হইয়াছে। এই রাজ্যের মিলসমূহে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করে।

উত্তর প্রদেশ—কানপুর কার্পাস-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। কয়লাখনি কিছুটা দূরে থাকিলেও পাঞ্জাবের তুলা, স্থানীয় সুলভ শ্রমিক, রেলপথের সুবন্দোবস্ত এবং স্থানীয় বাজারের প্রচুর চাহিদা এই শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কানপুরে ১৪টি কাপড়ের কল আছে।

মধ্য প্রদেশ—গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ কাপড়ের কল অবস্থিত।

কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, পণ্ডিচেরী, বিহার, ওড়িশা, আসাম ও দিল্লী রাজ্যেও কার্পাস শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

উৎপাদন—১৯৮৩ সালে ভারতে ১২৫ কোটি কিলোগ্রাম কার্পাস সুতা এবং ৯৫১.৮ কোটি মিটার কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই বস্ত্রের মধ্যে ৩৮০ কোটি মিটার মিলে এবং ৫৭১.৮ কোটি মিটার হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বাণিজ্য—বস্ত্র-রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই দেশ বস্ত্র রপ্তানিতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। কারণ, সেই সময় জাপান ও জার্মানীর রপ্তানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে রপ্তানি-বাণিজ্যে জাপানের পরেই ভারতের স্থান। ভারতে উৎপন্ন কার্পাস-বস্ত্র ও পোশাক বর্তমানে ব্রিটেন, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতকে জাপান, চীন, হংকং, পাকিস্তান, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। সুতরাং উৎপাদন খরচ না কমাইলে ভারতের পক্ষে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা কষ্টকর।

এইজন্য অনেক মিলের পুরাতন যন্ত্রপাতি পাল্টাইয়া নূতন যন্ত্রপাতি বসানো প্রয়োজন। কলিকাতার নিকট টেক্সম্যাকো-তে এখন বস্ত্রশিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। তবু এখনও এই যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়।

জাপানের সঙ্গে ভারত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। বিভিন্ন পরিকল্পনায় রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। উৎপাদন খরচ কমানো এবং বস্ত্রের উৎকর্ষ-বৃদ্ধির দ্বারাই জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব। সেইজন্য কাপড়ের মিলসমূহের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

এমনও বহু মিল আছে যাহাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় নহে, ইহাদের উৎপাদন-খরচ অত্যন্ত বেশী। কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য 'জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন' (National Industrial Development Corporation) মিলসমূহকে আর্থিক সাহায্য দানের বন্দোবস্ত করিতেছে।

ইহা ছাড়া, ভারত সরকার কার্পাসবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য 'কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি উন্নয়ন সংঘ' (Cotton Textile Export Promotion Council বা Texprocil) নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ইহার ফলে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

সুতরাং আশা করা যায়, ভারত কার্পাসবস্ত্রের রপ্তানি বাণিজ্যে আরও উন্নতিলাভ করিবে। বর্তমানে এই দেশ বস্ত্র ও সুতা দুইই রপ্তানি করিতেছে। ১৯৮১-৮২ সালে ভারত প্রায় ২৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের কার্পাসবস্ত্র ও ৫৪৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের তৈয়ারি পোশাক রপ্তানি করিয়াছে।

শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা—ভারতের কার্পাস-বয়ন শিল্পে বর্তমানে কয়েকটি সমস্যা বিদ্যমান রহিয়াছেঃ (ক) ভারতের তুলার অধিকাংশ মাঝারি ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ফলে উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যায়। (খ) বহু মিলে এখনও পুরাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতে থাকায় উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। (গ) সুলভ যন্ত্রপাতি ও জলবিদ্যুতের অভাবে শক্তিচালিত তাঁত শিল্প (Power looms) আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। (ঘ) শ্রমিক-মালিকের মধ্যে শিল্পবিরোধ থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হয়।

এই সকল সমস্যা কাটাইয়া উঠা খুব কঠিন নহে। কারণ, (ক) লোকসংখ্যা বেশী হওয়ায় ভারতে বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচুর। (খ) নিকটবর্তী দেশসমূহ এখনও এই শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং বস্ত্রের রপ্তানি বাণিজ্যে ভারত আরও উন্নতিলাভ করিতে পারে। (গ) দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা ছাড়া সাধারণ কাঁচা তুলা, শক্তিসম্পদ ও শ্রমিকের কোনো অভাব নাই। জলসেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই অনায়াসে এই তুলার অভাব মিটানো যাইবে। (ঘ) সমবায়ের মাধ্যমে শক্তি-চালিত তাঁত শিল্পের উন্নতিসাধন করা কঠিন নহে। সুতরাং ভারতে কার্পাস-বয়ন শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা এখনও প্রচুর রহিয়াছে।

পশমবয়ন শিল্প (Woolen Industry)

উৎপত্তি ও বিকাশ—পশমবয়ন শিল্প স্বাধীনতালাভের পূর্ববর্তী যুগে ভারতে তেমন উন্নত ছিল না। কুটিরশিল্প হিসাবেই তখন এই শিল্প বিকাশলাভ করিয়াছিল। তখনকার দিনেও কাশ্মীরের শাল ও গালিচা, পাঞ্জাবের কম্বল ও আলোয়ান, উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের পশমজাত দ্রব্য সমাদৃত ছিল।

যুগে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিদেশ

হইতে পশম দ্রব্য আমদানির নানা অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় দেশের মধ্যে নানা স্থানে পশম-বয়ন শিল্প প্রসারিত হইয়াছে ও উন্নতমানের পশম-উৎপাদন প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে বৃহদাকার কারখানা স্থাপন করিয়া পশম হইতে প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে।
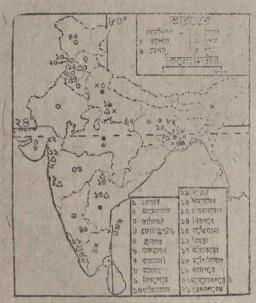
শীতপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের শীতের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পশমী বস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়; তাহা ছাড়া শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলেই অধিকাংশ ছাগ, মেষ ইত্যাদি পশমপ্রদায়ী পশু প্রতিপালিত হয় এবং পশমশিল্পে ব্যবহারের উপযোগী কাঁচা পশম শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সেইজন্য দেখা যায় শীতপ্রধান পার্বত্য প্রদেশে বা উহার নিকটবর্তী কোনো শিল্পপ্রধান শহরে পশমবয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।

কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ—মেষ ও ছাগলের পশম এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। ভারতের অধিকাংশ স্থান নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া শীত কম অনুভূত হয়; সেইজন্য পশমী বস্ত্রের চাহিদা কম। ভারতে উৎপন্ন পশমে ভারতের পশমবয়ন শিল্পের চাহিদা পূরণ হয়। পশমবয়ন শিল্পে কয়লা, তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ শক্তিসম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অবস্থান ও অবস্থানের কারণ : জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা পশুপালনকে অন্যতম জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। শীতপ্রধান অঞ্চলের ছাগ, মেষ প্রভৃতি পশুর লোম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। বর্তমানে এই সকল অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্কর মেষ সৃষ্টি করিয়া মেষের লোমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরে এখন ৬৪ প্রকারের মেষ প্রতিপালিত হয়।

কাশ্মীরের কারুকার্যখচিত শাল পৃথিবীর সর্বদেশের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়। ইহা ছাড়া এখানে আলোয়ান, কম্বল, গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শ্রীনগর ও অন্যান্য আরও অনেক শহরে পশমবয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। কাশ্মীরে প্রায় ৩ লক্ষ লোক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে।

হিমাচল প্রদেশে স্থানীয় পশমের সাহায্যে পশমবয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগীন্দ্রনগরের জলবিদ্যুৎ এই শিল্পের শক্তিসম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পাঞ্জাবের অমৃতসর, ধারিওয়াল, গুরুদাসপুর, জলন্ধর, লুধিয়ানা প্রভৃতি শহর পশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার কলকারখানায় কম্বল, গালিচা, আলোয়ান, সোয়েটার, মাফলার প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

উত্তর প্রদেশের কানপুর, রামপুর, মির্জাপুর প্রভৃতি শহরে পশমবয়ন শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। রামপুরী শাল বিখ্যাত।

রাজস্থানের জয়পুর, বিকানীর প্রভৃতি স্থানে পশমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে প্রধানতঃ কুটিরশিল্প হিসাবেই এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে।
গুজরাট ও কর্ণাটকেও স্থানে স্থানে পশম বয়নশিল্প কেন্দ্র দেখা যায়।

উৎপাদন—১৯৮২ সালে ভারতে ৪১৭ লক্ষ কিলোগ্রাম পশমী সুতা ও ১৬৭ লক্ষ মিটার পশমী বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। কার্পাসবস্ত্রের তুলনায় পশমী বস্ত্রের উৎপাদন খুবই নগণ্য। কারণ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীর পশমী বস্ত্র ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হয় না ; অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র বলিয়া প্রয়োজনীয় পশমী বস্ত্র কিনিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। ভারতের পশম উৎকৃষ্ট মানের নহে বলিয়া বিদেশেও ভারতীয় পশমী বস্ত্রের চাহিদা কম। এই সকল কারণে ভারতে পশমী সুতা ও বস্ত্র উৎপাদন তেমন উন্নতিলাভ করে নাই।

বাণিজ্য—পশমশিল্প ভারতে এখনও তেমন উন্নতিলাভ করে নাই। কারণ, পশমের উৎপাদন যথেষ্ট নহে এবং পশমী দ্রব্যের চাহিদাও ভারতে জনসংখ্যার অনুপাতে খুবই কম। প্রতি বৎসর ভারতে যে পরিমাণ পশমী সুতা ও পশমী কাপড় তৈয়ারি হয় অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া উহার সামান্য অংশই পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেতে রপ্তানি হইতে পারে। এই রপ্তানির পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু ভারত প্রতি বৎসর প্রায় ২৫০ কোটি টাকা মূল্যের পশমী কার্পেট বিদেশে রপ্তানি করে। ইহা ছাড়া শাল, আলোয়ান, কম্বল প্রভৃতিও বিদেশে রপ্তানি হয়।

পাটশিল্প (Jute Industry)

উৎপত্তি ও বিকাশ—পাটশিল্প ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প। অর্থপ্রসূ শিল্প হিসাবে ভারতে ইহার স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এই শিল্প অন্যতম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। প্রাচীনকালে কুটিরশিল্পে টাকুর সাহায্যে পাটের সুতা কাটা হইত এবং দড়ি, থলে প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। আধুনিক পাটশিল্প প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই দেশ হইতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ব্রহ্মদেশ, উত্তর আমেরিকা, জার্মানী ও জাভা প্রভৃতি দেশে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইত। ১৮৫০-৫১ সালে মোট ৪৪ লক্ষ টাকার থলে,

চট প্রভৃতি এই সকল দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ইংরেজগণ পাটের সাহায্যে একটি ব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিল। এই বিষয়ে তাহারা শীঘ্রই সাফল্যলাভ করে। ১৮৩২ সালের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্কটল্যান্ডের ডান্ডি শহরে পাট পাঠাইয়া গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিল যে, শণের পরিবর্তে সুলভ পাট ব্যবহার করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডান্ডিতে পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল। কয়েক বৎসর পর ইংরেজ ব্যবসায়িগণ বুঝিতে পারিল যে, কাঁচা পাট ভারত হইতে বহু দূরে ডান্ডিতে না লইয়া গিয়া ভারতেই পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি করিলে অধিক লাভ হইবে। কারণ, পাটজাত দ্রব্যের ওজন কাঁচা পাট অপেক্ষা কম। সেইজন্য ১৮৫৫ সালে জর্জ অকল্যান্ড নামে একজন ইংরেজ, বিশ্বম্ভর সেন নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সহায়তায় রিষড়াতে প্রথম পাটকলটি স্থাপন করে। ইহার পরে বরাহনগরে বিদ্যুৎচালিত পাটকল স্থাপিত হয়। এই ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক প্রতিপন্ন হওয়ায় ব্রিটিশ বণিকগণ তারপর একে একে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে হুগলী নদীর উভয় তীরে বহু পাটকল স্থাপন করে।

কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ—পাট এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। পাট উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সুতরাং এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব ভারতে নাই। প্রয়োজনে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট অল্প পরিমাণে বাংলাদেশ হইতে আমদানি করা হয়। মেস্তার তন্তুও এই শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে মেস্তার চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়লা এই শিল্পের প্রধান শক্তিসম্পদ।

অবস্থান ও অবস্থানের কারণ—বর্তমানে ভারতে ৬৮টি পাটকল চালু আছে। তন্মধ্যে ৫৬টি পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ইহা ছাড়া অন্ধ্র প্রদেশে ৪টি, বিহারে ৩টি, উত্তর প্রদেশে ৩টি, মধ্য প্রদেশে ১টি এবং আসামে ১টি পাটকল অবস্থিত। এই শিল্পে ২ লক্ষ ৭১ হাজার লোক নিযুক্ত আছে।

কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলেই পাটশিল্পের একদেশীভবন (localisation) হইয়াছে। বিভিন্ন কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছে। যথা—(ক) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) হইতে কাঁচা পাট আনিয়া কলিকাতায় পাটশিল্প আরম্ভ হয়। তখন হইতেই পূর্ববঙ্গ এবং আসামের কাঁচা পাট সহজেই অল্প খরচে জলপথে কলিকাতায় আনা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী উৎপাদক অঞ্চলের কাঁচা পাটও সহজে রেলপথ ও জলপথে কলিকাতায় আনিবার সুবন্দোবস্ত আছে। (খ) অধিকাংশ পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নিকটবর্তী কলিকাতা বন্দর মারফত পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি এবং যন্ত্রপাতি আমদানি সহজসাধ্য। (গ) এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা সহজেই রেলপথ ও জলপথে রানীগঞ্জ ও ঝরিয়া হইতে আনা যায়। (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ ও ইহার নিকটবর্তী বিহার ও ওড়িশায় প্রচুর সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। তাহারা পাটকলের কাজে অভ্যস্ত ও সুনিপুণ। (চ) পাটশিল্পের প্রথমাবস্থায় কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলিয়া বহু

ইংরেজ বণিক এখানে বাস করিত এবং তাহারা কলিকাতার নিকট নানাবিধ শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যাংক হইতে তাহাদের ঋণ লইবার কোনো অসুবিধা হইত না, এবং এখনও ব্যাংক হইতে ঋণ পাইতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই সকল কারণে হুগলী নদীর উভয় তীরে উত্তরে বাঁশবেড়িয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় (প্রধানতঃ নৈহাটি, কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর, টিটাগড়, আগড়পাড়া, বজবজ, বাউড়িয়া, শিবপুর, শালকিয়া, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বালি, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে) বহু পাটকল আছে।

অন্ধ্র প্রদেশের ৪টি পাটকলের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটি বিশাখাপতনম্ জেলার চিতাভালসা নামক স্থানে এবং অপরটি ঐ জেলার নেলিমারলায় অবস্থিত। উত্তর প্রদেশের কানপুরে দুইটি এবং সাজানওয়া নামক স্থানে একটি পাটকল আছে (১৮৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।
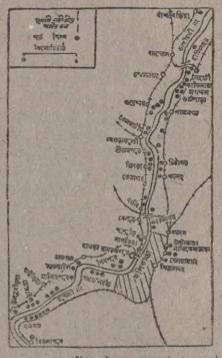
উৎপাদন—বর্তমানে বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মাধ্যমে পাটশিল্পের উন্নতির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় বলিয়া ইহার উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির উপর দেশের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল।

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ১৯৭৩-৭৪ সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল ১০.৭৪ লক্ষ মেঃ টন। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ১৯৭৮-৭৯ সালে ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৮২ সালে ১৩.৩৪ লক্ষ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে।

বাণিজ্য—পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৮১-৮২ সালে এই দেশ হইতে পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া

২৫০·১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইয়াছে। এই দেশে উৎপন্ন অধিকাংশ (৭০%) পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই জন্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর পাটশিল্প বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বর্তমানে বাংলাদেশ হইতে পাট আমদানি করিয়া বিভিন্ন দেশে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স ও ব্রাজিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন এই সকল দেশে ভারতের পক্ষে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা কঠিন। ইহা ছাড়া বাংলাদেশের সুলভ পাটজাত সামগ্রীর সঙ্গে ভারত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ কম বলিয়া এখনও ভারতের রপ্তানি বহুলাংশে কমিয়া যায় নাই। পাটের পরিবর্ত-সামগ্রীও ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। উৎকৃষ্ট মানের কাঁচা পাটের অভাব পাটশিল্পে প্রধান সমস্যা। এখনও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা পাট আমদানি করিতে পারিলে, পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বিশেষরূপে বাড়ানো যায়। ভারতের পাট এবং পাটজাত দ্রব্য বিদেশে বিকল্প কৃত্রিম দ্রব্যের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। রপ্তানি শুল্ক বেশী হওয়ায় ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের মূল্যও বেশী। বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্যের জন্য কেন্দ্রীয় শুল্কের হার বর্তমানে টন-প্রতি ২০০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা। পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পাইবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া উচিত। এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইলে পাট শিল্পকে পুনর্গঠিত করিয়া ইহার উৎপাদন খরচ কমাইতে হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাটজাত সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আমদানিকারক ; মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ পাটজাত দ্রব্য এই দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার পরে ব্রিটেনের স্থান। ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ পাটজাত দ্রব্য ব্রিটেনে রপ্তানি হয়। আর্জেন্টিনা আমদানি করে মোট রপ্তানির শতকরা ১০ ভাগ। ইহা ছাড়া মিশর এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশ, সোভিয়েত রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে প্রচুর পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে।

শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা—স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতের পাটশিল্পের বিশেষ কোনো সমস্যা ছিল না। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ-বিভাগের পর এই শিল্প নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। যথা—(১) বঙ্গ-বিভাগের সময় শতকরা ৭৩ ভাগ পাট পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন হইত ; অথচ পাটকলগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ইহা ছাড়া উৎকৃষ্ট মানের পাট শুধু পূর্ববঙ্গেই পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতের পাটশিল্প বাংলাদেশের (প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তানের) পাট সরবরাহের উপর নির্ভরশীল হইল। পাকিস্তান সরকারের নূতন করপ্রথা, স্টার্লিং মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস প্রভৃতি কারণে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি ব্যাহত হয়। সেইজন্য কাঁচা পাটের অভাবে ১৯৪৯ সালে এখানকার পাটকলগুলি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। (২) বাংলাদেশে এখন আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্টশ্রেণীর পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশে উৎকৃষ্ট পাট দ্বারা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম খরচে পাটজাত দ্রব্য তৈয়ারি হইতেছে।

সুতরাং বৈদেশিক বাজারে ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। (৩) স্থানীয় পাটের দাম বেশী বলিয়া উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যায়। (৪) এখানকার বহু যন্ত্রপাতি এখনও পুরাতন ধরনের। (৫) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বর্তমানে পাটজাত দ্রব্যের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা নিরাপদ মনে করে না। সেই জন্য চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ায় পাট-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীনেও পাটশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাংলাদেশের পাটের সাহায্যে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, মিশর, ব্রাজিল, ফিলিপাইনস্, ব্রহ্মদেশ, ইরান ও থাইল্যান্ডে নূতন নূতন পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। আবার বিভিন্ন দেশ পাটের পরিবর্ত-সামগ্রী ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সোভিয়েত রাশিয়া ও আর্জেন্টিনার 'তিসির বাকল', কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কাপড় ও কাগজের থলে, জাভার 'রোজেলা', মাঞ্চুরিয়ার 'কেনাফ', ফিলিপাইনসের 'ম্যানিলা হেম্প', ইন্দোচীনের 'পলম্পন' নির্মিত থলে বর্তমানে পাটের থলের প্রতিযোগী সামগ্রী। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া কোনোরকম থলে ব্যবহার না করিয়াই জাহাজে করিয়া গম রপ্তানি করিতেছে।

ভারতে পাটশিল্পের এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। প্রথমতঃ, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতেছে। পাট ও মেস্তার উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৬ লক্ষ গাঁট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৮০-৮১ সালে ৮১ লক্ষ ৯৬ হাজার গাঁটে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং উৎকৃষ্ট পাট ভিন্ন অন্যান্য পাটের জন্য ভারতকে আর বাংলাদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, পাটশিল্পের পুরাতন যন্ত্রপাতি পাল্টাইয়া নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপনের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। বর্তমানে অধিকাংশ পাটকলে ইহা করা হইয়াছে; ইহার ফলে পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্যের সমতা রক্ষা করা যাইবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতায় বিশেষ কোনো অসুবিধা হইবে না। দেশের মধ্যে এই সকল যন্ত্রপাতি উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, বিশেষ প্রচারকার্য দ্বারা পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে পাটের যে সকল প্রতিযোগী সামগ্রী বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার মূল্য পাটজাত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এমনকি বস্তাবন্দী না করিয়া জাহাজে গম পাঠাইবার খরচও পাটের থলের খরচের চেয়ে অনেক বেশী; কারণ, থলে ব্যবহার না করিবার জন্য যে পরিমাণ গম জাহাজের তলায় পচিয়া যায়, তাহার মূল্য থলের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহা ছাড়া পাটের থলে অনেকবার ব্যবহার করা যায়। অবশ্য এই সকল প্রতিযোগী সামগ্রীর জন্য পাটের চাহিদা কিছুটা কমিবেই। সেইজন্য এখন ভারতে বিভিন্ন গবেষণাকার্য দ্বারা পাটের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইতেছে। সুন্দর কার্পেট এবং কাপড় জামা পাট হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপ চলিতে থাকিলে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কাগজশিল্প (Paper Industry)

উৎপত্তি ও বিকাশ—প্রাচীনকাল হইতে ভারতে হাতে কাগজ প্রস্তুত হইত। ১৭১৬ সালে ডাঃ উইলিয়ম কেরী নামক জনৈক ইংরেজ তাঞ্জোরের অন্তর্গত ট্রাংকুবর নামক স্থানে সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন করেন। এই কলটি বেশীদিন চলে নাই। ইহার পর ১৮৭০ সালে হাওড়া জেলার বালী নামক স্থানে 'রয়েল পেপার মিল' নামে একটি আধুনিক ধরনের কাগজের কল স্থাপিত হয়। এই কলে প্রথমে বাদামী রঙের ডিমাই কাগজ প্রস্তুত হইত। সেইজন্য এখনও কোনো মিলের বাদামী রঙের ডিমাই কাগজ বাজারে 'বালীর কাগজ' বলিয়া পরিচিত। কাগজশিল্পের উপযোগী উপাদান ভারতে বিদ্যমান থাকায় ইহার পর হইতে এই দেশ ক্রমশঃ এই শিল্পে উন্নতিলাভ করিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

কাগজের শ্রেণীবিভাগ—ভারতে বিভিন্ন রকমের কাগজ প্রস্তুত হয়—লিখিবার ও ছাপিবার সাদা কাগজ (White Printing), শক্ত মলাটের কাগজ (Paper-Board), প্যাকিং করিবার কাগজ (Kraft paper), দলিলের কাগজ (Bond paper), সিগারেটের কাগজ (Cigarette paper), টিস্যু কাগজ (Tissue paper), সংবাদ-পত্রের কাগজ (Newsprint) ইত্যাদি। বিভিন্ন রকম কাগজ-প্রস্তুতের জন্য নানারকমের কাগজের কল আছে। যথা, সাধারণ কাগজের কল, কার্ডবোর্ড ও স্ট্রবোর্ডের কল, সংবাদপত্রের কাগজের কল ইত্যাদি।

কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ—উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারি করার জন্য সরলবর্গীয় বৃক্ষ, সাবাই ঘাস ও বাঁশের মণ্ড প্রয়োজন। আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রে বাঁশ জন্মে। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশে সাবাই ঘাস জন্মে। পশ্চিম হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নরম কাঠ পাওয়া যায়। এই সকল কাঁচামালের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে বলিয়া উৎকৃষ্ট কাগজ তৈয়ারির জন্য এখনও বিদেশ হইতে কাষ্ঠমণ্ড আমদানি করিতে হয়।

অব্যবহৃত তুলা, পাট ও শণ, ছেঁড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঐগুলি ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কার্ডবোর্ড তৈয়ারির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইক্ষুর ছিবড়া। ভারতে ইহার অভাব নাই ; কারণ, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ ইক্ষু ভারতে উৎপন্ন হয়।

কাগজ শিল্পে কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ব্লিচিং পাউডার, সল্টকেক, প্লাস্টার অফ প্যারিস, রং প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যও প্রয়োজন হয়। ভারতে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া এই সকল কাঁচামালের অনেকটা এখন দেশেই পাওয়া যায়। কিছু কিছু বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। কয়লা এই শিল্পের শক্তিসম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কয়লার উৎপাদন প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব ভারতে কেন্দ্রীভূত বলিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কলগুলির অসুবিধা হয়।

অবস্থান ও অবস্থানের কারণ—ভারতে ১২১টি কাগজের কল আছে। কাগজকল-

গুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১১টি, মহারাষ্ট্রে ১৪টি, উত্তর প্রদেশে ৩টি, অন্ধ্র প্রদেশে ২টি, ওড়িশায় ৩টি, হরিয়ানায় ৪টি, তামিলনাড়ুতে ৩টি, বিহারে ২টি, কর্ণাটকে ৫টি, কেরালায় ২টি, গুজরাটে ৭টি ও মধ্য প্রদেশে ৪টি কাগজের কল আছে। বাকীগুলি অন্যান্য রাজ্যে অবস্থিত। ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, আসাম ও মধ্য প্রদেশে আরও একটি করিয়া কাগজের কল স্থাপিত হইতেছে।

বহুদিন পর্যন্ত হুগলী নদীর তীরেই এই শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল। অবশ্য বর্তমানে এই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ হইয়াছে। কিন্তু উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে এখনও মহারাষ্ট্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ কাগজের কল অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, রানীগঞ্জ, হালিশহর, নৈহাটি ও ত্রিবেণীতে কাগজের কলগুলি অবস্থিত। বর্তমানে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বাঁশ, মধ্য প্রদেশের সাবাই ঘাস ও অন্যান্য জিনিস হইতে এখানে কাগজ প্রস্তুত হয়। রানীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা, কলিকাতা বন্দরের মারফত আমদানীকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি, স্থানীয় নিপুণ শ্রমিক ও শিক্ষার প্রসারের জন্য কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি এই রাজ্যের কাগজশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের অধিকাংশ কাগজ এইখানে উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীতে টিস্যু কাগজ উৎপাদনের একটি কারখানা আছে। মহারাষ্ট্রের কাগজের কলসমূহ বোম্বাই ও পুনেতে অবস্থিত। আমদানীকৃত কাঠমণ্ড, ছেঁড়া কাপড় ও সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে এখানে কাগজশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্মৌ ও সাহারানপুরে কাগজের কলগুলি অবস্থিত। এই রাজ্যের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ঘাস এই শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিহারের ডালমিয়ানগরের মিলটিতে সাবাই ঘাস দ্বারা প্রচুর কাগজ উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবের জগাধ্রীতে নেপাল অঞ্চলের ঘাস হইতে স্থানীয় জলবিদ্যুতের সাহায্যে কাগজ উৎপন্ন হয়। গুজরাটের আমেদাবাদে ছেঁড়া কাপড় হইতে অধিকাংশ কাগজ প্রস্তুত হয়। কর্ণাটকের ভদ্রাবতীতে, কেরালার পুনালুরে, অন্ধ্র প্রদেশের রাজমহেন্দ্রী ও সিরপুরে, ওড়িশার ব্রজরাজনগরে, মধ্য প্রদেশের বালারপুরে এবং তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ শহরে কাগজের কল আছে।

মধ্য প্রদেশের নেপানগরে ১৯৪৭ সালে সংবাদপত্রের কাগজ (Newsprint) উৎপাদনের একটি কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয়। প্রথমে বেসরকারী মালিকানায় আরম্ভ হইলেও ১৯৪৮ সালে ইহা সরকারী আওতায় আসে। নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের ইহাই ভারতের

একমাত্র কারখানা ছিল। এখানকার কাগজ এখনও বিদেশী নিউজপ্রিন্টের সমকক্ষ হইতে পারে নাই এবং এখানকার উৎপাদন-খরচও অপেক্ষাকৃত বেশী। এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন-ক্ষমতা বর্তমানে ৮৭,৫০০ মেঃ টন। ভেল্লুর নিকটস্থ স্প্রুস গাছের কাষ্ঠমণ্ড হইতে এখানে নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়। ১৯৮২ সালে এই মিলে ৫২,০২১ মেঃ টন নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় কেরালার কোট্টায়াম জেলার ভেল্লুরে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় 'কেরালা নিউজপ্রিন্ট মিল' নামে একটি নিউজপ্রিন্টের কারখানা স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। এই কারখানায় নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন-ক্ষমতা ৮০,০০০ মেঃ টন।

হোসঙ্গাবাদে ভারত সরকার উচ্চশ্রেণীর নোটের কাগজ প্রস্তুতের জন্য 'সিকিউরিটি পেপার মিল' নামে একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উৎপাদন—বর্তমানে মিলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ১৫৩৮ লক্ষ মেঃ টন। ১৯৮২ সালে ১২ লক্ষ ৩৭ হাজার মেঃ টন কাগজ ও বোর্ড উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ১০'২ লক্ষ মেঃ টন; নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ১'৫ লক্ষ মেঃ টন। এই বৎসরও এই লক্ষ্য পৌঁছান সম্ভব হয় নাই।

বাণিজ্য—ভারতে কাগজশিল্পের প্রভূত উন্নতি হইলেও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এখনও কম। স্বাধীনতার পর হইতে এই দেশে একদিকে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তার ও শিল্পোন্নতির জন্য কাগজের চাহিদাও অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে।

এই দেশে বর্তমানে কাগজের মোট বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ১৫ লক্ষ মেঃ টন। অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও ভারতে জনপ্রতি কাগজের চাহিদা অনেক কম।

ভারতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় এখনও কিছু পরিমাণে উন্নতমানের কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কানাডা, নরওয়ে, সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যান্ড, সুইডেন, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ইহা আমদানি হইয়া থাকে। ১৯৮২ সালে ২২'৯ কোটি টাকা মূল্যের কাষ্ঠমণ্ড ও ২৪০৩ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের কাগজ আমদানি করিতে হইয়াছে।

বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের পক্ষে কিছু কাগজ রপ্তানি করা সম্ভবপর হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহে ও মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের কাগজ রপ্তানি করা হইতেছে। কারণ, ওই সকল দেশে কাগজশিল্প বিশেষ গড়িয়া ওঠে নাই।

শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা—বর্তমানে ভারতের কাগজশিল্প নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই দেশে কাগজের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। কাগজশিল্পের সমস্যাসমূহের মধ্যে কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের সমস্যাই প্রধান। এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন বাঁশ, সাবাই ঘাস, সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি কাঁচামাল। ইহা ছাড়া ভারতে শণ, পাট, তুলা, পুরাতন কাগজ, ইক্ষুর

ছোবড়া, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি দ্বারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত হয়। সরলবর্গীয় স্প্রুস, পাইন ও ফার প্রভৃতি গাছ হিমালয় অঞ্চলে জন্মিলেও যানবাহনের অভাবে ইহার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, ফলে কানাডা, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হইতে কাষ্ঠমণ্ড আমদানি করিতে হয়। ভারতে বাঁশ ও সাবাই ঘাসের সাহায্যে অধিকাংশ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুইটি প্রধান কাঁচামাল সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে এই দেশে কাগজের উৎপাদন ব্যাহত হয়। বাঁশের সাহায্যে ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ কাগজ উৎপন্ন হইলেও বাঁশবনের সংরক্ষণ ও বাঁশ উৎপাদনের জন্য এযাবৎ কোনো সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতি অবলম্বন করা হয় নাই। উত্তর ভারতে—বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশে ও পাঞ্জাবে প্রচুর সাবাই ঘাস উৎপন্ন হয়। ইহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। বাঁশ উৎপাদনের সুবিধা এই যে, প্রতি ৪ বৎসর অন্তর ইহা কাটিয়া কাগজ শিল্পে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মাইতে সময় লাগে অন্ততঃ ৬০ বৎসর। এই দেশে বাঁশ ও সাবাই ঘাস উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে এই শিল্পের আরও উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর।

রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব কাগজশিল্পের অন্যতম সমস্যা। কস্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, সোডা অ্যাশ, ক্লোরিন, গন্ধক, সোডিয়াম সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন। এই সকল দ্রব্যের সবগুলির উৎপাদনে ভারত এখনও স্বাবলম্বী না হওয়ায় উহাদের কোনো কোনোটি বিদেশ হইতে উচ্চমূল্যে আমদানি করিয়া কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে কাগজের উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যায়। রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহের অনিশ্চয়তার দরুন কাগজশিল্প অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শক্তিসম্পদের কেন্দ্রীভবন কাগজশিল্পের অন্যতম সমস্যা। ভারতের অধিকাংশ কয়লাখনি দেশের পূর্বাংশে অবস্থিত হওয়ায় কয়লাখনি অঞ্চল হইতে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কয়লা আনিবার জন্য অনেক বেশী রেলভাড়া দিতে হয়; ইহাতেও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়।

কাগজের চাহিদা ভারতে যে ভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উল্লিখিত সমস্যাগুলি এই শিল্পের বিকাশকে ব্যাহত করিতে পারিবে না। এই জন্য পরিকল্পনা কমিশন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। যথা,

(ক) কাগজশিল্পের জন্য কয়েকটি বন নির্দিষ্ট থাকিবে; (খ) বাঁশ ও সাবাই ঘাসের একটি সর্বভারতীয় মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে; (গ) বনভূমি অঞ্চলে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এই সকল পন্থা অবলম্বিত হইলে আশা করা যায়, কাগজশিল্পে কাঁচামালের অভাব দূর হইবে।

সুখের কথা, দেরাদুনে ভারতের 'বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (Forest Research Institute) কাগজ প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন রকমের কাঁচামালের সন্ধানে গবেষণা চালাইতেছে। ইক্ষুর ছোবড়া (Bagasse) হইতে কাগজ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে; চিনি ও গুড় উৎপাদনের জন্য অন্য প্রকার জ্বালানির বন্দোবস্ত করিয়া ইক্ষুর ছোবড়া যাহাতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ ভারতে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জলবিদ্যুৎ,

তাপবিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং আশা করা যায়, কাগজশিল্প দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

চিনি শিল্প (Sugar Industry)

উৎপত্তি ও বিকাশ—প্রাচীন কাল হইতেই এই দেশে দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইত। ২,৫০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধযুগে রচিত 'প্রাতিমোক্ষ' নামক গ্রন্থে চিনির উল্লেখ আছে। প্রাচীন যুগেও এই দেশ হইতে চিনি রপ্তানির এবং চীন ও মিশর হইতে চিনি আমদানির নিদর্শন পাওয়া যায়। মনে হয় চীন হইতে 'চিনি' এবং মিশর হইতে 'মিশরি' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

১৮০৩ সালে বিহারে সর্বপ্রথম আধুনিক ধরনের চিনির কল স্থাপিত হয়। কিন্তু জাভার চিনি এই দেশে আমদানি হওয়ায় ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ঐ সময় সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করিয়া আমদানি কমাইবার ফলে এই দেশে দ্রুত চিনিশিল্পের উন্নতি হয়। ১৯৫১-৫২ সালে মাত্র ১৩৮টি চিনির কল ছিল, কিন্তু ইহা বাড়িয়া ১৯৮২ সালে ৩১৫টি হইয়াছে। বর্তমানে এই শিল্পে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক কাজ করে।

ভারতের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে চিনিশিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কার্পাসবয়নশিল্পের পরেই ইহার স্থান। ইক্ষু উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। স্বভাবতঃই এখানে চিনি শিল্প উন্নতিলাভ করিবে। এই দেশে ইক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে গুড় প্রস্তুত হয় বলিয়া ইক্ষুর অনুপাতে চিনির উৎপাদন অনেক কম। সেইজন্য ইক্ষুচিনিশিল্পে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বর্তমানকালে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিনির কলে ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ভারতে সাধারণতঃ তিন প্রকার উপায়ে চিনি প্রস্তুত করা হয়:—(ক) আধুনিক কলে ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, (খ) প্রথমে গুড় প্রস্তুত করিয়া পরে পরিস্রাবণ করিয়া চিনি পাওয়া যায় এবং (গ) দেশীয় খান্দসারী প্রথায় চিনি প্রস্তুত হয়। অবশ্য প্রথমোক্ত প্রথায় বেশীর ভাগ চিনি প্রস্তুত হয়। গুড় পরিস্রাবণ প্রথায় (Gur refining) এবং খান্দসারী প্রথায় চিনি প্রস্তুত করিলে প্রচুর চিনি নষ্ট হইয়া যায়।

কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ—ভারতের চিনিশিল্পে ইক্ষু কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইক্ষু উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই শিল্পে চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কয়লা এই শিল্পে প্রধান শক্তিসম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া জলবিদ্যুৎও কোনো কারখানায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবস্থান ও অবস্থানের কারণ—ভারতের ৩১৫টি চিনির কলের মধ্যে উত্তর প্রদেশে ৯১টি, বিহারে ২৯টি, মহারাষ্ট্রে ২৭টি, অন্ধ্র প্রদেশে ৯টি, পাঞ্জাবে ৯টি, তামিলনাড়ুতে ৫টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩টি অবস্থিত। বাকীগুলি অন্যান্য রাজ্যে অবস্থিত।

উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া, মীরাট, সাহারানপুর, মজঃফরনগর, কানপুর ও গোরখপুর জেলায় অধিকাংশ চিনির কল অবস্থিত। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের চিনির কলে ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা ব্যবহৃত হয়। ভারতের মোট চিনির শতকরা ৪৬ ভাগ উত্তর প্রদেশে পাওয়া যায়।

উত্তর প্রদেশ চিনিশিল্পে উন্নত হইবার কারণ : (ক) উচ্চগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল সেচব্যবস্থায় উন্নত। উর্বর প্রাচীন পলি মৃত্তিকা, উন্নত সেচব্যবস্থা ও অনুকূল জলবায়ু বিদ্যমান থাকায় এখানে ভারতের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হয়। (খ) এই অঞ্চল শুষ্ক বলিয়া ইক্ষুরসে চিনির পরিমাণ বেশী থাকে। (গ) অর্থকরী ফসল হিসাবে এতদঞ্চলের কৃষকগণ ইক্ষু উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ, অন্য কোনো অর্থকরী ফসল উৎপাদন এখানে তেমন লাভজনক হয় না। (ঘ) এখানে চিনির কলে কাজ করার মত প্রচুর সংখ্যক সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। (ঙ) অন্য কোনো শিল্পগঠনের তেমন অনুকূল পরিবেশ না থাকাতে এতদঞ্চলের পুঁজিপতিগণ চিনিশিল্পকেই অর্থবিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

বিহারের মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, চম্পারণ ও সারণ জেলায় এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যে চিনিশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখানকার ইক্ষুতে চিনির পরিমাণ বেশী থাকায় এবং ইক্ষুর হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় এই রাজ্য চিনিশিল্পে আরও উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। আমেদনগর এই রাজ্যের চিনিশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। পাঞ্জাব ইক্ষু উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেও ইক্ষুতে চিনির অংশ কম থাকায় এই শিল্প এখানে খুব ভালোভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এখানে জলসেচের সাহায্যে ইক্ষুর চাষ হওয়ায় ইক্ষুর হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অনেক বেশী। এই রাজ্যে চিনির চাহিদাও অত্যন্ত বেশী। **অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে** ইক্ষু চাষের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা থাকায় চিনিশিল্পের প্রসার হইয়াছে। এখানে চিনির চাহিদা খুব বেশী। অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ চিনিশিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গে চিনিশিল্পের উন্নতি হওয়া সম্ভব। বর্তমানে এখানে ৩টি চিনির কল

আছে। বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কলগুলি অবস্থিত। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ইহাদের উৎপাদন অনেক কম। এই রাজ্যে বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ মেঃ টন চিনির প্রয়োজন। এখানে ইক্ষুর হেক্টর প্রতি উৎপাদন উত্তর প্রদেশ বা বিহার অপেক্ষা অনেক বেশী। এখানকার জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষু উৎপাদনের সহায়ক। ইহা ছাড়া এখানে রানীগঞ্জের কয়লা অল্প মাসুলে আনা যায়। কলিকাতা বন্দর মারফত চিনি রপ্তানি করা সহজসাধ্য। এই রাজ্যে নিপুণ শ্রমিকের কোনো অভাব নাই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের চিনিশিল্প শীঘ্রই আরও উন্নতিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। অবশ্য এখানকার ধান ও পাট-উৎপাদন অধিক লাভজনক বলিয়া অধিকাংশ চাষীই ইক্ষু উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেয় না।

উৎপাদন—স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের চিনিশিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে চিনির কলের সংখ্যা ছিল ১৩৮টি; ঐগুলিতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১ ৩৪ লক্ষ মেঃ টন। ১৯৮২ সালে চিনির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৫টি হইয়াছে এবং চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪ লক্ষ ৩৪ হাজার মেঃ টন। কলের চিনি ছাড়াও ভারতের পল্লী অঞ্চলে খান্দসারী চিনি ও গুড় উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য—বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটাইয়া ভারত প্রতি বৎসর বিদেশে চিনি রপ্তানি করে। ১৯৫০-৫১ সালে গুড় ও চিনি রপ্তানি করিয়া ভারত মাত্র ১৭ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছিল। চিনি রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৫-৭৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা; কিন্তু উৎপাদনের সাময়িক হ্রাসের জন্য ১৯৮১-৮২ সালে মাত্র ৪০.৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইয়াছে। তথাপি এই হিসাব হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভারতের পক্ষে গুড়-চিনি রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা—ইক্ষু উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান লাভ করিলেও নানা কারণে চিনি উৎপাদনে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। নিম্নে এই শিল্পের সমস্যাগুলি আলোচনা করা হইল :

(১) ভারতে হেক্টর প্রতি ইক্ষু-উৎপাদন অন্যান্য বহু দেশ অপেক্ষা কম হওয়ায় ইক্ষুর উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। দূরবর্তী উৎপাদনক্ষেত্র হইতে চিনির কলে ইক্ষু আনিতে যে সময়ের অপচয় হয়, উহাতে ইক্ষুর রস অনেকটা শুকাইয়া যায়। তাহা ছাড়া ভারতীয় ইক্ষুর রসে চিনির অংশ তুলনামূলকভাবে কম।

(২) ভারতে ৪।৫ মাসের মধ্যেই পরিপক্ক ইক্ষু কাটার কাজ শেষ হইয়া যায়। চিনির কলগুলি ৫।৬ মাস চালু থাকে এবং ৬ মাস বন্ধ থাকে।

(৩) বহুসংখ্যক চিনির কলে এখনও পুরাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে।

(৪) ইক্ষুর ছিবড়া হইতে কার্ডবোর্ড ও ঝোলা গুড় হইতে সুরাসার প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করার সুবন্দোবস্ত নাই।

(৫) ইক্ষু হইতে রস নিষ্কাশন ও চিনি পরিশোধন পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ।

এই সকল কারণে ভারতের চিনিশিল্প বহুদিন সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয়ে থাকিয়াও আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইয়া ইক্ষুর মূল্য না কমাইলে, এই শিল্পের উপজাত দ্রব্যাদির (সুরাসার, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি) উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত না করিলে এবং চিনির কলের যন্ত্রপাতি না পাল্টাইলে চিনির মূল্য কমিবে না এবং শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইবে। সরকারী চেষ্টা সত্ত্বেও চিনিশিল্পের মালিকগণ এই বিষয়ে সচেষ্ট হন নাই। সাধারণ লোকে চিনির মূল্য বৃদ্ধির জন্য এই শিল্পের মালিকদের সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখে। সুতরাং জাতীয়করণ না করিলে এই শিল্পের উন্নতিসাধন করা খুবই কঠিন। কৃষকদের স্বার্থেও এই শিল্পের জাতীয়করণ প্রয়োজন।

উল্লিখিত সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিলে ভারতে চিনিশিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্পে পরিগণিত হইতে পারিবে এবং বিদেশে চিনি বিক্রয় করিয়া ভারত আরও বেশী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে পারিবে।

রাসায়নিক শিল্প (The Chemical Industry)

কোনো দেশ রাসায়নিক শিল্পে উন্নতিলাভ না করিলে অন্যান্য শিল্পে বা কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে না ; কারণ, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কৃষির উন্নতির জন্যও রাসায়নিক সার প্রয়োজন। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং এই দেশে রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারত এখনও রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই শিল্পের বিকাশ শুরু হইলেও প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত। বর্তমানে এই দেশে প্রায় ২৫০টি রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। রাসায়নিক শিল্পে মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। এই শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল বিভিন্ন রাজ্যে পাওয়া গেলেও কয়লা উৎপাদন ভারতের পূর্বাংশে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, এই শিল্প স্থাপনে শক্তিসম্পদের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে জলবিদ্যুতের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যসমূহকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—গুরু রাসায়নিক দ্রব্য এবং লঘু রাসায়নিক দ্রব্য।

গুরু রাসায়নিক দ্রব্য (Heavy Chemicals)

গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি সাধারণতঃ একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপাদন-খরচ অত্যন্ত কম। এই সকল দ্রব্যাদি অন্যান্য শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; যেমন সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি। কৃষিকার্যে যে সকল রাসায়নিক সার (অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফস্‌ফেট প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয় তাহাও গুরু রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন লবণ, চুনাপাথর, জিপ্‌সাম,

বক্সাইট, জিরকন্, ইলমেনাইট, মোনাজাইট, কেওলিন প্রভৃতি। এই সকল কাঁচামাল ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও ব্রিটিশ রাজত্বে এই শিল্পের উন্নতিসাধনের বিশেষ কোনো চেষ্টা হয় নাই। কারণ, ইংরেজগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উহাদের দেশের রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে রপ্তানি করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেন হইতে এই সকল দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হওয়ায় কোনো কোনো স্থানে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পরিকল্পনায় এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, দিল্লী, তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে গুরু রাসায়নিক শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রিষড়া নামক স্থানে ক্লোরিন, কস্টিক লিকার, ব্লিচিং পাউডার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় কয়লার উপজাত দ্রব্যের সাহায্যে বহু রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কাগজ, কার্পাসবয়ন ও চর্মশিল্পের উন্নতি বহুলাংশে রাসায়নিক শিল্পের উপর নির্ভরশীল বলিয়া সরকার এই শিল্পের উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

এই শিল্পের প্রধান সমস্যা এই যে, এই শিল্পে প্রচুর পরিমাণে মূলধন ও বৈদেশিক যন্ত্রপাতি দরকার। এই শিল্প স্থাপন করিতে এই জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ কারখানাই সরকারী মালিকানায় গঠিত হইতেছে।

গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে **সালফিউরিক অ্যাসিড** (Sulphuric Acid) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জিপসাম্, পাইরাইট ও গন্ধককে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারি হয়। বিভিন্ন শিল্পে ইহার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, ইহার উৎপাদনকে শিল্পোন্নতির মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। বর্তমানে দেশে ইহার ৬৬টি কারখানা আছে। এই সকল কারখানায় বৎসরে প্রায় ২১ লক্ষ মেঃ টন সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই সকল কারখানার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি এবং মহারাষ্ট্রে ১২টি কারখানা অবস্থিত। সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের প্রধান সমস্যা এই যে, ইহা প্রধানতঃ আমদানীকৃত গন্ধকের (Sulphur) উপর নির্ভরশীল।

কস্টিক সোডা অন্যতম গুরু রাসায়নিক দ্রব্য। কয়লা, চুনাপাথর ও সোডা অ্যাশ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া কস্টিক সোডা তৈয়ারি হয়। পশ্চিমবঙ্গের রিষড়া, তামিলনাড়ুর মেত্তুর এবং আমেদাবাদ, মিঠপুর, দিল্লী, ডেহরী-অন্-শোণ প্রভৃতি শহরে কস্টিক সোডা উৎপন্ন হয়। এই সকল কারখানায় বৎসরে প্রায় ৬ লক্ষ মেঃ টন কস্টিক সোডা উৎপন্ন হইতেছে।

সোডা অ্যাশ নামক গুরু রাসায়নিক দ্রব্য সাবান, কাচ, কাগজ ও বয়নশিল্পে এবং অন্যান্য রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কয়লা, চুনাপাথর, লবণ, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম গ্যাস প্রভৃতিকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া সোডা অ্যাশ তৈয়ারি হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে ইহার কারখানা আছে। এই সকল কারখানায় বৎসরে প্রায় ৬ লক্ষ মেঃ টন সোডা অ্যাশ উৎপন্ন হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ায় একটি সোডা অ্যাশের কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

রাসায়নিক সার (Chemical Fertilisers) উৎপাদনে ভারত ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া সার উৎপাদনের উপর পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পূর্বে এদেশে পুরানো প্রথায় জমিতে সার দেওয়া হইত এবং গোবর, মনুষ্য-পুরীষ, জীবজন্তুর হাড় প্রভৃতি সারের কাজে ব্যবহৃত হইত। এই সকল প্রাকৃতিক সারের যোগানের নিশ্চয়তা না থাকায় কৃত্রিম বা রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফরাস রাসায়নিক সারশিল্পের প্রধান কাঁচামাল। নাইট্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়া, পটাশ হইতে পটাসিয়াম সল্ট এবং ফসফরাস হইতে সুপার ফসফেট, অ্যামোনিয়াম ফসফেট ও নাইট্রোফসফেট প্রভৃতি কৃত্রিম সার উৎপন্ন হয়। এই দেশে সর্বপ্রথম সারের কারখানা স্থাপিত হয় কেরালার অন্তর্গত আলয়ে নামক স্থানে (২০৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী নামক স্থান হইতে জিপসাম আনাইয়া এখানে অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। ইহার পর ১৯৫১ সালে বিহারের সিন্দ্রিতে এশিয়ার বৃহত্তম সারের কারখানা স্থাপিত হয়। রাজস্থান হইতে আনীত জিপসামের সাহায্যে এখানে সার প্রস্তুত হয়। বর্তমানে এই কারখানায় বার্ষিক ২৫ লক্ষ মেঃ টন 'অ্যামোনিয়াম সালফেট' সার উৎপন্ন হইতেছে। কর্ণাটকেও একটি সারের কারখানা আছে। পাঞ্জাবের নাঙ্গাল এবং তামিলনাড়ুর নেভেলীতে দুইটি সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে হলদিয়াতে একটি সারের কারখানা নির্মিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশের ইস্পাত শিল্পের উপজাত দ্রব্য হিসাবে প্রচুর অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হইতেছে। কানপুরেও একটি বিশালকায় সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্যকালে রাসায়নিক সার উৎপাদনের উপর ক্রমশঃ অধিক জোর দেওয়ায় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ট্রম্বে, গোরক্ষপুর, নামরূপ, মাদ্রাজ, আলয়ে ও কোচিনে সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সাহায্যে গুজরাটের কালোল ও কাণ্ডালাতে বিশালকায় সারের কারখানা নির্মিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গুজরাট ও কর্ণাটকে আরও দুটি সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি গাজিয়াবাদ, মির্জাপুর, বিশাখাপত্তনম্, কাম্পটি, কোরবা, মথুরা, ম্যাঙ্গালোর, রামগুণ্ডম, শিরনোভা, তালচের, ট্রম্বে, তুতিকোরিণ ও গোয়াতে নূতন সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানাসমূহের সারের সাহায্যে ২২ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতেছে।

১৯৮৩ সালে প্রায় ৩৯ লক্ষ মেঃ টন সার উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতে কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে, সুতরাং সারের চাহিদা প্রচুর বাড়িয়া যাইতেছে। স্থানীয় উৎপাদন হইতে এই চাহিদা সম্পূর্ণ মিটানো যায় না বলিয়া কিছু পরিমাণে রাসায়নিক সার এখনও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

লঘু রাসায়নিক দ্রব্য (Fine Chemicals)

ঔষধপত্র, রঙ, বার্নিশ, ফটোগ্রাফ সংক্রান্ত রাসায়নিক দ্রব্য, আলকাতরা-জাত দ্রব্যাদি প্রভৃতি লঘু রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার পর এই জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন কারখানায় আলকাতরা-জাত বিভিন্ন

দ্রব্যাদি (বেনজিন, ন্যাপথলিন, গ্লিসারিন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যালকোহল প্রভৃতি) উৎপাদিত হইতেছে। ইহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিটামিন, কুইনাইন, গ্লুকোনেট, ক্যাফিন, অ্যান্টিবায়োটিকস্ প্রভৃতি ঔষধ এবং রং, বার্নিশ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। মহারাষ্ট্রের পিম্‌প্রিতে ভারত সরকার একটি স্ট্রেপটোমাইসিন ও পেনিসিলিন প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। কেরালার আলয়ে ও দিল্লীতে ডি ডি টি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দার্জিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে কুইনাইন প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া এই দেশে প্রায় ২৮টি রঞ্জন দ্রব্যের কারখানা আছে। গুজরাটের উপকূলে লবণ-জাত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। বোম্বাই, কলিকাতা ও বরোদায় বহু ঔষধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বিহারের গোমিয়া নামক স্থানে একটি বৃহদাকার বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা হইতে কয়লাখনিতে বিস্ফোরক (Explosive) দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় লঘু রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের পানভেল অঞ্চলে 'Basic Chemicals and Intermediates' নামক সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্ধ্র প্রদেশের সনৎনগরে একটি ঔষধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান ড্রাগস্ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ' ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর প্রদেশের হৃষীকেশে একটি 'অ্যান্টিবায়োটিকস্' কারখানাও তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কেরালায় একটি উদ্ভিজ্জ-রাসায়নিক (Phyto-Chemical) কারখানা তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে বুলসারে সালফা ঔষধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে সম্প্রতি বিদ্যুৎজাত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ক্যালসিয়াম কারবাইড, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফেরাম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রচুর সুলভ বিদ্যুৎ প্রয়োজন বলিয়া জলবিদ্যুতের উৎপাদনের সঙ্গে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পেট্রো-রাসায়নিক শিল্প (Petro-Chemical Industries)

এই শিল্পে পেট্রোলিয়াম হইতে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করিয়া উহা দ্বারা প্লাস্টিক, সার, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম তন্তু, কৃত্রিম পরিশোধক দ্রব্য, রং প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

১৯৬৭ সালে বে-সরকারী মালিকানাধীন 'ইউনিয়ন কারবাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর ট্রম্বেতে একটি কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়া ভারতে পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের অগ্রগতি সূচিত হয়। ১৯৬৮ সালে 'ন্যাশন্যাল অরগানিক কেমিক্যালস্ লিমিটেড' বে-সরকারী মালিকানাধীনে আরও একটি কারখানা স্থাপন করে। সরকারী তৈল-শোধনাগারগুলির নিকটে পেট্রো-রাসায়নিক শিল্প নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার গুজরাটের জওহরনগরে 'ইন্ডিয়ান পেট্রো-কেমিক্যালস্ কর্পোরেশন লিমিটেড' নামক সংস্থা গঠন করে। ১৯৭৪ সালে আসামে 'বোঙ্গাইগাঁও রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রো-কেমিক্যালস্ লিমিটেড' নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান বোঙ্গাইগাঁও তৈল-শোধনাগার ও পেট্রো-রাসায়নিক কারখানার তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন কারখানায় ১ লক্ষ ৩ হাজার মেঃ টন প্লাস্টিক, ৪৫ হাজার মেঃ টন কৃত্রিম তন্তু ও ২৪ হাজার মেঃ টন কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য—ভারত চিরকাল রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে এই নির্ভরশীলতা ছিল চরম; কিন্তু স্বাধীনতার পর এই নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। বর্তমানে একদিকে যেমন রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে শিল্প ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণও অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়া যাইতেছে। বর্তমানে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যে ভারত স্বাবলম্বী; যথা, পটাসিয়াম ব্রোমাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ব্লিচিং পাউডার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্লোরিন প্রভৃতি। অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য এখনও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ১৯৮১-৮২ সালে প্রায় ৩৮৭ কোটি টাকা মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্যের উপাদান এই দেশে আমদানি হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৮১-৮২ সালে ৫৪৮ কোটি টাকা মূল্যের রাসায়নিক সার এবং ৭১ কোটি টাকা মূল্যের ঔষধপত্র, ১৮ কোটি টাকা মূল্যের রং ও চামড়া পাকা করার উপাদান এবং ১০৬ কোটি টাকা মূল্যের প্লাস্টিক তৈয়ারির উপাদান বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইয়াছে। রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে ব্রিটেন মোট আমদানির শতকরা ৬০ ভাগ সরবরাহ করে। আমদানীকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের যৌগিক পদার্থ সোডিয়াম কার্বোনেট, কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ ও গন্ধক দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্তশিল্প (ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প)
(The Engineering Industries)

লৌহ ও ইস্পাতকে প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া যে শিল্পে নানাপ্রকারের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ইস্পাত-দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে পূর্তশিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলে। এই শিল্পকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) ভারী পূর্তশিল্প (Heavy Engineering), (২) হালকা পূর্তশিল্প (Light Engineering)।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এদেশে পূর্তশিল্পের প্রসার মোটেই ঘটে নাই। স্বাধীনতালাভের পরে এই শিল্পে দ্রুত উন্নতি শুরু হয়। এখন অনেক প্রকার যন্ত্রপাতি নির্মাণে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে নানাবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ ও সরবরাহ সংক্রান্ত সর্বপ্রকারের উপকরণ, লৌহ ও ইস্পাত সহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য ও খনির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, ট্রাক্টর ও কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল দ্রব্য ছাড়া সেলাই কল, বৈদ্যুতিক পাখা, বাইসাইকেল, স্ক্রু, বল্টু, বিদ্যুৎ-রোধক যন্ত্র, রেডিও, টাইপরাইটার, টেলিভিশন, ঘড়ি ইত্যাদির কারখানা পূর্তশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে এই সকল দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বিহারের রাঁচীতে 'দি হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন',

এলাহাবাদের নিকট নৈনিতে 'দি ত্রিবেণী স্ট্রাকচারাল্‌স্ লিমিটেড,' কর্ণাটকে 'দি তুঙ্গভদ্রা স্টীল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড', অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপতনমে 'দি ভারত হেভী প্লেটস্ অ্যান্ড ভেসেলস্ লিমিটেড', কলিকাতার সন্নিকটে 'দি জেসপ অ্যান্ড কোং লিমিটেড' প্রভৃতি ভারী
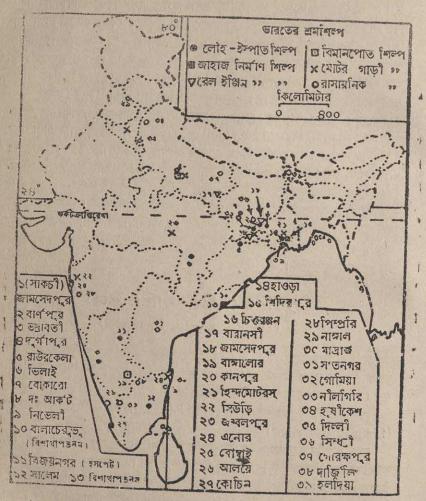
যন্ত্রপাতি ও পূর্তশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী উপাদান নির্মাণের কারখানা পরিচালিত হইতেছে। দুর্গাপুরে অবস্থিত 'দি মাইনিং অ্যান্ড অ্যালায়েড মেশিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড' নামক কারখানায় খনিতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি তৈয়ারি হইতেছে।

সরকার পরিচালিত বাঙ্গালোরে অবস্থিত 'দি হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্ লিমিটেড' (ইহার বাঙ্গালোরে, হরিয়ানার পিঞ্জোরে, কেরালার কালামাস্পেরীতে, হায়দরাবাদে ও শ্রীনগরে ৫টি কারখানা আছে) ও 'দি সেন্ট্রাল মেশিন টুলস ইনস্‌টিটিউট' নানাপ্রকারের ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, ছাপাখানার যন্ত্রপাতি, ঘড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি করিতেছে।

সরকার পরিচালিত 'দি ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেড' উহার চারিটি কারখানায় (ভূপাল, ত্রিরুচিরাপল্লী, হায়দরাবাদ ও হরিদ্বার) বিদ্যুৎশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে রূপনারায়ণপুরে অবস্থিত 'দি হিন্দুস্থান কেবলস্ লিমিটেড'-এর কারখানায় বৈদ্যুতিক তার উৎপন্ন হয়।

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্যও বহু কারখানা ভারতের নানা স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সরকার পরিচালিত উল্লিখিত কারখানাগুলি ছাড়াও বহু বে-সরকারী কারখানায় ঐ সকল জিনিসপত্র উৎপন্ন হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল ও দুর্গাপুর ছোটবড় পূর্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইহার পর মহারাষ্ট্রের স্থান। মহারাষ্ট্রের বোম্বাই, শোলাপুর, পুনে ও নাগপুর, বিহারের রাঁচী ও জামসেদপুর, উত্তর প্রদেশের নৈনি, কানপুর, হরিদ্বার, আলিগড় ও বেনারস, কর্ণাটকের বাঙ্গালোর, অন্ধ্র প্রদেশের হায়দরাবাদ ও বিশাখাপতনম্, পাঞ্জাবের অমৃতসর এবং দিল্লী প্রভৃতি স্থানে পূর্তশিল্পের ছোটবড় বহু কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃহদাকার বিভিন্ন পূর্ত-শিল্পসমূহ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

মোটরগাড়ি-নির্মাণ শিল্প (The Automobile Industry)—স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটেন হইতে ভারতে অধিকাংশ মোটরগাড়ি আমদানি করা হইত বলিয়া এদেশে ইংরেজগণ মোটরগাড়ি-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মোটরগাড়ি আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ১৯৪১ সালে বোম্বাই-এ 'প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড' নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ আমদানী-কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মোটরগাড়ি তৈয়ারি আরম্ভ করে। ইহার পর ১৯৪৪ সালে 'হিন্দুস্থান মোটরস লিঃ' কোন্নগরের নিকট হিন্দ্ মোটরে বৃহত্তম মোটরগাড়ি-নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে। ভারতে মোটরগাড়ির চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাদ্রাজ, জামসেদপুর ও অন্যান্য স্থানে আরও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে এদেশে ১২টি মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা আছে।

ভারতে মোটরগাড়ি-নির্মাণ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। এই শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল (ইস্পাত, কাঠ, রবার প্রভৃতি) বর্তমানে এখানে পাওয়া যায়। এই শিল্পের উপযোগী দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী। সরকার মোটরগাড়ি আমদানি বন্ধ করায় ভারতে মোটরগাড়ির একচেটিয়া ব্যবসায় চলিতেছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার কোনো অসুবিধা বর্তমানে এই শিল্পকে ভোগ করিতে হয় না। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত এই শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার সচেষ্ট আছেন।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে তিনটি কেন্দ্রে এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার নিকটস্থ হিন্দুস্থান মোটরস লিঃ-এর কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ট্রাক ও যাত্রিবাহী গাড়ি প্রস্তুত হইতেছে। এই শিল্পের উপযোগী অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই এই কারখানায় প্রস্তুত হয়। সাহাগঞ্জের ডানলপ কোম্পানীর রবার, দুর্গাপুর ও বার্নপুরের ইস্পাত এই কারখানায় ব্যবহৃত হয়। বাঙালী শ্রমিক এই শিল্পে অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দিতেছে। এই সকল কারণে হিন্দুস্থান মোটরস্ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। বোম্বাই

অঞ্চলে প্রিমিয়ার অটোমোবাইল্সের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায়ও ইঞ্জিন-নির্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে অশোক লিল্যান্ডস্ লিঃ নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজে 'স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড' নামে মোটরগাড়ির একটি কারখানা আছে। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মহীন্দ্র অ্যান্ড মহীন্দ্র কোম্পানী মহারাষ্ট্রে জীপগাড়ি নির্মাণ করিতেছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে স্কুটার নির্মাণ শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। (২১০ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। উত্তর প্রদেশের সান্ডিলাতে সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় 'ইন্সোভ অটো লিমিটেড' নামক ট্রাক ও জীপগাড়ি তৈয়ারির একটি বেসরকারী কারখানা নির্মাণের কাজ চলিতেছে।

জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে ভারতে ৯০০ জন লোকের জন্য একখানা গাড়ি নির্মিত হয় ; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪ জন লোকের জন্য, ব্রিটেনে প্রতি ১৮ জন লোকের জন্য, কানাডায় প্রতি ৮ জন লোকের জন্য একখানি গাড়ি আছে।

সম্প্রতি পেট্রোলিয়ামের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মোটরগাড়ির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় গাড়ির চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পাইতেছে। ফলে এই শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে।

পূর্বে ভারতে ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ হইতে প্রায় ১৪ কোটি টাকার মোটরগাড়ি আমদানি হইত, কিন্তু বর্তমানে সরকার আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় দেশীয় শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১৬·৫ হাজার মোটরগাড়ি (লরি সমেত) নির্মিত হয় ; ১৯৮২ সালে উহার উৎপাদন বাড়িয়া প্রায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজার হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মোটর সাইকেল বা স্কুটার নির্মিত হইত না ; ১৯৮২ সালে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার মোটর সাইকেল ও স্কুটার নির্মিত হইয়াছে।

রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প (The Locomotive Industry)—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতের প্রয়োজনীয় রেল-ইঞ্জিন অধিকাংশই ব্রিটেন হইতে আমদানি করা হইত। সেই সময় এই দেশে প্রায় ৭,০০০ ইঞ্জিনের প্রয়োজন হইত। যুদ্ধের সময় ইঞ্জিন আমদানি বন্ধ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এই দেশে রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণের অনুমতি দেয়। ১৯৪৩ সালে জামসেদপুরে টাটা কোম্পানী সর্বপ্রথম রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে। ১৯৫০ সালে চিত্তরঞ্জনে সরকারের রেল বিভাগ নিজস্ব রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে। এখানে বৈদ্যুতিক ও ডিজেল ইঞ্জিনও প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া বারাণসীতে একটি রেল ইঞ্জিন কারখানা নির্মিত হইয়াছে। এখানে প্রধানতঃ ডিজেল ইঞ্জিন তৈয়ারি করা হইতেছে। (২১০ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

ঝরিয়া ও রানীগঞ্জের কয়লা, বার্নপুর ও জামসেদপুরের ইস্পাত, ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশের কাঠ, স্থানীয় সুলভ শ্রমিক জামসেদপুর ও চিত্তরঞ্জনে এই শিল্প গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। চিত্তরঞ্জনে বর্তমানে বৎসরে প্রায় ৩০০ খানা বৃহদাকার ইঞ্জিন নির্মিত হইতে পারে। জামসেদপুরের উৎপাদন-ক্ষমতা বৎসরে প্রায় ১০০ খানা ইঞ্জিন। চিত্তরঞ্জনে প্রায় ৫,০০০ শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। প্রথমে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইলেও বর্তমানে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অধিকাংশ ভারতে প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া জামসেদপুরে সরকারের সহায়তায় টাটা ইঞ্জিনীয়ারিং লোকোমোটিভ কারখানা বৎসরে প্রায় ৬৮ খানা রেল-ইঞ্জিন উৎপাদন করে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করা যায়, ভারতে এই শিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিবে এবং সকল প্রকার রেল ইঞ্জিন-নির্মাণে ভারত স্বাবলম্বী হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮১-৮২ সালে ভারতে প্রায় ১৮ হাজার রেলওয়ে ওয়াগন নির্মিত হইয়াছে।

জাহাজ-নির্মাণ শিল্প (The Ship-building Industry)—প্রাচীনকালে ভারত জাহাজ নির্মাণ শিল্পে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ভারতীয় জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য হইত। সেই সময় কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ পালের সাহায্যে চলিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও ভারতীয় জাহাজে করিয়া ভারতীয় মালপত্র ব্রিটেনে লইয়া যাইত। কিন্তু ক্রমশঃ ইংরেজগণ বুঝিল যে তাহাদের নিজেদের জাহাজে মালপত্র প্রেরণ না করিলে একদিকে তাহাদের বাণিজ্য ভারতীয়গণের উপর নির্ভরশীল হইবে, অন্যদিকে তাহাদের জাহাজ কোম্পানীগুলি মুনাফা অর্জন করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ায় পাল-চালিত কাষ্ঠের জাহাজ প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিল না। এই সময় ইংরেজগণ কঠোর আইনের সাহায্যে ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া ব্রিটিশ জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্য আরম্ভ করিল। সেই সময় হইতে এখনও ব্রিটিশ জাহাজের উপর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নিজস্ব জাহাজ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভারত বর্তমানে রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এখনও এই দেশ রপ্তানির জন্য ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজের উপর নির্ভরশীল বলিয়া রপ্তানি-বৃদ্ধির চেষ্টা সফল হইতেছে না। কারণ, এই সকল দেশের জাহাজ কোম্পানীসমূহ নিজেদের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যস্ত, ভারতের জন্য নহে। এই সকল কারণে বর্তমানে ভারত সরকার জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

ভারতের আধুনিক জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪১ সালে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার ভারতে জাহাজ-নির্মাণের অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই সুযোগে ঐ বৎসর বোম্বাই-এর বিখ্যাত শিল্পপতি ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ বিশাখাপত্তনমে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উদ্বোধন করেন। তাঁহার জাহাজ কোম্পানীর নাম 'সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড'। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে এই শিল্পের প্রথম জাহাজ 'জল ঊষা' (৮,০০০ টন) জলে ভাসে। ক্রমশঃ বিশাখাপত্তনমে আরও জাহাজ নির্মিত হইতে থাকে। এই শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকার এই শিল্পের অংশীদার হইলেন। ১৯৫২ সালে হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ (Hindusthan Shipyard Ltd.) নামে যে নূতন কোম্পানী বিশাখাপত্তনমের জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের মালিক হইল ভারত সরকার সেই কোম্পানীর দুই-তৃতীয়াংশের এবং সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং এক-তৃতীয়াংশের মালিক হইল। সরকারী সাহায্য ও সমর্থনে ক্রমশঃই এই শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমে আমদানীকৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে জাহাজ নির্মিত হইলেও ক্রমশঃ যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারে বিশাখাপত্তনম্ স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কোচিনে দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপনের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উৎপাদক অঞ্চল—জাহাজের মালিকানায় বর্তমানে ভারত এশিয়া মহাদেশে দ্বিতীয় স্থান ও পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে। ভারতীয় জাহাজ এখন পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি সমুদ্রপথে যাতায়াত করে।

ভারতে বর্তমানে তিনটি জাহাজ-নির্মাণ কারখানা আছে: (ক) বিশাখাপতনমে 'হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড', (২) কলিকাতায় 'গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স' ও (৩) বোম্বাইয়ে 'মাজগাঁও ডক'। চতুর্থ জাহাজ-নির্মাণ কারখানাটি কেরালার কোচিন বন্দরে নির্মিত হইতেছে। সবগুলি জাহাজ-নির্মাণ কারখানাই সরকারের মালিকানাধীন। সম্প্রতি ওড়িশার পারাদিপ ভারতের পঞ্চম জাহাজ-নির্মাণ কারখানার জন্য নির্বাচিত হইয়াছে।

বিশাখাপতনমে ভারতের বৃহত্তম জাহাজ-নির্মাণের কারখানা অবস্থিত। ১৯৪৭ সাল হইতে এখন পর্যন্ত এই কারখানায় ৮০টি জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। বর্তমানে প্রতি বৎসর এই কারখানায় ৩ খানা করিয়া জাহাজ নির্মিত হইতেছে। বিভিন্ন কারণে বিশাখাপতনম্ জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। (১) এখানকার পোতাশ্রয়টি স্বাভাবিক ও সুগভীর এবং ডলফিন নাসিকাকৃতি অন্তরীপ দ্বারা সামুদ্রিক ঝড় হইতে সুরক্ষিত। (২) জাহাজ নির্মাণের স্থানটি বন্দরের সহিত যুক্ত এবং বন্দরের পয়ঃপ্রণালীতে ১৪ হাজার মেঃ টন পরিমিত জাহাজ থাকিবার উপযুক্ত জল আছে। (৩) এখানে জামসেদপুর ও ভিলাই হইতে লৌহ ও ইস্পাত আনিবার বন্দোবস্ত করা সহজ। (৪) জাহাজ-নির্মাণের উপযোগী কাষ্ঠ বিহার, ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশের বনভূমি হইতে সংগ্রহ করা সহজ। (৫) ঝরিয়া ও মধ্য প্রদেশের কয়লা এখানকার শিল্পে ব্যবহার করা যায়। (৬) বিশাখাপতনমের পশ্চাদ্ভূমির সহিত এই বন্দর রেলপথে যুক্ত। (৭) স্থানীয় সুলভ শ্রমিক এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। এই সকল সুবিধা থাকায় এবং ফ্রান্সের A. C L কোম্পানীর কারিগরি সাহায্যে এই শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

কলিকাতার **গার্ডেনরীচ** ওয়ার্কশপে গাধাবোট, মাটি-কাটা-যন্ত্র, বজরা, উপকূলবাহী ছোট জাহাজ প্রভৃতি নির্মিত হয়। বর্তমানে এই কারখানার ১৫,০০০-২৬,০০০ DWT সমুদ্রগামী বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণ করিবার ক্ষমতা আছে।

মাজগাঁও ডকে প্রথমতঃ কেবলমাত্র নৌবহরের জাহাজ নির্মিত হইত। কিন্তু এখন বাণিজ্য-জাহাজ, যাত্রিবাহী জাহাজ, বাণিজ্য ও যাত্রিবাহী জাহাজ এবং ড্রেজার নির্মিত হইতেছে। এই বন্দরের পরিপূরক গোয়া শিপ্‌ইয়ার্ড-এ গাধাবোট ও লঞ্চ নির্মিত হয় এবং জাহাজ মেরামত করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কোচিনে জাহাজ-নির্মাণের স্থান-নির্বাচন অত্যন্ত বিবেচনার সহিত করা হইয়াছে। এই কারখানায় ৮৫,০০০ DWT জাহাজ-নির্মাণের ও ১ লক্ষ DWT জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন কারণে এখানে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কর্ণাটকের বনভূমি হইতে জাহাজের প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানা হইতে এবং প্রয়োজন হইলে ভিলাই কারখানা হইতে সহজেই কোচিনে ইস্পাত আনা যাইতেছে। তৃতীয়তঃ, স্থানীয় নিপুণ ও সুলভ শ্রমিক এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। চতুর্থতঃ, কোচিন বন্দরে জাহাজ

নির্মাণের উপযোগী পোতাশ্রয় ও জলের গভীরতা বিদ্যমান। পঞ্চমতঃ, কোচিন বন্দর পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের নিকটবর্তী বলিয়া যন্ত্রপাতি আমদানি করা সহজসাধ্য হইতেছে। আশা করা যায়, এই সকল কারণে কোচিনে জাহাজ-নির্মাণ শিল্প আরও উন্নতিলাভ করিবে এখানে জাহাজ নির্মাণ শুরু হইয়াছে এবং ১৯৮১ সালে ৭৫,০০০ DWT একখানি জাহাজ নির্মিত হইয়াছে।

বিমানপোত-নির্মাণ শিল্প (The Aircraft Industry)—বর্তমান স্পুটনিকের যুগে বিমানপোত মানুষের সাধারণ যাতায়াত ব্যবস্থার কাজ করে ; কি সামরিক প্রয়োজনে, কি যাত্রী পরিবহণে, কি দ্রুত মালপত্র প্রেরণে বিমানপোত একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই দেশে বিমানপোতের ব্যবহার খুবই কম ছিল ; কিন্তু বর্তমানে ইহার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সামরিক প্রয়োজন ছাড়াও যাত্রী ও মাল-পরিবহণে বহু বিমানপোত প্রয়োজন হয়। ভারতে বর্তমানে ৪০টি বিমানপথ রহিয়াছে ; ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,৪০০ কিলোমিটার।

১৯৩৯ সালে সিন্ধিয়া কোম্পানী এই দেশে বিমানপোত নির্মাণের প্রথম কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারের অনুমতি চাহিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার স্বদেশের বিমানপোত শিল্পের স্বার্থে এই আবেদন অগ্রাহ্য করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেই যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইতে ব্রিটিশ সরকার এই দেশে বিমানপোত-নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিতে বাধ্য হয়।

১৯৪০ সালে বাঙ্গালোরে ভারতের প্রথম বিমানপোত-নির্মাণ শিল্প স্থাপিত হয়। এই কারখানার নাম Hindusthan Aircraft Factory। বিভিন্ন কারণে বাঙ্গালোর এই শিল্পের উপযোগী স্থান। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও সমুদ্রের লবণাক্ত বায়ুর প্রভাবমুক্ত। এইরূপ জলবায়ু বিমানপোতের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শিবসমুদ্রমের জলবিদ্যুৎ, ভদ্রাবতীর ইস্পাত, কর্ণাটকের বনভূমির কাষ্ঠ, কেরালার অ্যালুমিনিয়াম কারখানার অ্যালুমিনিয়াম পাত, স্থানীয় দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। 'ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ' বাঙ্গালোরে অবস্থিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক উপদেশ দ্বারা এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিতে পারে। পূর্বে বিমানপোতের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। বর্তমানে এই কারখানায় বিমানপোত-নির্মাণের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানায় পরিণত হইবে এবং কোনোপ্রকার যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানি করিবার প্রয়োজন হইবে না। বর্তমানে এই কারখানা একটি সরকারী কোম্পানীর (হিন্দুস্থান এয়ারোনটিকস লিঃ) অধীন। এই কোম্পানীর দ্বিতীয় কারখানা কানপুরে অবস্থিত। এখানে HS 748 বিমানপোত নির্মিত হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত সরকার লন্ডনের Percival Prentice Trainers Company-র নিকট হইতে এই শর্তে ৫০ খানা বিমানপোত ক্রয় করেন যে, উক্ত কোম্পানী লন্ডনে এবং বাঙ্গালোরে এই সকল বিমানপোত নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিবে এবং ভারতীয় শিক্ষানবিশগণকে এই শিল্পে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। আশা করা যায় এই ব্যবস্থার ফলে বহু ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার বিমানপোত-নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করিবে এবং ভারতীয় শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিবে। উপযুক্ত ইঞ্জিনীয়ারের অভাব না হইলে ভারত এই শিল্পে

উন্নতিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। কারণ বিমানপোত-নির্মাণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভারতে বিদ্যমান।

১৯৫০ সালে ব্রিটেনের ডি হ্যাভিল্যান্ড কোম্পানীর সহায়তায় বাঙ্গালোরে ভাম্পায়ার জেট (Vampire Jet) নির্মাণকার্য শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে ব্রিটেনের ফোল্যান্ড এয়ারক্র্যাফট কোম্পানীর সহায়তায় ন্যাট (Gnat) জাতীয় বিমানের নির্মাণকার্য শুরু হয়। জার্মানীর সহযোগিতায় অতি দ্রুতগামী সুপারসেনিক (Supersenik) যুদ্ধবিমান প্রস্তুত হইতেছে। ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় MIG বিমানপোত নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করিয়াছে নাসিক, কোরাপুট ও হায়দরাবাদে। বর্তমানে বাঙ্গালোরেও Gnat বিমানপোত নির্মিত হইতেছে, কানপুরেও বিমান তৈয়ারির কারখানায় AVRO বিমান নির্মিত হইতেছে।

প্রশ্নাবলী

(A) Essay-Type Questions

1. Discuss critically the progress made in the field of Industrialisation in India since independence. [C. U. B. Com. 1968]

(স্বাধীনতার পর হইতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা কর।)

উঃ। 'স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের শিল্পোন্নতি' (১৭৫—১৭৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

2. What are the raw materials of the iron and steel industry ? State the reasons for the location of iron and steel manufacturing centres at (a) Jamshedpur and (b) Durgapur. [H. S. Examination, 1978]

(লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল কি কি ? জামসেদপুরে ও দুর্গাপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কারখানাদ্বয় কেন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।)

উঃ। 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (১৭৭—১৮৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. How are iron ores geographically distributed in India? Discuss the importance of Steel in development of modern industries in India. [H. S. Examination, 1978]

(ভারতের আকরিক লৌহের ভৌগোলিক অবস্থান দেখাও। ভারতের আধুনিক শিল্পে ইস্পাতের গুরুত্ব আলোচনা কর।)

উঃ। চতুর্থ অধ্যায়ের 'লৌহ আকরিক' হইতে 'উৎপাদক অঞ্চল' (৯৮—৯৯ পৃঃ) এবং 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (১৭৭—১৮৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Name four major iron and steel producing centres of India and account for their locations. [B. S. E. Higher Secondary, 1965]

(ভারতের চারিটি লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনকেন্দ্রের নাম লিখ এবং উহাদের অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর।)

উঃ। 'জামসেদপুর' (১৮৩ পৃঃ), 'বোকারো' (১৮২ পৃঃ), 'দুর্গাপুর' (১৮১—১৮২ পৃঃ) ও 'ভিলাই' (১৮০—১৮১ পৃঃ) লিখ।

5. Name any four important centres of iron and steel industries of India. Account for the location of iron and steel industries in Durgapur and Jamshedpur. [H. S. Examination, 1981]

(ভারতের যে কোনো চারিটি প্রধান লৌহ ইস্পাত ও শিল্পকেন্দ্রের নাম লিখ। দুর্গাপুর ও জামসেদপুরে লৌহ ইস্পাত শিল্পের অবস্থানের কারণ নির্দেশ কর।)

উঃ। 'অবস্থান ও অবস্থানের কারণ' (১৭৯—১৮৪ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

6. Analyse critically the locational set up of the iron and steel industry of India. Indicate the present position of the industry. [C. U. B. Com. 1969 ; B. U. B. Com 1964 & 1965]

(ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থানের বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা নির্দেশ কর।)

উঃ। 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (১৭৭—১৮৬ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

7. Account for the location for the Cotton Textile Industry in (a) Bombay and Ahmedabad regions and (b) West Bengal. [B. U. Univ. Ent. 1963]

[(ক) বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে এবং (খ) পশ্চিমবঙ্গে কার্পাসবয়ন শিল্পের অবস্থানের কারণ বর্ণনা কর।]

উঃ। (ক) 'মহারাষ্ট্র' (১৮৭—১৮৯ পৃঃ), 'গুজরাট' (১৮৯ পৃঃ), (খ) 'পশ্চিমবঙ্গ' (১৮৯ পৃঃ) লিখ।

8. Explain the factors that have favoured the development of the Cotton Textile Industry in India and account for its location. Consider the present position and the future prospects of industry in the Indian Union.
[C.U. Pre. Univ. 1963 & 1972 ; B.U. Univ. Ent. 1969, 1971 & 1972]

(ভারতের কার্পাস-বয়নশিল্পের উন্নতির কারণসমূহ বুঝাইয়া লিখ এবং অবস্থানের কারণ দেখাও। ভারতে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

উঃ। 'কার্পাসবয়ন শিল্প' (১৮৬—১৯১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

9. Briefly describe the Cotton Textile Industry of India with reference to its new features in the field of production, its export trade and problems. [C. U. B. Com. 1969]

(উৎপাদন, রপ্তানি-বাণিজ্য এবং সমস্যাগুলির নূতন বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করিয়া ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্প সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

উঃ। 'কার্পাসবয়ন শিল্প' (১৮৬—১৯১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10. Give a geographical account of the cotton textile industry of India under the following heads : (a) source of raw materials, (b) power supply, (c) transport and communication and (d) market.

[নিম্নলিখিত শিরোনামা অবলম্বনে ভারতের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে একটি ভৌগোলিক বিবরণ দাও ঃ

(ক) কাঁচামালের সংস্থান, (খ) শক্তি সরবরাহ, (গ) পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘ) বাজার।]

উঃ। 'কার্পাসবয়ন শিল্প' (১৮৬—১৯১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. Account for the concentration of Cotton Textile Industry in the western and southern parts of India. What are the present problems of this industry ? [H. S. Examination, 1982]

(ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে কার্পাসবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ উল্লেখ কর। এই শিল্পের বর্তমানে সমস্যা কি কি ?)

উঃ। 'কার্পাসবয়ন শিল্প' (১৮৬—১৯১ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

12. Account for the location of Cotton Textile Industry in any major producing centre in India. What are the present problems of this industry ? [H. S. Examination, 1984]

[ভারতের যে কোনো একটি মুখ্য কার্পাস-বয়ন শিল্পকেন্দ্রের অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যাবলী কি কি ?]

উঃ। 'কার্পাস-বয়ন শিল্প' হইতে মহারাষ্ট্রের 'বোম্বাই শিল্পাঞ্চল' (১৮৭—১৮৮ পৃঃ) ও 'শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা' (১৯১ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

13. Mention the favourable geographical factors for the growth of Woollen Industry in India. Mention the location of the principal centres of this industry. [H. S Examination, 1984]

[ভারতের পশম শিল্প উন্নয়নের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। এই শিল্পের মুখ্য কেন্দ্রগুলির অবস্থান নির্দেশ কর।]

উঃ। 'পশম-বয়ন শিল্প' (১৯১-১৯৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

14 Write notes on the Woollen Industry of India.

(ভারতের পশমবয়ন শিল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।]

উঃ। 'পশমবয়ন শিল্প' (১৯১—১৯৩ পৃঃ) লিখ।

15. Give the grographical distribution of jute manufacturing centres in India. Mention briefly the progress and recent phase of the industry in India. [H. S. Examination, 1979.]

(ভারতের পাটশিল্প কেন্দ্রগুলির অবস্থান নির্দেশ কর। পাটশিল্পে ভারতের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।)

উঃ। 'পাটশিল্প' (১৯৩—১৯৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

16. Explain the factors that have favoured the development of the Jute Industry in India. Consider the present position and the future prospects of the industry in the Indian Union.

[C. U. Pre-Univ. 1962]

(ভারতের পাটশিল্পের উন্নতির কারণসমূহ বর্ণনা কর। ভারতে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

উঃ। 'অবস্থান ও অবস্থানের কারণ' (১৯৪—১৯৫ পৃঃ) এবং 'পাটশিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা' (১৯৬—১৯৭ পৃঃ) লিখ।

17. Give an account of the Jute Industry of the Indian Union with special reference to (i) sources of raw materials. (ii) present location. (iii) condition which favoured its development and (iv) future prospects.

[নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া ভারতের পাটশিল্পের বিবরণ দাও ঃ (ক) কাঁচামালের উৎপাদক অঞ্চল, (খ) বর্তমান অবস্থান, (গ) ইহার উন্নতির উপযোগী অবস্থানসমূহ এবং (ঘ) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।]

উঃ। 'পাটশিল্প' (১৯৩—১৯৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

18. How do you explain the following ? (a) The Hooghly belt is an important region of Jute manufacture. (b) Kanpur is an important centre of sugar manufacture. [C. U. Pre-Univ. 1961]

[নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে ? (ক) হুগলী নদী উপত্যকা পাট-শিল্পের একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল, (খ) কানপুর চিনি উৎপাদনের একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল।]

উঃ। 'অবস্থান ও অবস্থানের কারণ' (১৯৪—১৯৫ পৃঃ), 'অবস্থান ও অবস্থানের কারণ' (২০৩—২০৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

19. Account for the location of paper mills of India and discuss critically the present position and future scope of the paper industry. [C. U. B. Com. 1965, '71 ; B.U.B. Com. Hons. 1978]

(ভারতের কাগজ-শিল্পের অবস্থানের বিবরণ দাও এবং কাগজ শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা কর।)

উঃ। 'কাগজ শিল্প' (১৯৮—২০২ পৃঃ) হইতে লিখ।

20. Account for localisation, state the present position and indicate the future prospects of (a) Cotton Textile Industry, (b) Iron and Steel Industry and (c) Paper Industry of India.

[Specimen Question, 1978]

[ভারতের নিম্নলিখিত শিল্পগুলির অবস্থান, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বিবরণ দাও ঃ (ক) কার্পাস বয়ন-শিল্প, (খ) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং (গ) কাগজ শিল্প।]

উঃ। 'কার্পাস-বয়ন শিল্প' (১৮৬—১৯১ পৃঃ), লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (১৭৭—১৮৬ পৃঃ) এবং 'কাগজ শিল্প' (১৯৮—২০২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

21. What are the raw-materials required for the paper industry ? Give the geographical location of the main centres of paper production and the present position of the industry in India.

[H. S. Examination, 1980]

[কাগজ শিল্পের জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয় ? ভারতে কাগজ উৎপাদনের মুখ্য কেন্দ্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐ শিল্পের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর।]

উঃ। 'কাগজ শিল্প' (১৯৮—২০২ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

22. What are the raw materials needed for the Paper Industry of India ? Where and to what extent are they found in India ?
[Tripura H. S. Examination, 1982.]

(ভারতের কাগজ শিল্পের জন্য কি কি কাঁচামাল প্রয়োজন ? কোথায় এবং কি পরিমাণে এইগুলি ভারতে পাওয়া যায় ?)

উঃ 'কাগজ শিল্প' (১৯৮—২০২ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

23. Analyse the locational pattern of the Heavy Chemical Industry in India and discuss the problems of the industry and its present position. [C U. B. Com. 1973 & B. U. B. Com. 1970]

(ভারতের গুরু রাসায়নিক শিল্পের অবস্থানের ধরন বিশ্লেষণ কর এবং ঐ শিল্পের সমস্যা ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর।)

উঃ। 'গুরু রাসায়নিক দ্রব্য' (২০৫—২০৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

24. What are the raw materials required for the development of fertiliser industry ? Explain the favourable geographical factors for the development of fertiliser industry citing example from any one of such centres in Eastern India. [H. S Examination, 1979]

(সার-শিল্প গড়িয়া উঠার জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয় ? পূর্ব ভারতের যে কোনো একটি প্রধান সার শিল্প কেন্দ্রের পত্তন ও উন্নতির পক্ষে ভৌগোলিক উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা কর।)

উঃ। 'রাসায়নিক সার' (২০৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

25. Briefly describe the Chemical Fertilizer Industry of India.
[B. U. B. Com 1970.]

(ভারতের রাসায়নিক সার-শিল্প সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

উঃ। 'রাসায়নিক সার' (২০৭ পৃঃ) লিখ।

26. Examine the present position of Indian Sugar Industry. Where would you find the important areas of sugar industry in India ? Give reasons for its development in these areas.
[B. U. Univ. Ent. 1962, '68, '72 ; C. U. Pre-Univ. 1973.]

(ভারতের চিনিশিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর। ভারতে চিনিশিল্পের প্রধান প্রধান অঞ্চল কোথায় দেখা যায় ? ঐ সকল অঞ্চলে ইহার উন্নতিলাভের কারণ দেখাও।)

উঃ। 'উৎপত্তি ও বিকাশ' (২০২—২০৩ পৃঃ) এবং 'অবস্থান ও অবস্থানের কারণ' (২০৩—২০৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

27. Account for the concentration of sugar industry in the Ganga Plain. What are the present problems of this industry ?
[H. S. Examination. 1983]

(গাঙ্গেয় উপত্যকায় চিনি-শিল্পের কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি কি ?)

উঃ। 'চিনিশিল্প' (২০২—২০৫ পৃঃ) হইতে 'অবস্থান ও অবস্থানের কারণ' এবং 'শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা' অবলম্বনে উত্তর লিখ।

28. Account for the location, state the present position and indicate the future prospects of (a) Iron & Steel, (b) Sugar, (c) Paper and (d) Chemical Industries of India.

[Specimen Question, 19°0]

[ভারতের নিম্নলিখিত শিল্পগুলির অবস্থানের কারণ, উহাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিবরণ দাও : (ক) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, (খ) চিনি শিল্প, (গ) কাগজ শিল্প ও (ঘ) রাসায়নিক শিল্প]

উঃ। 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (১৭৭—১৮৬ পৃঃ) ও 'চিনিশিল্প' (২০২—২০৫ পৃঃ) 'কাগজ শিল্প' (১৯৮—২০২ পৃঃ) ও 'রাসায়নিক শিল্প' (২০৫—২০৯ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

29. Account for the localisation, state the present position and indicate the future prospects of (a) Sugar, (b) Jute, (c) Chemical and (d) Fertiliser industries of India.

[Specimen Question, 1978]

[ভারতের (ক) চিনিশিল্প, (খ) পাটশিল্প, (গ) রাসায়নিক শিল্প এবং (ঘ) সার শিল্পের অবস্থান, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

উঃ। 'চিনিশিল্প' (২০২—২০৫ পৃঃ), 'পাটশিল্প' (১৯০—১৯৭ পৃঃ), 'রাসায়নিক শিল্প' (২০৫—২০৯ পৃঃ) এবং 'সার শিল্প' (২০৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

30. Draw a full page outline map of Indian Union and insert the following on it :—Centres of aircraft and locomotive industries.

[B. S. E. Higher Secondary, 1967 & 1971]

(ভারতের একটি পূর্ণপৃষ্ঠার মানচিত্র আঁকিয়া দেখাও :—বিমানপোত ও রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পের কেন্দ্রসমূহ।)

উঃ। ২১০ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

31. In an outline map of India locate the centres of Ship building and Automobile industries.

(ভারতের একটি মানচিত্র আঁকিয়া জাহাজ ও মোটরগাড়ি-নির্মাণ শিল্পের কেন্দ্রসমূহ দেখাও।)

উঃ। ২১০ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

(B) Short Answer-type Questions

1. Explain the following statements :

(a) India exports sugar, though she could not meet her own demands. [H. S. Examination, 1981]

(b) Indian Jute mills are largely located in and around Calcutta.

[H. S. Examination, 1978]

(c) Textile industries are concentrated in Maharashtra and Gujarat. [H. S. Examination, 1978]

(d) Calcutta and neighbourhood areas have many jute mills whereas Bombay has none. [H. S. Examination, 1979]

(e) The Cotton textile industry is concentrated in the Ahmedabad industrial region. [H. S. Examination, 1979]

(f) Most of the Jute mills in India are localised on both banks of the Hooghly river. [H. S. Examination, 1980]

(g) Iron and Steel factories in India are located near the coal fields. [H. S. Examination, 1980]

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কারণ ব্যাখ্যা কর :

(ক) নিজস্ব চাহিদা অপূর্ণ রাখিয়াও ভারত চিনি রপ্তানি করে।

(খ) কলিকাতা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভারতের পাটকলগুলি অনেকাংশে অবস্থিত।

(গ) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে বয়নশিল্প কেন্দ্রীভূত।

(ঘ) কলিকাতা ও সংলগ্ন স্থানে বহু পাটকল আছে, কিন্তু বোম্বাইতে একটিও নাই।

(ঙ) আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চলে বয়নশিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(চ) হুগলী নদীর উভয় তীরে ভারতের অধিকাংশ পাটকলগুলি কেন্দ্রীভূত।

(ছ) ভারতের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলি কয়লাখনির নিকট অবস্থিত।]

উঃ। (ক) 'চিনিশিল্প' (২০২—২০৫ পৃঃ), (খ) 'পাটশিল্প' (১৯৩—১৯৭ পৃঃ), (গ) 'কার্পাসবয়ন শিল্প' (১৮৬—১৯১ পৃঃ), (ঘ) 'পাটশিল্প' (১৯৩—১৯৭ পৃঃ), (ঙ) কার্পাসবয়ন শিল্প' (১৮৬—১৯১ পৃঃ), (চ) 'পাটশিল্প' (১৯৩—১৯৭ পৃঃ), এবং (ছ) 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (১৭৭—১৮৬ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

C. Objective Questions

1. Give correct answer from the following statements :

(a) There is an automobile factory near Asansol/Uttarpara/Durgapur in West Bengal. [H. S. Examination, 1982]

(b) Sindhri is noted for its cycle/railway, locomotive/fertiliser factory. [H. S. Examination, 1982]

(c) Chittaranjan is famous for locomotive/ship-building industry. [H. S. Examination, 1978]

(d) Maximum sugar mills in India are located in West Bengal/Uttarpradesh/Sikkim.

(e) A good number of paper mills are found in Jammu and Kashmir/West Bengal/Rajasthan.

(f) Cotton textile industry has been localised in Maharashtra and Gujarat/Assam/Madhya Pradesh.

(g) Jute industry is concentrated at the Ganga Delta/Rajasthan/Krishna valley. [H. S. Examination, 1983]

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে সঠিক উত্তর দাও ঃ

(ক) পশ্চিমবঙ্গে আসানসোলের/উত্তরপাড়ার/দুর্গাপুরের নিকট একটি মোটর গাড়ি নির্মাণের কারখানা আছে।

(খ) সাইকেল/রেলইঞ্জিন সার কারখানার জন্য সিন্ধ্রী বিখ্যাত।

(গ) চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন/জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে/উত্তর প্রদেশে সিকিমে ভারতের অধিকাংশ চিনির কল অবস্থিত।

(ঙ) জম্মু ও কাশ্মীরে পশ্চিমবঙ্গে/রাজস্থানে বহুসংখ্যক কাগজের কল দেখা যায়।

(চ) মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে/আসামে মধ্য প্রদেশে কার্পাসবয়ন শিল্পের একদেশীভবন ঘটিয়াছে।

(ছ) গাঙ্গেয় বদ্বীপ রাজস্থান/কৃষ্ণানদীর উপত্যকা অঞ্চলে পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।]

2. Insert tick (√) marks against the correct sentences and cross (×) marks against the incorrect sentences :

(a) Bhadravati is the largest industrial centre of Iron and Steel in India. (b) Most of the steel industrial centres in India are situated in the mining areas of the North-Western zone. (c) Durgapur is called the Ruhr of India. (d) Ahmedabad of Gujarat is the principal cotton textile industrial centre in India. (e) West Bengal occupies the second position in cotton textile production in India. (f) Jullandhar is famous for woollen industry. (g) In Andhra Pradesh there are four jute mills. (h) In Hosangabad of Madhya Pradesh there is a newsprint production factory. (i) In sugar industry Uttar Pradesh occupies the principal position in India. (j) In Neyveli of Tamilnadu there is a sugar mill. (k) An explosive factory has been set up at Gomia in Bihar. (l) The largest automobile industry in India is situated at Sahapur in the neighbourhood of Calcutta.

[শুদ্ধ বাক্যের পাশে √ (টিক) চিহ্ন এবং ভুল বাক্যের পাশে × (ক্রশ) চিহ্ন দাও ঃ (ক) ভদ্রাবতী ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। (খ) ভারতের অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র এই দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের খনি অঞ্চলে অবস্থিত। (গ) দুর্গাপুরকে ভারতের রুঢ় বলা হয়। (ঘ) গুজরাট রাজ্যের আমেদাবাদ ভারতের শ্রেষ্ঠ কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্র। (ঙ) পশ্চিমবঙ্গ বস্ত্র উৎপাদনে ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। (চ) জলন্ধর পশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। (ছ) অন্ধ্র প্রদেশে ৪টি পাটের কল আছে। (জ) মধ্য প্রদেশের হোসঙ্গাবাদে সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদনের একটি কারখানা আছে। (ঝ) চিনিশিল্পে উত্তর প্রদেশ ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। (ঞ) তামিলনাড়ুর নেভেলীতে একটি চিনির কল আছে। (ট) বিহারের গোমিয়াতে বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদনের একটি বড় কারখানা আছে। (ঠ) কলিকাতার নিকটস্থ সাহাপুরে ভারতের বৃহত্তম মোটরগাড়ি-নির্মাণ কেন্দ্রটি অবস্থিত।

———

নবম অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য

(Foreign Trade)

বর্তমান যুগে মানুষের চাহিদার শেষ নাই। সেইজন্য কোনো দেশই প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যাদির উৎপাদনে স্বাবলম্বী নহে। সকল দেশকেই অন্য দেশ হইতে নানা রকমের দ্রব্যাদি কমবেশী আমদানি করিতে হয়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য মিটাইবার জন্য আবার বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানিও করিতে হয়। আমদানি ও রপ্তানি লইয়াই বৈদেশিক বাণিজ্যের সৃষ্টি।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ধরনের পরিবর্তন (Changes in the Pattern of Foreign Trade)—ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কোনো দেশই এই দেশ হইতে বহু দূরে নয়। ইহা ছাড়া ভারতের তিনদিকে জল। সেইজন্য পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিতে ভারতকে জলপথে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়া দিতে হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির এইরূপ ভৌগোলিক সুবিধা বিদ্যমান থাকায় প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ (অবিভক্ত ভারত) বহির্বাণিজ্যে উন্নত ছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে শ্রীলংকা, চীন, জাভা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচুর নজীর পাওয়া যায়। ঢাকার 'মসলিন' ও কেরালার 'ক্যালিকো' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হইত। চীন হইতে 'চিনি' এবং মিশর হইতে 'মিশরী' এই দেশে আমদানির কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ইংরেজদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। ইংরেজগণের এই দেশে রাজত্ব করিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সম্পদকে শোষণ করিয়া ব্রিটেনে লইয়া যাওয়া। সেইজন্য তাহারা এই দেশের কাঁচামাল ব্রিটেনে লইয়া সেখানকার শিল্পে নিয়োজিত করিত এবং সেখানকার শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য এই দেশে আনিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিত। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের গতি সেইভাবে নিরূপিত করিত। সেই সময় প্রচুর কাঁচামাল এই দেশ হইতে ব্রিটেনে রপ্তানি হইত; কিন্তু ভারতবাসীর বিদেশী শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার আর্থিক ক্ষমতা কম ছিল। ফলে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের রপ্তানি সর্বদাই আমদানি অপেক্ষা বেশী হইত। এইভাবে ভারতবর্ষের উদ্‌বৃত্ত বাণিজ্যের অর্থ ব্রিটেনে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাই ভারতবর্ষের স্টার্লিং ব্যালান্স (S erling Balance)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে যুদ্ধোপকরণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ইহাতে স্টার্লিং ব্যালান্সের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং ২,৬০০ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং-এ আসিয়া দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষকে এই ঋণ ব্রিটেন বহুলাংশে পরিশোধ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত মহাসাগরে জাপানী সাবমেরিনের ভয়ে ব্রিটিশ সরকারকে বিদেশ হইতে যুদ্ধোপকরণ ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এই দেশে আমদানি

করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য যুদ্ধের সময় এবং পরে ভারতে কয়েকটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় ও প্রসার ঘটে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হয়—**ভারত ও পাকিস্তান।** ইহাতে দুই দেশের বাণিজ্যের ধরনের কিছুটা পরিবর্তন হয়। যেমন, পূর্বে কলিকাতা বন্দর হইতে প্রচুর পাট ও চামড়া রপ্তানি করা হইত এবং বোম্বাই ও করাচী হইতে তুলা রপ্তানি করা হইত। কিন্তু দেশ বিভাগের পর অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্র ভারতে অবস্থিত হওয়ায় এদেশে এই সকল কাঁচামালের অধিকাংশের অভাব হইল। সেইজন্য ভারত এই সকল কাঁচামালের অধিকাংশের আমদানিকারক হইল।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি (Recent Trends in India's Foreign Trade)—ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের বহির্বাণিজ্যের মূলগত পরিবর্তন হইতেছে। বর্তমানে ভারতে বহির্বাণিজ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Feature) রহিয়াছে। যথা—

(১) স্বাধীনতার পরে ভারতের বহির্বাণিজ্যের **পরিমাণ (Volume)** উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১,২৫১ কোটি টাকা (আমদানি ৬৫০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি ৬০১ কোটি টাকা); কিন্তু **১৯৮১-৮২** সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে **২১,৪০৫·৮৩** কোটি টাকা (আমদানি ১৩,৬০৭·৫৫ কোটি টাকা এবং রপ্তানি ৭,৭৯৮·২৮ কোটি টাকা)। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেও পণ্যের পরিমাণের দিক হইতেও বাহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বহু যন্ত্রপাতি, অন্যান্য সামগ্রী এবং খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জন্যও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(২) ভারতে বর্তমানে শিল্পের অগ্রগতি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে (Composition) অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি কমিয়া **যন্ত্রপাতির আমদানি** বৃদ্ধি পাইয়াছে। যন্ত্রপাতির মূল্য বেশী বলিয়া বর্তমানে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি অনুকূলে থাকিতেছে না; বরং ভারত বিদেশের নিকট প্রচুর দেনায় আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

(৩) কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের শিল্পোন্নতির ফলে এদেশের **কাঁচামালের** রপ্তানি কমিয়া আসিতেছে এবং ভোগ্যদ্রব্যের আমদানিও হ্রাস পাইয়াছে।

(৪) পূর্বে ভারত কয়েকটি কাঁচামাল (পাট, তুলা ইত্যাদি) রপ্তানি করিত। তৎকালীন পাকিস্তানের অংশে এই সকল কাঁচামাল উৎপাদক অঞ্চলের কিয়দংশ চলিয়া যাওয়ায় ভারত এই সকল কাঁচামালের নিকৃষ্ট অংশ এখন রপ্তানি করিয়া দেশীয় শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচামাল **আমদানি** করিতেছে।

(৫) স্বাধীনতার পর ভারতের বহির্বাণিজ্যের **গতির (Direction)** অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হইত। কিন্তু বর্তমানে দেশ স্বাধীন হওয়ায় ভারত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাহার বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। বিশেষতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, চীন, পূর্ব জার্মানী, ফ্রান্স, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অবশ্য ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দনীয় ভূমিকার জন্য ঐ দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য কিছুটা কমিয়া গিয়াছিল। অন্য দিকে ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্তমানে ভারতের আড়তদারী বাণিজ্যও (Entrepot trade) বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আড়তদারী বাণিজ্যে উন্নতি হইতেছে।

(৬) পূর্বে ভারতের প্রায় সমগ্র বহির্বাণিজ্যই সমুদ্রপথে পরিচালিত হইত। বর্তমানে আফগানিস্তান, নেপাল, ইরান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় **স্থলপথেও** উল্লেখযোগ্য বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

(৭) পূর্বে দেশের খাদ্যাভাব পূরণ করিবার জন্য **খাদ্যশস্য আমদানি** করিতে হইত। খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ভারতে প্রতি বৎসর বহির্বাণিজ্যের গতি প্রতিকূলে যাইত। তবে ১৯৭৬ সাল হইতে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং বর্তমানে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ সামান্য। ফলে বহির্বাণিজ্যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

(৮) ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই ঐ দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছিল। বাংলাদেশ হইতে কাঁচা পাট, মাছ, চর্ম প্রভৃতি আমদানি করা সহজসাধ্য হইয়াছিল এবং ভারত ঐ দেশে কয়লা, খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র এবং আরও বহু জিনিস রপ্তানি করিতেছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(৯) ১৯৭১ সালে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্য করায় এবং ভারতের সহিত মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় এই দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য দ্রুত ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন (Reconstruction of Foreign Trade)— ভারতের আয়তন বিশাল হইলেও এবং এই দেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য সংঘটিত করিলেও পৃথিবীর মোট বহির্বাণিজ্যের তুলনায় ভারতের স্থান এখনও নগণ্য। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১,৪৭০ কোটি ডলার, ব্রিটেনের ১,২৪৩ কোটি ডলার, পশ্চিম জার্মানীর ১,০১০ কোটি ডলার, ফ্রান্সের ৬২৮ কোটি ডলার, কানাডার ৫৬৬ কোটি ডলার এবং জাপানের ২৪১ কোটি ডলার; কিন্তু ঐ বৎসর ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৯০ কোটি ডলার। পৃথিবীর মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা মাত্র ২·৫ অংশ ভারতের। ইহার প্রধান কারণ ভারত এখনও কৃষিপ্রধান দেশ এবং প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি এখনও এই দেশে কিছুটা প্রচলিত আছে। অবশ্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যেভাবে এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

কয়েকটি সামগ্রীর রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারত পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তন্মধ্যে পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, কার্পাস-বস্ত্র, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, ইলমেনাইট, মোনাজাইট, জিরকন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় এবং কয়েকটি সামগ্রী এই দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়ায়, এই সকল দ্রব্যাদির জন্য ভারত আমদানির উপর নির্ভরশীল। এই দেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খনিজ তৈল, ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে নূতন নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমদানী হইতেছিল। ইহা ছাড়া কৃষির উন্নতিকল্পে বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির জন্য বহু বিদেশী ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রপাতি আমদানী হইতেছিল। যাহার ফলে আমদানির পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার তুলনায় রপ্তানি-দ্রব্যের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা হইতেছিল। রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া ঘাটতি-পূরণের চেষ্টা করা হইলেও বৈদেশিক জটিল রাজনীতি এবং দেশীয় অর্থনীতির অক্ষমতার দরুন সর্বদা এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। সেইজন্য মনে হয় যে, যদি ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন (Reconstruction) করা না হয় তাহা হইলে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণ শেষ পর্যন্ত সম্ভব হইবে না এবং ইহার ফলে দেশের অর্থনীতিতে এক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে খাদ্যশস্য আমদানি হ্রাস পাওয়ায়, যন্ত্রপাতি আমদানি কমাইয়া দেওয়ায় এবং ভোগ্যপণ্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করায় বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি রোধ করা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহির্বাণিজ্যের পুনর্গঠনের কিছুটা চেষ্টা করা হয়। প্রথমতঃ, চা, কার্পাস বস্ত্র, রেশম, রেয়ন, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, মসলা, কাজুবাদাম, চর্ম, প্লাস্টিক দ্রব্য, অভ্র ও খেলাধূলার দ্রব্যাদির রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য এই সকল দ্রব্যাদির প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া 'রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা' (Export Promotion Council) গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রপ্তানি ঝুঁকির ও অর্থসংস্থানের বন্দোবস্তের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে Export Credit and Guarantee Corporation। তৃতীয়তঃ, চা, কফি ও নারিকেল দড়ির রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য এই সকল দ্রব্যাদির জন্য গঠিত বোর্ডসমূহের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, বিদেশে মেলার মাধ্যমে এবং প্রচারের দ্বারা ভারতীয় দ্রব্যাদির গুণাগুণ সম্বন্ধে বিদেশের ক্রেতাদের মন জয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। পঞ্চমতঃ, রপ্তানি শুল্কের হার কমাইয়া বা এই শুল্ক প্রত্যাহার করিয়া রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন-খরচের কিয়দংশ বহন করিয়া এবং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির সুবন্দোবস্ত করিয়া এবং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির পরিবহণের সুবন্দোবস্ত করিয়া সরকার রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করিয়াছেন। ষষ্ঠতঃ, সরকার নিয়ন্ত্রিত State Trading Corporation-এর সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সপ্তমতঃ, বিভিন্ন উপায়ে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য সরকার Board of Trade নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সংস্থ

বিভিন্নভাবে রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতেছে। অষ্টমতঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন বন্ধু-রাষ্ট্রের সহিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সরকার বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আফগানিস্তান, ব্রাজিল, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ইরান, জর্ডন, মরক্কো, সুদান, সিরিয়া, টিউনিশিয়া, মিশর, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল ৩,৮০০ কোটি টাকা। এইজন্য রপ্তানি বৃদ্ধির নানাবিধ পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির অভ্যন্তরীণ চাহিদা কমাইয়া রপ্তানির জন্য এই সকল দ্রব্য যতদূর সম্ভব ছাড়িয়া দেওয়া; দ্বিতীয়তঃ, রপ্তানির উপর লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা; নতুবা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অধিকতর লাভের আশায় ব্যবসায়িগণ রপ্তানির দিকে দৃষ্টি দেয় না; তৃতীয়তঃ, রপ্তানিযোগ্য শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন খরচ কমাইবার বন্দোবস্ত করা, যাহাতে বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করা যায়; চতুর্থতঃ, বিদেশে সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ভারতীয়গণকে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাময়িকভাবে ত্যাগ স্বীকার করিতে বলিয়া, রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য গবেষণা চালাইয়া এবং জনসাধারণের সহযোগিতা চাহিয়া রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত রপ্তানির লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই।

চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকালে (১৯৬৯-১৯৭৪) ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য এবং আমদানি কমাইবার জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল! কার্পাস বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, পাটজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, জামা-কাপড়, জুতা প্রভৃতির রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় এবং কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই সকল পন্থা গ্রহণ করিবার ফলে ভারতের রপ্তানি ১৯৬৫-৬৬ সালের ৮০৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৪-৭৫ সালে ৩,২৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ের আমদানি ১,৪০৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪,৩৪৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

রপ্তানি বৃদ্ধি ছাড়াও ভারতে আমদানি দ্রব্য যতদূর সম্ভব হ্রাস করিয়া এবং বাণিজ্যের গতি পরিবর্তন করিয়া এই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। পূর্বে এই দেশের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হইত ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, রোমানিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সংঘটিত করিয়া এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, এই সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে অনেক সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য চালানো সম্ভব। এই সকল দেশ উন্নতিশীল ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় গ্রহণ করে। ইহাতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধা হয়। সুতরাং এই সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে যতদূর সম্ভব অধিক বাণিজ্য সংঘটিত করিয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারত এই সকল দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত করিয়া বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারত-সোভিয়েত রাশিয়া মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে **সোভিয়েত রাশিয়ার** সহিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দনীয় মনোভাবের জন্য এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে সাহায্য দানের জন্য ভারতের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোমালিন্য হয়; ফলে এই দুই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে হ্রাস পায়। এইভাবে ভারতের **বৈদেশিক** বাণিজ্যে এক **বৈপ্লবিক পরিবর্তন** সাধিত হয়। অবশ্য ইহাতে ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে উচ্চমূল্যে জিনিসপত্র আমদানি করা অপেক্ষা সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি করা অনেক লাভজনক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সহিত বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাংলাদেশ হইতে কাঁচা পাট ও অন্যান্য কাঁচামাল ভারতে আমদানি হয় এবং ভারত হইতে খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি বাংলাদেশে রপ্তানি হয়। ইহার ফলে উভয় দেশেরই লাভবান হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু নানা কারণে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ পুনরায় হ্রাস পাইয়াছে।

সম্প্রতি ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে চিরাচরিত দ্রব্যাদি (চা, পাট, কার্পাসবস্ত্র, লৌহ আকরিক প্রভৃতি) ছাড়াও কয়েকটি **শিল্পজাত দ্রব্য** বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। যথা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, পূর্তশিল্পজাত দ্রব্য, রসায়ন দ্রব্য, রেশম-বস্ত্র, নারিকেলের দড়ির জিনিস প্রভৃতি। আশা করা যায়, দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল রপ্তানি দ্রব্যাদির মধ্যে বাইসাইকেল, সেলাইয়ের কল, বৈদ্যুতিক পাখা, ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি, ঢালাই লৌহ, জুতা, প্লাস্টিকের দ্রব্য, রবার দ্রব্য প্রভৃতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য উপরে বর্ণিত যে সকল পন্থা বিভিন্ন পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছিল, তাহা কার্যকরী হইলে ও সাফল্যলাভ করিলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে পুনর্গঠিত হইত সন্দেহ নাই।

আমদানি (Import)—পূর্বে ভারতের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, ধাতব দ্রব্যাদি ও খাদ্যশস্য উচ্চস্থান অধিকার করিত। শিল্পায়নের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত খাদ্যশস্যের জন্য প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হইত। কারণ, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং স্বাধীনতা লাভের ২৫ বৎসরের পরেও সে খাদ্যে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। ইহা বড়ই লজ্জার কথা। অবশ্য ১৯৭১-৭২ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খাদ্য-শস্য আমদানি বন্ধ করা হইয়াছিল। পুনরায় ১৯৭৬ সালে ভারত খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়ায় খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী না হইলে, তাহার জন্য আমদানি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় না। ইহার ফলে আমদানির পরিমাণ কিছুটা কমিয়াছে। কিন্তু এখনও রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির পরিমাণ অনেকটা বেশী। ১৯৮১-৮২ সালে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি ৫৮০৯·২৬ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। এই বৎসর ভারতের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

আমদানি (১৯৮১-৮২)*

আমদানি দ্রব্য	মূল্য (কোটি টাকা)	রপ্তানিকারক দেশসমূহ
১। খাদ্যদ্রব্য ও প্রাণী (গম, চাউল, যব, ভুট্টা, ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মৎস্য, মসলা, পশুখাদ্য)	৬৯০.১৪	কানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ইত্যাদি।
২। মদ্য ও তামাক	১.২০	ব্রিটেন, পাকিস্তান ইত্যাদি।
৩। অভক্ষ্য কাঁচা মাল (জ্বালানি ব্যতীত) (তুলা, পাট, কাঁচা রবার, কাষ্ঠমণ্ড, খনিজ দ্রব্য, পশম ইত্যাদি)	৮৪৩.৩৫	কানাডা, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড (কাষ্ঠমণ্ড), বাংলাদেশ (পাট), মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান (তুলা) ইত্যাদি।
৪। খনিজ জ্বালানি (কয়লা, খনিজ তৈল ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি)	৫২৩০.১৮	ইরান, সোভিয়েত রাশিয়া, সৌদি আরব, ইরাক, কুওয়াইত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি।
৫। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল এবং চর্বি	৬৮৭.৯৭	পাকিস্তান, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, ইটালি ইত্যাদি।
৬। রাসায়নিক দ্রব্য	১৩২৩.৯৪	ব্রিটেন, পঃ জার্মানী, সোঃ রাশিয়া, মাঃ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ইত্যাদি।
৭। শিল্পজাত দ্রব্য	২৫৯৭.৭৫	ব্রিটেন, পঃ জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া, বেলজিয়াম, জাপান, ফ্রান্স (ইস্পাত ও ধাতুদ্রব্য), কানাডা, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড (কাগজ), শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া (রবার) ইত্যাদি।
৮। যন্ত্রপাতি ও পরিবহণের সাজসরঞ্জাম	১৯৮০.৬৫	ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি।
৯। অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য ও কৃত্যক	২৪৮.৭২	সোঃ রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানী, জাপান ইত্যাদি।
১০। বিবিধ	৩.৬৫	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ।
মোট	১৩,৬০৭.৫৫	

*Source—Monthly Statistics of Foreign Trade, March, 1982

যে সকল দেশ হইতে ভারতে পণ্যদ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে জাপান, ইটালি, ফ্রান্স, সৌদি আরব ও কানাডা উল্লেখযোগ্য।

রপ্তানি (**Export**)—ভারতে রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ আমদানির তুলনায় বৃদ্ধি পাইতেছে না। শিল্পের আরও উন্নতি না হইলে এবং ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে রপ্তানি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা (Export possibilities) সুদূরপরাহত। ভারতের রপ্তানিযোগ্য জিনিসের মধ্যে চা, পাটজাত দ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র এবং খনিজ ও কৃষিজাত কাঁচামাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ শিল্পোন্নত দেশসমূহ ভারতের রপ্তানি-দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা।

ভারতে রপ্তানি-বাণিজ্য প্রধানতঃ **ছয়টি বাণিজ্যিক অঞ্চলে** সীমাবদ্ধ ঃ

প্রথমতঃ, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও পর্তুগাল লইয়া গঠিত পশ্চিম ইউরোপের 'অবাধ বাণিজ্য এলাকা'র (Free Trade area) দেশসমূহ ভারতীয় রপ্তানির শতকরা প্রায় ৩ ভাগ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের সাধারণ বাজারের (European Common Market) দেশসমূহ ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ৩২·৭ ভাগ পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। এই সকল দেশের মধ্যে ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানীর অংশ সর্বাপেক্ষা বেশী ; ইহার পরেই ফ্রান্সের স্থান। ব্রিটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ায় এই বাজারের সহিত ভারতের বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, 'ইকাফে' (ECAFE) অঞ্চলের দেশসমূহ ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে জাপানের অংশ শতকরা ৫·৫ ভাগ, বাংলাদেশের অংশ ৫ ভাগ, শ্রীলঙ্কার অংশ ৩·৪ ভাগ এবং ব্রহ্মদেশের অংশ ২·১ ভাগ। 'ইকাফে'র অন্তর্গত অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে রহিয়াছে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও আফগানিস্তান।

চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের (সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি) সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। বর্তমানে এই সকল দেশ ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ১২ ভাগ গ্রহণ করে। এই সকল দেশের সহিত আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য টাকায় নির্ধারিত হয় বলিয়া এই সকল দেশে ভারতীয় দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে।

পঞ্চমতঃ, আফ্রিকার দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের ক্রমশঃই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে ; বিশেষতঃ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ঘানা, আলজেরিয়া, গিনি, জায়েরে, সুদান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে নূতনভাবে বাণিজ্যিক লেনদেন হইতেছে। ইহারা ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ৫ ভাগ গ্রহণ করে।

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশ ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ২১ ভাগ ক্রয় করে ; ইহাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ প্রায় ১৫·৩ শতাংশ।

উপরিউক্ত ছয়টি বাণিজ্যিক অঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। বিদেশে বাণিজ্য-প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া এবং বিদেশে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারিলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা ২৫ ভাগ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত হইত। ইহাদের নিকট হইতে ভারতকে ঋণ লইতে হয়। এই দুর্বলতায় ভারতকে অধিক মূল্যে এই সকল দেশ হইতে পণ্য আমদানি করিতে হইত। অবশ্য বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অধিক মূল্যে ভারতে পণ্য রপ্তানিতে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত যদি সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের সহিত এবং আফ্রো-এশিয়ার সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সহিত বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের রপ্তানি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

রপ্তানি (১৯৮১-৮২) *

রপ্তানি দ্রব্য	মূল্য (কোটি টাকা)	আমদানিকারক দেশসমূহ
১। খাদ্য ও প্রাণী [দুগ্ধজাত দ্রব্য, মৎস্য, গম, চাউল, বিভিন্ন প্রাণী, মাংস, দুগ্ধ ও বার্লি, ভুট্টা, ডাল, ফল, চীনি, কফি, চা, মসলা ইত্যাদি।]	১১১১·১৭	শ্রীলংকা, কানাডা, ব্রিটেন, মাঃ যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সোঃ রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পঃ জার্মানী, ইরাক, নেপাল ইত্যাদি।
২। মদ্য ও তামাক	২৩৬·৪৪	ব্রিটেন, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ।
৩। কাঁচামাল [চামড়া, তৈলবীজ, রবার, রেশম, তুলা, পাট, লৌহ, নানাবিধ প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য]	৭৭৫·০৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পঃ জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানী, ইটালি, শ্রীলংকা, নেপাল ইত্যাদি।
৪। খনিজ জ্বালানি [কয়লা, খনিজ তৈল ও তৈলজাত জিনিসপত্র]	২২৪·৮৯	বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নেপাল।
৫। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল ও চর্বি	১৯·৯৬	বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান ইত্যাদি।
৬। রাসায়নিক দ্রব্য	৩৭৫·৩৮	শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ, মিশর, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি।
৭। শিল্পজাত দ্রব্য [চর্ম ও চর্মদ্রব্য, কাষ্ঠ, কাগজ, সূতিবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, সিমেন্ট, কাচ, লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি]	২৫৭৮·৮৮	ব্রিটেন, মাঃ যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, কানাডা, মিশর, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, সোঃ রাশিয়া, পঃ জার্মানী, জাপান, শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ইত্যাদি।

* Source—Monthly Statistics of Foreign Trade, March, 1982.

রপ্তানি দ্রব্য	মূল্য (কোটি টাকা)	আমদানিকারক দেশসমূহ
৮। যন্ত্রপাতি ও পরিবহণের সাজ-সরঞ্জাম [বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র, কৃষি-কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পরিবহণের সরঞ্জাম, রেলবগী ইত্যাদি]	৬১৭·৩৫	বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ঘানা, জায়েরে, ব্রহ্মদেশ, নেপাল ইত্যাদি।
৯। অন্যান্য শিল্পদ্রব্য ও কৃত্যক [গঁদ, লাক্ষা, লঘু রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ছোট-খাট শিল্পজাত দ্রব্য]	১০৩৮·৫০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি।
১০। বিবিধ	১২·৬৬	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ।
মোট	৭৭৯৮·২৮	

উপরে আমদানি-রপ্তানির যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে আমদানি-রপ্তানির গতি, বিশেষতঃ, কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হয় তাহাও বুঝা যাইবে। দেশ হিসাবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি নিম্নে দেওয়া হইল :

(১৯৮১-৮২)*

দেশসমূহ	আমদানি (কোটি টাকা)	রপ্তানি (কোটি টাকা)	দেশসমূহ	আমদানি (কোটি টাকা)	রপ্তানি (কোটি টাকা)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪২১	৮৮২	ইরান	১,৩২৮	১১২
জাপান	৯৩৯	৬৯১	সৌদি আরব	৮৩০	১৯০
সোভিয়েত রাশিয়া	১,১৫৬	১,৫০৫	পশ্চিম জার্মানী	৯১৭	৩৮২
ব্রিটেন	৮৪৯	৪৬৪	মালয়েশিয়া	২৪১	৫৯
ইরাক	৪২৪	৮১	রোমানিয়া	১১১	৮০
কুওয়াইত	২৬৮	১২৯	চেকোশ্লোভাকিয়া	৫১	৮৬
অস্ট্রেলিয়া	২২৪	১০৬	ইটালি	২২৫	১৬০
ফ্রান্স	২৪৭	১৪৯	বাংলাদেশ	১২	৭৫
কানাডা	২৯৪	৬৫			

প্রধান প্রধান দেশসমূহের সহিত ভারতের বাণিজ্য—উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ইরান প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা বেশী।

*Source—India 1983.

(১) **ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য**—দেশ স্বাধীন হইবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, তুলা, ঔষধপত্র, মোটরগাড়ি, খনিজ তৈল, রবার, ইস্পাত-দ্রব্য, গম, তামাক, কাগজ ও বোর্ড, কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতি মাঃ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি করা হয়। লাক্ষা, অভ্র, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ, পশম, ইলমেনাইট, ফল, মসলা, তৈলবীজ প্রভৃতি এই দেশ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য ভারতের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোমালিন্য হওয়ায় ঐ দেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ আর ততটা বৃদ্ধি পাইতেছে না।

(২) **ভারত-সোভিয়েত রাশিয়া বাণিজ্য**—ব্রিটিশ রাজত্বকালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্য অনুমোদন করিত না। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভারত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে ব্রিটেনের আর্থিক লোকসানের সম্ভাবনা ছিল এবং প্রতিযোগিতার ভয় ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্য প্রতি বৎসরই বাড়িয়া যাইতেছে। সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক সুবিধাজনক শর্তে পণ্যদ্রব্য সরবরাহের ফলে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া বাজার নষ্ট হইতে বসিয়াছে। খনিজ তৈল ও তৈলজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতি সোভিয়েত রাশিয়া হইতে ভারতে আমদানি হইতেছে এবং ইহার পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্য, চা, প্লাস্টিকদ্রব্য, অভ্র, চর্মদ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ ভোগ্যদ্রব্য এদেশ হইতে সোভিয়েত রাশিয়ায় রপ্তানি হইতেছে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের সহিত সহযোগিতা করায় এবং বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে সহায়তা করায় ভারতের সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারত-সোভিয়েত রাশিয়া বাণিজ্য (কোটি টাকা)*

বৎসর	ভারত হইতে রপ্তানি	ভারতে আমদানী
১৯৫৫-৫৬	৩·২৬	৬·২১
১৯৬০-৬১	৩০.৪৮	১৭·১৯
১৯৬৫-৬৬	৯৩	৮৩
১৯৭০-৭১	২১০	১০৬
১৯৭৫-৭৬	৪১৭	৩১০
১৯৮০-৮১	১,১২৬	১,০১৪
১৯৮১-৮২	১,৫০৫	১.১৫৬

(৩) **ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য**—ব্রিটেনের সহিত ভারতের বাণিজ্য খুবই বেশী। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে এখনও ব্রিটিশ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব বিদ্যমান। ইহাদের মারফত ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, রাসায়নিক দ্রব্য, সাইকেল, ইস্পাত-সামগ্রী, মদ্য, ঔষধ, পশম ও কার্পাসদ্রব্য প্রভৃতি ব্রিটেন হইতে ভারতে আমদানি হয়। ইহার মধ্যে যন্ত্রপাতির মূল্য সর্বাধিক। পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, লৌহ আকরিক, কার্পাস ও পশম, তামাক, কফি, রবার, লাক্ষা, দাঁড়, মসলা প্রভৃতি এদেশ হইতে ব্রিটেনে রপ্তানি করা হয়।

*Source—India 1983

(৪) **ভারত-পশ্চিম জার্মানী বাণিজ্য**—লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক দ্রব্য, কাগজ প্রভৃতি পশ্চিম জার্মানী হইতে ভারতে আমদানি হয় এবং পাটজাত দ্রব্য, চা, তামাক, তূলা, লৌহ আকরিক, মসলা, চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ, হরীতকী, অভ্র, দড়ি, পশম, কার্পাস-বস্ত্র, লাক্ষা, তৈলবীজ প্রভৃতি ভারত হইতে পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানি হয়।

(৫) **ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য**—ভারতে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার ফলে ১৯৪৯ সাল হইতে ভারতের সহিত বাংলাদেশের (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের) বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। পরে চুক্তির মারফত বাণিজ্য শুরু হয়। ১৯৫৭ সালে তিন বৎসরের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছিল। পুনরায় ১৯৬০ সালে নূতন এক চুক্তি হয়। পাট, তূলা, পশম, খাদ্যশস্য, চামড়া, ডিম, সুপারি, ফল, তরকারী, মৎস্য প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে বাংলাদেশ (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) হইতে ভারতে আমদানি হইত এবং লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, চা, তামাক, চলচ্চিত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, কয়লা, কার্পাস-বস্ত্র, গুড় ও চিনি সামান্য পরিমাণে ঐ দেশে রপ্তানি হইত। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ ভারতের সহায়তায় স্বাধীনতা অর্জন করিবার ফলে ভারতের সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইতেছিল। ভারত ঐ দেশকে খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, চর্মদ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করিতেছিল এবং বাংলাদেশ হইতে ভারত পাট, চর্ম, মৎস্য, ছাপার কাগজ প্রভৃতি আমদানি করিতেছিল। নানা কারণে এখন পুনরায় ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের আড়তদারী বাণিজ্য (**Entrepot Trade of India**)—ভারত মহাসাগরের উত্তরে ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। সেইজন্য এই দেশ সামুদ্রিক বাণিজ্যের মধ্যপথে অবস্থিত। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে যে সকল দেশ আছে (নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, ইরান) তাহাদের পক্ষে সরাসরি সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। এই সকল দেশের বহির্বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য ভারতের উপর দিয়া যায়। ইহাতে ভারতের কিছু লাভ (Middleman's profit) হয়। ইহা ছাড়া পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলি হইতে রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ভারত আমদানি করিয়া পুনরায় ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব আফ্রিকা, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করে। বর্তমানে এই জাতীয় বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। ভারত সরকার আড়তদারী বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সীমান্ত পথের বাণিজ্য (Frontier Trade of India)—ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থিত হইলেও, ইহার মধ্য দিয়া যে গিরিপথ আছে, ইহা সীমান্ত বাণিজ্যের সহায়ক। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক হইতে জেলেপ লা ও নাথু লা গিরিপথে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত যাওয়া যায়। এই পথে তিব্বত হইতে পশম, লবণ, স্বর্ণ, কস্তুরী প্রভৃতি এদেশে আসিত এবং খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্রাদি, চিনি প্রভৃতি তিব্বতে যাইত। এই পথে পশমের বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা বেশী হইত বলিয়া ইহাকে 'পশমপথ' বলা হইত। উত্তর প্রদেশ হইতে নীতিপথে তিব্বত যাওয়া যায়। গাড়োয়াল হইতে এই গিরিপথ শুরু হইয়াছে। এই পথে পশমের বাণিজ্য হইয়া থাকে। শ্রীনগর

ও সোনমার্গ হইতে জোজিলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া লাডাকে যাওয়া যায়। লেহ হইতে কারাকোরাম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া সিকিয়াং পর্যন্ত যাওয়া যায়। ভামোর মধ্য দিয়া চীন ও ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য চলে। পাকিস্তানের মধ্য দিয়া ঐ দেশের খাইবার, কুরুম-গোমাল ও বোলান গিরিপথে আফগানিস্তান ও ইরানের সহিত বাণিজ্য চলে। এই সকল পথে চাউল, ঘি, কাঁচা পশম, হিং, সোহাগা প্রভৃতি দ্রব্য আমদানি হয় এবং বস্ত্রাদি, লবণ, চিনি ও ধাতুদ্রব্য রপ্তানি হয়। স্থলপথে ও জলপথে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতি বৎসর অনেক টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Analyse the basic structure of India's foreign trade. Examine its recent trend. (H.S. Examination, 1984)

(ভারতের বহির্বাণিজ্যের মূল কাঠামো বিশ্লেষণ কর। ইহার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা কর।)

উঃ। 'ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি' (২২৫—২২৬ পৃঃ) লিখ।

2. Attempt a brief review of India's foreign trade in recent years with special emphasis of its composition and direction.

[B. U. B. Com. 1970]

(গঠন ও গতির উপর বিশেষ জোর দিয়া সাম্প্রতিককালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা কর।)

উঃ। 'ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি' (২২৫-২২৬ পৃঃ) ও 'বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন' (২২৬-২২৯ পৃঃ) লিখ।

3. Give an account of the foreign trade of India. Do you want the reconstruction of India's foreign trade? If so, in what directions? [Specimen Question, 1978]

(ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিবরণ দাও। তুমি কি ভারতের বহির্বাণিজ্যের পুনর্গঠন চাও? যদি চাও, তবে কিভাবে উহা পুনর্গঠিত করিবে?)

উঃ। 'আমদানি' (২২৯-২৩১ পৃঃ) 'রপ্তানি' (২৩১-২৩৩ পৃঃ) এবং 'বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন' (২২৬-২২৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

4. Give a critical account of the recent trend of India's foreign trade. Do you suggest any measure of its improvement?

[H. S. Examination 1982]

(ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা কর। এই বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তুমি কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে কর?)

উঃ। 'ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি' (২২৫-২২৬ পৃঃ) ও 'বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন' (২২৬-২২৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

5. Discuss the main features of India's foreign trade under the following heads : (a) Volume and balance of trade ; (b) Items of import and export ; (c) Countries with which foreign trade is conducted. [H. S. Examination, 1980]

[নিম্নলিখিত শিরোনামা অবলম্বনে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর : (ক) বাণিজ্যের পরিমাণ ও উদ্বৃত্ত ; (খ) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসমূহ ; (গ) যে দেশগুলির সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়।]

উঃ। 'আমদানি' (২২৯-২৩১ পৃঃ), 'রপ্তানি' (২৩১-২৩৩ পৃঃ) এবং 'প্রধান প্রধান দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য' (২৩৩-২৩৫ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

6. Explain why is India changing her outlook and policy in regard to her foreign trade. [B. S. E. Higher Secondary, 1960]

(ভারত তাহার বহির্বাণিজ্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি পরিবর্তন করিতেছে কেন তাহা বুঝাইয়া লিখ।)

উঃ। 'বৈদেশিক বাণিজ্যের ধরনের পরিবর্তন' (২২৪-২২৫ পৃঃ) লিখ।

7. State principal imports of India indicating their sources and the chief exports of India indicating their destinations.

[C. U. Inter. 1951, '53, '54]

(ভারতের প্রধান প্রধান আমদানি-দ্রব্য ও তাহাদের প্রেরকগণের নাম এবং প্রধান প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য ও তাহাদের গন্তব্যস্থল বর্ণনা কর।)

উঃ। 'আমদানি' (২২৯-২৩১ পৃঃ) ও 'রপ্তানি' (২৩১-২৩৩ পৃঃ) লিখ।

8. Give a picture of India's foreign trade with particular reference to the markets for India's exports and the possibility of securing new markets for Indian goods. [C. U. B. Com. 1965]

(ভারতের বর্তমান রপ্তানি বাজার এবং নূতন রপ্তানি-বাজার সংগ্রহের সম্ভাবনা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এক ছবি তুলিয়া ধর।)

উঃ। 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (২২৪-২৩৬ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

9. Give an account of the volume, composition and direction of the Foreign Trade of India and analyse its recent trend.

[C. U. B. Com. 1960 ; B. U. B. Com. Hons. 1962]

(ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন ও গতির বিবরণ দাও এবং ইহার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি বর্ণনা কর।)

উঃ। 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (২২৪-২৩৬ পৃঃ) অবলম্বনে সংক্ষেপে লিখ।

10. Discuss the future of India's foreign trade indicating the main items of export and import. [B. U. B. Com. 1960]

(প্রধান প্রধান :রপ্তানি-দ্রব্য ও আমদানি-দ্রব্য নির্দেশপূর্বক ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা কর।)

উঃ। 'বৈদেশিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি' (২২৫-২২৬ পৃঃ) ও 'বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন' (২২৬-২২৯ পৃঃ) হইতে লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes explaining the following statements :

(a) India is situated almost in the middle of the world.

(b) After independence there has been vital changes in the trend of foreign trade of India.

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি ব্যাখ্যামূলক সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ

(ক) ভারত প্রায় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

(খ) স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।]

উঃ। 'বৈদেশিক বাণিজ্যের ধরনের পরিবর্তন' (২২৪-২২৫ পৃঃ) ও 'ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি' ২২৫-২২৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Construct correct answers from the following statements :

(a) After independence the volume of India's foreign trade is gradually increasing/decreasing.

(b) Calcutta exports huge quantities of Jute goods/petroleum, while Bombay exports cotton textiles/motor car.

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে সঠিক উত্তর দাও ঃ

(ক) স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে/হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে।

(খ) যেখানে কলিকাতা হইতে প্রচুর পরিমাণে পাটজাত দ্রব্য/পেট্রোলিয়াম রপ্তানি হয় সেখানে বোম্বাই হইতে রপ্তানি হয় কার্পাসজাত বস্ত্র/মোটরগাড়ি।

———

দশম অধ্যায়

লোকবসতি

(Distribution of Population)

লোকসংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ; চীনের পরেই ভারতের স্থান। লোকবসতির উপর দেশের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। ভারতে মনুষ্য-সম্পদের অভাব না থাকায় কৃষিকার্যে, শিল্পে ও খনিজ সম্পদ আহরণে শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই দেশের লোকসংখ্যা ৬৮,৩৮,১০,০৫১। মোট আয়তন ৩২,৮০,৪৮৩ বর্গ-কিলোমিটার ; সুতরাং প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে এই দেশের লোকসংখ্যা ২২১ জন। কাগজ-পত্রে এই দেশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২২১ জন লোক বাস করিলেও কার্যকরী জমির অনুপাতে লোকবসতির ঘনত্ব আরও অনেক বেশী। কারণ, ভারতের বহুস্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য। যে সকল অঞ্চলে কৃষিজাত, খনিজ ও শিল্পজাত উৎপাদনের পরিমাণ বেশী, সেখানে বসতি-ঘনত্বও বেশী। যে সকল স্থানে জমির উৎপাদিকাশক্তি অধিক, যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কৃষিকার্যের উপযোগী, যে সকল স্থানে ভূগর্ভ হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা যায়, সেখানেই ঘনবসতি অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১ সালে এই দেশের লোকসংখ্যা ছিল ৩৬·১০ কোটি, ১৯৭১ সালে ছিল প্রায় ৫৫ কোটি এবং ১৯৮১ সালে বৃদ্ধি পাইয়া লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬৮·৩৮ কোটি। এই হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ২০০০ সালে ভারতের লোকসংখ্যা হইবে ১০০ কোটি।

অনেক লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, ভারতের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু বর্তমান যুগে লোকবসতির আধিক্য শুধু সংখ্যা দিয়া বিচার করা হয় না। স্থানীয় সম্পদের কার্যকারিতা, স্থানীয় মানুষের সাংস্কৃতিক মান ও কর্মক্ষমতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মোট লোকসংখ্যার অনুপাত বিচার করিয়াই শুধু বলা যায় যে, কোনো দেশে অত্যধিক লোকবসতি বিদ্যমান কিনা। ভারতে যেভাবে অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, যেভাবে খনিজ সম্পদ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে, এই দেশে অত্যধিক লোকবসতি বিদ্যমান এই কথা বলা যায় না।

ভারতের রাজ্য-ভিত্তিক লোকবণ্টন

নিম্নে ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের লোকসংখ্যা দেওয়া হইল :

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	আয়তন বর্গ-কি.মি.	লোকসংখ্যা	প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতির ঘনত্ব
রাজ্য			
অন্ধ্র প্রদেশ	২,৭৬,৮১৪	৫ কোটি ৩৫ লক্ষ	১৯৫
আসাম	৭৮,৫২৩	১ কোটি ৯৯ লক্ষ	২৫৪
বিহার	১,৭৩,৮৭৬	৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ১৫ হাজার	৪০২
গুজরাট	১,৯৫,৯৮৪	৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৮৬ হাজার	১৭৪
হরিয়ানা	৪৪,২২২	১ কোটি ২৯ লক্ষ ২৩ হাজার	২৯২
হিমাচল প্রদেশ	৫৫,৬৭৩	৪২ লক্ষ ৮০ হাজার	৭৭
জম্মু ও কাশ্মীর	২,২২,২৩৬	৫৯ লক্ষ ৮৭ হাজার	৫৯
কর্ণাটক	১,৯১,৭৭৩	৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৬ হাজার	১৯৪
কেরালা	৩৮,৮৬৪	২ কোটি ৫৫ লক্ষ	৬৫৫
মধ্য প্রদেশ	৪,৪২,৮৪১	৫ কোটি ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার	১১৮
মহারাষ্ট্র	৩,০৭,৭৬২	৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৪ হাজার	২০৪
মণিপুর	২২,৩৫৬	১৪ লক্ষ ২১ হাজার	৬৪
মেঘালয়	২২,৪৮৯	১৩ লক্ষ ৩৬ হাজার	৬০
নাগাল্যান্ড	১৬,৫২৭	৭ লক্ষ ৭৫ হাজার	৪৭
ওড়িশা	১,৫৫,৭৮২	২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭০ হাজার	১৬৯
পাঞ্জাব	৫০,৩৬২	১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৯ হাজার	৩৩৩
রাজস্থান	৩,৪২,২১৪	৩ কোটি ৪৩ লক্ষ	১০০
সিকিম	৭,২৯৯	৩ লক্ষ ১৬ হাজার	৪৫
তামিলনাড়ু	১,৩০,০৬৯	৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮ হাজার	৩৭২
ত্রিপুরা	১০,৪৭৭	২০ লক্ষ ৫৩ হাজার	১৯৬
উত্তর প্রদেশ	২,৯৪,৪১৩	১১ কোটি ৮ লক্ষ ৬২ হাজার	৩৭৭
পশ্চিমবঙ্গ	৮৭,৮০৩	৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮১ হাজার	৬১৫
কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল			
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৮,২৯৩	১ লক্ষ ৮৮ হাজার	২৩
অরুণাচল প্রদেশ	৮৩,৫৭৮	৬ লক্ষ ৩২ হাজার	৮
চণ্ডীগড়	১১৪	৪ লক্ষ ৫২ হাজার	৩,৯৬১
দাদরা ও নগরহাভেলি	৪৯১	১ লক্ষ ৩ হাজার	২১১
দিল্লী	১,৪৮৫	৬২ লক্ষ ২০ হাজার	৪,১৪৬
গোয়া, দমন, দিউ	৩,৮১৩	১০ লক্ষ ৮৭ হাজার	২৮৫
লাক্ষাদ্বীপ	৩২	৪০ হাজার	১,২৫৮
মিজোরাম	২১,০৮৭	৪ লক্ষ ৯৪ হাজার	২৩
পণ্ডিচেরী	৪৮০	৬ লক্ষ ৪ হাজার	১,২২৯

লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ (Factors for density and distribution of population)—উপরের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইবে ভারতে লোকবসতি-ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। কেরালায় প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৬৫৫ জন লোক বাস করিলেও অরুণাচল প্রদেশে বাস করে মাত্র ৮ জন। বিভিন্ন কারণে বসতি-ঘনত্বের এই তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) **জলবায়ু**—মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবায়ুর প্রভাব অত্যন্ত বেশী বলিয়া অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব অধিক হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্য বিদ্যমান। রাজস্থানের বৃষ্টিহীন মরু অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যগুলির অত্যধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত স্যাঁৎসেঁতে অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল, গাঙ্গেয় উপত্যকার পরিমিত বৃষ্টিপাতযুক্ত কৃষি-অঞ্চল সবই এই দেশে বিদ্যমান। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা ৬০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ; সেইজন্য যেখানেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কৃষিকার্যের উপযোগী সেইখানেই ঘনবসতি পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য ভারতের বৃষ্টিপাতের মানচিত্রের সঙ্গে লোকবসতির মানচিত্রের প্রভূত সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পরিমিত ও নিশ্চিত বৃষ্টিপাতের অভাব না থাকায় অধিক লোকবসতি দেখিতে পাওয়া যায় কেরালা, তামিলনাড়ু ও গাঙ্গেয় উপত্যকার রাজ্যসমূহে। অন্যদিকে রাজস্থানে বৃষ্টিপাতের অভাবে বসতিঘনত্ব খুবই কম। বর্তমানে জলসেচের উন্নতি হওয়ায় পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে লোকবসতির ঘনত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(খ) **ভূ-প্রকৃতি**—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমতলভূমি মানুষের বসবাসের উপযুক্ত স্থান। পার্বত্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন প্রায় অসম্ভব বলিয়া এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। এইজন্য হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, মধ্য প্রদেশের বিন্ধ্যাচলে এবং অরুণাচল প্রদেশে লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। অন্যদিকে সমতলভূমিতে কৃষিকার্যের, শিল্পের ও যানবাহনের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য বলিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমিতে (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ), মহানদী উপত্যকার সমতল ভূমিতে (ওড়িশা), শতদ্রু উপত্যকার সমতলভূমিতে (পাঞ্জাব) এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমভূমিতে (আসাম) ঘন লোকবসতি বিদ্যমান। এই সকল নদী উপত্যকায় উর্বর জমি থাকায় কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ করা কঠিন, কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করা কষ্টকর এবং এখানকার নদীসমূহ খরস্রোতা বলিয়া নৌ-চলাচলের অনুপযোগী। এইজন্য পার্বত্য অঞ্চলে (অরুণাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি) বিরল বা নাতি-নিবিড় লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

(গ) **মৃত্তিকা**—উর্বর মৃত্তিকা কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী ; সেইজন্য ভারতের উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, তামিলনাড়ু, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে ঘন লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) **প্রাকৃতিক সম্পদ**—প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করে। খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই

সকল সম্পদ-উৎপাদনকারী অঞ্চলে শিল্পের উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের বিহার, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর খনিজ ও বনজ সম্পদ পাওয়া যায় বলিয়া বহু শিল্প এই সকল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাগজ শিল্প, যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্প, রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প অধিকাংশই ভারতের এই চারিটি রাজ্যে অবস্থিত। শিল্পোন্নয়নের ফলে স্বভাবতঃই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে লোকবসতি-ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঙ) **সাংস্কৃতিক উন্নতি**—প্রাচীনকালে ভারত সভ্যতার প্রধান বাহক হিসাবে জগতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা প্রবর্তনের পূর্বেও যে এই দেশে ঘন-লোকবসতি বিদ্যমান ছিল তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা অন্যতম। আধুনিক যুগে ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত না হওয়ায় সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে ভারতে পুনরায় বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা প্রভৃতির চর্চা পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নে সাহায্য হইয়াছে, অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হইয়াছে এবং ফলে লোকবসতিও বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে নূতন নূতন অঞ্চল সমৃদ্ধিলাভ করিতেছে এবং এই সকল অঞ্চলের বসতি-ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাকরা, মাইথন ও পাঞ্চেৎ অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের পূর্বে অতি অল্পসংখ্যক লোক বাস করিত। এখন এই সকল স্থানের লোকসংখ্যা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্যে মরুভূমিকে শস্য-শ্যামলা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার পর রাজস্থানের সুরতগড়ের লোকবসতি-ঘনত্ব শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের লোকবসতি-বণ্টন (Distribution of population in India in the light of Geographical resources)—কোনো স্থানের লোকবসতির ঘনত্ব নির্ভর করে সেই স্থানের ভৌগোলিক সম্পদের প্রাচুর্যের উপর। যেখানে ভৌগোলিক সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য মানুষের পক্ষে সহজে জীবিকা অর্জন করা সম্ভব, স্বভাবতঃই সেখানে ঘন লোকবসতি লক্ষ্য করা যাইবে। ভৌগোলিক সম্পদ বলিতে অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, জলবায়ু, কৃষিজাত, বনজ ও খনিজ সম্পদ প্রভৃতিকে বুঝায়। যেখানে এই সকল সম্পদের প্রাচুর্য বিদ্যমান, সেখানেই ঘনবসতি লক্ষ্য করা যাইবে। ভৌগোলিক সম্পদের বণ্টনের ভিত্তিতে ভারতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন প্রকার **বসতি অঞ্চল (Density Zones)** গড়িয়া উঠিয়াছে: (১) নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল, (২) নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল এবং (৩) বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল।

(১) **নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল**: গাঙ্গেয় উপত্যকা, পাঞ্জাব সমভূমি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, মালাবার, কঙ্কণ ও ওড়িশার উপকূলভূমি এবং তামিলনাড়ুর উত্তরাংশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২০০ জনের বেশী লোক বাস করে। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর

প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, আসাম, লাক্ষাদ্বীপ, গোয়া-দমন-দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলী এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহা ছাড়া চণ্ডীগড়, দিল্লী ও পণ্ডিচেরী—এই তিনটি কেন্দ্রশাসিত শহরেও লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২০০ হইতে অনেক বেশী। এই অঞ্চলের সকল স্থানে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কোনো কোনো স্থানে জলসেচের ব্যবস্থা

বিদ্যমান। গাঙ্গেয় উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান **সমতলভূমি**। এইজন্য এখানে কৃষিকার্যের খুবই উন্নতি হইয়াছে। ধান, গম, পাট, ইক্ষু, চা প্রভৃতি শস্য এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গাঙ্গেয় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নদীর মারফত পরিবহণের সুবিধা আছে। তাহা ছাড়া এখানে শিল্পবাণিজ্য ও যানবাহনের উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি ঘন হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকার বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। কঙ্কণ উপকূলের বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর এবং বিহারের জামসেদপুর অঞ্চলে শিল্পোন্নতির জন্য লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দরে ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য লোকবসতি অত্যন্ত ঘন।

(২) **নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল**—গুজরাটের পূর্বাংশ, ওড়িশার পশ্চিমাংশ, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কিয়দংশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্যগুলির

কিয়দংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১২৫-২০০ জন। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে উর্বর মৃত্তিকা থাকায় কৃষিকার্য করা হয়। এই অঞ্চলে গম, তুলা, ইক্ষু, চা, ভুট্টা, চীনাবাদাম, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের স্থানসমূহ শিল্পাঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত। মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া যানবাহনের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কোনো কোনো স্থানে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন জলসেচের উপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো অঞ্চলে (কর্ণাটক, ত্রিপুরা) বনভূমি বিদ্যমান। খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা শিল্পের উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। এই সকল কারণে এই অঞ্চলে নাতিনিবিড় লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। অন্ধ্র প্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, ওড়িশা ও ত্রিপুরা রাজ্য এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল**—রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, ছোটনাগপুরের বনভূমি অঞ্চল, মধ্য প্রদেশের বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্যসমূহের অধিকাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য এখানে কৃষিকার্য ও পরিবহণের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। কাশ্মীরের ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর হওয়ায় এই রাজ্যের বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত কম। কোনো কোনো স্থানে নিবিড় অরণ্য বিদ্যমান। উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্যগুলির অধিকাংশ স্থান অরণ্যে পরিবৃত। এখানকার ভূপ্রকৃতিও অসমতল। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন এই সকল রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অস্বাস্থ্যকর। রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম; সেইজন্য কৃষিকার্যের অসুবিধা হয়। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের স্থানসমূহে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে গড়ে ১২৫ জনের কম লোক বাস করে। হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্য প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই বসতি-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে দেখা যায় ভৌগোলিক সম্পদের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের লোকবসতি বিদ্যমান।

প্রশ্নাবলী

A. Essay-Type Questions

1. Account for the distribution of population in India.

[Specimen Question. 1978]

(ভারতের জনসংখ্যা-বণ্টনের কারণসমূহ আলোচনা কর।)

উঃ। 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ (২৪১—২৪২ পৃঃ) লিখ।

2. Account for the uneven distribution of population in India.

[Tripura H. S. Examination, 1982]

(ভারতের জনসংখ্যার অসমান বণ্টনের কারণসমূহ আলোচনা কর।)

উঃ। 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (২৪১—২৪২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Give an account of the distribution of population in India. Why certain parts of the country have very high density of population while certain have low density ?

[B. S. E. Higher Secondary, 1965]

(ভারতের লোকবসতি-বণ্টনের বিবরণ দাও। দেশের কয়েকটি অংশে অত্যন্ত ঘন লোকবসতি এবং অন্য কয়েকটি অঞ্চলে বিরল লোকবসতির কারণ কি ?)

উঃ। 'ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের লোকবসতি বণ্টন' (২৪২—২৪৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

4. Explain critically the distribution of population in India in the light of geographical resources. [C. U. B. Com. 1968 ; 1972]

(ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের লোকবসতির বণ্টন, বিশ্লেষণ-পূর্বক ব্যাখ্যা কর।)

উঃ। 'ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের লোকবসতি-বণ্টন' (২৪২—২৪৪ পৃঃ) লিখ।

5. Which parts of India are thickly populated ? State the causes for such population concentration.

[H. S. Examination, 1978]

(ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে জনবসতি ঘন ? এই সকল অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্বের কারণগুলি বর্ণনা কর।)

উঃ। 'ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের লোকবসতি-বণ্টন' (২৪২—২৪৪ পৃঃ) এবং 'লোকবসতি ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (২৪১—২৪২ পৃঃ) হইতে লিখ।

6. Divide India on the basis of the density of population. Account for the uneven distribution of population of India.

[H. S. Examination, 1981]

(জনবসতির ঘনত্বের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ কর। ভারতের অসম জনবসতি-বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর।)

উঃ। 'ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের লোকবসতি-বণ্টন' (২৪২—২৪৪ পৃঃ) এবং 'লোকবসতি ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (২৪১—২৪২ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. Examine the pattern of population distribution in India. How far has this distribution been affected by economic factors ?

[H. S. Examination, 1983]

(ভারতের জনবসতি বিভাজনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ এই বসতি বিভাজনের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ?)

উঃ। 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (২৪১—২৪২ পৃঃ) এবং 'ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের লোকবসতি-বণ্টন' (২৪২—২৪৪ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।)

8. Account for the uneven distribution of population in India. Is India over-populated ? [H.S. Examination, 1982]

(ভারতের লোকবসতির অসম বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর। এই দেশ কি প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ ?)

উঃ। 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (২৪১—২৪২ পৃঃ) এবং ২৩৯ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদ (অনেক লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ···যায় না।) লিখ।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write short notes on : (a) Moderately Populated Regions of India ; (b) Sparsely Populated Regions of India.

[টীকা লিখ : (ক) ভারতের নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল ; (খ) ভারতের বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল ।]

উঃ। (ক) 'নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল' (২৪৩—২৪৪ পৃঃ) এবং (খ) 'বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল' (২৪৪ পৃঃ) হইতে সংক্ষেপে লিখ।

2. Explain the following facts about population in the Indian Union.

(a) The low average density in Rajasthan.
(b) The high average density in the Gangetic valley.

[**B. S. E. Higher Secondary, 1960**]

[ভারতের লোকবসতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাসমূহ বুঝাইয়া লিখ :—

(ক) রাজস্থানের গড় লোকবসতি বিরল, (খ) গাঙ্গেয় উপত্যকায় গড় লোকবসতি নিবিড় ।]

উঃ। 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (২৪১—২৪২ পৃঃ) এবং 'ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের লোকবসতি-বণ্টন' (২৪২—২৪৪ পৃষ্ঠা) হইতে লিখ।

C. Objective Questions

1. Write the correct answers from the following statements :—

(a) Population density is the least in Gangetic Valley/Arunachal Pradesh.

(b) West Bengal/Kashmir has high density of population.

(c) India is the most populous/least populous/second populous country in the world. [**H. S. Examination, 1983**]

[নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখ :—

(ক) গাঙ্গেয় উপত্যকায়/অরুণাচল প্রদেশে লোকবসতি-ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা কম।

(খ) পশ্চিমবঙ্গের/কাশ্মীরের লোকবসতি-ঘনত্ব বেশী।

(গ) পৃথিবীর মধ্যে ভারত সর্বাপেক্ষা অধিক জনবসতিপূর্ণ/জনবসতিবিরল/দ্বিতীয় বৃহত্তম জনাকীর্ণ দেশ।]

2. Fill up the blanks :

The population of India is inordinately —. In 1951 this country had a population of — crores ; in 1971 almost — crores and the population rose to — crores in 1981.

(শূন্যস্থান পূর্ণ কর : ভারতে লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে — । ১৯৫১ সালে এই দেশের লোকসংখ্যা ছিল — কোটি ; ১৯৭১ সালে প্রায় — কোটি এবং ১৯৮১ সালে বৃদ্ধি পাইয়া লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে — কোটি ।)

একাদশ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ

(West Bengal)

দেশবিভাগ হওয়ার ফলে বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হয়—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গ। দুইটি অঞ্চলের ভাষা এক, ভৌগোলিক পরিবেশ এক, মানুষের রীতিনীতি সকলই একপ্রকার; উভয় অঞ্চলে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পূর্ববঙ্গের পাটের উপর পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প নির্ভরশীল, পশ্চিমবঙ্গের কয়লার উপর পূর্ব-বঙ্গ নির্ভরশীল। পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া নদীপথে আসামের পাট ও চা পশ্চিমবঙ্গে আসিত এবং কলিকাতা বন্দরের মারফত পূর্ববঙ্গের পাট বিদেশে রপ্তানি হইত। বঙ্গদেশের এই দুইটি অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উভয়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে সিকিম রাজ্য ও ভুটান, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ওড়িশা, বিহার ও নেপাল।

১৯৫৬ সালে রাজ্য **পুনর্গঠন কমিশনের** সুপারিশ অনুসারে বিহারের পুরুলিয়া জেলার সম্পূর্ণ অংশ এবং পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার ফলে দক্ষিণবঙ্গের সহিত উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৬টি জেলা লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গঠিত; যথা—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলিকাতা, ২৪ পরগনা, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ। আয়তনের তুলনায় এই রাজ্যে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন—প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৬১৫ জন। বসতি-ঘনত্বে কেরালার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান।

ভূ-প্রকৃতি—পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ নহে। ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে এই রাজ্যকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) **হিমালয়ের পার্বত্য-ভূমি**—দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এখানে দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের চায়ের বাগানসমূহ অবস্থিত। (২) **উত্তরবঙ্গ**—কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলা এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা ও জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া ইহা গঠিত। পলিমাটি থাকায় এই অঞ্চলের মৃত্তিকায় ধান ভালো জন্মে। (৩) **গাঙ্গেয় উপত্যকা**—ভাগীরথী নদীর দুই পার্শ্বে পলিমাটি গঠিত সমতলভূমি অবস্থিত। মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনার উত্তরাংশ, নদীয়া, বর্ধমানের পূর্বাংশ, হুগলী ও হাওড়া জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল ধান ও পাটের জন্য বিখ্যাত। ভাগীরথী নদী মজিয়া যাইতেছে বলিয়া এই অঞ্চলের নৌ-চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে। (৪) **পশ্চিমের উচ্চভূমি**—পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে অবস্থিত বর্ধমানের পশ্চিমাংশ, মেদিনীপুরের অধিকাংশ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা লইয়া এই অঞ্চল

গঠিত। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয়, ময়ূরাক্ষী, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা প্রভৃতি নদ-নদী ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল হইতে পশ্চিমবঙ্গের সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িতেছে। এই অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়।
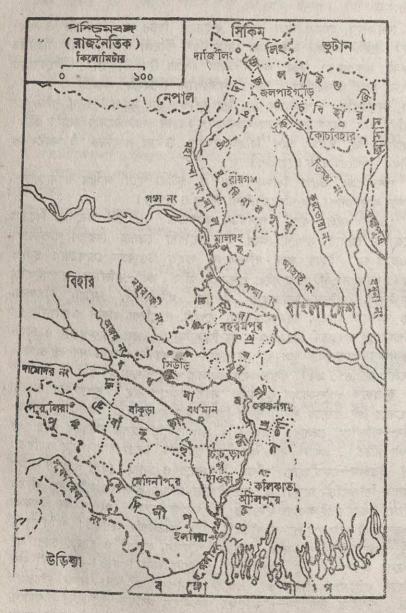
(৫) **দক্ষিণের উপকূলভূমি**—বঙ্গোপসাগরের তীরে ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর

জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এখানকার ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনে বিশেষ মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। এই নিম্নভূমি জঙ্গলাকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। মেদিনীপুর জেলার উপকূলভাগে বেলাভূমির স্থানে স্থানে বালিয়াড়ি ও জলাভূমি দেখা যায়।

নদ-নদী—পশ্চিমবঙ্গ নদীবহুল রাজ্য। ইহার অধিকাংশ নদী মজিয়া যাইতেছে। ইহাতে কৃষিকার্যের ও নৌ-চলাচলের অসুবিধা হইতেছে। পরিবহণের জন্য রেলপথের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। নদীসমূহের পঙ্কোদ্ধারের বন্দোবস্ত করিয়া নদীর স্রোতের বেগ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া তিস্তা ও ইহার শাখানদীসমূহ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়া বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদী **ভাগীরথী-হুগলী**। ইহারা গঙ্গার শাখানদী। ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া অজয়, রূপনারায়ণ, দামোদর, কাঁসাই ও ময়ূরাক্ষী এবং পদ্মানদীর শাখা জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। মাতলা, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, হুগলী, ইছামতী, পিয়ালী, বিদ্যাধরী ও গোসাবা বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। গঙ্গার মূলস্রোত পদ্মার উপনদী মহানন্দার তীরে মালদহ শহর অবস্থিত। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী নদীর জলস্রোত হইতে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও বীরভূম জেলায় সেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

জলবায়ু—এই রাজ্যে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উত্তরবঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশী (৩৩০ সেঃ মিঃ) এবং এই রাজ্যের পশ্চিমাংশে সর্বাপেক্ষা কম (১৪০ সেঃ মিঃ) বৃষ্টিপাত হয়। অন্যান্য স্থানে গড়ে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

সমতলভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্মের উষ্ণতা ২৬° হইতে ৪০° সেন্টিগ্রেড; কিন্তু শীতকালের উষ্ণতা ১৩° হইতে ১৯° সেন্টিগ্রেড।

কৃষিকার্য ও কৃষিজাত সম্পদ

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোকের (৫৭ই%) কৃষিকার্য প্রধান উপজীবিকা। এখানকার বৃষ্টিপাত, উত্তাপ ও মৃত্তিকা কৃষিকার্যের উপযোগী। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই সময় অধিকাংশ কৃষিকার্য (খারিফ শস্য) হইয়া থাকে। এই রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে বৃষ্টিপাতের আধিক্য দেখা যায়; এই সকল স্থানের নদীসমূহে বন্যার আশঙ্কা থাকে। কোনো কোনো স্থানে বৃষ্টিপাতের অভাব দেখা যায়। সেইজন্য দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া জলসেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী না হইলেও জলসেচের মাধ্যমে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অদ্যাবধি কৃষিযোগ্য মোট জমির ৩০ শতাংশে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মে। ইহা ছাড়া গম, ভুট্টা, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি খাদ্যশস্য জন্মে। অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, চা, পান ও আলু উল্লেখযোগ্য। তৈলবীজ, তামাক ও আখ কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রকার

খাদ্যশস্যের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ৭০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও উপরে। এখানে ৯০ হাজার মেট্রিক টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। পাট ও চা রপ্তানি করিয়া প্রতি বৎসর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অগ্রগণ্য।
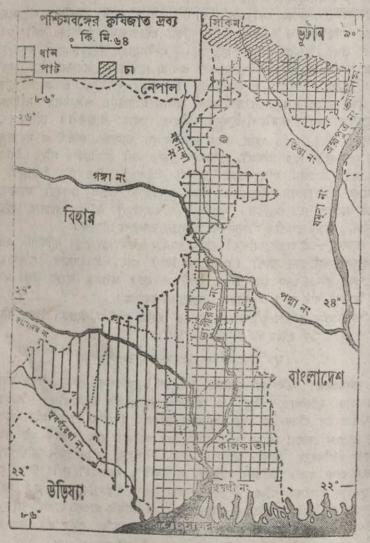
ধান—ধানচাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ১০০ সেন্টিমিটার হইতে ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ধানচাষের উপযোগী। ইহার জন্য ১৬° হইতে ২৭° সেন্টিগ্রেডের মত তাপ প্রয়োজন। ধানগাছ জন্মাইবার প্রথম অবস্থায় প্রচুর বৃষ্টিপাত

ও প্লাবন হওয়া দরকার। জমিতে কিছু জল না দাঁড়াইলে ধানের চাষ ভাল হয় না। যে পলিমাটি-গঠিত সমতলভূমি বর্ষাকালে প্লাবিত হইয়া যায়, তাহা ধান-চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি ধানচাষের অনুকূল। মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এবং এখানকার অধিকাংশ অঞ্চলের ভূভাগ গাঙ্গেয় পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ ধানচাষের খুব উপযুক্ত স্থান। পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদযোগ্য জমির ৭০ শতাংশে ধানচাষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ আমন, আউশ ও বোরো—এই তিন প্রকারের ধান জন্মিয়া থাকে। আমন ধান বর্ষা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোপণ করা হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমন ধান কাটা হয়। আমন ধানই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল। আউশ ধান বৈশাখ মাসে কালবৈশাখীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বপন করা হয় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কাটা হয়। বোরো ধান জলাভূমিতে জন্মে। যে সকল স্থান বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায় ও অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে জল প্রায় শুকাইয়া যায় এবং মাটি খুব নরম ও ভিজা থাকে, সেই সকল স্থানে বোরো ধান বপন বা রোপণ করা হয়। এই ধান চৈত্র মাসে পাকে।

যদিও ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শস্য, কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় হেক্টর-প্রতি ধানের ফলন আমাদের দেশে অনেক কম। বর্তমানে নানারকমের সার ও বীজ সরবরাহ করিয়া এবং চাষীদের নূতন পদ্ধতিতে চাষ শিখাইয়া ধানের ফলন বৃদ্ধি করা হইতেছে। ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় ধান বেশী জন্মে। পশ্চিম দিনাজপুরের ধান উৎকৃষ্ট। এই রাজ্যে ১৯৮২ সনে ৫৮·৩৩ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি ধান জন্মিয়াছে।

পাট—পাট চাষের জন্য প্রায় ২৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ এবং ১৫০ সেন্টিমিটার হইতে ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। মাটির সারাংশ পাটগাছের পুষ্টির জন্য নিঃশেষিত হইয়া যায়। সেইজন্য যেখানে প্রতি বৎসরই নূতন পলিমাটি পড়ে, সেখানে পাটচাষ ভাল হয়। **গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী ভূমিই** পৃথিবীতে পাট উৎপাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। পাট গাছ সাধারণতঃ ১½ মিটার হইতে ৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৪২·৭৩ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত মোট পাটের ৮০ শতাংশ মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মালদহ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও হুগলী জেলায় উৎপন্ন হয়। বর্তমানে হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, বর্ধমান—সর্বত্র পাটচাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় পাটচাষ সর্বাপেক্ষা কম। ভারতে উৎপন্ন পাটের ৬০% এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। পাটকল মালিকগণের শোষণে পাটচাষীরা বঞ্চিত। তাহারা পাটের ন্যায্য মূল্য পায় না বলিয়া তাহাদের পাটচাষের উৎসাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে।

পাটের পরিবর্ত সামগ্রীর মধ্যে মেস্তা উল্লেখযোগ্য। যে সকল অঞ্চলে পাট জন্মে সেখানেই নিকৃষ্ট জমিতে মেস্তার চাষ হয়। পশ্চিম দিনাজপুর, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় মেস্তার চাষ হয়।

চা—একপ্রকার ছোট ছোট চিরহরিৎ গাছের শুষ্ক পত্রের নাম চা। পর্বতের ঢালু অংশে যেখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী অথচ জল দাঁড়াইতে পারে না এবং উত্তাপ মাঝামাঝি সেখানে চা ভাল জন্মে। এই অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তের জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ১০৫টি ও দার্জিলিং জেলায় ১২৩টি চা-বাগান দেখা যায়। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১,২৯,৮০৮ হাজার কিলোগ্রাম চা উৎপন্ন হইয়াছে।

চা-চাষের জন্য এবং গাছ হইতে পাতা তুলিবার জন্য প্রচুর শ্রমিকের দরকার। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে বহু শ্রমিক আসিয়া জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর চা-বাগানে কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ভারতে উৎপন্ন চা-এর ২৫% উৎপন্ন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ চা-উৎপাদনে ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দার্জিলিং-এর চা স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ডাল—পশ্চিমবঙ্গে মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই, মটর, খেসারী, অড়হর প্রভৃতি বিভিন্ন রকম ডাল উৎপন্ন হয়। খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরেই ডালের স্থান। ডাল রবিশস্য। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলেই ডাল ভাল জন্মে। নদীয়া, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ডালের চাষ বেশী হয়। অন্যান্য জেলাগুলিতেও ডালের চাষ হয় এবং কিছু কিছু ডাল উৎপন্ন হয়। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেঃ টন ডাল উৎপন্ন হইয়াছে।

তৈলবীজ—এই রাজ্যে সরিষা, তিল, তিসি ও চীনাবাদাম প্রভৃতি তৈলবীজের চাষ হয়। ১৯৮২ সনে প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার মেঃ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ রবিশস্য বলিয়া শীতকালে চাষ হয়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বাঁকুড়া জেলায় অধিক পরিমাণে তৈলবীজের চাষ হয়। নারিকেল হইতেও তৈল উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের উপকূলবর্তী লবণাক্ত মাটিতে নারিকেল বেশী উৎপন্ন হয়। ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় অধিক নারিকেল জন্মে।

ইক্ষু—নদী-গঠিত সমতলভূমিতে দো-আঁশ মাটিতে ইক্ষু ভাল জন্মে। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই ইক্ষু চাষ হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় গঙ্গার নিকটবর্তী পলিময় অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় ইক্ষুচাষ সুবিধাজনক। পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি এবং বাঁকুড়া জেলায়ও কিছু কিছু ইক্ষু উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় ১½ লক্ষ মেঃ টন ইক্ষুর গুড় উৎপন্ন হয়।

গম—গম চাষের জন্য কমপক্ষে ১৪° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ ও ৫০-১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত দরকার। চাষের প্রথম অবস্থায় ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন ; কিন্তু গম পাকিবার সময় শুষ্ক জলবায়ু ও সূর্যের তাপ দরকার। এই রাজ্যে শীতকালে কোনো কোনো স্থানে গমচাষ হয়। গমের চাষ প্রতি বৎসর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বাঁকুড়া জেলায় গম উৎপন্ন হয়। ১৯৮২ সালে এখানে প্রায় ৪ লক্ষ মেঃ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে গম উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল স্থানে গমের চাষ হয় সেই সকল স্থানে যবের চাষও হইয়া থাকে।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় তামাক উৎপন্ন হয়। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার তিস্তা ও তোর্সা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকের চাষ হয়।

বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯ লক্ষ ৮৫ হাজার মেঃ টন আলু উৎপন্ন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হইয়া থাকে সেই সকল অঞ্চলে ভুট্টার চাষ হয়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় এবং সুন্দরবন অঞ্চলে কার্পাসের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পান জন্মে। মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশে, বাঁকুড়া, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলী জেলায় এই অর্থকরী ফসলের চাষ হয়। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উৎকৃষ্ট আম জন্মে। দার্জিলিং জেলার কমলালেবু প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতেই কলা জন্মে। হুগলী জেলা কলা চাষের জন্য বিখ্যাত। দার্জিলিং জেলার মংপুতে সিঙ্কোনা চাষ হয়। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় তুঁত গাছের চাষ হয়। এই গাছের পাতা রেশম-কীটের প্রিয় খাদ্য। ইহাদের গুটি হইতে রেশম তৈয়ারি হয়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় কুল, পলাশ ও কুসুম গাছে লাক্ষা কীট প্রতিপালিত হয়।

খনিজ সম্পদ

খনিজ দ্রব্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সবচেয়ে বেশি খনিজ সম্পদ বিহারে পাওয়া যায়; তারপরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। ভারতে উৎপন্ন মোট খনিজ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ এই রাজ্য হইতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদের ৯৯ শতাংশ কয়লা। কয়লা ছাড়া ফায়ার ক্লে, চীনামাটি, চুনাপাথর, তামা, লোহা, উলফ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

কয়লা উৎপাদনে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। ভারতের উৎপাদিত কয়লার ৩০ শতাংশ এখানে পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে ২২৮টি কয়লা খনিতে কয়লা উত্তোলনের কাজ চলিতেছে। কয়লা খনির কাজে ১ লক্ষ ২২ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। এই খনি অঞ্চলে ১,৫৫০ বর্গ-কিলোমিটার স্থান ব্যাপিয়া কয়লা রহিয়াছে। এখানকার কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহা 'রানীগঞ্জের কয়লা' নামে খ্যাত। রানীগঞ্জের কয়লাই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের বুনিয়াদ। দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্পাঞ্চলে এবং কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে রানীগঞ্জের কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্জিলিং জেলাতেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ১০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে।

ফায়ার ক্লে উৎপাদনে বিহার ও মধ্য প্রদেশের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে ইহা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

চীনামাটি দিয়া কাপ, প্লেট প্রভৃতি বাসনপত্র তৈয়ারি হয়। ইহা ছাড়া বস্ত্র, কাগজ, রং ও রবার শিল্পেও ইহার প্রয়োজন হয়। বীরভূম জেলার মহম্মদ-বাজার ও বাঁকুড়া জেলার মেজিয়াতে প্রচুর পরিমাণে চীনামাটি পাওয়া যায়। পুরুলিয়া, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় ইহা অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় **চুনাপাথর** পাওয়া যায়। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় **তামার খনি** আছে। বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট ধরনের **লৌহ আকরিক** পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলায় ঝিলিমিলিতে **উলফ্রামের খনি** আছে। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলায় **ম্যাঙ্গানিজের খনি** আছে। জলপাইগুড়ি জেলার দুয়ার অঞ্চলে **ডলোমাইট** পাওয়া যায়।

শক্তিসম্পদ, শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত সম্পদ

শক্তিসম্পদ—কয়লা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শক্তিসম্পদ। কয়লা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনো খনিজ তৈল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস আবিষ্কৃত হয় নাই। এই রাজ্যে জলশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থাও উন্নতিলাভ করে নাই। সুতরাং শিল্প ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি মূলতঃ কয়লা পোড়াইয়াই উৎপন্ন করা হইতেছে। তাপবিদ্যুতের সামান্য অংশ ডিজেল তৈল ব্যবহার করিয়াও উৎপাদন করা হয়।

দামোদর ও ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি হইতে পশ্চিমবঙ্গে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। উত্তরবঙ্গের জলঢাকা, কার্শিয়াং ও বিজনবাড়িতে তিনটি অতি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র আছে।

তাপবিদ্যুৎই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎশক্তির প্রধান উৎস। উৎপাদনকেন্দ্রগুলির মধ্যে ডি. ভি. সি.-র দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেডের দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যান্ডেল ও সাঁওতালদি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাশিপুর ও মূলাজোড় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাছাড়া রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদহ (২টি), ইসলামপুর, শিলিগুড়ি, বীরপাড়া, চ্যাংড়াবান্ধা, হলদিবাড়ি, কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা, মালবাজার প্রভৃতি স্থানে ডিজেল চালিত তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বিদ্যমান। ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ৫৩০ মেগাওয়াট, সাঁওতালদি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৪৮০ মেগাওয়াট, দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ২৮০ মেগাওয়াট, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের চারিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৩৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। সব মিলাইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২,২৪০ মেগাওয়াট। ইহা ছাড়া ডি. ভি. সি.-র পশ্চিমবঙ্গ বহির্ভূত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হইতে আরও বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের চাহিদা পূর্ণ হয় না। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। প্রতিদিন একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। ফলে কলকারখানা বন্ধ হইয়া যায়, অফিস-আদালত অচল হইয়া পড়ে, সেচের পাম্প নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকে, আর গৃহস্থরা নিষ্প্রদীপ গৃহে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন।

বিদ্যুতের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট। সাঁওতালদি প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে, ব্যান্ডেলে আরও একটি (৫ম) ইউনিট চালু করা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণে, ২৪ পরগনার টিটাগড়ে ও মেদিনীপুরের কোলাঘাটে ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের ব্যবস্থা

হইয়াছে। ভারত সরকার ফারাক্কায় একটি সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন স্থাপনের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১ সালে মাত্র ৩৮৬টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল; ১৯৮০ সালে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২,৮৬৩টিতে দাঁড়াইয়াছে। এখন ২৬,০৮২টি জলসেচ পাম্প বিদ্যুতের সাহায্যে চালান হইতেছে।

শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত সম্পদ—পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান রাজ্য। বিভিন্ন বৃহদাকার শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতের শিল্পপ্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল অগ্রগণ্য। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়কার শিল্পের ভিত্তি ছিল চট, সুতিবস্ত্র, চা, ইস্পাত, কয়লা ও পূর্তশিল্প (ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প)। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গে পূর্তশিল্পের উন্নতি ঘটিতে থাকে এবং চটশিল্পের গুরুত্ব কমিতে থাকে। দশ বৎসরের মধ্যে চটশিল্প পূর্ত শিল্পের কাছে উহার প্রথম স্থান হারায়।

বর্তমানে ভারতের মোট কারখানার ১৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত; এই কারখানাগুলির মোট উৎপাদন সারা ভারতের কারখানাগুলির মোট উৎপাদনের ২১ শতাংশ।

এক সময়ে (স্বাধীনতার সমসাময়িক কালে) পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ঘন বসতিপূর্ণ ও কাঁচামাল-সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ লইয়া নূতন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। আবার, কলিকাতা বন্দরের দুরবস্থাও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিকাশকে যথেষ্ট ব্যাহত করিতেছে। তাই মহারাষ্ট্রের বোম্বাই শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা (হুগলী) শিল্পাঞ্চল প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শক্তিসম্পদ (কয়লা) ও কাঁচামালের প্রাচুর্য, অতিনিবিড় বসতি-অঞ্চলের চাহিদা বিদ্যমান থাকায় এবং আসানসোল-দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলটির ক্রমশঃ উন্নতি ঘটায় মহারাষ্ট্রের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে শিল্প প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা বন্দরের অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইলেই পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় ভারতের শিল্পবিকাশের ইতিহাসে তাহার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে।

পাটশিল্প—পশ্চিমবঙ্গ পাটশিল্পে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতার নিকট হুগলী নদীর দুই তীরে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এই রাজ্যে ৮৭টি পাটকল ছিল, বর্তমানে ৫৬টি পাটের কলে কাজ চলে। তবে, মাঝে মাঝে একাধিক কারখানায় সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ থাকে। ভারতের কাঁচা পাটের উৎপাদন স্থানীয় চাহিদার প্রায় সমান হইলেও, এখনও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অল্প পরিমাণ কাঁচা পাট বাংলাদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বিভিন্ন .কারণে কলিকাতার পাটশিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে; বিস্তারিত বিবরণ ১৯৪—১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১১ লক্ষ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য.উৎপন্ন হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—পশ্চিমবঙ্গে উৎকৃষ্ট কয়লাখনি থাকায় এবং নিকটবর্তী ওড়িশা ও সিংভূম হইতে লৌহ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়া এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বার্নপুর ও দুর্গাপুরে দুইটি

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় **চুনাপাথর** পাওয়া যায়। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় **তামার খনি** আছে। বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট ধরনের **লৌহ আকরিক** পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলায় ঝিলিমিলিতে **উলফ্রামের খনি** আছে। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলায় **ম্যাঙ্গানিজের খনি** আছে। জলপাইগুড়ি জেলার দুয়ার অঞ্চলে ডলোমাইট পাওয়া যায়।

শক্তিসম্পদ, শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত সম্পদ

শক্তিসম্পদ—কয়লা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শক্তিসম্পদ। কয়লা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনো খনিজ তৈল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস আবিষ্কৃত হয় নাই। এই রাজ্যে জলশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থাও উন্নতিলাভ করে নাই। সুতরাং শিল্প ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি মূলতঃ কয়লা পোড়াইয়াই উৎপন্ন করা হইতেছে। তাপবিদ্যুতের সামান্য অংশ ডিজেল তৈল ব্যবহার করিয়াও উৎপাদন করা হয়।

দামোদর ও ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি হইতে পশ্চিমবঙ্গে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। উত্তরবঙ্গের জলঢাকা, কার্শিয়াং ও বিজনবাড়িতে তিনটি অতি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র আছে।

তাপবিদ্যুৎই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎশক্তির প্রধান উৎস। উৎপাদনকেন্দ্রগুলির মধ্যে ডি. ভি. সি.-র দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেডের দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যান্ডেল ও সাঁওতালদি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাশিপুর ও মূলাজোড় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাছাড়া রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদহ (২টি), ইসলামপুর, শিলিগুড়ি, বীরপাড়া, চ্যাংড়াবান্ধা, হলদিবাড়ি, কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা, মালবাজার প্রভৃতি স্থানে ডিজেল চালিত তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বিদ্যমান। ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ৫৩০ মেগাওয়াট, সাঁওতালদি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৪৮০ মেগাওয়াট, দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ২৮০ মেগাওয়াট, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের চারিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৩৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। সব মিলাইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২,২৪০ মেগাওয়াট। ইহা ছাড়া ডি. ভি. সি.-র পশ্চিমবঙ্গ বহির্ভূত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হইতে আরও বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের চাহিদা পূর্ণ হয় না। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। প্রতিদিন একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। ফলে কলকারখানা বন্ধ হইয়া যায়, অফিস-আদালত অচল হইয়া পড়ে, সেচের পাম্প নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকে, আর গৃহস্থরা নিষ্প্রদীপ গৃহে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন।

বিদ্যুতের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট। সাঁওতালদি প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে, ব্যান্ডেলে আরও একটি (৫ম) ইউনিট চালু করা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণে, ২৪ পরগনার টিটাগড়ে ও মেদিনীপুরের কোলাঘাটে ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের ব্যবস্থা

হইয়াছে। ভারত সরকার ফারাক্কায় একটি সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন স্থাপনের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১ সালে মাত্র ৩৮৬টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল; ১৯৮০ সালে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২,৮৬৩টিতে দাঁড়াইয়াছে। এখন ২৬,০৮২টি জলসেচ পাম্প বিদ্যুতের সাহায্যে চালান হইতেছে।

শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত সম্পদ—পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান রাজ্য। বিভিন্ন বৃহদাকার শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতের শিল্পপ্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল অগ্রগণ্য। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়কার শিল্পের ভিত্তি ছিল চট, সুতিবস্ত্র, চা, ইস্পাত, কয়লা ও পূর্তশিল্প (ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প)। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গে পূর্তশিল্পের উন্নতি ঘটিতে থাকে এবং চটশিল্পের গুরুত্ব কমিতে থাকে। দশ বৎসরের মধ্যে চটশিল্প পূর্ত শিল্পের কাছে উহার প্রথম স্থান হারায়।

বর্তমানে ভারতের মোট কারখানার ১৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত; এই কারখানাগুলির মোট উৎপাদন সারা ভারতের কারখানাগুলির মোট উৎপাদনের ২১ শতাংশ।

এক সময়ে (স্বাধীনতার সমসাময়িক কালে) পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ঘন বসতিপূর্ণ ও কাঁচামাল-সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ লইয়া নূতন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। আবার, কলিকাতা বন্দরের দুরবস্থাও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিকাশকে যথেষ্ট ব্যাহত করিতেছে। তাই মহারাষ্ট্রের বোম্বাই শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা (হুগলী) শিল্পাঞ্চল প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শক্তিসম্পদ (কয়লা) ও কাঁচামালের প্রাচুর্য, অতিনিবিড় বসতি-অঞ্চলের চাহিদা বিদ্যমান থাকায় এবং আসানসোল-দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলটির ক্রমশঃ উন্নতি ঘটায় মহারাষ্ট্রের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে শিল্প প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা বন্দরের অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইলেই পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় ভারতের শিল্পবিকাশের ইতিহাসে তাহার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে।

পাটশিল্প—পশ্চিমবঙ্গ পাটশিল্পে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতার নিকট হুগলী নদীর দুই তীরে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এই রাজ্যে ৮৭টি পাটকল ছিল, বর্তমানে ৫৬টি পাটের কলে কাজ চলে। তবে, মাঝে মাঝে একাধিক কারখানায় সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ থাকে। ভারতের কাঁচা পাটের উৎপাদন স্থানীয় চাহিদার প্রায় সমান হইলেও, এখনও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অল্প পরিমাণ কাঁচা পাট বাংলাদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বিভিন্ন কারণে কলিকাতায় পাটশিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে; বিস্তারিত বিবরণ ১৯৪—১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১১ লক্ষ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—পশ্চিমবঙ্গে উৎকৃষ্ট কয়লাখনি থাকায় এবং নিকটবর্তী ওড়িশা ও সিংভুম হইতে লৌহ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়া এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বার্নপুর ও দুর্গাপুরে দুইটি

বৃহদাকার ইস্পাতশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ ১৮১-১৮২ ও ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, লৌহদ্রব্য ও ইস্পাত-দ্রব্য প্রস্তুতের ছোট ছোট ২৮টি কারখানা এই রাজ্যে অবস্থিত। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৯·০৪ লক্ষ মেঃ টন কাঁচা লৌহ এবং ৮·৪২ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাতপিণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে।

কার্পাসবয়ন শিল্প—পশ্চিমবঙ্গে তূলা পাওয়া যায় না। তথাপি এই রাজ্য কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যে ৩৯টি বৃহদাকার কাপড়ের কল আছে। শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, হাওড়া, আসানসোল, বেলঘরিয়া, সোদপুর প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ কাপড়ের কল অবস্থিত। বিস্তারিত বিবরণ ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ কিঃ গ্রাঃ সূতা ও ৪ কোটি ৩০ লক্ষ মিটার বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প—আসানসোলের নিকট চিত্তরঞ্জনে একটি সরকারী রেল-ইঞ্জিন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারখানায় ৫,০০০ লোক কাজ করে। ইহার বাৎসরিক উৎপাদন-ক্ষমতা ৩০০ খানা ইঞ্জিন। বার্নপুর ও দুর্গাপুরের ইস্পাত এবং রানীগঞ্জের কয়লার সাহায্যে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। লিলুয়া, খড়্গপুর ও কাঁচড়াপাড়ায় তিনটি রেলের কারখানা আছে।

চা-শিল্প—চা-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও চা-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। এই রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলায় ১০৫টি এবং দার্জিলিং জেলায় ১২৩টি চা-বাগান আছে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় পর্বতের ঢালু অংশে ও তরাই অঞ্চলে এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-চাষ বিশেষ উন্নতি-লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, কোচবিহারেও চা উৎপন্ন হয়। মোট ৯১ হাজার হেক্টর জমিতে চা-চাষ হয়। পূর্বে চা তুলিবার পর ইহার অধিকাংশ কলিকাতা বা ইহার উপকণ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন চা-সংক্রান্ত কারখানায় প্রেরিত হইত। এখানে চা শুকাইয়া ও ব্লেন্ড করিয়া বাক্সে ভর্তি করা হইত। বর্তমানে বিভিন্ন চা-বাগানের নিজস্ব চা-সংক্রান্ত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ কিঃ গ্রাঃ চা উৎপন্ন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের চা প্রধানতঃ রপ্তানির জন্য প্রেরিত হয়। কলিকাতায় ও শিলিগুড়িতে নীলামের মারফত চা বিক্রয় হয় এবং কলিকাতা বন্দর মারফত বিদেশে প্রেরিত হয়। কিছু পরিমাণ চা স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয় হয়। পশ্চিম-বঙ্গের চা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। ইহার অধিকাংশই উচ্চমূল্যে ব্রিটেনে রপ্তানি হয়। পশ্চিমবঙ্গ চা রপ্তানি করিয়া বৎসরে ৫০-৬০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

পশ্চিমবঙ্গে চা-শিল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট। চা-শিল্প মূলতঃ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। পশ্চিমবঙ্গে চা-চাষে ও চায়ের কারখানায় ২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী-শ্রমিক। স্ত্রীলোকের কর্মসংস্থানে এই শিল্পের অবদান যথেষ্ট। চা-বাগিচাগুলি তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে পরিবর্তিত করিয়া স্বাস্থ্যকর ও মনুষ্যবাসের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। ফলে উত্তরবঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তরবঙ্গের তথা সারা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতিতে চা-শিল্প সাহায্য করিতেছে। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শহর মূলতঃ চা-শিল্প ও ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে। চা-শিল্পের জন্যই উত্তরবঙ্গের সহিত কলিকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। চা-শিল্প কলিকাতা বন্দরের সমৃদ্ধিতেও সহায়ক হইয়াছিল।

জাহাজ-নির্মাণ শিল্প—কলিকাতা বন্দরের নিকট খিদিরপুরে জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে। গার্ডেনরীচে গাধাবোট, মাটি-কাটার যন্ত্র ও উপকূলবাহী জাহাজ ও স্টীমার নির্মাণের কারখানা আছে। হলদিয়াতে জাহাজ মেরামতের কারখানা নির্মিত হইতেছে।

মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প—কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী জেলায় হিন্দ্ মোটরে (উত্তরপাড়া) ভারতের বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানাটি অবস্থিত।

রাসায়নিক শিল্প—পশ্চিমবঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডা-অ্যাশ, কস্টিক সোডা, ব্লীচিং পাউডার, ক্লোরিন, রং, বেনজিন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা আছে। কলিকাতার সন্নিকটে রিষড়া নামক স্থানে একটি বৃহদাকার রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা আছে। কলিকাতার কাঁকুড়গাছিতে বেঙ্গল কেমিক্যালের একটি বড় কারখানা আছে। বার্নপুর ও দুর্গাপুরে একটি বৃহদাকার রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরামপুরে, রিষড়ায় ও কোন্নগরে রং ও ঔষধের কারখানা আছে। হলদিয়াতে একটি বৃহদাকার রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানা আছে।

চিনিশিল্প—পশ্চিমবঙ্গে ইক্ষু উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু থাকিলেও এখানে পাট অপেক্ষা ইহা বেশী লাভজনক নহে বলিয়া ইক্ষুচাষে চাষীরা উৎসাহ পায় না। বর্তমানে এখানে তিনটি চিনির কল আছে—নদীয়া জেলার পলাশী, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা এবং বীরভূম জেলার আমেদপুরে। পশ্চিমবঙ্গে চিনির চাহিদা বাৎসরিক প্রায় ১ লক্ষ মেঃ টন। কিন্তু এখানকার চিনির কলগুলিতে মাত্র ১০,০০০ মেঃ টন চিনি উৎপন্ন হয়। কলিকাতা বন্দর নিকটবর্তী বলিয়া যন্ত্রপাতি আমদানি করা সহজ; নিকটেই কয়লাখনি অবস্থিত। সুতরাং ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি পাইলে এখানে আরও চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কাগজশিল্প—কাগজশিল্পে পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। এখানে ১১টি কাগজের কল আছে। প্রধানতঃ টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, রানীগঞ্জ, চন্দ্রহাটি, নৈহাটি ও ত্রিবেণীতে কাগজের কলগুলি অবস্থিত। কাগজ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে **প্রথম স্থানের** অধিকারী।

অ্যালুমিনিয়াম শিল্প—ভারতের বৃহত্তম অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা পশ্চিমবঙ্গের অনুপনগরে (আসানসোল) অবস্থিত। ডি. ভি. সি. হইতে সুলভে জলবিদ্যুৎ পাওয়ায় এই শিল্প বর্তমানে খুবই উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতার নিকটে বেলুড়ে একটি অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে।

অন্যান্য শিল্প—এই সকল বৃহদাকার শিল্প ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে ছোট ছোট বহু কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আসানসোলের নিকট রূপনারায়ণপুরে **টেলিফোনের তার** তৈয়ারির একটি বৃহদাকার কারখানা আছে। **চর্মশিল্পে** পশ্চিমবঙ্গ উন্নত। চর্ম-দ্রব্য নির্মাণ, সংস্কার ও রং করিবার অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানা আছে। বাটানগরে বৃহদাকার জুতার কারখানা আছে। কলিকাতা ও হাওড়ায় বহুসংখ্যক ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য নির্মাণের কারখানা আছে।

কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প —যে সকল শিল্পে কেবলমাত্র শিল্পী ও তাহার পরিবারের লোকজন কাজ করে, তাহাকে কুটিরশিল্প বলে। আর যে সকল ছোট ছোট কারখানায় ১০
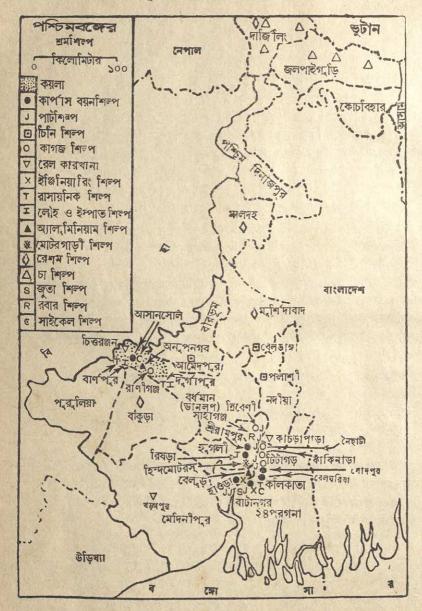
জন বা তাহার কিছু বেশী লোক বাহির হইতে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হয় তাহাকে ক্ষুদ্রশিল্প বলে।

পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হইলে কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পে আরও বহু লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে।

স্বাধীনতালাভের পরেই ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটিরশিল্পের উন্নতিবিধানের প্রতি স্বাধীন সরকারের দৃষ্টি পড়ে। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন দরিদ্র শিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই কুটিরশিল্পের উন্নতি করার প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যও কুটিরশিল্পের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে নানা উপায়ে কুটিরশিল্পের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। কুটিরশিল্পীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে একত্রিত করার চেষ্টা হয়। এই সমবায় সমিতিগুলি শিল্পীদের ঋণদান, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'ওয়েস্ট বেঙ্গল খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড', 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন' নামক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কুটিরশিল্পে উন্নত। এখানকার **হস্তচালিত তাঁতে** উৎকৃষ্টশ্রেণীর সুতি ও রেশমী বস্ত্র তৈয়ারি হয়। ইহা ছাড়া খাদিবস্ত্র, কাঁসা ও পিতলের বাসন, ছুরি-কাঁচি, হাতির দাঁতের শৌখিন জিনিস, মাটির পুতুল, লবণ, কুইনাইন, গুড়, কাগজ, বিড়ি, দড়ি, লাক্ষা, মাদুর, চর্ম ও জুতা, শতরঞ্জি, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের জিনিস, সোনা-রূপার গহনা, খেলনা, সাবান, চীনামাটির দ্রব্যাদির কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া আছে।

কুটিরশিল্পের মধ্যে **রেশমশিল্প** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মালদহ ও দার্জিলিং-এ এই শিল্প সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। **তাঁতশিল্পে** তামিলনাড়ুর পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, হুগলীর ধনিয়াখালি প্রভৃতি তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, ২৪-পরগনা, মালদহ ও বাঁকুড়া জেলার **কাঁসা ও পিতলের** বাসন বিখ্যাত। ইহা ছাড়া লবণ, কুইনাইন, গুড়, হাতে তৈয়ারি কাগজ, সাবান ও চীনামাটির দ্রব্যাদির কুটিরশিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

শিল্পাঞ্চল

উপরে বর্ণিত পশ্চিমবঙ্গের বৃহদায়তন শিল্পসমূহ প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে—( ) কলিকাতা (হুগলী) শিল্পাঞ্চল, (২) আসানসোল—দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও (৩) হলদিয়া শিল্পাঞ্চল।

(১) **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল**—কলিকাতা শহর ও শহরতলী (২৪-পরগনা, হাওড়া ও হুগলী জেলার হুগলী নদীর তীরবর্তী শহরাঞ্চল) লইয়া **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল** বা **হুগলী শিল্পাঞ্চল** গঠিত। অতীতে উত্তরে নৈহাটী হইতে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত হুগলী নদীর উভয় তীরে এই শিল্পাঞ্চল প্রসারিত ছিল। বর্তমানে ইহা উত্তরে প্রসারিত হইয়া নদীয়া জেলার কল্যাণী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

(i) রানীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা রেলপথে, সড়কপথে এবং নদী ও খালের মারফত এই অঞ্চলে আনা সহজসাধ্য। (ii) ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা এই অঞ্চলের

কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহাতে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা হইয়াছে। হুগলী নদীর মাধ্যমে কাঁচামাল এই অঞ্চলে আনা যায়। (iii) পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মারফত পরিবহণের সুবন্দোবস্ত আছে। (iv) পূর্বে কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল বলিয়া এখানে ব্রিটিশ মূলধন নিয়োগের সুযোগ ছিল। বর্তমানে স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক হইতে শিল্পের জন্য মূলধন সংগ্রহ করার সুযোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। (v) স্থানীয় ও বিহার-ওড়িশার সুলভ শ্রমিক এই শিল্পাঞ্চলে সহজেই পাওয়া যায়। (vi) ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল বলিয়া এখানকার শিল্পজাত দ্রব্যগুলির স্থানীয় চাহিদাও যথেষ্ট। এই সকল কারণে কলিকাতা শিল্পাঞ্চল ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এই অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে পাট, কার্পাসবস্ত্র, মোটরগাড়ি, কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক পদার্থ, নানাবিধ ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, দিয়াশলাই, কাঁচ ও রবার শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি ছাড়া ঔষধপত্র, প্রসাধন সামগ্রী, সিগারেট, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, জুতা ও অন্যান্য চর্মদ্রব্য, চীনামাটির বাসনপত্র, নানাপ্রকার প্লাস্টিকদ্রব্য, খেলনা প্রভৃতি তৈয়ারি করার বহুসংখ্যক কারখানা এই শিল্পাঞ্চলে দেখা যায়।

(২) **আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল**—বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় **আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল অবস্থিত।** (i) রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা এবং ডি ভি. সি-এর সুলভ জলবিদ্যুৎ এই অঞ্চলের শিল্পের প্রধান শক্তিসম্পদ। (ii) এই অঞ্চল হইতে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরের মারফত শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা এবং যন্ত্রপাতি আমদানি করা সহজ। (iii) আসানসোলের নিকটবর্তী বিহারের সিংভূম হইতে লৌহ আকরিক, ম্যাংগানিজ প্রভৃতি খনিজ সম্পদ আনিয়া এখানকার শিল্পে ব্যবহার করা হয়। (iv) দুর্গাপুর হইতে সড়কপথ এবং পূর্ব রেলপথ মারফত মালপত্র প্রেরণ করা সহজ। (v) এই অঞ্চলের সাঁওতাল শ্রমিক সুদৃঢ়কায় ও সুলভ। সেইজন্য এই অঞ্চল ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের একটি বিশিষ্ট শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইতেছে।

দুর্গাপুরে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, সংকর ইস্পাত উৎপাদনের অপর একটি

কারখানা, খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, কোক কয়লা উৎপাদনের কারখানা, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারির কারখানা, সিমেন্ট তৈয়ারির কারখানা প্রভৃতি বহুবিধ কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে **মৃৎশিল্প** ও **চুল্লী** নির্মাণের উপযোগী তাপসহ ইষ্টক-নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত বার্নপুরের লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, অনুপনগরের অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা, রূপনারায়ণপুরের টেলিফোনের তার তৈয়ারির কারখানা, আসানসোলের কাপড়ের কল ও বাই-সাইকেলের কারখানা এবং রানীগঞ্জের কাগজের কল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় উপত্যকার সঙ্গে দামোদর উপত্যকার তুলনা করা চলে। রূঢ় অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পের বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ বিদ্যমান। ভারতে দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত দুর্গাপুর অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প বিকাশের সুযোগ বিদ্যমান। রূঢ় অঞ্চলে প্রচুর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। দুর্গাপুরেও রানীগঞ্জের উৎকৃষ্টশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। রূঢ় অঞ্চলে যেমন ইস্পাত শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, দুর্গাপুরের নিকটেও সেইরূপ বহু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন শিল্প, রূপনারায়ণপুরের তারের কারখানা, আসানসোলের অ্যালুমিনিয়াম ও সাইকেলের কারখানা, সিন্ধ্রি সারের কারখানা এবং স্থানীয় কার্পাসবয়ন, সিমেন্ট, কাগজ ও অন্যান্য নানাবিধ কারখানার নাম করা যায়। ইহার নিকটবর্তী বার্নপুরে একটি ইস্পাত কারখানা অবস্থিত এবং আরও উত্তরে স্থাপিত হইয়াছে বোকারোর ইস্পাত কারখানা। এইভাবে দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত এই শিল্পাঞ্চলকে রূঢ় শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা যায় বলিয়া ইহাকে **'ভারতের রূঢ়' (The Rhur of India)** বলা হয়।

(৩) **হলদিয়া বন্দর ও শিল্পাঞ্চল**—কলিকাতা বন্দরে বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া মাল আমদানি ও রপ্তানি করিতে খুব অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য হুগলী ও হলদি নদীর সংযোগস্থলে মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে একটি বৃহৎ বন্দর ও পোতাশ্রয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে একটি তৈলশোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই শোধনাগারের তৈলশোধনের বার্ষিক ক্ষমতা ২৫ লক্ষ মেঃ টন। ১৯৮১-৮২ সালে ২৩ লক্ষ মেঃ টন অপরিশোধিত খনিজ তৈল এখানে শোধিত হইয়াছে। হলদিয়াতে একটি বৃহদাকার সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। অপরিশোধিত তৈলকে শোধন করার সময় নানাপ্রকার উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় ; উহাদের মধ্যে ন্যাপথা অন্যতম। এই ন্যাপথা দ্বারা এখানে সার তৈয়ারি হয়। এখানে জাহাজ মেরামতের একটি কারখানা নির্মিত হইবার কথা। এখানে আরও বহু শিল্প স্থাপিত হইবে এবং এই অঞ্চল একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইবে। ফলে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভীষণ চাপ ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে।

এই তিনটি শিল্পাঞ্চল ছাড়াও শিলিগুড়িতে একটি ছোট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার কাষ্ঠশিল্প, চা-এর বাক্স নির্মাণ শিল্প ও চা-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালদি, খড়্গপুর, ফারাক্কা প্রভৃতি স্থানে ছোটোখাটো আরও কয়েকটি শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব

কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর এবং শ্রেষ্ঠ শহর। কলিকাতা একটি নদী-বন্দর। বঙ্গোপসাগর হইতে প্রায় ১২০ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে হুগলী নদীর বাম তীরে এই বন্দরটি অবস্থিত। একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর বলিয়া কলিকাতা বন্দর ভূমধ্যসাগর-সুয়েজখাল-অস্ট্রেলিয়া জলপথ নামক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের সহিত যুক্ত। ফলে এই বন্দরের মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য চলে। ইহা ছাড়া ভারতের সবগুলি বন্দরে এই বন্দর হইতে জাহাজ যাতায়াত করে। সুতরাং ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যে কলিকাতা বন্দরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কলিকাতা বন্দরের বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্ভূমি রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং নেপাল ও ভুটান নামক দুইটি রাষ্ট্র ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই সকল রাজ্যের সহিত কলিকাতা রেলপথে যুক্ত। ইহা ছাড়া, জলপথে এই বন্দর হইতে গঙ্গানদী মারফত উত্তর ভারতে ও ব্রহ্মপুত্র নদী মারফত বাংলাদেশের মধ্য দিয়া আসামে যাওয়া যায়। এই পশ্চাদ্ভূমিতে প্রচুর কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কলিকাতার নিকট ইস্পাত, পাট, যন্ত্রপাতি, কাগজ, রবার, অ্যালুমিনিয়াম, কার্পাসবয়ন শিল্প প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা, পশ্চিমবঙ্গের কয়লা ও পাটজাত দ্রব্য, বিহারের তৈলবীজ, লাক্ষা, কয়লা, লৌহ আকরিক ও অভ্র, উত্তর প্রদেশের তৈলবীজ, চামড়া, চিনি ও বস্ত্রাদি, ওড়িশার লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই বন্দরের মারফত রপ্তানি করা হয়। বিদেশ হইতে নানাবিধ সামগ্রী এই বন্দরে আমদানি করিয়া ইহার পশ্চাদ্ভূমি অঞ্চলে প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে গম, চাউল, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, কাগজ, মোটরগাড়ি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যই প্রধান। কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাটশিল্প কেন্দ্র।

কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সেইজন্য কলিকাতা বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কলিকাতা বন্দর গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলেরও বিকাশ ঘটিতে থাকে। কলিকাতা বন্দর মারফত যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করার সুবিধা থাকায় কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তোলা সহজ হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের পাট ও চা শিল্পের উন্নতি কলিকাতা বন্দরের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। কারণ, উভয় শিল্প রপ্তানি-বাণিজ্যভিত্তিক। কলিকাতা বন্দরের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের রেলপথ ও সড়কপথের এত উন্নতি ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মূলে ছিল কলিকাতা বন্দর। সুতরাং এই বন্দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি ঘটিয়াছিল এবং এক সময়ে ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত রাজ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, আবার এই বন্দরের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তেমনি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দিয়াছে।

কলিকাতা বন্দরের কয়েকটি অসুবিধাও আছে। ১৬,৭৩৬ টনের (GRT) বেশী মালবহনক্ষম জাহাজ এই বন্দরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে জাহাজ দাঁড়াইবার জন্য খিদিরপুরে দুইটি পোতাশ্রয় এবং বড় ডক (কিং জর্জেস ডক)

আছে। কিন্তু এইগুলি প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। গঙ্গা হইতে ভাগীরথী বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ফলে হুগলী নদীর জলস্রোত কমিয়া যাওয়ায় এই বন্দর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত জলপথে বালি, কাদা প্রভৃতি আসিয়া জড় হয় এবং জাহাজের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ডায়মন্ডহারবার হইতে এই বন্দরে জাহাজ ঢুকিবার রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ; সেইজন্য ড্রেজার যন্ত্রের সাহায্যে জঞ্জাল সরাইয়া ফেলিতে হয় এবং পাইলটের সাহায্যে এই বন্দরে জাহাজ আনিতে হয়। ড্রেজার ও পাইলটের জন্য কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়াতে এই সকল অসুবিধা দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার বাংলাদেশকে অধিক পরিমাণ জল ছাড়িয়া দেওয়াতে এখন কলিকাতা বন্দরের আর কোনো সুবিধা হইতেছে না।

কলিকাতা পূর্ব ও উত্তর ভারতের প্রবেশদ্বার। সেইজন্য এই বন্দরের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে এই বিশাল অঞ্চলের উন্নতি ও অবনতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এই বন্দরের উন্নতির জন্য ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্প নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে হলদিয়াতে এই বন্দরের পরিপূরক বন্দর নির্মিত হইয়াছে। এখন হলদিয়া বন্দরে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ ভিড়িতে পারে। ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার সুফল হইতে বঞ্চিত না হইলে কলিকাতা ও পরিপূরক বন্দর হলদিয়া মিলিত-ভাবে উত্তর ও পূর্ব ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য অনায়াসে পরিচালনা করিতে পারিত।

প্রশ্নাবলী

(A) Essay-Type Questions

1. Describe the present position of agriculture in West Bengal. Mention the places where rice, jute and sugar-cane are grown.

(পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকার্যের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর। ধান, পাট ও ইক্ষু উৎপাদক স্থানসমূহের উল্লেখ কর।)

উঃ। 'কৃষিকার্য ও কৃষিজাত সম্পদ' (২৪৯—২৫৩ পৃঃ) হইতে লিখ।

2. Discuss the importance of river valley projects in the agricultural development of West Bengal. Name the important river valley projects of the state. [H. S. Examination, 1984]

(পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উন্নয়নে নদী উপত্যকা প্রকল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর। প্রসঙ্গতঃ এই প্রদেশের প্রধান প্রধান নদী উপত্যকা প্রকল্পগুলির নাম কর।)

উঃ। ভারতের 'বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা' (১২০-১২১ পৃঃ) হইতে 'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' ও 'ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা' এবং পশ্চিমবঙ্গের 'কৃষিকার্য ও কৃষিজাত সম্পদ' (২৪৯—২৫৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

3. Give an account of the principal agricultural and mineral resources of West Bengal. Locate the resources on a sketch map. [H. S. Examination, 1978]

(মানচিত্র সহযোগে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও।)

উঃ। 'কৃষিকার্য ও কৃষিজাত সম্পদ' (২৪৯—২৫৩ পৃঃ) ও 'খনিজ সম্পদ' (২৫৩—২৫৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

4. Give an account of the Jute Industry and Steel or Cotton textile Industry of West Bengal with special reference to (a) Centres

of manufacture and their locations, (b) The geographical advantages which helped the growth of the industry, (c) Market, (d) The importance of the industries in the external trade of the country. **[B. S. E. Higher Secondary, 1960]**

(নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখপূর্বক পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাতশিল্প অথবা কার্পাস বয়নশিল্পের বিবরণ দাও ঃ (ক) উৎপাদন-কেন্দ্রসমূহ ও ইহাদের অবস্থান, (খ) শিল্প প্রসারের উপযোগী ভৌগোলিক সুবিধা, (গ) চাহিদা ও বিক্রয়স্থল, (ঘ) দেশের বহির্বাণিজ্যে এই শিল্পগুলির গুরুত্ব।)

উঃ। 'পাটশিল্প' (২৫৫ পৃঃ), লৌহ ও ইস্পাতশিল্প' (২৫৫—২৫৬ পৃঃ) অথবা 'কার্পাস বয়নশিল্প' (২৫৫ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. Write a short essay on the Tea industry of West Bengal. **[Specimen Question, 1980]**

(পশ্চিমবঙ্গের চা-শিল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।)

উঃ। 'চা-শিল্প' (১৫৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

6 Point out the location of major Industrial Regions of West Bengal and explain the reasons for their development. **[H. S. Examination, 1984]**

(পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের উন্নতির কারণ নির্দেশ কর।)

উঃ। 'শক্তিসম্পদ, শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত সম্পদ' (২৫৪—২৫৯ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

7. Analyse the role played by the Calcutta industrial region in the economic development of West Bengal. **[H S Examination, 1979]**

(পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের অবদান বিশ্লেষণ কর।)

উঃ। 'কলিকাতা শিল্পাঞ্চল' (২৫৯—২৬০ পৃঃ) এবং 'শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত সম্পদ' (২৫৫—২৫৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।)

8 Write an account of the major industries of the state and explain the factors responsible for their localization. **[B S. E. Higher Secondary, 1966 (Comp)]**

(এই রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গে) প্রধান প্রধান শিল্পের বিবরণ লিখ এবং উহাদের একদেশীভবনের কারণ বুঝাইয়া লিখ।)

উঃ। 'শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত সম্পদ' (২৫৫—২৫৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

9. Give a brief account of the economic resources of West Bengal. **[Specimen Question, 1978]**

(পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

উঃ। 'কৃষিকার্য ও কৃষিজাত সম্পদ' (২৪৯—২৫৩ পৃঃ) 'খনিজ সম্পদ (২৫৩—২৫৪ পৃঃ) ও 'শ্রমশিল্প' (২৫৫—২৫৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

10 Into how many Industrial regions has the state of West Bengal been divided ? How has this development of industry influenced the density of population in West Bengal ? Give the names of two industries of this state and account for their development. **[H. S. Examination, 1980]**

(পশ্চিমবঙ্গকে কয়টি শিল্পাঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে ? এই শিল্পবিকাশ পশ্চিমবঙ্গের জনবসতির ঘনত্বকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে ? এই রাজ্যের দুইটি শিল্পের নাম কর এবং উহাদের উন্নতির কারণ লিখ।)

উঃ। 'শিল্পাঞ্চল' (২৫৯—২৬০ পৃঃ), 'পাটশিল্প' (২৬৫ পৃঃ) ও 'লৌহ ও ইস্পাতশিল্প' (২৫৫-২৫৬ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

11. Indicate the location of industrial regions of West Bengal and account for the growth of industries in any one of the regions.
[H S. Examination, 1982]

(পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া উহাদের যে কোনো একটির শিল্পায়নের কারণ নির্দেশ কর।)

উঃ। 'শিল্পাঞ্চল' (২৫৯—২৬০ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

12. Describe the importance of Calcutta port in the economic development of West Bengal. What are the present problems of this port ? **[H. S Examination, 1982]**

(পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বর্ণনা কর। এই বন্দরের বর্তমান সমস্যা কি কি ?)

উঃ। 'কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব' (২৬২—২৬৩ পৃঃ) হইতে উত্তর লিখ।

13. Discuss the importance of Calcutta Port in overall development of Eastern India. What are the present problems of this port?
[H. S. Examination, 1984]

(পূর্বভারতের সার্বিক উন্নয়নে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব আলোচনা কর। এই বন্দরের সাম্প্রতিক সমস্যাবলী কি কি ?)

উঃ। 'কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব' (২৬২—২৬৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

14 Analyse the geographical conditions that have contributed to the location and development of Calcutta port.
[Tripura H. S. Examination, 1982]

(কলিকাতা বন্দরের অবস্থান ও উন্নতিতে যে সকল ভৌগোলিক অবস্থার অবদান আছে তাহা বিশ্লেষণ কর।)

উঃ। সপ্তম অধ্যায় হইতে 'কলিকাতা' (১৫৯ পৃঃ) এবং 'কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব' (২৬২—২৬৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

15 Discuss the importance of Calcutta port in the economy of West Bengal. **[Specimen Question of H. S Council, 1980]**

(পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

উঃ। 'কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব' (২৬১—২৬৩ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

16. Discuss the importance of Farakka Barrage with regard to the future development of Calcutta and Haldia ports in West Bengal. **[H. S Examination, 1980]**

(পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দিক্ দিয়া ফারাক্কা বাঁধের গুরুত্ব আলোচনা কর।)

উঃ। 'ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা' (১২৬—১২৭ পৃঃ), 'কলিকাতা বন্দর' (১৫৯ পৃঃ), 'হলদিয়া বন্দর' (১৬১ পৃঃ) এবং 'কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব' (২৬২—২৬৩ পৃঃ) অবলম্বনে উত্তর তৈয়ারি কর।

B. Short Answer-Type Questions

1. Write notes on any two of the following ;

(a) Power resources of West Bengal. (b) Mineral resources of West Bengal. (c) Possibilities of industrial development at Haldia. (d) Present position and possibilities of future development of paper industry in West Bengal. [H S. Examination, 1981]

[যে কোনো দুইটির উপর টীকা লিখ :—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের শক্তিসম্পদ। (খ) পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ। (গ) হলদিয়ার শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা। (ঘ) পশ্চিমবঙ্গের কাগজ শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা।]

উঃ। 'শক্তি সম্পদ' (২৫৪—২৫৫ পৃঃ); 'খনিজ সম্পদ' (২৫৩—২৫৪ পৃঃ); 'হলদিয়া বন্দর ও শিল্পাঞ্চল' (২৬১ পৃঃ) এবং 'কাগজ শিল্প' (২৫৭ পৃঃ) অবলম্বনে লিখ।

2. Explain the following :

(a) Calcutta is the gateway of commerce of Eastern India.

(b) West Bengal has greater potentialities of industrial development than Maharastra. [H. S Examination, 1981]

(c) Most of the Jute mills of India are localised on both banks of the Hooghly river. [H. S. Examination, 1980]

(d) Durgapur is known as the Ruhr of India. [H. S. Examination, 1979]

(e) Darjeeling region produces quality tea.

[নিম্নলিখিতগুলির কারণ ব্যাখ্যা কর :

(ক) কলিকাতা পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের রাজপথ।

(খ) মহারাষ্ট্র অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা বেশী।

(গ) হুগলী নদীর উভয় তীরে ভারতের অধিকাংশ পাটকল কেন্দ্রীভূত।

(ঘ) দুর্গাপুরকে ভারতের রুঢ় বলা হয়।

(ঙ) দার্জিলিং অঞ্চলে উচ্চমানের চা উৎপন্ন হয়।]

উঃ। (ক) 'কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব' (২৬২—২৬৩ পৃঃ), (খ) 'শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত সম্পদ' (২৫৫ পৃঃ), (গ) 'পাটশিল্প' (২৫৫ পৃঃ), (ঘ) আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল' (২৬০—১৬১ পৃঃ) এবং (ঙ) 'চা' (২৫২ পৃঃ) হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লিখ।

C. Objective Questions

1. Frame correct answers from the following :

(i) Haldia is the centre for petrolium refining/deep sea fishing.

(ii) West Bengal is famous for the cultivation of rice/cotton.

(iii) Purulia is a backward/developed district of West Bengal.

(iv) Coal is mined in Raniganj region/Panagarh region.

(v) Bandel is a center for the production of thermal electricity/Hydroelectricity.

(vi) Calcutta is the capital of India/West Bengal.

(vii) Chittarajan is famous for locomotive/ship-building Industry.
[H. S. Examination, 1978]

(viii) There is an automobile factory near Asansol/Uttarpara/Durgapur in West Bengal. [H. S. Examination, 1982]

(ix) The area of West-Bengal is 87,853/32,80,483 sq. km. (x) Cinchona is produced in the district of Malda/Darjeeling of West Bengal. (xi) West Bengal holds the second/third/fourth place in India in the production of coal. (xii) West Bengal is famous for the cultivation of jute/sugar-cane. (xiii) Titagarh is famous for Engineering/Paper Industry. (xiv) The biggest aluminium factory in India is situated at Anupnagar/Rupnarayanpur. (xv) There is a Silk/Sugar mill at Ahmedpur in Birbhum district. (xvi) Santipur, Farasdanga, Bishnupur, Dhaniakhali etc. are famous for handloom industry/brass and bell metal utensil manufacturing industry. (xvii) Export/import trade is more in Calcutta port. (xviii) Calcutta is the gateway for eastern and northern/western and southern India.

[নিম্নলিখিত উক্তিগুলি সহযোগে সঠিক উত্তর দাও ঃ

(i) হলদিয়া একটি তৈলশোধনের/গভীর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের কেন্দ্র।

(ii) পশ্চিমবঙ্গ ধান/তুলা চাষের জন্য বিখ্যাত।

(iii) পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের একটি অনুন্নত/উন্নত জেলা।

(iv) কয়লা রানীগঞ্জ অঞ্চলে/পানাগড় অঞ্চলে খনন করা হয়।

(v) ব্যান্ডেল একটি তাপবিদ্যুৎ/জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র।

(vi) কলিকাতা ভারতের/পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

(vii) চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন/জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(viii) পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের/উত্তরপাড়ার/দুর্গাপুরের নিকটে একটি মোটর-গাড়ি নির্মাণের কারখানা আছে।

(ix) পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩/৩২,৮০,৪৮৩ বর্গ-কিলোমিটার। (x) পশ্চিমবঙ্গের মালদহ/দার্জিলিং জেলায় সিঙ্কোনার চাষ হয়। (xi) কয়লা উৎপাদনে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়/তৃতীয়/চতুর্থ। (xii) পশ্চিমবঙ্গ পাট/ইক্ষু চাষের জন্য বিখ্যাত। (xiii) টিটাগড় ইঞ্জিনিয়ারিং/কাগজ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। (xiv) অনুপনগরে/রূপনারায়ণপুরে ভারতের বৃহত্তম অ্যালুমিনিয়াম কারখানা অবস্থিত। (xv) বীরভূম জেলায় আমেদপুরে একটি রেশমের/চিনির কল আছে। (xvi) শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, ধনিয়াখালি প্রভৃতি স্থান তাঁত শিল্পের/কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ারির জন্য বিখ্যাত। (xvii) কলিকাতা বন্দরে আমদানি/রপ্তানি বেশী। (xviii) কলিকাতা পূর্ব ও উত্তর/পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রবেশদ্বার।]

পরিশিষ্ট

পরীক্ষার্থিগণের জ্ঞাতব্য বিষয়

(Hints to the Examinees)

অর্থনৈতিক ভূগোল শাস্ত্র বুঝিয়া পড়িতে পারিলে ইহা একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার অভাবে ছাত্রগণ পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাইতে ব্যর্থ হয়।

অর্থনৈতিক ভূগোলের অধ্যাপক এবং পরীক্ষক হিসাবে এবং এই পুস্তকের গ্রন্থকারগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক ভূগোল বিষয়টি ঠিকভাবে অধ্যয়ন করিবার এবং পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাইবার উপযোগী প্রশ্নোত্তর লিখিবার জন্য কয়েকটি ব্যবহারিক উপদেশ (Practical Suggestions) প্রদত্ত হইল এবং পরীক্ষার্থিগণ এই উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাইতে সক্ষম হইবে ঃ

১। ভূগোলশাস্ত্রে শুধুমাত্র জ্ঞানলাভ করিলেই যে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যাইবে এরূপ নহে। প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণের উপরেই নম্বর নির্ভর করিবে। প্রশ্নোত্তরকে পরীক্ষকের কাছে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের উপর পরীক্ষার্থিগণকে নজর রাখিতে হইবে ঃ

(ক) প্রথমতঃ, উত্তরটি লিখিবার পূর্বে বিষয়বস্তুর Point-গুলি ঠিক করিয়া উত্তরপত্রের বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে লিখিয়া লইতে হইবে ; এইভাবে পরিকল্পনা করিয়া উত্তর লিখিতে হইবে। তারপর **প্রতিটি বিষয়ের** (point) জন্য **পৃথক পৃথক প্যারাগ্রাফ** লিখিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়টি মর্মবোধক ২/৩টি **শব্দের** (point) **নীচে মোটা দাগ** দিতে হইবে ; তাছাড়া প্রতিটি উত্তরের বিষয়বস্তু শুরু করিবার পূর্বে কিছু ভূমিকা প্রয়োজন।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, যে সকল উত্তরের সঙ্গে **মানচিত্র** (Map) বা **রেখাচিত্র** (Diagram) **অংকন** করিয়া দেওয়া সম্ভব, সেই সকল প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে অবশ্যই মানচিত্র বা রেখাচিত্র অংকন করিয়া দিতে হইবে। উত্তরের বিষয়বস্তু উক্ত মানচিত্রে বা রেখাচিত্রে নির্দেশ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ মানচিত্রের বা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর সহজেই পরীক্ষকের মন জয় করিবে এবং অধিক নম্বর পাইতে সাহায্য করিবে। মানচিত্র ও রেখাচিত্র অংকন করিবার সময় সর্বদাই পেন্সিল ব্যবহার করিবে।

অবশ্য পরীক্ষার্থিগণের ধারণা, মানচিত্র অংকন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু ইহা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। পরীক্ষার্থিগণকে শুধুমাত্র Outline Map অংকন করিতে হইবে এবং উহা নিখুঁত না হইলেও চলিবে। মোটামুটি মানচিত্রটি দেখিয়া উহার অবস্থান বুঝিতে

পারিলেই হয়। বাড়িতে শুধুমাত্র ১৫ দিন ধরিয়া প্রতিদিন ১০।১৫ মিনিট করিয়া অভ্যাসের দ্বারা অনায়াসে এই ধরনের মানচিত্র অংকন করা যায়। ভারতের মানচিত্রের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হইবে এবং ভারত সংক্রান্ত প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজনমত মানচিত্র অংকন করিয়া দিতে হইবে।

ছাত্রগণ যাহাতে সহজে ভারতের মানচিত্র আঁকিতে পারে, সেজন্য একটি সহজ পন্থা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

মনে কর, **কখ** একটি সরলরেখা। ইহার দৈর্ঘ্য ৫.৬ সেঃ মিঃ (সেন্টিমিটার)।* ইহাকে **গ** বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত করা হইল। **গ** বিন্দুর মধ্য দিয়া **ঘচ** সরলরেখা টানা হইল। **গ** বিন্দু হইতে **ঘ** বিন্দুর দূরত্ব ৩.৮ সেঃ মিঃ এবং **চ** বিন্দুর দূরত্ব ৩.৫ সেঃ মিঃ। এখন **ঘ** বিন্দু হইতে উহার ডানদিকে **খগ** রেখার সমান্তরাল ১৬ সেঃ মিঃ লম্বা একটি রেখা **ছ** বিন্দু পর্যন্ত টানা হইল। **ছ** বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ২.৫ সেঃ মিঃ ব্যাসার্ধ লইয়া একটি
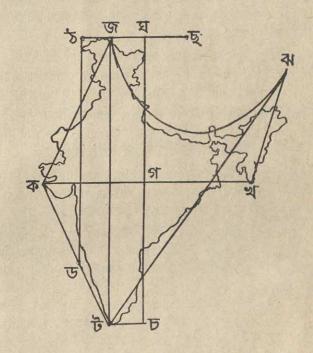
জঝ বৃত্তাংশ অংকিত হইল। এখন **খঝ** যোগ করিলে **খ** হইতে **ঝ**-এর দূরত্ব ২.৮ সেঃ মিঃ হইবে। **ঘজ** যোগ করিয়া **জ** হইতে একটি সরলরেখা **ঘচ** রেখার সমান ও সমান্তরাল করিয়া **ট** বিন্দু পর্যন্ত টানিয়া **ঝট** যোগ করা হইল। **চট, কট, কজ** যোগ করা হইল। এখন **জ** বিন্দু হইতে উহার বামদিকে ০.৭ সেঃ মেঃ দূরে **ঠ** বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা টানা হইল এবং

* স্কেলে সেন্টিমিটারে দশটি ভাগ থাকে। ৬ সেঃ মিঃ অর্থে ইহার ৬টি ভাগ লইতে হইবে। ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার।

ঠ বিন্দু হইতে **জট** রেখার সমান্তরাল **ঠড** সরলরেখা টানা হইল এবং উহা **কট** রেখাকে **ড** বিন্দুতে স্পর্শ করিল।

এখন যে ছক্‌টি পাওয়া গেল, তাহাতে মানচিত্রের মোটামুটি কাঠামো তৈয়ারি হইল। বিভিন্ন বিন্দুকে যোগ করিলে ভারতের মানচিত্র অংকন করা সহজ হইবে।

২। অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে; কারণ, পৃথিবী পরিবর্তনশীল। যেমন, পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খনিজ তৈল উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিত, কিন্তু একথা বর্তমানে অসত্য; কারণ, বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া তৈল উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এইজন্য অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠ করিবার সময় সর্বদা **সর্বশেষ সংস্করণের** (Latest edition) **বই পড়িতে হইবে** এবং এক বৎসর পূর্বের পরিসংখ্যান দেখিতে হইবে। অবশ্য পরিসংখ্যান সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ রাখিবার প্রয়োজন নাই। পরিসংখ্যান হইতে পরীক্ষার্থিগণকে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে কোন্‌ দেশ কোন্‌ জিনিস উৎপাদনে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি স্থান অধিকার করে। সেইভাবে প্রশ্নোত্তরে উহা লিখিতে হইবে।

৩। প্রশ্নোত্তরগুলি সর্বদাই **পরিস্কার পরিচ্ছন্ন** করিয়া লিখিতে হইবে। কারণ, হাতের লেখা সুন্দর ও পরিস্কার না হইলে পরীক্ষকের পক্ষে সমগ্র প্রশ্নোত্তর পাঠ করা সম্ভব হয় না। ফলে উত্তর ভাল হইলেও উহা দুর্বোধ্য হওয়ায় অধিক নম্বর পাওয়া যায় না।

৪। কোনো প্রশ্নে **দুইটি বিষয়ের পার্থক্য** চাহিলে প্রথমে উক্ত বিষয় দুইটি সম্পর্কে প্রাথমিক সমালোচনা করিয়া তারপর দুইটি পৃথক Column-এ পার্থক্যগুলি লিখিতে হইবে। উহাদের কোনো সাদৃশ্য থাকিলে তাহা উত্তরের শেষে লিখিতে হইবে।

৫। সবগুলি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হইবে এবং উত্তরগুলি অন্ততঃ একবার পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। একমাত্র পরীক্ষার পূর্বে ভালভাবে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিলেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাবতীয় প্রশ্নোত্তর লেখা সম্ভব।

৬। প্রতিটি উত্তর সাধারণতঃ গড়ে দুই-তিন পৃষ্ঠার বেশী না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবে; এইরূপভাবে পাতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিয়া লিখিলে সমগ্র প্রশ্নগুলির উত্তর তিন ঘণ্টার মধ্যে দেওয়া সম্ভব হইবে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু যুক্ত করিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ উত্তর পরিহার করিবে।

———

SPECIMEN QUESTIONS : 1978

OF

West Bengal Council of Higher Secondary Education

ECONOMIC GEOGRAPHY

Paper I

1. "The mode of life in any region is not an accident but is the result of the environment." Discuss.

2. Classify and account for the chief areas of natural grasslands of the world. Describe the nature of economic development of these regions.

3. Define and classify resources. Explain the functional theory of resources.

4. Explain the concept of conservation of resources. Indicate the different aspects of the conservation of resources.

5. What do you mean by man-land ratio ? How does the concept compare with population density ?

6 Describe the nature of population distribution in the world.

7. Explain the causes of uneven distribution of population in the world

8. Describe the important commercial fishing grounds of the world.

9. Classify the forests of the world and indicate the nature of their utilisation.

10. Classify soils of the world and indicate the nature of their utilisation.

11. Explain the conditions favouring the development of hydro-electric power. Examine the world distribution of water power resources.

12. Explain the conditions of growth, areas of production and world distribution of wheat, rice, cotton, jute, tea and coffee.

13. Describe the principal commercial grazing grounds of the world and indicate their future potentialities.

14. Classify ports and discuss the factors favouring the growth of sea ports.

15. Describe the principal industrial regions of the world.

16. Explain how far the volume of international trade can be considered as an index of economic development of a country.

Paper II

1. Examine the influence of (a) topography (b) climate on the economic life of India.

2. Write a short essay on the soils of India.

3. Examine briefly the soil conservation programme introduced in India during the Five-Year Plan periods.

4. Examine the importance of irrigation in India. What are the different modes of irrigation practised in the country ? Examine the various irrigation development programme introduced in India.

5. What are the principal commercial crops of India ? Where do they grow and under what geographical conditions ?

6. Examine the distribution of coal fields in India. What steps have been taken to develop the coal mining industry in India during the last twenty five years ?

7. Examine the present position and future prospects of the Indian petroleum mining and petroleum refining industry.

8. Describe the distribution of monopurpose hydro-electric power projects in India. Why have they been more developed in South India than in North India ?

9. What are the multipurpose river valley projects ? Describe the more important multipurpose river valley projects of India.

10 Classify the forests of India and describe the utilisation. Examine the forest conservation programme introduced in India during the five-year plan periods.

11. Describe the various railway zones of India.

12 What do you mean by major and minor ports of India ? Illustrate your answer with suitable examples.

13. Describe the hinterland and the pattern of trade of the major ports of India.

14. Account for the localisation, state the present position and indicate the future prospects of (a) cotton textile indusry (b) iron and steel industry and (c) paper industry of India.

15. Account for the distribution of population of India.

16. Give a brief account of the economic resources of West Bengal.

———

(ঞ) ভারী কাঠ / বাঁশ / পাইন গাছে সাইবেরিয়া খুব সমৃদ্ধ।

(ট) নাগাসাকি চীনদেশ / কামপুচিয়া / জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

(ঠ) আর্জেন্টিনা / নেদারল্যান্ডস / দক্ষিণ আফ্রিকা পশুপালনে সমধিক প্রসিদ্ধ।

অর্থনৈতিক ভূগোল—দ্বিতীয় পত্র

১। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং নদ-নদী কিভাবে ভারতের অর্থনৈতিক কার্য-কলাপকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা আলোচনা কর। ১৫

২। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার জলসেচ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। উহাদের প্রত্যেকটির সুবিধা ও অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর। ১০+৫

৩। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল রূপরেখা বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনা হইতে পশ্চিমবঙ্গ কি কি সুবিধা পাইয়া থাকে? ৮+৭

৪। ভারতের প্রধান প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চলের কথা উল্লেখ কর এবং কি কি ভৌগোলিক অবস্থায় ধান উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা কর। ৫+১০

৫। (ক) কি ধরনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ভারতে পাট ও চা উৎপাদন করা হয় তাহা বর্ণনা কর।

(খ) ভারতে কোন্ কোন্ রাজ্য পাট ও চা উৎপাদনে অগ্রণী? ১০+৫

৬। ভারতের কয়লা প্রধানতঃ কিরূপে ব্যবহার করা হয়? এই দেশের প্রধান প্রধান কয়লা খনির ভৌগোলিক আলোচনা কর। ৫+১০

৭। ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে কার্পাসবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ উল্লেখ কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি কি? ১০+৫

৮। ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা কর। এই বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তুমি কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে কর? ১০+৫

৯। ভারতে লোকবসতির অসম বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর। এই দেশ কি প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ? ১২+৩

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বর্ণনা কর। এই বন্দরের বর্তমান সমস্যা কি কি? ১০+৫

১১। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া উহাদের যে-কোনো একটির শিল্পায়নের কারণ নির্দেশ কর। ৫+১০

১২। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর দাও :— $১\frac{১}{২} \times ১০$

(ক) ভারতের পূর্বাঞ্চলে / উত্তরাঞ্চলে / দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়।

(খ) পাট / ইক্ষু / রবার ভারতে বাগিচা ফসলরূপে পরিচিত।

(গ) মেত্তুর / শিবসমুদ্রম / মাইথন ভারতের প্রাচীনতম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র।

(ঘ) ভারতের বৃহত্তম তৈল শোধনাগারটি কানপুরে / মথুরায় / হলদিয়াতে গড়িয়া উঠিতেছে।

(ঙ) ভারতের চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ / আসাম / তামিলনাড়ু প্রথম স্থান অধিকার করে।

(চ) কানপুর / এলাহাবাদ / লক্ষ্মৌ উত্তর প্রদেশের রাজধানী।

(ছ) পশ্চিমবঙ্গে আসানসোলের / উত্তরপাড়ার / দুর্গাপুরের নিকট একটি মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা আছে।

(জ) সাইকেল / রেলইঞ্জিন / সার কারখানার জন্য সিন্ধি বিখ্যাত।

(ঝ) মার্মাগাও পশ্চিম ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র / বন্দর / শৈলাবাস।

(ঞ) মধ্য রেলপথের সদর দপ্তর পুনে / নাগপুর / বোম্বাই-তে অবস্থিত।

1983

অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র

Answer any six questions

১। সম্পদ বলিতে কি বুঝায়? যথাযথ উদাহরণসহ ইহার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। ৫+১০

২। উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা "মানুষ-জমির অনুপাত" তত্ত্বটির ব্যাখ্যা কর। জনসংখ্যার বিভাজন ও কৃষিজ পদার্থের উৎপাদনের উপর এই অনুপাত কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে? ৮+৭

৩। বিশ্বের প্রধান প্রধান মৎস্যচারণভূমির অবস্থান নির্দেশ কর। ইহাদের অবস্থান ও উন্নয়নে যে সকল ভৌগোলিক কারণ প্রভাব বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর। ৫+১০

৪। লৌহ আকরিকের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণ উল্লেখ কর। যে সকল দেশে ইহা খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে উত্তোলন করা হয় তাহাদের নাম উল্লেখ কর। লৌহ-আকরিক রপ্তানি ও আমদানিকারক প্রধান প্রধান দেশগুলির নাম কর। ৫+৫+২½+২½

৫। কয়লা কয় প্রকারের হইয়া থাকে? ইহার প্রধান উপজাত দ্রব্যগুলির নাম কর। ইহা কিভাবে শিল্পের অবস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে, যথাযথ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ২½+২½+১০

৬। বিভিন্ন প্রকারের কৃষিপদ্ধতি কি কি? কি পরিবেশে এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সকল কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা বিশ্লেষণ কর। ৫+১০

৭। চাল উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা কর। বিশ্বের প্রধান প্রধান চাল উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। ১০+৫

৮। কি কি ভৌগোলিক পরিবেশে দুগ্ধজাত শিল্প উন্নতি লাভ করে, তাহা আলোচনা কর। যে সকল দেশ এই শিল্পে খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম কর। ১০+৫

৯। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়া সুয়েজ ও পানামা খালের উপর একটি তুলনামূলক আলোচনা কর :—

(ক) ইহাদের ভিতর দিয়া চলাচলকারী পণ্যসমূহ ;

(খ) ইহাদের দ্বারা উপকৃত দেশসমূহ। ৭+৮

অথবা

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৭+৮

১০। পোতাশ্রয় গড়িয়া ওঠার অনুকূল ভৌগোলিক কারণ কি কি? যথাযথ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ১০+৫

অথবা

পাটশিল্পের উন্নতিতে কাঁচামালের অবদান আলোচনা কর। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নাম কর। ১০+৫

১১। নিম্নোক্ত যে কোন তিনটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :— ৫×৩

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নে জলবায়ুর ভূমিকা।

(খ) আদর্শ-জনবসতি তত্ব।

(গ) ভূমিক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ।

(ঘ) জ্বালানি খনিজ।

(ঙ) বনভূমির শ্রেণীবিভাগ।

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঠিক উত্তর লিখ :— ১×১৫

(১) কয়লা একটি পূরণশীল / অপূরণশীল সম্পদ।

(২) জলবায়ু / সম্পদের ব্যবহার / সামাজিক পরিবেশ /-এর উপর কোন স্থানের জনবসতির ঘনত্ব নির্ভর করে।

(৩) কয়লা / খনিজ তেল / নারকেল-এ কেরালা উন্নত।

(৪) কানাডার বনভূমি পর্ণমোচী / চিরহরিৎ / সরলবর্গীয় গোষ্ঠীভুক্ত।

(৫) বোম্বাই-আমেদাবাদ / জম্মু-শ্রীনগর / কটক-ভুবনেশ্বর অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

(৬) ম্যাঙ্গানিজ / তিমি মাছ / মৎস্য সম্পদে চিল্কা হ্রদ সমৃদ্ধ।

(৭) তামা / টিন / অভ্র মালয়েশিয়ায় পাওয়া যায়।

(৮) রানীগঞ্জ / জামসেদপুর / দার্জিলিং-এর খনি হইতে কয়লা তোলা হয়।

(৯) নীল নদের বদ্বীপ / গাঙ্গেয় বদ্বীপ / পো নদীর উপত্যকা অঞ্চলে পাটচাষ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(১০) নূতন পলিমাটি / লাল মাটি / কৃষ্ণ মৃত্তিকা ধান চাষের উপযোগী।

(১১) নাইজেরিয়া / পশ্চিম জার্মানী / আর্জেন্টিনা কাঁচা পশম রপ্তানী করে।

(১২) আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগর / ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর / কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে সুয়েজ খাল অবস্থিত।

(১৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া / জাপান / পশ্চিম ইউরোপে মিশ্র কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(১৪) তারাপুরে জলবিদ্যুৎ / আণবিক শক্তি / তাপবিদ্যুৎ কারখানা আছে।

(১৫) বুয়েনস আইরিস হইতে কাঁচা তূলা / পাট / পশুজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়।

1983

অর্থনৈতিক ভূগোল—দ্বিতীয় পত্র

Answer any SIX questions

১। ভারতের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর জলবায়ুর প্রভাব উদাহরণসহ আলোচনা কর। ১০+৫

২। ভারতের প্রধান প্রধান বাগিচা-ফসল কি কি? উহাদের যে কোন একটি ফসলের উৎপাদন উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির কেন্দ্রীভূত হওয়া সম্বন্ধে লিখ। ৪+৮+৩

৩। ভারতের জলবিদ্যুৎ সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং সেই সম্পদ হইতে আমরা কিভাবে উপকৃত হই সে সম্বন্ধে বর্ণনা কর। ১০+৫

৪। কি কি ভৌগোলিক পরিবেশে ভারতে গম চাষ হয়, তাহা বর্ণনা কর। এই ফসলের বর্তমান সমৃদ্ধির কারণ নির্দেশ কর। ১০+৫

৫। ভারতের বনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৫+১০

৬। ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির অবস্থান বিষয়ে আলোচনা কর। খনিজ তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই দেশে যে সকল প্রচেষ্টা লওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ কর। ১০+৫

৭। গাঙ্গেয় উপত্যকায় চিনি শিল্পের কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি কি? ১০+৫

৮। ভারতের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া ইহাদের (১) অবস্থান (২) রপ্তানি (৩) আমদানি বিষয়ে আলোচনা কর। ৫×৩

৯। ভারতের জনবসতি বিভাজনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ এই বসতি বিভাজনের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? ৮+৭

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের অবদান নির্ণয় কর। খনিজ উৎপাদনে এই দেশে কি কি অসুবিধা দেখা যায়? ১০+৫

১১। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় চা-শিল্প অবস্থিত হইবার কারণ কি? এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ১০+৩+২

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাযথ উত্তর লিখ :— ১×১৫

(১) পৃথিবীর মধ্যে ভারত সর্বাপেক্ষা অধিক জনবসতিপূর্ণ / জনবসতি বিরল / দ্বিতীয় বৃহত্তম জনাকীর্ণ দেশ।

(২) চেরাপুঞ্জি / মহাবালেশ্বর / বোম্বাই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল স্থান।

(৩) শস্য উৎপাদন / খনিজ / পশুপালনের জন্য দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বিখ্যাত।

(৪) হিমালয় / রাজস্থান / পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

(৫) কয়লা / ম্যাঙ্গানিজ / লৌহ-আকরিক উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

(৬) তুঁতফল / আপেল / কাষ্ঠ / চা উৎপাদনে ডুয়ার্সের সমভূমি উন্নত।

(৭) মাদ্রাজ / কলিকাতা / কোচিনের পরিপূরক বন্দর হিসাবে হলদিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৮) গাঙ্গেয় বদ্বীপ / রাজস্থান / কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা-অঞ্চলে পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

(৯) হীরাকুদ / তিলাইয়া / ভাকরায় ভারতের সর্বোচ্চ বাঁধ অবস্থিত।

(১০) কেরালা / গুজরাট / অন্ধ্র প্রদেশে কাণ্ডলা অবস্থিত।

(১১) ভূপালে একটি সুবৃহৎ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং / লৌহ-ইস্পাত / রেলগাড়ি মেরামতের কারখানা অবস্থিত।

(১২) ২ নম্বর জাতীয় সড়কটি বোম্বাই-এর সহিত মাদ্রাজ / দিল্লীর সহিত অমৃতসর / কলিকাতার সহিত দিল্লীর যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

(১৩) ঝরিয়ায় উন্নত মানের অভ্র / কয়লা / বক্সাইট প্রচুর পরিমাণে মজুত রহিয়াছে।

(১৪) ভারতের সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্য বোম্বাই / কলিকাতা / মাদ্রাজ-এর মাধ্যমে হইয়া থাকে।

(১৫) বোম্বাই / কলিকাতা / দিল্লী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর-গোষ্ঠী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

1984

অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র

Answer any SIX questions

১। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে কি বুঝায় ? মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ইহা কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে ? ৫+১০

২। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসম জনবসতি বিন্যাসের ভৌগোলিক কারণ বর্ণনা কর। ১৫

৩। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। এই অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে জলবায়ুর ভূমিকা কি ? ৫+১০

৪। যথাযথ উদাহরণ সহ সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর। ৫+১০

৫। পৃথিবীর বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর। বনসম্পদের প্রধান প্রধান ব্যবহার উল্লেখ করিয়া উহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ কর। ৬+৪+৫

৬। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পেট্রোলিয়ম উৎপাদক দেশগুলির নাম কর। ইহার বিবিধ ব্যবহার কি কি ? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা কর। ৪+৬+৫

৭। রবার চাষের অনুকূল ভৌগোলিক কারণগুলি বর্ণনা কর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবার চাষ কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ কি ? ৮+৭

৮। বাণিজ্যিক ভাবে পশম উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ করিয়া আন্তর্জাতিক পশম ব্যবসায়ে ইহাদের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৯+৩+৩

৯। কাগজ-শিল্প উন্নয়নের প্রধান কারণ কি কি ? পৃথিবীর মুখ্য কাগজ উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর এবং ইহাদের অবস্থানের যৌক্তিকতা সমর্থন কর। ৯+৩+৩

অথবা

বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার পারস্পরিক গুরুত্ব ও অসুবিধার কথা আলোচনা কর। ৮+৭

১০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভৌগোলিক উপাদানসমূহ নির্দেশ কর। এই বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির বিবরণ দাও। ৮+৭

অথবা

যথাযথ উদাহরণসহ কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রভাব আলোচনা কর। ১৫

১১। নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোন তিনটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ ৫×৩

(ক) পশ্চাদ্ভূমি ও মাধ্যম বন্দর।

(খ) শিল্প-স্থাপনের মুখ্য উপাদান।

(গ) আদর্শ জনবসতি ও বসতির ঘনত্ব।

(ঘ) কৃষিপদ্ধতির প্রকারভেদ।

(ঙ) অধাতব খনিজ।

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঠিক উত্তর লিখ— ১×১৫

(১) অরণ্য একটি পূরণশীল / অপূরণশীল সম্পদ।

(২) পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যক্ষেত্রগুলি গভীর সমুদ্র / অগভীর মহীসোপান / নদী উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

(৩) সরলবর্গীয় / চিরহরিৎ / পর্ণমোচী বনভূমির জন্য তৈগা অঞ্চল খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

(৪) টিটাগড়ে ধানকল / ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প / কাগজের কল আছে।

(৫) হেমাটাইট / গ্যালেনা / বক্সাইট আকর হইতে এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়।

(৬) আলকাতরা / ডিজেল তেল / সুরাসার কয়লার একটি উপজাত দ্রব্য।

(৭) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি জলবিদ্যুৎ / নিকেল / খনিজ তৈল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

(৮) ট্রম্বে আণবিক শক্তি / কার্পাস বস্ত্র / চর্মের দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

(৯) ভারতের উত্তর-পূর্বের উচ্চভূমি / কানাডার মধ্যাঞ্চলের সমভূমি / ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলে ঝুমচাষ করা হয়।

(১০) কানাডা তৈলবীজ / ধান / গম রপ্তানি করে।

(১১) নাতিশীতোষ্ণ / শুষ্ক / উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু চা চাষের অনুকূল।

(১২) অস্ট্রেলিয়া পশম / মাছ / রবার উৎপাদন করে।

(১৩) ওসাকা / কানাডা / পশ্চিম-জার্মানী / জাপানের এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

(১৪) লৌহ-ইস্পাত / রাসায়নিক সার / সিমেন্ট শিল্পে সালফিউরিক অ্যাসিড কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(১৫) জলপথ / সড়কপথ / রেলপথ-এ পরিবহণ সর্বাপেক্ষা সুলভ।

1984

অর্থনৈতিক ভূগোল—দ্বিতীয় পত্র

Answer any SIX Questions

১। ভারতের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির নাম কর। ইহাদের যে কোন একটির ভূমিরূপ বর্ণনা করিয়া ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ভূমিরূপের প্রভাব উল্লেখ কর। [২+৮+৫

১০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সুয়েজ খালের অর্থনৈতিক গুরুত্বের আলোচনা কর। [১৫

অথবা

কার্পাস বয়ন শিল্পে কাঁচামাল ও বাজারের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। পৃথিবীর তিনটি উল্লেখযোগ্য কার্পাসবস্ত্র উৎপাদনকেন্দ্রের নাম লিখ। [৫×২+৫ ১৫

১১। নিম্নলিখিত যে কোন তিনটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর— [৫×৩=১৫

(ক) অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের গুরুত্ব।

(খ) লৌহ-সঙ্কর গোষ্ঠীর ধাতব খনিজ।

(গ) বন্দর সৃষ্টির অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ।

(ঘ) বনসম্পদ সংরক্ষণ।

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঠিক উত্তর দাও— [১×১৫=১৫

(ক) হিমালয় পর্বতের পাদদেশ সুন্দরবনের / তরাই বনভূমির / শুষ্ক বনভূমির জন্য বিখ্যাত।

(খ) প্ল্যাঙ্কটন মানুষের / মৎস্যকুলের / বন্যপ্রাণীর প্রিয় খাদ্য।

(গ) পাইনের বনভূমি হইতে লাক্ষা / মধু / তার্পিন তৈল সংগ্রহ করা হয়।

(ঘ) লৌহ-ইস্পাত শিল্পে বক্সাইট / হেমাটাইট / টিন প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(ঙ) আলকাতরা হইল কয়লা / বাদাম তৈল / লৌহ আকরের উপজাত দ্রব্য।

(চ) ইউরেনিয়াম / লিগনাইট / সীসা হইতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা হয়।

(ছ) কৃষ্ণমৃত্তিকা ধান / ইক্ষু / তূলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(জ) দুগ্ধজাত শিল্পে ডেনমার্ক / কোরিয়া / চীনদেশ বিশেষ উন্নত।

(ঝ) নাইজেরিয়া / ভারতবর্ষ / পাকিস্তান কোকো উৎপাদনে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

(ঞ) বাগিচা-ফসল উৎপাদনে সাইবেরিয়া / নিউ জিল্যাণ্ড / দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

(ট) কৃষ্ণা / গোদাবরী / গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপে পাটচাষ কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

(ঠ) শীতল ও শুষ্ক / উষ্ণ ও আর্দ্র / উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু মেষ-পালনের বিশেষ উপযোগী।

(ড) তূলা / পাট / রেশম উৎপাদনে মিশর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

(ঢ) প্রশান্ত মহাসাগরের / ভূমধ্যসাগরের / বঙ্গোপসাগরের তীরে সানফ্রান্সিস্কো বন্দর অবস্থিত।

(ণ) জাপান / সোভিয়েত ইউনিয়ন / ভারতবর্ষ আকরিক-লৌহ আমদানি করে।